বঙ্গদর্শন

(নবপর্য্যায়)

মাসিক পত্র

দ্বাদশ বর্ষ

১৩১৯

প্রবন্ধ-লেখক লেখিকাগণ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়-
কুমার মৈত্রেয়, শ্রীশশধর রায়, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল,
শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি, শ্রীকৃষ্ণদাস দত্ত, শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার
রায়, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীখগেন্দ্রনাথ
মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্রীদ্বিজেন্দ্র-
লাল বসু, শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীপঞ্চা-
নন মজুমদার, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, শ্রীতারকচন্দ্র
রায়, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরামলাল সর-
কার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশীতলচন্দ্র
চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র, শ্রীকালি-
দাসরায়, শ্রীগোপালচন্দ্র দেব,
শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়, শ্রীমতী
প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী প্রিয়-
ম্বদা দেবী প্রভৃতি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে।

এস, সি, মজুমদার প্রকাশিত,

বার্ষিক মূল্য ৩৸৹।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ব্রহ্মসংহিতা ও ভক্তিবাদ

অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মহাগ্রন্থ স্বয়ং দাক্ষিণাত্য হইতে জন্মভূমিতে আনয়ন করিয়া শ্রীল জীব গোস্বামী দ্বারা টীকা লেখান। সেই মূল ও টীকা এবং মূলের ও টীকার পৃথক্ পৃথক্ অনুবাদ এবং ষড়দর্শন ও ভক্তি শাস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে এক অদ্বিতীয় ও পূর্ণতম পরমাত্মা তাহা মূলে শ্লোকাদির ব্যাখ্যা ও আভাস দ্বারা দেখান হইয়াছে, তৎপরেই ভক্তিই যে মুক্তির একমাত্র কারণ এবং "রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি" তাহা ভক্তিবাদে বুঝান হইয়াছে। এমন গ্রন্থ, এমন সংগ্রহ, এমন আলোচনা কোন গ্রন্থে নাই। বঙ্গভাষায় ইহা মহাগ্রন্থ। বৃহৎ পুস্তক, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও কাগজ। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

দ্বাদশ বর্ষ] বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১৯ [১২শ সংখ্যা

সূচী

এস্, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩১৯

নব বর্ষের

বঙ্গদর্শনের

বৈশাখ সংখ্যা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়গণের বিবিধ রচনা ও কোন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস, ও শ্রেষ্ঠ গল্প ও নক্সা-লেখকগণের ছোট গল্প ও নক্সা প্রভৃতি থাকিবে। নববর্ষ হইতে নূতন বন্দোবস্তানুযায়ী, গ্রাহকগণ ১০ই তারিখের মধ্যে প্রতিমাসের কাগজ পাইবেন।

গ্রাহক মহোদয়গণ ৩০ শে চৈত্রের মধ্যে আগামী বর্ষের মূল্য ৩।৵০ মণিঅর্ডার করিলে সুবিধা অনুভব করিব। যাঁহারা মণিঅর্ডারে টাকা পাঠান অসুবিধা মনে করেন, তাঁহাদের নিকট ৩।৵০ চার্জ্জ করিয়া বৈশাখের সংখ্যা ভিপিতে প্রেরিত হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণের কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে ৩০শে চৈত্র্ মধ্যেই অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

বঙ্গদর্শন

চরিত-চিত্র

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার ইতিহাসে গুরুদাস বাবুর স্থান

বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গুরুদাস বাবুর নাম থাকিবে কি না, জানি না। না থাকাই সম্ভব। ইতিহাস সচরাচর যে সকল বস্তুর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করে, গুরুদাস বাবুতে সে বস্তু বেশি নাই। যাহা অলোক-সামান্য, ইতিহাস কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে। গুরুদাস বাবুর এরূপ অলোকসামান্য কোনো কিছু নাই। তাঁর অনেক বিদ্যা আছে, কিন্তু অনন্যসাধারণ বিশেষজ্ঞতা নাই। শ্রেষ্ঠ মেধা আছে, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা নাই। গুরুদাস বাবু কর্ম্মী; আর তাঁর কর্ম্ম সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও নীতি, শাস্ত্র ও লোকাচারের সম্মান করিয়া চলে। এই জন্য যাঁহারা সচরাচর এ সংসারে কলহ-কোলাহল-মুখর কর্ম্মজাল বিস্তার করিয়া, সস্তায় একটা ঐতিহ্য-কীর্ত্তি অর্জ্জন করে, গুরুদাস বাবু সে জাতীয় কর্ম্ম-নায়ক নহেন। তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করে; এতটা শ্রদ্ধা বাংলাদেশের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণ হইতে, আর কাহারো প্রতি অর্পিত হইতেছে কি না, সন্দেহ। দেশের লোকে তাঁহার বিদ্যার সম্বর্দ্ধনা করে; তাঁহার বিনয়-সৌজন্যের সমাদর করে; তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মনিষ্ঠার ও আত্মনিষ্ঠার পূজা করিয়া থাকে। সকল প্রকারের জনহিতকর কর্ম্মে তাঁহার নেতৃত্ব কামনা করে। সকল স্বাদেশিক সাধু-অনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও সাহচর্য্য, তাঁর পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু তিনি যে তাহাদের চিন্তা ও ভাব, আশা ও আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া, অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাহাদের অন্তর্জ্জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছেন, এমনটী কখনো অনুভব করে না। আর এ জগতে যাঁহারা, মিত্রভাবেই হউক আর শত্রুভাবেই হউক, আপনাদের সম-সাময়িক জনমণ্ডলীর জ্ঞান, রস, আশা, আদর্শ, প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইয়া থাকেন, ইতিহাস কেবল তাঁহাদেরই স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক কীর্ত্তির বিশেষত্ব

কিন্তু ইতিহাসে যাঁহাদের নাম থাকিয়া যায়, কেবল তাঁহারাই যে সমাজের শ্রেষ্ঠ জন, কেবল তাঁহাদেরই নিকটে যে সমাজ অশেষ ও অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ থাকে, অপরের নিকটে থাকে না, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। ফলতঃ ইতিহাস যে কেবল ভালকেই মনে করিয়া রাখে, মন্দকে ভুলিয়া যায়, তাহাও নহে। রোমের ইতিহাস পুণ্যশ্লোক মার্কাস্ অরিলিয়সের যেমন, তেমনি ক্রূরমতি নীরোরও নামকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন পুরাণ-কথায় রামও আছেন, রাবণও আছেন; যুধিষ্ঠিরও আছেন, দুঃশাসনও আছেন। ভারতের পূণ্যস্মৃতি জনকের নামও মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, বেণ রাজার নামও ভুলিয়া যায় নাই। ইতিহাস কেবল ভালকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে, মন্দকে রাখে না, তাহা নয় ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু অলোকসামান্য, ইতিহাস তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। মানবের প্রকৃতি হইতেই তো ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতির উৎপত্তি। আর যাহা নিত্য, তাহা অপেক্ষা যাহা নৈমিত্তিক, যাহা স্থিতি-হেতু, তাহা অপেক্ষা যাহা গতি-সহায়; মানুষের মন তাহারই দ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে যাঁহারা জনসমাজের স্থিতির সহায়, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা জন-সমাজের গতির হেতু হইয়া উঠেন, ইতিহাস তাঁহাদিগের স্মৃতিকেই বিশেষভাবে জাগাইয়া রাখিতে চাহে। যে সকল শক্তির সমবায়ে বা সংঘর্ষণে সমাজ-জীবনবিবর্ত্তিত হয়, ইতিহাস তাহাকেই ভাল করিয়া লক্ষ্য করে। আর সমাজ-বিবর্ত্তনে ভাল ও মন্দ দুই মিশিয়া থাকে। আলো ও ছায়ার সমাবেশ ব্যতিরেকে যেমন কোনো তৈলচিত্র ফুটিয়া উঠে না; যেইরূপ ভাল ও মন্দের সংঘর্ষ ব্যতীত সমাজ-জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাল ও মন্দের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহারই দ্বারা, সেই বিরোধের ফলস্বরূপই, জনসমাজ বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই দেবাসুর-সংগ্রাম মানব-সমাজের নিত্য ধর্ম্ম। আর তারই জন্য, এই মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যে ইতিহাসের কর্ম্ম, সেই ইতিহাস লোকে যাহাকে ভাল বলে কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে না; কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু শক্তিশালী, যাহা কিছু অনন্যসাধারণ, যাহা কিছু গতির কারণ, ইতিহাস সর্ব্বদা তাহাকেই নিরপেক্ষভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রণালী

আর অলোকসামান্য প্রতিভাই সচরাচর জনমণ্ডলীর প্রাণে নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া, যুগে যুগে সমাজের এই গতিশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত করিয়া থাকে। এই সকল নূতন ভাব ও আদর্শের প্রেরণায়, যাহা পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, তাহা পাইবার জন্য জনগণের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই লোভ হইতে নূতন কর্ম্মের আয়োজন, এবং এই কর্ম্মচেষ্টা হইতেই সমাজের বিবর্ত্তন ও বিকাশ সাধিত হয়। অলোকসামান্য প্রতিভা সমাজের গতি-বেগ বৃদ্ধি করে বলিয়াই ইতিহাসে তাহার এত গৌরব। কিন্তু জনসমাজের কল্যাণকল্পে যেমন তার গতি-শক্তির তেমনি তার স্থিতি-শক্তিরও আবশ্যক। যেখানে সমাজের

গতি-শক্তি তাঁর সনাতন স্থিতি-শক্তিকে একান্তভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে, সেখানেই সমাজ-চৈতন্য একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া, উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির ক্রীড়াপুত্তলি হয় এবং অচিরে বিনাশের মুখে যাইয়া পড়ে। আবার যেখানে সমাজের স্থিতি-শক্তি একান্ত-ভাবে তাহার স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে, সেখানে কিছুদিনের জন্য সমাজ নিতান্ত স্থবির হইয়া পড়ে এবং শুদ্ধ গতানুগতিক পথ ধরিয়া জড়গতিমাত্র প্রাপ্ত হয়, জীবন-চেষ্টা প্রকাশ করিতে পারে না। আর স্বভাবের গতিরোধ করিয়া কিছুকালের জন্য স্থবিরত্ব লাভ করে বলিয়াই, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ, পরিণামে প্রবল বিপ্লবের মুখে যাইয়াই পড়ে। এই জন্য, সমাজের চিরন্তন কল্যাণকল্পে, তাহার স্বাভাবিক বিবর্তন-পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিতে হইলে, তাহার গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয় শক্তিকেই, আপন আপন অধিকারে, সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক হয়।

সমাজ-জীবনের ত্রিধারা

কারণ, জনসমাজের বিবর্তন-চেষ্টা গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয়কেই সমভাবে অবলম্বন করিয়া চলে। একদল লোক যখন কোনো অভিনব ভাব বা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ আত্যন্তিকভাবে সমাজের গতি-বেগকে বাড়াইয়া তুলিতে চান; অপর এক দল লোক তখন, সমাজের অবস্থার পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিব্যবস্থার এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং এই পরিবর্তনের একান্ত প্রতিরোধ করিলে সমাজের গুরুতর অকল্যাণ সাধিত হয়, ইহা বিচার না করিয়া, সমাজস্থিতির দোহাই দিয়া, প্রাণপণে এই প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আর এই দুই দলই সমাজ-বিবর্তনের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে, ইতি-হাসে স্মরণীয় হইয়া রহেন। কিন্তু যাঁহারা এক দিকে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে সমাজের গতিবেগকে আত্যন্তিক ভাবে বাড়াইয়া তোলেন, তাঁহারা যেমন সমাজের স্থৈর্য্য ও শান্তি নষ্ট করিয়া, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রাণ-বস্তুকে পীড়িত করেন; সেইরূপ যাঁহারা অন্যদিকে অভিনব যুগধর্মের ও কালধর্মের প্রতি অমনস্ক হইয়া, এই প্রবুদ্ধ গতিবেগকে জোর করিয়া প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহারাও সেইরূপই অযথা সংগ্রাম বাঁধাইয়া, সমাজ-প্রাণকে রক্ষা করিতে যাইয়াই, তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন। কিন্তু যাঁহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া, ধীর-ভাবে তার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং যতক্ষণ না এই সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়া নূতনের ও পুরাতনের মধ্যে একটা উচ্চতর সন্ধি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ কোন এক পক্ষকে একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে, এই কলহ-কোলাহলের মধ্যে সমাজের মর্ম্মস্থলে যে সনাতন প্রাণবস্তু আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই কেবল ধরিয়া বসিয়া রহেন,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরু-দণ্ডস্বরূপ। কোন সমাজে, কালপ্রভাবে, তাহার পূর্ব্বকৃত ও অধুনা-চেষ্টিত কর্ম্মবশে, এইরূপ সমর-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, যাঁহারা নূতনের লোভেও আত্মবিস্মৃত হন না, আর তার ভয়-বিভীষিকাতেও বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন না,—

কামবশাৎ নূতনকেও আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন না, আর কার্পণ্যবশাৎ পুরাতনের জীর্ণতাকেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহেন না; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গুণাগুণ ও দাওয়াদাবীর পরীক্ষা হইয়া পরিণামে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, ধীরভাবে তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন,—প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের সনাতনী প্রাণশক্তি তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে। কলহকোলাহলপ্রিয় ইতিহাস এই সকল লোকের খোঁজ লয় না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও, আসন্ন-সমাজ-বিপ্লবের মুখে, এই সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ, শান্ত ও সমাহিত-চিত্ত সুধীজনই অতি সন্তর্পণে, সেই সঙ্কটকালে, সমাজের সনাতন প্রকৃতিটীকে প্রাণে পূরিয়া বাঁচাইয়া রাখেন।

গুরুদাস বাবু ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়

বাংলার স্বদেশী সমাজ একটা প্রবল বিপ্লব-স্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এই সঙ্কটকালে যে অত্যল্পসংখ্যক ধীর-প্রকৃতি সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজের সনাতন প্রাণবস্তু আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, গুরুদাস বাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। যে বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে এই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, গুরুদাস বাবু সেই শিক্ষা ও সাধনাকে সুন্দর-রূপেই অধিগত করিয়াছেন। এ দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তিনি অগ্রণী। যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে, গুরুদাস বাবু তাহার অন্যতম অধিনায়ক। কিন্তু গুরুদাস বাবুর সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই যেরূপভাবে এই শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গুরুদাস বাবু কখনো সেরূপ হন নাই। অন্যদিকে যাঁহারা এই শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াও, ইহার প্রতি একটা গভীর ও অযৌক্তিক বিরাগ বশতঃ এই শিক্ষাদীক্ষাতে দেশ মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী পরি-বর্ত্তনের স্রোত আনিয়াছে, সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন; গুরুদাস বাবু কখনো একান্তভাবে তাঁহাদেরও সঙ্গে মিশিয়া যান নাই। মানুষের বিদ্যা তাহার ভৃত্য হইয়াই থাকিবে, তাহারই ঈপ্সিত-সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত হইবে; ইহাই বিদ্যালাভের সত্যলক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজি-কালি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে বিদেশীয় বিদ্যা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছি, তাহা অনেক স্থলেই আমাদের ভৃত্য না হইয়া, আমাদের প্রভু হইয়াই বসিতেছে। আমরা অনেকেই এই অভিনব বিদ্যাকে নিজেদের কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না; প্রত্যুত এই বিদ্যাই আমা-দিগকে ভয়াবহ পর-ধর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে। মানুষের শিক্ষা ও সাধনা তাহার আত্মজ্ঞানেরই স্ফূরণ করিবে; ইহাতেই শিক্ষাদীক্ষার স্বার্থকতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ না করিয়া, অনেক সময় কেবল আত্মবিস্মৃতিই জন্মাইয়া দেয়। এই বিদেশী বিদ্যার বলে আত্মলাভ করা দূরে থাক, অনেক সময় আমরা আত্মবিক্রয় করিয়াই বসি। এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি ও আত্মবিক্রয় আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। সংস্কারক ও সংস্করণ-বিরোধী, উভয় দলেরই মধ্যে ইহা দেখা যায়। এক শ্রেণীর সমাজ ও ধর্ম্ম-

সংস্কারক সর্ব্বজনসমক্ষে, স্পর্দ্ধাসহকারে, নির্লজ্জভাবে, যেমন এই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহারা এই প্রকাশ্য প্রয়াসের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও গোপনে গোপনে সেই বিজাতীয় ভাবকেই অজ্ঞাতসারে প্রাণ মধ্যে বরণ করিয়া তুলিতেছেন। ভগবানকে যেমন মিত্রভাবে ভজনা করিয়াও পাওয়া যায়, শত্রুভাবে সাধন করিয়াও পাওয়া যায়, আর শাস্ত্রে বলে, শত্রু-ভাবে সাধন করিলে যত সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, মিত্রভাবের ভজনায় তত সত্বর হয় না;—সেই-রূপ কোনো বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনাকেও মিত্র-ভাবে ও শত্রুভাবে, উভয় ভাবেই পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা মিত্রভাবে য়ুরোপের ভজনা করিতেছেন। সংস্করণ-বিরোধী "পুনরুত্থানকারিগণ" শত্রুভাবে তার সাধনা করিতেছেন। আর কার্য্যতঃ উভয় পক্ষই সমভাবে তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণের উপরে য়ুরোপের প্রভাব প্রত্যক্ষ, সংস্করণ-বিরোধিগণের উপরে প্রচ্ছন্ন—দু'এর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ।

"সংস্কারক" ও সংস্করণ-বিরোধী

সংস্কারকগণ অসাধারণ অভ্যুদয়সম্পন্ন বিদেশীয় সমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান-প্রতি-ষ্ঠানাদিকে যথাসাধ্য নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। আর এইরূপে বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বাহ্য উপকরণগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করিতে যাইয়া, স্বল্পবিস্তর আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। স্বদেশী সভ্যতা ও সাধনার যে একটা অতি ভাল দিক্ আছে, এ কথা ইঁহারা অস্বীকার করেন না। বরং এই ভালটুকুকে রক্ষা করিবার জন্যই যে সংস্কারের প্রয়োজন, ইহাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোনো সমাজের বহিরঙ্গগুলিকে গ্রহণ করিয়া তার ভিতরকার প্রকৃতিগত আদর্শ ও স্বভাবকে বর্জ্জন করা যে কখনো সম্ভব হয় না, এটা তাঁহারা বোঝেন না। বিদেশীয় সমাজের বাহিরের উপকরণ ও আয়োজনগুলিকে প্রাণ-পণে সংগ্রহ করিব, আর স্বদেশের সমাজের ভিতরকার প্রাণটাকেও ধরিয়া রাখিব এবং তাহারই মধ্যে পূরিয়া দিয়া একটা উৎকৃষ্টতম সমাজ গড়িয়া তুলিব, ইহা যে একেবারে অসম্ভব ও অসাধ্য,—এই মোটা কথাটা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। প্রত্যেক জীবের আত্ম-প্রয়োজনেই তার দেহটা গড়িয়া উঠে। জীবদেহের বহিরঙ্গগুলি একটা আকস্মিক ঘটনাপাতের অচেষ্টিত ফল নহে। সমাজ-জীবন এবং সমাজ-দেহ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদি সেই সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, তার আভ্যন্তরীণ জীবন-চেষ্টার ফলেই গড়িয়া উঠে, কোন আকস্মিক ঘটনাপাতে, আপনা হইতে গজায় না, অথবা অন্য সমাজ হইতেও উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে না। দেহের সঙ্গে দেহীর যেমন অঙ্গাঙ্গী—ইংরেজিতে ইহাকে অর্গেনিক রিলেষণ (Organic relation) বলে—প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, বিধি-ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সেই সমাজ-জীবনের সম্বন্ধও সেইরূপ অঙ্গাঙ্গী, আকস্মিক নহে। কাণ টানিলেই যেমন আপনা হইতেই মাথাও সরিয়া আইসে, সেইরূপ কোন সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের ঠাটটাকে কোথাও খাড়া করিতে গেলেই, তার প্রাণটাও

যে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত। বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গসাধনে নিযুক্ত হইলে, তার অন্তরঙ্গটুকুকেও লইতেই হইবে। আর এরূপ ভাবে, স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তার দেহ ও প্রাণ উভয় বস্তুকেই যদি আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে স্বদেশের সত্য প্রাণটাকে কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সংস্কারকগণ যে ভাবিতেছেন, তাঁরা বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার ভাল ভাল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই গুণিয়া বাছিয়া, নিজের সমাজে গ্রহণ করিবেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশের সনাতন আদর্শটীকেও বাঁচাইয়া রাখিবেন, ইহা নিতান্তই অলীক কল্পনা মাত্র। প্রত্যেক সভ্যতা ও সাধনাতেই ভাল ও মন্দ দুই আছে। আর এই ভাল ও মন্দ, ছায়াতপের ন্যায়, পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া আছে। সকল সমাজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যেই ভাল ও মন্দের এই অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি ও আচার-বিচার, সামাজিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, সে সমাজে, তার সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্রের মধ্যেই ভালকে রক্ষা করিবার ও মন্দকে রোধ করিবার একটা অপূর্ব্ব কৌশলও আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। অপর সমাজ যদি এই সকল রীতিনীতি বাহির হইতে গ্রহণ করিতে যায়, তাহা হইলে, ভাল মন্দ দুই তাহাকে লইতে হয়। কিন্তু তার ভালটীকে বাড়াইয়া দিয়া মন্দটীকে রোধ করিবার এই সহজ কৌশলটী সে সমাজ কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। কারণ এই সহজ কৌশলটী ধার করিয়া পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই অনুকরণ-প্রয়াসী সংস্কার-চেষ্টা, সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া, সর্ব্বদাই ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম-ও-সমাজ-সংস্কারকগণ যেমন এইরূপে বিদেশের সমাজের বহিরঙ্গসাধনে সচেষ্ট হইয়া, সেই সমাজের ভিতরকার ভাব ও আদর্শের দ্বারা উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া, তাহারই ফলে স্বদেশের ভিতরকার সনাতন প্রাণস্রোতের বাহিরে যাইয়া পড়িতেছেন; সংস্করণ-বিরোধিগণও সেইরূপই, অন্যভাবে ও অন্য কারণে, সেই সনাতন প্রাণ-স্রোত হইতে একান্তভাবেই সরিয়া যাইতেছেন। সংস্কারকগণ বিদেশীয় সমাজের বাহিরের আচারানুষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেদের সমাজের প্রাণরূপী সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শটীকে পূরিয়া, তাহাকে সময়োপযোগী ও কার্য্যক্ষম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পরদেহে যে সে প্রাণ থাকিবে না, থাকিতে পারে না; তৎপ্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। সংস্করণ-বিরোধিগণ বিপরীত পথ ধরিয়া স্বদেশের সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রবল প্রাণটাকে পূরিয়া দিয়া, নিজেদের সমাজের বাহ্য ঠাটটাকে সতেজ ও সময়োপযোগী করিতে চাহিতেছেন। আমাদের পুরাতন সমাজ-দেহ বিদেশের এই নবীন প্রাণের টান যে কখনই সহিতে পারিবে না, তৎপ্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। আর এই-রূপ উভয় পক্ষই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারক-গণ নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গটাকে

স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বিদেশীয় সমাজের ছাঁচে, নিজেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতার পশ্চাতে একটা পাদ্রিজনসুলভ, কল্পিত, বিশ্বমানবী প্রেমের প্রেরণাই আছে; নিজেদের সমাজ-জীবন ও সমাজ-প্রকৃতির কোনো সত্য ধারণা নাই। অন্যদিকে যাঁহারা প্রাণপণে এই সংস্কার-প্রয়াসের প্রতিরোধ করিয়া, সমাজের "সনাতনী"টুকুকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; তাঁহাদের এই ব্যাকুলতাতে তাঁহাদের সরল স্বদেশপ্রীতিই প্রকাশিত হয়, কিন্তু নিজেদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে প্রাকৃতজনসুলভ দেহাত্মধ্যাসটা যে বিন্দু-পরিমাণেও বিচলিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা সমাজের দেহটাকেই, তার বাহ্য বিধিব্যবস্থা ও আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকেই সমাজের সনাতন প্রাণ বলিয়া ধরিতেছেন আর তারই জন্য, কালের প্রভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া, সমাজের বাহিরের ঠাটটাকে রক্ষা করিলে তার ভিতরকার প্রাণটাও রক্ষা পাইবে ভাবিয়া,যাঁহারা এই ঠাটটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ করিতেছেন। এইরূপে আমাদের সংস্কারকদল যেমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে, দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজগঠনকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্থলে বিলাতি আদর্শের একটা রজত-প্রধান শ্রেণী-ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন; সেইরূপ সংস্করণ-বিরোধিগণও আশ্রমভ্রষ্ট সুতরাং ধর্ম্মহীন যে বর্ত্তমান বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত আছে, তারই ভিতরে বিলাতী শ্রেণী-ভেদের প্রাণটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ক্ষয়োন্মুখ বহিরঙ্গটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একদল বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দেহটাকে, আর একদল তার প্রাণটাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন। সুতরাং একপক্ষ সজ্ঞানে, আর একপক্ষ অজ্ঞাতসারে, কিন্তু উভয় পক্ষই সমভাবে, সত্যকার স্বাদেশিকতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই দুই দলই, দুই ভিন্ন দিক দিয়া, দেশের সত্যিকার সনাতন সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

গুরুদাস বাবুর "মধ্যপথ"

গুরুদাস বাবু এই দুই প্রতিদ্বন্দিদলের কোনটারই অন্তর্ভূত নহেন। প্রচলিত অর্থে, তাঁহাকে কিছুতেই সমাজ-সংস্কারক বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি নিজেই কোন মতে সংস্করণ-বিরোধী বলিয়া পরিচিত হইতে রাজি নহেন। মানব-সমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ইহা তিনি জানেন। মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও, মোটের উপরে এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন যে উন্নতিমুখী, ইহাও তিনি মানেন। সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাচীন রীতিনীতিও যে পরিবর্ত্তন-যোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। "হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারকের অনেক কার্য্য আছে"—এ কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।*

* "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—৩১৭

সুতরাং মোটের উপরে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, প্রচলিত সমাজসংস্কারকদিগের সঙ্গেও গুরুদাস বাবুর মতের মিল আছে। তবে মতের মিল থাকিলেও কার্য্যের মিল নাই। তারই জন্যই গুরুদাস বাবুকে প্রচলিত অর্থে সমাজসংস্কারক বলা সঙ্গত নহে। সমাজসংস্কারকেরা সচরাচর সমাজের গতির বেগটাই বাড়াইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত; তার গতির দিক্‌টা স্থির রহিল কি না, তৎপ্রতি তাঁহাদের তেমন সজাগ দৃষ্টি নাই। আর এই খানেই তাঁহাদের সঙ্গে গুরুদাস বাবুর যা' কিছু বিরোধ। সাধারণভাবে সমাজসংস্কারকদিগের, সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে গুরুদাস বাবুর আন্তরিক সহানুভূতিই আছে। এই জন্য আপনি নিষ্ঠাবান ও একান্ত স্মৃতি-অনুগত হিন্দু হইয়াও, গুরুদাস বাবু কখনো শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধী সংস্কারক-সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং তাঁরা যে সাধু-ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সেই ইচ্ছার সফলতার জন্যই, তাঁহাদিগকে "অগ্রপশ্চাৎ ও চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে" চলিতে বলেন। *

হিন্দুর সমাজানুগত্য

এই সংযম ও সম্যক্‌দৃষ্টিই গুরুদাস বাবুর কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র সমাজের কল্যাণের জন্য, প্রয়োজন মত, তার প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। কোন চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞ হিন্দুই এ পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী নহেন। প্রাচীনকে বর্জ্জন করাই যে মহাপাপ, হিন্দুর বিবর্ত্তন-ইতিহাসে এমন অদ্ভুত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা প্রাচীন ও প্রচলিত তাহাকে ভাঙ্গাই যে অধর্ম্ম, গুরুদাস বাবুও এমন মনে করেন না। আবশ্যক হইলে, হিন্দু তাঁর দেবতার মন্দিরও তো ভাঙ্গিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভাঙ্গার ভাব ও ধরণ পৃথক। সে ভাঙ্গাতে তাঁর দেবতাও লুপ্ত হন না, তাঁর দেবভক্তিও নষ্ট হয় না। দেবতার পীঠস্থান বলিয়াই তো দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা। তারই জন্য তো সামান্য ইঁটকাঠের ঘর ভক্তের ভক্তির বিষয় হইয়া উঠে। হিন্দুর সমাজ, সেইরূপ, হিন্দুর ধর্ম্মের বহিরাবরণ ও কায়ব্যূহস্বরূপ ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ বলিয়া হিন্দুর শ্রুতি যাঁহার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নিতান্ত নিরাকার ভাবমাত্র নহেন। কেবল মানুষের হৃদয়-আকাশেই তাঁর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের প্রাণে, তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন; সেইরূপ যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করেন, সেই সমাজ-দেহে, তার রীতিনীতি এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যেও তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রত্যেক সমাজের বিধিব্যবস্থা, সেই সমাজের প্রাণগত ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রহে। অতএব হিন্দু আপনার দেহকে যেমন দেবতার মন্দির বলিয়া ভাবেন, তাঁর দেহ-পুরে যেমন তিনি সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বলোকসাক্ষী নারায়ণকেই একমাত্র পুরস্বামীরূপে দেখিয়া সংযত চিত্তে, পবিত্রভাবে দেহের সেবা করেন; সেইরূপ আপনার সমাজকেও হিন্দু সেই ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ পরমপুরুষের বহিরঙ্গ ও কায়ব্যূহ বলিয়া ভক্তি করেন। এই কারণেই নিষ্ঠাবান

* "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—২৮০ পৃষ্ঠা।

হিন্দুর চক্ষে তাঁর সমাজের আনুগত্য ও ধর্ম্মের আনুগত্য একই কথা হয়।

হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব

কারণ, হিন্দুর নিকটে তাঁর সমাজ, কতকগুলি মনুজগোষ্ঠির স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বা ঘটনাক্রমে সংগঠিত, একটা মিলনভূমি নহে। মানুষ কখনো ইচ্ছা করিয়া, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু এ সকল স্বকৃত সমাজ তার মূল সমাজেরই অন্তর্গত হয়, কিন্তু সে সমাজের সমধর্ম্ম লাভ করে না। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ, ভারত-সভা, জমিদারী-পঞ্চায়ৎ, জাতীয়-মহাসভা বা কন্‌গ্রেস্ এবং প্রাদেশিক সমিতি বা কন্‌ফারেনস্—এগুলি স্বেচ্ছাবদ্ধ সমাজ। কিন্তু মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়া আমরা যে সমাজের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, সে সমাজ এই জাতীয় সমাজ নহে। ফরাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, একটা কল্পিত সামাজিক সর্ত্তের বা সোসিয়াল্ কনট্র্যাক্টের (social contract) উপরে মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, সেই সর্ত্তের উপরেই জনমণ্ডলীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বস্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বহুদিন সে কল্পিত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন আর মানবসমাজকে এইরূপ একটা স্বেচ্ছাবদ্ধ ও স্বকৃত মিলনভূমি বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু কখনোই এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। হিন্দু চিরদিনই এটী জানেন যে মানুষ যেমন আপনার খুসি বা খেয়ালমত এই ভৌতিক দেহ ধারণ করে না, সেইরূপ সে আপনার ইচ্ছামত সমাজবিশেষেও জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ ব্যাপারই তার প্রাক্তনকর্ম্মবশে সংঘটিত হইয়া থাকে। তার প্রাক্তনকর্ম্মই তাহাকে আপনার নির্দ্দিষ্ট ফল-অনুযায়ী ভৌতিক দেহেতে আবদ্ধ করে। আর সেই প্রাক্তনকর্ম্ম-বশেই মানুষ সমাজ-বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই সমাজের কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই দেহের সঙ্গে যেমন, তার নিজের সমাজের সঙ্গেও সেইরূপ, মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ আকস্মিক নহে কিন্তু অঙ্গাঙ্গী। যেখানে সে ঘটনাবশে, পরজীবনে, সমাজান্তর গ্রহণও করে, সেখানেও তার মূল ও জন্মগত সমাজ-প্রকৃতিটীকে সে সঙ্গে লইয়াই যায়। সেই স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত নূতন সমাজে, নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া, কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, যে সমাজে তার জন্ম হইয়াছিল, সেই সমাজের মূল ছাপটা তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিরাচরণ হইতে কখনোই একেবারে মুছিয়া যায় না। প্রত্যুত বংশপরম্পরায় তার বৈজিকগুণ সংক্রামিত হইয়া, এই স্বেচ্ছাগৃহীত নূতন সমাজেও, চিরদিনের জন্য না হউক, অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত, তার বংশধরগণের চিন্তাতে ও চরিত্রে, সেই মূল সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর ইহাতেই সমাজের সঙ্গে সেই সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ যে আকস্মিক নহে, কিন্তু নিতান্তই অঙ্গাঙ্গী, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সঙ্গে সমাজান্তর্গত জনগণের যে সম্বন্ধ তাহা একান্তই অপরিহার্য্য ও অঙ্গাঙ্গী বলিয়াই, হিন্দু কখনো আপনার সমাজকে নির্জীব মনে করেন নাই। তাঁহার দেহে যেমন একটা প্রাণবস্তু আছে,

যাহা চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, যে সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব্ববিধ দৈহিক চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে এই প্রাণবস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন; তেমনি তাঁহার সমাজেও একটা প্রাণবস্তু আছে, হিন্দু এ কথায় চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। এই সমাজ-প্রাণকেও চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই বিবিধ চেষ্টার ভিতরে এই সমাজ-প্রাণও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। আর হিন্দুর এ সিদ্ধান্তকে য়ুরোপীয়দের পক্ষেও আজিকালি একটা অদ্ভুত কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কারণ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন এই কথাই বলিতেছেন। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মানবসমাজে জীবধর্ম্ম আরোপ করিয়া, তাহাকে নিঃসঙ্কোচে জীব-উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সোসিয়াল্ অর্গেনিজ্‌ম্ (social organism) বা সমাজ-জীব কথাটা য়ুরোপীয় চিন্তায় সর্ব্বথা গৃহীত হইয়াছে। আর এটা যদি কেবল একটা কথার কথা না হয়, এর পশ্চাতে যদি কোনো প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তবে জনসমাজের ভিতরে একটা আত্মস্ফূরিত প্রাণন-চেষ্টারও প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জীব বলিলেই তার একটা ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব আছে, এটা বোঝায়। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব সাধারণ জীবধর্ম্ম। জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যলাভের জন্য যথোপযুক্ত উপায়-নির্ব্বাচন ও সেই উপায়-অবলম্বনে আপনার সফলতালাভের প্রয়াস করিবার একটা আভ্যন্তরীণ শক্তিও আছে। জীবের সর্ব্ববিধ জীবন-চেষ্টার ভিতর দিয়া তার জীবনের এই চরম-লক্ষ্যটী নিয়ত ফুটিয়া উঠে। জীবের ভিতরকার ও বাহিরের বিভিন্ন সম্বন্ধ ও সর্ব্ববিধ বিধিব্যবস্থা এই লক্ষ্যটীর সন্ধানেই চলে। জনসমাজেরও সমষ্টিভাবে একটা গতি, একটা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-চেষ্টা, একটা নিয়ম আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু গতি আছে, তথাপি নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য নাই; বিধান আছে, তথাপি কোনো স্থির লক্ষ্য নাই; নিয়ম আছে, তথাপি সে নিয়ম কোন কিছুই স্থিরভাবে আয়ত্ত, প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না,—ইহা কুত্রাপি জীবধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। এরূপ অসঙ্গতি বুদ্ধিতে আসে না, কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু জনসমাজকে কেবল অর্গেনিজম্ বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। জনসমাজে শুদ্ধ জীবত্ব আরোপ করিয়াই, তার প্রকৃতি ও গতির সম্যক্ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। জনসমাজকে, এই জন্য, কেবল অর্গেনিজ্‌ম্ না বলিয়া বিইংই (Being) বলিতে হয়। ইতালীয় মনীষী মহামতি ম্যাট্‌সিনী মানব-সমাজকে এই বিইং উপাধি প্রদান করিয়াছেন। য়ুরোপীয়দের মধ্যে আধুনিক কালে, বোধ হয়, ম্যাট্‌সিনীই মানব-সমাজের মূল প্রকৃতিটী অতি পরিষ্কার রূপে ধরিয়াছিলেন। Humanity is a Being—আধুনিক যুগে ম্যাটসিনীই প্রথমে অকুতোভয়ে এ কথাটা বলিয়াছেন। আর বিইং (Being) বস্তু অচেতন নহে, সচেতন। তাহা স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। তার আত্মজ্ঞানই তার গতির কারণ ও স্থিতির ভূমি হইয়া আছে। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে বিইং (Being) বলেন, হিন্দু তাহাকে আত্মা বলেন। আমরা

যাহাকে "আমি" বলি, যাহাকে অপর মানুষে তুমি বা তিনি বলে, এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তুই আত্মবস্তু। তাহাই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এ বস্তু আপনি আপনার গতি-হেতু ও স্থিতি-ভূমি। হিন্দুর শাস্ত্রে, জীবান্তর্য্যামী এই আত্ম-বস্তুকেই নারায়ণ বলিয়াছেন। "জীবহৃদে জলে বসে সেই নারায়ণ।" এই নারায়ণই ব্যষ্টিভাবে জীবান্তর্য্যামী—পরমাত্মা। আর এই নারায়ণই, সমষ্টিভাবে, মহাবিষ্ণুরূপে, সমগ্র মানবসমাজেরও আত্মা। ম্যাট্‌সিনী যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া "হিউম্যানিটী ইজ এ বিইং" (Humanity is a Being) এই কথা বলিয়াছেন, সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াই, হিন্দু-সাধক মহাবিষ্ণু নাম দিয়াছেন। এই হিউম্যানিটীর ভাব বা আদর্শকে য়ুরোপের নিকট হইতে ধার করিয়া, বিশ্বমানব উপাধি দিয়া নিজেদের জাতীয় সাধনায় বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক।* আমাদের মহাবিষ্ণুতে এই ভাবটী যেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, য়ুরোপের হিউম্যানিটীতে এখনো তেমন ফুটিয়া উঠে নাই কোথাও কোথাও খৃষ্টীয়-সাধনায় খৃষ্টেতে বরং এ ভাবটী ফুটিয়াছে। এই মহাবিষ্ণুই বিশ্ব-আত্মা। এই দেহ নারায়ণেরই কায়ব্যূহ। তিনিই হৃষীকেশ,—এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের অন্তরস্থ পর-আত্মা বা পর-মাত্মা,—বিজ্ঞান-চৈতন্যের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। তিনিই কর্ম্মাধিপ,—দেহযনের সর্ব্ববিধ চেষ্টার নিয়ামক ও ফলদাতা। আবার সমষ্টিভাবে, মহাবিষ্ণুরূপে, এই নারায়ণই সমাজ-দেহে বাস করিতেছেন। জনসমাজ এই মহাবিষ্ণুরই কায়ব্যূহ-স্বরূপ। তিনিই ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ সমাজ-নিয়মের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। সমাজ-বিবর্ত্তনের তিনিই একমাত্র প্রবর্ত্তক ও পরি-চালক। ম্যাট্‌সিনী যে হিউম্যানিটীকে বিইং বলিয়াছেন, সেই তত্ত্বই বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু। আর আপনার সমাজকে হিন্দু এই সর্ব্বান্তর্য্যামী, এই সমাজা-ন্তর্য্যামী, এই বিশ্ব-আত্মা মহাবিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশ ও কায়ব্যূহরূপে দেখেন বলিয়াই, তাঁহার নিকটে সমাজের আনুগত্য ও ধর্ম্মের আনুগত্য একই কথা হইয়াছে।

হিন্দুসমাজতত্ত্বে গতি-শক্তির স্থান

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু যে কখনো আপনার সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হন না, এবং এই সকল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবার সময় প্রচলিত সমাজ-বিধির আনুগত্য অস্বীকার করেন না, এমনো নয়। হিন্দুর চক্ষে সমাজটা দেহমাত্র, নারায়ণই এ দেহের প্রাণ। আর প্রাণের প্রয়োজনেই দেহ; দেহের প্রয়োজনে তো প্রাণ নয়। প্রাণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও, সর্ব্বদাই দেহ অপেক্ষা বড় হইয়া রহে। নারায়ণ সর্ব্বদাই সমাজ হইতে বড়। আর সমাজের রীতিনীতি যখন কালবশে নারায়ণের আত্ম-প্রকাশের অনুপযোগী হইয়া, তাঁর আত্ম-প্রয়োজনেই, পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া উঠে, তখন তিনি স্বয়ং সাধুমহাজনগণেতে আবিষ্ট বা

* বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার সময়ে মাকে মহাবিষ্ণুর অঙ্কে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই মা'র নিত্যমূর্ত্তি। মহাবিষ্ণুর অঙ্ক হইতেই মা ক্রমে জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা রূপে সমাজ-বিবর্ত্তনে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবিষ্ণুই য়ুরোপীয়-দিগের হিউম্যানিটী।

অবতীর্ণ হইয়া, এই সকল পরিবর্ত্তনযোগ্য বিধি-ব্যবস্থা রহিত করিয়া, নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। তখন হিন্দু নিঃসঙ্কোচে এই মহাজনপন্থার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, প্রচলিত ও পুরাপ্রতিষ্ঠিত পরিবর্ত্তনযোগ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পুরাতন আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে যেখানে সমাজের সংস্কার সাধিত হয়, সেখানে এই সংস্কারচেষ্টা শুদ্ধ সমাজের ব্যক্তিগণের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ-সংস্কারের নামে, তখন সমাজের জনগণমধ্যে অসংযত ব্যক্তিস্বাভিমান জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে স্ব-স্ব-প্রধান করিয়া, সমাজ শাসনকে শিথিল করিয়া দেয় না। সেখানে প্রাকৃতজনের অশোধিত বিচারবুদ্ধি ও অসংযত ভোগলালসার দ্বারাই প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্ত্তনযোগ্যতাও প্রমাণিত হয় না এবং প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বশ্যতা অস্বীকার করিতে যাইয়া, সমাজসংস্কারচেষ্টা সমাজমধ্যে অরাজকতা আনয়ন করিতে পারে না। যুগে যুগে, এই ভাবেই হিন্দুসমাজের সংস্কার ও বিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। মহাজনপন্থার অনুসরণ করিয়াই হিন্দু সর্ব্বদা আপনার সমাজের সংস্কার ও শোধন করিয়াছেন। আর এই কারণেই, প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়াও, হিন্দু প্রকৃতপক্ষে কখনো সর্ব্বধর্ম্মমূল যে সমাজানুগত্য তাহাকে একান্ত-ভাবে বর্জ্জন করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও কদাপি হিন্দুসমাজে উপস্থিত হয় নাই।

মহাজন-পন্থার প্রণালী

কিন্তু কোনো সমাজের সকল লোকই সর্ব্বদা সেই সমাজের মূল প্রকৃতিকে সজ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে না। সকলেই তার শ্রেষ্ঠতম বিধান বা উৎকৃষ্টতম আদর্শানুযায়ী আপনাদিগের জীবনকে গড়িয়া তোলে না। এই জন্য কালবশে যুগে যুগে যখনি সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে, তখন সকল হিন্দুই যে এই মহাজনপন্থা আশ্রয় করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। আর কোনো যুগেই যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনেরা সেই যুগের প্রারম্ভেই আবির্ভূতও হন না। প্রথমে নানা কারণে সমাজ-মধ্যে নূতন আদর্শ ও নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। তখন অল্পে অল্পে নূতনে ও পুরাতনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া, সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে থাকে। আর তখন হইতেই এই সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের আগমনের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়োজনও আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলার একান্ত অতিশয্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা আবির্ভূত হন না। কারণ ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় একটা বিশেষ মাত্রা লাভ না করিলে, যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলেই, এক দল লোকে মহাজনপদাশ্রয় লাভ না করিয়াও, শুদ্ধ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রেরণাতেই সমাজের প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সে সময়ে আর একদল লোক সমাজস্থিতিরক্ষার্থে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি-নীতিকেই আশ্রয় করিয়া রহেন। কিন্তু যথা-সময়ে মহাজনেরা আবির্ভূত হইলেই যে সকলে বা অনেকে একযোগে তাঁহাদিগকে আশ্রয় করেন, তাহাও নহে। তখনো একদল লোকে প্রাচীনকেই ধরিয়া রহেন। হিন্দুসমাজের

বিবর্ত্তন-ইতিহাসেও এটী সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেবের সামসাময়িক আর্য্যগণ সকলেই বা অধিকাংশই তাঁহার শরণাপন্ন হন নাই। কেহ কেহ যেমন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ কেহ আত্যন্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার প্রতিরোধও করিয়াছিলেন। আর বহুসংখ্যক লোকই তাঁহার আনুগত্যও গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার প্রতিপক্ষতাও করেন নাই, কেবল যাহা ছিল, তাহাকেই ধরিয়া রহিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে, আমাদের এই বাংলাদেশেও তাহাই দেখা গিয়াছে। আর আমাদের এ কালেও যে যুগ-ভাঁবপ্রবর্ত্তক মহাজনের আবির্ভাব হয় নাই, এমনো তো নয়। কিন্তু সকলেই কি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বা করিতে পারিয়াছেন ?

ফলতঃ এরূপ সর্ব্বদাই হইয়াছে, ও সর্ব্বদাই হইবে। কারণ, সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়। কারো প্রকৃতি বা তামসিক, কারো বা রাজসিক, আর কারো বা শুদ্ধ সাত্বিক। যারা নিতান্ত তামসিক, তাঁরা এ মহাজনপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁদের অবিবেক, তাঁদের জড়তা, তাঁদের ভয়প্রমাদাদি এ পথে চলিবার একান্ত অন্তরায় হইয়া রহে। সেইরূপ যাঁরা নিতান্তই সাত্বিক, যাঁহাদের তমঃ ও রজঃ উভয়ই অন্তরস্থ সত্বগুণের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়াছে, সেই সকল সহজ-সিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ সাধু-সজ্জনেরা, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রতি ভক্তিমান হইয়াও, প্রয়োজনাভাবে, প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাদের ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের কর্ম্মস্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন না। যাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি রজোপ্রধান, তাঁহারাই প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের প্রবুদ্ধগতি-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপনাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা অন্বেষণ করেন। আর ইহাঁদের মধ্যে যাঁহাদের অন্তরস্থ রজোগুণ বর্দ্ধীয়মান সত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে আরম্ভ করে, তাঁহারাই যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণকে একান্তভাবে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন। কারণ, যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজনগণ আপনারা ত্রিগুণাতীত হইলেও, চতুঃপার্শ্বস্থ রজোগুণপ্রধান লোক-দিগকে অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রথম শিষ্যেরা সকলে না হউন, অনেকেই, রজোপ্রভাবে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া, প্রাচীন ও প্রচলিত সংস্কার ও পন্থাকে পরিহার করিয়া, নূতন সাধন ও শাসন গ্রহণ করেন। ক্রমে এই নূতন সাধন ও শাসনের ফলেই, তাঁহাদের অন্তরস্থ সত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রথমে তাঁহাদের রজোগুণকে অভিভূত করে, পরে, ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সুকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা ক্রমে ত্রিগুণা-তীত হইয়া, ভাগবতী তনু লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিণামে সত্বাধিক্য হইলেও, আদিতে, নূতন পন্থা অবলম্বন-সময়ে, রজো-গুণের অতিশয্য থাকা একান্তই আবশ্যক হয়। নতুবা সকলে যুগপ্রবর্ত্তকমহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারে না। আর এই কারণেই হিন্দুর যাবতীয় যুগাবতার ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। কেবল এক পরশুরামই, অবতারগণমধ্যে, ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া-ছিলেন মাত্র ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন

নাই। পরন্তু ত্রিভুবনকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্যই তাঁহাকে রজঃপ্রধানা রাগাত্মিকা ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। হিন্দুর কিম্বদন্তিপ্রসিদ্ধ যুগাবতারগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পশ্চাতে সমাজ-বিজ্ঞানের একটা অতি সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গুরুদাস বাবু ও মহাজনপন্থা

গুরুদাস বাবুর মধ্যে কখনো এই রজো-গুণের কোনো প্রকারের আতিশয্য দেখা যায় নাই। "কর্ম্মনাং অশমং স্পৃহা"—ইহাই রজের প্রধান লক্ষণ। এই গুণ "তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং।" ইহা "রাগাত্মিকা।" গুরুদাস বাবুর কর্ম্ম-চেষ্টা আছে। এখন পর্য্যন্তও জন-হিতকর কর্ম্মে তাঁর বিন্দু পরিমাণ আলস্য বা ঔদাসীন্য দেখা যায় না। কিন্তু কর্ম্মচেষ্টা থাকিলেও কখনোই কর্ম্মে তাঁর অশম স্পৃহা দেখা যায় নাই। তাঁর কর্ম্মচেষ্টা তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভব নহে, ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত। সুতরাং আমাদের অপরাপর কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে প্রায়শঃই যে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব ও ফলাফল-সন্ধিৎসু চাঞ্চল্য লুকাইয়া থাকে, গুরুদাস বাবুতে তাহা লক্ষিত হয় নাই। আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরে এই রজোগুণের আতিশয্য নাই বলিয়াই, যে মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া, অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে হিন্দুসমাজের বিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসমাজ প্রত্যেক যুগসন্ধিসময়ে আপনার গতিশক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে এমন সুন্দর ও সহজ সন্ধি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, গুরুদাস বাবু, আপনার কর্ম্মজীবনে বা ধর্ম্মজীবনে, কোথাও একান্তভাবে সেই মহাজনপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। গুরুদাস বাবুর ভিতরকার প্রকৃতিই এমন যে তিনি বৌদ্ধ-যুগের আদিতে জন্মিলে, কখনই একান্তভাবে ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্নও হইতে পারিতেন না, তাঁর প্রতিবাদীও হইতেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি অন্তরে অন্তরে ভক্তিমান হইয়াও, সেকালের ক্রিয়া-বহুল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৈদিক পন্থাকেই ধরিয়া রহিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও, গুরুদাস বাবু তাহাই করিতেন। সে কালের বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ও কায়স্থদিগের ন্যায়, গুরুদাস বাবুও হয় ত মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও সাধন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনই তাঁর একান্ত অনুগত হইয়া, সমাজের প্রচলিত স্মৃতি-আনুগত্য বর্জ্জন করিতে পারিতেন না। আর আমাদের এই কালে, বাংলার হিন্দু-সমাজের গতিশক্তি যে সকল মহাজনকে আশ্রয় করিয়া, সমাজের "পরিবর্ত্তনযোগ্য" রীতিনীতির সংস্কার-সাধনের প্রয়াসী হইয়াছে; গুরুদাস বাবু ইঁহাদের সকলেরি প্রতি ভক্তিমান, কাহাকেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন না; কিন্তু আবার কাহাকেই একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া, সমাজের পরিবর্ত্তনযোগ্য রীতিনীতির আনুগত্যও পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হন নাই।

গুরুদাস বাবু ও লৌকিকাচার

মোট কথা এই যে—

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ।

"যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্র-লঙ্ঘনক্ষম

হইলেও, কদাপি আপনার মনেও লৌকিকাচারকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না"—ইহাই গুরুদাস বাবুর কর্ম্মজীবনের মূল সূত্র হইয়া আছে। গুরুদাস বাবু, মোটের উপরে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতিরই পরিবর্ত্তন যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা জানেন ও মানেন। আর এ সকল মত প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যতদিন না সমাজ সমষ্টিভাবে এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না এগুলি লৌকিকাচারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ততদিন তিনি এ সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহেন। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এদেশের হিন্দুসমাজে যে অতি অল্পবয়সে বালক-বালিকাদের বিবাহ হইত, গুরুদাস বাবু তার প্রতিবাদী। চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষেই সচরাচর "স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর-সংসর্গলিপ্সার" উদ্রেক হয়; আর যে বয়সে এই প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তখনই তাহাকে "নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ন্যস্ত করিয়া নিবৃত্তিমুখী করিবার জন্য" নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য—বিবাহের বয়সসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। * কিন্তু কার্য্যতঃ বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া তিনি দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্তই তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিচার মতে চতুর্দ্দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষই বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম কাল নির্দ্ধারিত হওয়াই বিধেয়। "অসামান্য পবিত্র ও সংযতচিত্ত" নরনারীর পক্ষে আরো অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও, ধর্ম্মহানি হয় না, এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তথাপি কেবল লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়াই, গুরুদাস বাবু, দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষই বালিকার বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পরে, বাংলার হিন্দুসমাজের লৌকিকাচারে যদি অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ বর্ষের যুবতীগণের বিবাহ প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, গুরুদাস বাবু যে তখনো এই দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিয়মকেই ধরিয়া থাকিবেন, এমন বোধ হয় না। যেমন বাল্যবিবাহের সংস্কারসম্বন্ধে, সেইরূপ হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতি-বিচারসম্বন্ধেও, লোকাচারে যে পরিমাণে শিথিলতা বা ঔদার্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, গুরুদাস বাবু কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে রাজি আছেন। পরমার্থদৃষ্টিতে যে জাতি-বিচারের স্থান নাই, গুরুদাস বাবু ইহা স্বীকার করেন।

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
গাভী হস্তী কুক্কুরকে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে।
পণ্ডিতেরা সমভাবে দেখেন সকলে॥

এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে।" * গীতার এই উক্তি অনুসারে, আর গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারাই প্রথমে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হয়, এই কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করিয়া, হিন্দুসমাজে এখন যে আকারে জাতিবিচার প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্গত বলিয়া তাহার সমর্থন করা সম্ভব নহে; গুরুদাস বাবু ইহা জানেন।

* জ্ঞান ও কর্ম্ম—২৮৪ পৃষ্ঠা

* জ্ঞান ও কর্ম্ম—৩৫৪ পৃষ্ঠা।

কিন্তু সমাজের লোকমত এখনো এতটা অগ্রসর হয় নাই। তবে বাংলার হিন্দুসমাজে আজিকালি জাতিবিচারটা কেবল পানাহার ও বিবাহেতেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং মধ্য যুগের হিন্দুয়ানীর "লৌকিকাচারং মনসাংপি ন লঙ্ঘয়েৎ"—এই আদেশ মনে রাখিয়াই যেন, গুরুদাস বাবুও "আহার ও বিবাহ বাদ দিয়া" অন্যান্য বিষয়ে জাতির প্রাচীর যে ভাঙ্গা যাইতে পারে, ভাঙ্গাই যে কর্ত্তব্য, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আর যে যুক্তি অবলম্বনে * বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়েই এখন জাতি-বিচার মানিয়া চলা কর্ত্তব্য, অন্য বিষয়ে নহে, গুরুদাস বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও লৌকিকাচারই যে তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রধান ও সম্ভবতঃ একমাত্র তৌলদণ্ড, এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া যায়।

গুরুদাস বাবুর সামাজিক সিদ্ধান্ত

আর গুরুদাস বাবুর মতন এমন সম্যক্-দর্শী, এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদ্বিচারক মনীষীর সিদ্ধান্তেও সামান্য লৌকিকাচার যে এতটাই অদ্ভুত প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও একান্ত কঠিন নহে। প্রথমতঃ গুরুদাস বাবু আযৌবনকাল আইনকানুন লইয়াই দিন কাটাইয়াছেন। আর সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-শাস্ত্রেই লোকাচার অদ্ভুত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যে সকল লোকাচারের আরম্ভকাল জনগণের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সকল সভ্যসমাজেই সে জাতীয় লৌকিকা-চারকে প্রত্যক্ষ আইনের সুস্পষ্ট বিধানের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়। বিবাহ, দায়ভাগ প্রভৃতি সামাজিক সত্ত্বাসত্ত্ব নির্দ্ধারণে, এইরূপ লৌকিকাচার শ্রুতি-স্মৃতি অপেক্ষাও বলবত্তর বলিয়া গণ্য হয়। আর ব্যবহার শাস্ত্রে লৌকিকাচারের এতটা অদ্ভুত প্রভুত্ব দেখিয়াই, ব্যবহারজীবী গুরুদাস বাবুর প্রাণে তাহার প্রতি এমন অপরিসীম মর্য্যাদা জন্মিয়াছে। গুরুদাস বাবু ব্যবহারবিদ্ (jurist) ও নীতিবিদ্ (moralist) দুই। কেবল ব্যবহারবিদ্ বলিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে, জানি। কিন্তু তথাপি তাঁর সাধনায় ও সিদ্ধান্তে ব্যবহারবিদের দিক্‌টা যে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক নীতি-বিদের দিক্‌টা সে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। গুরুদাস বাবু জীবনের গুরুতর সমস্যাসকলকে কতটা পরিমাণে যে সমীচিন ব্যবহারবিদের চক্ষে দেখেন ও সর্ব্বদা ব্যবহার তত্ত্বের যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে এ সকলের যথোপযোগী মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁর "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন তাঁর ব্যবসায়ের দীর্ঘ অভ্যাস, অন্যদিকে সেইরূপ তাঁর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তও গুরুদাস বাবুর এই লোকাচারানুগত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তত্ত্বসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু শঙ্কর-বেদান্তাবলম্বী। শঙ্কর-বেদান্ত মতে, বিশেষতঃ যে মায়াবাদ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত বলিয়া এদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে, জীব ও জগতের সত্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, এই জীব ও জগতের পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান পরমার্থতঃ মিথ্যা। মায়াতেই এই সংসারের উৎপত্তি, মায়াতেই ইহার স্থিতি।

* জ্ঞান ও ধর্ম্ম—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

সংসারের বিবিধ সম্বন্ধসকলের কোনো নিত্য লক্ষ্য বা পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সমাজ-ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি, সকলই অতি নিচের কথা; সাধনার্থীর নিকটে ইহার মূল্য থাকিলেও, সিদ্ধ পুরুষের নিকটে কোনো সত্য, কোনো মূল্যই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতির ব্যবহারিক সত্য ও সার্থকতা আছে মাত্র; পারমার্থিক সত্য ও সার্থকতা নাই। অতএব দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, উপরতি, তিতিক্ষা, এ সকল সাধনসম্পৎলাভের জন্য উপযোগী অভ্যাসের ক্ষেত্র বলিয়াই সংসার প্রয়োজনীয়। সাধনসম্পৎ লাভ হইয়া ক্রমে বিবেক-বৈরাগ্যাদি ও সর্ব্বশেষে ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভূতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হইলে, সর্পের খোলস যেমন আপনা হইতেই, অনাবশ্যক বলিয়া, তাহার গাত্র হইতে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ জীবের সংসার ও তাহার যাবতীয় সামাজিক সম্বন্ধাদিও তাহার মন হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু কেবল মায়াবাদীর নিকটেই যে সংসারের সম্বন্ধসকল অনিত্য, ও অনিত্য বলিয়াই পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক, তাহা নহে। কোনো হিন্দুসিদ্ধান্তেই এ সকলের অনিত্যতা অস্বীকৃত হয় নাই। যাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরাও এগুলিকে নিত্য বা সত্য বলেন না। সুতরাং এ সকল ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধের অতীত হইবার চেষ্টা সকল সাধনেই আছে। তবে মায়াবাদী এ সকলের পশ্চাতে কোনো স্থায়ী রস প্রত্যক্ষ করেন না। আর যাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরা সংসারের সর্ব্ববিধ অনিত্য সম্বন্ধের মধ্যেও কতকগুলি স্থায়ী রসের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই সকল রসকে রস-স্বরূপ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই নিখিলরসামৃত-সিন্ধুর উপরিস্থ তরঙ্গভঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। এ সংসারে পিতাপুত্রের যে কায়িক সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষতঃই অনিত্য। প্রাকৃতজনে যে বাৎসল্যরস আস্বাদন করে তাহাও অস্থায়ী, সন্তানের জন্মের সঙ্গে তাহার উৎপত্তি হয়, আর সন্তান গত হইবার পরে সচরাচর তাহা ক্ষীণ হইয়া, দীর্ঘকাল পরে, লুপ্তপ্রায় হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধের পশ্চাতে একটা স্থায়ী বাৎসল্যরস আছে। এই স্থায়ী রসই, দেশকালাধীন এই সংসারে লৌকিক পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার যে সম্বন্ধ, তাহারই মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ রস ভগবৎ-প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পারমার্থিক ও নিত্য। সংসারের বিভিন্ন সম্বন্ধ এই স্থায়ী ভাগবতীলীলা-রসকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্বন্ধের অন্তরালে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ স্থায়ী রস বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই জন্য, এই পঞ্চ স্থায়ী রসের প্রকাশ ও আলম্বন বলিয়া, সংসারেরও একটা পারমার্থিক সত্য ও মাহাত্ম্য, মর্য্যাদা ও মূল্য আছে। জীব ও সংসার অত্যন্ত অনিত্য নহে, অত্যন্ত নিত্যও নহে; কিন্তু নিত্যানিত্য-মিশ্রিত; ইহাকে পরিণামী নিত্য বলা যায়। আর পরিণামী নিত্য বলিয়াই, এই সংসার ভাগবতী-লীলার আশ্রয় হইয়া আছে। এই লীলা-প্রয়োজনেই মনুষ্যসমাজ মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের কায়ব্যূহ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের আত্মচরিতার্থতার জন্যই, সেই অদ্বৈত-স্বরূপেরই মধ্যে, যে একটা দ্বৈত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দ্বৈত-সম্বন্ধ বা ভেদাভেদকে অবলম্বন করিয়াই

ভগবান নিত্যলীলপর হইয়া আছেন, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে এই তত্ত্বের কোনোই স্থান ও সঙ্গতি নাই। সুতরাং ভগবল্লীলীলারসপর বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে যে ভাবে ও যে অর্থে মহাজনপন্থা আশ্রয় করিয়া, সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে তাহা হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। এখানে লৌকিকাচারের পন্থা অবলম্বন করিয়াই এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের স্বাভাবিক বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তাহার আর অন্যপথ নাই।

সংসার মায়ামাত্র। সমাজসম্বন্ধ সকল মায়িক। মানুষের স্নেহমমতা, প্রেয়-ও-শ্রেয়বোধ, ভালমন্দজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার, সকলই অবিদ্যাবদ্ধিষয়ানী। সুতরাং নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কার্য্যের যে একটা সঙ্গতি রাখিতেই হইবে, এখানে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের এ সকল মতামত যখন মিথ্যা, কার্য্যাকার্য্য যখন মিথ্যা, মতের সঙ্গে কার্য্যের মিলন-বিরোধও যখন মিথ্যা; তখন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজের মিল হইল কি না হইল, তাহাও মিথ্যা। এ সকলের ব্যবহারিক সত্য থাকিলেও পারমার্থিক মর্য্যাদা নাই। এ সকল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক। প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সংসারধর্ম্মের কোনই পারমার্থিক সত্য ও মর্য্যাদা নাই। চিত্তশুদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব্ববিধ দ্বৈতবোধ নষ্ট করাই, শঙ্কর-বেদান্তমতে, সমাজধর্ম্ম ও সমাজবন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। সমাজবন্ধন ও সামাজিক সম্বন্ধ সকল জীবের বহির্মুখীন ও বহুমুখী প্রবৃত্তি সকলকে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী করিয়া দিয়াই, এই পারমার্থিক উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে। আর একমাত্র সংযম ও নিবৃত্তি-সাধনই যখন সমাজধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তখন লৌকিকাচারের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া যে কোনো উদ্দেশ্যে ও যে কোনো আকারেই সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহাতেই সমাজবন্ধনের এই মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলেই কোনো না কোনো আকারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হয়। এরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের পক্ষে আপনার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখা একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে। আর সর্ব্ববিধ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যেই যে কলহবিরোধ জাগিয়া থাকে, তাহাতে অন্তরের দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়াই রাখে, নষ্ট করিবার সাহায্য করে না। সুতরাং লৌকিকাচারকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা মোক্ষপথের অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য শঙ্করমতাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীসমাজে একদিকে প্রচণ্ড জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপন্থার প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব, অন্যদিকে তামসপ্রকৃতি-সুলভ নিশ্চেষ্টতা ও লৌকিকাচারের আত্যন্তিক আনুগত্য, এ দুই দেখা গিয়া থাকে। একদিকে—বিচারে, চিন্তায়, সাধনায় ও সিদ্ধান্তে—এ সকলে সর্ব্ববিধ দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধির নিন্দা করিয়াও, কার্য্যকালে ইহাঁরা প্রায় সর্ব্বদাই সমাজ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকারের ভেদ ও বৈষম্যের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়া চলিবার জন্য ব্যগ্র হন। শঙ্কর স্বয়ংও ইহার অন্যথাচরণ করেন নাই।

মধ্যযুগের হিন্দুয়ানী লৌকিকাচারকে যে এমন করিয়া ধর্ম্মের আসনে বসাইতে চাহিয়াছে, শঙ্কর-বেদান্তের সঙ্গে ইহার অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। আর আজিও হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়মধ্যেই শঙ্কর-সিদ্ধান্তের প্রভাব, প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, নিরতিশয় প্রবল রহিয়াছে বলিয়াই, আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণও লৌকিকাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে এত ভয় পাইয়া থাকেন। গুরুদাস বাবুর লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্যের অন্তরালেও শঙ্কর-বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে।

লৌকিকাচারকে কেবল মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীই যে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান কালে কোনো কোনো য়ুরোপীয় সিদ্ধান্তেও তার প্রায় অনুরূপ মর্য্যাদাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্টাদশ খৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তা, অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়াও সমাজ-স্থিতিরক্ষার্থে একটা বিজ্ঞান-সম্মত, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ মরালিটীর বা ধর্ম্মনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া, ফলতঃ লৌকিকাচারকেই ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদী কোমত্-সিদ্ধান্তেও আমাদেরই শঙ্কর-বেদান্তের ন্যায়, সমাজ-বিবর্ত্তনে সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য, এই লৌকিকাচারই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোমত্সিদ্ধান্ত-বাদিগণ, ইংরেজিতে যাঁহাদিগকে পজিটিভিষ্ট্ (Positivist) সম্প্রদায় বলে,—একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতির জন্য লালায়িত, সেইরূপ অন্যদিকে 'সমাজের স্থিতিভঙ্গ-নিবারণের জন্যও একান্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁরা কিছুতেই, কার্য্যতঃ, সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রভাব নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের নিকটেও সমাজই ধর্ম্মের কায়ব্যূহস্বরূপ। ক্যাথলিক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে চার্চ্চ বা রোমক-খৃষ্টীয় সঙ্ঘ যে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া সকলে যেরূপ এই চার্চ্চের বা সঙ্ঘের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলে, প্রত্যক্ষবাদী কোমত্মতাবলম্বিগণ মধ্যে সমাজ সেইরূপ মর্য্যাদাই প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের আনুগত্য মানিয়া চলা, কোমত্মতে নিতান্তই নীতিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোমত্-মতের সঙ্গে মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর এই সমাজানুগত্য বা লৌকিকাচারানুগত্যের একটা যে ঐক্য আছে, বাঙালী হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁরা কোমত্মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষায় ও চরিত্রে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের জমিদার, স্বর্গীয় যোগীন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ, ন্যাশন পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইহাঁরা দু'জনেই কোমত্-মতাবলম্বী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় জীবনের শেষভাগে এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা সকলেই জানেন। আর এঁরা দু'জনই একদিকে ঘোরতর প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী হইয়াও হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও সংস্কারাদির ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজ কোমত্বাদিগণ মধ্যে স্যার হেনরী কটন্ প্রভৃতি প্রায় সকলেই হিন্দুর এই লৌকিকাচারের আনুগত্যকে

কখনই ভাঙ্গিয়া দিতে চান নাই; বরং সর্ব্বদাই তাহাকে সঙ্গত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। ইহাঁরা পারলৌকিক ধর্ম্মের দিক্ দিয়া হিন্দু রীতিনীতির পোষকতা করেন নাই। সে ধর্ম্মে তাঁদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। কেবল শুদ্ধ সমাজের কল্যাণকামনায়, সমাজস্থিতি-রক্ষার্থে, সমাজনীতি বা মরালিটীর দিক্ দিয়াই এ সকলের সমর্থন করিতেন। গুরুদাস বাবু কোমত্‌মতাবলম্বী নহেন। কিন্তু সমাজনীতিসম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্য যে কোমত্‌মতের দ্বারা সমর্থিত হইয়া, আধুনিক য়ুরোপীয় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার একটা সঙ্গতি-সাধনে যে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তারই জন্য গুরুদাস বাবুর আধুনিক শিক্ষা এবং সাধনাও তাঁর চরিত্রগত মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর ঐকান্তিক লৌকিকাচারানুগত্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

গুরুদাস বাবুর এই রক্ষণশীলতার আরো একটী বিশেষ কারণ আছে। গুরুদাস বাবু একদিকে য়ুরোপের আধুনিক সাধনা ও অন্যদিকে স্বদেশের সনাতন সাধনার উভয়েরই মূল প্রকৃতিটী ভাল করিয়াই ধরিয়াছেন। এই দুই সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য আছে, ইহাও তিনি জানেন। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক সমাজের ধর্ম্মও যে সর্ব্বদাই তার ভিতরকার মূল প্রকৃতি হইতে, সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং এই জন্য কি ব্যক্তির পক্ষে কি সমাজের পক্ষে, সকলেরই পক্ষে যে পরধর্ম্ম ভয়াবহ হয়, ইহা ও তিনি বিশ্বাস করেন। আমাদের সমাজসংস্কারপ্রয়াস যে অনেক বিষয়েই ভারতের প্রাচীন সমাজ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, য়ুরোপের রীতি-নীতির স্বল্পবিস্তর অনুকরণচেষ্টায় চলিয়াছে, ইহাও তিনি দেখিতেছেন। য়ুরোপ যে পথে যাইয়া, অসংযত বিষয়-ভোগলালসায় বিক্ষিপ্ত হইয়া, আপনার জীবনসমস্যাকে বিষম জটিল করিয়া তুলিতেছে, নূতন নূতন পন্থার অনুসরণ করিয়া, সমাজের বুকে সমস্যার উপরে সমস্যাই স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে, একটীরও সমীচিন মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, কখনো পারিবে কি না, তাহারও স্থিরতা নাই; গুরুদাস বাবু এ সকলই জানেন। আর আমরা যে সমাজের হিতেচ্ছু হইয়া, এ সকল না বুঝিয়া, সংস্কারের নামে, অনেক সময়, নিজেদের সমাজের উপরে এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝা চাপাইয়া দিতেছি, ইহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর এই জন্যই অজ্ঞাত ও অপরিক্ষিত পন্থায় সমাজকে চালাইবার পূর্ব্বে, সে পথ সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির অনুযায়ী হইবে কি না, ইহা দেখিবার জন্যই, তিনি সর্ব্বদা এই লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে চাহেন। কারণ, কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়ই সর্ব্বদা আপনার প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই আধুনিক জীবতত্ত্বে বা বায়লজিতে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কহে। এই নিয়মাধীন হইয়াই, সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থারও বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কদাপি যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নহে। কিন্তু যেখানেই ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানেই সমাজ পরধর্ম্মবশে আত্মহারা হইয়া, বিপ্লবমুখী ও বিনাশোন্মুখ হইয়া উঠে। গুরুদাস বাবুর

রক্ষণশীলতার অন্তরালে এই বিপ্লবের ভয়ই জাগিয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ইহাঁরা অনেকেই প্রাচীন সমাজের জীর্ণদেহকে রক্ষা করিবার জন্য যত ব্যস্ত, তার ভিতরকার সনাতন প্রাণবস্তুকে রাখিবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন। হিন্দুয়ানীর বাহ্য ঠাটটা বজায় থাকিলেই, হিন্দুর সব রহিল, সেই ঠাটের ভিতরকার প্রাণটা হিন্দু কি অহিন্দু, ভারতীয় কি বিলাতী হইয়া যাইতেছে এ চিন্তা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। এক গুরুদাস বাবুই বোধ হয়, আধুনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে, হিন্দুর সনাতন প্রাণবস্তুকে অক্ষত ও অক্ষয় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। আর এই ব্যগ্রতার জন্যই হিন্দুসমাজের সনাতন প্রাণবস্তু এবং ধর্ম্মবস্তুও, আজ তাঁহাকে ও তাঁহারই মতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠ, সংযত ও সম্যকদর্শী সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া, আসন্ন বিপ্লবমুখে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক বস্তুরই স্থিতির ভূমি যাহা, তাহা অতি নিগূঢ় ভাবে, চক্ষের অন্তরালে, বসিয়া থাকে। তাহার গতির কারণ যাহা তাহাই বাহিরে ফুটিয়া উঠে। গুরুদাস বাবুর মত লোকনায়কগণ সমাজের স্থিতির সহায় বলিয়া, তাঁহাদের প্রভাব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না; নতুবা তাঁহাদের শক্তি ও মাহাত্ম্য যে সামান্য, তাহা নহে। ইহাঁরা আছেন বলিয়াই হিন্দুর সমাজের সমাজত্ব, ও হিন্দুর ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বটুকু এখনো আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাময়িক-আলোচনা

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ কথা শুনিয়া দেশের লোক যে প্রথমে কতকটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তখন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ও কালেজগুলি কলিকাতার অধীন ও পূর্ব্ববঙ্গের স্কুল ও কালেজগুলি ঢাকার অধীন হইবে। এইরূপভাবে লোকশিক্ষা লইয়া বাংলাদেশকে আবার নূতন করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে। সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া বঙ্গভঙ্গের কার্জ্জনী কুস্বপ্নটা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন সত্য; কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই, এই নূতন বঙ্গভঙ্গের আশঙ্কায় লোকমন সহজেই বিচলিত হইয়া উঠে। কিন্তু বড়লাট যখন সরলভাবে এই বিষয়ে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আর একটা নূতন পরীক্ষার যন্ত্র ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কিন্তু একটা প্রকৃত বিহার বা টিচিং ইউনিভারসিটি সেখানে স্থাপিত হইবে, তখন আর এরূপ ভয়ভাবনার কোনো কারণ রহিল কৈ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকালেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা লইয়াই ক্ষান্ত রহেন; এবং এই পরীক্ষা লইবার জন্য যতটা পরিমাণে ও যেরূপভাবে তাদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক ততটা তত্ত্বাবধানও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকালেজের মধ্যে কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠতা নাই, জন্মানোও অসম্ভব। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটা সত্য ও সজীব একতা বা কোনো প্রকারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

নাই। উচ্চ-আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই একতা ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধই প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন বিহার সকল এই শ্রেণীরই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিলাতে অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ, আমেরিকায় হারবার্ড, ইয়েল, এ সকল প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ও এই শ্রেণীরই। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের দেশে একটীও নাই। ঢাকায় এই প্রথম এই উচ্চ-আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে দেশের লোকের আনন্দ করাই কর্ত্তব্য; ক্ষোভের তো কোন কারণ এখনো দেখা যায় না।

* * *

এইরূপ বিহার বা টিচিং ইউনিভারসিটি যদি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ফলে বরিশাল, মৈমনসিংহ, রাজসাহি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যে সকল স্কুলকালেজ এখন আছে, তার সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সম্বন্ধ কিছুতেই তো ছিন্ন হইতে পারে না। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার অন্তর্ভূত স্কুলকালেজ সকল সেই স্থানেতেই আবদ্ধ থাকে। অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের বাহিরে, এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট কোনো স্কুলকালেজ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট কোনো স্কুলকালেজও ঢাকা সহরের বাহিরে থাকিবে না, থাকিতে পারিবেই না। তাই যদি হয়, তবে বড়লাট হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এক বলিয়া অন্য বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিবেন, এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ সন্দেহের তো কোনো কারণ নাই। আজি পর্য্যন্ত তিনি কেবল আপনার দূরদর্শিনী নীতিরই পরিচয় দিয়াছেন, রাজনীতি-সুলভ কুটিলতার কোনো পরিচয় দেন নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের আলোচনায় কাহারো সততা বা অসততার কথা তোলাই অপ্রাসঙ্গিক। ডাক্তারী ব্যবসায়ে, ডাক্তার যখন রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি সাধু কি অসাধু, সরল কি অসরল, এ সকল প্রশ্ন উঠে না, তোলাই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক; কেবল তাঁর নিদান-জ্ঞান আছে কি না, রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার কুশলতা আছে কি না, ইহাই বিচার্য্য। সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক কোনো কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার-আলোচনায় কর্ত্তার দূরদর্শিতা ও সম্যক দর্শন আছে কি না, তিনি মূল সমস্যাটী ধরিয়াছেন কি না, এবং তাঁরই উপযোগী করিয়া শাসন-ব্যবস্থা করিতেছেন কি না, এ সকলই কেবল বিবেচ্য, তাঁর সততা বা অসততা, সরলতা বা কুটিলতা, এ সকল সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত। লাট হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের দূরদর্শিতা আছে কি না, দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিচারালোচনার দ্বারা তাঁর শাসননীতি সত্যভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, এ ক্ষেত্রে ইহাই কেবল বিবেচ্য। আর এইরূপ ভাবে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের আলোচনা করা যায়, তবে তার সমীচিনতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে, বা থাকিতে পারে এমন মনে হয় না।

* * * *

প্রথমতঃ হার্ডিঞ্জ মহোদয় যে বলিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় নহে, ইহা অতি সত্য। আমরাও তো বহুদিন ধরিয়া, নানাভাবে, নানা দিক্ দিয়া, এই আক্ষেপই করিয়া আসিতেছি। নানাভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানেরও যে চেষ্টা হইতেছে, আর এ জন্য যে গবর্ণমেণ্ট অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহাও জানা আছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিই এরূপ, ইহার গঠনই এমন, জন্মাবধি এই বিশ্ববিদ্যালয়টী এমন ভাবে, এমন সব অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে এখন ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়িয়া তোলা কেবল অসম্ভব নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অসাধ্য। ফলতঃ কলিকাতার মত সহরে একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এখানকার সামাজিক অবস্থা, লোকের বসবাসের ব্যবস্থা, এ সকলই একটা সাচ্চা

বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়গঠনের একান্তই বিরোধী। একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব বিষয়েই যথাসম্ভব আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন হওয়া একান্তই আবশ্যক। অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ প্রভৃতির এ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা আছে। আর এটী থাকা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, এই দুইটা সহর কার্য্যতঃ কেবল এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটীকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয় নাই, ও হইতেই পারে নাই, এই জন্য লণ্ডনের উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রকারের কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব ছিল না, কখনো সম্ভব হইতেই পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আর এই জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে, তারই ছাঁচে, প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের আদর্শে গড়িয়া উঠে নাই।

*　　*　　*

ঢাকাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের আদর্শেই গঠিত হইবে। বড়লাট বারম্বার মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং ও রেসিডেন্‌শিয়েল ইউনিভারসিটী (Teaching and Residential University) হইবে, লর্ড হার্ডিঞ্জ স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা কোনও আকারে যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে একটা ভাগ বাটোয়ারা বসান হইবে না, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। ইহার পরেও তাঁর এই অভিপ্রায়ের প্রতিরোধ করা কেবল অযৌক্তিক নহে, কিন্তু নিতান্তই অসঙ্গত।

*　　*　　*

ফলতঃ যাঁরা এখনো ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁরা এই প্রস্তাবের ভিতর-কার তত্ত্বটী এখনও ধরিতে পারেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমানবিরোধীরা ইহা ধরিলেও, হিন্দু বিরোধীদল একে-বারেই ধরিতে পারেন নাই। আর তারই জন্য এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তাটা ইহাঁরা একেবারেই স্বীকার করিতে রাজি নন। বড়লাট যে ভাবের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা যে অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য ইহা সকলেই বোঝেন। আর বর্ত্তমান অবস্থায় সরকার কোথা হইতে এত টাকার ব্যবস্থা করিবেন, অনেকে ইহাও ভাবিয়া পান না। আর এই জন্যই সত্যি সত্যি যে ঢাকায় একটা উচ্চ অঙ্গের বিহার স্থাপিত হইবে, তাঁরা কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। আর এটী বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই, গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কোনো না কোনো একটা অসাধু অভিপ্রায় লুকাইয়া আছে, এরূপ কল্পনা করিতেছেন। এই চেষ্টার ভিতরকার তত্ত্বটী ধরিতে পারিলে, এ ভয় ভাবনা হইত না।

*　　*　　*

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সহর, বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের কেন্দ্রস্থল। সমস্ত ভারতবর্ষে পঞ্জাব ও বাংলা এই দুইটীই মুসলমান-প্রধান প্রদেশ। আর বাংলার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গই বিশেষভাবে মুসলমান-প্রধান হইয়া আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঢাকায় বা পূর্ব্ব-বঙ্গের কোথাও আলিগড়ে যে মুসলমান কলেজ আছে, তার প্রভাব প্রত্যক্ষ হয় নাই। সমগ্র মুসলমান-সমাজকে এক করিয়া পুনরায় ইস্‌লামের আধিপত্যকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায়, ভিন্ন ভিন্ন মুসলমানাধিকৃত দেশে যে একটা প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া উঠিতেছে, ভারতবর্ষে আলিগড়ই তার একটা কেন্দ্র-স্থল। ইস্‌লাম মহামণ্ডলের বা প্যান্-ইস্‌লামিজমের (Pan-Islamismএর) ভাবটা আলিগড় কালেজের ছাত্রদের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল। তাঁরা এই ভাবটাকে ভারতময় ব্যাপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই ইসলাম্-মহামণ্ডল বা প্যান্-ইসলামিজমের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশশাসননীতির একটা নিগূঢ় ও প্রবল

প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। ভারতের মুসলমান-প্রকৃতিপুঞ্জ বহির্ভারতের মুসলমান শক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে কোনও প্রকারের সখ্য বা সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ হয়, ভারতের ব্রিটিশ প্রভুশক্তি কখনই এটী ইচ্ছা করেন না। অথচ এইরূপ সখ্যবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের মুসলমান-সমাজের ইংরেজিশিক্ষিত নেতৃবর্গের অনেকেই বিশেষ লালায়িত। আলিগড়ই মুসলমানগণের একমাত্র নিজস্ব বিদ্যালয়। পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত মুসলমানসম্প্রদায়কে এই বিদ্যালয়ের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যই প্রধানতঃ ঢাকায় একটী নূতন ও উচ্চ অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্যই অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান এই প্রস্তাবের এত বিরোধী হইয়াছেন। আমাদের হিন্দুনেতৃবর্গ এই প্রতিবাদে মুসলমানগণের সঙ্গে যোগ দিয়া যে আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করিতেছেন, এ কথা যে বোঝেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

নব বর্ষ

এস এস, হে বর্ষ নূতন!
নূতন কিরণ ঢালি' আশার আলোক জ্বালি'
এস এস, হে অতিথি করি আবাহন!
বুকভরা প্রেমরাশি, ল'য়ে এস মধু হাসি,
আজি নত শিরে তোমা' করি গো বন্দন!
এস এস, হে বর্ষ নূতন।

এস এস, হে বর্ষ নূতন!
উঠিছে তরুণ রবি, আকাশে সোনার ছবি,
কাননে কুসুমবালা মেলিছে নয়ন;
আলোকে পুলকি' প্রাণ বিহগ গাহিছে গান—
তোমার বন্দনা ভরি' নিখিল ভুবন;
এস এস, হে বর্ষ নূতন!

এস এস, হে বর্ষ নূতন!
ভুলাইয়া ভূত কথা, মুছাইয়া মলিনতা
আন' নব বল দেহে—নূতন জীবন;
শুনাও নূতন গীতি প্রাণ ভরি' দেও প্রীতি,
পূর্ণ কর জীবনের আশা, আকিঞ্চন;
এস এস, হে বর্ষ নূতন!

এস এস, বরষ নূতন!
দেখাও কর্ত্তব্য-পথ, জীবনের ভবিষ্যৎ,
ভেঙে দেও সুখতন্দ্রা—অলস স্বপন;
দণ্ডে-দণ্ডে পলে-পলে আয়ু ক্ষয়মুখে চলে,
কে বা জানে কত দূরে হবে সমাপন!
এস এস, বরষ নূতন!

এস এস, বরষ নূতন!
তীরে-তীরে দিয়া পাড়ি, কৈশোর, যৌবন ছাড়ি'
কোন্ খেয়া-ঘাটে তরি করিবে বন্ধন;
ফেলে যাবে কত গ্রাম— নয়নের অভিরাম,
তালী-নারিকেল-কুঞ্জ-ছায়ায় মগন!
এস এস, বরষ নূতন!

এস এস, বরষ নূতন!
বল আর কত দূরে নিয়ে যাবে কোন্ পুরে
হয় ত, সন্ধ্যার ছায়া নামিবে তখন;
তখন বাঁধিও তরি, যাত্রা সমাপন করি'
করিব নূতন দেশে, নব পদার্পণ;
এস এস, বরষ নূতন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ভিক্টর হুগোর কথা

ভিক্টর হুগোর মহিমামণ্ডিত নাম ভুবনবিখ্যাত। তাঁহার সাহিত্য-যশঃসৌরভ দিগন্তব্যাপ্ত। তিনি কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি ঔপন্যাসিক; এবং এই বিবিধ ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয়া, তাঁহার প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত। অনেক কাব্যরসজ্ঞ তাঁহাকে ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়াছেন। ইউরোপীয় বিদ্বৎ-সমাজেই তিনি অনেক বার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেক্ষপীয়র' বলিয়াও অভিহিত ও সম্পূজিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজেও তাঁহার ভক্তের সীমা নাই। এমন মানুষের জীবন-কথা শুনিবার আগ্রহ অনেকের হইবার সম্ভাবনা। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কিন্তু বলিয়া রাখিতে হইতেছে যে, ইহা ভিক্টর হুগোর জীবনী নহে। তাঁহার বাল্য-শিক্ষা ও সাহিত্য-জীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র। আমি প্রবন্ধ লিখিতেছি; জীবন-বৃত্ত লিখিতেছি না।

১৮০২ খৃঃ অব্দের ২'এ ফেব্রুয়ারি ভিক্টর হুগো জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তিনি এমন ক্ষুদ্র, শীর্ণ, দুর্ব্বল ও জীবনী-শক্তিহীন ছিলেন যে, প্রসবকারী-চিকিৎসক স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, এই শিশুর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে, "তাহাকে কাপড় পরাইয়া একখানি সাধারণ চেয়ারের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সে এত অল্প স্থান অধিকার করিয়াছিল যে, তাহার মতন আরও বারটি ছেলের স্থান, সেই চেয়ারে হইতে পারিত।" তাঁহার অগ্রজ ইউজিন্ তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল --"এ আবার কি একটা ছোট্ট জানোয়ার!" ইউজিন্ তখন দেড় বৎসরের শিশু, ভাল করিয়া কথা বলিতেও শিখে নাই।

নেপোলিয়ানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফ্ বোনাপার্ট নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে ভিক্টরের পিতা লিয়োপোল্ড হুগো কর্ম্মকুশলতা, রণদক্ষতা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ রাজকীয় কর্সিকান্ সেনাদলের কর্ণেল ও আভেলিনো প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসরেরও অধিককাল তিনি স্ত্রীপুত্রের সঙ্গসুখে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি এই দীর্ঘকাল কর্ম্মানুরোধে ইতালির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভূমধ্যসাগরের একাধিক দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সুতরাং পত্নী ও পুত্রত্রয়কে সঙ্গে রাখিতে পারেন নাই। তাহারা প্যারিসে বাস করিতেছিল। এক্ষণে এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া, এবং ইতালিতেও শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, তিনি স্ত্রীকে আসিতে লিখিলেন।

১৮০৭ সালের অক্টোবর মাসে মাদাম্ হুগো পুত্রত্রয়কে লইয়া ইতালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভিক্টরের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। এই দূরপথ যাত্রা সম্পর্কীয় বড় অধিক কথা পরিণত বয়সে ভিক্টরের মনে ছিল না, কিন্তু দুই চারিটা ঘটনা

তাঁহার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। একটা ঘটনা এই যে, তাহাদের প্যারিস হইতে যাত্রাকালে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল; তাহাতে তাহাদের গাড়ীর জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আর মনে ছিল, আপিলাইন্ পর্ব্বতে এক দিনকার ভোজনের কথা। পার্ব্বত্য বায়ুর কল্যাণে বালকদিগের অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। সঙ্গে আহার্য্য কিছুই ছিল না; নিকটে সাধারণ ভোজনাগার পাইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। অকস্মাৎ একজন ছাগ-পালকের সহিত দেখা হইল; সে লোকটা তাহার কুটীরে বালকদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিল। কিন্তু তথায় খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিল না—কেবল একটি সদ্যোনিহত ঈগল্ পক্ষী পড়িয়া ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় বালকেরা কোলাহল করিয়া উঠিল, "আমরা এই ঈগল্ পাখীই খাব।" ছাগপালক সত্য সত্যই তাহা রাঁধিয়া দিল; বালকগণ মহা আহ্লাদে ও আগ্রহে তাহা উদরসাৎ করিল।

আরও একটা কথা মনে ছিল। সেই সময়ে জলপ্লাবনে পারম্যা নগরীর চতুর্দ্দিক ডুবিয়া গিয়াছিল। জুতা, মোজা ভিজাইতে অনিচ্ছুক কৃষকেরা সেগুলি বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া খালি পায়ে পথ চলিতেছিল, এই অসদৃশ দৃশ্য দেখিয়া বালক ভিক্টর বড়ই আমোদ পাইল; তাহার অগ্রজ ইউজিন্‌কে টিপিয়া বলিল—"দেখ, দেখ, কি সব মজার লোক! ইহারা বরং নিজের পা ক্ষয় করিবে, তবু জুতা ক্ষয় করিতে রাজি নয়!"

অবশেষে যাত্রীর এই ক্ষুদ্র দল আভেলি-নোতে গিয়া পৌঁছিলেন। আহ্লাদে অধীর লিওপোল্ড হুগো তাঁহার জমকাল সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্ত্রী ও পুত্রদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

আভেলিনোতে অবস্থানকালে বালক-দিগের দিন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। পাঠশালায় যাইতে হয় না, পাঠাভ্যাস করিতে হয় না, শিক্ষকের তাড়না নাই, গৃহেও কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিড়ম্বনা নাই—কোন বালাই-ই ছিল না; কেবল খেলা-ধূলা করিয়া, হাস্য-কলরব করিয়া, গাছে চড়িয়া, ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিয়া, প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, দিন বড় আনন্দেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু এত সুখ বড় অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কয়েক মাসের মধ্যেই নেপ্‌ল্‌সের রাজা যোসেফ্ বোনাপার্টি স্পেনের সিংহাসন লাভ করিয়া ইতালি হইতে চলিয়া গেলেন। স্পেনের রাজধানী মাড্রিডে পৌঁছিয়া তিনি লিওপোল্ড হুগোকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার ইতালিতে থাকায় কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু তিনি স্পেনে আসিলে অধিকতর প্রীতি ও সন্তোষের বিষয় হয়। মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধনসম্পদ, উচ্চ-পদ, গৌরব, লিওপোল্ড হুগোর যাহা কিছু, সবই যোসেফ্ বোনাপার্টির প্রসাদে; ইতালি পরিত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি লিও-পোল্ডকে নাইট্ কম্যানডার ও মার্শালের উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয় প্রীতিপূর্ণ আহ্বান কি অস্বীকার করা যায়? স্পেনে যাওয়াই স্থির; কিন্তু নবাধিকৃত স্পেন তখন অশান্তিপূর্ণ। ইতালি তাহার নূতন রাজাকে সহজে স্বীকার করে নাই;

স্পেনও করিল না। তেমন অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া তথায় যাওয়া নিরাপদ ও সঙ্গত নহে। লিওপোল্ড হুগো স্থির করিলেন যে স্ত্রী ও পুত্রদিগকে প্যারিসে পাঠাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং স্পেনে যাইবেন।

তাহাই হইল। পুত্রকলত্র প্যারিসে পাঠাইয়া দিয়া লিওপোল্ড হুগোর পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বড়ই দুর্ব্বহ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার মাতা বরগণ্ডি প্রদেশে অবস্থান করিতে-ছিলেন। লিওপোল্ড এই সময়ে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ এইরূপ—

"সর্ব্বকনিষ্ঠ ভিক্টরের লেখাপড়া শিখিবার বড় আগ্রহ। সে তাহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ধীর, গম্ভীর ও চিন্তাশীল। কথা সে বড় কহে না; কিন্তু যাহা বলে তাহা সকল সময়েই প্রসঙ্গাধীন—প্রসঙ্গাতীত কখনই হয় না। সময়ে সময়ে সে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহাতে আমি বিস্মিত হই। আমার কাছে তাহারা যে এখন নাই, তাহাতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু উপায় কি? এখানে ত তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার কোন সুবিধা নাই; সুতরাং প্যারিসে পাঠান ব্যতীত আর উপায় ছিল না।"

ভিক্টর হুগো শৈশবে কেমন ছিলেন, তাহা তাঁহার পিতার এই পত্র হইতে কতকটা বুঝা গেল।

প্যারিসে আসিয়া বালকদিগকে একটি শিশুবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্ব্বেই ভিক্টরের বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, এবং অক্ষর দেখিয়া ও মিলাইয়া সে নিজের চেষ্টাতেই পড়িতে শিখিয়াছিল। বিদ্যা-লয়ে আসিয়া লিখন ও বর্ণবিন্যাস শিখিতে হইল। তাহার শিক্ষকের পত্নী অনেক সময় গৌরব করিয়া বলিতেন যে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ভিক্টরকে শ্রুতলিপির জন্য বাইবেলের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া বলা হইয়া-ছিল, এবং সমস্ত অধ্যায়টি লিখিতে ভিক্টরের একটির অধিক ভুল হয় নাই—সে কেবল bent কথাটা লিখিতে একটা e অধিক দিয়া লিখিয়াছিল।

শিশু ভিক্টরের লেখাপড়া শিখিবার যেমন আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছিল, খেলা-ধূলাও তদ্রূপ বা ততোধিক ছিল। সে যাহাই করিত, সর্ব্বান্তঃকরণে করিত। ক্রীড়ার সময় তাহাদের কোন ভ্রাতারই পরিচ্ছদের প্রতি বড় ভ্রূক্ষেপ থাকিত না, ভিক্টরের একেবারেই না। যখন তাহারা খেলা সারিয়া মাতার নিকট আসিত, তখন প্রায়ই দেখা যাইত, তাহাদের গায়ের জামা ধূলা-মাটিতে ভরা, পায়জামা নানা স্থানে ছেঁড়া। ইহার জন্য তাহাদিগকে প্রায়ই মাতার কাছে তিরস্কৃত হইতে হইত। এক-দিন তাহারা এ বিষয়ে এতই বাড়াবাড়ি করিয়াছিল যে, মাদাম্ হুগো অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে শাসাইয়া বলিলেন—"পুনরায় তোমরা যদি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে ড্রেগুনদের মতন মোটা কাপড়ের পোষাক পরিতে হইবে।"

পরদিন তাহারা বিদ্যালয় হইতে গৃহে

ফিরিবার সময় একদল ড্রেগুন সৈনিক অশ্বারোহণে যাইতেছিল। সূর্য্যকিরণে তাহাদের পরিচ্ছদ ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া ভিক্‌টর বড়ই মুগ্ধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারা কাহারা?" সঙ্গিনী ধাত্রী বলিল—"ইহারা ড্রেগুন।"

বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া ভিক্‌টর বড়ই চেঁচামেচি ও ছুটাছুটি করিত। সে দিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এক ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, অথচ ভিক্‌টরের কোন সাড়াশব্দ নাই। কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া মাতা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলেন, একটি প্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্তভাবে ভিক্‌টর নিজের পায়জামা ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতেছে। মাতা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—ওখানে ও কি হইতেছে? কিছুমাত্র ভীত বা অপ্রতিভ না হইয়া, অম্লানবদনে মাতার মুখপানে চাহিয়া ভিক্‌টর বলিল—"আমি ড্রেগুনদের মতন পায়জামা পরিতে চাই।"

১৮০৯ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে মাদাম হুগোর গৃহে এক জন নূতন অতিথির আগমন হইল। এই অতিথি, জেনারাল লাহোরী। নেপালিয়নের কোপে পড়িয়া ইনি কিছু দিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুর গৃহে লুক্কায়িত থাকিয়া জীবন কাটাইতেছিলেন। পুলিশ তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়াই ছিল বলিয়া একই স্থানে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। তাই গুপ্তভাবে থাকিলেও তাঁকে পুনঃপুনঃ আবাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছিল। এক্ষণে তিনি আসিয়া মাদাম্ হুগোর গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিণতবয়স্ক হইলেও তিনি শিশুদিগের সহিত সরল, উদার ও অমায়িক ভাবে মিশিতে পারিতেন। ইহাদের খেলাধূলায় ইনি অকপট ভাবে যোগ দিতেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভিক্‌টরকে ইনি সময়ে সময়ে ধরিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেন এবং পতন সময়ে ধরিয়া লইতেন। এইরূপ খেলায় শিশুর মাতা বড়ই ভীত হইতেন, কিন্তু ভিক্‌টরের আনন্দের সীমা থাকিত না।

এই গৃহে ইহার অবস্থানে শিশুদিগের বিদ্যাশিক্ষার অনেক সাহায্য হইয়াছিল। ইনি তাহাদের পঠিত বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন, অনুশীলনের খাতা দেখিয়া দিতেন, তাহাদের রচনা ভাল হইলে প্রশংসা করিতেন, ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং অবসরকালে বালকদিগের পক্ষে সুখবোধ্য ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গল্পসকল শুনাইয়া তাহাদের চিত্ত বিনোদন করিতেন। তিন ভ্রাতার মধ্যে ভিক্‌টরের প্রতি তিনি যেন কিছু অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সেই ভিক্‌টরের ল্যাটিন শিক্ষা আরব্ধ হইয়াছিল। গৃহে জেনেরাল লাহোরী তাহাকে তাসিতসের ইতিহাসগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। ইহাতে ভিক্‌টরের ল্যাটিন-শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাদাম হুগো পুত্রদিগকে লইয়া প্যারিসে আসার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে লিওপোল্ড হুগোর স্ত্রী ও পুত্রদিগকে দেখিবার সুযোগ একবারও হয় নাই। নববিজিত ও অশান্তি-

পূর্ণ স্পেনে তিনি যুদ্ধ ও শাসনকার্য্য লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তিন বৎসরের বিচ্ছেদের পর স্ত্রীপুত্রদিগকে দেখিবার জন্য তিনি নিতান্ত উৎসুক ও ব্যগ্র হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা কর্ণেল লুই হুগো কোন রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে প্যারিসে যাইতেছিলেন। লিওপোল্ড হুগো তাহাকে দিয়া স্ত্রীপুত্রদিগকে স্পেনে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার কার্য্য সমাধান করিয়া লুই হুগো ভ্রাতৃজায়ার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বর্ণরৌপ্যখচিত সামরিক পরিচ্ছদ,সমুজ্জ্বল তরবারি,বীরোচিত সততপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল ও পিতৃসদৃশ আকৃতি দেখিয়া বালকেরা যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। বহুকাল পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভিক্টর হুগো বলিয়াছিলেন—"যখন আমাদের পিতৃব্য আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন আমার মনে হইয়াছিল, যেন প্রধান স্বর্গীয় দূত মাইকেল আলোকরশ্মিতে চড়িয়া আমাদের গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন।"

কর্ণেল লুই হুগোর আগমনের পর দিনই ইউজিন ও ভিক্টর দেখিল যে তাহাদের শয়নকক্ষের টেবিলের উপর কয়েকখানি নূতন পুস্তক রহিয়াছে। মাতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "এগুলি স্পেনদেশীয় ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ। তোমরা আজই পড়িতে আরম্ভ কর, কেননা তিন মাসের মধ্যেই তোমাদিগকে স্পেনের ভাষা শিখিতে হইবে।"

ছয় সপ্তাহ অতীত হইলেই দেখা গেল যে, তাহারা স্পেনদেশের ভাষা উত্তমরূপে ও অনর্গল বলিতে পারিতেছে, কেবল উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হইতেছে মাত্র।

ইহার কিছুদিন পরেই মাদাম হুগো ও তাঁহার পুত্রত্রয় স্বামী ও পিতৃদর্শনে স্পেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন স্পেনে যাওয়া অতিশয় বিপদসঙ্কুল ছিল। নবাধিকৃত স্পেন তখন সর্ব্বান্তঃকরণে ফরাসীদিগের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। খণ্ডযুদ্ধ তখন প্রতিনিয়তই চলিতেছিল; এমন দিন যাইত না যে দিন না একটা সংঘর্ষ ঘটিত না। স্পেনে যাইতে হইলে তখন ফরাসীদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হইত। বহু সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে না লইয়া স্পেনে ভ্রমণ করা তখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বেয়ন নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম হুগো অবগত হইলেন যে, যে রক্ষিবর্গ তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে কথা ছিল, তাহারা এক মাসের মধ্যে আসিয়া জুটিতে পারিবে না। অগত্যা তাঁহাদিগকে একমাস কাল বেয়ন নগরে বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল।

এই সময়কার একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। যে গৃহে মাদাম হুগো তাঁহার পুত্রদিগকে লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সে গৃহের অধিকারিণী একটি বিধবা স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটিও এই গৃহেরই একাংশে অবস্থান করিত। তাহার একটি কন্যা ছিল।

কন্যাটির বয়স দশ বৎসর; ভিক্টরের

বয়স তখন নয় বৎসর। বালিকার পক্ষে দশ বৎসর যাহা, বালকের পক্ষে বোধ হয় পনর বৎসরও তাহা নহে। এই ক্ষুদ্র বালিকাটি ভিক্টরকে দেখিত শুনিত, তাহাকে গল্প পড়িয়া শুনাইত—তাহার একপ্রকার অভিভাবিকা হইয়া উঠিয়াছিল। ভিক্টরের দুই অগ্রজ ভ্রাতা, আবেল ও ইউজিন, ইহাদের সঙ্গে বড় মিশিত না। তাহারা তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠত্বের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিত। যে দিন বন্দুক-ব্যবহারের শিক্ষা ও পরীক্ষা হইত, সে দিন আবেল ও ইউজিন তাহা দেখিতে চলিয়া যাইত; কিন্তু ভিক্টর যাইত না। সে এই বালিকার কাছে বসিয়া থাকিত। বন্দুকের খেলা দেখায় আনন্দ আছে বৈ কি, কিন্তু এই বালিকার মুখ দেখাতে ভিক্টরের বোধ হয় অধিক আনন্দ ছিল।"

ইহাকে অবশ্যই কেহ প্রেম বলিবে না। নয় বৎসরের বালক, দশ বৎসরের বালিকা—ইহাদের মধ্যে প্রেম, আমাদের নাটক-নভেলপড়া পাঠকবর্গ অবশ্যই স্বীকার করিবেন না। কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, ঘটনাটা এই—

তাহার অগ্রজ দুই ভ্রাতা বাহির হইয়া গেলে, ভিক্টরকে বালিকা বলিত—"এস ভিক্টর, তোমাকে আমি কিছু পড়িয়া শুনাই; তাহাতে সময়টা বেশ কাটিয়া যাইবে।" তখন বালিকা ভিক্টরকে লইয়া গিয়া সিঁড়ির একটা ধাপে বসিত এবং কোন একখানি গল্পের পুস্তক খুলিয়া কোন চিত্তরঞ্জক গল্প পড়িয়া যাইত। কিন্তু ইহার এক বর্ণও ভিক্টরের কর্ণগোচর হইত না; সে কেবল একদৃষ্টে বালিকার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। বালিকার চক্ষু যতক্ষণ পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিত ততক্ষণ ভিক্টর একমনে-একপ্রাণে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বালিকা যখন মাথা তুলিয়া ভিক্টরের পানে চাহিত, তখন ভিক্টর নিতান্ত অপ্রতিভ হইত ও লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিত।

এক এক সময় বালিকা যখন বুঝিত যে, ভিক্টর মন দিয়া শুনিতেছে না, তখন সে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিত—"দেখ ভিক্টর তুমি ভাল করিয়া শুনিতেছ না। তুমি যদি মন দিয়া না শুন, তবে আর আমি পড়িব না।" তখন ভিক্টর ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিত, "আমি খুব মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি, তুমি পড়।" অর্থাৎ বালিকার চক্ষু পুনরায় পুস্তকে নিবদ্ধ হইলেই ভিক্টর আবার প্রাণ ভরিয়া তাহার মুখ দেখিবার সুবিধা পাইবে। কোন কোন সময়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিত, "কোন্ খানটা তোমার খুব লাগিয়াছে, ভিক্টর?" ভিক্টর এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিত না; কেননা, কিছুই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই।

এই ব্যাপারের অনেক দিন পরে, পরিণত বয়সে, ভিক্টর হুগো নিজেই বলিয়াছিলেন—"এইরূপ বাল্যোচিত প্রণয়-ব্যাপার বোধ করি সকল মানুষেরই জীবনে ঘটে। ইহার সহিত পরিণত বয়সের প্রেমের সম্বন্ধ, যেমন উষার আলোকের সহিত মাধ্যাহ্নিক প্রখর দীপ্তির সম্বন্ধ। ইহা জাগরণোন্মুখ হৃদয়ের প্রথম নয়নোন্মীলন।"

তেত্রিশ বৎসর পরে, ১৮৪৪ সালে, ভিকৃটর হুগোকে আর একবার বেয়ন নগরে যাইতে হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই গৃহটি দেখিতে গেলেন। সেই বালিকা পাঠিকাকে মনে করিয়া কি? সেই বাড়ীর দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল; কেহ সেখানে বাস করিতেছিল না। নিকটবর্ত্তী অনেক গৃহে অনেক লোককে সেই বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার নাম শুনিয়া কেহই তাহার কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিল না। কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না। তিনি সেদিন বেয়ন নগরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেন—অস্পষ্ট আশা, যদি সেইরূপ আকৃতির কেহ চক্ষে পড়ে। দুরাশা! জীবনে আর কখনও ভিকৃটর তাহার কথা শুনিতে পান নাই। ভিকৃটরের পক্ষে তখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

অবশেষে মাদাম হুগো পুত্রদিগকে লইয়া স্পেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহারা স্পেনের রাজধানী মাড্রিড নগরে পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পরেই ইউজিন ও ভিকৃটরকে তথাকার অভিজাতদিগের কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর দিন প্রাতে কলেজের অধ্যক্ষ এই দুটি বালক শিক্ষাবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণীতে ইহাদিগকে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের কক্ষে ইহাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন। সেখানে আরও এক জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। টেবিলের উপর কতকগুলি ল্যাটিন পুস্তক সাজান ছিল। প্যারিসের বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পড়ান হইত, এগুলিও তাই। দুই ভ্রাতা নিতান্ত বালক বলিয়া প্রথমেই ইহাদিগকে "L' Epitome" নামক একখানি পুস্তক অনুবাদ করিতে দেওয়া হইল, ইহারা কিছুমাত্র চিন্তা বা ইতস্ততঃ না করিয়া তাহা অনর্গল অনুবাদ করিয়া গেল। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক উভয়েই কিছু বিস্মিত হইলেন। তার পর ইহাদিগকে "De Viris" নামক ল্যাটিন পুস্তক দেওয়া হইল। কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ইহাও তাহারা অবলীলাক্রমে অনুবাদ করিল। অধ্যাপকেরা অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তাহার পর "Justin" দেওয়া হইল, "Quintus Curtius" দেওয়া হইল। ইহাও তাহারা অভিধানের বিনা সাহায্যে অনুবাদ করিয়া গেল। অধ্যাপকদ্বয় বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর পুস্তক দিয়া শিক্ষকদ্বয় দেখিলেন যে, "Virgil" ও "Lucretius" বুঝিতে বালকদ্বয়কে কিছু আয়াস পাইতে হইতেছে।

কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় যেন বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের ইহাদের মতন বয়সের বা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সের কোন বালকই ল্যাটিন ভাষায় এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আট বৎসর বয়সে তোমরা কোন ল্যাটিন পুস্তকের পাঠ লইতে?" ভিকৃটর উত্তর করিল—"Tacitus." প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল; তিনি ভিকৃটরকে যেন কতকটা শত্রুর মতন দেখিলেন।

এখন বিবেচনার বিষয় হইল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা যায়। দ্বিতীয় শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, শিক্ষাবিষয়ে ইহারা যতটা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বালকদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অধ্যক্ষ মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বালকদিগকে এক শ্রেণীতে লওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বিতীয় অধ্যাপক আর কি করিবেন, ইউজিন ও ভিক্টরকে তাহাদের সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে অতি নিম্নশ্রেণীতেই ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল। ইহাতে এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। অনুশীলনের জন্য যাহা কিছু দেওয়া হয়, অন্যান্য বালকেরা তাহাতে নিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ইহারা দুই ভ্রাতা তাহা সমাপন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহাতে সেই শ্রেণীর অপর বালকেরা নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে। তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, এই দুই ভ্রাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কোন পুরস্কার (prize) পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধ্যক্ষ মহাশয় আর কি করিবেন অগত্যা ইহাদিগকে অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। সে শ্রেণীতেও ঠিক এইরূপই হইতে লাগিল। আর এক শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইল; সেখানেও ঠিক ঐ রূপই ঘটিল বালকদিগের যে কোন শ্রেণীতেই এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেওয়া হয়, সেই শ্রেণীর অপরাপর বালকেরা একেবারে হতাশ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। তখন অনন্যোপায় হইয়া কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় অধিকবয়স্ক বালকদিগের শ্রেণীতে ইহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ফল এই হইল যে, এক সপ্তাহের মধ্যে ইহারা দুই ভ্রাতা সপ্তম শ্রেণী হইতে অলঙ্কারের শ্রেণীতে উঠিয়া গেল।

এই শ্রেণীতেও একটু কৌতুকাবহ ব্যাপার ঘটিল। পঞ্চদশ বৎসরের বালকেরা নয় বৎসরের বালকদিগকে যেরূপ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, সেই শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রেরা ইহাদের দুই ভ্রাতাকে প্রথমে সেইরূপ অবজ্ঞার ভাবে দেখিতে লাগিল। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই তাহারা দেখিল যে, পাঠ্যপুস্তকের অনেক স্থল, যাহা তাহারা অভিধানের সাহায্য লইয়া বহু প্রয়াসেও অন্বয় করিতে বা বুঝিতে সক্ষম হয় না, এই বালক দুইটি তাহা অনায়াসেই করে ও বুঝে। তখন তাহারা ইহাদের সহিত সমবয়স্কের ন্যায় সমান ভাবে মিশিতে লাগিল।

১৮১২ সালের প্রারম্ভে স্পেন দেশে ফরাসীদিগের অবস্থান ক্রমেই এরূপ আশঙ্কাজনক ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল যে, জেনারেল হুগো পত্নী ও পুত্রদিগকে আর সে দেশে রাখা অসঙ্গত ও বিপদ্‌জনক মনে করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবেলকে বাধ্য হইয়া নিজের কাছে রাখিলেন, কিন্তু ইউজিন ও ভিক্টরকে তাহাদের মাতার সহিত ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিলেন।

প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া মাদাম হুগো তাঁহার পুত্রদ্বয়কে শীঘ্র আর কোন বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন না। তাহাদের শিক্ষাকার্য্য

গৃহেই চলিতে লাগিল। লারিভিয়ের নামক একজন শিক্ষক ইহাদের দুই ভ্রাতার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ইহাদিগকে ল্যাটিন পড়াইতে লাগিলেন। আরও এক প্রকারে ইহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সাধিত হইতে লাগিল। মাদাম হুগো নিজে পুস্তকপাঠের একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন। একটি সাধারণ পুস্তকালয়ে তিনি বার্ষিক চাঁদা ত দিতেনই, তদ্ব্যতীত রয়ল নামক একজন পুস্তকবিক্রেতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, ইউজিন ও ভিক্টর তাহার দোকানে গিয়া যে কোনও পুস্তক যত ইচ্ছা লইয়া আসিবে। এই কার্য্যের ভার পাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়েরও নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হইয়াছিল। দোকানে গিয়া মাতার জন্য পুস্তক নির্ব্বাচন উপলক্ষে কোন পুস্তক তাহাদের ভাল লাগিলে তাহারা দোকানে বসিয়াই সেই সব পুস্তক তিন চারি ঘণ্টা করিয়া মনোযোগসহকারে পাঠ করিত। গদ্য, পদ্য, ইতিহাস, জীবন-বৃত্ত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বিজ্ঞান সকলই তাহারা একাগ্রচিত্তে পাঠ করিত। এইরূপে তাহারা রূশো, ভলটেয়ার ও দিদেরোর গ্রন্থাবলী পড়িয়া শেষ করিয়াছিল। এমন কি, "Taub-las" ও সেই শ্রেণীর অপরাপর উপন্যাস পর্য্যন্ত তাহারা পাঠ করিত। সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, কাপ্তেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত। এই পুস্তক সেই সময়ে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যত্যাগের পর অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই জেনেরাল হুগোকে তাঁহার সামরিক পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কেননা বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক ফ্রান্স-আক্রমণে যে কেহ দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুর্ব্বণদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছিল। জেনেরাল হুগো প্যারিসে আসিয়াই পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, ইহাদিগকে "Ecole Polytechnique" এ দিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সেখানে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী শিক্ষালাভের জন্য প্রথমতঃ তাহাদিগকে অপর একটি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম, করডিয়র; তাঁহার সহকারী-শিক্ষকের নাম, ডেকোটা। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে ইউজিনের বয়স প্রায় পনের ও ভিক্টরের তের।

বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে কোন একটা বিশেষ দ্রব্যের মর্‌সুম পড়িয়া যায়, সাহিত্যক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে তাহা ঘটে। এই সময়ে ১৮১৫ সালে, প্যারিসে কবিতা-রচনার একটা মরসুম পড়িয়া গিয়াছিল। কবি অকবি, সুবোধ নির্ব্বোধ, বালক যুবক প্রৌঢ়, সকলেই কি এক অজ্ঞাত কারণে কবিতা রচনা করিতে সিরতিশয় সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তের বৎসরের ভিক্টর যে এই স্রোতে ভাসিয়া চলিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; বরং তাহার পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক, কেননা স্পেনে যাইবার পূর্ব্ব হইতেই, অর্থাৎ যখন তাহার বয়স সবে আট বৎসর, কবিতা-রচনার চেষ্টা সে করিত। বলা বাহুল্য যে, সে সকল দোষ-

বহুল পদ্যমাত্র হইত, কবিতা হইত না। সে যাহা হউক, এই নূতন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই, অর্থাৎ ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ পর্য্যন্ত, তাহার কবিতা লিখিবার আগ্রহ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কবিতাক্ষেত্রে যত প্রকারের পথ আছে, ভিক্টর সে সকলেরই পথিক হইয়া উঠিয়াছিল। আখ্যানকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, শোকোচ্ছ্বাস, নাটক, প্রহসন, প্রহেলিকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকথা, ওসিয়ানের অনুকরণ, ভার্জ্জিল ও হোরেসের অনুবাদ, কবিতাসম্বন্ধে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহাতে ভিক্টর হস্তক্ষেপ করিত না। এমন কি, এই বয়সেই ভিক্টর একখানি হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্য পর্য্যন্ত লিখিয়াছিল।

এই সময় তিনি যাহা কিছু লিখিতেন তাহা কেবলমাত্র তিন জন পরম আত্মীয় ও বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইতেন। সে তিন জন, তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতা ইউজিন ও বিশিষ্ট সুহৃদ বিস্কারা। এই তিন জন নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে এই সকল রচনার দোষগুণ নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিচারক ছিলেন তিনি নিজে। তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, একখানি খাতা বাঁধিয়া লইয়া তাহাতে তিনি কবিতা লিখিয়া যাইতেন। একখানি খাতা নিঃশেষ হইলে আর একখানি খাতা বাঁধিয়া লইয়া লিখিতেন। রচনা-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিতারও উৎকর্ষ সাধিত হইত। তখন আর তাঁহার নিঃশেষিত খাতার লিখিত কবিতাসকল ভাল লাগিত না; তিনি সে খাতাখানি পোড়াইয়া ফেলিতেন। এইরূপে সেই সময়কার অনেক খাতাই তিনি নিজেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গীয় নবীন কবিগণ এমন মহদ্দৃষ্টান্তের ও আদর্শের অনুসরণ করেন না কেন? করিলে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে অনেক জঞ্জাল দূরীভূত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ।

এই কবিতা-রচনাব্যাপার লইয়া একবার একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল; তাহা কৌতুকাবহও বটে, নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া হাস্যজনকও বটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়ে কবিতা-রচনার একটা আকস্মিক মরসুম পড়িয়া গিয়াছিল। ভিক্টর নিজে ত লিখিতেনই; তাঁহার অগ্রজ ইউজিন লিখিতেন, তাঁহার একান্ত সুহৃদ্ বিস্কারা লিখিতেন এবং বিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ডেকোটিও লিখিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে যে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, ইহা ডেকোটি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ভিক্টর হুগোর কবিতালেখার উপর তিনি বড়ই বিরূপ ছিলেন। কিন্তু নানা প্রকারে প্রয়াস সত্ত্বেও তিনি ভিক্টরের কবিতা লেখা বন্ধ করিতে পারেন নাই। রাত্রে ভিক্টর নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধরাত্রি জাগিয়া কবিতা লিখিতেন এবং তাহা অতি সাবধানে নিজের টেবিলের দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। এক দিন তিনি নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেরাজ খোলা পড়িয়া আছে ও কাগজপত্র সমস্ত অপহৃত হইয়াছে। অপহরণকারী যে কে, তাহা বুঝিতে ভিক্টরের অণুমাত্র বিলম্ব

হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ডেকোটির নিকটে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ডেকোটীই তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, অধ্যাপক ডেকোটী ও অধ্যক্ষ করুডিয়ার উভয়েই অতি গম্ভীর ও অপ্রসন্নভাবে বসিয়া রহিয়াছেন এবং সম্মুখে টেবিলের উপর তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অতি গম্ভীরভাবে ও কঠোরস্বরে ডেকোটী বলিলেন—"আমি ত তোমাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করিয়াছি।"

কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভিকৃটর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আমি ত আপনাকে আমার দেরাজ ভাঙ্গিবার অধিকার দিই নাই।"

ডেকোটী বড় অপ্রতিভ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ভিকৃটরকে অভিযুক্ত অপরাধীর ন্যায় বিনীত ও ক্ষমাপ্রার্থীরূপে দেখিতে পাইবেন। তাহা দূরে থাকুক, এখন ভিকৃটরই ক্রুদ্ধ অভিযোগকারী ও ডেকোটী অভিযুক্ত অপরাধী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যখন দেখিলেন ও বুঝিলেন যে, বিচারকের ও শাসকের গর্ব্বিত উদ্ধত ভাবে ও বাক্যে কোন ফল হইল না, তখন বলিলেন—"যখন তুমি অবাধ্য হইয়াও এত খানি স্পর্দ্ধা করিতেছ, তখন এই মুহূর্ত্ত হইতেই এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রহিত হইল।"

নির্ভীক ভিকৃটর অম্লানবদনে বলিলেন—"আমিও সেই কথাই আপনাকে বলিতে যাইতেছিলাম।"

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় বেগতিক দেখিয়া নিজে মধ্যস্থ হইয়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বিরোধ কোন প্রকারে এক প্রকার মিটমাট করিয়া দিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে অন্তরের অপ্রসন্নতা ও মলিনতা দূর হইতে যে আরও অনেক সময় লাগিয়াছিল, এ কথা না বলিলেও চলে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

১

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার এক অপূর্ব্ব সম্পত্তি। জগতের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। বর্ণ-ভেদ বা শ্রেণীভেদ অনেক দেশেই ছিল, কোনও না কোন আকারে এখনো রহিয়াছে। আমেরিকায় জাতিভেদ নাই, কিন্তু এমন বিষম বর্ণভেদ আজিও বিদ্যমান যে, জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও তাহা নাই, কখনও ছিল কি না সন্দেহ।

খৃষ্টীয়ান্ ইউরোপে জাতিভেদ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইউরোপেম মনুষ্যত্বের সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা বেশী,—মানুষের প্রতি কেবল মানুষ বলিয়া যে একটা সত্য শ্রদ্ধা আছে, দূর হইতে কল্পনার চক্ষে যাই দেখ

যাক না কেন, কাছে গিয়া প্রতিদিনের কার্য্য-কলাপ পরখ করিয়া দেখিলে সে প্রতীতি জন্মে না। এবং ভারতে জাতিভেদ সত্ত্বেও যে মনুষ্যত্বের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা, মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া নহে কিন্তু নারায়ণরূপে যে ভক্তি করিবার একটা ভাব, অন্তঃসলিলার মত, প্রাণের ভিতরে ভিতরে এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এরূপ ভাব ক্কচিৎ কোন খৃষ্টীয়ান্ ভক্তের মধ্যে থাকিলেও, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা-ধারী ইউরোপীয় সমাজে একান্তই বিরল। এ ভাব থাকিলে ইউরোপে ধনী-সম্প্রদায় চিরদিন দরিদ্রকে যে চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আর সমগ্র শ্বেতাঙ্গসমাজ অপর বর্ণের লোকের প্রতি যে অস্থিমজ্জাগত ঘৃণার ভাব পোষণ করে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না।

ইউরোপে জাতিভেদ নাই, শ্রেণীভেদ আছে; এ কথা সকলেই জানেন ও মানেন। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে এ দুইয়ের কোন্‌টাকে বেশী পছন্দ করি, আমার প্রথম উত্তর এই যে, ইহার কোনোটাকেই আমি সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি না। ভারতে আজ যে আকারে জাতিভেদ আছে ও ইউরোপে যে শ্রেণীভেদ প্রবল, এ দু'ই মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায়। মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন, এ দুইয়ের কোন ব্যবস্থাতেই তাঁহাকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে দেয় না। কিন্তু যদি বল যে, এই দুইয়ের একটীকে আমায় লইতেই হইবে, তৃতীয় পন্থা আর নাই; তবে আমি ঐকান্তিক অকুণ্ঠার সহিত বলিব—"আমার নিজের জাতিভেদকেই আমায় রাখিতে দাও, বিলাতের শ্রেণীভেদের দ্বারা আমার এই পুরুষপরম্পরাগত জাতিভেদকে আমি তাড়াইয়া দিতে রাজি নহি।"

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক বন্ধুই এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিবেন, জানি। আর যে সকল রক্ষণশীল বন্ধু আমাকে এই জন্য সাধুবাদ করিবেন, তাঁরাও যে আমার এ কথার মর্ম্ম বুঝবেন না ইহাও দেখিতেছি। তবুও বলি, আমাদের জাতিভেদ যতই মন্দ হউক না, বিলাতের শ্রেণীভেদ হইতে অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ।

আপনার বস্তুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক যে মমতা আছে তারই প্রেরণায় এ কথা বলিতেছি, এমনও কেহ মনে করিবেন না। আমি ইংরেজ বা আমেরিকান্ হইলেও এই কথাই বলিতাম। এমন ইংরেজ ও আমেরিকানও দেখিয়াছি, যাঁদের স্বদেশ-ভক্তি কম নহে, আর যাঁরা নিজেদের সমাজের শ্রেণীভেদের সমুদায় দোষগুণের সম্পূর্ণ ওয়াকেব হইয়াও স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার এ কথার সায় দিয়া থাকেন।

আমাদের জাতিভেদের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে কিছুতেই মানুষকে আপনার জন্মের বাঁধন কাটাইয়া উঠিতে দেয় না। যে নীচ জাতে জন্মিল কিছুতেই তার উঁচু জাতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিবার অধিকার বা অবসর হয় না। শ্রেণীভেদের বিশেষ গুণ এই যে, গুণী হইলে যে কেহই এই জন্মের বাঁধন কাটাইয়া উঠিতে পারে। অতি নীচ ঘরে যে জন্মাইল সে-ও আপনার গুণের প্রমাণ দিতে পারিলে অনায়াসে বা

স্বল্পায়াসে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীতে যাইয়া বসিতে পারে।

এই যুক্তি অবলম্বনে যাঁরা ভারতের জাতিভেদের উপরে ইউরোপের শ্রেণীভেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে যান, মনে হয় তাঁরা যেন একটা মোটা কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা এইটী ভুলিয়া যান যে, ভারতের জাতিভেদ যতই কেন দুরতিক্রমণীয় হউক না, কখনই একান্ত অনতিক্রমণীয় ছিল না, আজিও নহে। পুরাণ ইতিহাসে নিম্নতম জাতির সাধু ও সিদ্ধপুরুষদিগের ব্রাহ্মণ্যলাভের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আজিও যাঁহাদিগকে সচরাচর অন্ত্যজ জাতি বলা যায়, সে সকল জাতির সাধু-মহাজনেরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির উপদেষ্টাও গুরুর আসন পাইতেছেন ইহাও জানি। এই বাংলা দেশের নানা স্থানে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। সুতরাং একান্তভাবেই যে জাতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য, কিছুতেই এমন কথা বলা যায় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সকলেই জাতির অতীত হইয়া যায়। বৈষ্ণবতন্ত্রে ভেক ধারণ করিলেই জাতির বাঁধন কাটিয়া যায় কিন্তু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা ভেকধারী বৈষ্ণবের কথা এখানে বলিতেছি না; গৃহস্থ সাধুদিগের কথাই বলিতেছি। এরূপ অনেক সাধু নিম্ন জাতে জন্মিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম না ছাড়িয়াও উচ্চ জাতির লোকের উপদেষ্টা ও গুরু হইয়াছেন ও হইতেছেন।

তবে, এ সকল দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইহা মানিতেই হইবে। আর কেন যে বিরল তাহার কারণও চোখের উপরেই পড়িয়া আছে।

ইউরোপেও নিম্নশ্রেণীর লোকে উচ্চ শ্রেণীতে যাইতে পারেন। ভারতেও নিম্ন-জাতিতে জন্মিয়া উচ্চজাতির সমকক্ষ হইতে পারা যায়। শ্রেণীর বন্ধন বা জাতির বন্ধন দুইয়ের কোনটাই একান্ত অনতিক্রমণীয় নহে। তবে, পন্থার পার্থক্য আছে। যে পথে শ্রেণীর প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারা যায়, সে পথে জাতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে।

বিলাতে অতি নীচ জালিয়ার ঘরে জন্মিয়াও কোন ব্যক্তি অর্থ ও বিদ্যাবলে বলীয়ান্ হইলে ক্রমে লাটসভার সভ্য হইয়া দেশের আভিজাত শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারেন। কেবল অর্থের জোরে যে পারা যায় তাহা মনে করিবেন না। কেবল বিদ্যার বলেই যে পারা যায় তাহাও কল্পনা করিবেন না। অর্থের চাবি দিয়া আভি-জাত্যের দরজা খুলিতে হয়। বিদ্যার পালিস দিয়া, সহজ না হইলেও কৃত্রিম উপায়ে কিয়ৎপরিমাণে আপনার কথাবার্ত্তায় ও চাল-চলনে আভিজাত্যের রংটা ফুটান আবশ্যক হয়। এটী না করিলে কেবল অর্থের জোরে অভিজাতসমাজের মধ্যে গিয়া বসিবার চেষ্টা করিলে, একেবারেই যে সফলতা লাভ করা যায় না তাহা নহে। কিন্তু সে সাফল্য 'হংস মধ্যে বকো যথা'র ন্যায় একান্তই বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে। তথাপি অর্থই বিলাতী সমাজে নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে যাইবার মুখ্য পথ।

বিলাতে অর্থের বলে নীচ হইতে উঁচু হওয়া যায়। জাতিভেদ-পীড়িত ভারতে অর্থের এ মর্য্যাদা নাই। এখানে জন্মের বন্ধন ছাড়াইতে হইলে অর্থ নহে কিন্তু পরমার্থের প্রয়োজন হয়। ধন-লাভ জ্ঞান-ভক্তি-লাভ অপেক্ষা সহজ। অর্থ-উপার্জ্জন পারমার্থিক-সম্পদ-আহরণ অপেক্ষা অশেষ স্বল্পায়াসসাধ্য। প্রত্যেক সমাজেই অতি স্বল্পসংখ্যক লোক পরমার্থ-লাভে প্রয়াসী হন, ইহাঁদের মধ্যে ক্বচিৎ কোন ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাম্ কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ॥

সহস্র মনুষ্য মধ্যে ক্বচিৎ কোনো ব্যক্তি সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন। আর সাধনশীল সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে ক্বচিৎ কোনো ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বভাবে জানেন।

পরমার্থলাভ যে সমাজে নিম্নজাতি হইতে উচ্চতর জাতিতে যাইবার একমাত্র পন্থা, সে সমাজে যে বহুলোকে জন্মের বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ইহা বিচিত্র নহে। ইংরেজসমাজ যে দাম লইয়া নিম্নশ্রেণীর লোককে উচ্চশ্রেণীতে যাইতে দেয়, হিন্দু-ভারতে কেহ সেই দাম দিয়া সামাজিক আভিজাত্য কিনিতে পারে না। ইহাই কেবল সত্য। নতুবা ভারতের জাতিভেদ একান্ত অনতিক্রমণীয় আর ইউরোপের শ্রেণীভেদ একান্তই অতিক্রমণীয়; দুইয়ের মধ্যে এ পার্থক্য প্রতিষ্ঠা হয় না। একটা দুরতিক্রমণীয় ও অপরটা সহজে অতিক্রম করা যায় এ কথাই সত্য।

জাতিভেদ যতই কেন মন্দ হউক না, তাতে মানুষের মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখে, আর ইউরোপীয় শ্রেণীভেদে রাখে না, এমন কথাও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না।

বরং ইউরোপ যে প্রণালীতে নিম্ন-শ্রেণীকে উপরে তুলিয়া লয়, বোধ হয় তাহাতেই মনুষ্যত্ব-বিকাশের বেশী হানি হয়। ভারতবর্ষের চিরাগত প্রণালীতে তাহার ততটা আশঙ্কা নাই বলিয়াই মনে হয়।

ইউরোপে টাকা দিয়া আভিজাত্য কেনা যায়। মানুষ সমাজের পদমর্য্যাদার কাঙাল সর্ব্বত্রই। যেখানে টাকায় এ পদমর্য্যাদা কেনা যাইতে পারে, সেখানে টাকার আদর অবশ্যই বেশী হইবে। এই জন্য ইউরোপে টাকার দাম আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। আর যেখানেই টাকার দাম চড়িয়া যায় সেখানেই মনুষ্যত্ব বলিতে যা কিছু বোঝায়, তাহার মূল্য অনেকটা কমিয়া আসিবে, ইহা অনিবার্য্য। ইউরোপে কি তাহাই হইতেছে না? সে দেশে দারিদ্র্য আমাদের পঞ্চমহাপাতকের সমান। টাকার মর্যাদা বাড়িলেই ভোগবিলাসের মাত্রা চড়িয়া যাইবে, ইহাও অবশ্যম্ভাবী। যে সমাজে টাকার উপরে সমাজের পদ ও সম্মান-প্রাপ্তি এতটাই নির্ভর করে, সেখানে লোকে সর্ব্বদাই আপনার অর্থ জাহির করিতে ব্যগ্র হইবে। ইহা হইতে সমাজে বাহ্য আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইবেই হইবে। টাকাকড়ি, ঘোড়াগাড়ী, বাগান-বাড়ী এ সকল যখন লোকে জাহির করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে, তখন সে সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে

ক্ষীণতর হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ পথ দৈবী সম্পদের পথ নহে—আসুরী সম্পদেরই প্রশস্ত পথ। শ্রেণী-ভেদে এই আত্মঘাতী পন্থাকে কি প্রশস্ত করিয়া তুলে না?

এই জন্যই মনে হয় আমাদের জাতি-ভেদ যতই কেন নিন্দনীয় হউক না, বিলাত ও আমেরিকার শ্রেণীভেদ অপেক্ষা কিছুতেই হীনতর এ কথা বলা যায় না।

তবে জাতিভেদ যে আকারে এখন আমাদের সমাজে আছে তাহাও কোনো মতেই মঙ্গলজনক নহে। বিলাতি শ্রেণী-ভেদও তথৈবচ কিম্বা ততোধিক। দুইয়ের কোনটাই সামাজিক কল্যাণের সহায় নহে।

ফলতঃ আমার মনে হয় জাতিভেদ কথাটা আমাদিগের সভ্যতা ও সাধনার কথা নহে। শাস্ত্রেও এ কথা আছে কি না জানি না। ঐকান্তিক অভেদজ্ঞান-লাভ যে সাধনার চিরন্তন লক্ষ্য, তাহাতে এরূপ ভেদের কথা থাকা সম্ভব নহে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় কথা, এই ধর্ম্মের উপরে হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সত্য। এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সাহায্যেই ভারতের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য্যেরা আপনা-দিগের সাধনা ও সভ্যতাকে এই বিশাল ভূখণ্ডে বিবিধ জাতির অসংখ্য জনগণমধ্যে আশ্চর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া-ছিলেন। এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-অবলম্বনেই প্রাচীন ভারতে অনেক জাতি এক বহুমুখী সাধনার অন্তর্গত হইয়া এই বিশাল ও বহু-শাখ হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমানধর্ম্মের ন্যায়, ভারতের আর্য্যধর্ম্ম একটা মতবদ্ধ ধর্ম্ম নহে। মত-বদ্ধ ধর্ম্ম সকলকে প্রচারক ধর্ম্ম বলা যায়। ভাব ও ভাষা এখানে দুই বিদেশী। মতবদ্ধ ধর্ম্মকে ইংরাজীতে Credal Religion বলে। কতকগুলি বিশেষ মতেই এ সকল ধর্ম্মের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। এ সকল ধর্ম্মের স্থিতি যে মতের উপরে এমন কথা বলা ঠিক নহে। অপর ধর্ম্মের যেমন, সেইরূপ এ সকল ধর্ম্মেরও স্থিতি আচারে ও চরিত্রে, শুদ্ধ মতে নহে। কিন্তু ইহাদের গতির মূল মত, আচার নহে। মত-প্রচারের দ্বারাই এ সকল ধর্ম্ম প্রথমে আপনাকে প্রসারিত করে। এই জন্যই ইহাদিগকে প্রচারক ধর্ম্ম, বা ইংরেজীতে Missionary Religion বলে। এ সকল ধর্ম্মে মতের প্রচার আগে, আচারের প্রতিষ্ঠা পরে। ভারতের আর্য্যধর্ম্ম এই শ্রেণীর ধর্ম্ম নহে। খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় তন্ত্র যেরূপে আপনাদিগের বিশেষ বিশেষ মত প্রচার করিয়া, আপনাদিগকে জগতে ছড়াইয়াছে, আর্য্যধর্ম্ম সেরূপভাবে জগতে আপনাকে ছড়ায় নাই। তথাপি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যেমন অখৃষ্টীয়ান্‌কে খৃষ্টীয়ান্ করিয়াছে, কিম্বা ইলসাম ধর্ম্ম যেমন কাফেরকে কল্‌মা পড়াইয়া মুসলমান্ করিয়াছে, ভারতের প্রাচীন আর্য্যেরাও সেইরূপ অসংখ্য অনার্য্যকে আর্য্য করিয়াছিলেন। অহিন্দু যে কখনও হিন্দু হইতে পারে না, কথাটা নিতান্তই আধুনিক। হুন, শক প্রভৃতি অনেক প্রাচীন জাতি আদিতে হিন্দু ছিলেন না, এখন শ্রেষ্ঠ হিন্দু বলিয়া পরিগণিত। বিরাট দ্রাবিড়সমাজ আর্য্যতন্ত্রের বহির্ভূত ছিল। কিন্তু আজ সেই সমাজে হিন্দুয়ানীর প্রভাব

যেমন প্রবল, আর্য্য-সাধনার প্রাচীনতম লীলাভূমি উত্তর-ভারতে তেমনতর প্রবল নহে। দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র মণিপুরী জাতি হিন্দুত্ব লাভ করিয়াছে। আজিও দেশের নানা স্থানে আমাদিগের অলক্ষিতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনার্য্য-গোষ্ঠী আর্য্যসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম মত প্রচার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সনাতন আর্য্য-সাধনা বিবিধ অনার্য্য সমাজে, আপনার বিশেষ সমাজ-তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সকল অনার্য্য-সমাজকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। এই বিশেষ আর্য্যসমাজ-তন্ত্রকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে।

দুর্দ্দিনে পড়িয়া এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আশ্রম-বিহীন, সুতরাং ধর্ম্মচ্যুত হইয়া বর্ণভেদে পরিণত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম বলিয়া যাঁহারা একটা প্রবল কোলাহল তুলিয়াছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম বলিতে প্রকৃত পক্ষে বিলাতী ছাঁচের ও বিদেশী ঝাঁজের একটা বিকট শ্রেণীভেদই বুঝিয়া থাকেন। একদল লোক যেমন ভারতের তথাকথিত জাতিভেদকে তাড়াইয়া, তাহার স্থানে বিলাতের আমদানী অর্থ-প্রাণ, ভোগপ্রধান, পারুষ্যপূর্ণ, উগ্র-কর্ম্মা, বিপ্লবাত্মক শ্রেণীভেদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, সেইরূপ আর একদল লোকে আশ্রমের অর্থ ভুলিয়া ধর্ম্মের মর্ম্মকে নিষ্পীড়িত করিয়া বর্ণাশ্রম রক্ষা করিবার ছল করিয়া সেই আত্মঘাতী শ্রেণীভেদের আদর্শকে আপনাদিগের সমাজে আনিয়া কেহ বা ব্রাহ্মণ-সভা কেহ বা বৈশ্য-সভা কেহ বা মাহিষ্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিলে এ উৎকট চেষ্টায় কেহ প্রবৃত্ত হইতেন না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ। এ সমাস দ্বন্দ্ব সমাস নহে। কিন্তু দ্বন্দ্ব ও ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ এই দুই সমাস এক হইয়া এই সমষ্টিকে গড়িয়াছে। বর্ণ ও আশ্রম—বর্ণাশ্রম দ্বন্দ্ব সমাস, এই বর্ণাশ্রমের যে ধর্ম্ম তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণ হইতে আশ্রমকে পৃথক করিলে যে বর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার উপরে বর্ণভেদ বা জাতিভেদকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না। বর্ণ ও আশ্রমের পরস্পরের সঙ্গে যে প্রাচীন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ে আছে কি? এখন আশ্রম নাই বর্ণ আছে। সুতরাং ভারতে বর্ণাশ্রম আর নাই; বর্ণাশ্রমধর্ম্মও নাই। আছে কেবল জাতিভেদ আর এ জাতিভেদ বস্তুটা কখনো প্রকৃত আর্য্য-সাধনায় স্থান পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

আর্য্য-সাধনায় বর্ণ ও জাতি একই কথা কি না তাহাও বলিতে পারি না। গো জাতি, মনুষ্য জাতি এ সকল কথা আছে। দ্বিজাতি এ কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে জাতি বলা যাইত, না বর্ণ বলা যাইত?

চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্।

গীতায় ভগবান এই কথাই বলিতেছেন। চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছি এমন কথা তো বলেন নাই। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মেও বর্ণ শব্দই ব্যব-হৃত হইয়াছে, জাতি শব্দ হয় নাই। এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ কি? এ কি রং না অক্ষর?

আর্য্যে-অনার্য্যে বর্ণভেদ ছিল, পণ্ডিতেরা এ কথা বলেন। কিন্তু চতুর্ব্বর্ণের তিন বর্ণই তো আর্য্য-গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিল। সুতরাং বর্ণাশ্রমের যে বর্ণ, তাহা রংয়ের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এমন মনে করা যায় না। বিশেষতঃ চতুর্ব্বর্ণের প্রথম তিন বর্ণই কেবল, আশ্রম-ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন। শূদ্রের সে অধিকার ছিল না। সুতরাং আর্য্যে ও অনার্য্যে বর্ণের যে বিভিন্নতা ছিল, তাহার উপরে বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ বর্ণভেদ কথাটাই যেন আর্য্য-সাধনার বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আর্য্যেরা বর্ণ বিভাগ করিয়াছিলেন, বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হন নাই। কিন্তু এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারাই তাঁহারা বর্ণ-বিভাগ করিয়াও, সত্য সত্যই বর্ণভেদকে আপনাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই জন্যই ভারতের সাধনার বিশেষ সম্পত্তি। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যখন কালক্রমে ম্লান হইয়া গেল, বর্ণ যখন আশ্রম হইতে, ও বর্ণ ও আশ্রম যখন ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখনই পারমার্থিক সাম্য সাধনার জন্য যে সমাজের জন্ম, সেই উদার সমাজে আত্মঘাতী বর্ণভেদের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নহে।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

নবযুগের নববর্ষ

এবারকার নববর্ষকে নব্যভারতের একটি নবযুগের নববর্ষ বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ এখন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সে সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, তাহার ইতিহাস বহু ভাগে বিভক্ত। তাহার যথাযোগ্য সমালোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বলিয়া, অনেক রাজকর্ম্মচারী ভারতবর্ষের বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখিত হইলে, তাহাতে হয় ত অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হইবে না।

ভারতবর্ষে বৃটিশসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বকাহিনী নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য-কাহিনী। ইংরাজ বণিক্-সমিতির অপরাজিত অধ্যবসায়ের কথাই তাহার প্রধান কথা। তাহার মূলে কেবল অংশীদারগণের লাভের লোভের কথা। তখনও তাহার অধিক কোনরূপ উচ্চ আশা কাহারও কল্পনা-ক্ষেত্রেও প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু তাহাই এখন ঘটনা-চক্রে সমগ্র ইংরাজজাতির অসামান্য অভ্যুদয়-কাহিনীর প্রধান কথা বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে।

যে যুগে প্রাচ্য-বাণিজ্যের প্রবল প্রলোভন ইংরাজগণকে নিরতিশয় প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, সে যুগে ইংরাজ-শক্তি প্রবল শক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল না। আকস্মিক ঝঞ্ঝাবাতে "আরমাডা" নামক নৌবাহিনী সমুদ্রপথে বিপর্য্যস্ত না হইলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস কিরূপ আকার ধারণ করিত,

তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই যুগেও অকুতোভয়তাই ইংরাজজাতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতা পরাভূত করিয়া, ভারত-বাণিজ্যে লাভবান্ হইবার আশায়, ইংরাজ-বণিক্-সমিতি মূলধন-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা বড় সহজে বা নিরুদ্বেগে সুসম্পন্ন হয় নাই। প্রথমবারের বাণিজ্য-যাত্রা সফল না হইলে, বণিক্-সমিতি অধ্যবসায়-প্রকাশের অবসর লাভ করিতেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয়ের অভাব ছিল না।

তাঁহারা যে বাণিজ্য-যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত-বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত করা যায় না;—তাহা প্রাচ্য মহাসাগরের অনির্দ্দিষ্ট অভিনব বাণিজ্য। কারণ, তৎপূর্ব্বে ইউরোপের অন্যান্য প্রবল জাতি ভারত-বাণিজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত থাকিলে, তাঁহারাই সে সুযোগের ফললাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও একটি পরাক্রান্ত প্রাচ্য সাম্রাজ্য বলিয়াই সুপরিচিত ছিল। উত্তরকালে, সে সাম্রাজ্য, তাহার অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ-বহ্নিতেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল! সেই শ্মশানভূমির উপর ইংরাজ-বণিক্-সমিতির বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহা অচিন্তিত-পূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা; নিরতিশয় বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই অভিহিত হইবার যোগ্য।

তখনকার ইংরাজ-বণিক্-সমিতির লাভের লোভ প্রবল থাকিতেও, ক্ষতির আশঙ্কা তুল্যরূপেই প্রবল বলিয়া পরিচিত ছিল। সেকালের পুরাতন দপ্তরের কাগজ-পত্রে তাহার কথাই প্রধান কথা। রাজ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী হইলে, বাণিজ্য-ব্যাপার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে বলিয়া, একদিকে যেমন প্রবল আশঙ্কা ইংরাজ-বণিক্-সমিতিকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখিত; অন্যদিকে, সেইরূপ সতর্কতাই, বাণিজ্য-রক্ষার খাতিরে তাঁহাদিগকে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন স্বীকার করিতেও বাধ্য করিত। সুতরাং সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের সকল কথাই বাণিজ্যের কথা। তাহার জন্যই "পলাশির যুদ্ধ;"—তাহার জন্যই "দেওয়ানী সনন্দ" গ্রহণ।

তৎকালে শাসন—শোষণকার্য্য এবং শোষণের জন্য শাসনকার্য্য প্রধান রাজকার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই জন্য, অল্পকালের মধ্যেই, ইংরাজ বণিক্-সমিতি শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। যথাকালে রাজস্ব সংগ্রহ করাই সেকালের লক্ষ্য ছিল; তাহার জন্য "মন্বন্তরের" সময়, কৃষককুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল! রাজস্ব-সংগ্রহের লালসা প্রবল ছিল বলিয়াই, কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, ভূস্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই, রাজস্ব-বিধি গঠিত হইয়াছিল।

প্রজাপালনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম, সে কথা কখন কখন সাধারণভাবে উল্লিখিত হইলেও, বণিক্-সমিতি তাহাকে মূলধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

হয়। কিন্তু সে কথা এখন বলিতেছি না। বৈষ্ণবকবিতার শিল্পাংশই এখন আমার লক্ষ্য। বৈষ্ণবকবিতায় যে একটা ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, সেই ঝঙ্কারে যে একটু রহস্যের ভাব আছে, তাহা বড় উপাদেয়। গানের প্রধান অঙ্গ যেমন সুর, গৌণতঃ ভাব, তেমনি বৈষ্ণব কবিতায় এই ঝঙ্কারই তাহার প্রথম কৌশল। আমরা যখন বৈষ্ণবকবিতা পড়ি তখন প্রথমে আকৃষ্ট হই তাহার রহস্যময়ী ভাষাদ্বারা, তার পর তাহার ভাবের দিকে নজর পড়ে। এই ভাষার একটা বৈচিত্র্য এই যে ইহা দ্বারা যেন ভাবটী ছন্দে ও সুরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

সখিরে ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ লতা সঙে　　তড়িত লতা জনু
হৃদয় শেল দেরি গেল।

একটা অনির্ব্বচনীয় ভরা সুরের সহিত কাণের ভিতর বাজিয়া উঠে। ইহা গানের আলাপের মত কথার অপেক্ষা রাখে না, ভাবের লালিত্যকে প্রকাশ হইবার অবসর দিতে চাহে না। এমনি করিয়া বৈষ্ণব-কবির পদাবলী আমাদের হৃদয়ে একটা সুরের মোহ সৃজন করে। কোকিল বা পাপিয়ার কূজনের অর্থ বাহির করিয়া আমরা তাহার মিষ্টতা উপভোগ করি না, তাহা শুনিলেই মিষ্ট লাগে। কোমল ভাবে ভরপুর বৈষ্ণবকবির হৃদয় এই সুরে বিভোর হইয়াছিল, তাই অধিকাংশ বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিই এই ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং চণ্ডী-দাসও ইহার আশ্রয় লইয়াছেন, তবে অনেক কম মাত্রায়, এবং বোধ হয় বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর। জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে অবিমিশ্র বাঙ্গলাপদ কতকগুলি আছে, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ পদই "ব্রজবুলি"তে লিখিত, অথবা ব্রজবুলিমিশ্রিত ভাষায় রচিত।

"শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম।"

হইতে জ্ঞানদাসের পদাবলীর আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞানদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবকবি-গণের পদযোজনাবিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, ইহার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, অথবা ইহারই প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল, তাহা কোথাও মনে হয় না। যেখানে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাই তাঁহারা বসাইয়া গিয়াছেন, কাটছাঁট করিবার প্রয়াস করেন নাই, কথা বাড়িয়া গিয়াছে কি কথা পড়িয়া গিয়াছে, অত ভাবিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি বা সময় ছিল না অথচ মনের উল্লাসে তাঁহারা যে গান গাহিয়াছেন তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর ভঙ্গীতে মনোহর ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই আত্ম-প্রকাশ বহু বৈচিত্র্যময়, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই ভাবের উপযুক্ত। কবি জ্ঞানদাস রাস-লীলার আনন্দ কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিবার যোগ্য।

দেখরি সখি　　শ্যামচন্দ
ইন্দু বদনী রাধিকা।
বিবিধযন্ত্র　　যুবতীবৃন্দ
গাওয়ে রাগ মালিকা॥
মন্দ পবন　　কুঞ্জভবন
কুসুম গন্ধ মাধুরী।

মদন রাজ নব সমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী ॥
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণ নাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পূর ॥
অঙ্গ অঙ্গ পরশ ভোর
কেহু রংত কানু কংকোর।
জ্ঞানদাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরী জোর ॥

মনের আনন্দে হৃদয়ের নৃত্যশীল গতি যেন এই কবিতার ছন্দের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই একটী মাত্র ছন্দে জ্ঞানদাসের রাসানন্দ পর্য্যবসিত হয় নাই, বহুবিধ নূতন ছন্দোবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আরও কতকগুলি ছন্দের পরিচয় আমরা এইখানে দিতেছি—

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিসলয়
মন্দ পবন পিক রাব।
বরিহা কপোত জোড়ে জোড়ে নাচত
চিতক নিজ পর মাব ॥
ভালিরে ভালি অভিসার মদন সমাজে।
রাধা রসবতী অতি রসে আরতি
কানু রসিকবর রাজে ॥
কুসুমিত কুঞ্জহি রঞ্জন মনসিজ
নব নব রঙ্গিণী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ কতহুঁ রস মধুকরী
ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি ॥
ধনিরে ধনিরে ধনি দুহুঁ রূপ লাবণি
ধনি বেদ গবি কত ভাঁতি।
আর কে কহু কত দুহুঁ রসে উনমত
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি ॥

এই ছন্দে জয়দেবের প্রভাব বিলক্ষণ অনুভূত হয়।

নূপুর ঘুঘুর মধুর বোল
ঝনন ঝনন নটন রোল
হাসি হাসি কেহ করত কোল
ভালি ভালি বোলনী।
জ্ঞানদাস পড়ত তাল
গায়ত মধুর অতি রসাল
গুণত ভুগত জগত উমত
হৃদয় পুতলী দোলনী ॥

এই ছন্দগুলির একটা মূর্ত্তি আছে, বচন-বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি পড়িবার পূর্ব্বেই শুধু স্পন্দনে সুরের সলিল-হিল্লোলে আমরা কবির 'হৃদয় পুতলী দোলনী" স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি; কেবল ছন্দের গুণেই আনন্দরস মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের প্রাণে ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করে। ভাবব্যঞ্জক বাক্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য ধাবিত ও নিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হয় না, কবির অভিপ্রেত ভাব আপনি যেন উছলিয়া উঠিয়া আমাদের সম্মুখেই উপস্থিত হয়। কাব্যশিল্পে এ কৌশল বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যে প্রথমে বৈষ্ণবকবিই আমদানী করিয়াছেন। সঙ্গীত-কলায় যেমন তালের ও সুরের পার্থক্যে অনেক ভাবের পার্থক্য আসে তেমনি কাব্য-কলায়ও যে হইতে পারে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম দেখাইয়াছেন বৈষ্ণব কবিকুল; এই জন্য বঙ্গসাহিত্য চিরদিন তাঁহাদের কাছে ঋণী থাকিবে।

তাই বলিয়া বৈষ্ণবকবি যে ছন্দ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা নহে; হৃদয়ের বিভিন্ন ভাবের অনুগামিনী ভাষা

যেমন মানুষমাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক, বৈষ্ণবকবির ছন্দের তারতম্যও তেমনি স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। লোকে আনন্দিত হইলে এক রকম কথা কয়, ব্যথিত হইলে অন্য রকম কথা কয়, রাগিলে তাহার ভাষা অন্যরূপ ধারণ করে; যে নিতান্ত কৃত্রিমতার জালে আবদ্ধ নহে, সে কোনও সময়েই বাছিয়া বাছিয়া কথা সাজাইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে না, যখন যেটা আসিয়া পড়ে সেই কথাতেই ভাব ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবকবির ছন্দেও এইরূপ স্বভাব-সরলতা বিদ্যমান। ইঁহাদের কাব্যে আনন্দের ভাষার মতনই বিষাদের ভাষা আছে.

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার নয় অন্যজনা
ইহা কি পরাণে সয়"
সই কত না রাখিব হিয়া॥
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
আন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

বলা বাহুল্য যে, এ উদাহরণটী কবি জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে কোনও বিষয়ের উদাহরণ দিব তাহা ইঁহারই পদসমষ্টি হইতে গৃহীত হইবে। এই খানে বলিয়া রাখি যে বৈষ্ণবসাহিত্যে জ্ঞানদাসের স্থান বিশেষ উন্নত; এমন কি বিষয়ের রহস্যকে যদি স্থান-নির্ণয়ের অধিকারী বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার স্থান দুই এক জনের নীচে হইতে পারে, এতদধিক নিম্নে যাইবে না। এ কথা অবশ্য বলাই নিষ্প্রয়োজন যে জ্ঞানদাসের কবিতায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে অন্যান্য বৈষ্ণবকবির ন্যায় তিনিও বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের কথাগুলি লইয়া নিজের পদাবলীর সৌষ্ঠব সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে "গোবিন্দদাস" প্রবন্ধে আমি বুঝাইয়াছি যে, ইহাতে জ্ঞানদাসের লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ শিষ্য গুরুর অনুকরণ করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? জ্ঞানদাসে চণ্ডীদাসের প্রভাব বেশী, কি বিদ্যাপতির প্রভাব বেশী; ইহার মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট; কারণ যাঁহারা জ্ঞানদাসের সমগ্র রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি, উভয় মহাকবির কাছ হইতেই প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হৌক এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এতৎ সত্ত্বেও জ্ঞানদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের, তথা সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের, একটী উজ্জ্বল রত্ন। আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, জ্ঞানদাসে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির সমন্বয় হইয়াছে। জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপাততঃ এইটুকু বলিয়া রাখিলেই চলিবে; অতঃপর আমরা যে কথা বুঝাইতেছিলাম তাহাই আর একটু বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

আমরা বাক্য ও ছন্দসম্বন্ধে এত বিস্তৃত

ভাবে অলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশার্থ ফরাসী পণ্ডিত ভিক্টর কুজ্যাঁর ফরাসীতে লিখিত গ্রন্থের শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত অনুবাদ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটীর প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি ভিক্ষা করিতেছি। কুজ্যাঁ বলেন; "বাক্যই কবিতার সাধনযন্ত্র; কবিতা বাক্যকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়, এবং আদর্শ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে মনোবস্তুতে পরিণত করে। কবিতা বাক্যকে ছন্দের দ্বারা সুন্দর করিয়া তোলে; বাক্যকে সামান্য কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া দাঁড় করায়; উহাকে এমন কিছু করিয়া তোলে যাহা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই, যাহা আকৃতি ও দেহ-গঠনের ন্যায় সীমাবদ্ধ, পরিস্ফুট, সুনির্দ্দিষ্ট; যাহা বর্ণচ্ছটার ন্যায় জীবন্ত ভাবাপন্ন, যাহা ধ্বনির ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী ও অনন্ত। শব্দ স্বয়ং, বিশেষতঃ কবিতার নির্ব্বাচিত ও রূপান্তরিত শব্দ, একটা প্রবল বিশ্বজনীন সঙ্কেত।"

তাই বলিয়াছিলাম যে কবি জ্ঞানদাসের ছন্দে একটা এমন কিছু আছে যাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বচ্ছন্দে আপন মর্ম্ম বিজ্ঞাপন করে। যেমন আনন্দের ছন্দ, বিষাদের ছন্দ আমরা দেখাইয়াছি, তেমনি মনের অপরাপর ভাবাবলীর ছন্দও একা জ্ঞানদাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবকবি মনুষ্য-হৃদয়ের ছবি তুলিয়াছেন, এবং সেই ছবি ভাবের বর্ণে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই চিত্রের প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাদের বাক্য ও ছন্দে। বাক্যের উপরই ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, যদিও ছন্দের এমন শক্তি আছে যদ্দ্বারা সে বাক্যের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, আপনার গুণে আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কালিদাসের কুমার-সম্ভবের রতিবিলাপের ছন্দের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সংস্কৃত কিছুই জানে না তাহার কাছে যদি এই রতিবিলাপ যথাযথ রীতি অনুসারে আবৃত্তি করা যায় তাহা হইলে সেও বুঝিতে পারিবে যে কবি বিষাদের গান গাহিতেছেন। জ্ঞানদাসের আর একটী পদ উঠাইয়া এই কথা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিব। বসন্তকালে বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা শূন্য কুঞ্জবনে বিলাপ করিতেছেন, এই বিলাপ ব্রজবুলিতে গ্রথিত অতএব ইহাতে বাক্যের রহস্যাত্মক ভাবও যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু ইহা শুনিলেই বুঝা যাইবে যে, এই পদে কবি কোনও বিষাদের তান তুলিয়াছেন :—

ফুটল কুসুম নবকুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাবই রে।
মলয়ানীল হিম শিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেশ না আইব রে ॥
অনিমিখ নিকট নহে মুখ নিরখিতে
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময় সহয়ে এত শাকই
অবলা কঠিন পরাণ।
চন্দন চাঁদ অধিক উতপাতই
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত দূর দেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল ॥

দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি হয় পরজন্ত।
জ্ঞানদাস কহ কো সমুঝায়ত
শ্যামর নিকরুণ অন্ত।

ইহার অর্থ সর্ব্বত্র উপলব্ধি না হইলেও, ছন্দের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে এই পদে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিয়াছে। বসন্তের উল্লাস এবং বসন্তের বিষাদ কবি ছন্দের তারতম্যে প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু ছন্দ তো কেবল ভাবের বাহন মাত্র; দেউলের বাহ্যাবরণ যতই চাকচিক্য-ময় হউক তাহার অভ্যন্তরে যদি দেবতা না থাকেন, তবে তাহার প্রয়োজনীয়তা বড়ই অল্প। তাই কবিতায় কেহ ছন্দ মাত্র দেখিতে চাহে না, দেখিতে চাহে তাহার হৃদয়। কবিতার হৃদয় ছন্দ নহে—ভাব। তত্রাচ কবিতার ছন্দ নিতান্ত অবহেলার বস্তু নহে, যে হেতু ছন্দদ্বারা ভাব প্রকাশ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। পদ্য যে গদ্য নহে তাহা অনেকেই বিস্মৃত হন. তাই ছন্দের বিষয়ে এত কথা বলিলাম। তবে শুধু ছন্দ ভাল হইলেই যে কবিতা হয় তাহাও নহে, তাই কবিতার বাক্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। কাব্যের ভাবস্ফূর্ত্তি বাক্যেরই উপর নির্ভর করে—শুধু ছন্দের উপর নহে।

বৈষ্ণব কবির শব্দ-চয়ন-শক্তি প্রশংসনীয়। শব্দের শক্তি অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে ব্যঞ্জনা বোধ হয় প্রধান। এক একটী কথায় যে ভাবাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এই ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে। জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে ইহার উদাহরণ অনেক মিলিবে। তাঁহার এক একটী কথার মধ্যে ভাবরাশি যেন লুকাইয়া আছে।

সহজে ননীর পুতলি গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥

এই "জারল" কথাটী মনের কত ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে, দেহের কেমন বিষাদমাখা চিত্র আঁকিয়াছে।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলস নয়নে অলস ঝরে॥
* * *
না জানিয়ে কিবা অন্তর সুখে।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
* * *
কালের বদন চমকি চাও।
ভাবে কেয়া ফুল ওর না পাও॥
* * *
কপোলে পুলক বেকড় দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সখি॥

এই পদের ভিতর অনেকগুলি কথা লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত; যথা রসের ভরে, অলস ঝরে, ঝলকে চমকি চাও, ওর না পাও। প্রত্যেক কথায় এক একটা বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র পদাবলীর দ্বারা রসাবিষ্টা একটী কমনীয় মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই মূর্ত্তি, যাহা কালিদাসের অমর তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়া চিরকালের জন্য আমাদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছে—

তাং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টিঃ
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃত মুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

গুটীকতক কথার সাহায্যে কবি এক খানি সুন্দর চিত্রপট আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রেমের প্রথম পরিচয়ে লজ্জানম্র নব বধূর নয়নের অবনম্রতা এমন সুন্দরভাবে বড় অল্পই চিত্রিত হইয়াছে। কবিবর জ্ঞানদাস এইরূপ অনেক স্থলেই শব্দশক্তির দ্বারা ভাব প্রকটন করিতে পারিয়াছেন উদাহরণ—

শ্যাম চিকনিয়া দে রাসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।
*   *   *   *
লোচন মোর লুকায়লি গোরী।
পুলক প্রচুর করলি ধনী চোরী॥
প্রেম পরস রস   লীলা রস লহরী
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর।

কাব্যের বাক্য যে একটা সঙ্কেত তাহা যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই গুলিতে তাহা বেশ দেখা যায়। শব্দ-ব্যঙ্গ এই সকল পদে বিশেষ রূপে উদাহৃত হইয়াছে। বোধ হয় শেষের উদাহরণটীতে শুধু ব্যঞ্জনা-শক্তির প্রয়োগ হইয়াছে বলিলে ঠিক হইবে না. অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে ইহাতে লক্ষণারও পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবে "উজোর" ইহার মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব ইহাতে শব্দের লক্ষণাশক্তির সকল কার্য্যই ব্যঞ্জনাদ্বারাই প্রকাশিত হয়, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত।

যস্য প্রতীতিমাধাতুং লক্ষণং সমুপাস্যতে।
ফলে শব্দৈক গম্যে চ ব্যঞ্জনান্নাপরা ক্রিয়া॥

কাব্যপ্রকাশ—২য় উল্লাস।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

স্নেহের প্রতিদান

পল্লী-কাহিনী

মুকুন্দ পাল ও মুরারী পাল দুই ভাই। মুকুন্দ মুরারী অপেক্ষা আট বৎসরের বড়। মুকুন্দের বয়স যখন নয় বৎসর, সেই সময় তাহাদের পিতা গোপীনাথ পাল তিন দিনের জ্বরে ভবপারে প্রস্থান করিল। এক বৎসরের শিশু মুরারীকে লইয়া তাহার জননী সৌদামিনী বিধবা হইল; নাবালক পুত্র দু'টিকে সে কিরূপে লালন পালন করিবে, কিরূপেই বা সে দুটি উদরান্নের সংস্থান করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, বিধবা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল; গুরুতর পতি-বিয়োগ-শোকের উপর দুঃসহ অন্নচিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। স্বামীর সৎকার শেষ হইলে বিধবা সিমন্তের সিন্দুর মুছিয়া, হাতের নোয়া খুলিয়া, সাদা থান পরিয়া তাহার পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতা ত্রিলোচন সরকারের পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া বলিল, "কাকা, সংসারে আপনার বলিতে আপনি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, যাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, আপনি তার উপায় করুন। আপনি থাকিতে কার দুয়োরে দাসীগিরি করিতে যাইব?"

ত্রিলোচন সরকার সরলপ্রকৃতি, ধার্ম্মিক বৃদ্ধ। পাকা আমের মত টুকটুকে গৌরবর্ণ, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, ঘাড়ের দিকে মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত অল্প কয়েকগাছি কেশ ছিল, তাহা

শণের ন্যায় শুভ্র; কণ্ঠে তিনকণ্ঠি তুলসী কাঠের মালা। সরকার মহাশয় ভুসি মালের কারবার করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার আড়তে অনেক লোকজন খাটিত, এবং পরোপকারী সদাশয় সাধুব্যক্তি বলিয়া গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সৌদামিনীর পিতা রামনারায়ণ সরকারের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না. রামনারায়ণ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ত্রিলোচনের অনিষ্ট-সাধনের জন্য কোনদিন চেষ্টার ক্রটী করেন নাই; রামনারায়ণের খলতায় অনেক সময় ত্রিলোচনকে যথেষ্ট ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেও হইয়াছিল; একটি মিথ্যা মামলা বাধাইয়া রামনারায়ণ ত্রিলোচনের অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে রামনারায়ণের পরিবারবর্গের উপর ত্রিলোচন জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, এমন কি, তিনি রামনারায়ণের পরিবারস্থ কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন না; কিন্তু সদ্য-বিধবা সৌদামিনীকে অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ত্রিলোচন পূর্ব্ব ক্রোধ বিস্মৃত হইলেন. তিনি সৌদা-মিনীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "আমার রাজু যদি দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায় তাহলে তুমিও পাবে। তোমাকে পরের দুয়োরে দাসীগিরি করতে হবে কেন? আমার সংসারে কত লোক 'প্রতিপালন' হচ্ছে, আর তোমাকে দু'মুঠো খেতে দিলে কি আমার সংসার অচল হবে?"

সৌদামিনী বলিল, "আমি নিজের পেটের ভাবনা ভাবিনে কাকা, দুটো 'অপুষ্যি' নিয়েই হয়েছে আমার বিপদ।"

ত্রিলোচন বলিলেন "অপুষ্যি আর কি, ভগবান ত কাকেও অপুষ্যি মনে করেন না; যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না মা, আমার সংসারে থেকেই ওরা 'মানুষ মুনিষ' হোক। রাজুকে বলে দেব সে মুকুন্দকে আড়তের কাজ কর্ম্ম শিখোবে?"

রাজু অর্থাৎ রাজীবলোচন ত্রিলোচনের একমাত্র পুত্র। রাজুই এখন ত্রিলোচনের সংসারের কর্ত্তা, সেই কাজকর্ম্ম দেখে। মহাপ্রভুর চরণচিন্তা, ভাগবতগ্রন্থপাঠ, সজ্জনপ্রসঙ্গ ও হরিকথার আলোচনা লইয়াই বৃদ্ধের জীবনসন্ধ্যা নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইতেছে।

সৌদামিনী বলিল "কাকা আপনার জামাই আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, বাড়ীটা শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করচে, ও বাড়ীতে আমার আর এক দণ্ড মন টিক্‌চে না। কি করে আমি থাক্‌বো?"

ত্রিলোচন 'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত সুলোহিত হরিনামের ঝুলিটি ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে, আমার নিজের মেয়ে নেই, তুমিই মেয়ের মত সংসারের 'গিন্নিমো' করবে। বৌমা আমার বাতে ভুগচেন। সংসারের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করে এমন 'গিন্নি ধন্নি' স্ত্রীলোক সংসারে কেউ নেই, তোমার উপর সেই ভার দিলাম।"

ইতিমধ্যে রাজু খড়ম পায়ে দিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সেই গৃহের বারাণ্ডায়

উপস্থিত হইল, ত্রিলোচন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজু, গোপীনাথ ত হঠাৎ মারা গেল, সৌদামিনীর কোন উপায়ই ত দেখ্‌চিনে, গলায় দুটো নাবালক ঝুল্‌চে, আমাদের সংসারেও 'গিন্নি ধন্নি' মেয়েলোকের অভাব। আমি মনে করচি, তোর দিদি আমাদের সংসারে থেকেই 'প্রতিপালন' হোক, তুই কি বলিস্‌ ?"

রাজু বলিল, "আমি আবার কি বলবো, আপনার যেমন ইচ্ছা। আর আমরা থাক্‌তে দিদি অন্য কোথাও গতর খাটিয়ে খাবেন, এও ত উচিত নয়। আপনি সঙ্গত কথাই বলেছেন।"

ত্রিলোচন পুত্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সংসারে কে কাকে খেতে পরতে দেয় বল! সকলই লীলাময়ের লীলা, তিনিই আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছেন, আবার জল দিয়ে জগৎ ঠাণ্ডা করেন, নিরাশ্রয় অনাথের প্রতিপালন-ভার তিনিই নিচ্ছেন, আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। তা দেখিস্‌ সুদাংয়ের বড় ছেলে মুকুন্দকে গোলাবাড়ীতে রেখে কাজকর্ম্ম কিছু শিখুতে পারিস্‌ কি না।"

রাজু বলিল, "মুকুন্দ নিতান্ত ছেলেমানুষ, এখন ও কাজকর্ম্ম কি শিখ্‌বে ? সে এখন কিছুদিন পাঠশালায় লিখুক, একটু জ্ঞান বুদ্ধি হলে কাজকর্ম্ম শিখানো যাবে।"

ত্রিলোচন বলিল, "হ্যাঁ সেই কথাই ভাল। ছেলেটাকে একটু লেখাপড়া শিখানো দরকার বটে।"

পরদিন সৌদামিনী ত্রিলোচনের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুকুন্দ গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইল। যে হতভাগিনী বিধবা সংসার-সমুদ্রের কূল-কিনারা দেখিতে না পাইয়া উদ্বেগে ও ভয়ে অবসন্ন হইতেছিল, ভগবানের অনুগ্রহে তাহার অশন-বসনের ক্লেশ দূর হইল।

২

কয়েক বৎসর পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া মুকুন্দের হাতের লেখাটা বেশ পাকিয়া আসিলে, রাজু তাহাকে গোলাবাড়ীর কাজে নিযুক্ত করিল; মুকুন্দ বুদ্ধিমান, বিনয়ী ও আজ্ঞাবহ ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই সে চালানী কারবারের কাজ বেশ বুঝিয়া লইল। সৌদামিনী রাজুকে ধরিয়া একটি গরীবের মেয়ের সঙ্গে মুকুন্দের বিবাহ দিল। কর্ত্তা ত্রিলোচন সরকার বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সেইখানেই বাস করিবেন।

মুকুন্দ দু'টাকা উপার্জ্জন করিতেছে দেখিয়া সৌদামিনী রাজুকে বলিল "এতকাল তুমি আমাকে ও আমার ছেলে দুটিকে প্রতিপালন করলে, সাধ করে ছেলের বিয়ে দিলেম, সেও দু পয়সা আন্‌চে, এখন আমি মনে করচি বাড়াতে গিয়েই থাক্‌বো। ছেলে দুটো থাক্‌তে কর্ত্তার ভিঁটেয় প্রদীপ জ্বলবে না, কি করে তা দেখি ? ঈশ্বর-ইচ্ছায় বৌ এখন 'গিন্নি ধন্নি' হয়েছে, আমি তোমার সংসারে না থাক্‌লেও কোন অসুবিধা হবে না। আর আমি তো বাড়ীর দুয়োরেই থাক্‌বো, যখন ডাক্‌বে তখনই আস্‌বো।"

রাজু বলিল, "এতদিন সংসারের সকল ভার তোমার হাতে ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম; তবে তোমরা থাকতে পালজির ভিঁটেয় একটা আলো জ্বলবে না এটাও ভাল দেখায় না। তা যা ভাল বোঝ, কর; বাবা আবার মনে না করেন, এখানে তোমার থাকবার অসুবিধা হলো বলে তুমি বাড়ী চলে যাচ্ছ।"

সৌদামিনী বলিল, "না, কাকা তা কখনও মনে করবেন না। তোমার কত গুণ তা কি তিনি জানেন না? এতদিন তোমরা আমাকে যে ভাবে প্রতিপালন করলে, নিজের মায়ের পেটের ভাই ও বোনকে তেমন আদর যত্নে রাখে না; কি আর বলবো ভাই, নারায়ণ মধুসূদন তোমাকে চিরজীবী করে রাখুন। তোমার সোনার সংসার চির দিন উথলে উঠুক।"

এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া সৌদামিনী পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী স্বামী গৃহে ফিরিয়া গেল। অন্ধকার কুটীর দশবৎসর পরে আবার দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যথাসময়ে সৌদামিনী পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া আবার সংসার পাতিয়া বসিল। বৈচিত্র্যময় কর্ম্ম-রঙ্গভূমিতে তাহার জীবন-নাটকের নূতন দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইল।

মুকুন্দ দেখিল সে শৈশবে ভাল রকম লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে একালে ভদ্রসমাজে সমাদর হয় না, অর্থসম্পদ, মানসম্ভ্রম এ সকলই ইংরাজীশিক্ষার উপর নির্ভর করে। মুকুন্দ মুরারীকে গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

লেখাপড়ায় মুরারীর অনুরাগ ছিল, শৈশবেই তাহার হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়াছিল, সে অল্পদিনেই মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিও পাইল। ভ্রাতার কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত হইয়া মুকুন্দ স্থির করিল সে যত দিন পারিবে মুরারীকে পড়াইবে। মুরারী যদি কোন রকমে বি এল্‌টা পাশ করিয়া উকীল হইয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পিতার নাম উজ্জ্বল হইবে। নিত্যানন্দপুরের সকলেই ধন্য ধন্য করিবে, সে পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপুরের একটি ছেলেও প্রবেশিকা পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ব্যবসায়প্রধান স্থান, সকলেই ছেলেদের সামান্য লেখাপড়া শিখাইয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিত।

নিত্যানন্দপুরের সাতক্রোশ দূরে সুলতানপুর গ্রাম। সুলতানপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদারেরা অনেক চেষ্টায় সেখানে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন, সুলতানপুরে মুকুন্দের এক বিধবা পিশির বাড়ী। বিধবার হাতে অনেক টাকা ছিল, তিনি মহাজনী করিতেন। মুরারী পিশির বাড়ী থাকিয়া সুলতানপুরের স্কুলে পড়িতে লাগিল। মুরারী তিন বৎসর পরে, এণ্ট্রেন্স পাশ করিলে মুকুন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। মুকুন্দ তাহাকে এল্ এ পড়াইবার জন্য কৃষ্ণনগরে পাঠাইল। মুরারী এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া বৃত্তি পায় নাই, কৃষ্ণনগরে রাখিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা গ্রাম্য আড়তদারের গোমস্তা মুকুন্দের পক্ষে সহজ হইল না। মুরারীর শ্বশুর নীলরতন

সাহার যথেষ্ট পয়সা ছিল, কিন্তু সে জামাইকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল না, সে বলিল, "আমার ত আর ঐ একটি মাত্র মেয়ে নয়, আমাকে আরও চারিটি মেয়ে পার করিতে হইবে, জামাইকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য সাহায্য করি, আমার এমন সাধ্য নাই।" —অগত্যা মুকুন্দ পিশিমাকে ধরিয়া বসিল। পিশিমা দশটাকার তিন কেতা নোট বাহির করিয়া বলিল, "এই টাকা দিয়ে মুরারীর কেতাব কিনে দিও, শুনেছি এখন তার অনেক টাকার কেতাব লাগবে। আমি বিধবা মেয়ে মানুষ, তোমার ভাইকে পড়ানোর খরচ কোথায় পাব? আমি আর কিছু দিতে পারবো না।"

পিশিমা এতদিন মুরারীকে বাড়ী রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে, টাকা কয়টি না লইলে তাহার অপমান করা হয়, বিশেষতঃ মুকুন্দের ন্যায় পক্ষে ত্রিশ টাকা উপেক্ষার বস্তু নহে। সে টাকা কয়টি লইল, কিন্তু ভ্রাতার শিক্ষার গুরু-ভার সে কিরূপে বহন করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। রাজুর নিকটেও সে সাহায্য চাহিতে পারিল না, ইদানীং রাজুর কাজকর্ম্মও 'মন্দা' যাইতেছিল, তথাপি রাজু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুরারীর কলেজের বেতন যাহা লাগে তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইল। মুকুন্দ সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া ভ্রাতার শিক্ষার ব্যয় চালাইতে লাগিল। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও দুই ভাইয়ের স্ত্রী। তখন পর্য্যন্ত মুকুন্দ পুত্রমুখ দর্শন করে নাই, তাহার স্ত্রীর সন্তানবতী হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং পল্লীবাসিনীগণের ধারণা হইয়াছিল, মুকুন্দের স্ত্রী পদ্মাবতী বন্ধ্যা। নাতির মুখ দেখিবার সুখ অদৃষ্টে নাই বলিয়া সৌদামিনী সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিত।

কৃষ্ণনগর সহরে আসিয়া মুরারী হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বদেশপ্রেমিক হইয়া উঠিল; কোথাও সভাসমিতি হইবে—মুরারী তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিত, কোন স্বদেশ-হিতকর কার্য্যে চাঁদা তুলিতে হইবে—মুরারী চাঁদার খাতা হাতে লইয়া সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিত; অর্দ্ধোদয়-যোগের সময় নবদ্বীপে বহু যাত্রীর সমাগম হইলে, মুরারী ভলণ্টিয়ার দলের কাপ্তেন হইয়া, তীর্থযাত্রিগণের বিবিধ অসুবিধা দূর করিবার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কাজ খুব ভাল ও প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে তাহার পড়াশুনার বড় বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। দেশহিত ও জনহিতের উৎসাহে সে ভুলিয়া গেল—তাহার দরিদ্র দাদা সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেছে।

দশে মুরারীর খুব প্রশংসা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেবল দশের প্রশংসা সঞ্চয় করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; একজামিন পাশ করিতে হইলে যথারীতি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয়, এবং নির্ভুল উত্তর লিখিতে হইলে পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক। মুরারী সময়াভাবে অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তক খুলিবার 'ফুরসৎ' পাইত না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গেজেটে এল্ এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, কোনও

বিভাগে মুরারির নাম দেখিতে পাওয়া গেল না। মুরারি বলিল—পরীক্ষকেরা তাহার 'মেরিট এপ্রিসিয়েট' করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ 'একজামিন পাশ' করিবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাঁর জীবনের মহত্তর সার্থকতা আছে।

ভাই এল্ এ পরীক্ষায় ফেল হইল দেখিয়া গোবিন্দ বড় মর্ম্মাহত হইল, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রাতাকে অপরাধী করিল না।—রাজু বিরক্ত হইয়া মুরারির কলেজের বেতন দেওয়া বন্ধ করিল; মুকুন্দও আর তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারিল না। মুরারি দাদার উপর বড় চটিয়া গেল, এবং মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া ডাকঘরে এপ্রেণ্টিসি আরম্ভ করিল। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে কুড়ি টাকা বেতনে তাহার চাকরী হইল। মুরারী জগন্নাথপুর ডাকঘরে কেরাণীগিরি করিতে গেল; স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার খোলস দূরে পড়িয়া রহিল।—কলেজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে নেশা কাটিয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে মুকুন্দের পিশি রক্তামাশয় রোগে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। পিশির পীড়ার সংবাদ পাইয়া মুকুন্দ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। সংসারে পিশির অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল না, পিশির টাকাকড়ি সমস্তই মুকুন্দের হস্তগত হইল।

দরিদ্রের সন্তান মুকুন্দ এক সঙ্গে আট দশ হাজার টাকা পাইয়া হঠাৎ 'বে-সামাল' হইয়া উঠিল। টাকাগুলা হুল বাহির করিয়া কণ্টকের ন্যায় তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে অধিকাংশ টাকা খরচ করিয়া পিতৃভিটায় এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল, কিছু জমিজমা করিল। এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়া মুদিখানার দোকান খুলিল।

রাজু মুকুন্দকে তাড়াতাড়ি চাকরী ছাড়িয়া দোকান করিতে প্রথমে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু মুকুন্দের একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া শেষে আর আপত্তি করে নাই—তবে গোটাকত উপদেশ দিয়াছিল, 'হাত চেয়ে যেন আম বড় না হয়, কখন পুঁজি ভেঙ্গে খরচ করো না, ইত্যাদি।' সে সব অতি প্রাচীন উপদেশে মুকুন্দ বড় কাণই দিল না, তবে রাজুর নিকট কোন অবিনয়ও দেখাইল না।

মহা সমারোহে মুকুন্দের ব্যবসায় চলিতে লাগিল। উভয় ভ্রাতার স্ত্রীর অনেকগুলি সোনার গহনা হইল; এবং যে সকল পল্লীরমণী মুকুন্দ ও মুরারির স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বে বাক্যালাপও করিত না, তাহারা এখন ঘন ঘন তাহাদের বাড়ী আসিয়া আত্মীয়তা করিতে লাগিল। কেহ হইল সই, কেহ হইল বেগুণ ফুল; তা ছাড়া দেখনহাসি, অডিকলোন, গঙ্গাজল প্রভৃতি কুটুম্বিনী সমাজের কোলাহলে মুকুন্দের প্রশস্ত অট্টালিকা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পুত্রদ্বয়ের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন মধ্যাকাশে দেদীপ্যমান, সেই সময় সাধ্বী সৌদামিনী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। মায়ের শ্রাদ্ধ লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে কিঞ্চিৎ মনান্তর উপস্থিত হইল, মুকুন্দ বলিল, "মায়ের

শ্রাদ্ধে সাতখানি গ্রামের কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিব ও রাঢ় হইতে তিন দল কীর্ত্তন আনাইব; বৃষোৎসর্গ ও অন্ততঃপক্ষে দুইটা ষোড়শ না করিলে লোকে কি বলিবে, আর আমাদের তৃপ্তিই বা কিসে হইবে, মা-ই আমাদের সর্ব্বস্ব ছিলেন।" মুরারি বলিল, "পরের টাকা কিছু হাতে আসিয়াছে বলিয়া কি এই ভাবে অপব্যয় করা ভাল? সংক্ষেপে কাজ শেষ কর।'

কিন্তু মুরারির পরামর্শে কাজ হইল না। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ শেষ হইল।

ইদানীং মুদীখানার দোকান ভাল চলিতেছিল না; অথচ সংসারে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়; মুকুন্দকে বাধ্য হইয়া জমিদার ও শিকদারদের কাছে বাড়ী ও জমি বাঁধা দিয়া হাজার টাকা কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। মুরারি বলিল, "তোমার বিবেচনার ক্রটীতেই দেনা হইল! তখন অত করে বারণ করেছিলাম, কিছুতেই শুনলে না। এখন আপনিও মজলে, আবার সবাইকে মজাবার জোগাড় করে তুলেছ।

তাহার স্ত্রী পদ্মাবতীকে জানাইল, "দিদি, তোমাদের ত ছেলে পুলে নাই, তোমাদের আর কিসের ভয় বল, ভাশুরের বিবেচনার দোষে আমাদেরই আণ্ডা বাচ্ছা লয়ে পথের ভিখারী হ'তে হচ্চে!" এ কথাও মুকুন্দের কাণে গেল। সে ভাবিল ঠিক কথাই ত! তখন মহাজনকে বুঝাইয়া সে বাড়ীর ও জমার (নিজ অংশ) অৰ্দ্ধেক বাঁধা দিয়া টাকা লইল। অর্দ্ধেক অংশই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া মহাজনও তাহাতে আপত্তি করিল না।

তারপর মুদিখানা সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ভাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভায়ের ইচ্ছামত মুকুন্দ একটা ব্যবস্থা করিয়া লইল। দুই নামে দোকান চলিতে লাগিল।

তখন দ্বিগুণ উৎসাহে মুকুন্দ ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু যখন সাংসারিক অবস্থার অবনতি আরম্ভ হয়, তখন সহস্র চেষ্টাতেও তাহার গতিরোধ হয় না। মুকুন্দের স্ত্রীর যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহাও উত্তমর্ণের সিন্দুকে উঠিল। তবে মুরারির অংশের টাকা মুকুন্দ কোন রকমে সংগ্রহ করিয়া মুরারিকে দিয়াছিল। তবু কলঙ্ক ও লাঞ্ছনার হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই।

৪

মা ষষ্ঠীর খেয়াল কিছু বিচিত্র। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি মাথা খুঁড়িয়াও তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না, পোষ্য পুত্র লইয়া তাঁহাদিগকে বংশ রক্ষা করিতে হয়; আবার যে দরিদ্র উদরান্নের সংস্থানে অসমর্থ, তাঁহার কৃপাসিন্ধুর প্লাবনে তাহাকে 'নাকানি চুবানি' খাইতে হয়! ছেলে মেয়ের নিবারণ, ক্ষান্ত, আন্না প্রভৃতি নিষেধার্থসূচক নামকরণ করিয়াও হতভাগ্যের নিষ্কৃতি নাই, তাই কবি দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—

"বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা,
আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত!
প্রাণটা রাখিতে 'হোল প্রাণান্ত'॥

মুকুন্দ বংশরক্ষায় হতাশ হইয়া যখন হাল ছাড়িয়াছিল, সেই সময় মা ষষ্ঠী

হঠাৎ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বহস্তে হাল ধরিলেন; মুকুন্দের স্ত্রী পঁচিশ বৎসর বয়সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাহার পর বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই মা ষষ্ঠী হয় একটি পুত্র না হয় একটি কন্যারত্ন তাহাকে উপহার দিতে লাগিলেন। মুরারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র তখন বেশ বড় সড় হইয়া জনার্দ্দনপুরের স্কুলে লেখা-পড়া আরম্ভ করিয়াছিল।

সাংসারিক অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল, মুকুন্দ বাধ্য হইয়া দোকান উঠাইয়া দিল, নিজে একবেলা না খাইলেও চলে, কিন্তু দুধ ভিন্ন ছেলে মেয়েদের একবেলা চলিবার উপায় নাই। গয়লার নিকট দুধ কিনিতে অনেক পয়সা লাগে, সুতরাং মুকুন্দ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইটি দুগ্ধবতী গাভী কিনিল। অর্থকষ্টে বাধ্য হইয়া মুকুন্দ দাসদাসীদের বিদায় দিয়াছিল, অগত্যা সে স্বহস্তে গরুর বিচালী কাটিয়া জাব মাখিয়া দিত, এবং তৈজসপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া কষ্টে সংসার চালাইত। নানা দুশ্চিন্তায় অকালে তাহার চুল পাকিয়া গেল, এবং প্রৌঢ় হইবার পূর্ব্বেই জরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

এদিকে মুরারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশ গুছাইয়া লইল। সে বিশ টাকা বেতনে ডাকঘরের চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার বেতন পঞ্চাশ টাকা হইল; একটি সব পোষ্ট আফিসে সে পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইল।

মুরারি কৃপণ ছিল, কৃপণেরা প্রায়ই সঞ্চয়ী হয়। ডাকঘরের চাকরী করায় তাহাকে দাস দাসী রাখিতে হয় নাই, ডাকঘরের হরকরা ও পিয়নেরাই তাহার গৃহস্থালীর সকল কাজ করিয়া দিত, বাসা ভাড়া লাগিত না; টিকিট বিক্রয় করিয়া সে যে কমিশন পাইত, তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলিত, বেতনের টাকাগুলি সুদে খাটিত। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই মুরারি অনেক টাকা জমাইয়া ফেলিল।

ডাকঘরের চাকরীতে প্রায়ই ছুটি পাওয়া যায় না। সুতরাং মুরারি সপরিবারেই কর্ম্মস্থলে থাকিত। তথাপি সে মধ্যে মধ্যে দাদার তত্ত্বতল্লাস লইত, এবং পূজার সময় বৎসরান্তে সপরিবারে একবার বাড়ী যাইত। যতদিন তাহার দাদার সন্তানাদি হয় নাই, ততদিন সে দাদার অনুগত হইয়া চলিয়াছিল, দাদাকে মৌখিক সম্মানও করিত। সে বুঝিয়াছিল দাদার যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই তাহার বা তাহার পুত্রের। সুতরাং দাদার অবাধ্য হইয়া তাঁহার মনে কষ্ট দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিত না।

কিন্তু মা ষষ্ঠী যেদিন হইতে মুকুন্দের স্কন্ধে ভর করিলেন, সেই দিন হইতেই মুরারির মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। সে বুঝিল, এতদিনে সরিকের সংসার হইল। তাই মুকুন্দ যখন অর্থকষ্টে পড়িয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মুরারি দাদাকে অর্থের পরিবর্ত্তে অযাচিত হিতোপদেশ প্রদানে কুণ্ঠিত হইল না, সে মুকুন্দকে লিখিল, "আপনি কোনও দিন বুঝিয়া চলিতে শেখেন নাই, আপনার হাতে যথেষ্ট পয়সা ছিল, কিন্তু আপনি তাহা দুই হাতে উড়াইয়া দিয়াছেন, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়

করিয়া সর্ব্বস্ব লুটাইয়াছেন, তখন আমি আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার কথা আপনি গ্রাহ্য করেন নাই, পিশিমার এতগুলি টাকা আপনি কি করিয়া নষ্ট করিলেন, সে কথা আমি কোনদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি কোনও দিন আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি নাই, সামান্য বেতনের চাকরী করিয়া কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেছি। স্বীকার করি আপনি যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধাংশ আমার, এবং আপনি আমার স্ত্রীকে দুই একখানি অলঙ্কারও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা আপনার স্বোপার্জ্জিত অর্থ নহে, পিশিমার টাকাতেই তাহা হইয়াছে; সেই অর্থে আপনার ও আমার সমান অধিকার ছিল; আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবশতঃই আমি কোনদিন সে টাকার অংশ চাহি নাই। বুদ্ধির দোষে সর্ব্বস্ব উড়াইয়া এখন আপনি অর্থকষ্টে আমার নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন, সাধ্য হইলে আমি আপনাকে কিছু পাঠাইতাম, কিন্তু তাহা আমার সাধ্যাতীত। মানুষ মাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ করে, আপনি স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন, আমি কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করি?"

হায়, মুকুন্দ যে এই ভাইকেই বাল্যকাল হইতে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছে, সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে! ইহাকেই বলে—

"যখন তোমার কেউ ছিল না,
তখন ছিলাম আমি,
এখন তোমার সব হয়েছে,
পর হয়েছি আমি।"

কিন্তু মুকুন্দের মনে এত কথা আসে নাই, ভাইয়ের সাধ্য নাই; তা সে কি করিবে! কিন্তু মুরারি চিঠি খানি এ ভাবে লিখিল কেন? আর একটু নরম করিয়াও লিখিতে পারিত! সহসা তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, দুই চারি ফোঁটা স্থানচ্যুত হইয়াও পড়িল!

পিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র গোপাল তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অর্দ্ধস্ফুট কোমলস্বরে বলিল, "বাবা তুই কাঁদতিত কেন? তোল কি হয়েতে?"—কাঁদ কাঁদ হইয়া তাড়াতাড়ি সে কচি কচি হাতে বাপের চোখের জল মুছাইয়া দিল। মুকুন্দ বেদনাবিদ্ধ ব্যথিত বক্ষে পুত্রকে চাপিয়া ধরিল, জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস অশ্রুরূপে বিগলিত হইয়া আবার তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিল, সে পুত্রের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না।

৫

কয়েক মাস পরে মুকুন্দের উত্তমর্ণ পঞ্চানন শিকদার প্রাপ্য টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সংসার প্রতিপালন করা কঠিন, সে সুদসহ সহস্রাধিক টাকার ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিবে?—শেষে পঞ্চানন শিকদার বাধ্য হইয়া জেলার সবজজ আদালতে গোবিন্দের নামে নালিশ রুজু করিল। বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া মামলা, মুকুন্দ বুঝিল, মামলা চালাইয়া কোনও লাভ নাই; নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তি যেমন সম্মুখস্থিত

তৃণ ধরিয়া উদ্ধার লাভের আশা করে মুকুন্দ সেইরূপ কিস্তীবন্দী করিয়া এই মহাদায় হইতে উদ্ধার-লাভের চেষ্টা করিল। কিন্তু কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দিতে না পারিলে কিস্তীবন্দী করিয়া ফল কি? প্রথম কিস্তীতেই সে কিস্তী খেলাপ করিল। আদালত হুকুম দিলেন, মুকুন্দের সম্পত্তি নিলাম করিয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ হইবে।

বাসগৃহের অর্দ্ধাংশ ভিন্ন মুকুন্দের অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না, সুতরাং তাহাই নিলাম হইয়া গেল! মুরারির শ্বশুরের নামে সে অংশ খরিদ হইল।

কয়েক দিন পরে নিলাম খরিদ্দারের উকীল মুকুন্দকে বাড়ী হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য এক 'নুটিশ' দিলেন। মুকুন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঙ্গে লইয়া পৈত্রিক বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিল। —দুই ক্রোশ দূরে সনাতনপুরে মুকুন্দের শ্বশুরবাড়ী; মুকুন্দের স্ত্রী ভিন্ন তাহার শ্বশুরের অন্য পুত্র কন্যা ছিল না। মুকুন্দ সপরিবারে তাহার একমাত্র অবলম্বন গরু দুটি লইয়া শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মুকুন্দ এখন শ্বশুরালয়েই সপরিবারে বাস করিতেছে। সে সনাতনপুরে কয়েক জন দোকানদারের দোকানে ঠিকা মুহুরীর কাজ করে, এবং অবসর কালে গোরুর বিচালি কাটে ও জাব মাখে। আর, বৎসরের ভিতর অন্ততঃ একবারও মুরারীকে দেখিয়া আসে, ঘরের একটু ঘি, চাষের কিছু আলু, গোটা কত নারিকেলের নাড়ু ভাইয়ের জন্য বহিয়া লইয়া যায়, তবে পরিমাণ বড় অল্প, তা হ'লে কি হয় মুরারি যে এ সব বড় ভাল বাসে! মুরারির স্ত্রী জিনিষের 'ছিরি' দেখিয়া ঠোট ফুলাইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, আর স্বামীর প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে। পাছে তার মন নরম হয়, সর্ব্বনাশ, তা হইলে কি আর রক্ষা আছে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে!
ফুল্লারবিন্দায়ত পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

হে বেদব্যাস! আপনাকে প্রণাম করি। আপনার বুদ্ধি বিশাল। আপনার নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। আপনিই মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ জ্বালিয়াছেন।

মুখবন্ধ

সত্যসত্যই মহাভারত ভারতের জ্ঞানময় অপূর্ব্ব প্রদীপ। ভারতের গৌরবরবি অস্তমিত। গাঢ় মোহনিশা সমাগতা। এই ঘন অজ্ঞানতিমিরে মহাভারত এখনও উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপরূপে ভারতের অতীত গৌরব প্রকাশ করিতেছে। কি কবিত্বে, কি দার্শনিকতায়, কি ভূগোলরূপে, কি ধর্ম্ম-সংহিতাভাবে, কি ইতিহাসাংশে মহাভারত

অতুলনীয়। মহাভারত কবিত্বের অমৃত-প্রস্রবণ, দর্শনের গভীর খনি, প্রাচীন পৃথিবীর অদ্ভুত ভূগোল, আর্য্যসমাজের অত্যুজ্জ্বল চিত্র, পৌরাণিকী গাথার অক্ষয় ভাণ্ডার, ধর্ম্মের অগাধ রত্নাকর, ও ভারতের বিচিত্র ইতিহাস। এই জন্যই মহাভারত পঞ্চমবেদ বলিয়া বিখ্যাত। এই জন্যই প্রবাদ যে, পিতামহ ব্রহ্মা যখন একদিকে বেদবেদাঙ্গাদি ও অপরদিকে মহাভারত রাখিয়া তৌল করেন, তখন মহাভারতের ভার অধিক হইয়াছিল। মহাভারত যে একাধারে আর্য্যজাতির মহান্ কাব্য, গভীর দর্শন, ও অদ্ভুত পুরাণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

মহাভারতে ঐতিহাসিকতায় সংশয়

আস্থাবান্ নিরক্ষর বা সাক্ষর হিন্দুগণ সকলেই মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কতক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এদেশ-বাসী মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, প্রাচীন ভারত ইতিহাস বুঝিত না, তাই প্রাচীন ভারতে ইতিহাস নাই, কেবল লৌকিকালৌকিক অসম্ভব ঘটনাবলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।' সুতরাং অগ্রে আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ ইতিহাস শব্দের যথার্থ-মর্ম্ম অবগত ছিলেন কি না দেখা আবশ্যক

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-জ্ঞান

প্রাচীনভারতে যে ইতিহাসের মর্ম্ম পরিচিত ছিল তাহা পুরাণ, আখ্যান, কথা, আখ্যায়িকা, ইতিহাস প্রভৃতি শব্দ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিত—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সর্গ অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও তত্ত্বময় হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি, বিসর্গ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি-গণের সৃষ্টি; বংশ অর্থাৎ প্রজাপতিগণ কর্তৃক দেবযক্ষরক্ষোমনুষ্যতির্য্যগাদির সৃষ্টি, মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বতমনু প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার, এবং বংশানুচরিত অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ, এই পঞ্চবিধ বিষয় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই পুরাণ। এ মতে পুরাণ গবেষণা এবং অলৌকিক ও লৌকিকালৌকিক ও লৌকিক ব্যাপারের সন্নিবেশ থাকে। পুরাণের অলৌকিক বিবরণকে mythology ও লৌকিকালৌকিক বিবরণকে legend বলা যাইতে পারে। আখ্যান শব্দে কাল্পনিক বা সত্য বা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। সেই আখ্যানকে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ পঞ্চবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে আছে—

'আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথালিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা॥

আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথালিকা এই পঞ্চভাগে গদ্যকাব্য বিভক্ত। আখ্যায়িকা শব্দে সত্যমূলক ইতিবৃত্ত, কথা শব্দে কাল্পনিক রচনা বুঝায়। অমরকোষে "আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা," "প্রবন্ধকল্পনা কথা" এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণের হস্তে আখ্যায়িকা ও কথা শব্দের অর্থ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

গদ্যে লিখিত নায়কমুখে বিবৃত উপাখ্যানের নাম আখ্যায়িকা এবং গদ্যে লিখিত নায়ক-মুখে বা অপরের মুখে বিবৃত উপাখ্যানের নাম কথা হয়। আচার্য্য দণ্ডী ঐরূপ লক্ষণে আপত্তি করিয়া আখ্যায়িকা ও কথা ও খণ্ডকথা প্রভৃতি সমস্ত আখ্যানকেই এক জাতীয় গদ্যময় গল্প বলিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ আখ্যায়িকা ও কথার প্রভেদ দেখাইয়া বলেন সত্যমূলক বিবরণী আখ্যায়িকা ও কাল্পনিক বিবরণী কথা। সেই জন্য তাঁহারা বাণভট্টের হর্ষচরিতকে আখ্যায়িকা ও কাদম্বরীকে কথা বলিয়া বর্ণনা করেন।

ইতিহাসের লক্ষণ

ইতিহাস শব্দটী ইতিহ শব্দের উত্তর আস্‌ধাতু অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ইতিহ শব্দে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বুঝায়। ইতিহ হইতেই ঐতিহ্য শব্দ আসিয়াছে। ঐতিহ্যের অর্থ প্রবাদ। ইতিহাস শব্দের যৌগিক অর্থ—যাহাতে ইতিহ বা পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সুতরাং অমরকোষের বচন "ইতিহাসঃ পূর্ব্ববৃত্তম্"। ঐ যৌগিক অর্থ ক্রমে প্রসারিত হয়। প্রসারণও যুক্তিযুক্ত। নীরস প্রাচীন ঘটনার ইতিবৃত্ত ইতিহাস হইলে ইতিহাসের গৌরব থাকে না। ঐরূপ ইতিবৃত্তকে ইংরাজিতে history অর্থাৎ ইতিহাস না বলিয়া annals (বার্ষিক ঘটনার বিবরণী) বা chronicles অর্থাৎ প্রাচীন ঘটনাবিন্যাস বলা হয়। ইতিহাস বিদ্যার প্রস্থান-ভেদ। ইতিহাস-রচনা শিল্পবিশেষ। কেবল প্রাচীন বৃত্তান্ত সরসভাবে লিখিয়া রচনা চাতুরী দেখাইলেই ইতিহাস-লেখকের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্পন্ন হইল না। যখন মানবসমাজকে উন্নতিপথে লইয়া যাওয়া সমস্ত বিদ্যারই উদ্দেশ্য, তখন ইতিহাসেরও সেই উদ্দেশ্য থাকা উচিত। সেই জন্য ইতিহাসের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে যে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পুরাবৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সাধিত হয় এমন উপদেশকথা সহ প্রাচীনকালে ঘটিত বৃত্তান্তের বিবরণ ইতিহাস।

ইংরাজী History শব্দের অর্থ

ইংরাজী History শব্দের অর্থও ঐরূপ। উহার ধাতুজ অর্থ জ্ঞান, সংবাদ, অনুসন্ধান। ইহার ষড়বিধ যোগরূঢ় অর্থ যাহা কোষকার Webester দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

১ম। কোন সত্য বা কাল্পনিক ব্যক্তি বা বিষয়সংক্রান্ত সম্বন্ধঘটনাবলির বিবরণ।

২য়। কোন জাতির বা সঙ্ঘের বা বিদ্যার বা শিল্পের উত্থান বিকাশ পতন ইত্যাদির কারণানুসন্ধানমূলক ঘটনাবলির বিবরণ।

৩য়। ঘটনাবলির বিবরণদ্বারা মনুষ্য-চরিত্রের আলোচনা।

৪র্থ। ইতিহাসের বিষয়ীভূত ঘটনা।

৫ম। ঐতিহাসিক নাটকাদি।

৬ষ্ঠ। ঐতিহাসিক বিষয়ের চিত্র।

ইংরাজী ইতিহাস শব্দের অর্থ কত বিস্তৃত দেখুন যে, ঐতিহাসিক নাটকাদি যাহাকে সংস্কৃতে ইতিহাসবাদ ও ঐতিহাসিক বিষয়ের

চিত্র যাহাকে ইতিহাসনিবন্ধন বলে তাহাও ইংরাজী ইতিহাস শব্দের বাচ্য। কাল্পনিক চরিত্রের ঘটনাবলীর বিবরণও ইতিহাস। তাই Thackerএর উপন্যাস Pendenisকে History of Pendenis অর্থাৎ পেণ্ডেনিসের ইতিহাস বলা যায়। সত্যঘটনার বিবরণ ইতিহাসের অভিধেয় বটে। কিন্তু ঘটনাবর্ণনই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। সেই ঘটনাবলী দ্বারা মনুষ্যজীবনের ক্রম-বিকাশ-প্রদর্শনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং অস্মদ্দেশে এবং পাশ্চাত্যদেশে ইতিহাসের একই উদ্দেশ্য, ইতিহাস-রচনায় কল্পনার লীলা। উভয় দেশের ইতিহাস যে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কল্পনাদেবীর সাহায্য লন তাহা ঐ উদ্দেশ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে। সংস্কৃত ইতিহাস-কারক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত' অবলম্বন করিয়া জন-সমাজকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবলম্বনে কিরূপে কোন জাতির অভ্যুদয় হইল কেনই বা তাহার পতন হইল এবং সেই সেই অভ্যুদয় ও পতন হইতে কি নীতি পাওয়া যায় ইহা শিক্ষা দেন। ঐ নীতি নিষ্কাষণে এবং অভ্যুদয়াদির কারণ অনুসন্ধানে কল্পনার লীলা অনিবার্য্য। লেখকের যেরূপ প্রবৃত্তি তদনুযায়ী তিনি কারণ দেন। ইংলণ্ডের প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব অর্থাৎ প্রথম চার্লসের সহিত প্রজাপুঞ্জের সমর-সংক্রান্ত ইতিহাস পাঠ করিলেই উহা বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ প্রথম চার্লস্‌কে নৃশংস ভীষণ অত্যাচারী রাক্ষস প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। কেহ বা তাঁহার দোষক্ষালনে যত্নবান্ হইয়াছেন। এইরূপ দ্বিতীয় জেম্‌স্-এর সহিত বিগ্রহ লইয়াও মতভেদ। যেখানে মত দিবার অধিকার সেই খানেই মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" কালিদাসের কথা ধ্রুবসত্য। ঘটনাবর্ণনেও ইতিহাসকার কল্পনাদেবীর আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না। একটি যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইবে। ইতিহাসের উপজীব্য প্রাচীন প্রবাদে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিল, কোন্ পক্ষের কত সৈন্য ছিল, কোন্ পক্ষের কোন্ বীর কিরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিহাসলেখক বর্ণনা সরস করিবার জন্য তাহাতে রঙ্ দিতে বাধ্য হন। সেই জন্যই একই যুদ্ধের বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে মোটের উপর সদৃশ হইলেও একরূপ নহে। যে লেখকের যত কবিত্ব সেই লেখকের বর্ণনা তত উজ্জ্বল। Macaulayর ইতিহাসে এতই কল্পনার ছটা যে সেনাপতি Wolsey বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে Bible, কাব্যের মধ্যে Shakespeare ও Homerএর গ্রন্থ, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে Macaulay's History of England লইয়া যান।

মূলে সত্য থাকিলে ঐতিহাসিকতা নষ্ট হয় না।

ইতিহাসের লক্ষণ ও ইতিহাসলেখার প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, যদি মূলে সত্য থাকে তাহা হইলে ঐতিহাসিকতা নষ্ট হয় না। প্রাচীনকালে একই ব্যক্তি কবি, দার্শনিক ও ইতিহাসকার হইতেন। সুতরাং ইতিহাসে কবিত্বের ছটা ও দর্শনের ঘটা দেখিতে পাওয়া যায়। একালে কবি, দার্শনিকও

ইতিহাসকার ভিন্ন ভিন্ন, অতএব কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন পৃথক্ পৃথক্। তথাপি ইতিহাস দার্শনিকতা বা কবিত্বের ছায়া একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন ইতিহাসকার স্বীয় গবেষণার পরিচয় দিবেন, ততদিন ইতিহাসে দার্শনিকতা থাকিবে। কল্পনার লীলা ইতিহাসে কখনই যাইবে না। Hallamএর Constitutional History সমালোচনা করিতে গিয়া Macaulay বলিয়াছেন যে, কবিত্ব ও দার্শনিকতা এই উভয় বিরুদ্ধ ভাব যখন অবিরুদ্ধভাবে মিলিত হইয়া সত্যকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে, তখনই আদর্শ ইতিহাস দেখিতে পাইব। তিনি দুঃখ করিয়াছেন যে, ঐ দুই বিরুদ্ধভাবের অবিরুদ্ধ সম্মিলন জগতে নাই। আমাদের ধারণা ঐ মিলন অনেকটা মহাভারতে আছে। এ জন্য মহাভারত ইতিহাসমূলক দার্শনিক কাব্য এবং দার্শনিক-কাব্যমূলক ইতিহাস।

ঐতিহাসিক সত্যতার নির্ণয়োপায়

সংস্কৃতশাস্ত্রমতে প্রমাণ অষ্টপ্রকার। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর ভিন্ন ভিন্ন মত সুন্দররূপে সংগৃহীত।

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি।।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেত্যানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥

চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা একমাত্র প্রত্যক্ষকে, বৈশেষিক ও বৌদ্ধবাদীরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে, সাঙ্খ্যবাদিগণ সেই দুইটি ও শব্দকে, একদল নৈয়ায়িক ঐরূপ ঐ তিনটিকে, আর একদল উপরন্তু উপমানকে; পূর্ব্বমীমাংসকগণ অর্থাপত্তির সহিত সেই চারিটীকে, ভট্টমতানুসারীরা ও বেদান্তীরা ঐ পাঁচটী ও অভাবকে এবং পৌরাণিকগণ সম্ভব ও ঐতিহ্য লইয়া সেই সকলগুলিকে প্রমাণ বলেন।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এক প্রত্যক্ষকেই চার্ব্বাকগণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ না হইলেও আমরা অপর প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা সেই অপ্রত্যক্ষবিষয়ের জ্ঞানে উপনীত হই বলিয়া মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এ বিষয়ে তাঁহার মতানুসরণ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণ বলেন। সাঙ্খ্যকার ইহার উপর আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাশূন্য বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের বচনকেও প্রমাণ বলেন। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে ইহা অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। একদল নৈয়ায়িক বলেন যে সদৃশবস্তুদর্শনে সদৃশবস্তুর জ্ঞান আপনা-আপনি আসে সুতরাং উপমানও প্রমাণ। আর একদল বলেন যে তাহাও অবোধপূর্ব্ব অনুমান। দুইটী বিরুদ্ধ বিষয় দেখিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জনের জন্য যে তৃতীয় অদৃষ্টবিষয়ের জ্ঞান, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে। পূর্ব্বমীমাংসকগণ ইহার এই প্রচলিত দৃষ্টান্ত দেন—"পীনো দেবদত্তো

দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে অতঃ রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে" (দেবদত্ত দিবসে খায় না অথচ স্থূল, সুতরাং রাত্রে খায়)। পীনত্ব ও দিবসে অনাহার বিরুদ্ধ, তাহাদের বিরোধ-ভঞ্জনের জন্য রাত্রি-ভোজন স্বীকার্য্য। নৈয়ায়িকাদির মতে এরূপ দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টজ্ঞান অনুমান। পূর্ব্ব-মীমাংসকগণের মধ্যে যাঁহারা কুমারিলভট্টের মতাবলম্বী তাঁহারা আবার ঘটাভাব হইতে ঘটের জ্ঞানকে অভাবনামক পৃথক্ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বলেন। পৌরাণিকগণের এই ছয়টী প্রমাণেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না. তাঁহারা অগত্যা ঐতিহ্য বা প্রবাদ এবং সম্ভব অর্থাৎ ইহা হইতে পারে ইহাকেও প্রমাণ বলিয়া মানেন। ঐতিহ্য ও সম্ভব না মানিলে ঐতিহাসিক সত্যের অস্তিত্বলোপ হয়। প্রাচীনব্যাপার আমরা দেখি নাই। তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে সেই সমসাময়িক ব্যক্তির কথা বিশ্বাস না করিলে চলে না। আবার বহুপ্রাচীন বিষয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিরও অভাব। তথায় যাহা করেন ধারাবাহিক জনশ্রুতি। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে "ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" (জনশ্রুতি বা প্রবাদ অমূলক নহে)। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচ্য ইতিবৃত্তের সত্যতা নিরাকরণে প্রবাদকে একেবারে ফেলিয়া দেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে যদি তাঁহাদের পুরাবৃত্তের সত্যতা স্থির করিতে তাঁহাদের প্রবাদ যাহা chronicles ও annalsএ রক্ষিত তাহা ত্যাগ করা যায়,তাহা হইলে সেই পুরাবৃত্তের সত্যতা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মহাভারতে ইতিহাসের গৌণ লক্ষণ

মহাভারতে সংস্কৃতমতে ইতিহাসের গৌণ-লক্ষণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসংক্রান্ত উপদেশাবলী সাবিত্রী-সত্যবান্ প্রভৃতি উপাখ্যানে, বৃত্রবাসবাদি পৌরাণিকসংবাদে, গৃধ্রগোমায়ু-সংবাদাদি কথায়, সনৎসুজাতীয়ভগবদ্গীতা অনুগীতা মোক্ষধর্ম্মাদি দার্শনিকভাগে এমন কি প্রতি ছত্রে ছত্রে আছে। তর্কচ্ছলে মহাভারতের চরিত্রগুলি কাল্পনিক ধরিলেও মহাভারতে বর্ণিত সমাজ কাল্পনিক না হইলে ইংরাজিমতেও ইতিহাসের গৌণ লক্ষণ মহাভারতে আছে বলিতে হইবে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য—

মহাভারতের সমাজ কাল্পনিক কি সত্য?

ঐ সমাজ পর্য্যালোচনা করিলে উহা কবির স্বকপোল কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। কল্পিত হইলে উহা সত্য কালের বা ত্রেতার সমাজের ন্যায় ধর্ম্মময় ও সর্ব্বানন্দময় হইত। ব্যাসদেব যে নিজকালের বিপর্য্যস্ত সমাজ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা গ্রন্থে সুপ্রকাশ। ইতিবৃত্তের মুখবন্ধেই আদি বংশাবতারণপর্ব্বাধ্যায়ে তিনি অগ্রে সত্য-যুগের চিত্র দিয়া পরে তাহা কেন দ্বাপরের শেষভাগে পরিবর্ত্তিত হয় উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যযুগের শেষভাগে ক্ষত্রিয়গণ দুর্ব্বৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে, এমন কি নিরীহ তপোরত মহর্ষি জমদগ্নিকে হৈহয়গণ বিনাপরাধে হত্যা করিলে, জামদগ্ন্য রাম ক্ষত্রিয়দমনে বদ্ধপরিকর হন। তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে সমন্তপঞ্চক হ্রদ সৃষ্টি করতঃ পিতৃ-

গণের তর্পণ করেন। পিতৃগণ তখন তাঁহাকে দর্শন দিয়া ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি কোপ সম্বরণ করিতে বলিলে তিনি শান্ত হন। এই উপাখ্যানের সত্যতায় সন্দেহ করিলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয়রাজন্যগণ পুরাকালে ঘোর অত্যাচারী হন এবং জামদগ্ন্যসদৃশ শস্ত্রকুশল ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধন করেন। পরে ক্ষত্রিয়গণ উচ্ছিন্ন হইলে ক্ষত্রিয়নারীরা সন্তানার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট আসেন। শংসিতব্রত বিপ্রগণ তখন ক্ষত্রিয়াঙ্গনাতে পুনরায় ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়কুল সৃষ্টি করেন। সেই নূতন ক্ষত্রিয়গণ প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশের ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। আবার ধর্ম্মস্রোতঃ প্রবর্ত্তিত হইল। তপোবনে বেদধ্বনি উঠিল। ক্ষত্রিয়দিগের ভূরিদক্ষিণ যাগের যূপচিহ্নে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নর্ম্মদা কাবেরী গোদাবরীর উপকূল পুনরায় চিহ্নিত হইল। বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিক্রয় করেন না। ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচারী নহেন। বৈশ্য দুর্ব্বল বৃষ হলে যোতেন না, বৎসতরীকে মারিয়া দুগ্ধ দোহন করেন না। বণিকৃগণ কূটমানে গ্রাহকগণকে প্রবঞ্চনা করেন না। পর্জ্জন্য কালবর্ষী। ধরা শস্যশ্যামলা। ঋতুগণ যথাকালে প্রবর্ত্তিত। তরুরাজি ফলভরে অবনত। নিখিল সমাজ সমুদিত। এইরূপে সত্য ত্রেতা কাটিয়া গেল। দ্বাপরও শেষ হয় হয় হইল। ধরার অদৃষ্টে এ সুখ সহিল না। অসুরগণের দৃষ্টি মর্ত্ত্যধামে পড়িল। দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অসুরগণ পৃথিবীতে মনুষ্য এমন কি গোমহিষাদি পশুমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে দৈত্যদানবগণে বসুন্ধরা পরিপূর্ণা হইলেন। ধরাধামে অবতীর্ণ অসুরকুল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদিগকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। মহর্ষিগণও তাহাদের দ্বারা ধর্ষিত হইলেন। ধরা অসুরভার সহিতে পারেন না। গোরূপধারিণী হইয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ পিতামহের নিকট দুঃখ জানাইলেন। পিতামহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভূভার হরণের জন্য দেবগণকে নিয়োজিত করিলেন। ইন্দ্রাদিদেবগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ মর্ত্ত্যধামে আসিতে স্বীকার করিলেন। তাঁহার অনন্ত করুণা। সত্যসত্যই যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখনই তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন। ভগবান্ সদলবলে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই বংশাবতরণিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে দ্বাপরের শেষভাগে আর্য্যসমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষত্রিয় নৃপতিই দুর্ব্বৃত্ত ও অধার্ম্মিক হইয়া পড়ে। ধার্ম্মিক অতএব দেবাংশসম্ভূত জন কতক ঐ সমাজের রক্ষার জন্য ব্রতী হন এবং সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ধার্ম্মিকগণই অধার্ম্মিকের জয়ে সমর্থ হন। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি যেরূপ ক্রুর, স্বার্থপর, অধার্ম্মিক তাহাতে তাহারা যথার্থই কলির অংশ এবং যুধিষ্ঠিরাদি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, সহিষ্ণু ও স্বার্থত্যাগী তাহাতে তাঁহারা ধর্ম্মাদি

দেবগণের অংশজাত বটে। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অলৌকিক শক্তির আধার, তাহাতে তিনিই সেই ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্—নারায়ণের অবতার। ইহারা কবির কল্পনা-প্রসূত হইলেও কবি যে ঐ সমস্ত চরিত্রমুখে নিজসময়ের পাপময় অথচ পুণ্যবীজযুক্ত সমাজের উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সময় ভারতে যে ক্ষত্রিয় রাজার সংখ্যা অনেক ও তাঁহাদের যে প্রত্যেকরই সৈন্য বহুল ছিল তাহাতেও সংশয় নাই। সত্যসত্যই নিখিল ভারতের সৈন্যপদভরে ধরা প্রপীড়িতা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপ রাজ্যের অবস্থা যদি কোন কবি ইতিহাসমূলক কাব্যে লেখেন তাহা হইলে তিনিও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, জার্ম্মাণ, ইটালি, রুষিয়ার সেনা, রণতরী ও অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনা করিতে নিশ্চয়ই বলিবেন যে উহাদের পদভরে মেদিনী কম্পান্বিতা। যদি আবার ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ স্বার্থান্ধ হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হন এবং পৃথিবীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে ধার্ম্মিক ইতিহাসকার না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না যে, অসুরগণ উহাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অচিরে উহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা আবির্ভূত হইবেন। সুতরাং বেদব্যাসকে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য সর্ব্ববেত্তা ঋষি বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও তাঁহাকে কবিত্বপ্রতিভাবান্ ধর্ম্মপ্রিয় দার্শনিক লেখক বলিলেও তাঁহার বংশাবতরণিকাকে অমূলক বলা যায় না। অসুরাংশসম্ভূত মনুষ্যগণের প্রভাবে যে ধর্ম্ম হীনপ্রভ হয়, সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। মহাভারতের সমাজ তাই বিপরিবর্ত্তিত ও বিপর্য্যস্ত। ব্রাহ্মণ-মাত্রেই মনুর কথিত যজনযাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম লইয়া ছিলেন না। ধৌম্যাদি স্বধর্ম্মনিরত থাকিলেও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিভোগী। আবার দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি ঋষিবংশধর হইয়াও ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া উদরের জন্য শস্ত্রজীবী হন। ক্ষত্রিয়গণও সকলে সত্যযুগের ন্যায় শান্ত দান্ত সত্যনিষ্ঠ ও ইজ্যাধ্যয়নাদিপঞ্চ কর্ম্মনিরত ছিলেন না। ইজ্যাদির সহিত দুর্য্যোধনাদির কোন সম্পর্কই ছিল না। কর্ণ তাঁহাকে যে যাগ করান তাহা সাত্বিক বা রাজসিক যজ্ঞও নহে, কেবল তমোগুণের পূর্ণবিকার। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের মধ্যে অধিকাংশই অধ্যয়নাদিপরায়ণ ছিলেন না, তাঁহাদের দানও তাদৃশ ছিল না এবং বিষয়ে অনাসক্তি আদৌ ছিল না—ইহাও মহাভারত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। শূদ্র এবং আর্য্য-সমাজের বহির্ভূত জাতিসমূহের মর্য্যাদা-বৃদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হয়। পৌরবংশাবতংস শান্তনু দাসরাজার কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শূদ্রাগর্ভজাত বিদুর কুরু-গণের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও সরল আবার কণিকের ন্যায় ব্রাহ্মণ কৌটিল্য চাণক্যের ন্যায় কুটিল। শক-দরদ-পারদ-পহ্লবচীন-হুন-রোমক-খশতকিরা প্রভৃতি আর্য্যসমাজের বহির্ভূত জাতি আর্য্যসমাজের নৃপতিগণের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এমন কি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে

তাঁহারাও সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেন এবং হস্তিনাপুরের সিংহাসন জন্য তাঁহারাও প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। বর্ণধর্ম্মের ন্যায় আশ্রম-ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন মহাভারতে হয়। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্থাভাববশতঃ প্রাচীন প্রথা অবলম্বনে গুরুগৃহে যাইয়া গুরুশুশ্রূষা করিয়া শস্ত্রাদি লাভ করেন। কিন্তু ধনাঢ্য রাজবংশীয় কুরুবালকগণ গৃহে গুরু পাইলেন। কৃপ ও দ্রোণ উপযাচক হইয়া তাঁহাদের বৃত্তিভোগে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। দারিদ্র্য-পীড়িত দ্রোণ যখন বাল্যসখা দ্রুপদের দ্বারস্থ, দ্রুপদ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সম্মান রাখিলেন না। দ্রোণও ব্রাহ্মণবলে তাঁহাকে শাসন করিতে না পারিয়া কৌরবগণের ক্ষত্রিয়বলে তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণের রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়া তিনি দ্রুপদকে স্ববশে পাইয়াও ক্ষমা করিলেন। কিন্তু দ্রুপদ বৈরনির্য্যাতনে আত্মহারা হইয়া দ্রোণঘাতী যজ্ঞের জন্য যাজক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বেদবিৎ কর্ম্মী যাজ অর্থের লোভে ব্রাহ্মণ-ঘাতী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণোচিত ঔদার্য্যপ্রযুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে হন্তা জানিয়াও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অস্ত্রবিদ্যা দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু ও ব্রহ্ম হত্যা করিলেন। দ্রুপদরাজনন্দিনী, পাণ্ডবগণের গৃহিণী, রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিতা মহিষী দ্রৌপদীকে একবস্ত্রা রজস্বলা অবস্থায় প্রকাশ্য সভায় বলপূর্ব্বক আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেও দুঃশাসন সঙ্কুচিত হইল না। রোরুদ্যমানা বীরপত্নী, সভাসদ্‌গণকে বারম্বার অত্যাচার নিবারণ করিতে বলিলেও ভীষ্মদ্রোণাদি কেহ দুর্য্যোধনের ভয়ে কথা কহিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা-গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু থাকিতে না পারিয়া দুর্য্যোধনাদিরও ভৎর্সনা করিলেন। যে কার্য্য ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য করিতে সাহস পান নাই, সেই কার্য্য বৈশ্যানন্দন করিলেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্মের নন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া নিন্দনীয় জানিয়াও, কৌরবগণের পাপ-চক্র বিদিত হইয়াও সৌবলের আহ্বানে দ্যূতে বসিলেন এবং ক্রীড়ায় এতদূর আত্মহারা হইলেন যে অর্থ, বসন, ভূষণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, চতুরঙ্গবল হারাইয়াও তাঁহার চৈতন্য হইল না। সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন, ভীমসেন ও আপনাকে পণ রাখিয়া তিনি খেলিলেন। তাহাতেও হারিয়া তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল না। তিনি স্বয়ং জিত ও দাস হইয়া তখন দ্রৌপদীর উপর তাঁহার কোন অধিকার না থাকিলেও পঞ্চজনার পত্নীকে পণ রাখিয়া খেলিলেন। এই সমস্ত উপকথা হইলে ইহা হইতে তাৎকালিক আর্য্যসমাজের আভাস পাওয়া যায়। এবং কতদূর পর্য্যন্ত সেই সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আবার সনাতন ধর্ম্মের সনাতনত্ব সমাজে রক্ষিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষ্মের দেবোপম চরিত্র আর্য্যসমাজের সনাতন চিত্র। ভীষ্মের ন্যায় আত্মবলিদান ভারতে সে দিনও মেবারের ইতিহাসে ঘটিয়াছে। সূর্য্যবংশাবতংস বাপ্পারাওএর প্রথিত বংশধর চণ্ড পিতার জন্য মিবারের স্পৃহণীয় রাজমুকুট

সহাস্যমুখে বংশপরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া ভীষ্মের ভাব যে ভারতেরই তাহা দেখাইয়াছেন। বিদুরের ধর্ম্মপক্ষসমর্থনকারিতা, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠতা আর্য্যসমাজের সনাতনী শক্তি। দ্রৌপদীর পতিভক্তি আর্য্যনারীর সনাতনী রীতি। অর্জ্জুনের সহিষ্ণুতা আর্য্যসমাজের সনাতনী প্রথা। শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্ভাব আর্য্যসমাজের উন্নত আদর্শ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তর্কচ্ছলে ব্যাসের অঙ্কিত চরিত্রগুলি প্রাণহীন ধরিয়া লইলেও সেই চরিত্রা ঙ্কনমুখে মুনিবর নিজকালের 'পাপপুণ্যময় সমাজ বর্ণন করিয়াছেন, একই পটে আলোক-ছায়ার ন্যায় যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধনাদির সন্নিবেশ করিয়া সমসাময়িক সমাজের আলোক-ছায়া দেখাইয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

অবলা কি দুর্ব্বলা?

অনেকের বিশ্বাস অন্যান্য বিষয়ে, বিশেষতঃ বুদ্ধি ও হৃদয়ে, পুরুষের সমকক্ষ হইবার মত গুণ স্ত্রীর থাকিলেও, শারীরিক বলে স্ত্রী পুরুষের বামে বসিবার যোগ্য। এই কারণেই অনাদিকাল হইতে পুরুষ স্ত্রীর রক্ষাকর্ত্তা, স্বামী বা নিয়ন্তা, এবং স্ত্রী পুরুষের অনুবর্ত্তিনী দাসী।

ইংরেজদের মধ্যে কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। ডারউইন বলেন স্ত্রী পুরুষের অনেক পূর্ব্বে উন্নতির শেষ সোপানে উঠিয়াছে; পুরুষ এখনও উন্নতির পথে চলিয়াছে। হারবার্ট স্পেন্সার বলেন—"স্ত্রীজাতির উন্নতি অবহেলা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত।" জন ষ্টুয়ার্ট মিল মনে করিতেন কেবল মাত্র অভ্যাসজাত সংস্কারদ্বারা স্ত্রী পুরুষের নিকট হীনতা স্বীকার করে, নতুবা স্ত্রী কোন বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মহাত্মা মিল যেরূপ সাহস ও দক্ষতার সহিত তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। সমগ্র রমণীসমাজ তাঁহার নিকট এ জন্য চিরঋণী।

আজ কাল পুনরায় একদল মাথা তুলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রী পুরুষ-অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে, পক্ষান্তরে পুরুষই দুর্ব্বল। ইহাদের প্রমাণ-সংগ্রহের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে ইংরেজ কুলাঙ্গনাগণ সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকার বিস্তারের জন্য ছিন্নমস্তারূপে রণরঙ্গে মাতিয়াছেন। তর্ক যুক্তির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম না করিলে পাছে স্বার্থপরায়ণ পুরুষ সহজে স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে, বোধ হয় এই আশঙ্কায় বীর রমণীকুল সমাজ-বন্ধন পদদলিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইহাঁদের ভৈরব নিনাদে ত্রস্ত ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রমণীর অধিকার-পথ অচিরে কণ্টকমুক্ত না করিলে, ইংরেজ সমাজে কি বিপ্লব উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে?

ডারউইনের শিষ্যগণ বলেন মানুষ ও বনমানুষের শারীরিক গঠনগত প্রভেদের মধ্যে পাঁজরের হাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানুষের পাঁজরে সাত খানি হাড় থাকে; বনমানুষের আটখানি। বনমানুষ যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণ যে, অনেক মানুষের ৮খান পাঁজর থাকে। এবং এই অষ্টমপঞ্জর স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে বেশী দেখা যায়। সুতরাং ইহা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের একটা নিদর্শন। আবার শরীরাবয়বের অস্বাভাবিক গঠনও পুরুষের গৌরবের অনেক পরিমাণে হানি করে। পুরুষের মাথার চুল খড়ার ন্যায় মধ্যভাগে দ্বিধাভিন্ন ও ঊর্দ্ধমুখী। অনেক সময় হস্তপদের অঙ্গুলি পুরুষের বিকৃত। আঙ্গুলের উপর আঙ্গুল, দাঁতের উপর দাঁত, এরূপ বিকৃতি স্ত্রীগণের মধ্যে খুব কম। ইহা স্ত্রীজাতির শারীরিক উৎকর্ষের প্রমাণ।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় পুরুষ ক্রমবিকাশে যত উন্নীত হইতেছে, ততই সে স্ত্রীত্ব লাভ করিতেছে।* অবয়ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন আধুনিক সভ্য সমাজে পুরুষের গঠন ও আকার ক্রমেই স্ত্রীর মত হইয়া আসিতেছে। হয় ত এমন দিন বহুদূর নয় যখন আকার দেখিয়া পুরুষ কি স্ত্রী চেনা শক্ত হইবে। অপরিচিতের সহিত আলাপে নামধামের পরিচয়ের সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইবে। অসভ্য সমাজে বৃহদাকার সুদীর্ঘ বপু পুরুষোচিত বলিয়া গণ্য। কিন্তু সে ধারণা এখন সভ্য সমাজ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এখন স্ত্রীর ন্যায় পুরুষও কৃশাঙ্গ ও খর্ব্বাকার হইলে সভ্য মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করে। বস্তুতঃ সভ্যদেশে পুরুষ ও ক্ষীণ-অস্থিবিশিষ্ট ও স্ত্রীসুলভ লাবণ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে।

এ প্রমাণ অনুসারে বাঙ্গালী পুরুষ অন্য দেশীয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হায়, বাঙ্গালী! তুমি জান না বিশ্ববিধাতা তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে মনুষ্যজাতির আদর্শ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের আরও প্রমাণ আছে। বর্ণানুভূতি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর তীক্ষ্ণ। অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় তাহারা ৪।৫ টীর বেশী বর্ণ অনুভব করিতে পারে না। সাদা, কাল, নীল, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের ভেদ কেবলমাত্র স্ত্রীগণই সুস্পষ্ট অনুভব করে। সভ্যসমাজে পুরুষগণও বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্য অনুভব করিতে পারে না। এ বিষয়ে স্ত্রীর শক্তি পুরুষ অপেক্ষা বেশী।

একটা কিছু রহস্যজনক প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন অভিনব পণ্ডিতসম্প্রদায় মনে করেন যেখানে খাদ্যসামগ্রী মহার্ঘ্য ও অপ্রচুর, সেখানে পুত্র বেশী জন্ম গ্রহণ করে এবং যেখানে প্রচুর ও সুলভ সেখানে কন্যা বেশী জন্মে। ধনীর গৃহে এই কারণে কন্যা বেশী ও দরিদ্রের গৃহে পুত্র বেশী। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কিম্বা যুদ্ধবিগ্রহের সময় পুত্র বেশী জন্ম গ্রহণ করে।

* কথাটা বুঝি বা সত্য। হিন্দুজাতির আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দেহের গঠন, লালিত্য. রমণীজনোচিত নয় কি? কিন্তু, গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। নজীরের অভাব নাই। মল্লিনাথ।

এবং এই একই কারণে দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও মরুভূমে কন্যা অপেক্ষা পুত্র বেশী। এই পণ্ডিত-মণ্ডলী ভারতবর্ষের খবর রাখিলে বলিতে পারিতেন এই কারণে ভারতে পুত্র অপেক্ষা কন্যা বেশী এবং অসূর্য্যম্পশ্যা আর্য্যরমণী ইংরেজের পুরস্ত্রী হইলে সভ্যতার আদান প্রদানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ড অধিক লাভবতী হইতেন।

অনেকের হয় ত খট্‌কা ঠেকিবে অপ্রচুর খাদ্যের সঙ্গে মানুষের জন্মের কি সম্বন্ধ? এবং সম্বন্ধ থাকিলেও, তাহাতে স্ত্রীলোকের গৌরব কিসে বাড়ে। আমার মনে হয়—বিজ্ঞান ইহার সমর্থন করিবে কি না জানি না—সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সমুদয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সম্যক উৎকর্ষ খাদ্য হইতে পুষ্টি ও রসাকর্ষণের উপর নির্ভর করে। অপ্রচুর খাদ্যরস হইতে পুরুষের অপরিণত শরীর ও মনের জন্ম হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রীর পারে না। এই জন্য প্রচুর খাদ্যের অভাব ঘটিলে সেখানে স্ত্রী জন্মে না, পুরুষ জন্মে। ধনীর গৃহে এই জন্য সুন্দরী কন্যা এবং মরুভূমে ও দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে পুত্র বেশী জন্মে। ইহা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ।

কেহ হয় ত বলিবেন—কৈ ইহাতে ত স্ত্রীর শারীরিক শক্তির কোন পরিচয় পাইলাম না। অধ্যবসায়শীল ইংরেজ পণ্ডিত ইহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত। ইহাঁরা নানা ভিন্নদেশীয় হাঁসপাতাল অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে স্বভাবতঃ স্ত্রীর শরীর পুরুষ অপেক্ষা সুদৃঢ় ও স্থায়ী। রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে ও রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশী। স্ত্রী হাসিমুখে যে রোগ বহন করে, পুরুষ তাহাতে শয্যাগত হয়। অনেক রোগ স্ত্রীলোকের আদৌ হয় না। অনেক রোগ খুব কম হয়। পীড়িত-অঙ্গচ্ছেদ বা উহাতে অস্ত্রাঘাত স্ত্রী যত সহজে সহ্য করে, পুরুষ তাহা পারে না। অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ পণ্ডিত এ কথার সাক্ষী। সেবা-ব্রতে স্ত্রী অতুলনীয়া। হিন্দুর নিকট ইহার নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। হিন্দু স্ত্রীকে লক্ষ্মীস্বরূপা জানে। অন্য দেশে ইহার সম্যক পরিচয় নাই বলিয়া হাঁসপাতাল ও যুদ্ধক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতে হয়। সেখানে দেখা যায় সেবায় স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নার্স (Nurse) বা ধাত্রীগণ হাঁসপাতালে ও যুদ্ধক্ষেত্রে করুণহস্ত প্রসারণ না করিলে কত বিরাট সভ্য রাজ্যে মরণের ছায়া দ্বিগুণ বিকট হইয়া মানুষকে মরণের ভয়ে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিত। রমণী মঙ্গলহস্তদ্বারা শ্মশানকেও সুখ-শয্যায় পরিণত করিয়াছে। ইহা রমণীর কম গৌরবের কথা নয়।

আর একটীমাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইতিহাস হইতে দেখা যায় স্ত্রীর দৃষ্টশক্তি পুরুষ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবি। দৃষ্টি যে তীক্ষ্ণতর তাহার প্রমাণের জন্য ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দপ্তর ঘাঁটিয়া মরি কেন? ইহা ত জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় নিত্যপ্রামাণ্য-নতুবা সে কটাক্ষে মহাযোগী মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইবে কেন? আর বেচারি বাঙ্গালী-পুরুষই বা বিশ্বসংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া অঙ্কলক্ষ্মীর অঞ্চললগ্ন হইবে কেন?

ইহার পর যদি কোন পুরুষ স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ করেন তবে মনে করিব নিশ্চয়ই তাঁহার সৃষ্টিতত্বের বর্ণপরিচয় হয় নাই।*

শ্রীপ—

* এটা একটা কথার কথা মাত্র। ডারউইনের মতবাদের সহিত এ কথার কোন সম্বন্ধ আছে—এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। —সম্পাদক।

বঙ্গদর্শন

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা

সত্য এবং সনাতন ধর্ম্মের শান্তি, প্রীতি, ও মঙ্গলময় মন্ত্রের প্রচারক ঋষিগণ। যে সকল ঋষি তাহা কাব্যে প্রচার করিয়াছেন তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অভিনব এবং অপূর্ব্ব। বিংশ শতাব্দীর রক্তিম সন্ধ্যায়, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জীবন-সংঘর্ষের মহাকোলাহলের মধ্যে, ধীরে ধীরে, বহু পুরাকালের কতকগুলি লুপ্ত গান এবং শান্তিবাণী, ঋষি রবীন্দ্রনাথের নিকট বঙ্গের শস্যশ্যামলক্ষেত্রপ্রান্তে, ভগ্নকুটীরে, এবং পুরাতন মন্দিরে বসিয়া আমরা শুনিয়াছি। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে সেগুলি আমরা কিছুই বুঝিতাম না। তখন কল্পনা-মন্দিরে সেগুলি ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে অনেক অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্যজগতে তাহার প্রতিভা বাইরণ, সেলী, এবেঞ্জার ইলিয়ট, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের সহিত তুলনা করিয়াছি। ক্রমে বঙ্গে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম-জীবনের উন্মেষ হইল। যে জীবন দেবতাকে বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ বিস্মৃত হইয়াছিল তাঁহাকে মন্ত্রপূত করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত যজ্ঞের মধ্যে বঙ্গের সন্তানগণ পুনর্ব্বার আবাহন করিল। সেই সন্তানগণের অগ্রগণ্য হোতা এবং কবি—রবীন্দ্রনাথ। যে মন্ত্রদ্বারা তিনি এই সাধনা শিখাইতে চাহিয়াছেন তাহার মূলে প্রকৃতি এবং পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। তাহার কথা কাব্য। তাহার উৎস উপনিষদ। তাহার ভিত্তি জ্ঞান, এবং উপকরণ প্রেম। সেই প্রেম সিঞ্চন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু শতাব্দীর মরুভূমিকে পুষ্পিত এবং লতাবেষ্টিত আশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। সখ্যভাবে, পবিত্র মনে, প্রীতির সহিত যখন সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি, তখনই কিছু নূতন দেখিয়াছি এবং শিক্ষা করিয়াছি। তখনই কোনও কালের বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়াছে। কোনও গভীর অন্তর্নিহিত এবং অমৃত-স্রাবিণী ভাবলহরী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুঝি নাই কিন্তু অনুভব করিয়াছি। কারণ জানি না, তবুও নিজের বিগলিত অশ্রুধার দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছি।

কেবল কাব্য নহে, তাহারই মধ্যে কলভাষে কবি রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি ধর্ম্মজগতের আদিম ইতিহাস ক্ষুদ্র এবং

মনোহর প্রণালী দ্বারা ইঙ্গিতে প্রকটিত করিয়াছেন। নিষ্কম্প এবং বিশাল উদধির বক্ষে প্রকৃতি এবং পুরুষের প্রথম উদ্বাহ, সপ্তপর্ণভূষিত কুমারগণের বাল্যলীলা, অনন্ত আকাশতলে তাহাদিগের আত্মবিস্মৃতি এবং স্বপ্ন, ভূগৃহে তাহাদিগের পুনরাবর্ত্তন, মাতৃ-স্নেহ, পিতৃস্মৃতি এবং মায়াবধূ লইয়া গৃহরচনা, কত কথায়, কত ছন্দে এবং কত রঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখিতে পাইয়াছি।

অবসর মত যাহা মনে পড়িত, তাহারই কতিপয় কথা এই প্রবন্ধে আমরা লিখিতেছি। সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের সহিত ধর্ম্মের, এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ, যাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে পাইয়াছি, তাহারই কিয়দংশ বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সমালোচনার বিপুল ব্যাপার আমাদিগের সাধ্যের বহির্ভূত। রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্ম্মস্পর্শী কাব্য সম্পূর্ণরূপে মানসপটে চিত্রিত করি, সে স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে যতদূর তাহার প্রতিঘাত অনুভব করিয়াছি, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার মর্ম্ম যতদূর বুঝিয়াছি, সে সব কথা বলিলে, যদি অন্য কাহারও সম্বাদী ভাবের সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দ লাভ করিয়া সার্থক হইব।

ধর্ম্মই কাব্যের মূল

ধৃতি হইতে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রকৃতি এবং পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ। অজ্ঞান ও মায়া হইতে আত্মবিস্মৃতি এবং দুঃখ। কিন্তু এই বিশাল মায়ারূপী আবরণের মধ্যে ধর্ম্মই পথপ্রদর্শক। ধর্ম্ম প্রথমাবস্থায় পরিচ্ছিন্নভাবে উদিত হয়, ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি এবং আত্মত্যাগে প্রসারতা লাভ করে। তাহারই প্রতিকৃতি সমাজ এবং সংসার। বহুযুগ দুঃখ সহিয়া জীব অবশেষে জাতিস্মরতা এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে।

জীবাত্মার এই বিশাল ইতিহাস, কেবল মানবের সামাজিক কিংবা জাতীয় ইতিহাসে প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। একই লীলা, একই ধর্ম্ম, অহরহ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র গুরুমুখী বিদ্যা, দর্শন বিবেক ও বিচার-সাপেক্ষ। বাহ্যদৃষ্টিতে ইতর মানব কেবল দুইটী চিত্র দেখিতে পায়—দ্বন্দ্ব এবং প্রেম। একদিকে জীবন-সংগ্রাম, অন্যদিকে স্নেহবন্ধন। সেই বন্ধন ধর্ম্মোদ্ভূত, এবং বন্ধন হইলেও মুক্তির পথ। প্রেম একটি নিগূঢ় বন্ধন, ভক্তিও বন্ধন। কিন্তু এই বন্ধন হইতেই, এই দ্বৈতভাব হইতেই, প্রাণের গতি অন্তর্মুখী হইয়া থাকে। পরিচ্ছিন্ন জীবনের সহিত অনন্ত জীবনের সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়। প্রেম হইতেই জীব যুক্তাবস্থা অনুভব করে, আদর্শ কল্পনা করে। সেই প্রেমের প্রসারতা স্থাবর জঙ্গম এবং প্রত্যেক বিশ্বকণায় যে অনুভব করে সেই ভক্ত। তাহারই সৌন্দর্য্য, তাহার সঙ্গীত লইয়া কাব্য। তাহারই কথা, ধর্ম্মের কথা, প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্বন্ধের কথা। অতএব মনীষিগণ কহিয়াছেন, ঈশ্বর, প্রকৃতি, ধর্ম্মের প্রতিভা, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত এবং প্রেমময় মানবের জীবন, এই গুলি কাব্যের সাধারণ এবং মৌলিক বিষয়।

যাহারা গুরূপদিষ্ট পথ জানে না, যাহাদিগের দেহের প্রাকৃতিক সংগঠনে প্রেম এবং ভক্তির উপকরণ বর্ত্তমান, তাহাদিগের পক্ষে কাব্যই ধর্ম্মপথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষের আদিম সামাজিক কিংবা জাতীয় ইতিহাস বিশদরূপে কোথাও বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু তাহা হইতেও অধিকতর মূল্যবান ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্র। কাব্য, তন্ত্র এবং দর্শন সেই শাস্ত্রের অন্তর্গত। আদিম প্রকৃতির অঙ্কশয়ান স্বপ্নজড়িত মানবশিশুর সহিত বিশ্বপরমাত্মার সম্বন্ধ আমরা প্রাচীন মহাকাব্যে দেখিতে পাই। সেই বিশ্বব্যাপ্ত মায়াদেহের রচনা তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্র তাহা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কেবল কাব্যের দিকেই দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে, পৌরাণিক ইতিহাস ইহার প্রথম যুগের উপকরণ। কিন্তু সে ইতিহাস ধর্ম্মের অদ্ভুত ইতিহাস। সেই যুগের প্রকৃতি ও পুরুষের গূঢ় পারিবারিক সম্বন্ধের ইতিহাস। তাহাতে এ যুগের সৌন্দর্য্য-উপাসনার তত্ত্ব বিরল। তাহাতে পরবর্ত্তী যুগের পরিস্ফুট যৌবনলক্ষণ নাই। তাহারও পরবর্ত্তী যুগের দর্শনশাস্ত্রের বার্দ্ধক্য-লক্ষণ নাই। শৈশবের স্বপ্ন কোন যুগেই কেহ বুঝিতে পারে না। অথচ তাহাই প্রকৃত তন্ত্র ও ইতিহাস, এবং প্রকৃত দর্শনের প্রমাণ। একটি নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, ঘুমন্ত সদ্যোজাত শিশুর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। নীরব গৃহে শিশুর প্রতি একাগ্রচিত্তা জননী, এবং জননীর অঙ্কে জীবন্মুক্ত সুষুপ্ত সন্তান। উভয়ের অন্তরালে অদৃশ্য পিতা। তিন জনেই যুক্ত এবং সেই গোপনীয় যোগপথেই ধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর নিহিত। যে স্বপ্নে শিশু মগ্ন তাহা কখনই আধুনিক হইতে পারে না, কারণ তাহার প্রত্যেক হাস্যে নির্লিপ্ত ভাব, প্রত্যেক ক্রন্দনে পূর্ব্ববৈরাগ্য এবং প্রত্যেক চাহনিতে অন্তর্দৃষ্টি। দর্শন যাহা বুঝাইতে চাহে, তন্ত্র যাহা বর্ণনা করে, জগৎ-লীলার যাহা শেষ, যাহার মধ্যে মণিময় সূত্রের ন্যায় বিশাল বিশ্বধর্ম্মের আদি এবং অনাদি বন্ধন, অজ্ঞেয় এবং অদৃশ্য বিরাট সত্য পুরুষের মহিমা প্রচার করিতেছে, ইহা তাহাই। তাহা বর্ণনা করা শিশুর ক্ষমতার বহির্ভূত। কারণ তাহার বিবেক এবং বিশ্লেষণের শক্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই। শিশু তখনও কবির পদে প্রতিষ্ঠিত নহে। সে কথা জানে না। তখনও ছন্দের উৎপত্তি হয় নাই। আনন্দ অন্তর্নিহিত।

কাব্যের প্রথম তিনটি যুগ

সমগ্র পৌরাণিক কাব্য এবং মহাকাব্য সেই আদিম স্বপ্নের কথা। সেই মহান এবং বিরাট স্বপ্ন কি তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু এককালে আমরাও তাহার দ্রষ্টা ছিলাম। বাহ্য প্রকৃতিতে মন আকৃষ্ট হইলে সেই স্বপ্ন আমরা বিস্মৃত হই। সত্য স্বপ্ন অসত্য হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন হাসি নূতন, পুরাতন অশ্রু বাহ্য নয়নের, পুরাতন জীবন তখন পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাল্যাবস্থা এবং যৌবন পর্য্যন্তও সেই স্বপ্নের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। জন্মান্তরে বদ্ধসংসারী জীব সেই স্বপ্ন বিস্মৃত হইয়া পথভ্রান্ত অরণ্যগত পথিকের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।

কিন্তু ঋষি-কবি যুক্ত শিশু। প্রথম যুগে সে স্বপ্নদৃষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করে। দ্বিতীয় যুগ তাহার বাল্যাবস্থা। তখন জীবন-সংগ্রাম তাহার লক্ষ্য। সেই দ্বন্দের অভ্যন্তরে সে অন্তর্নিহিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বন্দ্ব মিটাইতে চাহে। মহাসংগ্রামের মধ্যে তাহার চিরসখা সত্য স্বপ্নময় পুরুষ অবতাররূপে রথোপস্থে কিংবা ভূগর্ভ ভেদ করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করেন। সে যাহা দেখিতেছে তাহা সত্য। সে যাহা কহিতেছে তাহা কেহ শিখায় নাই। তাহার কল্পনা স্মৃতি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। প্রকৃতির মায়াময়ী লীলা সে স্বভাবতঃ ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতে থাকে। তাহার প্রকৃত অর্থ আমাদিগের নিকট দুজ্ঞেয়, কিন্তু তাহার নিকট সরল সত্য। আমাদিগের নিকট তাহা অদ্ভুত, অতএব আমরা চিরকালই কহিয়া থাকি যে, বাল্মীকি ও ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্য Transcendental কবিগণ সকলেই কল্পনার দাস। যেন একটা অভূতপূর্ব্ব অবিশ্বাস্য মোহজালে জড়িত। পৌরাণিক ইতিহাসের কথা এবং এ যুগের কবির কথা সকলই কল্পিত গাঁজাখুরি বিষয়।

প্রথম যুগের সনাতন মহাকাব্য বেদ-গানে প্রচারিত হইয়াছিল। পুরাণ হইতে দ্বিতীয় যুগের মহাকাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু সেই মহাজ্ঞানী ঋষিগণের বর্ণনাসমূহ সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। পাশ্চাত্য মনীষিগণ ইহার সম্বন্ধে দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। গেটে, লেসিং, হার্ডার প্রভৃতি জর্ম্মান্ দর্শনবিদ্‌গণের মতে পৌরাণিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে গূঢ় সঙ্কেত বর্ত্তমান। সে সঙ্কেতের অর্থ ঋষিগণ ভিন্ন অপরের নিকট দুজ্ঞেয়। রেণান্ প্রভৃতি বলেন যে, আদিম মানব যুগসংস্কারবশতঃ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিল (They conversed with Nature, spoke to her, heard her voice, and held to her through her arteries. They comprehended in a sort of magnetic way. They did not create symbols to cover dogmas. The latter were born as thought and the intention was not distinct from the thing itself)। কিন্তু আমাদিগের আধুনিক সংস্কার দর্শনের ও জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। আমরা মনে করি ধর্ম্ম মানব-কল্পনা মাত্র, পৌরাণিক কাব্য একটা বিরাট হেঁয়ালি। বুদ্ধি দ্বারা সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেই তাহার মায়াদুর্গ ছিন্নবিছিন্ন করা হইল। যোগ দীক্ষা প্রভৃতি সেই হেঁয়ালির অন্তর্গত।

যেমন যৌবনের প্রারম্ভেই যুবার সহিত পিতামাতার যুক্ত সম্বন্ধ শিথিল হইতে থাকে এব 'আমিত্বে'র ভাব তীব্র হয়, সেই রূপ তৃতীয় যুগে মানবের অবস্থা দাঁড়ায়। (The relation between Nature and God becomes veiled)। প্রকৃতি ও পুরুষের আদিম রহস্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পিতামাতার সহিত শিশুর পুরাতন সম্বন্ধ থাকে না। তখন এই মায়িক আবরণের

মধ্যে আমরা দুইটী ভাবের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

অনুসন্ধান

প্রকৃতির বাহ্য মায়িক সৌন্দর্য্যের উপভোগ-কামনা তাহার প্রথম দৃশ্য, এবং দ্বিতীয় দৃশ্য তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা এবং ব্যভিচারের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয়ের সংঘর্ষণে অলক্ষ্যে ঈশ্বরের ভাব মানব-হৃদয়ে উদিত হয়। মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম তাহার প্রমাণ। উভয় ধর্ম্মেই ঈশ্বর এক। কিন্তু মায়া কিংবা প্রকৃতির কথার লেশমাত্র নাই। ব্যবহারিক ভাবে মায়া কিংবা স্ত্রী-প্রকৃতিকে নিকৃষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট করাই মুসলমানধর্ম্মের লক্ষণ। সাংখ্যদর্শনের 'নৃত্যকীবৎ'। কিন্তু কামনা-শূন্য জ্ঞান তাহাতে নাই। সুফিধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে কেবল সৌন্দর্য্যের উপভোগই মুসলমান কবিগণের বর্ণনার বিষয় ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে স্ত্রী-প্রকৃতির স্থান সামাজিক ভাবে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের মাতৃভাব তাহাতে নাই। পরাপ্রকৃতির জগদ্ধাত্রীভাব, প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি পবিত্র সম্বন্ধ, এবং তাহাতে জীবের অপূর্ব্ব রহস্যময় স্থান পরবর্ত্তী যুগের কবিগণের জন্য রহিয়া গিয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ই ইহার কারণ। ইহাকে Max Muller প্রভৃতি 'পুনর্ব্বন্ধন' [Re=again, Ligo=bind or Religion] স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে ডোর এই বন্ধনকে দৃঢ় করে তাহাই ধর্ম্ম। ঋষিগণের মতে এই যুক্তাবস্থা কোনকালেই লয় প্রাপ্ত হয় না, কেবল কালে শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। যুক্ত শিশু যৌবনকালে সংস্কারবশতঃ সেই বন্ধন লইয়া উন্মাদের ন্যায় আত্মহারা হইয়া পরিভ্রমণ করে। "The first poems related the earliest bonds, but never expressed them in analytical thought. Poetry begins with the youth of the world's history. It is called the mediaeval movement and its first aspect is transcendentalism. Nature begins to lay down the relation of God with itself as Bride." বিস্মৃতিবশতঃ আমরা ইহাকে মায়িক সৃষ্টি এবং কল্পনা বলিয়া থাকি, কিন্তু অনুধাবনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্ব-কল্পের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। পূর্ব্ব-স্বপ্নের চিদাভাষ। তাহাই কবির এত ব্যাকুলতা এবং অনুসন্ধান। প্রেম এবং তীব্র সঙ্গলিপ্সা ইহার প্রমাণ। ধ্যান এবং অনুসন্ধান ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ। হুগো, বাইরণ, সেলী, কীটস্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, এবেঞ্জার ইলিয়ট প্রভৃতি এই পথের পথিক। তবে ইঁহারা সাধক কবি নহেন। বৈষ্ণব এবং সুফিকবিগণ প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেমবন্ধন ভক্তিমার্গে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু Transcendental কবিগণ দৃশ্যজগতে তাহার অনুসন্ধান-তৎপর হইলেন। সেলীর দীর্ঘনিশ্বাস, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের গভীর নিদি-ধ্যাসন, এবেঞ্জার ইলিয়টের করুণা এবং স্নেহ, ও টেনিসনের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং কার্লাইলের বীর-পূজা, সকলেরই রঙ্গস্থল দৃশ্যজগৎ। অন্তরে যে পুরুষ বর্ত্তমান তাহার সহিত দৃশ্য জগতের সম্বন্ধ কি? সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল স্মিতমুখে কহিলেন

যে সেই পুরুষ আপনাকে আপনিই বাঁধিয়া থাকেন, নিজেই নিজের প্রেমে মত্ত। ইহা বেদান্তের মায়িক স্বপ্ন, এবং জ্ঞান-জগতের কথা। কিন্তু Transcendental কবিগণ তাহাতে তৃপ্ত হয়েন নাই। এই যে বিরাট স্বপ্ন যাহার অভ্যন্তরস্থ ভক্তির কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, জ্ঞানের কথা দার্শনিকগণ কহিয়াছেন, তাহার আদি ও অন্তের আভাষ মধ্যাবস্থা হইতে কিরূপে প্রাপ্ত হইব? জড়-প্রকৃতি, জড়সমাজ, জড়সংসারের মধ্যে সেই অন্তরাত্মা কিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন? কোন্ ভাবের মধ্য দিয়া, কোন্ গোপনীয় পথ দিয়া জীব-ভাবে সেই আত্মা আপনাকে অনুভব করিয়া থাকেন? আমার ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, সাধনা নাই, পথ কেহ কহে নাই। তবে কি দৃশ্যজগতের অপূর্ব্ব ভাবের মধ্যে, উন্মাদ জীবন-তরঙ্গায়িত সমাজ ও সংসারের মধ্যে, প্রত্যেক তৃণকণা এবং ঝিল্লীরবের মধ্যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের এবং জীবের সহিত জীবের এবং মায়াধিষ্ঠিত চৈতন্যময় পরমাত্মার পবিত্র, সনাতন, এবং শান্তিময় সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাইব না? এই যুগে যে অভিনব পথ দিয়া Transcendental কবিগণ এই মহান্ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার একজন শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন পথিক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শিক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা *

মানবশিশু-প্রথম যখন এই সুন্দর আলোকোজ্জ্বল বিশ্বের দিকে তাহার কচি-কচি অক্ষিপল্লব উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখে, তখন প্রাক্তনজন্মবিদ্যা তাহার অনভ্যস্ত ইন্দ্রিয়কে সেই আলোকাচ্ছন্ন বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করে কি না, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মানসপটে যে রেখাগুলি ধীরে ধীরে অঙ্কিত হইতে থাকে, তাহাই তাহার শিক্ষার প্রথম সোপান। সে মানসপটে এই পরিস্ফুট রেখাগুলির পশ্চাতে যে প্রচ্ছন্ন ভূমি রহিয়াছে, তাহার বিচিত্র উপাদানের মধ্যে বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ও বৃত্তি লুক্কায়িত আছে। এই জ্ঞান ও বৃত্তি সকল শিশুর বুদ্ধিবিকাশে প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রচ্ছন্নভূমি বা Back ground যেমন পরোক্ষভাবে চিত্তোৎকর্ষের জন্য দায়ী, অগণিত জীব-প্রবাহ হইতে উদ্ভূত জ্ঞান ও বৃত্তি সকল সেইরূপ চিত্তোৎকর্ষের পক্ষে পরোক্ষভাবে অত্যাবশ্যক।

এইরূপ মৌলিক, মানসিক ও শারীরিক বিভব লইয়া মানবশিশু জ্ঞানার্জ্জনের পথে অগ্রসর হয়, এবং ক্রমে নিজের চেষ্টায় অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অনবরত আপনাকে নিয়োজিত করিয়া

---

* চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি লাভ করে। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান হইতে সে যেরূপ বহির্জগতের সন্ধান পায়, স্মরণ, মনন ও সুখাদির উপলব্ধি হইতে সে তেমনই আপনার মনকে জানিতে পায়; এবং বাহ্য ও আন্তর বিষয়ের মধ্য দিয়া মানবাত্মার স্বরূপ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানবের জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। সুতরাং মানবের শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। সেই জন্যই মানব ইতিহাস ও পুরাণে, কাব্য ও দর্শনে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে —প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই খুঁজিয়া বেড়ায়। সে যেমন তাহার নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে নিয়োজিত করিতে প্রয়াসী হয়, তেমনি লৌকিক ও অলৌকিক চরিত্রের মধ্য দিয়া, জ্ঞানের নিগূঢ়তম সমস্যার দ্বার দিয়া, ছন্দের সঙ্গীতে, আত্মার সহিত পরমাত্মার নিবিড়তম সম্বন্ধে, পদার্থ ও পরমাণুর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরিচয়ে মানবের আত্মা আপনার পরিস্ফুটতর প্রতিবিম্ব দেখিয়া সার্থক হয়। এ সার্থকতা প্রয়োজন-বিশেষের অপেক্ষা করে না, ইহাতে সকল সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জ্বালা থাকে না—এ সার্থকতা মানুষের মৌলিক-প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা ও কামনার সার্থকতা। তুমি যখন অর্থের জন্য জগৎকে কুবের-ভাণ্ডার বলিয়া গণনা করিয়া তাহা জয় করিতে চলিয়াছ, অথবা যশের জন্য নানাবিধ পণ্যে তোমার তরণীখানি সাজাইয়া লইয়া পৃথিবীর হাটে বাণিজ্য করিতে চলিয়াছ, অথবা বিলাসের লালসায় প্রকৃতির প্রমোদোদ্যানের প্রতি পুষ্পের সৌরভ লুটিয়া বেড়াইবার কল্পনা করিতেছ,—তখন তুমি তোমার বৃহত্তর, পূর্ণতর, সুন্দরতর আত্মার সন্ধানে ফিরিতেছ! তোমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত সাধনা, সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের পশ্চাতে তোমার আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। তুমি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রত্বই কামনা কর, আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের অধিকারীই হইতে চাহ, এ সমস্তই তুমি তোমার নিজের তুষ্টি, তৃপ্তি বা পরিণামের জন্য করিতেছ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আত্মাই সমস্ত মননশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎস। নিজের ছায়াকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যেমন যাওয়া যায় না, আত্মার বৃত্ত ছাড়িয়া তেমনই অন্যদিকে যাওয়াও অসম্ভব। আমরা যে শুধু অনাত্মের মধ্য দিয়া আত্মার সন্ধান পাই তাহা নহে, আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আত্মাভিমুখী। জ্ঞানের দিক দিয়া—ধর্ম্মের দিক দিয়া—অধর্ম্মের দিক দিয়া—যে দিক দিয়াই—দেখি, আত্মা সকলের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আত্মাপেক্ষা জগতে প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই, উপনিষৎকার সত্যই বলিয়াছেন—

> ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি
> কিন্ত্বাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।
>
> —বৃহদারণ্যক।

অতি হেয় স্বার্থ হইতে পরমোপাদেয় পরার্থ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই আত্মার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অবশ্য এরূপ বলিতেছি না যে, লোকে আত্মার

সুখ বা সুবিধার জন্য পরার্থের অনুসন্ধান করে, নিজের প্রয়োজন উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিবেশীদিগের উপকার করে, এমন কি, মাতৃস্তন্যের উপকারিতা ও মূল্য স্মরণ করিয়া মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ বা স্নেহ-পরবশ হয়! কোনও কোনও নীতিতত্ত্ববিৎ এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন! কিন্তু আমি বলিতেছিলাম যে, মানবের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তাহার আত্মার মুদ্রাঙ্কিত! যে স্বার্থসম্পর্কশূন্য পরহিত-ব্রতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বলি প্রদান করিয়া সময়ে সময়ে মানবজগতের ইতিহাসের শুষ্ক কঠিন উষরে স্নিগ্ধপূত মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দেয়, সে পরহিতের মধ্যেও আত্মা আপনার শান্ত পবিত্র নিষ্কল সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হয়। ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই যে সর্ব্বব্যাপী আত্মধর্ম্ম জীবজগতের প্রাথমিক স্তর হইতে ধীরে ধীরে উচ্চাদপি উচ্চ স্তরে আত্ম বিকাশ করিতেছে, ইহাকে সাহায্য করাই মানবীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মানব ইহার যে স্তর যে সময়ে অধিকার করিয়া থাকে, সে সময়ে তাহার শিক্ষাপ্রণালী ও সাধনা তাহার অনুগামী হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য হইলেও স্তরের পার্থক্য অনুসারে শিক্ষার আদর্শসম্বন্ধে অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। টাইবরের তীরে অবিনশ্বর নগরী যখন জগজ্জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিল, জগতের শিক্ষয়িত্রীস্বরূপিণী গ্রীস্ যখন পরকীয় শাসনচ্ছায়ে নিভৃতে জ্ঞান ও শিল্পের আদর্শ গড়িতেছিল, [illegible] বাণিজ্যের জাল বিস্তার করিয়া যখন জগৎকে স্নায়ুর ন্যায় বেষ্টন করিবার কল্পনা করিতেছিল, ভারত যখন স্তিমিত-নয়নে অরণ্যে বসিয়া পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফলের অনন্ত শৃঙ্খল রচনা করিতেছিল, তখন এই সকল দেশের লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং সেই জন্য ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীও স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিল। সুযোগ পাইয়া সে সেই আদর্শের মধ্য দিয়াই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। তাহার শিক্ষা, সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা সমস্তই সেই তীব্র আত্ম-প্রকাশের সাধনস্বরূপ হইয়াছে। যে সুষুপ্ত অহিফেনমুগ্ধ বেণীবদ্ধ চীন এতদিন আপনাকে ভুলিয়াছিল, সে-ও হঠাৎ তাহার অহিলাঞ্ছিত বেণীর সহিত অহিফেন চীন-সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া জাগ্রত হইয়াছে; তাহারও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান চীনের শিক্ষা-প্রণালী এই নূতন আদর্শের ছায়ায় গঠিত হইবে। চীনের আদর্শ ভারতের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে। যতদিন আদর্শের পার্থক্য থাকিবে, ততদিন শিক্ষাও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য। এইরূপে আমরা দেশভেদে ও জাতিভেদে শিক্ষার তারতম্য বুঝিতে পারি। একই কেন্দ্রস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াও প্রকৃতি ও আদর্শানুসারে রেখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার "শিক্ষা" নামক

সারবান্ গ্রন্থে "কোন্ জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ ?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "আত্মরক্ষাই জীবধর্ম্মবিশিষ্ট মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এবং যে জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মরক্ষা সহজ-সাধ্য হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। এই জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে উপযোগিনী যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই গরীয়সী। বলা বাহুল্য যে আত্মরক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্টতম উদাহরণ। জীবরাজ্যের প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই আত্মরক্ষা-নীতির সার্ব্বভৌম প্রভাব। এই আত্মরক্ষারূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা তোমাকে স্বার্থান্ধ জীবমাত্রে পরিণত করিতে পারে, আবার এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া তোমাকে অমরত্বের তীরে লইয়া যাইতে পারে। জীবজগতের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া স্পেন্সার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছিলেন, সুতরাং তিনি জীবনের পরিপূর্ণতা (complete living)কেই জ্ঞানের চরম আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সামাজিক আত্মরক্ষা, রাষ্ট্রনৈতিক আত্মরক্ষা, অর্থ-নৈতিক আত্মরক্ষা—নানাভাবে পারিপার্শ্বিক সর্ব্ববিধ অবস্থার মধ্য দিয়া আমরা আত্মাকে পূর্ণতর অবস্থায় লইয়া যাইতে চাহি। এই জন্যই আত্মরক্ষা বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নীতি। এবং এই জন্যই তৎসাধনরূপ জ্ঞানের অনুশীলনই মানবের লক্ষ্য হইয়াছে। দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য যাহা পারে নাই, বিজ্ঞান তাহা করিতেছে। 'বিজ্ঞানের প্রভাবে জীবনীশক্তি বাড়িতেছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে সুখের সীমা প্রসারিত হইতেছে, বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারে শত্রুকে পরাভূত করা সহজ হইয়া উঠিতেছে। কাজেই, আত্মরক্ষা যেখানে মূলমন্ত্র, বিজ্ঞানই সেখানে প্রধান পুরোহিত। বিজ্ঞান আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়, সুতরাং বিজ্ঞান আদরণীয়।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাণ-পোষণের গৌরব এদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—

কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণ-মসৃজত।

ছান্দোগ্যে প্রাণের প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে।

প্রাণো পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" ইত্যাদি বহু পদের দ্বারা আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইয়াছে। তবে বর্ত্তমান কালে জীবন-সংগ্রাম যেমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য আত্মরক্ষা এ দেশের কল্পনার উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আত্মরক্ষাতত্ত্বের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালীর যে আত্মপ্রতিষ্ঠা-সাধনতা দেখিতে পাইতেছি, পাশ্চাত্য জগতে শতদিকে শতভাবে তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। অবশ্য তাহার ফল

যে সর্ব্বত্র শুভদায়ক হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহার গতি আলোচনা করিলে বস্তুতঃ আমরা শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে একটি অব্যভিচরিত সত্যের সন্ধান পাই—তাহা এই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত এবং জাতিগত আত্মবিকাশ। এই আত্মবিকাশের ইতিহাসই মানবজীবনের গূঢ়তম ইতিহাস। আত্মার ধারণা অবশ্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ এই ধারণা আবার অতীত শিক্ষা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপে এই আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম-প্রিয় জীবনে এক তুমুল ঝঞ্ঝা তুলিয়াছে। তাহার জ্বালাময় কর্ম্মলালসায় ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছে। মধ্যযুগে লোকে যখন প্রাচীন আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, গতানুগতিকের ন্যায় ভজন-সাধনকে অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে এক শান্তি ছিল! কিন্তু তার পরেই যে জাগরণ সুপ্তির শান্ত অলসতা ভাঙ্গিয়া দিল, সে জাগরণ এখনও পাশ্চাত্য জগতে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে। লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া ধর্ম্মজীবনে যে চঞ্চল আত্মপ্রকাশ দেখা দিল, তাহা আবার রাষ্ট্রীয়নীতি, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে অদ্ভুত শক্তির সহিত ক্রিয়া করিতে লাগিল। চিন্তা ও বাক্যে স্বাধীনতার জন্য পাশ্চাত্য জগতে দুর্দ্দমনীয় আশঙ্কা লোকের মনে জাগিয়া উঠিল, এবং সেই স্বাধীনতা-প্রয়াসের ফলে কত রাজ্য ধ্বংসমুখে প্রস্থিত হইল, কত নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠিল, কত পুরাতন ধর্ম্মমত সে বন্যায় ভাসিয়া গেল, নূতন ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল, তর্কশাস্ত্রের জীর্ণ শুষ্ক কঙ্কাল পরিত্যক্ত হইল, তাহার স্থলে সরস সজীব বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হইল। লোকশিক্ষার ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র আনয়ন করিতেছে। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার স্থলে সাকার প্রত্যক্ষীভূত জনব্যূহের উপাসনার অনুমোদন করিতেছে; এবং দর্শনশাস্ত্রের জটিল কঠিন নিষ্ফল তর্ককে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার স্থলে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যন্ত্র ও নল প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে গৃহপিঞ্জরকোকিলাগণ শত শত শতাব্দীর জড়তা পরিহার পূর্ব্বক রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধমাঙ্গের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং জিউজিৎসুর সাহায্যে কোমলাঙ্গীগণ বর্ম্ম-চর্ম্মপরিহিত বেচারী পাহারাওয়ালাকে পর্য্যন্ত ধরাশায়ী করিতেছেন, এরূপ শুনিয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহাদের ঘোড়ার সইস পর্য্যন্ত যে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই বা সে অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত থাকিবেন? আত্মপ্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তর হইতে টানিয়া আনিয়া সমাজের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছে। ইহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এই যে সচেতন, প্রবুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠা রমণীগণের মধ্যে একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে অশেষ কল্যাণের জন্ম হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগের যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপ্লব তাহাও লোকশিক্ষার ফল। পূর্ব্বে ধনীর দ্বারে নির্ধন কৃপার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া কৃতার্থ হইত। ধনী তাঁহার প্রাসাদের উচ্চতম শিখর হইতে আদেশ প্রচার করিতেন, নির্ধন অবনত মস্তকে সে আদেশ পালন করিয়া ধন্য হইত। কিন্তু সে দিন চলিয়া গিয়াছে; অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় ধনী ও শ্রমজীবীদিগের সম্বন্ধ একেবারে উল্‌টাইয়া যাইতে বসিয়াছে। ধনী ইচ্ছা করেন যে তাঁহার অর্থে যে সকল পণ্যজাত উৎপন্ন হইবে, তাহার লভ্যের অধিকাংশ তাঁহারই কোষাগারে যাউক। বেচারী শ্রমজীবীরা খাটিয়া খাটিয়া সারা হউক এবং সপ্তাহান্তে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্বল্প কিছু অর্থ লউক। তাহা হইলেই ধনীর পক্ষে লাভের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। পৃথিবীর হাটে প্রতি-যোগিতা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, অর্থশালী-দিগের ততই চেষ্টা হইতেছে যাহাতে শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিক কমিয়া যায়। অর্থের বশ সকলেই; শ্রমজীবীগণের ত অর্থ নাই। কাজেই তাহারা ধনীর কৃপাপ্রার্থী হইয়া কোনও রূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইত। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখা দিয়াছে এবং আরও সুশিক্ষার সূচনা করিতেছে। তাহাদের অর্থবল নাই; কিন্তু তাহাদের লোকবল আছে—সমবেত হইয়া প্রণালী অনুসারে কাজ করিবার মত তাহারা শিক্ষা পাইতেছে, সুতরাং আজ নির্ধনের দ্বারে ধনীকে দাঁড়াইতে হইয়াছে। এই যে তীব্র পারিশ্রমিক প্রতিযোগিতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জগতের সর্ব্বত্র প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা হইতে যে কি এক বিশাল দাবদাহের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা ভাবিতেও শোণিত শুষ্ক হয়। এই অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের মধ্যেও আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি গৌরবময় চিত্র দেখিতে পাই। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর ক্লেশ প্রশমিত করিয়া, জগতের অধিকাংশ লোকের শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া এই আত্মপ্রতিষ্ঠা মানবের অপরিমিত কল্যাণ সাধন করিতেছে, যদি এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা জগতে সাম্যতন্ত্র বা সম্পত্তির সম-বিভাগ (The Socialistic ideal) আনয়ন করে, তাহা হইলে ফল যে কি হইবে বুঝিতে পারা যায় না।

চিন্তায় ও কর্ম্মে আত্মপ্রকাশের যে উচ্চ আদর্শ হিন্দুদিগের মধ্যে ছিল, তাহা কোনও আদর্শের তুলনায় পরিম্লান বলিয়া বোধ হয় না। সে একদিন ছিল যখন অরণ্যের শান্ত বিজনতার মধ্যে সরস্বতীর কলগুঞ্জনে, কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দে আর্য্যগণ বিশ্বস্রষ্টার স্তুতি রচনা করিতেন। সে একদিন ছিল, যখন অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে জগতের প্রিয়বস্তুসম্ভার উপহার দিয়া তাঁহারা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। সে এক দিন ছিল, যখন আত্মতত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তাঁহারা অদ্ভুত তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়া ভবিষ্যবংশীয়দের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আত্মাকে জানিতে পারা যাঁহারা জ্ঞানের আদর্শ বলিয়া মানিয়াছিলেন, আত্মহিতের চেষ্টাকে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা ও সাধনা কি গভীর ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোক্ষের জন্যই হউক, নিঃশ্রেয়স-লাভের জন্যই হউক, অথবা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই হউক, যে কোনও লক্ষ্যের দিকেই তাঁহাদের চিন্তাসূত্র প্রলম্বিত হইয়াছিল, সেই দিকেই আর্য্যহিন্দু আত্মপ্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কালের চক্র ইহার পরে কত শত বার আবর্ত্তিত হইয়াছে, কত নূতন নূতন লক্ষ্য, নূতন নূতন আদর্শ আমাদের কর্ম্ম ও গতিকে পরিচালিত করিয়াছে, এখন আর সে পুরাতন সমাজ নাই,—পুরাতন কর্ম্ম-ক্ষেত্র নাই, পুরাতন শিক্ষা নাই—কাজেই সে পুরাতন আত্মপ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল আদর্শও আর নাই। বর্ত্তমান অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে কেবলমাত্র সেই পুরাতন আদর্শের অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। আর্য্য-সভ্যতার সে দ্যুতিমান মধ্যাহ্নের রজতকান্তি অপরাহ্নের স্তিমিতালোকে ফিরিয়া পাইবার আশা করা বৃথা। আমাদের এ নূতন জাগরণ বর্ত্তমান যুগের আশা ও কল্পনাকে সার্থক করিবে, পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে এবং অন্যান্য জাতির সহিত আমাদিগকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। যে আত্মপ্রতিষ্ঠা কার্য্যকারণ-পরম্পরার অপেক্ষা করিবে না, অন্যান্য জাতির ইতিহাসের প্রতি অবলোকন করিবে না, অবস্থার প্রতি, দেশ কালের প্রতি, জন-সাধারণের প্রকৃতি ও রুচির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, সে আত্মপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনে সে আদর্শ কখনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

দেশ, কাল ও অবস্থার বৈচিত্র্য, অন্যান্য জাতির সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি আমাদের ক্রিয়া ও চিন্তাপ্রণালীকে স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যে শক্তি ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আপনা-আপনি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাকে রুদ্ধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই নূতন জাগরণকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করাই বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ।

ফল পাকিয়া যখন বৃন্তচ্যুত হইতে চলিয়াছে, তখন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে কেহ চাহে না। পুরাতনের প্রতি মমত্ব-পরবশ হইয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করা বিফল। কিন্তু সেই যে পুরাতন আর্য্য-আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে একটা মহিমময় আশ্বাস, আত্মনির্ভর ও সনাতনত্ব ছিল, তাহাকে বিদায় দিলে চলিবে না। নূতন ও পুরাতনের যে অপূর্ব্ব সমাবেশে দেশে এক চির মঙ্গলময় আদর্শের আবির্ভাব হইবে, তাহা জগৎ বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষণ করিবে।

আমাদের জাতীয় জীবনের তরুণারুণ-রাগের উদয়ে যে মঙ্গলধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ আমাদের

জীবনকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার নিম্নে শিক্ষার জন্য একটি অধীর ব্যগ্রতার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের স্বজাতির শিক্ষার জন্য বিধিমতে আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়াস-গুলি গ্রথিত হইয়া এক বিপুল ইস্‌লাম-বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দুরাও পশ্চাৎপদ হইবার নহেন ; হিন্দু-দিগের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার যে স্পৃহা আছে, মাননীয় মালব্য মহাশয় অজস্র রৌপ্যমুদ্রায় তাহার পরিমাপ করিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর ভূমিতে নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন—ব্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা, মাহিষ্য-সভা, বৈশ্য-বারজিবি-সভা, নমঃশূদ্র-সভা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান জন্ম গ্রহণ করিয়া এক প্রবল জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ দেশের রমণীরাও তাঁহাদের স্বভাবসুলভ অলসতা পরিহার পূর্ব্বক অন্তঃপুরের শিক্ষা-বিধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। রাজকীয় শক্তিও এ বিষয়ে উদাসীন নহে। গতবর্ষে শিমলা ও এলাহাবাদে রাজপুরুষদিগের যে শিক্ষা-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেরূপ সচেষ্ট ভাবে শিক্ষাবিস্তাররূপ দায়িত্বে মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদিগের দ্বারা ছাত্রগণের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক আশা হয় যে, আমাদের শিক্ষার পথ অনেক প্রশস্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা কল্পে সম্রাটের দান বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। মাননীয় গোখ্‌লে মহোদয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যবস্থা সমগ্র দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনিমাত্র। আমাদের শিক্ষার জন্য রাজকীয় চেষ্টার আর একটি উদাহরণ—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের লোকের সহায়তায় রাজপুরুষগণের চেষ্টা আশাতীত রূপে সফল হইয়া উঠুক, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কামনা হওয়া উচিত। আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যে প্রজা-শিক্ষার জন্য অধুনা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন—ইহাও আমাদের পক্ষে আশার কথা। আজ এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া আমাদের দেশের প্রজা-বৎসল ভূপতিকুলের আদর্শস্বরূপ সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সমক্ষে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

এইরূপে অসংখ্য চেষ্টা আমাদিগকে নানা আবর্ত্ত ও বাধার মধ্য দিয়া লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দিতেছে। শিক্ষার আয়োজন হইতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা জন্ম লাভ করিয়া উন্নততর, পূর্ণতর, সুন্দরতর শিক্ষা-প্রণালীর প্রসূতি হইবে। পুরাতন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, মাতৃভাষাকে অবলম্বন করিয়া নূতন শিক্ষা-প্রণালী আমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিলয় হইবে। এই যে আরাধ্যতম লক্ষ্য, ইহা জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষার দ্বারা লাভ করিতে হয়। গন্তব্য পথ দীর্ঘ, কিন্তু পাথেয়ও অপ্রচুর নহে। উপযুক্ত সাধনার অভাব না ঘটিলে

সিদ্ধি নিশ্চয়ই অদূরবর্ত্তিনী। এই যে বিশ্বের সভায় আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লইয়া দণ্ডায়মান হইব, ইহা আমাদের স্পর্দ্ধা মাত্র নহে। আমাদের অতীত ইতিহাস এই ন্যায্য অধিকারে আমাদের উপযোগিতা শতমুখে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। দেশের প্রতিকূল জলবায়ু এ গৌরব খর্ব্ব করিতে পারে না, পরাধীনতা এ গৌরব কাড়িয়া লইতে পারে না * যাহারা 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখং' বলিয়া এক সময়ে অপূর্ব্ব আত্মনির্ভরের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা কি সে পুরাতন গৌরব ভুলিয়া গিয়া জগতের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া অপরের ঐশ্বর্য্য মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিবে? ব্যাধি যখন বর্ষের পর বর্ষ সহস্র সহস্র ভারতবাসীকে অকালে গ্রাস করিতেছে, বর্ষের পর বর্ষ দুর্ভিক্ষ যখন অনন্ত বিভীষিকা লইয়া ভারতের দ্বারদেশে দেখা দিতেছে, তখন কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে? তাই বলিতেছিলাম যে, আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের বহু শতাব্দীর সুষুপ্তিকে দূর করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে এ দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে শ্রেয়স্কর পথে পরিচালিত করাই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হইবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

* Editor's Footnote to Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire.

কমলমণি

(বিষবৃক্ষ)

বিষবৃক্ষে তিনটি ফুল, তিনটিই অতুলনীয় —কমল স্বভাবজাত, কুন্দ অপার্থিব, সূর্য্যমুখী প্রকৃতি-প্রসূত হইলেও, তাঁহাতে কারুকার্য্য আছে, সে চরিত্রে শিক্ষার ফল পরিলক্ষিত; যদিও সে শিক্ষা হিন্দুর শিক্ষা, স্বাভাবিক কারণান্তর্ভূত, স্বভাব হইতে কদাচিৎ প্রভেদযোগ্য। আমরা সূর্য্যমুখী ও কুন্দকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কমলকে বুঝান কঠিন। অথবা কমলকে বুঝিতে ব্যাখার প্রয়োজনের অভাব। শুভ্র, অরঞ্জিত, প্রস্ফুটিত, নিত্যবিরাজিত; অকপট, খোলা, শাদা, পরিষ্কার; সপ্রকাশ, ক্রীড়াময়; তাহার আবার ব্যাখ্যা কি? দেখিলেই নয়নের প্রীতি জন্মে, চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি কাব্যজগতে বিরল, ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবের, কুত্রাপি ব্যতিক্রম নাই। কমল সর্ব্বত্র পরিস্ফুট ও অনায়াসবোধ্য। তবে এ চরিত্র পরিস্ফুরণ জন্য যত কৌশলের আবশ্যক ছিল, কবি তাহার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। স্নেহের পুত্তলি সতীশকে কমলের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীশচন্দ্রের আপিস জোটাইয়া দিয়াছেন, নিরাশ্রয়া বালিকা কুন্দকে

আনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আর ভক্তি ও মহাপ্রীতির পাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অতুলনীয়া গৃহিণীর সহিত হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ করায় কমলের প্রীতি-প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যের ভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর আত্মবিসর্জ্জনের সংবাদে কমল সতীশকেও একদিন ভুলিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগে কুন্দের প্রতি তাঁহার স্বভাব-প্রস্রুত হৃদয়ও একদিন প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল।

কমলমণি অষ্টাদশবর্ষীয়া কুলরমণী, এ বয়সে হিন্দুপরিবারে তাঁহার স্বামীকুলে গুরুজন কেহ না থাকা তত সম্ভবপর নহে। তাই, বোধ হয়, কবি কমলের শ্বশ্রূর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কমলের প্রকৃতি-প্রস্ফুরণ জন্য তাঁহার স্বাধীনতার প্রয়োজন, স্বামীসম্ভাষণে তাঁহার কোনরূপ বাধা থাকা সঙ্গত নহে, কবি তাই কৌশলে কমলের শ্বশ্রূকে কমলের স্বামী শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার বাড়ীতে কমলই গৃহিণী, সুতরাং উপস্থিত যে কোন কাজ গৃহের স্ত্রীলোকের উপর ন্যস্তভার হইবার প্রয়োজন হইত, তাহা কমলের উপরেই পড়িত; তাহা দ্বারা কবি কমলের প্রকৃতি লোকের দৃষ্টিগোচর হইবার কারণ বা উপায়ের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ বালিকা, দরিদ্রা, মলিনা, অযত্নলালিতা কুন্দকে আনিয়া কমলের হাতে ফেলিয়া দিলেন, কমল তাহাকে স্বহস্তে ধৌত, স্নাত, সুবাসিত, বস্ত্রালঙ্কারভূষিত করিয়া, তাঁহার পরিশ্রম লাঘবের আশায় ঐ সকল কার্য্য করিতে উদ্যত দাসীর গায়ে তপ্তজল ছিটাইয়া দিয়া, আপনার চিরপ্রেমময় স্বভাবের প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন।

অন্যাকে স্বামীর হৃদয়ভাগিনী জানিয়া মর্ম্মপীড়ায় সূর্য্যমুখী কমলকে একবার আসিতে আহ্বান করিলেন, কমল সে আহ্বানে গোবিন্দপুরে আসিলে দত্তদিগের বাটীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল, সূর্য্যমুখীর চোখের জল শুকাইল। আবার সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ এবং তজ্জনিত নগেন্দ্রের দেশত্যাগের পর, বিজন দত্তগৃহে, কুন্দ-নন্দিনী দুঃখকাতর হৃদয়ে সময়াতিপাত করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমনের সঙ্গে কমল তথায় পুনরাগমন করিলে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল আবার আকাশে একটি তারা উঠিয়াছে। প্রকৃতই কমল যেখানে যাইতেন সেইখানেই আলোক বিস্তার করিতেন, আলোকময়ীর উপস্থিতিতে লোকের দুঃখ প্রশমিত হইত, বিষাদের স্থানে প্রফুল্লতা আসিয়া দুঃখান্ধকার বিদুরিত করিত। চুলের গোছা লইয়া বসা কমলের একটি রোগ ছিল। সূর্য্যমুখীর দুঃখে সমবেদনাও এই রোগের পথে প্রকাশ লাভ করিত, কুন্দনন্দিনীর সহিত সহানুভূতির ইহা উপায়স্বরূপ হইত। হিন্দুরমণীগণমধ্যে প্রীতিপ্রবণতার এ লক্ষণ সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। একই সময়ে সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর সহিত সমভাবে সহানুভূতি দ্বারা কবি কৌশলে কমলের চিরপ্রেমিকতার, তাঁহার প্রীতিবৃত্তির সার্ব্বজনীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া-ছেন। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার

কমল তাহা জানিতেন, তাই তিনি সূর্য্যমুখীর মর্ম্মপীড়ায় ব্যথিত হইয়াও, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

কমল কাহাকেও তিরস্কার করিলেও, তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার মধুর প্রকৃতি প্রকাশ পাইত। "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?" এ তিরস্কারে রূক্ষতা কোথায়? আবার "রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।" এবং এই প্রসঙ্গে হীরাকে সম্বোধন করিয়া, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুট বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়া আসিস্।" অমৃতময়ীর রাগেও যেন অমৃতক্ষরণ হয়। এই স্থলে, অন্য দিকে, কবির কৌশল দেখুন। রূক্ষতার ভাবেও মধুর প্রকৃতির বিকাশের জন্য হরিদাসী বৈষ্ণবীকে কাঁটা ফোটাইবার চেষ্টায় যেমন কমলকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তেমনই আবার ভদ্রমহিলার শীলতা রক্ষার জন্য কবি পথের মাঝে আনিয়া সতীশচন্দ্রকে বসাইয়াছেন। তাহাতে শীলতাও রক্ষা হইয়াছে, স্নেহময়ীর স্নেহপ্রকৃতিও বিকাশ লাভ করিয়াছে।

সূর্য্যমুখীর প্রতি কমলের ভালবাসার গাঢ়তা কবি কয়েকটি ঘটনা দ্বারা অতি সুন্দর রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। কুন্দের প্রতি স্বামীর আসক্তি জানিয়া সূর্য্যমুখী যখন অতি দুঃখে লিখিলেন "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!" পড়িয়া কমলমণির আসন টলিল, আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন, অমনি স্বামীর সঙ্গে গোবিন্দপুর যাওয়ার পরামর্শ করিতে গেলেন। আবার কমলের স্বামীপুত্র লইয়া আমোদের মধ্যে কুন্দের সহিত নগেন্দ্রনাথের বিবাহের সংবাদ পৌঁছিল, কমল গোবিন্দপুর যাইবার জন্য অতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দপুর উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যমুখীর সম্বন্ধে অতি আশঙ্কান্বিত অন্তরে পুর প্রবেশ করিলেন, প্রাণাধিক সতীশচন্দ্রও সে ব্যস্ততার মধ্যে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। এইরূপ, যে দিন নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ লইয়া কলিকাতায় কমলের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন, কমল সতীশচন্দ্রকে একা ফেলিয়া সে রাত্রির মত অদৃশ্য হইয়াছিলেন। অন্য ভাবে, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে, কুন্দের প্রতি কমলের রাগ, সহানুভূতির আশয়ে নিকটাগতা কুন্দকে দেখিয়া তাঁহার অপ্রসন্নতা, সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁহার সেই প্রণয়গাম্ভীর্য্যমূলক। তাহার পর, সূর্য্যমুখী গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ অপ্রমাণিত করিলে কমল যখন কান্না ও হাসির মধ্যে শাঁখ বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন কেবল যে তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীর প্রতি প্রণয়াতিশয্য চরম বিকাশ লাভ করিল, তাহা নহে, তাঁহার সরল আনন্দময় প্রকৃতিরও অতি প্রদীপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই প্রসঙ্গেই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কুন্দের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে কমলমণি ও সূর্য্যমুখীর উচ্চৈঃস্বরে রোদন এই রমণীদ্বয়ের হৃদয়রত্নের কম উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে নাই। কমলমণি কাহাকে না ভালবাসিতেন!

সূর্য্যমুখী কাহাকে না ভাল বাসিতে পারিতেন! কুন্দ স্বামীর হৃদয়াধিকারিণী, কুন্দের জন্য তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব, তাঁহার একমাত্র চিন্তার বস্তু, সুখের উপকরণ, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া, সূর্য্যমুখী দেশত্যাগিনী পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছিলেন, সেই কুন্দের জন্য তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে রোদন, সেই কুন্দের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি বলিতেছেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম আমার কপালে এক দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?" হৃদয়ের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যে এরূপ কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীচরণ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ নারীদেহের নানা অঙ্গের সুষমা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সকল অঙ্গের ভিত্তিভূমি শান্তিপ্রদ চরণকমলের সৌন্দর্য্য ও মহিমা-কীর্ত্তন একমাত্র ভারতবর্ষেরই একান্ত বিশেষত্ব। অন্যান্য দেশের সুকুমার সাহিত্যে মরাল-গ্রীবা, নীলাম্বুনেত্র, অরুণগণ্ড এবং মধুর বিম্বাধরের প্রশংসার অভাব নাই, কিন্তু সেখানে শ্রীচরণের "থল কমল শোভা" উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবর্ষীয় শ্রীচরণের "হৃদয়-পাবক" অলক্তরাগ অথবা ভারতবাসীর প্রকৃতিগত ভক্তিরস এই চরণমহিমার মূলকারণ কি না জানি না, কিন্তু শ্রীচরণের মহিমা ভারতবর্ষে যেমন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত এমন আর কোথাও নহে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কবি পর্য্যন্ত সকলেই এই মন্ত্রের উপাসক। বাঙ্গালার বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কেহই এ বিষয়ে ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই।

সুবিমল নখরসংযুক্ত শ্রীচরণ দেখিয়া কেহ বা বিস্ময়ে গাহিয়াছেন—

"কমল যুগল পর চাঁদক মাল।"

কেহ গাহিয়াছেন—

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥"

কেহ বলিয়াছেন—

"উরুযুগ কদলী করিবর কর জিনি
স্থল পঙ্কজ পদ পাণি
নখ দাড়িম বীজ ইন্দু বরণ জিনি
পিক জিনি অমিয়া বাণী।"

কেহ গাহিয়াছেন—

"যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলি দেখিয়া
কটুগন্ধ সার করে নীরস হইয়া।"

কেহ গাহিয়াছেন—

"অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা ল'য়ে
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হ'য়ে।"

কেহ বা নির্ব্বাক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন—

"কোমল চরণ তলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হ'য়ে ছিল ?"

এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আকুল কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি
শৌর্য্যবীর্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে,
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে!"

এবং কেহ বা তাহাতেও তৃপ্তি না পাইয়া ভক্তির আকুল উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"কাজ কি আমার কাশী ?
শ্যামাপদ কোকনদে গয়া গঙ্গা বারাণসী !"

শ্রীচরণের এমন অপূর্ব্ব মহিমা-সঙ্গীত জগতের অন্য কোন সাহিত্যে দুর্ল্লভ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে ভারতের এই সনাতন মহিমা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল।

পাশ্চাত্যশিক্ষাবিকৃত সমাজ পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর কিছুদিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের বিদুষী পত্নী স্ত্রীলোকের পাদুকা ব্যবহারসম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া আমাদের অধিকতর সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পণ্ডিতমহাশয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন যে পুরুষগণের "স্থল কমল" শোভাদর্শনের মূঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং রমণীমণ্ডলীর অলক্তক-রঞ্জিত চরণকমলের শোভাপ্রদর্শনের শূন্য-গর্ভ গর্ব্বই রমণীজাতির পাদুকা পরিত্যাগের কারণ।

আমরা চরণকমলের চিরভক্ত হিন্দুজাতি -যাহাদের আদর্শ দেবতা "উদার পদপল্লব" মস্তকে ধারণ করিয়া চরণের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন—আমরা পাশ্চাত্য-আদর্শ-অনুপ্রাণিত শিক্ষিত সমাজের অনুরোধ গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবীণা পণ্ডিত-মহাশয়ার প্রবল অনুযোগ আমাদের কথঞ্চিৎ নিরুত্তর করিয়াছিল। তাই আজ সহসা সুশিক্ষিত পশ্চিমের দূরপ্রান্ত হইতে অপ্রত্যাশিত অভয়বাণী শুনিয়া আবার বহুকাল পরে আমাদের "নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠা" আশা "সন্ধুক্ষিত" হইয়া উঠিতেছে

যে পশ্চিম আপনার বিষময় প্রভাবে আমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছিল, সে-ই আজ আবার আমাদের রক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করিয়া দীনবন্ধুর অমর বাণীকে পূর্ণ সার্থকতা দান করিয়াছে !

আমেরিকার "ইলিনয়" প্রদেশের স্ত্রীলোকদের শ্রীচরণসম্বন্ধে বহুদিন হইতে কিছু খ্যাতি আছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তাঁহাদের মত দৈর্ঘ্যপ্রস্থবিশিষ্ট শ্রীচরণ না কি দুর্লভ ! শ্রীচরণ-মর্য্যাদাভিজ্ঞ পাশ্চাত্য সমাজে এ জন্য এতদিন তাঁহাদিগকে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

এতদিন পরে সেখানকার একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক প্রগাঢ় গবেষণা সহকারে শ্রীচরণের মহিমা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের বহুকালের কলঙ্ক বিদূরিত করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে শ্রীচরণ কেবল শরীর বহনের উপযোগী যন্ত্রমাত্র নহে; ইহা প্রকৃতি-বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক শক্তির বাচক। শ্রীচরণের দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপরেই

প্রকৃতির কোমলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, এবং চিত্তবৃত্তির সজীবতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহার মতে চরণদ্বয়কে উপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই বুদ্ধির তীক্ষ্নতা এবং চরিত্রের কমনীয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য অধ্যাপক মহাশয়ের মতে যতক্ষণ সম্ভব অনাবৃত পদে থাকা কর্ত্তব্য, এবং অভাবে ঢিলা খড়মের ন্যায় চটিজুতা ব্যবহার করা উচিত। ছেলেদের জুতা দিতেই নাই এবং এক জুতা উপর্য্যুপরি দুইদিন পায়ে দিতে নাই।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও শ্রীচরণের পরিণতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে অধিকাংশ লোকেরই 'বপু'র সহসা কিঞ্চিৎ 'প্রকর্ষ' ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে চরণদ্বয়কে পরিপুষ্ট করিয়া না রাখিলে এ বয়সে শরীর বহন কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইয়া উঠে। সুতরাং শ্রীচরণ নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে।

পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে এই অভয়বাণী শুনিয়া তাই আবার আশা হইতেছে যে, এখনো আরও কিছুকাল ধরিয়া "চরণ-যাচক" "হৃদয়পাবক" রূপে প্রেমিকের হৃদয় দগ্ধ করিবে, কবি স্খলিত চরণে স্থলকমলের শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন, ভক্ত 'কোমল' বলিয়া "কমল পায়' শরণ লইয়া কৃতার্থ হইবে এবং ভগবানের বক্ষস্থল হইতে "ভৃগুপদচিহ্ন" আরও কিছুকাল বিলুপ্ত হইবে না।

অধ্যাপক মহাশয়ের অভয়বাণী সার্থক হউক। ভারতের কলকণ্ঠ হইতে "উদার পদপল্লবের" সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া জগতের অন্যান্য জাতি চরণের মর্য্যাদা উপলব্ধি করুক, চীনের পীতচরণ হইতে কাষ্ঠপাদুকার কঠোর নিগড় খসিয়া যাক, এবং ইউরোপের সংকীর্ণ পাদুকা আপনার ক্ষুদ্র বক্ষ হইতে শ্বেত শতদল বিমুক্ত করিয়া দিক, আমরা চরণভক্ত হিন্দুজাতি শ্বেত, পীত নানা বর্ণের শ্রীচরণে অলক্তের অরুণরাগ দেখিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীশ্রীচরণ দাসগুপ্ত।

বিলাতে সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষা

আমাদের দেশে যাঁরা জোর করিয়া সকল লোককে স্কুলে পাঠাইয়া বর্ণজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁরা যদি বিলাতে কি কারণে ও কিরূপ অবস্থাধীনে এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এটী একবার তলাইয়া দেখেন, বড়ই ভাল হয়। কারণ বিলাতে যেরূপ বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার অনুরূপ বিধান এ দেশে প্রবর্ত্তিত করা যে এখন অসঙ্গত ও অসম্ভব, উভয় দেশের সমাজ-প্রকৃতির ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহা অতি সহজেই বোঝা যাইবে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ আমাদের সমাজে এরূপ জবরদস্তির বর্ণজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কোনো অপরিহার্য্য প্রয়োজন এখনো উপস্থিত হয় নাই। আর যে সামান্য

পরিমাণ লোকের বর্ণজ্ঞান জন্মিবার প্রয়োজন আপনারা অনুভব করিতেছেন,সেই পরিমাণে এ শিক্ষাও আপনা হইতেই দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তার জন্য কোনো প্রকারের জোরজবরদস্তি করা একান্তই অনাবশ্যক। আজ আমাদের এই বাংলা দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যে পরিমাণ লোকে লেখাপড়া জানেন, বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তত লোকে জানিতেন না। আবার দশ বৎসর পরে এই বর্ণজ্ঞান আরও যে অনেকটা ছড়াইয়া পড়িবে, তারও কোনো সন্দেহ নাই। আর এই অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে আপনা হইতেই যখন দেশের অধিকাংশ লোক বর্ণজ্ঞ হইয়া উঠিবেই উঠিবে, এবং এই বর্ণজ্ঞানের যা' কিছু ফলাফল তাহা লাভ করিতে পারিবে, তখন অমন রাতারাতি তাদের গলায় দড়ি দিয়া স্কুলে টানিয়া আনিবার জন্য কোনো ব্যাকুলতার কারণ দেখা যায় না। দেশের সাধারণ লোকের এরূপ লেখাপড়া শিক্ষার পক্ষে যদি কোথাও কিছু অন্তরায় থাকে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে দূর করিয়া দাও। যে গ্রামে স্কুল-পাঠশালা নাই, সেখানে এগুলি স্থাপিত কর। যারা স্কুল-পাঠশালায় আপনা হইতে পড়িতে আসিতে চায়, প্রয়োজন হইলে, তাহাদিগকে পাঠ্য পুস্তকাদি কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা কর। দিনের বেলায় যারা আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে বলিয়া, পাঠশালায় আসিতে পারে না, তাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কর। যারা পাঠশালার অতি সামান্য বেতন পর্য্যন্ত জুগাইতে পারে না, তাদের বিনা বেতনে পড়িতে দাও। সাধারণ বয়স্থ লোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য কথকতা, ছায়াবাজি, বায়স্কোপ, এ সকলের ব্যবস্থা করিয়া, বিনা বর্ণজ্ঞান-শিক্ষায় যাহাতে তাহাদের চিন্তা ও ভাব বাড়িয়া উঠিতে পারে, তার আয়োজন কর। কিন্তু যার যে বিষয়ে রুচি জন্মায় নাই, যার এই বর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিবার সঙ্গতি নাই, তাহাকে আইনের ভয় দেখাইয়া, রাজবিধানের ও রাজদণ্ডের শাসনে জোর করিয়া পাঠশালায় আনিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই ফলিবার সম্ভাবনা বেশি। আর এই কুফলের আশঙ্কাতেই এই উদ্ভট ও অনুকরণপর সংস্কার-প্রয়াসের প্রতিবাদ করা হয়; নতুবা দেশের জনসাধারণে চিরদিন অজ্ঞ হইয়া থা'ক, ইহা যেমন সংস্কারকেরা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, যাঁরা তাঁদের এই চেষ্টার প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তাঁরাও ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় ভাবেন না ও বলেন না।

বিলাতে কিছুকাল হইতে যে জবরদস্তির সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারও যে কোনো কুফল ফলিতেছে না, এমন নয়। চৈত্রের সংখ্যার বঙ্গদর্শনে এ সকল কুফলের কতকটা আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও এই জোরজবরদস্তি না করিলেই, বোধ হয়, ভাল হইত। তবে বিলাতী সমাজের প্রকৃতি যেরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে যে ভাবে, নানা কারণে, পরিবারের স্নেহের সম্বন্ধসকল কতকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আর সর্ব্বোপরি

সে দেশের জনগণমধ্যে অমিতাচার যে আকারে কিছুদিন পূর্ব্বে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সকল সময়ে কেবল পিতামাতার সহজ স্নেহমমতার উপরেই সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাদীক্ষার ভার ফেলিয়া রাখা হয় ত সঙ্গত হইত না। সে অবস্থায় গরিব গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় হয় ত অল্পবয়সে রাজপথকে আশ্রয় করিয়াই দিন কাটাইত, এবং তাহার ফলে,বয়োবৃদ্ধিসহকারে শুণ্ডিকালয়কেই আশ্রয় করিয়া জীবনক্ষয় করিত। বিশেষতঃ সে দেশে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমে এতটাই বাড়িয়া পড়িতেছিল যে,অনেক সময় মিতাচারী পিতামাতার পক্ষেও আপন আপন জীবিকা-উপার্জ্জনের চেষ্টায় বিব্রত থাকিয়া, তার উপরে আবার ছোট ছোট শিশুদিগের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। বিলাতের গরিব লোকেরাই খাটিয়া খায়, আর আমাদের গরিব লোকেরা বিনা খাটুনিতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে, তাহা নয়। আমাদের গরিবদিগকেও খুবই খাটিতে হয়। তবে আমাদের খাটুনির ক্ষেত্র ও ধরণ, বিলাতের গরিব লোকদিগের খাটুনীর ক্ষেত্র ও ধরণধারণ হইতে স্বতন্ত্র। বিলাতে গরিব লোকদিগকে কলের বা খনির মজুরী করিতে হয়। প্রত্যুষে ৬৷৹টা কি ৭টা হইতে ১২টা কি ১২৷৹টা পর্য্যন্ত, ও আবার ১টা কি ১৷৹টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা কি ৫৷৹টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই সকল কারখানায় যাইয়া খাটিতে হয়। সুতরাং কার্য্যতঃ সমস্ত দিনের মধ্যে তারা আপনাদের সন্তানসন্ততির মুখ একবারও দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত অনেক সময় পায় না, তাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা তো দূরের কথা। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে সারাদিনের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পয়সা দিয়া কোনো ধাত্রীর হাসপাতালে,—ইংরেজিতে এ গুলিকে বেবি-ফারম্ (Baby-Farm) বলে,—রাখিয়া যায়,সন্ধ্যাবেলা কলকারখানা হইতে ফিরিবার সময় আবার বাড়ী লইয়া আসে। আর যারা একটু বয়স্ক, পূর্ব্বে অনেক সময়ই তাহাদিগের হাতে দুপ্রহরের আহারের জন্য একটা দুটা পয়সা দিয়া, একরূপ রাস্তায়ই ছাড়িয়া যাইত। সুতরাং এই অবস্থায় তাদেরে জোর করিয়া স্কুলে লইয়া গিয়া, সেখানে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থাতে অনেক লোকেরই কতকটা সুবিধা হইয়াছিল। এই সুবিধাটুকু না হইলে, বিলাতের লোক-মত, কেবল কতিপয় সংস্কারকের সাধু ইচ্ছার ও উন্নত আদর্শের চরিতার্থতার জন্য, এই জবরদস্তির লেখাপড়ার ব্যবস্থার সমর্থন করিত না। কিন্তু আমাদের দেশের এরূপ অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমাদের দেশের গরিব লোকদের জীবিকা-উপার্জ্জনের চেষ্টায় পারিবারিক জীবনটা এখনো এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় নাই। আমাদের সমাজের গরিব স্ত্রীলোকেরাও খাটিয়াই খায়; কিন্তু এখনো কি পুরুষ কি স্ত্রী, কাহাকেই কলকারখানার জেলখানায় যাইয়া দিনের ১০।১২ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিয়া, প্রতিদিনের অন্নমুষ্টি সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরুষেরা বাহিরে যাইয়া খাটে, স্ত্রীলোকেরা হয় নিজের ঘরে বসিয়া না

হয় অতি নিকট প্রতিবেশীদের বাড়ীতে যাইয়া সামান্য শ্রম করিয়া, পরিবারের তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। এরূপ প্রকারের খাটুনির ব্যবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে বেবী-ফারমে (Baby-Farm) কিম্বা অল্পবয়স্ক বালকবালিকা-দিগকে পথে ঘাটে রাখিয়া যাইতে হয় না। সুতরাং লেখাপড়া শিক্ষা করা ছাড়াও যে আর একটা প্রয়োজনে বিলাতে এই জবরদস্তির বর্ণজ্ঞানদানের ব্যবস্থা লোক-মতের দ্বারা সমর্থিত হইয়া, দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে প্রয়োজন আমাদের সমাজে এখনো উপস্থিত হয় নাই। আর যে অনুকরণলিপ্সা এই সংস্কারচেষ্টার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ইহাতে একটা কৃত্রিম শক্তি সঞ্চার করিতেছে, তাহা যদি যথা-সময়ে প্রতিহত ও উন্মূলিত হইয়া যায়, এবং বিলাতের দেখাদেখি, রাতারাতি ধনী হইয়া উঠিবার লালসায় আমরা যদি এদেশেও কলকারখানা বসাইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া না বসি, তবে, ঈশ্বর-কৃপায়, হয় ত কখনোই আমাদের সমাজে এই "সর্ব্বনেশে" প্রয়োজন উপস্থিত হইবে না।

অতএব ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব যে বিলাতে যে জবরদস্তির সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে কেবল একদল ইংরেজ সমাজসংস্কারকের দেশহিতৈষা ও লোকহিতৈষার আতিশয্যই বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু সমাজের ভিতরকার কতকগুলি অপরিহার্য্য প্রয়োজনও বিদ্যমান ছিল। বহুকাল ধরিয়া বিলাতের সমাজের প্রকৃতি এমনি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল, সে দেশের পারিবারিক ও স্নেহমমতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও বন্ধন সকল এমনি ভাবে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা ও পণ্য-উৎপাদন-প্রণালী এমনি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, ব্রিটিশ জাতির রাষ্ট্রব্যবহার ও ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন এমন একটা পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সে পথের অপরি-হার্য্য প্রয়োজনের অনুরোধে, সে দেশে এই জবরদস্তির লেখাপড়ার বিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। ফলতঃ বিলাতের এই সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থাটী, নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে, একাকী দাঁড়াইয়া আছে, এমনো নয়। তার সমজাতীয় আরো দশটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মাঝখানে, সে সকল বিধিব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই, সেখানে এই বিশেষ বিধানটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থার দরুণ, প্রতিদিনও আরো কতকগুলি নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। এ সকল অভিনব বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলে, সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষাবিধিও আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। আর বিলাতী সমাজের ভিতরকার ও চারিপাশের যে সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে বিলাতের সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহার বিচার না করিয়া, কেবল একটা নির্গুণ সংস্কারলিপ্সার চরিতার্থতার জন্য, বিলাতের অনুকরণে, আমাদের এখানে এই জবরদস্তির বর্ণশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে, সমাজে অকারণ

একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত এবং দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনর্থক কতকগুলি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইবে। আর এই জন্যই এই উদ্দাম সংস্কারচেষ্টাকে সর্ব্বপ্রযত্নে সংযত করা আবশ্যক।

আমাদের সমাজের প্রকৃতির ভিতরে ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা হইতে, বিলাতের মতন জোর করিয়া দেশের সকল বালকবালিকাকে স্কুলে পাঠাইবার যে কোনো অপরিহার্য্য প্রয়োজন এখনো উপস্থিত হয় নাই, এ কথা এই সংস্কারের প্রবর্ত্তক ও পরিপোষকগণও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফলতঃ যাঁহারা এই বিলাতী আইন আমাদের দেশের গরিব লোকদের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনো বিশেষ সামাজিক প্রয়োজন দেখাইতে পারেন নাই। লেখাপড়া শিখিলে সাধারণভাবে মানুষের কি কি উপকার হইয়া থাকে, এ সকল কথাই সর্ব্বদা শুনিয়া থাকি। এ সকল কথা তো কেহ অস্বীকারও করে না। কিন্তু শুদ্ধ এই সকল সাধারণী যুক্তির বলেই বিলাতে বা অন্য কোনো দেশে জোর করিয়া দেশের সকল লোককে লেখাপড়া শিখাইবার বিধান প্রচলিত হয় নাই। পাণ্ডা-পাদ্রিদের এ সকল অভ্যস্ত বুলী বক্তৃতার বকুনীরূপেই বিশেষ কাজে আসে; এ সকলের জোরে কোনো বিরাট-সমাজ আপনার স্বাভাবিক গতিবেগকে বাড়াইয়াও দেয় না, চাপিয়াও রাখে না। ফলতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো জীব আপনার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের প্রেরণা ব্যতীত, কেবল একটা বড় উপদেশ শুনিয়া বা অতি উচ্চ আদর্শ দেখিয়া, কোনো বিষয়ে আপনার শক্তি প্রয়োগ করে না। যতক্ষণ না জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনো কিছু গ্রহণ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, কোনো জীব ততক্ষণ সে বিষয়ে চেষ্টিত হয় না। এইরূপ সমাজ-জীবও অপরিহার্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে চাহে না। কোনো বিশেষ সাধনা আয়ত্ত করা, কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা, কোনো প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে পরিহার করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, এ সকল যতক্ষণ কোনো সমাজের পক্ষে জীবন-মরণের কথা না হইয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ সে সমাজ কখনো সে সকল বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া, আপনার দেহের বোঝা ও কর্ম্মের দায় খামাকা বাড়াইয়া তোলে না।

নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, রাজপুতদিগের কন্যাহত্যা প্রভৃতি মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর কতকগুলি প্রথা ইংরেজ সরকার জোর করিয়াই তুলিয়া দিয়াছেন; দেশের লোকের মত গ্রহণ করিয়া এ সকল নিষেধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হইতেই পারিত না। অতএব জোর করিয়া এখন যদি সকলকে স্কুলে পাঠানোই হয়, কিছু দিন পরে, লোকমতে ও সমাজের অভ্যাসেতে এই ব্যবস্থাটী যখন স্থায়িত্ব লাভ করিবে, তখন জবরদস্তির দরুণ যে অসুবিধা ও অমঙ্গলটুকু আপাতত হইতেও বা পারে, তাহার আর কোনে

আশঙ্কা থাকিবে না, কেহ কেহ এইভাবে এই সংস্কার-চেষ্টার সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, এ সকল প্রথা কখনো সমাজের সর্ব্বজনকে বা অধিকাংশ লোককে স্পর্শ করে নাই। অন্যদিকে অনেকের সহজ-মানুষী বুদ্ধি ও সহৃদয়তাই এ সকল প্রথার স্বল্পবিস্তর বিরুদ্ধাচরণ করিত। এ সকল প্রথা রহিত হইয়া, সমাজের ভিতরে সাক্ষাৎভাবে এমন কোনো প্রকারের পরিবর্ত্তন আনয়ন করে নাই, যে পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজ-প্রকৃতির বা সাধারণ সামাজিক রীতিনীতির কোনো বিশেষ ও স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জোর করিয়া সকল বালকবালিকাকে স্কুলে আনিবার ব্যবস্থা এ জাতীয় নহে। সুতরাং নরবলি, সতীদাহ, প্রভৃতির নজীর এখানে একেবারেই খাটে না।

কিন্তু এই সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে বিলাতের সমাজ-প্রকৃতির ও সামাজিক অবস্থার যেমন ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, তাহার আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও ইহার সেইরূপ সম্বন্ধই রহিয়াছে। আর বিলাতে এই সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যে উদার রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সে নীতির প্রতিষ্ঠা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ লোকাহিতার্থে কিছুতেই বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রত্যেক রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তির কতকগুলি মুখ্য আর কতকগুলি গৌণ কর্ত্তব্য আছে। প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা এবং স্বরাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রশক্তির বা পররাষ্ট্রপতির আক্রমণ ও উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া, প্রজাসাধারণের স্বাভাবিক স্বত্বস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই প্রত্যেক রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রথম কর্ত্তব্য। জাতির রাষ্ট্রশক্তি যে আকারেই সংঘটিত হউক না কেন, তাহা কোনো সেনাপতি বা লোকপতিকেই আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করুক, কিম্বা কোনো বিশেষ অভিজাত শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করুক, অথবা দেশের আপামর সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহা রাজতন্ত্রই হউক আর প্রজাতন্ত্রই হউক, স্বেচ্ছাতন্ত্র বা অটক্র্যাটিকই (autocratic) হউক, কিম্বা প্রজাতন্ত্র বা ডিমক্র্যাটিকই (democratic) হউক, সকল অবস্থাতে ও সকল আকারেই প্রত্যেক রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বাদৌ এই মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর হইতেই হয়। যেখানেই কোনো রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি এই মুখ্য কর্ত্তব্য পালনে অপারগ বা পরাঙ্মুখ হয় সেখানেই সমাজস্থিতি রক্ষা পায় না, সমাজ বিপ্লবের মুখে যাইয়া পড়ে, রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, ও সমাজরক্ষার জন্য নূতন ব্যবস্থার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের জ্ঞানোন্নতি-বিধান, রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও রাষ্ট্রশক্তির একটা মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয় না। যেখানে রাষ্ট্রীয় সেনাগণের গতিবিধির জন্য ও পররাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ ও উৎপাত হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য রাজপথ

নির্ম্মাণ করা অনাবশ্যক, সে সকল স্থলে কেবল প্রজাগণের গতিবিধির বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এ সকল পথ বা পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করা, দেশের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় হইলেও, রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার বা আর্থিক উন্নতির বা জ্ঞানলাভের জন্য নানাবিধ সময়োপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন এবং অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, এ সকলই রাষ্ট্রের গৌণ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। আর যতদিন না রাষ্ট্রশক্তি স্বল্পবিস্তর পরিমাণে প্রজাসাধারণের হস্তগত হইয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না দেশের শাসন-ব্যবস্থা একান্তই নিয়মতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত কোনো সমীচিন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ই পরকরায়ত্ত রাষ্ট্রশক্তির হস্তে এ সকল গৌণ কর্ত্তব্য পালনের গুরুভার অর্পণ করিতে অগ্রসর হন না। যতদিন পর্য্যন্ত বিলাতের রাষ্ট্রশক্তি সম্যকরূপে প্রজাসাধারণের হাতে আসিয়া পড়ে নাই, যতদিন পর্য্যন্ত একদিকে রাজার অধিকার ও অন্যদিকে প্রজার স্বত্ব-স্বাধীনতা, এ দু'এর মধ্যে একটা নিত্য বিরোধ ও প্রতিযোগিতা জাগিয়া ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত কোনো সমীচিন ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিক রাষ্ট্রশক্তির বা রাজশক্তির হাতে লোকশিক্ষার ভার এমনভাবে অর্পণ করিয়া, দেশে আইনের জোরে সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন নাই লোকশিক্ষা যার হাতে থাকে সে-ই কালক্রমে দেশের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিতে পারে। রাজা-প্রজার স্বত্বস্বার্থের সম্পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততদিন রাজশক্তির হস্তে একান্তভাবে লোকশিক্ষার ভার অর্পিত হইলে, সে রাজ্যে প্রজার স্বত্বস্বাধীনতার সম্প্রসারণ অসাধ্য না হইলেও নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। আমাদের ইংরেজি-নবিশ রাষ্ট্রনীতিকেরা বিলাতের লিবারেল সম্প্রদায়ের দিব্যি দিয়া সকল কাজই করিতে চান, কিন্তু তাঁদের নকলনবিশী রাষ্ট্রবুদ্ধিতে এই সামান্য তত্বটী ধরা পড়ে না। যতদিন ইংলণ্ডে রাজার অধিকার ও প্রজার স্বত্বস্বাধীনতার মধ্যে একটা বিরোধ ও প্রতিযোগিতা জাগিয়া ছিল, ততদিন যে বিলাতের লিবারেল সম্প্রদায় রাজশক্তির আধিপত্যকে প্রতিহত করিবার জন্য, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে তাহার মুখ্য কর্ত্তব্যের গণ্ডি অতিক্রম করিতে দেন নাই, প্রজার ধনপ্রাণ ও পররাষ্ট্রের আক্রমণ ও উপদ্রব হইতে স্বরাষ্ট্রকে রক্ষা করা ব্যতীত, আর প্রায় কোনো কার্য্য যাহাতে তাহার হস্তগত না হয়, প্রাণপণে তার চেষ্টা করিয়াছেন; এই অতি সামান্য কথাটা ইঁহারা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যান। আর এই জন্যই যে বুরোক্র্যাসির (Bureaucracy) বা রাজকর্ম্মচারী-তন্ত্রের হস্ত হইতে দেশের প্রজাসাধারণের স্বত্বস্বাধীনতাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁরা কালে অকালে এমন আন্দোলন আব্দার করিয়া থাকেন, সেই বুরোক্র্যাসির হাতেই একান্ত ভাবে আবার লোকশিক্ষার অধিকারটী তুলিয়া দিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন।

ফলতঃ রাষ্ট্রশক্তিপ্রয়োগে, বিধিব্যবস্থার

জোরে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বর্ণজ্ঞান প্রচার করিবার বিধান যে সাধারণ রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইংরাজিতে তাহাকে ষ্টেট্ সোসিয়্যালিজম (state socialism) বলে। যে বিশেষ সমাজ-নীতি য়ুরোপে সোসিয়্যালিজম্ (socialism) নামে প্রচারিত হইতেছে, এই ষ্টেট্ সোসিয়্যালিজম (state socialism) তাহারই অন্তর্গত। মোটামোটি সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় এই বলেন যে, যে সকল বিষয়ের উপরে সমাজের জনগণের জীবন ও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যসাধন একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে, সে সকল বিষয়কে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের অপরিহার্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিয়া, সমাজের সর্ব্বসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ যে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি তারই হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা কোনো বিশেষ পরিবারের বা সম্প্রদায়ের কোনো প্রকারের বিশেষ দাওয়াদাবী থাকিবে না। মানুষের বাঁচিবার জন্য তিনটী বস্তুর ঐকান্তিক প্রয়োজন হয়। এক বায়ু, দ্বিতীয় জল ও তৃতীয় মাটী বা জমি। এই তিন বস্তুর দুইটী সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, এ দুটীর উপর কারো কোনো বিশেষ অধিকার নাই। জল ও হাওয়ার জন্য, মোটের উপরে, কেহ কোনো খাজানা দাবি করিতে পারে না। কিন্তু জমির অবস্থা স্বতন্ত্র। য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই জমিটা বিশেষ বিশেষ জমিদারের সম্পত্তি। এ জমির উপরে সর্ব্বসাধারণের কোনো অধিকার নাই। যার যেমন প্রয়োজন সে সেরূপভাবে এই জমি ব্যবহার করিতে পারে না। জমিদারের খুসিমত, তাহাকে খাজনা দিয়া তবে লোকে সে জমিতে বসবাস ও সে জমির চাষ করিয়া তাহা হইতে আপনার খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। সোসিয়ালিষ্টগণ বলেন, এ জমিতে জমিদারের কোনো অধিকার থাকিবে না। জমি সাধারণের সম্পত্তি হইবে, আর রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি যখন জনসমাজে জনসাধারণের একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হইয়া আছে, তখন জমির সর্ব্ববিধ স্বত্ব এই রাষ্ট্রশক্তিরই থাকিবে। জমির খাজানা কোনো ব্যক্তি বিশেষে দাবী করিতে পারিবেন না; জমিতে যদি কোনো গাছপালা বা খনি থাকে, সে ধনও রাষ্ট্রেরই হইবে, জমিদার আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না। আর শুধু জল ও বায়ুর উপরে সাধারণের অধিকার থাকিলেই তো হয় না। এ জল বিশুদ্ধ, পানের উপযুক্ত, ও স্বচ্ছন্দে পাওয়া যায়, এমন করা চাই। আর হাওয়াটাও যাতে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সুতরাং এ সকল কাজও রাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পর, কেবল জমি, জল, ও হাওয়াতেও মানুষ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জমি হইতে পণ্য উৎপন্ন হয়। এ সকল পণ্য উৎপাদনের প্রকৃষ্টতর উপায় উত্তরোত্তর উদ্ভাবিত হইয়া, সমাজের ধনীদের হাতে একটা বিপুলশক্তি ও সাংঘাতিক অধিকার অর্পণ করিতেছে। সাধারণ জনগণ ইঁহাদের কলকারখানায় যাইয়া খাটিয়া প্রাণান্ত হয়, কিন্তু তাহাদের পরিশ্রমের সমুদয় ফল তাহারা নিজেরা

উপভোগ করিতে পায় না। ধনীর মুনফার আকারে সে কলের অনেকটাই তাঁহাদেরই করকবলিত হইয়া পড়ে; জনেরা শুদ্ধ পারিশ্রমিক মাত্র পাইয়া, কায়ক্লেশে জীবন-ধারণ করে। এ ব্যবস্থাও রদ হওয়া আবশ্যক। যেমন সকল কার্য্যের মূলাধার যে জমি, তাহা কাহারো বিশেষ স্বত্বাধীন থাকিবে না, সেইরূপ এই সকল পণ্য উৎপাদন করিবার যন্ত্রতন্ত্রেও কাহারো বিশেষ স্বত্ব বা অধিকার থাকিবে না। এ সকলও রাষ্ট্রেরই অধীন হইয়া, সর্ব্ব-সাধারণের কাজে আনা চাই। সমাজের এক দল লোক খাটিয়া মরিবে, আর একদল অতি মুষ্টিমেয় লোক খাটিবেন না, অথচ সাধারণ লোকের শ্রমের অধিকাংশটাই আত্মসাৎ করিবেন, এ ব্যবস্থা ন্যায়ানুমোদিত নহে, ইহারও পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। পণ্য উৎপাদনের উপায় সকলও (ইংরেজীতে ইহাকে instruments of production বলে) জনসাধারণের যে রাষ্ট্রশক্তি তারই কর্ত্তৃত্বাধীনে ও অধিকারে থাকিবে। উৎপন্ন পণ্যের মুনাফা কোনো ব্যক্তি বিশেষে বা সমবায় বিশেষে দাবী করিতে পারিবে না। যে পণ্য হইতে যেরূপ মুনাফা হইবে, তাহার কিয়দংশ রাষ্ট্রের সাধারণ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, আর বাকী সমটাই শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কেবল জমি বা কলকব্জাতেই তো আর পণ্য উৎপন্ন হয় না। তার জন্য মানুষের শক্তি-সাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিরও তো একান্তই আবশ্যক। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি-সাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি বাড়াইবার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক, রাষ্ট্রশক্তিকে তাহাও করিতে হইবে। যেমন জমির খাজানা বলিয়া একটা কিছু কাহাকেও দিতে হইবে না, কলকারখানার মুনাফা বলিয়া কেহ এই সকল কল-কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের কোন একটা ভাগ নিজেরা লইতে পারিবে না, সেইরূপ জনগণের শক্তিসাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশের জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা আবশ্যক হয়, তাহার জন্যও কেহ কোন টাকা দাবি করিতে পারিবে না। সকলেই কিছু না দিয়া এই সকল বিধিব্যবস্থার সাহায্যে যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিতে পারিবে। সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের এই মত। বিলাতে বা অপর কোথাও সম্পূর্ণভাবে এ মত এখনো গৃহীত হয় নাই। কিন্তু ক্রমেই যে এ সকল সিদ্ধান্ত য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষা বিলাত প্রভৃতি দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এই সোসিয়ালিষ্ট নীতিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিরই ইংরাজি নাম ষ্টেট সোসিয়ালিজম (state socialism) এই ষ্টেট সোসিয়ালিজম য়ুরোপে প্রজা-সত্ত্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রজাসাধারণের সুখ-সুবিধা-বৃদ্ধির কিম্বা শিক্ষা-দীক্ষা বিধানের জন্য যত কিছু বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার প্রায় সকলগুলিই এই রাষ্ট্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রজাসাধারণে

কেবল আপনাদের সন্তানসন্ততিগণের লেখাপড়ার ভারই রাষ্ট্রশক্তির হাতে দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বার্দ্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় যখন তাহাদের আর খাটিয়া খাইবার শক্তি থাকিবে না, তখন যাহাতে রাষ্ট্রের কোষাগার হইতে সকলেই একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইতে পারে, তারও ব্যবস্থা করিয়াছে। এই নূতন বার্দ্ধক্যের পেন্সনের ব্যবস্থা অনুসারে, ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ইংরেজই, তার জীবিকার অন্য উপায় না থাকিলে, সপ্তাহে পাঁচশিলিং বা ৩৷৷০ আনা হিসাবে আমরণ কাল পর্য্যন্ত পেন্সেন পাইতেছে। এই সম্প্রতি যে ইনস্যুয়র‍্যান্স আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মক্ষম লোকও যখন ব্যায়ারামে পড়িয়া, কিম্বা কর্ম্মের অভাবে উপার্জ্জন করিতে অপারগ হইবে, তখন তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। যেমন সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থা, তেমনি বার্দ্ধক্যের পেন্সেনের বিধান এবং এই নূতন ইন্‌স্যুয়র‍্যান্স আইন (Insurance Act) এ সকলই একই সাধারণ রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত। আর বিলাতে এই নীতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দেশের সকল বালকবালিকাকে স্কুলে লইয়া গিয়াই ব্রিটিশরাজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। এরূপ জোর-জবরদস্তির ফলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাইতেছে বটে, কিন্তু পিতামাতা তাদের উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, বা করিতেছে না। সুতরাং এখন অনেক বালকবালিকাদিগকে সরকারের খরচে খাওয়াইবারও ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। অনেক স্থানেই অন্ততঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের দুপ্রহরের আহারের ব্যবস্থাটা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণকেই করিতে হইতেছে। কখনো কখনো তাদের ধুইয়া মুছিয়া ছেঁড়া ও নোংড়া কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া দিয়া, পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরাইয়া তবে স্কুলে রাখিতে হয়। সুতরাং কেবল বেতন না লইয়া লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থাতেই এই সংস্কারের সার্থকতালাভ হইবে না। ক্রমে অপর অনেক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত সরকার এ জন্য কবে যে এত টাকা টাকা খরচ করিতে পারিবেন, বলা যায় না। আর পারিলেও তাহা করাই কর্ত্তব্য হইবে কি না তাহাও ভাবিবার কথা। এরূপ ভাবে সন্তানগণের সকল ভারই যদি রাজা আপনার হাতে গ্রহণ করেন, তাহার ফলে দেশের লোকের সহজ সন্তান-বাৎসল্য যে ক্রমে নষ্ট হইবার কতটাই আশঙ্কা আছে ইহা ভাবিলেও ভয় হয়। মানুষের ভাল মন্দ কোন প্রবৃত্তিতেই যে নিরাকার সাধন সম্ভব নহে, আজিকালিকার দিনেও আমাদের আধুনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এ সহজ কথাটা বুঝিতেও কিছু সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

বিলাত প্রভৃতি দেশে সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষা যে বিশেষ রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত, এদেশে সে নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার সময় এখনো আইসে নাই। এই রাষ্ট্রনীতি (state socialism) প্রজাস্বত্বের সম্প্র-সারণের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপে ক্রমে তন্ঠালাভ করিতেছে। স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনে

এ নীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও কদাপি কল্যাণকর হয় না, হইতেই পারে না। আমাদের নকলনবিশী রাষ্টনীতির পক্ষে এ সহজ কথাটা বোঝাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন না শাসনযন্ত্রের উপরে শাসিতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যতদিন না শাসনকর্ত্তাগণ শাসিতের মুখাপেক্ষী হইয়া সর্ব্বদা তাদের স্বত্বস্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে শিখিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির হস্তে প্রজার পারিবারিক বা বৈষয়িক বা সামাজিক কোনো কর্ত্তব্য ও অধিকার অর্পণ করিতে যাওয়া যে একান্তই মূর্খতা, ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি ইহা চিরদিনই জানিয়াছে। আমাদের দেশে এখন জোরজবরদস্তির লেখাপড়া প্রবর্ত্তিত করিলে পুলিশের অধিকার ও অত্যাচার কতটা যে বাড়িয়া যাইবে এ কথা কি সংস্কারকেরা একটীবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন। কারণ এ আইন জারি করিবার ভার হয় পুলিশের উপরে না হয় নূতন গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভাপতির উপরেই অর্পিত হইবে। আর উভয় ক্ষেত্রেই জেলার রাজকর্ম্মচারী যিনি, তাঁরই প্রভুত্ব আমাদের শিশুগণের শিক্ষাদীক্ষার উপরেও যাইয়া পড়িবে। একদিকে যাঁরা ঢাকায় একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে আর পূর্ব্ববঙ্গের লোকশিক্ষার তত্বাবধানের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন এই কথা শুনিয়া বুরোক্র্যাসীর প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, অন্যদিকে তাঁরাই আবার জোরজবরদস্তির লেখাপড়ার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন! আমাদের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনার পশ্চাতে যে নীতি বলিয়া কোন একটা কিছু নাই, এ সকলে তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু নীতি-জ্ঞান না থাকিলেও যে বড় বড় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হইতে পারা যায়, ইহা কেবল বর্ত্তমান ভারতবর্ষেই সম্ভব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

থিয়সফি

(G. De Lafontর ফরাসী হইতে)

এক্ষণে কেবল নব-বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং যে থিয়সফি শাক্যমুনির প্রচারিত মতবাদের একটা শাখা বলিয়া দাবী করেন, সেই থিয়সফি সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকী আছে।

আমি এ স্থলে, আধুনিক থিয়সফির মত ও বিশ্বাস কি, অথবা সেই সকল মত ও বিশ্বাসের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় কি না, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; আমি শুধু আলোচনা করিব, বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থিয়সফির যে দাবী সেই দাবীর প্রকৃত কোন ভিত্তি আছে কি না।

যে দার্শনিক সম্প্রদায় হইতে এই নূতন

সম্প্রদায়টি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা মহাযান-পদ্ধতি হইতে নিঃসৃত এবং উহা যোগবাদের এক শাখা। উহা "যোগাচর্য্যা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্যিক ভারতে, দীর্ঘকাল হইতে যোগবাদসংক্রান্ত যে সকল সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, উহা তাহাদেরই এক শাখা। কিন্তু Csôma, Barnouf, Wassiljew, Schlaginweit, Wilson,—ইঁহাদের মতে, যোগাচর্য্য-পদ্ধতি, অস্মৎ-যুগের দশম শতাব্দীতে ভারত ও তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থের নাম সংস্কৃত ভাষায়—"কালচক্র" ও তিব্বতীয় ভাষায়,—"Dons Kyi Khorlo"।

এই গ্রন্থে, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, কাল-গণনা-বিদ্যা, আলোচিত হইয়াছে। উহাতে কতকগুলি দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায়। এমন কি, উহার মধ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্মেরও কথা আছে। উহা পরাৎপর আদিবুদ্ধ হইতে আবির্ভূত বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। Schlaginweit বলেন, যোগবাদ-সংক্রান্ত মুখ্য ক্রিয়াকর্ম্ম ও মূলসূত্রগুলির সহিত, সাইবিরীয়দিগের Shamanismএর আশ্চর্য্য মিল আছে। তা ছাড়া উহা অনেকটা হিন্দুদিগের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অনুরূপ। যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ত্রিলোকের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনায় বিদ্যমান্ এবং এই বিশ্বাস-অনুসারে যে কাজ করে, সে এমন কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ করে যাহা পুণ্য ও সংযম-জনিত শক্তি হইতে উৎকৃষ্ট এবং যাহার প্রভাবে সে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হয়।"

এই সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—দেব-পর্য্যায়ের চূড়াদেশে সেই পরমদেব আদিবুদ্ধের সিংহাসন অধিষ্ঠিত—যিনি অনাদি ও অনন্ত; তাহার পর, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ:—ইঁহারা দেব-শ্রেণীভুক্ত। এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের অনুরূপ পঞ্চ মানুষী-বুদ্ধ। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ স্বকীয় ধ্যান-বলে, এক একটি ধ্যানী-বোধিস্বত্ব সৃষ্টি করেন,—ইঁহাদেরও দেব-প্রকৃতি। আবার প্রত্যেক মানুষী-বুদ্ধ তিন লোকে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সেই ধ্যান-লোকে তিনি নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত; রূপ-লোকে তিনি ধ্যানী-বুদ্ধ-রূপে প্রকাশ পান; এবং কাম-লোকে তিনি মানব-আকারে আবির্ভূত হন। এইরূপ, প্রত্যেক মানুষী বুদ্ধের অনুরূপ এক-একজন ধ্যানী-বুদ্ধ ও এক-একজন বোধিস্বত্ব আছে। বর্ত্তমান যুগে, শাক্যসিংহ মানুষী-বুদ্ধ (ইনি চতুর্থ মানুষী-বুদ্ধ); তাঁহার ধ্যানী-বুদ্ধ—অমিতাভ এবং তাঁহার ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব—অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণি। এই সম্প্রদায়ের মতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন এক বিষয়ের উপর (জাগতিক ঘটনা বা তত্ত্বের উপর নহে) একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, মানুষ কতকগুলি অলৌকিক মানসিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, এবং তাহা হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া ধ্যান সমাধির চারি ধাপে উপনীত হয়; তাহার ফলে, প্রথমেই তাহার ব্যক্তিত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম সমাধির অবস্থায় উপনীত

হইতে হইলে, গোড়ায় কতকগুলি সাধন একান্তই আবশ্যক; এবং যে প্রণালীতে একাগ্রচিত্ত হওয়া যাইতে পারে "যোগাচর্য্য" তাহার উপদেশ দেয়।

পরিশেষে, "ধারণী"নামক কতকগুলি অভিচার-মন্ত্র ও যোগসাধনমন্ত্রের আবৃত্তি দ্বারা সাধক, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের সাহায্য পাইবার অধিকারী হয়। এই অভিচার-মন্ত্র ও যোগসাধন-মন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তি শীলধর্ম্ম ও সূক্ষ্ম ধ্যানসমাধি সংযুক্ত করিতে পারে, সে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে. তখন সে, —কি ধন, কি দীর্ঘ পরমায়ু, কি পর-চিত্তের উপর প্রভুত্ব এ সমস্ত ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পারে। পরিশেষে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না—সে পরমদেবের সহিত যুক্ত হয়।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই সম্প্রদায়টি আধুনিক; কেননা, উহাদের মতে, মুক্তি তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তন্ত্রশাস্ত্র, সমস্ত প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তাদিগেরই মতে, অস্মৎ-যুগের প্রথম শতাব্দীগুলির মধ্যেই ভারতে আবির্ভূত হয় এবং দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। Schlagenweit বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকতা সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে, চীন ভাষায় তান্ত্রিকগ্রন্থ অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাহার কারণ, যে সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখনও তন্ত্রশাস্ত্র আবির্ভূত হয় নাই। তবে, "ধারণী"নামক অভিচার-মন্ত্রগুলি সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কালের।

পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক পদ্ধতি হইতে আধুনিক কালে আরও যে সকল মতবাদ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে, থিয়সফি তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার থিয়সফিষ্টদিগের গ্রন্থাবলী হইতেই বিচার করিয়া দেখা যাক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত থিয়সফিষ্টদিগের কিরূপ সম্বন্ধ।

আমি কর্ণেল অল্‌কটের বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত নিতান্ত অর্ব্বাচীন ধরণের একটি প্রশ্নোত্তরমালার উল্লেখ করিব মাত্র; প্রধান-পুরোহিত সুমঙ্গলের অনুমোদিত হইলেও, এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্ত সরল নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের জন্যই রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আদিম বৌদ্ধ সূত্রগ্রন্থে উহার প্রমাণ অনুসন্ধান করা বৃথা চেষ্টা। থিয়সফিষ্টরা যে গ্রন্থকে তাঁহাদের ইমারতের সুদৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তর মনে করেন, আমি কেবল সেই গ্রন্থের উপর সমধিক নির্ভর করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ঐ গ্রন্থের নামমাত্রেই সমস্ত দ্বিধা বিদূরিত হয়—সেই নামটি—Sinnet প্রণীত "গুহ্য বৌদ্ধধর্ম্ম বা হিন্দু Positivism" গ্রন্থকার প্রথমেই এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, যে মতবাদটি তিনি আমাদের নিকট অর্পণ করিতেছেন, তাহা এরূপ গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল যে ভারতের কোন গ্রন্থে বা পাণ্ডুলিপিতে তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যদিও আমি এ স্থলে থিয়সফির সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিতে আদৌ ইচ্ছা করি না, তবে এইটুকুমাত্র আমি বলিতে চাই যে, মিষ্টার সিনেট্ যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্ত প্রাচীনকালের গুহ্য-মতবাদের

বিপরীত কথা। এ কথা সত্য, প্রাচীনকালের সমস্ত জাতিই দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রুতি-পরম্পরায় গুহ্য-মতবাদকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে উহা লিপিবদ্ধও হইয়াছিল; এইরূপ পাণ্ডুলিপি ও উৎকীর্ণ লিপি ইজিপ্‌স্থান, আসীরীয়-ব্যাবিলোনীয়, চীনীয়, হিন্দু, পারসিক, ইহুদি—এই সকল জাতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি এ কথা স্বীকার করি, উহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের চাবিটি না পাইলে, ঐ সকল পাণ্ডুলিপির অর্থ বোধগম্য হওয়া কঠিন বা অসম্ভব; কিন্তু ঐ সকল পুঁথি যে আছে এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি গুহ্য ধরণের মতবাদও যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

"গুহ্য-বৌদ্ধধর্ম্মের" গ্রন্থকার আমাদিগকে এই কথা জানাইয়াছেন যে,—তিনি তাঁহার গ্রন্থের নাম "গুহ্য-বৌদ্ধধর্ম্ম" যে দিয়াছেন তাহার কারণ,—যদিও এই গুহ্যতন্ত্রের উপদেশ বহুপ্রাচীন যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল,—কিন্তু গৌতম বুদ্ধ এই গুহ্যতন্ত্রের এতটা উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে এই গুহ্যতন্ত্র তাঁহারই নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছে।" বস্তুতঃ গুহ্যতন্ত্র অতীব প্রাচীন কালের এবং ইহাও কাহারও অবিদিত নাই যে, সেই প্রাচীন কালে, কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিরাই প্রকৃত ধর্ম্মমত জানিতে পারিত। অতএব মিষ্টার সিনেট আমাদের নিকট কিছুই নূতন বলেন নাই এবং এই কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আর তিনি যে শাক্যমুনিকে এই গুহ্যমতবাদের নবজীবনদাতা বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার সঙ্গত কোন হেতু প্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন প্রকৃত যুক্তি নাই। তিনি বলেনঃ—

"তাঁহার গ্রন্থ-প্রক্ষিপ্ত আলোকের সাহায্য ভিন্ন, প্রকৃত সত্যানুসন্ধায়ী সুধীগণ (মিষ্টার সিনেট সেই সকল সুধীগণকে সাহসী ও সামর্থ্যবান্ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন) ভারতীয় ধর্ম্মগুলিরও সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।" এই ঘোষণার পর,—সিনেট তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যে আশঙ্কা করিয়াছেন পাছে লোকে তাঁহার কথা লঘুভাবে গ্রহণ করে, সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যদি মিঃ সিনেট বড় বড় য়ুরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তা ও প্রাচ্য দেশীয় বড় বড় দার্শনিকদিগের কথা অগ্রাহ্য করেন এবং এই কথা বলেন যে, তাঁহার মতবাদগুলি কোন গ্রন্থে বা কোন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইলে তর্কের মুখ এইখানেই ত আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না, তিনি কিরূপে থিয়সফির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবেন। এই থিয়সফি কোন অলৌকিক ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতিই উহার পত্তনভূমি। তথাপি, মিঃ সিনেট আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, "এই বৈজ্ঞানিক দর্শন যাহা শিক্ষা দেয় তাহাই প্রকৃত মতবাদ, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরকার জিনিস"। আরও তিনি এই কথা বলেন যে, "গুহ্য ধর্ম্মসংক্রান্ত যত সম্মিলনী আছে, তন্মধ্যে তিব্বতের ভ্রাতৃমণ্ডলী সর্ব্বপ্রধান, তাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।" এবং সিংহলদ্বীপ "গুহ্য-বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিষিক্ত"।

আমি এক্ষণে স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিব যে সিনেটের প্রদত্ত মতবাদগুলি পূর্ব্বোক্ত তিব্বতীয় "যোগাচার্য্য" সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে নিঃসৃত। (ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক-আলোচনা

ইস্‌লাম-মহামণ্ডল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে এ সব বিষয়ের কোনও অনুভূতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ এই আন্দোলনটাই অনেক পরিমাণে কেবল কলিকাতার গুটিকয়েক নেতৃগণের বিশেষ চেষ্টাতেই এখানে জাগিয়া রহিয়াছে। মফঃস্বলে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, বড়লাট বাহাদুরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে লোক-নায়কগণের মোটামুটি সহানুভূতিই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের নেতৃবর্গ, ঢাকায় একটা নূতন টিচিং ও রেসিডেন্‌শিয়েল ইউনিভারসিটী (Teaching and Residential University) যদি হয়, তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, এ কথাই বলিয়াছেন। এই জন্য কলিকাতায় সে দিন টাউনহলে যে সভা হয়, প্রথমতঃ তাহার মন্তব্যের পাণ্ডুলিপিতেও এই কথাই বলা হইয়াছিল। পরে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া, ঢাকায় কোনো প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা আদবেই বাঞ্ছনীয় নহে, এই কথা বলা হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কতিপয় মুসলমান সভ্যের অনুরোধেই বিশেষ ভাবে এই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। মুসলমানগণ কেন যে এ বিষয়ে এমন আপত্তি করিতেছেন, তার ভিতরকার কথাটা ধরিতে পারিলে, বোধ হয় হিন্দুনেতৃবর্গ এরূপভাবে তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতেন না। আর যাঁরা এটী বুঝিয়া শুনিয়াও এইরূপ অন্দোলনে আমাদের মুসলমান বন্ধুগণের পৃষ্টপোষক হইতেছেন, তারা যে প্যান্-ইস্‌লামিজম্ বা ইস্‌লাম্‌মহামণ্ডল প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু, ইহা একটুকুও বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। একদিকে জাপান, অন্যদিকে এই ইস্‌লাম্‌মহামণ্ডল, (চীনের প্রকৃতির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তার কথা কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না)—এঁরা দু'-ই ভারতের জাতীয় জীবনের, রাষ্ট্রীয় একতার ও সাধারণ লৌকিক স্বত্ব-স্বাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতা প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হউক ইহা কে না চায়? এই একতা ব্যতীত ভারতে রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তিসঞ্চার অসাধ্য হউক বা না হউক, নিতান্তই যে দুঃসাধ্য হইবে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। এই একতার পথে কোনো ক্রমেই কোনো বাধাবিঘ্ন স্থাপিত করা কর্ত্তব্য নহে। হিন্দু ও মুসলমান একযোগে মিলিত হইয়া সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও দেশহিতকর কার্য্য করুন, ইহা সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়। কিন্তু প্যান্-ইস্‌লামিজম্ বলিয়া যে অভিনব বস্তু মুসলমান-জগতের চিদাকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় একতার বিষম শত্রু। জগতের সকল দেশের মুসলমানকে একচ্ছত্রাধীন করিয়া বিশ্বব্যাপী একটা অভিনব ইস্‌লাম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার সুখস্বপ্নে প্যান্-ইস্‌লাম্ বিভোর হইয়া আছে। প্যান্-ইস্‌লামিজম্ কেবল একটা ধর্ম্মের ব্যাপার নহে। ধর্ম্ম বাস্তবিক ইহার একটা বাহ্য আবরণ মাত্র।

ইহার মূল লক্ষ্য সংসার, পরমার্থ নহে। চারিদিকে জগতের জাতিসকল এক অভিনব শক্তিসঞ্চারে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতি সকল আশিয়ার ও আফ্রিকার উপরে আপন আপন রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন, এবং আপন আপন অধিকৃত রাষ্ট্ররক্ষা ও অনধিকৃত রাষ্ট্রলাভের জন্য তাঁহারা আপনাদিগের শক্তি-পুঞ্জকে সংহত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন। য়ুরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা বৈরভাব আছে বলিয়াই আশিয়ার ও আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি এখনো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া আছে। আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সকলই ইস্‌লামের অন্তর্ভূত। ইয়ুরোপে সার্ভিয়া ও মন্টিনিগ্রোর পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে, আশিয়ায় চীনের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত, বৃহৎ ভূভাগ এবং সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ব আফ্রিকা মুসলমানেরই দেশ। এই বিস্তৃত মুসলমানভূমিকে যদি এক করিয়া তুলিতে পারা যায়, তবে আধুনিক জগতে মুসলমানসমাজ খৃষ্টীয় সমাজেরই মত শক্তিশালী ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। এখনো যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান-রাষ্ট্র আছে, তাহাদের স্বত্বস্বাধীনতা রক্ষা করাও বহুলপরিমাণে এই একতা-সাধনের উপরেই নির্ভর করিবে। আর এইরূপে একটা বিশ্বব্যাপী মহম্মদীয় রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠন করিয়া জগতের ইতিহাসে আর একবার ইস্‌লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই প্যান্-ইস্‌লামিজমের মূল উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ এই সুখসৌভাগ্যের স্বপ্নঘোরে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছেন। ভারতের মুসলমান-নেতৃগণের সকলে না হউন অনেকেই, এই আশামদিরাপানে আত্মহারা হইয়াছেন। এঁরা যে আপনাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনকে ভারতবর্ষের সাধারণ রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন, যাহাতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তারিত ও রাষ্ট্রীয় শক্তি সঞ্চারিত না হয়, তার জন্য ইঁহারা যে একদল অদূরদর্শী ইংরেজরাজ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ইহার পশ্চাতে এই অদ্ভুত ও সাংঘাতিক মাদকতা রহিয়াছে। ভারতীয় মস্‌লেম-লীগের প্রতিষ্ঠা যে এই অভিনব প্যান্-ইস্‌লামিজমেরই একটা তরঙ্গভঙ্গমাত্র, ইহা লাট হার্ডিঞ্জ সুস্পষ্টই বুঝিয়াছেন। আর তিনি এটাও জানেন যে ভারতে এখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রবল হিন্দুদিগকে দুর্ব্বল ও দুর্ব্বল মুসলমানদিগকে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে, যে প্যান-ইস্‌লামিজম্, ব্রিটেন ও ভারত কারোই মিত্র নহে, যাহা ভারতে হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ও ব্রিটিশের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, উভয়েরই সমান প্রতিবাদী, সেই প্যান্-ইস্‌লামিজমের গর্ভেই অশেষ শক্তিসঞ্চার করা হইবে। ইহা বুঝিয়াই লাট হার্ডিঞ্জ ভারতে ব্রিটিশের স্বার্থ ও হিন্দুর স্বত্ব উভয়ই যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তাহার বিধান করিবার জন্যই বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়াছেন। সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা প্রাভিন্‌শিয়াল অটনমি (Provincial Autonomy) প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র ভারতকে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র

শাসনে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের সমবায়ে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠ শাসন-সঙ্ঘ বা যুক্তরাজ্য গড়িয়া উঠিবে এই আশার কথা প্রচার করিয়া স্বদেশপ্রেমিকদিগের আশাকে সঞ্জীবিত করিয়াই তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সুদূর লক্ষ্যকে ধরিয়াই এই নূতন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতি ও নিয়তি যাঁরা লক্ষ্য করিতেছেন, স্বজাতির অভ্যুদয় ও সমগ্র মানবসমাজের শান্তি ও উন্নতি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে লাট হার্ডিঞ্জের এই দূরদর্শিনী নীতির সমর্থন করা কর্ত্তব্য।

প্যান্-ইস্‌লামিজম্ যে ভাবে জগতের মুসলমান-সমাজের শক্তি-বৃদ্ধির ও একতা-সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, সে ভাবে ইস্‌লামের অভ্যুত্থান হউক, ইহা ইচ্ছা করি না বলিয়া, কেহ আমাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মের বা মুসলমান-সমাজের শত্রু মনে করিবেন না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইস্‌লামের হিত কামনা করি। ইস্‌লামের অধোগতিতে মানবসমাজের একটী অতি বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বিকল হইতেছে, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। সমগ্রমানবমণ্ডলীর হিতার্থেই আমরা ইস্‌লামের হিত কামনা করি। আর ভারতের সঙ্গে ইস্‌লামের যে একটা বিশেষ ও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাও আমরা বিস্মৃত হই নাই। ভারতীয় মুসলমানগণ ভারত-সমাজের অঙ্গ। অঙ্গের উৎকর্ষে অঙ্গীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অঙ্গের অপকর্ষে অঙ্গীর অবনতি অপরিহার্য্য। সুতরাং ভারত-সমাজের কল্যাণকল্পেই ভারতের মুসলমানসম্প্রদায়ের যথাযোগ্য অভ্যুদয় কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু অঙ্গ যদি অঙ্গীর বিদ্রোহী হইয়া, তাহার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্বন্ধ চ্ছেদন করিয়া, স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহে, তাহাতে অঙ্গ ও অঙ্গী উভয়েরই শক্তিক্ষয় হয়, এবং উভয়েরই আপন, আপন সফলতালাভের অশেষ অন্তরায় জন্মিয়া থাকে। ভারতের মুসলমানসম্প্রদায় যদি প্যান্-ইস্‌লামের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকেন, তাহাতে যেমন তাঁহাদের নিজের, তেমনি ভারতবর্ষের, তেমনি সমগ্র মানবমণ্ডলীর অশেষ অকল্যাণের সূত্রপাত হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই, আমরা এই আত্মঘাতী ও স্বদেশদ্রোহী প্রয়াসের প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য মনে করি। ভারতের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ যে সকল ক্ষেত্রে হিন্দুনেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, প্রকাশ্যে ও একযোগে ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারিগণের নীতির বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, প্রকৃতপক্ষে, ভিতরে ভিতরে এই প্যান্-ইস্‌লামিজমেরই শক্তিসঞ্চার করিতে চেষ্টা করিবেন, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদিগকে সচকিতস্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেই হইবে। এই কয় বৎসর, মিণ্টো মহোদয়ের শাসনকালে, ভারতে প্যান্-ইস্‌লামের প্রচারকগণ ইংরেজরাজপুরুষগণকে ধরিয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিতেছিলেন। লাট হার্ডিঞ্জের বিচক্ষণ বুদ্ধি সে পথ রোধ করিয়াছে। এখন তাঁহারা দেশের হিন্দুনেতৃগণকে ধরিয়া সেই কাজই বাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এটী আমাদের বোঝা উচিত।

লাট হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি

লাট হার্ডিঞ্জের এই নূতন শাসন-নীতির নিগূঢ় মর্ম্ম দেশের লোকে এখনো ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এটী বুঝিলে তাঁরা অযথা আন্দোলন করিয়া, এ সময়ে বড়লাট বাহাদুরকে অকারণ বিব্রত করিতে যাইতেন না। অপর বিষয় যেমন লোকের একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে, তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও, তাহাকে পরিত্যাগ করা কঠিন হয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃবর্গের তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষের সকল অভ্যাসই আদিতে কোনো প্রয়োজনসাধনের জন্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পরে, সে প্রয়োজন অতীত হইলেও, অভ্যাসটী চলিয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এইরূপ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াই প্রথমে জন্মিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের সমালোচনা করিবার জন্যই এই আন্দোলনের জন্ম হয়। সে কালে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়া, এই সমালোচনা প্রায়শঃই প্রতিবাদে ও নিন্দাবাদে পরিণত হইয়াছিল। একদল লোক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বলিতেই গবর্ণমেণ্টের প্রতিবাদ বুঝিতেন। এখনো অনেকের এ ধারণা নষ্ট হয় নাই। আর এরূপ আন্দোলন করিতে করিতে একদল লোকের এমনি একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাঁরা এখন কোনো না কোনো অজুহাতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের একটা না একটা প্রতিবাদের সুরগোল না তুলিলে দিনটা বৃথায় গেল এমনি যেন মনে করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, নানা কারণে দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গোল প্রায় থামিয়াই গিয়াছিল। আন্দোলনই যাঁহাদের কর্ম্মশীলতার প্রাণ, তাঁরা এ জন্য কতকটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। লাট মিণ্টোর প্রচণ্ড শাসনাধীনে উচ্চবাচ্য করা বড় নিরাপদ ছিল না; সুতরাং সে সময়ে প্রতিবাদের বেগটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। লাট হার্ডিঞ্জ লাট মিণ্টোর সে অদূরদর্শিনী নীতি এক-রূপ বর্জ্জনই করিয়াছেন। শাসনের কঠোরতা তেমন আর নাই। এই কারণে আবার সেই পুরাতন অভ্যাসটা জাগিয়া উঠিয়াছে।

* * *

দেশের কল্যাণের জন্য, নূতন লাটের এই নূতন নীতির মর্ম্ম বুঝিয়া, যথাযোগ্যভাবে তার সমর্থন করাই যে এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য, এ দিকে এখনো অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। আর তারই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে, দিল্লিতে রাজধানী তুলিয়া নেওয়া উপলক্ষে, বেহারে নূতন শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্য, উড়িষ্যা বাংলা হইতে পৃথক হইতেছে বলিয়া, এইরূপে নানা দিক্ দিয়া লাট হার্ডিঞ্জের কার্য্য ও অভিপ্রায়ের এত প্রতিবাদ হইতেছে।

লাট হার্ডিঞ্জ যে সকল কাজই ঠিক আমাদের মনোমত করিবেন বা করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কোনো কেহই এমন ভাবে অপর কাহারো মন জোগাইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন না। একজন শাসনকর্ত্তার পক্ষে ইহ

একান্তই অসাধ্য। লাট হার্ডিঞ্জ একটা বিরাট ও জটিল শাসনযন্ত্রের শীর্ষ স্থানে, তাহার পরিচালকরূপে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই যন্ত্রী যন্ত্র অপেক্ষা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যত বড় হউন না কেন, কোনো যন্ত্রচালনায় তাঁহাকে বহুলপরিমাণে সেই যন্ত্রের অধীন হইয়াও চলিতেই হয়। যন্ত্রী কখনো একান্তভাবে আপনার যন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন না। লাটসাহেব যে নীতিই প্রবর্ত্তিত করুন না কেন, কার্য্যতঃ সে নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার তাঁর নিজের হাতে নাই। অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের হাতে এ ভার সর্ব্বদা ন্যস্ত থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং এ সকল প্রাচীন ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর ভাবস্বভাব, মতামত, রুচি ও অভ্যাসকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া শাসন পরিচালন সম্ভব হয় না। অন্যদিকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যেমন তার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাধীন হইয়া আছে, এ কর্ম্মফলকে অগ্রাহ্য করিয়া সে ইচ্ছা কিছুতেই আপনার সফলতা লাভ করিতে পারে না,—রাষ্ট্রের নীতিও সেইরূপ রাষ্ট্রের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবন্ধনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে আপনার সফলতা অন্বেষণ বা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইতরজনের ন্যায় রাষ্ট্রপতিকেও আপনার কর্ম্মাধীন হইয়া বাস করিতে হয়। ইতরজনের কর্ম্ম তার স্বকৃত বা তার পরিবার বা সমাজকৃত। রাষ্ট্রপতি যে বিশাল ও জটিল কর্ম্মজালে আবদ্ধ হন তাহা কেবল তাঁহার স্বকৃত বা পরিবারকৃত নহে। সমগ্ররাষ্ট্রের সমুদায় পুরাতন ও অধুনাকৃত কর্ম্মজালে তাঁহাকে চারিদিক হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই জন্য রাষ্ট্রপতির সদিচ্ছাতেই সর্ব্বদা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয় না। এই সকল বিচার-আলোচনা করিয়া দেখিলে, লাট হার্ডিঞ্জ আমাদের হাতে চাঁদ ধরিয়া দিলেন না বলিয়া, অধীর বা অসন্তুষ্ট হইবার যে কোনই কারণ নাই, ইহা সহজেই বোঝা যাইবে।

*　　*　　*

অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন—"লাটসাহেব কি আমাদের ভালোর জন্য ব্যস্ত হইয়া এ সকল করিতেছেন? ভিতরে ভিতরে তাঁর কি অন্য অভিপ্রায় নাই?" আমার নিকট এ প্রশ্নটাই একান্ত অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। পাদ্রিজনসুলভ বিশ্বমানবী-প্রেম লাট হার্ডিঞ্জের আছে কি না, জানি না। আর থাক্ বা না থাক্ সে বিষয়ে এ ক্ষেত্রে আমাদের মাথা ঘামানো নিতান্তই নিরর্থক। ভাল পাদ্রিই যে ভাল শাসনকর্ত্তা হইবেন এমনো তো কোনো কথা নাই। ফলতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিমানবিহারী বিশ্বমানবী-প্রেমের আতিশয্য কৃতিত্ব-লাভের সহায় না হইয়া প্রায়শঃই অতি গুরুতর অন্তরায় হইয়া উঠে। রাষ্ট্র-নীতিকের প্রাণে যদি কোনো বিশ্বকল্যাণকর আদর্শের প্রেরণা থাকে, ভালই। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির অনাগতকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি ও সেই অনাগতের ভবিষ্যৎ মন্দটুকুকে প্রতিহত করিয়া তার ভালটুকুকে প্রবুদ্ধ ও প্রবৃদ্ধ করিবার কর্ম্মকুশলতা থাকা একান্তই আবশ্যক। বিশ্বমানবী-প্রেম না থাকিলেও কেহ শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনীতিবিশারদ হইতে পারেন। এই দূরদর্শনের ক্ষমতা ও অনাগত বিপন্নিবারণের কুশলতা না থাকিলে, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা বা রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনভার গ্রহণ করা

তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনার ও রাষ্ট্রের পক্ষে অশেষ অকল্যাণের কারণ হইবেই হইবে। "লাট-সাহেব কি কেবল আমাদের ভালোর জন্য ব্যস্ত হইয়া, এ সকল কাজ করিতেছেন ?"—এ কথা যাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁদের যে রাষ্ট্রনীতির ক, খ, জ্ঞানও হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

* * *

আর এই "আমাদেরি ভালোর" অর্থই বা কি ? "তাঁর অন্য অভিপ্রায় আছে কি না ?"—এই প্রশ্নে এই "অন্য অভিপ্রায়" বলিতেই বা কি বোঝায় ? কেবল "আমাদেরি ভালো" করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এখন যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অনেকটা প্রতিযোগিতা আছে, লাট হার্ডিঞ্জ যে তাঁহাদের ভালোর প্রতি উদাসীন বা তাঁদের ভালোর প্রতিবাদী, ইহাই বোঝাইত। সে অবস্থায়, আমাদের হিতার্থী হইতে যাইয়া, লাট হার্ডিঞ্জকে দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইতে হইত। তিনি "আমাদেরি ভালো" করিবার জন্য এই উচ্চপদে নিযুক্ত হন নাই। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া, সেই সাম্রাজ্যের স্বত্বস্বার্থ-রক্ষার জন্যই তিনি ভারতের শাসনকর্তৃপদে বৃত হইয়াছেন। এ মোটা কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন ? লাট হার্ডিঞ্জ 'আমাদেরি ভালো'র জন্য এ দেশে আসেন নাই। আজি পর্য্যন্ত কোনো লাট-বেলাট এ ভাবে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন নাই। কোনো জমিদারীর নায়েব যদি জমিদারের স্বার্থ নাশ করিয়া প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হয়, সে লোক যতই কেন সহৃদয় ও সদাশয় হউক না, কর্ম্মচারীরূপে যে নিমক্‌হারাম ও অবিশ্বাসী, তার কি আর সন্দেহ আছে ? সেইরূপ কোনো ব্রিটিশ-শাসন-কর্তার পক্ষে কেবল "আমাদেরি ভালোর" জন্য ব্যস্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার চেষ্টা করা যে একান্তই নিমক্‌হারামি হইবে, এ কথা অস্বীকার করা যায় কি ? লাট হার্ডিঞ্জ এইরূপ নিমক্‌হারাম হইবেন ইহা কল্পনাও করা যায় না। ফলতঃ তিনি কেবল "আমাদেরি ভালোর" জন্য আত্যন্তিক আগ্রহবশতঃ এই নূতন শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এমন কথা বলি না বলিলে সে কথা তাঁর প্রশংসার কথা না হইয়া বরং নিন্দারই কথা হইত।

* * *

ফলতঃ ব্রিটিশ-ভারতের শাসননীতি কদাপি ব্রিটিশজাতির ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভাল-মন্দের দিকে না চাহিয়া, কেবল আমাদেরি ভালোর জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেই পারে না। যে সকল ইংরেজরাষ্ট্রনীতিক আজি পর্য্যন্ত আমাদের কল্যাণ অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন, তাঁরাও ব্রিটিশজাতির বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের প্রতি কদাপি উদাসীন হন নাই। তাঁরা কেবল এইটা বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের কোনো প্রকারের সত্যিকার অমঙ্গল-চেষ্টা করিয়া, ব্রিটিশজাতির ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের চিরন্তন কল্যাণসাধন সম্ভব নহে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকে এ জগতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের আপাত-বিরোধটাই দেখে, আর এই বিরোধকেই বিশ্ববিবর্ত্তনের নিত্য ধর্ম্ম মনে করিয়া, একের স্বার্থকে অন্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিণামে এ চেষ্টা সর্ব্বথাই বিফল হইয়া

যায়। বিশ্বের মর্ম্মস্থলে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামঞ্জস্য, সকল সংগ্রামের শেষ-সন্ধি-স্থাপনের একটা বিধান ও ব্যবস্থা রহিয়াছে। যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি বা কোনো জাতি মিলনের সেই নিত্য ভূমিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, ততক্ষণ তাদের বিরোধ ও সংগ্রামের ক্ষণিক বিরাম হইতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। এই মিলনের ভূমিটী অন্বেষণ ও আবিষ্কার করাই সকল নীতির লক্ষ্য। ধর্ম্মনীতি ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য সজ্ঞানে অজ্ঞানে এই মিলন-ভূমিটীকেই খুঁজিতেছে। বিশ্বধর্ম্মের বিবর্ত্তন-ইতিহাস এই অন্বেষণেরই বিবরণ মাত্র। সমাজনীতি, সমাজের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের স্বস্বার্থের বিরোধ মিটাইবার চেষ্টায়, সতত এই ভূমিটীরই অন্বেষণ করিতেছে। রাষ্ট্র-নীতিও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে বিষম বিরোধ জাগিয়া আছে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত সতত এই মিলনভূমিকেই আশ্রয় করিবার জন্য লালায়িত। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এ সকলেরই উৎকর্ষ ও সফলতালাভ, এই মিলনভূমি প্রাপ্তির উপরে নির্ভর করে। তিনিই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-নীতিবিদ্ যিনি ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে আপাত-বিরোধ জগতকে বিছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্টতম নিষ্পত্তি করিতে পারেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ-তম সমাজনীতিবিদ্ যাঁর শিক্ষাদীক্ষাতে সমাজের আপাতবিরোধ উত্তরোত্তর নষ্ট হইতে থাকে। আর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাঁরই অসাধারণ পার-দর্শিতা প্রমাণিত হয়, যিনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে আপাত-বিরোধ বাধিয়া উঠে, তার সম্যক মীমাংসা করিবার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটেনের স্বার্থের আপাত-বিরোধ রহিয়াছে সত্য। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ইংরেজ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভারতবাসী উভয়ে কেবল এই বিরোধটাকেই লক্ষ্য করিয়া চলেন। তাই তাহারা একে অন্যের মঙ্গলকে প্রতিহত করিয়া, আপনাদের কল্যাণ সাধন করিবার কল্পনা করেন। লাট হার্ডিঞ্জের দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতি এ ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ ভারত ও ব্রিটেনের স্বস্বস্বার্থের মধ্যে একটা আপাতবিরোধ রহিয়াছে, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এই বিরোধ নিষ্পত্তিরও একটা উচ্চতর ও প্রশস্ত-তর ভূমি আছে, তাহাও তেমনি সত্য। লাট হার্ডিঞ্জ এ কথা বুঝিয়াছেন। লাট কর্জ্জন ব লাট মিণ্টো এটী বুঝেন নাই, তাই তাঁরা এক পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন। লাট হার্ডিঞ্জ এটী বুঝিয়াছেন বলিয়া, অন্যপথ ধরিয়াছেন।

* * *

লাট হার্ডিঞ্জ এটী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে ব্রিটেনকে বড় করিয়া রাখিতে হইলে, ভারতকে ছোট করিলে চলিবে না। এক দিন ছিল যখন ভারতকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভার-বাহী ভৃত্য করিয়া রাখা সম্ভব বলিয়া মনে হইত। সেদিন আর নাই। ভারতের আত্ম-জ্ঞান ফুটিয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনফলেই ভারত ক্রমে আপনাকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে। কিছুকাল হইতে দেশে যে অশান্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার পশ্চাতে এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্য স্পন্দিত হইতেছে। এখন আর ভারতকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভারবাহী ভৃত্য করিয়া রাখা সম্ভব নয়। দু চারি দশ

বৎসর সম্ভব হইলেও চিরদিন কদাপি সম্ভব হইবে না। সুতরাং এখন হইতেই অল্পে অল্পে ভারতের এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে ব্রিটিশ-প্রভুশক্তির সন্ধি ও সখ্য সাধন করিয়া, আত্মরক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্রিটেন য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে আজ যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে, ভারতের সঙ্গে তার রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ যদি কোনো কারণে ছিন্ন হইয়া যায়, কিছুতেই আর সে পদ ও সে মর্য্যাদা, সে প্রতাপ ও প্রভুত্ব থাকিবে না। ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যত্ব একেবারেই লোপ পাইবে। যে কোনো প্রকারে হউক এই সম্বন্ধটী রক্ষা করা, ব্রিটেনের স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলেও, ব্রিটিশরাষ্ট্রনীতির মূললক্ষ্য হওয়া বিধেয়। আর এই মূললক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের ব্রিটিশ প্রভুশক্তির পক্ষে দেশের নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে যথাসাধ্য সখ্য স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। লাট হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতির ইহাই মূল-সূত্র।

* * *

আর যে কারণে আমাদের এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়-চৈতন্যের সঙ্গে যথাসাধ্য সখ্য রক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশপ্রভুশক্তির আত্মপ্রয়োজনেই আজ কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই ভারতের কল্যাণ-কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও আত্মপ্রয়োজনেই ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হইয়া, আপনাদের জাতীয় জীবনের যথাসঙ্গত সফলতা অন্বেষণ করাই বিধেয়। সভ্যজগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের সঙ্গে সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গেলে, ব্রিটেনের যেমন আপনার পদ ও মর্য্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, সেইরূপ এই সম্বন্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিলে ভারতের পক্ষে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করা সাধ্যায়ত্ত হইবে না। আর কেন যে আমরা আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না, তার কারণ প্রধানতঃ দুইটী,—একটি চীনের পুনরুত্থান, অপর প্যান্-ইস্‌লামিজমের অভ্যুদয়। এ জগতে কেবল এক চীনই ভারতের অপরিমেয় প্রকৃতিপুঞ্জকে শুদ্ধ কায়িকশক্তির দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে। আর ভারতের পাঁচকোটী মুসলমান্ প্যান্-ইস্‌লামের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যদি আশিয়ার ও আফ্রিকার সৈকতবালুকাসম বিরাট মুসলমান-সমাজের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে, তবে ভারতের স্বরাজ-প্রতিষ্ঠারই আশা চিরদিনের জন্য আকাশকুসুমবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। চীনের নবজাগরণ ও প্যান্-ইস্‌লামের অভ্যুদয়, এই দুইটী যেমন ব্রিটেনের তেমনি ভারতের ভবিষ্যৎকে ভীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের ও ব্রিটেনের পরস্পরের রাষ্ট্রীয় স্বত্বস্বার্থের মধ্যে একটা উচ্চতর মিলন ও সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে, এই দুই শক্তির হস্তে উভয়েরই ভবিষ্যৎ আশাভরসা একবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইতে পারে। লাট হার্ডিঞ্জ এটী দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। আর এই দূরদৃষ্টির উপরেই তাঁর ভারত-শাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির অকল্যাণ করিয়া আমাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সত্য নহে। তিনি আমাদের অকল্যাণ করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থান্বেষণ করিতেছেন, ইহাও সত্য নহে। সত্য কথাটা এই যে তিনি এমন এক ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, যেখানে ব্রিটেনের কল্যাণ-কামনাতেই তাঁহাকে ভারতের আত্মচৈতন্যের সফলতালাভের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিতে হইতেছে, আর ভারতের কল্যাণকল্পেই এদেশে ব্রিটিশের স্বত্বস্বার্থকেও যথাসঙ্গতভাবে রক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। আর এই সম্যকদৃষ্টির উপরে তাঁর ভারতশাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই, ইহাকে আমাদেরও সর্ব্বতোভাবেই আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য।

—০—

ভারতশিল্পের মূলসূত্র

ভারত-শিল্পের মূলসূত্র কোথায়;—ভারতবর্ষের বাহিরে না অভ্যন্তরে? অনেকে ইহার আবিষ্কার-সাধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। ইহাকে সুলক্ষণ বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কারণ, মানব-হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় ভাব-সম্পৎ যে ভাবে শিল্পের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে, তাহার পরিচয়-লাভের জন্য আয়োজন না করিলে, মানব-সমাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাম্রপট্ট-লিপি, শিলাপট্ট-লিপি এবং লুপ্তাবশিষ্ট পুরাতন গ্রন্থ পুরাকালের নানা বিবরণের সন্ধান প্রদান করিতে পারে। তজ্জন্য তাহার আলোচনা ইতিহাস-লেখকগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। পুরাকালের শিল্পনিদর্শনগুলিও সেইরূপ সমাদর লাভের যোগ্য; তাহার মধ্যেও পুরাকালের নানা বিবরণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভারত-শিল্প আদৌ শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া কথিত হইতে পারে কি না, এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে তদ্বিষয়েই বিলক্ষণ সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—"ভারত-ভাস্কর্য্যের বিস্তৃত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন নাই। কারণ, শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সময়ে, তাহা হইতে সাহায্যলাভের আশা করা যাইতে পারে না। তাহা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর কারুকার্য্যমাত্র;—তাহাকে শিল্পকলা বলিয়া সমাদর করা যায় না।"*

বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা গুণী, এবং গুণজ্ঞ, তাঁহাদিগের বিচারে, ভারত-শিল্প বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের "শিল্পকলার" মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, ভারতশিল্পের উল্লেখ না করিলে শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় নাই। কারণ, সমগ্র প্রাচ্য শিল্পেই ভারতশিল্পের প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে; প্রতীচ্য-শিল্পের উপরও গৌণভাবে সে প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। তথাপি, ভারত-শিল্পের প্রকৃত প্রকৃতি-বিচারে এখনও তর্কবিতর্ক নিরস্ত হয় নাই, এখনও নানা মুনির নানা মতের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া, ভারত-শিল্প নানারূপে বিপর্য্যস্ত হইতেছে।

অনেকের বিশ্বাস;—ভারতশিল্প পরানুকরণ-লব্ধ। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরানুকরণ-লব্ধ বলিতে অসম্মত, তাঁহাদিগের বিশ্বাস,

* There is no temptation to dwell at length on the Sculpture of Hindustan. It affords no assistance in tracing the history of art, and its debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art.—Westmacott's Handbook of Sculpture, p. 51.

—ভারতশিল্পে পরানুকরণ-সম্পর্কের অভাব ছিল না। যাঁহারা তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস,—ভারতবর্ষীয়গণ প্রতিভাবলে পরানুকরণকে ভারতবর্ষীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।* এই সকল কারণে, ভারতশিল্পের মূলসূত্রের সন্ধান লাভের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে পর্য্যটন করিবার প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইতে পারে নাই; এবং ইহাতেই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যথাযোগ্য ভাবে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার অধ্যবসায় ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। এখনও ভারতশিল্পের উপর গ্রীক শিল্প-প্রভাবের কথা আলোচিত হইতেছে।

ব্রসেল্‌জ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর মহোদয় তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে সুপরিচিত হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত। তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—"ভারত-সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক-সভ্যতার কিছুমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না, এরূপ কথা স্বীকার করিতে না পারিলেও, তাহাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করা যায় না। কারণ, উভয়দেশের মানবসমাজে ধর্ম্মতত্ত্বের এবং দার্শনিক তত্ত্বের যুগপৎ উন্মেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় গ্রীসের নিকট ভারতবর্ষের যৎকিঞ্চিৎ ঋণ থাকিতে পারে; কিন্তু এই দুইটি বিদ্যাও উভয়দেশে স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হইবার সূত্রপাত করিয়াছিল। কাব্যে, নাটকে, ব্যাকরণে, লিপিকৌশলে, গণিতে বা কলাশিল্পে ভারতবর্ষের উপর গ্রীসের প্রভাব কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, গ্রীসের সহিত পরিচয় লাভ না করা পর্য্যন্ত, এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতে পারে নাই। পরিচয় সংস্থাপিত হইবার পর, গ্রীক-শিল্পের প্রভাবে ভারত-ভাস্কর্য্যে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে ভারত-শিল্পের স্বাতন্ত্র্য এবং রচনা নৈপুণ্য বিনষ্ট হইতে পারে নাই।" *

* India, of course, has borrowed many things from abroad during the long course of ages, but it is a trite observation, easily proved by many instances, that she always so transmutes her borrowings as to make them her own.—Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 7.

* Greece has played a part, but by no means a predominant part, in Indian civilization. The evolution of philosophy and religion has gone along parallel, but independent paths. India owes to Greece an improvement in astronomy and medicine, but it had begun both, and in lyric and epic poetry, in grammar, the art of writing, the drama, mathematics and the fine arts, it had no need to wait for the introduction or the initiative of Hellenism. Notably, howoever, in the plastic arts, and perhaps also in the details of dramatic representations, the classical culture has acted as a ferment to revivify the native qualities of the Indian artists

শিল্পকলার মূলচেষ্টা বিকাশ-চেষ্টা। যে প্রাকৃতিক বিকাশ চেষ্টায়, বৃক্ষলতা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিতে গিয়া, যথাকালে পুষ্পফলে সুশোভিত হয়, সেই প্রাকৃতিক বিকাশ-চেষ্টাই মানবসমাজকেও শিল্পকলায় আত্মবিকাশ লাভ করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়া থাকে। শিল্পকলার মূলসূত্র মানব-প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মানব-সমাজ বহুদেশে, বহুজাতিতে বিভক্ত হইয়া, নানাভাবে বিকাশ-লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। যে দেশের, যে যুগের, যে মানবসমাজ যে ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার শিল্পকলার মূলসূত্র তাহার মধ্যেই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা বাহিরে নহে,— অভ্যন্তরে। অল্পদিন হইল, ইহার উপলব্ধি করিয়া, মানবতত্ত্বশাস্ত্র নূতন পদ্ধতিতে তথ্যা-লোচনা করিবার জন্য মুনিঋষিগণকে বিবিধ অনুসন্ধান-চেষ্টায় ব্যাপৃত করিয়াছেন। এক দেশের সহিত অন্য দেশের কোন কোন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান প্রচলিত হইলেও, তাহাতে বিকাশ-চেষ্টার মূলপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। বিকাশ চেষ্টার সাদৃশ্যমাত্র লক্ষ্য করিয়াই, এক দেশের নিকট আর এক দেশের ঋণ থাকা সিদ্ধান্ত করা যায় না। সে সাদৃশ্য হয় ত জাতিগত বা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিলুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয়-বিজ্ঞাপক অপরিহার্য্য সাদৃশ্য।

ভারতবর্ষের সহিত পুরাকালেও অনেক দূরদেশের পরিচয় ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে সে পরিচয় কখন ক্ষণস্থায়ী কখন বা দীর্ঘস্থায়ী পরিচয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রসাদে ভারতবাসিগণ নানা দূরদেশ হইতে ধনরত্ন আহরণ করিবার সময়ে, কখন যে কোনরূপ জ্ঞানরত্ন আহরণ করেন নাই, তাহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতবাসিগণ শিল্পকলার বিকাশসাধনে দূরদেশ হইতে কখন কিরূপ রচনা-কৌশল আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতশিল্পের মূল-প্রকৃতিতে তাহার পরিচয়-লাভের উপায় নাই। ভারতবর্ষ কখন কখন ভিন্নদেশ হইতে শব্দসম্পৎ আহরণ করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষের ভাষার মূলপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই। সেইরূপ প্রয়োজনে ভারতবর্ষ কখনও ভিন্নদেশের শিল্পরীতি হইতে কোনরূপ নূতন রচনা-কৌশল আহরণ করিয়া থাকিলেও, তাহাতে ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। ভারতশিল্পে একটি অনন্যসাধারণ বিকাশ-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত ভারতবর্ষের আর্য্য অনার্য্য সকল শ্রেণীর অধিবাসীর পরম্পরাগত শিক্ষাদীক্ষার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে বাহির হইতে আহৃত শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত মিলনভূমি।

ভারতশিল্পের ইতিহাস বিষয়ক সদ্যঃ প্রকাশিত গ্রন্থে ভিন্সেণ্ট স্মিথ স্বীকার

without robbing them of their originality and subtlety." Journal of the Royal Asiatic Society (1898), pp. 188—189.

করিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের পুরাপ্রচলিত শিল্প-সংস্কার অতিক্রম করিয়া, গ্রীক্‌শিল্পের রচনারীতি এবং রচনা-মান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু-শিল্পের প্রকৃত গুণাবলী সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুশিল্প আদ্যন্ত হিন্দুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে, গ্রীক-সংস্কারের বশবর্ত্তী হয় নাই। কেবল সাজসজ্জার মধ্যেই বিদেশাগত শিল্প-প্রভাবের পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে, তাহা বাহ্য প্রভাব মাত্র

এই বাহ্য প্রভাব ভারতবর্ষের সকল যুগের সকল প্রদেশের শিল্পকলার মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। যে যুগের যে প্রদেশের শিল্পকলায় ইহার পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, মনীষিগণ "গান্ধার-শিল্প" বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। "গান্ধার-শিল্পের" লক্ষ্য কি ছিল, এখনও তদ্বিষয়ক সকল তর্ক নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা কি ভারতশিল্পকে গ্রীক ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল? যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—"গান্ধার শিল্প" গ্রীক শিল্পকেই ভারত-ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা যখন সুফল হইয়াছিল, তখন "গান্ধার-শিল্পের" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যত দিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই, ততদিন সফলতা লাভের আয়োজন চলিতেছিল। যে সকল শিল্পনিদর্শনে সেই আয়োজনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "গান্ধার-শিল্প" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহাকে গ্রীক-শিল্প বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত উদ্ভব-ক্ষেত্র।

ভারত-শিল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় থাকিলে, তাহাকে সহজেই আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা থাকিত। ভারত-শিল্প ভারত-সমাজের সকল প্রকার আত্মবিকাশচেষ্টার সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, সহসা সকল কথার মীমাংসা-সাধনের উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সংস্থান, তাহার সভ্য অসভ্য সমগ্র মানবসমাজ, ভারতবর্ষের আত্মবিকাশ-চেষ্টার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে;—ভারতবর্ষের "প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমা", তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে; ভারতবর্ষের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, বৃক্ষবনস্পতি-পর্ব্বতমালা, নদনদী-মহাসাগরও তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না; ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াও, শিল্প-সৌন্দর্য্য আলোচিত হইতে পারে না

* Greek artistic cannons and rules of proportion never succeeded in making headway against the strong current of Indian tradition. Hindu Sculpture, whatever may be thought of its intrinsic quality continued to be Indian on the whole, guided by Indian not Greek principles. The foreign influences, Assyrian, Persian, or Greek, had merely superficial effect, chiefly traceable in decorative details.—Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 8.

এই সরল সত্যটি এখনও ভাল করিয়া প্রতিভাত হয় নাই।

ভারত-শিল্পের মূল-সূত্র কোথায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ভারতবর্ষীয় মানব-সমাজের মূলপ্রকৃতি কোথায়? তাহা বাহিরে, না অভ্যন্তরে? সে প্রকৃতি যে চিরকালই আত্মনিষ্ঠ ছিল, তাহার প্রমাণাবলীর অভাব নাই। যাহারা যখন ভারতভূমিতে আপতিত হইয়াছে, তাহারাই (কিয়ৎকালের মধ্যে) ভারতবর্ষীয় হইয়া গিয়াছে। প্রবল সমাজের পক্ষে এইরূপে ক্ষুদ্র সমাজকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই, ভারতবর্ষ বহু বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া, এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই। এখনও সেকাল-একালের মধ্যে কালগত পার্থক্যই উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য;—প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ভারত-বর্ষের প্রধান আকাঙ্ক্ষা বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে,—সান্তে নহে, অনন্তে;—পরিদৃশ্যমান বস্তুতে নহে, অতীন্দ্রিয় মহাসত্তায়।

আমরা কিছুই জানিতে পারি না;—ইহা সত্য হইতে পারে না। আমরা সমস্তই জানিতে পারি;—ইহাও সত্য হইতে পারে না। মানব-জ্ঞানের এই সীমানির্দ্দেশের মধ্যে, তাহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় লাভ করিয়া, ভারতবর্ষ অচিন্ত্যকে চিন্তা করিবার এবং অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সাহসেই, প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ, গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাকে গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া, তাহার ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা ভারত-শিল্পের ইতিহাসেও সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

যে সকল দেশে শিল্পকলা, কেবল পরি-দৃশ্যমান আকারকে অবলম্বন করিয়া, আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সে সকল দেশের শিল্পকলার সহিত ভারতশিল্পকলার জ্ঞাতিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। ভারতশিল্পকলা আকারের ভিতর দিয়া ভাব ফুটাইবার চেষ্টা না করিয়া, ভাবকেই আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের সকল যুগের মূর্ত্তিশিল্পেরই মূলপ্রকৃতি এক রূপ;—তাহা আভাসাত্মক। অনির্ব্বচনীয়ের আভাস প্রকাশ করিয়াই তাহা কৃতকৃতার্থ। তাহার মূলসূত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

কেবল শিল্প-সৌন্দর্য্যের বিচারেই এই মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার পথই প্রকৃত পথ;—সেই পথে ভারতশিল্পের মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা শ্রমসাধ্য বলিয়া, তাহাতে সহসা পদার্পণ না করিয়া, অনেকে প্রতিভাবলেই ভারত-শিল্পের ব্যাখ্যা-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ইতিহাস এইরূপে উপেক্ষিত হইলে, সত্যনির্ণয় করা সহজ হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভারতশিল্পের মূলসূত্রের সন্ধান লাভ করিতে হইলে,

ভারতবর্ষের জনসমাজের সর্ব্ববিধ আত্ম-বিকাশচেষ্টার ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইবে।

ফার্গুসন্ তাঁহার অমরগ্রন্থে একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"ভারতশিল্পে হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন নামক তিনটি রচনারীতি দেখিতে পাওয়া যায়।" তাহাকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, অনেকেই ভারতশিল্পকে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন নামক তিনটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি সর্ব্বত্র সকল যুগে একরূপ হইলেও, যুগে যুগে নানা স্থানে নানা রচনারীতি মূলসূত্রের ভাষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে কেবল স্থান-কালের প্রভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাবই শিল্পের পক্ষে একরূপ। অনির্ব্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টাতেই তাহার পরিসমাপ্তি। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূল প্রস্রবণ একস্থানে বলিয়াই ভারতবর্ষ সমন্বয়-ক্ষেত্র। তাহার প্রভাব শিল্পের ইতিহাসেও দেদীপ্যমান।

যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা ভীষণে মধুরে মিশিয়া রহিয়াছে। তাহা অণু হইতে অণু এবং মহান্ হইতেও মহীয়ান্। যে যুগে যে প্রদেশে তাহা যে ভাবে মানব-মনকে বিকাশ-চেষ্টায় প্রণোদিত করিয়াছে, সেই যুগের সেই প্রদেশের রচনারীতিতে [সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূর্ত্তিশিল্পেই] তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কোন কোন যুগে কোন কোন প্রদেশে ভীষণের ভিতর দিয়া, মধুরের ভিতর দিয়া, কিম্বা ভীষণ-মধুরের ভিতর দিয়া, অনির্ব্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছে ? তৎ-কালের তৎপ্রদেশের জনসমাজ তাহা জানিত। সুতরাং আমরা যাহাকে ভীষণ বলিয়া ভ্রূভঙ্গী বিকাশ করি, তাহারা তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে বঞ্চিত হইত না। মৃত্যু অমৃতের সোপান বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইত, তাহাদিগের দৃষ্টি নিকটে নহে,—দূরে। তাহারা সকল যুগের সকল প্রদেশের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যে অমূর্ত্তকেই দর্শন করিত। আমরা মূর্ত্তিমাত্র দর্শন করিয়া, বিজ্ঞতার পরিচয় দান করিবার জন্য বলিতেছি,—কোনও মূর্ত্তি ভীষণ, কোনও মূর্ত্তি মধুর, সকল মূর্ত্তি অল্পাধিক অস্বাভাবিক !

ভারতবর্ষে স্বাভাবিক মূর্ত্তিরচনারও অভাব ছিল না; এখনও নানা স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ভারতশিল্প দেবমূর্ত্তি-রচনার সময়ে স্বভাবা-নুকরণ করিতে সম্মত হয় নাই কেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান ছিল। মানবমূর্ত্তিকে দেবমূর্ত্তির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভারতশিল্পাচার্য্যগণকেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নরনারী রচনা করিয়াই নিরস্ত হইতে হইত। কিন্তু তাহাতে ভারতশিল্পের মূলসূত্রটি ছিন্ন হইয়া পড়িত। প্রয়োজনের অনুরোধেই ভারতশিল্প সে পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে নাই। বাহিরের পট হইতে সাদৃশ্য

আহরণ না করিয়া, চিত্তপট হইতে সাদৃশ্য আহরণ করিতে গিয়াই, ভারতশিল্প এক অনন্যসাধারণ শিল্পসূত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা কদাপি পরানুকরণলব্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

ভারতশিল্প সুন্দর কি না, তাহা ইতিহাসের বিচারযোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিরূপ কার্য্যকারণশৃঙ্খলা ভারতশিল্পকে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে, তাহার প্রভাবে কোন্ প্রদেশের কোন্ যুগের ভারতশিল্প কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই কেবল ইতিহাসের বিচারযোগ্য কথা। তাহার প্রথম এবং প্রধান কথা,—ভারতশিল্পের মূলসূত্রের কথা; তাহা বাহিরে, না অভ্যন্তরে,—সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা শেষ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মানবের জন্মকথা

অসভ্য মানব এবং কুকুর অনেক সময় নিম্নভূমিতে জল দেখিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের মনে নিম্নভূমির সহিত জলের ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি বোধ হয় ঐরূপক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন; কিন্তু আমরা অসভ্যদিগের কথা যতদূর জানি তাহাতে তাহারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবে কি না, বিশেষ সন্দেহস্থল; কুকুরেরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করিবে না; কিন্তু কুকুর এবং অসভ্য মানব উভয়েই যদিও পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হউক, তথাপি আবারও একই ভাবে (জল) অন্বেষণ করিবে। তাহাদিগের মনোমধ্যে কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত বিদ্যমান থাকুক আর নাই থাকুক, তাহারা উভয়েই ঐ কার্য্য বুদ্ধিপূর্ব্বক করিবে। হস্তী এবং ভল্লুক জলে বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে। অসভ্য মানব যেরূপ গতি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কিরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হয়, সে বিষয় কিছু জানেও না, জানিতে ইচ্ছাও করে না। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মোটামুটি একটা বুদ্ধিপরিচালনার ফল; দার্শনিক পণ্ডিতের সুদীর্ঘ বিচারমূলক সিদ্ধান্ত সকল যে ভাবে নিষ্পন্ন হয়, অসভ্যেরও নিশ্চয়ই তদনুরূপ। কিন্তু অসভ্যের এবং উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যে নিশ্চয়ই এ প্রভেদ থাকিবে যে অসভ্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের এবং অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিবে, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিদর্শনান্তে ঐ বিষয় এবং অবস্থার মধ্যে একটা সমবায় সম্বন্ধ বুঝিয়া বসিবে। ইহা তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। আমার একটী শিশু সন্তানের কর্ম্মগুলি আমি প্রত্যহ লিখিয়া রাখিতাম; সে যখন ১১ মাস বয়সের হইল এবং একটী কথাও বলিতে পারে না, তখন তাহার মনে সর্ব্বপ্রকার বস্তু এবং শব্দের অর্থ যেরূপ দ্রুতগতি সংযুক্ত হইতে

লাগিল, তাহার সহিত অতিশয় বুদ্ধিমান কুকুরের ব্যবহার যতদূর দেখিয়াছি তাহা তুলনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীস্থ এবং পাইক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যেও বস্তুর সহিত শব্দ সংযোগ-বিষয়ে এবং পর্য্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত করা সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার প্রভেদই দেখা যায়।

অল্প পরিদর্শনের পরেও বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজনা কিরূপ হয় তাহা আমেরিকান্ বানরগণের নিম্নশ্রেণীস্থদিগের ব্যবহার দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়। রেঙ্গার যত্নপূর্ব্বক উহা পরিদর্শন করিতেন। তিনি যখন প্যারা গোয়া দেশে তাঁহার বানরদিগকে ডিম্ব দিয়াছিলেন তখন তাহারা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সুতরাং তন্মধ্যস্থ পদার্থ অনেক নষ্ট হইত; কিন্তু পরে তাহারা ডিম্বের একদিক কোন কঠিন বস্তুর উপর আস্তে আঘাত দিত, এবং খোসার ভগ্নস্থানগুলি অঙ্গুলি দ্বারা খুঁটিয়া তুলিত। একবার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে হাত কাটিলে তাহারা ঐ অস্ত্র আর স্পর্শও করিত না, অথবা স্পর্শ করিলেও অতি সাবধানে করিত। অনেক সময় তাহাদিগকে কাগজে জড়াইয়া চিনি দেওয়া হইত; রেঙ্গার কখন কখন ঐ কাগজের মোড়কের মধ্যে জীবিত বোল্‌তা দিতেন; বানরেরা তাড়াতাড়ি কাগজ খুলিতে গেলে বোলতায় কামড়াইয়া দিত। এইরূপ একবার দংশন করিলে পর উহারা প্রত্যেকবার কাগজের মোড়ক প্রথমে কাণের কাছে আনিয়া উহার মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ শুনা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিত।

নীচে কুকুরের কতিপয় ব্যবহারের উল্লেখ করিতেছি। মিঃ কোহন (Colquhoun) দুইটী বন্য হংস উড্ডীয়মান অবস্থায় শীকার করিয়াছিলেন, উহার একটী নদীর অপর পারে পড়িয়াছিল; তাঁহার কুকুর একসঙ্গে দুইটাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিল না; তৎপর ঐ কুকুর যে কখন কোন পাখীর একটী পালখ উলট্-পালট্ করে নাই সে একটী হংসকে মারিয়া ফেলিল, এবং অপরটীকে লইয়া এপারে আসিল, পরে ঐ মৃতপাখীটী আনিতে গিয়াছিল। কর্ণেল হাচিন্‌সন্ বর্ণনা করিয়াছেন যে একসঙ্গেই দুইটী পার্টিজকে গুলি করা হয়, একটী হত অপরটী আহত হইয়াছিল। আহতটী দৌড়াইয়া পলাইতেছিল, তখন শিকারী কুকুর তাহাকে ধরিল, এবং ফিরিয়া আসিবার সময় মৃত পার্টিজটীকে দেখিতে পাইল। "সে ক্ষণকাল থামিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; তা'রপর যখন বুঝিল যে ঐ মৃতটী আনিতে হইলে জীবিতটী পলাইয়া যায় তখন সে ক্ষণকালমাত্র বিবেচনা করিবার পর তখনই ইচ্ছা করিয়াই জীবিতটিকে বলপূর্ব্বক হত্যা করিল, তৎপর দুইটীকেই একসঙ্গে লইয়া আসিল সে এই একবার মাত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক শিকার নষ্ট করিয়াছিল জানা যায়।" এখানে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইতেছি কিন্তু উৎকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাই না; কারণ কুকুর প্রথমে আহতটীকে আনিয়া পরে মৃতটীকে আনিলেই পারিত, যেমন বন্যহংস আনিবার সময় করা হইয়াছিল। এই দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার হেতু এই যে

দুইজন পরিদর্শক পৃথক ভাবে অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে দেখা যায় যে শিকারী কুকুর (Retreiver) যাহারা বংশানুক্রমিক অভ্যাসবশতঃ কখনও শিকারকে বধ করে না, তাহারাও বংশানুগত অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করিয়াছিল ; সুতরাং বুঝা গেল যে, বদ্ধমূল অভ্যাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে তাহাদিগের বিচার-বুদ্ধি কতদূর প্রবল হইয়াছিল !

বিখ্যাত হাম্‌বোল্ট মহোদয়ের একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমি এ বিষয় শেষ করিব। দক্ষিণ আমেরিকার খচ্চর-চালকগণ বলে "যে খচ্চরটীর চলন মৃদু, তাহা আপনাকে দিব না, যেটীর বুদ্ধি ভাল সেইটী দিব।" ইহা হইতে হাম্‌বোল্ট বিবেচনা করেন যে "ভূয়োদর্শন হইতে এই যে কথাটী প্রচলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীব অণুমাত্র, কলমাত্র—এই মত এত উত্তমরূপে খণ্ডিত হইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রের বিবিধ যুক্তি-তর্কেও তেমন হইতে পারে না।" তথাপি কোন কোন লেখক অদ্যাপিও বলেন যে উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তু-গণের বুদ্ধিবৃত্তির চিহ্নমাত্রও নাই। উপরে যে সকল বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলাম তদনুরূপ বৃত্তান্ত তাঁহারা কেবল বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ ব্যাখ্যায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

আমি বিবেচনা করি, ইহা এক্ষণে প্রতিপন্নই হইয়াছে যে মানবের এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুর, বিশেষতঃ বানরগণের মধ্যে কতিপয় সহজাত বৃত্তি সাধারণ। উহাদিগের সকলের ইন্দ্রিয়গণ একই প্রকার, অনুভূতি এবং স্বাভাবিক সংস্কারও একই ; কাম-ক্রোধাদি রিপু, স্নেহমমতা, ভাবপ্রবাহও তুল্যরূপ ; এমন কি, অপেক্ষাকৃত জটিলবৃত্তি-গুলিও একই প্রকার, যেমন হিংসা, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা, কৃতজ্ঞতা, মহত্ত্ব। উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণ প্রতারণা করে ও প্রতিহিংসা লয় ; উহারা সময় সময় ব্যঙ্গ বুঝিতে পারে, এবং উহাদিগের রসিকতার ভাবও আছে। উহাদিগের আশ্চর্য্য বোধ ও কৌতূহল আছে। অনুকরণবৃত্তি, মনঃসংযোগ, চিন্তা-শীলতা, উৎকর্ষাপকর্ষবোধ, স্মৃতি, কল্পনা, ভাবসংযোগ, বুদ্ধিবৃত্তি—এ সকলই উহাদিগের আছে, কিন্তু সকলের সমান পরিমাণে নাই। একজাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রমিক প্রভেদ অনুসারে প্রায় জড়বৎ নির্ব্বোধ হইতে অতিশয় বুদ্ধিমান পর্য্যন্ত সকলই দেখা যায়। উহারা উন্মাদও হইতে পারে, কিন্তু অনুপাতে মানুষ অপেক্ষা অনেক কম সময় হইয়া থাকে। তথাপি অনেক গ্রন্থকার দৃঢ়তার সহিত বলেন যে মনোবৃত্তিতে মানুষে এবং ইতর জন্তুতে অলঙ্ঘ্য প্রভেদ বিদ্যমান আছে। আমি ইতিপূর্ব্বে এইরূপ উক্তি বিংশতির অধিক সংগ্রহ করিয়া-ছিলাম, কিন্তু সে সকলগুলিই প্রায় মূল্যহীন, কারণ এই সকল উক্তির সংখ্যা ও পরস্পরের গুরুতর পার্থক্য বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে ঐরূপ সংগ্রহের চেষ্টা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে কেবল মানুষই উত্তরোত্তর ক্রমিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম ; এবং সকল মানুষই যন্ত্র ও অগ্নি ব্যবহার করে, অন্য জন্তুকে গৃহপালিত করে, অথবা সম্পত্তি অধিকার করে, অন্য কোন জন্তুর সামান্য-বিধি

নিষ্পন্ন করিবার অথবা সাধারণ-সংস্কার ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই; উহাদিগের কাহারও আত্মজ্ঞান অথবা আত্মবোধ নাই; উহারা কেহই ভাষা ব্যবহার করে না; কেবল মানুষেরই সৌন্দর্য্য-বোধ আছে; খামখেয়ালি, কৃতজ্ঞতা, অজ্ঞেয়ের ভাব, ঈশ্বরে বিশ্বাস, অথবা হিতাহিত জ্ঞান আছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে আমি সাহস করিয়া গোটাকতক কথা বলিব।

আর্কবিসপ্ সায়ার পূর্ব্বে বিবেচনা করিতেন যে কেবল মানুষই ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে পারে। মানুষ অন্য প্রাণী অপেক্ষা অতুলনীয় অধিক উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতবেগে লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রধান কারণ বাক্‌শক্তি এবং এক পুরুষের জ্ঞান পুরুষপরম্পরায় সংক্রমিত হওয়া। ইতর জন্তু সম্বন্ধে প্রথমে ব্যক্তিগত হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কগণকে অতি সহজে ফাঁদে ধরা যায়। যাঁহার ফাঁদ পাতায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই এ কথা জানেন। বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কদিগের নিকট শত্রুও সহজে আসিতে পারে। বৃদ্ধদিগকেও একস্থানে এক ফাঁদে বহুসংখ্যক ধরা অসম্ভব; এক প্রকার বিষ দিয়া বহুসংখ্যক বৃদ্ধকে বধ করা যায় না। সকলেই যে ঐ বিষ খাইয়াছিল তাহা হইতে পারে না; অথবা এক ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল তাহাও নহে। উহারা নিশ্চয়ই অন্য জন্তু ফাঁদে বদ্ধ হওয়া অথবা বিষ খাইয়া মরা দেখিয়া সাবধান হইতে শিক্ষা করিয়াছে। উত্তর আমেরিকাতে সকল পরিদর্শকই দেখিয়াছেন, যে সকল লোমশ জন্তুদিগকে দীর্ঘকাল অবধি তাড়াইয়া (ধরা) হইতেছে তাহারা অসম্ভব ধূর্ত্ততা, সাবধানতা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়; কিন্তু তথায় এত দীর্ঘকাল ফাঁদ পাতিয়া শিকার করা হইতেছে যে সম্ভবতঃ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে উহারা ঐ সকল বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। * অনেকে আমাকে জানাইয়াছেন যে, যখন কোন জেলায় প্রথম টেলিগ্রাফের তার বসান হয় তখন উড়িবার সময় তারে ঠেকিয়া অনেক পক্ষী মারা পড়ে; কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহারা অন্যান্য পক্ষীকে ঐরূপে মরিতে দেখিয়া ঐ বিপদ হইতে দূরে থাকিতে শিক্ষা করে।

জন্তুগণের বংশপরম্পরা অথবা জাতির কথা বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তুগণ মানুষ এবং অপর শত্রু হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা ক্রমে শিক্ষা করে, এবং ক্রমেই ঐ শিক্ষা ভুলিয়াও যায়। এই সতর্কতা প্রধানতঃ বংশানুক্রমিক অভ্যাস অথবা সহজ-বৃত্তি, সন্দেহ নাই, কিন্তু অংশতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও ফল। লিয়র বলেন, যে সকল স্থানে বেশি শৃগাল শিকার করা হয় তথায় বাচ্চাগুলি গর্ত্ত হইতে প্রথম বাহির হইয়াই যেরূপ সতর্কতা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অন্য স্থানে করে না।

* এ সকল বংশানুক্রমে হওয়া এক্ষণে স্বীকৃত হয় না; বৃদ্ধের দুর্দ্দশা দেখিয়া অল্পবয়স্কেরা ধূর্ত্ততা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

আমাদের গৃহপালিত কুকুরগুলি শৃগাল ও নেকড়ে বাঘ হইতে জাত হইয়াছে ; যদিও তাহাদিগের ধূর্ত্ততা বাড়ে নাই, এবং সাবধানতা ও আশঙ্কা কমিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের স্নেহ, বিশ্বাসিতা, মেজাজ এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি নৈতিক গুণ উন্নত হইয়াছে। ইউরোপে, উত্তর আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে, নিউজিল্যাণ্ডে, এবং সম্প্রতি ফর্ম্মোসা দ্বীপে ও চীনদেশে সাধারণ ইন্দুর অন্যান্য জাতীয় ইন্দুরকে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। মিঃ সুইন্‌হো বলেন যে ফর্ম্মোসা ও চীনের ঐ সকল ইন্দুর অধিকতর চতুর, এই নিমিত্তই বৃহৎকায় মুস্ কনিঙ্গা জাতীয় ইন্দুরকেও পরাজয় করিয়াছে। মানব কর্ত্তৃক নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হওয়ায় উহারা বুদ্ধি পরিচালন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে করিতেই চতুরতা শিক্ষা করিয়াছে। এবং অল্পবুদ্ধি অথবা নির্ব্বোধগুলি ক্রমশঃ বিনষ্ট হওয়াতেও ঐরূপ হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু মানুষের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বেও ঐ সাধারণ ইন্দুর অন্যজাতীয় ইন্দুর অপেক্ষা অধিকতর চতুর ছিল, এবং তদ্ধেতুই বিজয়ী হইয়াছে, ইহাও সম্ভব নহে। কোন মুখ্য প্রমাণ না পাইয়াও, যদি কেহ বলেন যে কোন ইতর জন্তুই চিরাতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে এবং অন্যান্য মনোবৃত্তিতে উন্নতি লাভ করে নাই, তবে তিনি জীব-বিবর্ত্তনতত্ত্বে যাহা প্রমাণ-অপ্রমাণের বিষয় তাহার সম্বন্ধে আগে হইতেই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। আমরা জানি যে লার্টেটার মতানুসারে জন্তু-যুগ * অপেক্ষা এক্ষণে সকল স্তন্যপায়ী জীবের মস্তিষ্কই বড় হইয়াছে।

অনেক সময় কথিত হয় যে কোন ইতর জন্তুই যন্ত্র ব্যবহার করে না। কিন্তু বন্য সিম্পাঞ্জি পাথরের আঘাত দিয়া ফল ভাঙ্গে ; যেমন কাট বাদাম ভাঙ্গা যায় সেইরূপ। রেঙ্গার একটী আমেরিকান বানরকে এই ভাবে কঠিন সুপারী ভাঙ্গিতে শিখাইয়াছিলেন। ঐ বানর শেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য প্রকার সুপারী অথবা বাক্স পাথর দ্বারা ভাঙ্গিয়া খুলিত। সে এই ভাবে দুর্গন্ধযুক্ত ফলের খোসা খুলিত। আর একটী বানরকে লাঠি দিয়া একটা বড় বাক্স খুলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল ; পরে সে ঐ লাঠি দ্বারা ঠেলা দিয়া ভার বস্তু নড়াইত। আমি নিজে দেখিয়াছি, একটী অল্পবয়স্ক ওরাংওটাং এক ফাটা স্থানের মধ্যে লাঠির এক দিক প্রবেশ করাইয়া দিয়া অপর দিক হাত দিয়া ধরিয়া লিবারের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। অনেকেই জানেন ভারতবর্ষে পোষা হাতী গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া তদ্দ্বারা গায়ের মাছি তাড়াইয়া থাকে ; একটী বন্য হস্তীকেও ঐরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, একটা ছোট ওরাংওটাং যখন ভাবিল যে তাহাকে চাবুক মারা হইবে তখন সে একটা কম্বল অথবা খড় দিয়া গা ঢাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সকল স্থলে পাথর এবং লাঠি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল ; কিন্তু উহাদিগকে অস্ত্রস্বরূপও ব্যবহার করে। সিম্পারের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া ব্রেস্ বলেন যে এবিসিনিয়া দেশে যখন একজাতীয় বানরের দল পাহাড়

* Tartiary age.

হইতে নামিয়া ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিতে আসে, তখন তাহারা সময় সময় অপরজাতীয় বানরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। গেলাডা জাতীয়গণ বড় বড় পাথর গড়াইয়া দেয়, হেমাড্রিয়া জাতীয়গণ তাহা এড়াইবার চেষ্টা করে; তৎপর উভয় জাতীয় বানরই অত্যন্ত চিৎকার করতঃ পরস্পরকে বেগে আক্রমণ করে।

ব্রেস যখন কোবার্গ গোথা দেশের ডিউকের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এবিসিনিয়ায় মেনসা-পথের মধ্যে একদল বেবুন বানরকে উভয়েই বন্দুক লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। বানরগণ তখন পর্ব্বত হইতে এত পাথর গড়াইয়া দিয়াছিল, (তাহার মধ্যে মানুষের মাথার মত বড় পাথরও ছিল) যে আক্রমণ কারীদিগকে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে হইয়াছিল, এবং কিছু দিন পথিকগণ ঐ পথে যাইতে পারিল না। ঐ সকল বানর সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ করিয়াছিল, ইহা উল্লেখযোগ্য। মিঃ ওয়ালেস্ তিনবার দেখিয়াছিলেন, "যখন তাঁহারা কতকগুলি সপুত্রক বানরীর গাছের নিকট যাইতেছিলেন, তখন বানরীরা ক্রোধান্বিত হইয়া ডুরিয়ান গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ও কাঁটাযুক্ত ফল ছিড়িয়া তাঁহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে তাঁহারা আর উহার নিকটে যাইতে পরিলেন না। আমি অনেক বার দেখিয়াছি, সিম্পাঞ্জিকে কেহ বিরক্ত করিলে হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই তাহার দিকে ফেলিয়া মারে। পূর্ব্বে যে বেবুন বানরের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে ঐ জন্য কাদা প্রস্তুত করিয়াছিল। (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

চরিত-চিত্র

স্বর্গীয় উইলিয়েম. টি, ষ্টেড্

বাল্যকাল হইতে ইংরেজি গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের চরিতাখ্যান পড়িয়াছি। ইংরেজসমাজের মাঝখানে বসিয়াও ছোট-বড় অনেক ইংরেজের সঙ্গে নানা কর্ম্মে, নানা ভাবে, মেশামিশি করিয়াছি। কিন্তু উইলিয়েম, টি, ষ্টেডের মত এমন খাঁটি ইংরেজ অতি অল্পই দেখিয়াছি।

"খাঁটি" ও "ভাল"।

যে বস্তু ঠিক আপনার স্বরূপেতে থাকে তাহাকেই আমরা খাঁটি বস্তু বলি। কিন্তু খাঁটি হইলেই যে সে বস্তু সকলের চক্ষে ভাল হইবে এমন বলা যায় না। দ্রব্যগুণসম্বন্ধে, বোধ হয়, যা খাঁটি তাই ভাল, আর যা ভাল তাই খাঁটি হয়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা যায় কি? আমরা কোনো দ্রব্যের নিজের-প্রকৃতির দ্বারাই তার সত্যিকার ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের বেলা আমরা তার ভিতরকার প্রকৃতির সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সন্ধান করি না; আমাদের

নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি রুচি ও অভ্যাসের দ্বারাই তার ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকি। সকল মানুষ যদি সমান হইত, তবে এরূপ বিচার অসঙ্গত হইত না। কিন্তু মানুষ যে সকল সমান নয়। সকল জলই যেমন সমান, জলে জলে যে বেশ কম দেখি, তাহা জলের ভিতরকার প্রকৃতিগত নহে, জল ছাড়া অন্য কোনো ধাতুকণা বা লবনাদি তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জলের গুণের তারতম্য উৎপাদন করে; সকল সোণাই যেমন সমান; সকল পারদ গন্ধকই যেমন সমান; সকল মানুষ তো আর সেরূপ সমান নয়। মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা তা' তার প্রকৃতিগত। সে প্রকৃতির বাহিরের কোন বস্তু তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া এ সকল ভেদাভেদের সৃষ্টি করে নাই। আর মানুষে মানুষে এই প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয়াই প্রকৃতপক্ষে একের যা' ধর্ম্ম অপরের তাই ধর্ম্ম হয় না, একের ভাল মন্দের দ্বারা অপরের ভালমন্দের বিচার সঙ্গত হইতেই পারে না; সুতরাং কোনো মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকলের বিচারে সে ভালও হইবে, আর সকলে কাহাকেও ভাল বলিলেই যে সে খাঁটি হইবে, এমন কোনো কথা নাই। বরং এ সংসারে দশজনে যা'কে ভাল বলে অনেক সময় সে খাঁটি হয় না; নিজের স্বরূপেতে থাকা তার পক্ষে একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে।

ভাল ইংরেজ ও খাঁটি ইংরেজ,

এমন ইংরেজ তো দেখিয়াছি যাঁহাদিগকে আমাদে চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। এমন বিস্তর ইংরেজ সর্ব্বদাই তো দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে আমাদের চক্ষে নিতান্তই মন্দ ঠেকে। কিন্তু আমরা যাঁহাকে ভাল বলি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ আর আমরা যাঁহাকে মন্দ দেখি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ নহেন, এমন কথা বলা যায় কি? বরং আমরা যে ইংরেজকে বড় ভাল বলি তার পক্ষে খাঁটি ইংরেজ না হওয়ারই সম্ভাবনা কি বেশী নাই? লাট রিপণ্ আমাদের চক্ষে বড় ভাল ইংরেজ ছিলেন। তাঁর মত এমন ভাল লাট বহুদিন ভারত শাসন করিতে আসেন নাই। কিন্তু রিপণচরিত্রে যে বস্তু দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে বস্তু ইংরেজচরিত্রের বিশেষত্ব নহে। রিপণের শান্তমূর্ত্তি, সদাপ্রসন্ন ভাব, সমাহিত চেষ্টা-চরিত্র, ধর্ম্মভয় ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া আমরা ইংরেজ আভিজাত্যের পরিচয় পাই নাই, বরং আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শেরই কথঞ্চিৎ আভাস পাইতাম। আর তারই জন্য রিপণকে আমাদের এতটা ভাল লাগিয়াছিল। রিপণ লোক অতি মহৎ ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না। রিপণের মত, ভারত-বন্ধু স্যার হেন্‌রি কটনও লোক অতি ভাল। রিপণকে দেখিয়া যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভাব মনে আসিত, কটনকে দেখিয়া, তাঁর কথাবার্ত্তায় ভাবস্বভাবে, কতকটা সেইরূপ আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্বমানবভক্ত, বাঙ্গালী আন্দোলনকারী বা এজিটেটরদের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ফলতঃ কটন যখন আসামের

চিফ্ কমিশনার ছিলেন, তখন শিলঙের সিভিলিয়ান্ সমাজ, পরিহাসচ্ছলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে "বাবু চিফ্" বলিয়াই ডাকিতেন। আর তারই জন্যই বস্তুতঃ কটনকেও আমাদের এত ভাল লাগে। কিন্তু রিপণ, কটন, এঁরা কেউ যে খাঁটি ইংরেজ, এ কথা বলিতে পারি না।

ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব।

ইংরেজের ইংরেজত্ব বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, সে বস্তু যাঁর ভিতরে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যাইতে পারে, অন্যকে নহে। দুধ যখন সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপে থাকে, তখনই কেবল তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়। খাঁটি দুধের চাইতে কারো কারো নিকটে রাবড়ী ঢের বেশি মিষ্টি লাগে। ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থায় ঘোল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশি উপকারী হয়। কিন্তু তাই বলিয়া রাবড়ী বা ঘোল খাঁটি দুধ হয় না। যেমন দুধের দুগ্ধত্ব বলিয়া একটা বস্তু আছে, যে বস্তুরূপে দুধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়; সেইরূপ ইংরেজেরও ইরেজত্ব বলিয়া একটা বিশেষ বস্তু আছে, এ বস্তুরূপে থাকিলেই ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ হয়। দুধের দুগ্ধত্ব যেমন দুধকে দুনিয়ার আর সকল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইংরেজের এই ইংরেজত্ব বস্তুও তাহাকে দুনিয়ার আর সকল জা'ত হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সকল মানুষই এক হিসাবে সমান বটে; কিন্তু আর এক হিসাবে কোনো মানুষই আর কোনো মানুষের মত নহে। সকল মানুষেরই দেহ-গঠন মোটের উপরে এক; সকলেরই মোটের উপরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে; সকলেরই মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে মন বিরাজ করিতেছেন, মনের উপরে বুদ্ধি; বুদ্ধির উপরে আত্মা;—সভ্য ও অসভ্য, আর্য্য অনার্য্য, মানুষমাত্রেই এ সকল সাধারণ মানবধর্ম্ম রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি সকল মানুষ তো সমান নয়। কারণ এই সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মানবধর্ম্মের মধ্যেই আবার ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে তার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষকে অপর সকল মানুষ হইতে আলাহিদা করিয়া রাখিতেছে। এই ব্যক্তিত্ব-বস্তুটী তার চেহারায়, তার চাহনিতে, তার গলার স্বরে, তার পায়ের শব্দে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে রূপে সে ভাবে-চিন্তে,—এ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই যে বিশেষত্বটুকু যাহাতে এক মানুষকে আর এক মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখে, ইহাকে সাধারণ মানবধর্ম্মের অন্তর্গত ব্যক্তিধর্ম্ম বলা যাইতে পারে! যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য। সমাজের বা মনুজগোষ্ঠির কতকগুলি নিজ ধর্ম্ম আছে। আর, এই যে নিজস্ব সমাজ-ধর্ম্ম বা গোষ্ঠি-ধর্ম্ম বা জাতি ধর্ম্ম, ইহারই জন্য এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। বিশাল মনুষ্যত্বের সাধারণ ভূমিতেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, হিন্দুর হিন্দুত্বকে, ইহুদীর ইহুদীত্বকে, জর্ম্মানের জর্ম্মাণত্বকে,

ইংরেজের ইংরেজত্বকে,—এ সকল ভিন্ন ভিন্ন জা'তের জাতিত্ব বা জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানুষের হিসাবে ইহুদী ও হিন্দু, জাপ ও জর্ম্মাণ, রুশ ও চীন, ইতালীয় ও ইংরেজ, এঁরা সকলেই সমান। সকলেরই মানুষের দেহ, মানুষের মন, মানুষের ভাব-স্বভাব রহিয়াছে। অথচ জাতির হিসাবে, ইহাদের সকলেই অপর সকল হইতে ভিন্ন। হিন্দুর চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, ভাবস্বভাবে, এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা জগতের আর কোনো জা'তের ভিতরে নাই। এই বিশেষত্বটুকুই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যে সকল চিহ্ন দ্বারা দুনিয়ার অসংখ্য জা'তের মাঝখানে আমরা হিন্দুকে বাছাই করিয়া আলাহিদা করিতে পারি, তাই তার হিন্দুত্ব। সেইরূপ যে সকল চিহ্নের দ্বারা জর্ম্মাণকে জগতের আর দশটা জা'তের ভিতরে চিনিয়া লইতে পারা যায়, তাহাই তার জর্ম্মাণত্ব। আর যে সকল লক্ষণার দ্বারা ইংরেজকে এইভাবে বিশ্বের মানবসমাজের মাঝখানে চিহ্নিত করিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহাই তার ইংরেজত্ব। এই ইংরেজত্ব-বস্তু ইংরেজের চেহারায়, তার গঠনে, তার বর্ণে, তার সর্ব্ববিধ সূক্ষ্ম শারীর ধর্ম্মে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, জীবনের সকল বিভাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। যাঁর ভিতরে এই ইংরেজত্ব-বস্তু বেশি লক্ষ্য করিতে পারি, যে ইংরেজ আপনার জা'তের এই সকল স্বরূপলক্ষণেতে অবস্থান করিতেছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যায়। আর এই অর্থেই ষ্টেড্‌কে আমি অত্যন্ত খাঁটি ইংরেজ বলিতেছি।

ইংরেজত্বের শারীর লক্ষণ

আমাদের দেশের নানা জাতের নানা লোকের ভিতরে কে যে হিন্দু আর কে যে অহিন্দু ইহা যেমন তাহার চেহারাতেই অনেক সময় ধরা পড়ে, সেইরূপ বিলাতের নানা জা'তের লোকের মধ্যে কে যে ইংরেজ ইহা তার চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়। বিলাতে ইংরেজ আছে, স্কচ্ বা স্কট্ আছে, আইরিশ্ আছে, ওয়েল্‌শ্ আছে; তাহা ছাড়া জর্ম্মাণ, রুশ, ইতালীয়, ফরাসীস্, এ সকল শ্বেতাঙ্গও বিস্তর আছে। আর কিছু দিন সে দেশে বাস করিলেই কে কোন্ জা'তের লোক ইহা তাহাদের চেহারা দেখিয়াই ঠিক করিতে পারা যায়। যেখানে পুরুষানুক্রমে অসজাতীয় বিবাহ নিবন্ধন নানা জাতের রক্তের বেশি মেশামিশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে কে ইংরেজ, কে জর্ম্মাণ, কে আইরিশ, ইহা একেবারে ঠিক করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে এরূপ শোণিত-মিশ্রণ হয় নাই, সেখানে খাঁটি ইংরেজ যে কে ইহা তার চেহারাতেই ধরা পড়ে। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ভারি ভারি ঠেকে। আইরিশের বা ইতালীয়ের চেহারা যেমন কাটা ছাঁটা, ইংরেজের চেহারা সেরূপ নয়। আইরিশ বা ইতালীয়ের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপভাবে আপন আপন উৎকর্ষলাভের চেষ্টা করে, ইংরেজের যেন সেরূপ করে না। নাক, চোখ, ভ্রূ, কপোল, ললাট, কর্ণ, গ্রীবা,—আইরিশ বা ইতালীয়ের চেহারায় এরা সকলে আপন আপন অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া, সকলে মিলিয়া,

তারই ভিতর দিয়া যেন একটা সুন্দর সঙ্গত্ মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপই মনে হয়, ইংরেজের চেহারাতে এ ভাবটী লক্ষ্য করা যায় না। আইরিশের বা ইতালীয়ের, প্রাচীন গ্রীশীয়ের বা রোমকের চেহারা দেখিলে মনে হয় যে বিধাতাপুরুষ বুঝি আপনার কারখানায় নিবিষ্টমনে বসিয়া ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করিতে করিতে, অপূর্ব্ব বাঁটুলি দিয়া, এ চেহারাগুলি খুদিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজকে গড়িতে যাইয়া কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজের চেহারার উপকরণ-গুলি বেশ বাছিয়া গুছিয়াই যে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষটা যেন, কোনো দৈব কারণ-বশতঃ বিধাতাপুরুষ আঙ্গুল দিয়াই সেগুলিকেই ঠাসিয়া, টিপিয়া, ইংরেজের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, এমনই মনে হয়। তারই জন্য ইংরেজের গঠনটা কেমন মোটা, ভারি, স্থূল। চীন-জাপের মতন ইংরেজের নাক খাঁদা নয়, আবার আইরিশ বা ইতালীয়ের মত চাঁছাছোলাও নয়, কিন্তু মোটা। ইংরেজের চক্ষু আকর্ণায়তও নহে, অথচ খুব ছোটও নহে; কিন্তু রংএ ও আকারে কতকটা মার্জ্জার চক্ষুরই মত; তার মোহিনীশক্তি অত্যন্ত কম। ইংরেজের কেশ কটা; চিবুক চওড়া; গ্রীবা বঙ্কিমও নয়, খাটও নয়, কিন্তু কতকটা মোটা। তার সমুদয় দেহগঠনই অনেকটা স্থূল। কিন্তু এই স্থূলত্বে কোনো বিশেষ কমনীয়তা ফুটিয়া উঠে না, কেবল সতেজ রক্তমাংসের একটা জীবন্ত প্রভাবই যেন অনুভূত হইয়া থাকে। এই রক্তমাংসের প্রভাবের একটা বিশেষ শব্দ ইংরেজিতে আছে, আমাদের ভাষায় আছে বলিয়া জানি না। ইংরেজিতে এ বস্তুকে এনিম্যালিজ্ম্ (Animalism) বলে। আর খাঁটি ইংরেজ যত কেন উন্নতচরিত্রের হউন না, এই এনিম্যালিজ্ম্ বস্তুটী তাঁর চেহারাতে সর্ব্বদাই স্বল্প বিস্তর ফুটিয়া রহে। বুলডগ (Bulldog) নামে যে এক জাতীয় বিলাতী কুকুর আছে, সারমেয়-সমাজে তার চেহারা যে ছাঁচের, কুকুরজাতির ভিতরে সে চেহারার যে বিশেষত্ব আছে, মনুষ্যসমাজে ইংরেজের চেহারাও কতকটা সেই ছাঁচের

ইংরেজত্বের মানস-লক্ষণ

ইংরেজের চেহারা স্থূল কিন্তু শক্ত, মোটা কিন্তু অনমনীয়, কোন অঙ্গই তার অপরিস্ফুট নাই, অথচ কোন অঙ্গই যেন জড়ত্বের ও ইতরজীবত্বের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। যেমন ইংরেজের চেহারায় বুল ডগ্‌কে মনে করাইয়া দেয়, তেমনি তার প্রকৃতিও অনেকটা এই বুল্‌ডগেরই মত। বুল্‌ডগ্ একবার কোনো শীকারের পশ্চাতে ছুটিলে সে শীকারকে কখনো ছাড়িয়া আসে না। একবার কোনো শীকারকে ধরিলে, প্রাণ যায় যাক্ তবুও তার দাঁতের কবাট আর খোলে না। ইংরেজও সেইরূপ যে লক্ষ্যকে একবার সন্ধান করে, তাহাকে কখনো লাভ না করিয়া ছাড়ে না। যাহা একবার ধরে, প্রাণান্ত হইলেও তাহাকে আর পরিত্যাগ করে না। সহজে সে কোনো বিষয়ে কাণ দেয় না। হুজুকে পড়িয়া সে আত্মহারা

হয় না। কোনো বস্তুকে বুঝিতে তার সময় লাগে। কোনো লক্ষ্যকে সন্ধান করিবার পূর্ব্বে সে অনেক ভাবে-চিন্তে। তার বৈশ্যপ্রকৃতি ক্ষতি-লাভের খতিয়ান না করিয়া কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু একবার যদি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে, একবার যদি কোন লক্ষ্যকে সন্ধান করে, একবার যদি কোনো ব্যাপারে হাত দেয়, তবে তার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টায় ইংরেজ আর অগ্রপশ্চাৎ বা ভালমন্দ, বা ক্ষতিলাভ, কোন কিছুরই গণনা করে না। ইংরেজকে দেখিলেই, তার চেহারার ভিতরেই, একটা পশুভাবের প্রভাব লক্ষ্য হয়। তার শারীর প্রকৃতিকে অনেকটা তামসিক বলিয়াই মনে হয়, সত্য; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে নিদ্রালস্য প্রভৃতি তমোধর্ম্মের লেশ মাত্র আছে বলিয়াও বোধ হয় না। ইংরেজ ব্যবসাদার, দোকান-পশারীর জাত, অথচ দোকানীপশারীর স্বভাবসুলভ কৃপণতা তাহাতে নাই। ইংরেজের বুদ্ধি অনেকটা স্থূল সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মতত্ত্ব ধরিবার শক্তি তার কম, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অথচ স্থূলবুদ্ধি লোকের মধ্যে যে এক প্রকারের মানসিক জড়তা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কথাটা আপাতত স্ববিরোধী হইলেও নিরতিশয় সত্য যে জগতের অপর জাতির মধ্যে সচরাচর যাহা নিতান্ত দোষের বলিয়া গণ্য হয়, ' তাহাই ইংরেজের মধ্যে, ইংরেজপ্রকৃতির বিশেষত্বনিবন্ধন, তার অশেষ গুণগরিমার মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

স্টেডের শারীর লক্ষণ ও মনের প্রকৃতি

ইংরেজপ্রকৃতির এই সহজ ও বিশেষ ধর্ম্মগুলি ষ্টেডের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সকল প্রসিদ্ধ ইংরেজের চেহারা দেখিয়াছি, তার কোথাও ইংরেজের ইংরেজত্বটী এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। গ্ল্যাডষ্টোন্ কি মর্লে, টেনিসন্ কি মরিস্, হ্যারিসন্ কি স্পেন্‌সার, এঁদের সকলের চেহারাতেই এমন কিছু না কিছু চাঁছা-ছোলার, কাটাকুঁদার ভাব ছিল, যে ভাব খাঁটি ইংরেজের চেহারায় নাই। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ঢালাই জিনিষ, খোদাই জিনিষ নহে। এ চেহারা অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল। ষ্টেডের চেহারাও ঢালাই ছিল, খোদাই ছিল না। তাহাও অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল ছিল। ষ্টেড্‌কে দেখিয়া মনে হইত, বিধাতাপুরুষ যে বিশেষ ছাঁচে প্রথমে ইংরেজকে গড়িয়াছিলেন, বহুদিন পরে বুঝি সেই ছাঁচটাকে ধুইয়া মুছিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, আবার যেন তাহাতেই আমাদের এ কালে ষ্টেড্‌কে ঢালাই করিয়া পাঠাইয়াছেন। ষ্টেডের মাথাটা বড় ছিল। আর সেই বড় ও সুগোল মস্তকের ঘননিবিড় কেশরাশি তাঁর ভিতরকার ভাবপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করিত। অতিশয় ভাবপ্রবণ লোকে একটু লঘুচিত্ত, একটু চঞ্চল, একটু নিষ্ঠাহীন হইয়াই থাকে। কি আইরিশ্, কি স্পেনীয়, কি ফরাসীস্, কি ইতালীয়,—য়ুরোপের

ভাবপ্রবণ লোকেরা সকলেই স্বল্পবিস্তর লঘুচিত্ত ও চঞ্চল ও নিষ্ঠাহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরেজের চরিত্রে এ লঘুচিত্ততা, এ চাঞ্চল্য, এ নিষ্ঠাহীনতা নাই বলিলেই হয়। ষ্টেডের আন্তরিক ভাবপ্রবণতার মধ্যেও এরূপ লঘুচিত্ততা বা চাঞ্চল্য বা নিষ্ঠাহীনতা ছিল না। তাঁর সুগঠিত মস্তকের নিবিড় কেশরাশি যেমন তাঁর ভাবপ্রবণতার পরিচয় দান করিত, তেমনি আবার তাঁর প্রশস্ত ললাট, উন্নত কপোল, অপেক্ষাকৃত স্থূল অধরোষ্ঠ ও আয়ত চিবুকের ভিতর দিয়া তাঁর চরিত্রের স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার আভাই ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁর চোখ দু'টী ছোট ছিল। কিন্তু সেই ছোট গোলকের তীব্র দৃষ্টির ভিতর দিয়া লোকচরিত্র বুঝিবার একটা অসাধারণ শক্তি এবং আপনার স্বত্বস্বার্থ রক্ষা করিবার উপযোগী একটা বণিকস্বভাবসুলভ চতুরতাও প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ষ্টেডের মুখের দিকে চাহিলেই মনে হইত, এ লোককে ক্ষেপান যায়, কিন্তু ঠকান যায় না। এ ব্যক্তি ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া, কোন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বনাশকে অকুতোভয়ে আলিঙ্গন করিতে পারে; কিন্তু ভাল করিয়া না বুঝিয়া, আপনি কোন বিষয়ের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত না করিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় বা কোন হুজুকের টানে, গোলে হরিবোল দিয়া, অন্ধকারে এক পা-ও চলিতে পারে না। ষ্টেডের চেহারার ভিতর দিয়াই এ সকল যেন ফুটিয়া বাহির হইত।

ষ্টেডের বাল্যশিক্ষা

ষ্টেড্ অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া অতি সামান্য ভাবেই জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমরা আজিকালি উচ্চশিক্ষা বলিয়া জানি, সে শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ষ্টেড্ কোন বড় স্কুলে যান নাই। বিলাতে আমাদের দেশের মত বর্ণভেদ নাই, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। বর্ণভেদে সামাজিক পদ-মর্য্যাদাকে একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের জন্ম ও কুলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রেণীভেদে সামাজিক পদ-মর্য্যাদাকে অনেক পরিমাণে ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বর্ণভেদের উপরে যে সমাজ গঠিত, সেখানে ধনের মূল্য কখনই অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাইতে পারে না। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অন্যদিকে শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজ গড়িয়া উঠে, সেখানে ধনের মূল্যটা আপনা হইতেই চড়িয়া যায়। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে জীবনের সকল পথেই একটা দুরতি-ক্রমণীয় ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ণভেদ-প্রতিষ্ঠিত সমাজে, যে বড় কুলে জন্মাইল, তার ধন থাক্ বা না থাক্, আপনার কুলোচিত বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাকে উপার্জ্জন করিতেই হয়। সমাজও সেখানে আত্মরক্ষার জন্য আপনা হইতেই এই বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রেণীভেদপ্রতিষ্ঠিত সমাজে টাকা দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। এইজন্য শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে বিদ্যালাভ

ধনীদেরই সাধ্যায়ত্ত, দরিদ্রের পক্ষে সহজ নহে। বিলাতে ইটন্ (Eton), হ্যারো (Harrow), উইন্‌চেষ্টার (Winchester), রাগ্‌বী (Rugby) প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্কুল আছে। দেশের বড়লোকের বালকেরাই এই সকল স্কুলে যাইতে পারে। আভিজাত্যের দাবী যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে এ সকল স্কুলে যাওয়া অসম্ভব। এ সকল স্কুলের বালকেরাই অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ্ (Cambridge) এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ্ (Cambridge) এই দুই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলেরই প্রতি উন্মুক্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানে বিদ্যালাভ করা এতই ব্যয়সাধ্য যে দেশের সাধারণ গরিব লোকে সে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। তার উপরে এই দুইটী বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের অভিমান জাগিয়া আছে যে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সেখানে যাইয়া অনেক সময় "হংস মধ্যে বকো যথা"র ন্যায় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ষ্টেড্ গরিব গৃহস্থের সন্তান। বিলাতী সমাজের আভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোন প্রকারের সম্বন্ধের গন্ধ মাত্রও ছিল না। সুতরাং কোন প্রসিদ্ধ স্কুলে বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া কোন প্রকারের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অতি অল্প বয়সেই এক আফিসের ছোক্‌রার বা এরেণ্ড বয়ের (Errand-Boy) কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ষ্টেড্‌কে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়।

কালেজের শিক্ষা ও কাজকর্ম্মের শিক্ষা

বিধাতার বিশ্বের যেখানেই কোন বিশেষ মন্দ জাগিয়া উঠে, সেখানে সেই মন্দেরই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধায়ক ভালটাও আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের প্রকৃতি কখনই চিরকাল বা দীর্ঘকাল কোন মন্দকে আশ্রয় করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব, সমাজের পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাহা অপূর্ণ তাহাই মন্দ। আর মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার বীজ বুকে ধরিয়া ঋজুকুটিলভাবে সেই পূর্ণতার দিকেই ক্রমে ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তিও ইহাই করিতেছে, সমাজ এই পথেই চলিতেছে। আর তারই জন্য কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার ভিতরেই ভালোর মধ্যেই মন্দ ও মন্দের মধ্যেই ভালো মিশিয়া রহে। এই জন্য রজতপ্রধান বিলাতীসমাজে গরিব লোকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিম্বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যালাভ করা যেমন কঠিন, অন্যদিকে সেইরূপ এ সকল সুযোগ না পাইয়াও যত লোক সেখানে কেবল আপনার অনুশীলন ও অধ্যবসায়বলে অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে অসাধারণ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন সমাজে তাহা সম্ভব হয় না। কি ব্যবসা-বাণিজ্যে কি রাষ্ট্রীয় কার্য্যে কিম্বা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে বিলাতে যাঁহারা সমাজে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহাদের সকলে না অনেকেই

যে অক্সফোর্ড্ বা ক্যাম্ব্রিজের লোক, এমন নহে। ইংরেজের বিশাল বাণিজ্য যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহাদের একজনেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজজাতির ক্ষাত্রবীর্য্য যে সকল মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গেই বা অক্স-ফোর্ড্ বা ক্যাম্ব্রিজের কোন সম্পর্ক ছিল? বারুণীর অঙ্কে বর্দ্ধিত ইংরেজের নৌ-বিলাস হইতেই ইংলণ্ডের বিশ্ববিজয়িনী নৌশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের শিক্ষা হইতে হয় নাই। ফলতঃ সকলে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজে যাইতে পারে না বলিয়াই ইংরেজসমাজের এত লোক বাল্যে কোন শিক্ষা না পাইয়াও শুদ্ধ আপনাদের অদম্য অধ্যবসায়বলে পর-জীবনে সমাজের শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। এই অদম্য অধ্যবসায় ইংরেজ-চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।

ষ্টেডের অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব

এই অধ্যবসায় গুণেই ষ্টেড্ও অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া, শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষালাভের কোনো সুযোগ না পাইয়াও, পরজীবনে কেবল আপনার দেশে নহে, কিন্তু সমগ্র সভ্যসমাজে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন যে সামান্য হরকরার কাজে নিযুক্ত হইয়া লণ্ডনের রাজপথে চিঠি হাতে করিয়া ছুটোছুটি করিত, পরে এমন এক দিন আসিল, যখন রুসিয়ার জার (Czar) ও জর্ম্মণীর ক্যায়সার (Kaiser), তুরস্কের সুলতান ও ইংলণ্ডের সম্রাট, নিয়ম-তন্ত্রাধীন রাজমন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রাধীন প্রেসিডেণ্ট, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক, তাঁহারই পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অথচ ষ্টেড্ কখনো সাক্ষাৎভাবে কোন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মভার গ্রহণ করেন নাই। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাঁহার অপেক্ষা অনেক নীচুদরের ইংরেজও পার্লেমেণ্টে যাইয়া ক্রমে মন্ত্রীদলে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে ষ্টেড্ও তাহা পারিতেন কিন্তু এ চেষ্টা তিনি কখনো করেন নাই। একবার কেবল তিনদিনের জন্য পার্লেমেণ্টে যাইবার তাঁর সাধ হইয়া ছিল,—আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তখন আইরিস্ লোক-নায়ক পার্ণেল জীবিত ছিলেন। সে সময়ে কি একটা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অহিতাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়। ষ্টেড্ পার্ণেলকে তখন একটা আইরিস কনষ্টি-টুয়েন্সী (Constituency) জোগাড় করিয়া তিন-চা'র দিনের জন্য তাঁহাকে পার্লেমেণ্টের সভ্য করিয়া দিতে বলেন। পার্লেমেণ্টে দাঁড়াইয়া এই অহিতাচারের প্রতিবাদ করিয়া একটী মাত্র বক্তৃতা দিয়াই তিনি তাঁর পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া যাঁর স্থান তাহাকে দিতে রাজি হন। যাহা হউক ষ্টেডের এই ক্ষণিক সাধও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু পার্লেমেণ্টের সভ্য না হইয়াও ব্রিটিশসাম্রাজ্যনীতির বিকাশসাধনে ষ্টেড্ যতটা সাহায্য করিয়াছেন, গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ ও ঔপনি-বেশিক রাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ততটা সাহায্য করিয়াছেন কি না, সন্দেহের কথা।

আর ষ্টেডের এই অসাধারণ কৃতিত্বের পশ্চাতে তাঁর সাচ্চা ইংরেজ-প্রকৃতিটীই দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেডের বুদ্ধি যে নিরতিশয় সূক্ষ্ম ছিল, তাহা নহে। ইংরেজের স্বাভাবিকী বুদ্ধি একটু মোটা। তাহা ভারে কাটে কিন্তু ধারে কাটে না। কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্বে বা জটিল বিষয়ে ইংরেজের বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কোনো জটিল সমস্যার জটিলতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, একটা সম্যকদর্শন ফুটিয়া উঠে। ইংরেজবুদ্ধির এ সম্যক দৃষ্টি নাই। যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ব্যবসায়ীর লাভালাভ জানিবার জন্য অত্যাবশ্যক, ততটুকু দূরদর্শিতা ইংরেজের বুদ্ধিরও আছে। কিন্তু যে সম্যকদৃষ্টি তত্ত্বদর্শীর লক্ষণ, ইংরেজের সে সম্যকদৃষ্টি নাই। আর সেরূপ সম্যকদৃষ্টি নাই বলিয়াই ইংরেজের একটা অসাধারণ 'গোঁ' আছে। এই গোঁয়ের জোরেই ইংরেজ দুনিয়া জয় করিয়াছে। আর এই গোঁয়ের জোরেই ষ্টেডও অসাধারণ বিদ্যার বল, অথবা বিপুল ধনের বল, কিম্বা উচ্চ আভিজাত্যের বল ব্যতীতও আজীবন ইংরেজসমাজে রাজা ও প্রজা, ইতর ও ভদ্র, সকলের উপরে এতটা আধিপত্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

"Maiden Tribute.

ষ্টেডের প্রথম প্রতিষ্ঠা "পেল্ মেল্ গেজেট" (Pall Mall Gazette) নামক পত্রিকায়। সে আজ প্রায় আটাশ বৎসরের কথা। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের পাঠকদিগের নিকটে ষ্টেড্ তার পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যে দিন "Maiden Tribute of Modern Babylon" নামক প্রবন্ধাবলী পেল্ মেল্ গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল, সে দিন সমগ্র সভ্যজগতের চক্ষু ষ্টেডের উপরে যাইয়া পড়িল। সেদিন ইংরেজ বুঝিল যে বহুদিন পরে একজন মানুষের মত মানুষ দেশে জন্মিয়াছে। সে দিন দুনিয়া দেখিল যে ইংরেজের বিপুল ধনরাশি, তাহার প্রচণ্ড ভোগবিলাস, তাহার সখ ও সৌখিনতা এ সকলের পশ্চাতেও একটা সাচ্চা মনুষ্যত্ব-বস্তু জাগিয়া আছে। সে দিন ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লণ্ডন সহরে সে সময়ে একদল বড় লোক গরিব পিতামাতাকে টাকা দিয়া বশ করিয়া তাহাদের উদ্ভিন্নযৌবনা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণের সর্ব্বনাশ করিতেছিল। এই পাপে ইংরেজ আভিজাত সমাজ নীরয়গামী হইতেছিল। প্রাচীন বেবিলনে, আমাদের দেশের কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধনের ন্যায় ধর্ম্মের নামে, অক্ষতযোনী কুমারীগণের সতীত্ব নাশ করা হইত, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। এই কিম্বদন্তী স্মরণ করিয়াই ষ্টেড লণ্ডন সহরকে মডার্ণ বেবিলন (Modern Babylon) নামে অভিহিত করেন। আর বেবিলনের পুরাতন গর্হিতাচার মনে করিয়াই কুমারী-বলি বা Maiden Tribute বলিয়া লণ্ডনের ধনীলোকদিগের এই আধুনিক পশুবৃত্তির ব্যাখ্যান করেন। বিলাতের অতিবড় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এই পাপে লিপ্ত ছিলেন। মাতৃরূপিণী রমণীর

শ্রেষ্ঠতম বস্তু যে এরূপভাবে বেচা কেনা হয়, ষ্টেড্ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। এ দুরাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কেবল লোকের মুখের কথার উপরে নির্ভর করিয়া সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে অত বড় অভিযোগ আনা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, তিনি স্বয়ং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। আপনি একজন লম্পট সাজিয়া, যাহারা এই গর্হিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তেমন লোকের দ্বারা একটী উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার মাতাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া, তার কন্যাকে সংগ্রহ করিলেন। বিলাতী আইনে সে সময়ে ষোড়শ বর্ষই বালিকাগণের নিম্নতম "সম্মতির" বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই বালিকার বয়স যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূন ইহা সত্য সত্য ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন। যখন এতটা প্রমাণ স্বয়ং সংগ্রহ করিলেন, ব্যাপারটা যে সত্য সে বিষয়ে যখন আর তিলপরিমাণ সন্দেহের অবসর রহিল না, তখন ইহার কথা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া Maiden Tribute-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পত্রস্থ করিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবা মাত্র, চারিদিকে তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। ধনীদল আপনাদের কলঙ্ক রটনায়, ক্রোধে, ভয়ে, লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ইংরেজ জনসাধারণে দারিদ্র্যের অবমাননার কথা পড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। সভ্যজগতের লোকে ইংরেজের নামে ধিক্কার দিতে লাগিল। Maiden Tribute লেখার জন্য ষ্টেড্কে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা অসম্ভব দেখিয়া, তাঁর শত্রুগণ ষ্টেড্ আপনি যে একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীকে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইয়া, আপনার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই, ষ্টেড্ অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে নালিশ রুজু করাইলেন। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সহবাসের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া ষ্টেড্ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাঁর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু এজন্য ষ্টেডের দুঃখ হইল না। এ দণ্ড তাঁর নিন্দার হেতু না হইয়া শ্লাঘার কারণই হইল। কারাবাস তাঁর অপমানের বিষয় না হইয়া অশেষ গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিল। আমরণ পর্য্যন্ত ষ্টেড্ যে তারিখে তাঁর কারাদণ্ড হইয়াছিল, প্রতি বৎসর সেই দিন সেই পুরাতন কয়েদীর পোষাক পরিধান করিয়া, সেই ত্যাগযজ্ঞের সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেন। ষ্টেডের জেল হইল বটে, কিন্তু যে গোপনীয় অত্যাচারের কথা লোকমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিয়া তিনি এ দণ্ডভোগ করেন, সে অহিতাচারেরও প্রতিবিধান হইল। Maiden Tribute শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিলাতের প্রাচীন দণ্ডবিধিতে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা যুবতীগণের সহবাসকে দণ্ডনীয় করিয়া, নূতন বিধান সন্নিবিষ্ট হইল। এই বিধান অনুসারে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের "সম্মতির" বয়স অষ্টাদশবর্ষ নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ক্রিমিন্যাল এমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট (Criminal Amendment Act) ইংরেজের সমাজ-জীবনের

ইতিহাসে, ষ্টেডের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া চিরদিন ঘোষিত হইবে।

বিলাতী সংবাদপত্র-সম্পাদনে ষ্টেডের বিশেষত্ব

সাময়িক পত্রের লেখক ও সম্পাদক বলিয়াই ষ্টেড্ আধুনিক সভ্যজগতে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে সাময়িক সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রভাব যত, এই সকল পত্রের লেখকদিগের প্রতিষ্ঠা তার শতাংশের এক অংশও হয় না। ফলতঃ এ সকল পত্রে কে লেখে বা না লেখে, সাধারণ লোকে তার খবরাখবর রাখে না। বিলাতী সাময়িক পত্র সকল দল বিশেষের মুখপত্র হইয়াই থাকে। যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মতামত ও রীতিনীতিরই পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। লেখকেরা পয়সা খাইয়া লেখেন। যাঁহাদের বেতনভোগী হইয়া ইহাঁরা প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাঁহাদের মতামতই ইহা-দিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। নিজেদের বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী কোনো কিছু লিখিবার অধিকার ইহাঁদের প্রায়ই থাকে না। কখনো কখনো নিজেদের যাহা মত নয়, এমন বিষয়ও ইহাদিগকে লিখিতে হয়। এরূপ ব্যবসাদারী সাহিত্যচর্চ্চায় ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইলেও মনোবৃত্তির স্ফূরণ কিম্বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। বিলাতের ধনীলোকেরা এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বহুকাল ধরিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকগণের মনুষ্যত্বকে এইরূপ-ভাবে চাপিয়া রাখিয়া ও পিষিয়া মারিতেছিলেন। ষ্টেড্ই সর্ব্বপ্রথমে এই নিষ্ঠুর দাসত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের ও সাময়িক পত্রের লেখক-গণের আত্মসম্মানবোধকে জাগাইয়া তোলেন; পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বেনামী লেখাই বিলাতী সংবাদপত্রের সাধারণ রীতি ছিল। ষ্টেড্ই সর্ব্বপ্রথমে নিজের নাম দিয়া সংবাদ-পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। আজিকালি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের লেখকগণ নিজের নাম দিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। পূর্ব্বকার বেনামী লেখাতে সংবাদ-পত্র বিশেষেরই প্রতিষ্ঠা হইত, দল বিশেষেরই প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বাড়িয়া যাইত; জনগণের চিন্তা ও চরিত্রের কিম্বা রাষ্ট্রের কর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে লোকমত সংগ্রহকারী সাময়িকপত্রের লেখকগণের ব্যক্তিত্বের ও বিদ্যাবুদ্ধির কোনো প্রকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত না। ষ্টেড্ এ সকলকে বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রের লেখকগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনগঠনে কতটা সহায়তা করেন, প্রতিভাশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ-গৌরব ও শক্তিসাধ্য যে কোনো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রমন্ত্রী অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে অনেক বেশী; লোকে পূর্ব্বে ইহা কখনো অনুভব করে নাই। ষ্টেড্কে দেখিয়া তারা এখন ইহা বুঝিয়াছে। ষ্টেড্ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন। কিন্তু কি স্বরাষ্ট্রের কিম্বা পররাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ নীতি নির্দ্ধারণে তিনি যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন,

অনেক রাষ্ট্রমন্ত্রী তাহা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের নৌ-নীতি আজ যে রীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে ষ্টেডেরই উদ্ভাবিত। জর্ম্মণী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রশক্তির নৌবলের তুলনায় ইংরেজের নৌশক্তিকে কি পরিমাণে বাড়াইতে হইবে, তাহার মূলমন্ত্রটী ষ্টেডের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। ষ্টেড্‌ই প্রথমে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, অপরে যখন এক খানা যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিবে, ইংলণ্ডকে তখন দু'খানা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আজ উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের রাষ্ট্রনৈতিকেরা একবাক্যে এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। আজি কালি য়ুরোপের সর্ব্বত্র শালিশীর দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে, ষ্টেড্ তাহারও সূত্রপাত করেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হেগ্ (Hague) নগরীতে সভ্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া, প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইয়া পরস্পরের বিবাদ যাহাতে আপোষে মিটিতে পারে, তাহার বিচার আলোচনা করিয়াছিলেন। ষ্টেড্ সেই শান্তিসমিতি বা 'Peace Confernce'এরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যতীত এই অনুষ্ঠান যে কখনই সম্ভব হইত না, ইহা সকলেই এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ষ্টেডের ধনবল ছিল না। ষ্টেড্ কোনো রাষ্ট্রনৈতিকদলের নেতা ছিলেন না। তাঁর লোকবলও ছিল না। তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি কিম্বা অলোকসামান্য প্রতিভাও ছিল না। তাঁর ছিল কেবল অদমনীয় অধ্যবসায়, অকপট সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ, অসাধারণ আত্মনির্ভর এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেম ও লোকহিতৈষা। ষ্টেড্ বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমলহৃদয় ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সিংহের ন্যায় সাহসী ছিলেন ও পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। আর তাঁহার মধ্যে এ সকল গুণের সমাবেশ ছিল বলিয়াই, সামান্য সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়াও তিনি সাময়িক ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্র-পরিচালকগণ দুই পথ ধরিয়া প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। এক পথে যাইয়া, সর্ব্বদা লোকমতের অনুসরণ করিয়া, জনসাধারণে যখন যে ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে সেই ভাবেতে ইন্ধন যোগাইয়া তাঁহারা সহজেই লোকের অনুরাগভাজন হইতে পারেন। আর এক পথে যাইয়া, জনসাধারণের কি ভাল লাগিবে সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, কিসে তাহাদের ভাল হইবে, তারই অনুধ্যান করিয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথে নয়, কিন্তু শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রথম পথের পথিক লোকমতের অনুসরণ করিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় জনসাধারণের সেবা করেন। এ পথ সহজ। এই পথে অনায়াসে বা অতি স্বল্পায়াসেই সংবাদপত্র-পরিচালক আপনার পশার বৃদ্ধি করিতে পারেন। এ পথ ব্যবসাদারের পথ। বিলাতের প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের প্রায় সকল গুলিই এই পথের পথিক। লোকমতের হাওয়া যখন যে বিষয়ে যে দিকে প্রবলবেগে

ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন ইঁহারা সেই দিকেই আপনাদের লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। দেশের প্রবল রাষ্ট্রীয়-দলের প্রত্যেকেরই দু' এক খানা মুখপত্র আছে। এই সকল সংবাদপত্র নিজ নিজ দলের নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া চলে। এক সময়ে বিলাতে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, লিবারেল্ ও কন্‌সারভেটিভ (Lilberal ও Conservative) এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোনোটারই একান্ত অনুগত নয়, এমন সংবাদপত্র ছিল না। তখন যাঁরা সংবাদপত্র কিনিতেন ও পড়িতেন, তাঁরা সকলেই হয় কন্‌সারভেটিভ না হয় লিবারেল্ এই দুই দলের একদল ভুক্ত হইতেন। আর এই দুই দলের মধ্যে এতটা রেশারেশি ছিল যে একদলের লোকে অপর দলের পৃষ্টপোষক সংবাদপত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। সাময়িক পত্রের পাঠক সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। ক্রমেই এ সকল অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সাময়িক পত্রের পাঠকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক গুণে বেশী হইয়াছে। আগেকার দলাদলির ভাবটাও ক্রমে কমিয়াছে। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয়দলভুক্ত নহে, সাময়িক পত্রের এরূপ অনেক পাঠক এখন জুটিয়াছে। এ সকল লোকই পার্লেমেণ্টে সভ্যনির্ব্বাচন সময়ে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের ভাগ্যবিধাতা হইয়া থাকে। যখন যে দলের দিকে ইহারা ঝুকিয়া পড়ে, তখন সেই দলেরই জিত হয়। আর আজিকালি বিলাতে এই সকল লোকই ব্যবসাদারী সাময়িক পত্র সকলের প্রভু হইয়া বসিয়াছে। সুচতুর ব্যবসায়ী যেমন বাজারের মতিগতি লক্ষ্য করিয়া আপনার পণ্য সংগ্রহ করে ও দোকানপাট সাজায়, গ্রাহকের মন জোগাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা ছাড়া আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যেমন তার থাকে না, সেইরূপ এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালক ও লোকমত কোন্ দিকে চলিতেছে তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং সেই মতের পোষকতা করিয়াই আপনাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য, ভালমন্দ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তাঁহাদের কর্ত্তব্যসীমার বাহিরে পড়িয়া রহে। এই সকল সংবাদ-পত্র-পরিচালক জনমণ্ডলীর আসন্ন পরিচারক রূপে তাহাদের মর্জ্জি যোগাইয়াই দু' পয়সা উপার্জ্জন করেন; লোকের ইষ্টানিষ্ট ও দেশের ভালমন্দের প্রতি ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। বিলাতের অধিকাংশ সাময়িক পত্রই এখন এই পথ ধরিয়া চলিতেছে। ডেলি মেল (Daily Mail) জাতীয় সংবাদ পত্র এই পথ ধরিয়া চলিয়াই দেশটা লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-পরিচালনার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নহে। ভালমন্দ বিচার না করিয়া লোকমতের অনুসরণ করাই সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যবসায় বা কর্ত্তব্য নহে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক জনমণ্ডলীর পরিচারক হইবেন না, কিন্তু পরিচালকই হইবেন; অনুগত ভৃত্য হইবেন না, কিন্তু তাহাদের শক্তিশালী গুরু হইয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইবেন। ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সত্য লক্ষ্য। আর আধুনিক

বিলাতী সমাজে যে অত্যল্পসংখ্যক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ষ্টেড্ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। যে কালে ষ্টেড্ এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করেন, সে কালে বিলাতী সংবাদ-পত্র সম্পাদক ও লেখকবর্গের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বলিয়া কোনো বস্তু ছিল না। যে পেল্ মেল্ গেজেটকে আশ্রয় করিয়া ষ্টেড্ বিলাতের সাময়িক সাহিত্যে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই পেল্ মেল্ গেজেটের সঙ্গেও বেশী দিন একসঙ্গে কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ষ্টেড্ "পেল্ মেল্" পরিত্যাগ করিলেন। যে আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে পেল্ মেল্ ছাড়িয়া দিতে হয়, অন্য কোনো সংবাদপত্রের বেতন-ভোগী সম্পাদক বা লেখকরূপে সেই আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। আপনার জীবনের লক্ষ্য সাধনের জন্য ষ্টেড্কে তখন আপনার সত্বাধীনে একখানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হয়। এইরূপেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত রিভিউ অব্ রিভিউজের (Review of Reviews) উৎপত্তি হয়। আপনি এই পত্রের সত্বাধিকারী ও আপনি ইহার সম্পাদক ও পরিচালক হইয়া ষ্টেড্ বিগত বাইশ বৎসর কাল আধুনিক সভ্যসমাজে আপনার পবিত্র লোকশিক্ষাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"রিভিউ-অব্-রিভিউজ্"

যে অকপটে যে আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, বিধাতাপুরুষ স্বয়ং তাহাকে সেই আদর্শ লাভের উপযোগী বিচার-বুদ্ধি ও শক্তি সাধ্য দান করিয়া থাকেন। ষ্টেডের যে অসাধারণ বুদ্ধি কিম্বা অলোকসামান্য দূরদৃষ্টি ছিল, এমন বলা যায় না। কতটা পরিমাণে যে রিভিউ অব রিভিউজ্ (Review of Reviews) তাঁহার লোকশিক্ষাব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিবে, প্রথম হইতেই যে তিনি এটী বুঝিয়াছিলেন এমনও বোধ হয় না। আজি কালিকার দিনে লোকে নিজ নিজ বিষয়-কর্ম্ম লইয়া এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে বড় বড় মাসিক পত্রে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা হয়, সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়িবার সময় ও শক্তি তাহাদের থাকে না বলিলেই হয়। অথচ দুনিয়ার চিন্তাস্রোত কোন্ ভাবে কোন্‌দিকে চলিতেছে এই সকল মাসিকপত্র না পড়িলে তাহার সন্ধান রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত জনগণের হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই রিভিউ অব রিভিউজের জন্ম হয়। ইহা অপেক্ষা কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যে ষ্টেড তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। আর প্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়াই তাঁহার এই অনুষ্ঠানের অন্তরালে আমরা এখন বিধাতাপুরুষেরই হস্ত দেখিতেছি। ষ্টেড নিজের একখানা দৈনিক সংবাদপত্র না হউক, অন্ততঃ উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কেন যে তিনি সে পথে যান নাই জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে তিনি রিভিউ অব রিভিউজের সাহায্যে সমগ্র

সভ্যজগতের চিন্তা ও কর্ম্মের উপরে যতটা প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকার সাহায্যে তাহা কদাপি লাভ করিতে পারিতেন না। রিভিউ অব্ রিভিউজ ইংরেজীতেই লেখা হয় সত্য, আর লণ্ডনেতেই ছাপা হইত। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইহাকে কখনই কেবল ইংরেজের কাগজ বলা যাইতে পারিত না। য়ুরোপের সর্ব্বত্র যে সকল কর্ম্মী ও মনীষিগণের হস্তে আধুনিক জগতের ভাগ্যসূত্র রহিয়াছে, রিভিউ অব রিভিউজ তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু ছিল। রাজপ্রাসাদে রাজা, মন্ত্রভবনে রাজমন্ত্রিগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সেনাশিবিরে সেনানায়ক, সংবাদপত্রের আপিসে সম্পাদক, ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজক, নাট্যশালায় নটনায়ক, আধুনিক সভ্যজগতের সর্ব্বত্র যাঁহারা জনগণের চিন্তাস্রোত ও কর্ম্মস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই রিভিউ অব রিভিউজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহাঁরা সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে, শ্রদ্ধাসহকারে রিভিউ অব রিভিউজ পাঠ করিতেন। বিলাতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ব্যালফোর (Balfour) একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি কখনও সংবাদপত্র পাঠ করেন না, কিন্তু তিনিও রিভিউ অব রিভিউজের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। রিভিউ অব রিভিউজ কেবল যে অপর পত্র হইতে প্রবন্ধ সার সংগ্রহ করিয়াই আপনার কলেবর পূর্ণ করিত তাহাও নহে। প্রতি মাসে সভ্যজগতের যেখানেই যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটুক না কেন, ষ্টেড্ তাহারই উপরে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একদিকে জগতের দৈনন্দিন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন, অন্যদিকে দুনিয়ার লোকমত গঠনের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। রিভিউ অব রিভিউজের চরিত্র-চিত্রগুলি আধুনিক সভ্য জগতের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের প্রাণ বস্তুকে ভবিষ্যতের জন্য মূর্ত্তিমন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ষ্টেডের বিচার প্রণালী।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক সভ্য জগতের কোনো দেশে এমন কোনো শক্তিশালী লোকনায়কের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে ষ্টেডের স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ আলাপপরিচয় ছিল না। তিনি কেবল যে জগতের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিই জানিতেন তাহা নহে, কিন্তু এই সকল ঘটনার অন্তরালে যে ব্যক্তিগত চরিত্র লুকাইয়া থাকে, নখদর্পণের ন্যায় সর্ব্বদা তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেন। সুতরাং ষ্টেড্ কখনই কেবল বাহিরের কার্য্যাকার্য্যের দ্বারা কোনো বিষয়ের ভালমন্দের বিচার করিতেন না। কিন্তু এই সকল কার্য্যাকার্য্যের ভিতরে যে মানুষের প্রাণ, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের শক্তি ও সংযম, মানুষের লক্ষ্য ও অভীষ্ট জড়াইয়া থাকে, তাহারই দ্বারা এ সকলের বিচার করিতেন। আর এই জন্য প্রত্যেক দেশের কর্ম্মিগণ একদিকে যেমন তাঁহার মন্তব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা শুনিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ কেবল বাহির হইতে যাহারা সকল বিষয়ের বিচার

আলোচনা করেন, তাহারা অনেক সময়ে ষ্টেডের বুদ্ধির স্থিরতা ও তাহার মতামতের মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই বলিয়া প্রায়ই তাঁহার মন্তব্যকে উপেক্ষা করিতেও চেষ্টা করিতেন। যে মানুষ নিজের নিকটে সর্ব্বদা খাঁটী হইতে চাহে, লোকচক্ষে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা প্রমাণিত করা অসম্ভব। মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে। সত্যের সকল দিকটা সর্ব্বদা একই সঙ্গে তাহার চক্ষু-গোচর হয় না। আমাদের সকল সিদ্ধান্তেই অন্ধের-হস্তিদর্শন-ন্যায়টা প্রায় সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইতে পারে। এবং তারই জন্য জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্ব্বপ্রকারের সিদ্ধান্তই উত্তরোত্তর পূর্ণতর হইতে যাইয়াই পরিবর্ত্তিত হয়। লোকে যাহাকে সচরাচর স্থিরমতি বলে তাহা অনেক সময়েই কেবল রুদ্ধগতির লক্ষণ। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই রুদ্ধগতিকেই arrested development বলে। কিন্তু ষ্টেডের মনের গতি আমরণ কখনও রুদ্ধ হয় নাই। বয়স তাঁহার বাড়িয়াছিল, কিন্তু শৈশবের সারল্য, যৌবনের উদ্যম, জ্ঞানের পিপাসা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মের চেষ্টা, এ সকলের কিছুই বিন্দু পরিমাণ কমে নাই। জগতের অনেক লোক প্রকৃত পক্ষে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করিয়া নূতন শক্তি সংগ্রহ ও নূতন চেষ্টার প্রকাশ, নিত্য নূতন জ্ঞান বা নিত্য নূতন রস আস্বাদন, নিত্য নূতন কর্ম্মের আয়োজন এ সকলই তো প্রকৃত জীবনের লক্ষণ। কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোক জীবিত থাকিয়াও জীবনের এ সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে না। আর এই সকল লোকের বিষয়েই সচরাচর আমরা জীবন্ত-মৃত্যুর স্থবিরতার মধ্যে, তাহাদের রুদ্ধবুদ্ধির স্থিরতাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ষ্টেড্ প্রকৃত অর্থে জীবিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি যে প্রাকৃতজন-সুলভ স্থিরত্ব লাভ করে নাই ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাঁহার মতামতের মধ্যে যে সঙ্গতির অভাব দৃষ্ট হইত তাহা কেবল বাহিরেরই কথা, ভিতরের কথা নহে।

ষ্টেড্ ও রুশ সম্রাট

ষ্টেড্ আজীবন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন যেখানে প্রজামণ্ডলী আপনাদের স্বত্বস্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিয়াছে, ষ্টেড্ তখনই তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বুয়র যুদ্ধের সময় নিজেদের গভর্ণমেণ্টের সমর্থন না করিয়া বুয়র-নেতৃবর্গের পক্ষই সমর্থন করিয়াছিলেন। আর এই কারণে সেই সময়ে তিনি অতিমাত্রায় সাধারণ ইংরেজমণ্ডলীর বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। অথচ যে সিসিল রোড্স্ (Cecil Rhodes) প্রকৃত পক্ষে চক্রান্ত করিয়া ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টকে এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেন, ষ্টেড্ সর্ব্বদাই সেই সিসিল রোডসের স্তুতিবাদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। সাধারণ লোকে ষ্টেডের এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ষ্টেড্ একদিকে যেমন জগতের সর্ব্বত্র প্রজামণ্ডলীর স্বত্ব-

স্বাধীনতা সম্প্রসারণের ও প্রজাতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ য়ূরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্রের একমাত্র অধিনায়ক, রুশিয়ার জারেরও (Czar) পক্ষ সমর্থন করিতেন। লোকে এ অসঙ্গতির অর্থও বুঝিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অনেক সময়ে ষ্টেডের সাধুতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছে। কেবল বাহির হইতে ষ্টেডের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিলে এ অসঙ্গতির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় না। সিসিল রোড্‌সকে এবং "জারকে" সাধারণ লোকে দূর হইতে এবং বাহির হইতেই সর্ব্বদা দেখিয়াছে। তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের প্রাণের অন্তঃপুরে কখনো প্রবেশাধিকার পায় নাই। ষ্টেড্ এই দুই জনকেই অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বন্ধুর নিকট বন্ধু যেমন প্রাণের সকল পর্দ্দা খুলিয়া দিয়া নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ায়, রোডস্ এবং "জার" দু'জনেই সেইরূপ একদিন ষ্টেডের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ষ্টেডের প্রকৃতিগত অকপটতার সংস্পর্শে জারের জারত্বের বহিরাবরণ আপনা হইতেই সরিয়া গিয়াছিল। ষ্টেডের অনাবৃত মনুষত্বের সম্মুখে "জার" জাররূপে নহে, কিন্তু শুদ্ধ মানুষরূপে একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। "জারের" ভিতরে যে মনুষত্ববস্তু আছে, তাহারই দ্বারা ষ্টেড্ সর্ব্বদা জারের বাহিরের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিতেন। এই জন্য রুশীয় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার অবিচারে জারের প্রতি ষ্টেডের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কোনো ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে নাই। রুশীয় গভর্ণমেণ্ট কেবল জারকে লইয়া নহে। সে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের জন্য জার কতটা দায়ী এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো দায়িত্ব আছে কি না এ কথা বলা কঠিন। রুশের বিশাল ও জটিল শাসনযন্ত্রে জার একটী সামান্য অঙ্গ মাত্র! রুশিয়ার রাজশক্তি ও প্রজা-প্রকৃতির অনাদিকৃত কর্ম্মবশে রুশের স্বেচ্ছাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কেবল রাজার ইচ্ছায় বা আভিজাতবর্গের চেষ্টায় ইহা গড়িয়া উঠে নাই। এখন সে স্বেচ্ছাতন্ত্র কেবল রুশরাজের উদার অভিপ্রায়ের বলে ভাঙিয়া চুরিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা ও প্রজা উভয়ের কর্ম্মক্ষয় না হইলে, কখনই রাজ্যের এ সংস্কার সাধিত হইবার নহে। গুপ্তহত্যায় কর্ম্মবোঝা বাড়িয়াই যায়, ক্ষয় হয় না। এ পথ স্বাধীনতার পথ নহে। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ যে দিন আপনার কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিবে, তাহাদের পুরুষ পরম্পরাগত তমঃ নষ্ট হইয়া যে দিন তাহাদের আত্ম-চৈতন্যের উদয় হইবে, সে দিন গুপ্তহত্যারও প্রয়োজন থাকিবে না, বিদ্রোহেরও প্রয়োজন অনাবশ্যক হইবে; কিন্তু আপনা হইতেই রাজাপ্রজার পরস্পরের অধিকারের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই মীমাংসার পথে রুশের বর্ত্তমান জার প্রকৃতপক্ষে কোনই অন্তরায় নহেন। ইহার প্রধান অন্তরায় বিপ্লবপন্থিগণ। বিপ্লবপন্থিগণ যতদিন গুপ্তহত্যা প্রভৃতি অহিতাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত

জারের পক্ষে রাজপুরুষদিগের অত্যাচার নিবারণ করাও অসম্ভব। সাধারণ লোকে ইহা বোঝে না। সাধারণ লোকে জারের মনুষত্ব যে কতটা ইহা জানে না। আর তারই জন্য তাহারা সরাসরিভাবে বিচার করিয়া রুশগভর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের জন্য অন্যায়রূপে জারকে দায়ী করিয়া থাকে। ষ্টেড্ জারকে চিনিতেন। জারের রাজৈশ্বর্য্য নয় কিন্তু নিরাভরণ মানুষী মূর্ত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রুশ শাসনযন্ত্রের জটিলতাও তাঁর চক্ষুগোচর হইয়াছিল। এই যন্ত্রচালনায় জারের শক্তিসাধ্য যে কি এবং অধিকার ও অবসরই বা কতটুকু ইহাও তিনি জানিতেন। আর এ সকল জানিতেন বলিয়াই রুশের রাষ্ট্রীয়শক্তির ও বিপ্লবশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে সকল অমানুষী কাণ্ড ঘটিত, সে সকলের জন্য জারকে তিনি কখনো দায়ী মনে করিতেন না। রুশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে জার যেমন অবস্থার দাস এবং ঘটনাচক্রের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া আছেন, সিসিল রোডস্‌ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেইরূপই অবস্থার দাস ও ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। আর এই জন্যই ষ্টেড্ বুয়রব্রিটিশসংগ্রামঘটিত কার্য্যাকার্য্যের জন্য সিসিল রোডস্‌কেও কখনো সাক্ষাৎভাবে দায়ী করেন নাই।

ষ্টেডের চরিত্রের জটিলতা সকলে বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তাঁর চরিত্রের স্বচ্ছতায় ও তাঁর অকৃত্রিম সত্যানুরাগে, তাঁহার সরল স্বদেশ-বাৎসল্যে ও গভীর মানব-প্রেমে সকলেই মুগ্ধ ছিল। এক প্রকারের সত্যানুরাগ ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানে দোকানদারীর ভিতর দিয়াই একপ্রকারের সত্যবাদিতা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সত্য-বাদিতা ব্যতীত সে ক্ষেত্রে কেহ আপনার ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারে না। এই জাতীয় সততাকে লক্ষ্য করিয়াই ইংরেজ প্রবাদ-বচনে সততাকে শ্রেষ্ঠতম নীতি—হনেষ্টিকে বেষ্ট পলিসি (Honesty is the best policy)—বলিয়াছে। ষ্টেডের সত্যপরায়ণতা এই শ্রেণীর ছিল না। তাহা অকপট সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্য তিনি যখন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, সেইভাবে কাজ করিতে যাইয়া, অনেক সময় আপনার বিস্তর ক্ষতিও করিয়াছেন। ব্রিটিশ—বুয়রের যুদ্ধের সময়, তার উজ্জল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই অকপট সত্যানুরাগের জন্যই, ইদানীং তার নিজের সমাজে এবং কিয়ৎ পরিমাণে, অন্যান্য দেশেও ষ্টেডের প্রতিপত্তি কিছু কমিয়া গিয়াছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোকের পর হইতে ষ্টেড্ পরলোকতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরেজিতে যাহাকে স্পিরিটুয়্যালিজ্‌ম (Spiritualism) বলে, তার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মৃতলোকের আত্মা যে জীবিতদিগের সঙ্গে উপযুক্ত "মিডিয়্যম" পাইলে, কথাবার্ত্তা কহেন ও এমন কি কখনো কখনো ভৌতিকরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের চক্ষুগোচরও হন, ষ্টেড্ কিছুদিন হইতে ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। এই স্পিরিটুয়্যালিজ্‌মের অনুশীলন করিবার

জন্য তিনি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী উইম্বেলডেন্ নামক স্থানে একটা বাড়ী করিয়া, মাহিনা দিয়া লোক রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দৈনন্দিন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পুর্ব্বে প্রায়ই তিনি কিছুকাল এই বিষয়ের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে কখনো কখনো তিনি জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যার সম্বন্ধেও পরলোকগত মনীষিগণের মতামত জানিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে পরলোকতত্ত্বের অনুশীলনের সত্যাসত্য বা ভালমন্দ বিচারের এ সময় নহে, এ স্থানও নহে। সকলে বা অনেকে যে এ যুগে এ সকল ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, এমনটাও আশা করা যায় না। বরং অধিকাংশ লোকেই এসকল প্রয়াসকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। সুতরাং বিলাতের বা য়ুরোপের তর্কবাদিদিগের সমক্ষে এ সকল তত্ত্বের আলোচনা বড় কম সাহসের পরিচয় দেয় না। ষ্টেড্ অকুতোভয়ে তাঁর সিয়ান্সে (Seance'এ) যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাহা বাহির করিতেন। ইহাতে অনেক লোকেই তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহাও তিনি জানিতেন। এজন্য তাঁর ব্যবসায়েরও বিস্তর ক্ষতি হইতেছিল, ইহাও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু যাহা নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, লোকের মুখ চাহিয়া তিনি কখনো তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেই তাঁর চরিত্রের জোর কতটা ছিল, ইহা সহজেই বোঝা যায়। এ বিষয়েও ষ্টেড্ ইংরেজের সেরা ছিলেন।

যেমন তাঁর সত্যানুরাগ, তেমনি তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও মানবহিতৈষাতেও ষ্টেড্ ইংরেজ-চরিত্রের উচ্চতম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁর দেশকে যেমন ভালবাসেন, জগতের আর কোনো জাতির লোক বোধ হয় তাদের নিজেদের দেশকে তেমন ভালবাসে না। ইংরেজের প্রেম কাজে ফোটে, কেবল ভাবে বা কথায় উচ্ছ্বসিত হয় না। ষ্টেড্ স্বজাতিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, দুনিয়ায় যে ইংরেজের মত আর কোনো জা'ত যে ছিল বা আছে ভিতরে ভিতরে তিনি যে তাহা বড় বিশ্বাস করিতেন, এমনো মনে হয় না। তাঁর চক্ষে ইংরেজ আদর্শ মানুষ। কিন্তু সে ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের উন্নত আদর্শভ্রষ্ট যে সকল লোক জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ইংরেজ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে, ষ্টেডের চক্ষে সে ইংরেজ আদর্শ-মানুষ ছিল না। এইজন্য ইংরেজের মধ্যে যা কিছু ভাল, তাহাই তিনি রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, মন্দকে কখনো আদর করিয়া পুষিয়া রাখিতে চান নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশে এবং ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল ইংরেজ ইংরেজত্ব-ভ্রষ্ট হইয়া যায়, যারা ইংরেজের সত্যবাদিতা, ইংরেজের ন্যায়পরতা, ইংরেজের উদারতা ইংরেজের মানবহিতৈষা ভুলিয়া যাইয়া, একটা অযথা ও আত্মঘাতী অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, অপর জাতির লোকের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব ও অমানুষী অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের ইংরেজত্বের অভিমানের সঙ্গে ষ্টেডের বিন্দু পরিমাণেও

সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে ষ্টেডের মানবহিতৈষাও, বলিতে গেলে, তাঁর গভীর স্বজাতি বাৎসল্যেরই রূপান্তর মাত্র ছিল। তিনি আপনার জাতিকে ও আপনার সভ্যতা ও সাধনাকে এতটা ভাল বাসিতেন যে একদিকে যেমন সেইজন্য, নিজের জাতের আদর্শ ও চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিবার ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই-রূপ অন্যদিকে, এই আদর্শ ও এই সভ্যতা ও সাধনা যাহাতে জগতের সকল লোকে আয়ত্ত ও অধিকার করিতে পারে, তার জন্যও সর্ব্বদাই লালায়িত ছিলেন। দুনিয়ার লোক ইংরেজের মত স্বাধীন ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হউক, ইংরেজ রাষ্ট্র যেমন নিয়ম-তন্ত্র, ইংরেজ রাজা যেমন প্রজামতের অধীন, সকল দেশের রাষ্ট্র ও রাজা সেইরূপ হউক, ষ্টেড্ সর্ব্বদাই ইহা চাহিতেন। তারই জন্য জগতের যেখানে প্রজাস্বত্ব সম্প্রসারণের সঙ্গত প্রয়াস হইতেছে দেখিতেন, যেখানেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের • স্থানে নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আয়োজন বা চেষ্টা হইতেছে শুনিতেন, সেখানেই সেই সকল প্রয়াসের সঙ্গে সর্ব্বদা সহানুভূতি করিতে অগ্রসর হইতেন। কি পোল্যাণ্ডের, কি ফিন্‌ল্যাণ্ডের, কি মিশরের, কি ভারতবর্ষের, কি চীনের, কি পারস্যের, সকল দেশের স্বাধীনতার উপাসকগণ বিলাতে যাইয়া, তীর্থস্থানে যেমন দেশদেশান্তরের যাত্রী মিলিত হয়, সেইরূপ ষ্টেডের বাড়ীতে সম্মিলিত হইতেন। এখানে আফ্রিকার কাফ্রি লোক-নায়ককে দেখিয়াছি। পারস্যের প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কগণকেও দেখিয়াছি। যাঁরা তুরস্কের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেখানেও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সেই সকল ইয়ংটার্ককে (Young Turksকে) এখানে দেখিয়াছি। ফিন্‌ল্যাণ্ডে, পোলাণ্ডে, সকল দেশে যারা স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিলাতে গেলে, ষ্টেডের বাড়ীতে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইত, সেখানে সকলেই মিলিত হইতেন। ষ্টেডের বৈঠকখানা আধুনিক সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠজনের একটা পবিত্র সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এই অদ্ভুত সম্মিলন, গৃহস্বামীর উদার মানবপ্রেমেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করিত।

জীবদ্দশায় ষ্টেড যে সকল উন্নত আদর্শের কথা প্রচার করিতেন, মরণ সময়েও তাহারই চরণে আত্মবলিদান দিয়া গিয়াছেন। মরণকালেই মানুষকে সত্যভাবে চেনা যায়। অকূল পাথারে পড়িয়া মানুষের সংসারের সকল আশ্রয় যখন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তার জীবনের সত্যিকার সাধনটা যে কি ছিল, তাহা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ষ্টেডেরও তাহাই হইয়াছে। অবলাকুলের হিতব্রতে ষ্টেড্ যৌবনের প্রারম্ভেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের সাধনেই Maiden Tribute রচিত ও প্রকাশিত হয়। তারই জন্য কারাগারে তাঁর লাঞ্ছনা। অসহায়ের সহায়তা করিতে ষ্টেড্ কখনও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তাঁর শত্রুরাও এমন কথা বলে না। আর অকূল সমুদ্রে, ভগ্ন অর্ণবতরী বক্ষে, অবলা ও শিশুদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া শেষে ধীর ভাবে, আপনি সেই জাহাজের সঙ্গে অতলে ডুবিয়া গিয়া ষ্টেড্ সেই পবিত্র জীবনব্রতই উদযাপন করিয়াছেন। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ব কোথায়, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দেবত্ব-টুকু কোন্‌খানে,—টাইট্যানিক জাহাজের এই অন্তিমদৃশ্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পবিত্র দৃশ্য যখন মানসপটে ভাসিয়া উঠে, তখন আর ইংরেজ জাতিকে অশ্রদ্ধা, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বঙ্গদর্শন।

টাইট্যানিকের তিরোধান

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের ব্যবধানটা যে কত সূক্ষ্ম ও সামান্য, সংসারমোহবিভ্রান্ত মানুষ সকল সময়ে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই বুঝি বিধাতাপুরুষ মাঝে মাঝে টাইট্যানিকের তিরোধানের মত লোমহর্ষণ বিধানের ব্যবস্থা করিয়া, আত্মবিস্মৃত জনগণের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া দেন। সভ্যতা বলিতে আমরা আজি কালি যে বস্তুকে বুঝিয়া থাকি, তাহা একান্তই ইহ-সর্ব্বস্ব। এই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিন্তা ও কল্পনার উপরে প্রত্যক্ষ পুরুষকারের প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়া, অপেক্ষাকৃত "অসভ্য" প্রাচীন সমাজে দৈবের উপরে যে একটা ঐকান্তিক নির্ভর ছিল, তাহা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া, একেবারেই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার অদ্ভুত উদ্ভাবনীশক্তি, তার আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতা, যতই তাহাকে বাহিরের শক্তিপুঞ্জের প্রভু ও নিয়ন্তা করিয়া তুলিতেছে; যতই মানুষ আপনার বুদ্ধি-বলে দেশ-কালের নৈসর্গিক ব্যবধান, জল-স্থলের অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরায়, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, এ সকলকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার অভিষ্টসাধনে সমর্থ হইতেছে, ততই তার আপনার উপরে নির্ভরটা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্ভরটাই আধুনিক সভ্যতার একটা অতি প্রধান লক্ষণ। সুতরাং এরূপ সভ্যতা যে "আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতা" হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এ সভ্যতাকে মাঝে মাঝে এরূপ ভাবে নাড়া না দিলে, তার চৈতন্যোদয় হইবে কেন?

* * * * *

য়ুরোপ ভাবিতেছিল যে সে আপনার অলৌকিক অধ্যবসায় ও অসাধারণ বুদ্ধির জোরে নিসর্গের প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জকে করায়ত্ত করিয়া ক্রমে মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তুলিবে। টাইট্যানিকের তিরোধানে, ক্ষণিকের জন্য তার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা এ পথে মৃত্যুকে জয় করিতে যাই নাই। আমরা যাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া জানি, তিনি যোগেশ্বর, তিনি মহাবৈরাগী, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, মৃত্যু ও অমৃতে তাঁর সমান-জ্ঞান, তপঃপ্রভাবে জীব-শিব তাঁর ভিতরে এক হইয়া গিয়াছে। আমাদের মৃত্যুকে জয় করিবার পথ ছিল—যোগের পথ, ভোগের পথ নহে; ত্যাগের পথ, লোভের পথ নহে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

"যে সকল কামনা এই মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদায় যখন একান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়, তখনই মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এইখানেই ব্রহ্মকে ভোগ করিয়া থাকে।"

আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাকেই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। "ত্যাগেনৈবমৃতত্বমনাশুঃ" কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাওয়া যায়, তার আর অন্যপথ নাই, ভারতের আর্য্যসভ্যতা ও সাধনার ইহাই সার কথা ও শেষ কথা। জগতের সকল সাধু ও সিদ্ধ-পুরুষেরাই এ কথার সত্যতার ও সারবত্তার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টীয় সাধনায়ও এ কথাটা নূতন নহে। যিশুও এই ত্যাগের পথই দেখাইয়া গিয়াছেন, ভোগের পথ দেখান নাই। "তোমার যা' কিছু তৎসমুদায় বিকাইয়া দিয়া, আমার অনুগামী হও,"—"যদি সে' জীবন পাইতে চাও, তবে এ'জীবন বিসর্জ্জন দাও";—"কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, আজিকার দুর্ভাবনাই আজিকার জন্য যথেষ্ট";—খৃষ্টের এ সকল প্রসিদ্ধ উপদেশ,—এবং পরিণামে যে ভাবে তিনি এই মহাত্যাগ-যজ্ঞে আপনার পবিত্র দেহ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; আর এইরূপ ভাবে দেহ রাখিয়া আপনার "পুনরুত্থান" বা রিসরেক্সনের (Resurrection) ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান্ মণ্ডলীকে তিনি স্বয়ং অমৃতত্বের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও আমাদেরই এই প্রাচীন ও সার্ব্বজনীন ঋষিপন্থা। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হয়নায়"।

* * * * *

টাইট্যানিকের তিরোধান সংসার-মোহ-বিভ্রান্ত য়ুরোপীয় সমাজকে, অপূর্ব্ব কলাকুশলতা সহকারে, এই সনাতন ঋষি-পথ ও পুরাতন যিশুপথই দেখাইয়া দিয়া গেল। যারা আজন্মকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল ভোগের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল, যাহাদিগকে দুনিয়ার লোকে ইহ-সর্ব্বস্ব বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে আসুরী-সম্পদ বলিয়াছেন, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আসুরীভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আহরণ করিতে যাঁহারা আপনাদের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হইত; সেই সকল লোককে বুকে লইয়াই টাইট্যানিক তার এই মহাপ্রয়াণে যাত্রা করিয়াছিল। আধুনিক সমাজের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা ও বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতা মিলিয়া এই বিপুল অর্ণবযানখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। একদিন য়ুরোপ হইতে আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় যাইতে এক পক্ষ কাল লাগিত। ক্রমে তাহা এক সপ্তাহে আসিয়া দাঁড়ায়; বৎসর দুই কাল হইল, এ ব্যবধান আরও কমিয়া গিয়াছিল। দুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করে; একের নাম "কিউন্যার্ড" (Cunard), অপরের নাম "হোয়াইট ষ্টার" (White Star)। কিউন্যার্ড কোম্পানীর মরিট্যানিয়া (Mauritania) নামক নূতন জাহাজ প্রথমে, পাঁচ দিন কয়েক ঘণ্টায়, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। সপত্নী কোম্পানীর এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া, হোয়াইটষ্টার (White Star)

কোম্পানীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই প্রতিযোগীতার প্রেরণাতেই "টাইট্যানিকের" জন্ম হয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রতিদিনই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। "মরিট্যানিয়া" যখন নির্ম্মিত হয় তার পরে, এই দুই বৎসর কি তিন বৎসর কালের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের বা যন্ত্রের যাহা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হইয়াছে, 'টাইট্যানিক" সে সকলের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আয়তনে ও গতি শক্তিতে, সাজসজ্জার বিচিত্রতায় ও ভোগবিলাসের আয়োজনে, সকল বিষয়েই "হোয়াইট ষ্টার" কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ "টাইট্যানিক"কে অর্ণবপোতের সেরা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আরোহীগণের সুখের ও সখের ব্যবস্থা করিয়াই ইহাঁরা ক্ষান্ত হন নাই। জাহাজখানিকে এমন ভাবে গড়িয়াছিলেন, তার ভিতরে এমন সকল কলকৌশল রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার ডুবিবার কোনও আশঙ্কাই ছিল না। আপনাদের অসাধারণ কৃতিত্বের উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নিরতিশয় স্পর্দ্ধা সহকারে যাত্রীগণকে সর্ব্বপ্রকারের সুখ সৌখিনতার ও ভোগবিলাসের লোভ দেখাইয়া, এবং সমুদ্রযাত্রার সর্ব্ববিধ বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে একান্ত অভয়দান করিয়া, আপনাদের নিয়ন্তৃসমিতির বা Board of Directors'এর সভাপতি মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া, যাত্রী, কর্ম্মচারী ও নাবিক সকলে মিলিয়া প্রায় তিন হাজার স্ত্রীপুরুষ লইয়া, হোয়াইট ষ্টার কোম্পানী টাইট্যানিককে আটল্যাণ্টিকের বুকে ভাসাইয়া দিলেন। প্রহরে প্রহরে অদৃশ্য ঈথর-স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়া, তারহীন তড়িৎ-বার্ত্তা সাগরবক্ষস্থ টাইট্যানিকের গতিবিধির সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিপুলকায় জাহাজখানি নির্ভয়ে ও সদর্পে সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া চলিতেছিল, তার বুকের উপরে সহস্রাধিক নরনারীও সেইরূপ ভয়ভাবনাবিরহিত হইয়া, হাস্যপরিহাসে, নাচেগানে, দিন কাটাইতেছিলেন। এইরূপেই এই বিশাল প্রাণের পসরা সাজাইয়া "টাইট্যানিক" আনন্দে আপনার গন্তব্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

* * * * *

কিন্তু তার কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহার যে গন্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গন্তব্য লাভ তাহার ভাগ্যে ছিল না। সভ্যতার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব হরণ করিবার জন্য, বিষয়বিমূঢ় জনগণের চিত্তে সাড়া আনিবার জন্য, পুরুষকারের উপরে যে দৈব আছেন এই জ্ঞান জন্মাইবার জন্য, সংসারমোহবিভ্রান্ত স্বরূপভ্রষ্ট সভ্য জীবের স্বরূপচৈতন্যের সঞ্চার করিবার জন্য, কামোপভোগপরমা সভ্যতা ও সাধনার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য, "নান্যদস্তীতিবাদী" ইহ-সর্ব্বস্ব জনগণের প্রাণে অমৃতত্বের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, ভোগসর্ব্বস্ব সমাজকে ত্যাগের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য—বিধাতাপুরুষ টাইট্যানিকের আর এক গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। টাইট্যানিক্ সে সাংঘাতিক নিয়তি প্রাপ্ত হইয়াই আপনার চরম সার্থকতালাভ করিয়াছে।

* * * *

সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। আকাশে মেঘ নাই।

অগণ্য নক্ষত্ররাজি দশদিক্ পূর্ণ করিয়া, হীরার হাট খুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণপক্ষের নিশির অন্ধকারও নাই। শান্ত সুপ্রসন্ন প্রকৃতিমুখে নির্ম্মমতার আভাস মাত্র নাই। অপূর্ব্ব রচনাকৌশলগুণে বিপুলকায় অর্ণবপোতের জলমগ্নের আশঙ্কার লেশমাত্র নাই। তড়িতালোকসমুজ্জ্বল, বিবিধ কলাকুশলপূর্ণ প্রমোদপ্রয়াসমুখরিত ইন্দ্রপুরীর-ন্যায় অর্ণবপোত আশ্রয় করিয়া দ্বিসহস্রাধিক আরোহী নির্ভয়ে ও নিশ্চিত মনে অকূল জলরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। কেহ বা শুইয়াছে, কেহ বা শয়নের আয়োজন করিতেছে। কেহ বা ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে, কেহ বা সঙ্গীতালাপ করিতেছে। কেহ বা আরামচৌকিতে বসিয়া নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছে, আর কেহ বা ডেকের উপরে পাদচারণ করিতে করিতে প্রণয়ীজনের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। কেহ বা ধনের কেহ বা দারিদ্র্যের, কেহ বা প্রেমের কেহ বা প্রতিযোগিতার, কেহ বা জ্ঞানের কেহ বা ললিতকলার, কেহ বা সখ্যের কেহ বা সখের ভাবনা ভাবিতেছে। দুনিয়ার সকল ভাবনার বোঝা লইয়া টাইট্যানিক শান্ত সমুদ্রাম্বুরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে—নাই কেবল সে বিচিত্র পসরায় এক মৃত্যুর ভাবনা। সহসা যখন মরণের ডাক পড়িল, জাহাজের কল যখন বন্ধ হইয়া গেল, আরোহীগণের প্রাণরক্ষার জন্য লাইফ্-বোট (Life boat) বা জীবনতরণীগুলিকে জলে নামাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, সকলকে ডেকে যাইয়া দাঁড়াইবার জন্য যখন কাপ্তানের হুকুমজারী হইল, তখনও সকলের প্রাণে সাড়া পড়িল না। কালের ভেরী বাজিল, তথাপি অনেকে ক্রীড়াকৌতুক ছাড়িল না, অনেকের গীতবাদ্য থামিল না। বিজ্ঞানের প্রামাণ্যকে নষ্ট করিয়া, সভ্যতার অসাধারণ কৃতিত্বাভিমানকে চূর্ণ করিয়া, স্থির সমুদ্রে, নির্ম্মল আকাশ তলে, টাইট্যানিক যে সহসা অতলে ডুবিবে বা ডুবিতে পারে, অনেকের মনে এ কল্পনারও উদয় হয় নাই। প্রথমকার এ ভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরে যখন বিপদ যে সত্য, মৃত্যু যে সন্নিকট এ বিষয়ে তিল পরিমাণ সন্দেহের আর অবসর রহিল না, তখনও যে কেন এই দ্বিসহস্রাধিক আরোহী এবং নাবিকেরা ভয়-বিক্ষিপ্ত হইয়া, শৃঙ্খলমুক্ত পশুর ন্যায় কে কাহাকে মারিয়া আপনাকে বাঁচাইবে সে চেষ্টায় জাহাজখানিকে কলহকোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিল না, এ রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যে আধুনিক সভ্যতা হয় মানুষকে সর্ব্বপ্রকারের সাধারণ মানব ধর্ম্ম-বিবর্জিত করিয়া জিহ্বোপান্তসমন্বিত কাষ্ঠলোষ্ট্রে পরিণত করে, না হয় দেবত্বে উন্নীত করিয়া তোলে। এ সকল কি মোহের না মোক্ষের লক্ষণ? টাইট্যানিকে যাহা দেখিলাম তাহা কি জড়ত্ব না বীরত্ব?

* * * *

আর একরূপ সন্দেহের কারণ এই যে আমরা য়ুরোপকে সচরাচর ইহ-সর্ব্বস্ব বলিয়াই মনে করি। য়ুরোপ ভোগের সন্ধানই পাইয়াছে, ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও লাভ করিতে পারে নাই, অনেক সময়ে আমরা এরূপই ভাবিয়াই থাকি। সুতরাং টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ যাহা দেখাইল, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা সহজে ধরিয়া উঠিতে পারি না। কখনো মনে হয়, আমরা য়ুরোপকে

যাহা বুঝিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর কখনো মনে হয়, বুঝি বা টাইট্যানিকের তিরোধানের যে কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে কল্পিত। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বধারণাও একান্তই মিথ্যা নহে; আর আজ যে ছবি দেখিলাম, তাহাও নিতান্তই কল্পিত নহে। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা যে ত্যাগের পথ ধরিয়া যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে, য়ুরোপ যে সে পথেরই সন্ধান পাইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহা প্রমাণ হয় না। ভারতের পথ চিরদিনই ত্যাগের পথ। য়ুরোপের পথ চিরদিনই ভোগের পথ। ভারতের যতই কেন আত্মবিস্মৃতি জন্মাক্ না, সে কখনো একান্তভাবে য়ুরোপের ভোগের পথ ধরিতে পারিবে না। আর য়ুরোপের যতই কেন ক্ষণিক শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হউক না, সেও কখনো ভারতের এই প্রাচীন ত্যাগের পথ ধরিতে পারিবে না। ভারত যদি য়ুরোপের অদ্ভূত অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার ভোগের পথ ধরিতে যায়, তাহাতে আত্মচরিতার্থতা লাভ করা দূরে থাকুক, সে নিষ্ফল প্রয়াসে তাহার ভাগ্যে কেবল আত্মঘাতী পরধর্ম্ম লাভই ঘটিবে। আর য়ুরোপও যদি ভারতের প্রাচীন পারমার্থিক সম্পদের অতিলৌকিক শক্তি দর্শনে আপনার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পরধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হয়, সে প্রয়াসও তাহার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াই উঠিবে।

* * *

ফলতঃ কি ভারতের কি য়ুরোপের পক্ষে এইরূপ পরধর্ম্মানুশীলনের কোনই প্রয়োজনও নাই। কারণ মানব প্রকৃতির মৌলিক একত্বনিবন্ধন, মানুষ আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, নিষ্ঠাসহকারে যে পথেই চলুক না কেন, পরিণামে সেই মূল প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হইবে; ইহার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। সকল নদীই যেমন একই সাগরগর্ভে যাইয়া আপনার চরিতার্থতা লাভ করে, সেইরূপ সকল মানবীয় সাধনাই ঋজুকুটীলভাবে, নানা পথ অতিক্রম করিয়া, পরিণামে যে মনুষ্যত্বে মানবপ্রকৃতিমাত্রেরই সার্থকতা লাভ হয় সেই মনুষ্যত্বকেই প্রাপ্ত হয়। য়ুরোপের প্রবাদে একটী কথা আছে—সকল পথই চরমে রোম নগরে যাইয়া পৌঁছায়। সেইরূপ সার্ব্বজনীন মানব ইতিহাসেরও সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বপ্রকারের মানবীয় সাধনাই চরমে একই পরম মনুষ্যত্ব বস্তুকেই ফুটাইয়া তুলে। ত্যাগে যেমন ত্যাগের পরিসমাপ্তি হয় না, নিষ্কাম ভোগে যাইয়াই ত্যাগ আপনার সার্থকতা লাভ করে; সেইরূপ ভোগও আপনার চরিতার্থতার জন্যই ক্রমে ত্যাগের পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং আদিতে যে ভোগ কামাবিষয়ের অনুসরণ করিয়া চলে, ক্রমে ত্যাগের পথ ধরিয়া তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধ্যে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে হয়।

* * *

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার আত্যন্তিক ভোগ লালসা আপনার চরিতার্থতার জন্যই যে সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে

বাধ্য হইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধান-কালে তাহারই শ্রেষ্ঠতম ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আধুনিক ভোগের আয়োজন করিতে হইলে, বহুলোকের সমবেত শ্রম ও সাহচর্য্য প্রয়োজন হয়। টাইট্যানিক আপনি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এতবড় বিপুলকায় অর্ণবযান পরিচালনার জন্য বহুলোকের আবশ্যক হয়। এই বহু-সংখ্যক নৌ-কর্ম্মচারী ও নাবিকদিগের পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের কর্ম্মাকর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই সকল ব্যবস্থার উপরেই যখন এত আরোহীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন-মরণ নির্ভর করে, তখন এসকলের বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয় যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কঠোর শাসনেরও প্রয়োজন হয়। এক এক খানি সমুদ্রগামী জাহাজ এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের মত। কাপ্তান সেই রাজ্যের রাজা। জাহাজের কর্ম্মচারী এবং আরোহী সকলকেই কাপ্তানের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হয়; না চলিলে জাহাজ-পরিচালনা অসম্ভব এবং এত লোকের প্রাণরক্ষা অসাধ্য হইয়া পড়ে। সেনা-শিবিরে প্রত্যেক সেনাপতির যে প্রভুত্ব ও অধিকার, সমুদ্রগামী জাহাজের কাপ্তানের সেইরূপ অধিকার ও প্রভুত্ব রহিয়াছে। এখানে নাবিক এবং আরোহী সকলেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা,—জাহাজের কাপ্তান। যাহারা এই সকল জাহাজে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে ও এই সকল জাহাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই জাহাজের বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতে ও কাপ্তেনের আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর এই অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহারা এক প্রকারের সংযম শিক্ষাও করিয়া থাকে। এই সংযমের গুণেই আসন্ন মৃত্যুর মুখেও টাইট্যানিকের দ্বিসহস্রাধিক আরোহী ও নাবিক বিন্দুমাত্র ভয়বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই।

* * * *

এ তো গেল বিশেষ ব্যবস্থার ও বিশেষ বিধানের কথা। ইহার অন্তরালে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মও বিদ্যমান ছিল। এই সভ্যতা ও সাধনা, যতই কেন ভোগপ্রধান হউক না, ইহার পারমার্থিক দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও, পরার্থপরতা বস্তুতঃ সামান্য নহে। বিধাতার রাজ্যে অত্যন্ত ভোগী যে সেও কখনও নিতান্ত একাকীত্বের মধ্যে কিছুই ভোগ করিতে পারে না। জনসমাজই একদিকে যেমন ত্যাগের, অন্যদিকে সেইরূপ ভোগেরও একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। একান্ত একাকী হইয়া যে থাকে, সে যেমন ত্যাগের অবসর পায় না, সেইরূপ ভোগের আয়োজনও করিতে পারে না। ভোগের মাত্রা যতই বাড়িয়া যায়, ততই দশজনকে মিলাইয়া, দশজনের শক্তি সাধ্যের সমবায়ে সেই ভোগের আয়োজনও করিতে হয়। আর এইরূপে দশজনে মিলিয়া কোনো কিছু করিতে গেলেই প্রত্যেকের স্বার্থ-পরতাকে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই, কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়। এই সমবায়ের সূত্র ধরিয়াই য়ুরোপ এতটা অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আর দশজনে

মিলিয়া কাজ করিতে যাইয়াই য়ুরোপীয় সমাজে এক প্রকারের পরার্থপরতাও বিকাশ হইয়াছে। এইরূপে দেশের জন্য ও দশের জন্য ত্যাগস্বীকার করা য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার একটী সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই য়ুরোপের জাতীয় চরিত্রে একটা অতি উদার বিশ্বপ্রেমের আদর্শও ফুটিয়া উঠিয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধান কালে আমরা এই সকলেরই একটা অতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। ত্যাগের পথে যাইয়া ভারত মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল। ভোগের পথে যাইয়া য়ুরোপ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। ভারত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মা সাধন করিয়া আপনি সুখদুঃখের অতীত হইয়াও জগতের সুখকেই আপনার সুখ ও জগতের দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ ও ভোগ করিবার নিগূঢ় সঙ্কেত লাভ করিয়াছিল। এই মহাপরিনির্ব্বাণের সুখ-দুঃখের তত্ত্ব য়ুরোপ জানে না। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থার সংবাদ আধুনিক সভ্যতা রাখে না। কিন্তু আপনি সুখ চাহে বলিয়াই, য়ুরোপ অপরকেও সুখী করিতে চাহে এবং আপনি দুঃখের তীব্র হলাহল পান করিতেছে বলিয়াই, সে বিষের যাতনা জানে এবং তাহারই জন্য জগতের দুঃখীতাপীর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে এবং সেই দুঃখ ও সেই বেদনা উপশম করিবার জন্য কখনও কোনও শ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতেও বিমুখ হয় না। টাইট্যানিকের তিরোধানে কি করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে হয়, তাহাই দেখিলাম। কেমন করিয়া অপরের সুখে সুখানুভব ও অপরের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়, তাহাও দেখিলাম। কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে যাইয়াও যে অসাধারণ সংযমের প্রয়োজন হয় এবং এই অপরিহার্য্য সংযমের মধ্য দিয়াই যে অতি উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বও ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং এই পথে যাইয়াও যে সুকৃতিসম্পন্ন লোকে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ লাভ করিতে পারেন, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহাও দেখিলাম। এ সকল দিকেই আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টাইট্যানিক আধুনিক য়ুরোপের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অন্যতম নিদর্শনরূপে গঠিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপীয় কর্ম্মিগণের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সগর্ব্বে সাগর বক্ষে ভাসিয়াছিল। আর য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ব ভোগপ্রধান সাধনার মূলেও সে ভাগবতীলীলাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠতম যোগশক্তি ও মোক্ষসম্পদ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, ইহা প্রমাণ করিয়াই টাইট্যানিক অতল সাগরতলে অন্তর্হিত হইয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ মহীয়ান্ ও জগৎ লাভবান্ হইয়াছে।

———

নাহি সে

(১)

নাহি সে উৎসাহ, আশা, কামনা, কল্পনা ;
আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জ্জনা।
শীতে যথা শুষ্ক সরঃ পড়িয়া নীরবে,
কুয়াসা দুর্গন্ধ-ভরা গলিত-পল্লবে।
উবে গেছে সুখ শোভা সুরভি সুসার ;
রয়েছে শৈবাল পঙ্ক,—যা নহে যাবার !

(২)

রয়েছে পড়িয়া পিছে কি দীন জীবন !
প্রভাত আনে না আর নব জাগরণ !
মধ্যাহ্নে পড়ে না আর সে শ্রম-নিশ্বাস ;
সায়াহ্নে আসে না আর আপনে বিশ্বাস।
আসে যায় দিনরাত, সেই অবসাদ—
মানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, নাহিক আস্বাদ।

(৩)

ধরা জুড়ে পড়ে আছে সুধু সেই দিন,—
সে ফুল্ল উজ্জ্বল চক্ষু হ'তেছে মলিন !
চায়—চায়—তবু চায়, কি বলিতে চায়,
হৃদয়ের ভাষা তার অধরে মিলায় !
হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ ;
শীতল নিস্পন্দ দেহ, মুদ্রিত নয়ান।

(৪)

মরণ-কালিমা দেহে, তবু কি সুষমা !
রাহুর কবলে যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রমা।
কি মহিমা—কি ভঙ্গিমা—নির্ভয় হৃদয়,
এখনি জাগিবে যেন করি' মৃত্যু জয়।
কোথা তুমি—কোথা আজ মৃত্যু-বিজয়িনী—
সর্ব্বার্থসাধিকে গৌরী শিবে নারায়ণী !

(৫)

দিয়া তব রূপগুণ না হয় মরণে—
বাঁচিলে না কেন আর দু' দিন জীবনে !
সুধুই বুঝায়ে গেলে,—কি ছিলে আমার—
জগতের সার তুমি—জীবনের সার !
না লইতে প্রেমপূজা—প্রেম প্রতিদান,
না করিতে আবাহন, দেবী অন্তর্দ্ধান !

(৬)

মনে হয়,—ছুটে যাই পিছে পিছে তব,
হউক না যত দুখ, সব দুখ স'ব।
এক দিন—কোন দিন—যদি কোন কালে,
চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ অন্তরালে।
বলিব না কোন কথা ; দুটি করে ধরি',
চেয়ে—চেয়ে মুখপানে র'ব বুকে মরি'।

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

হিন্দুর ধর্ম্মের বিচিত্রতা

হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম বলেন সে বস্তু সনাতন। কালবিশেষে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। দেশ বিশেষে সে ধর্ম্ম আবদ্ধ হয় না। তাহা কেবল হিন্দুরই ধর্ম্ম নহে, মানব মাত্রেরই তাহা ধর্ম্ম। এই জন্য সে ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবেই সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন। এ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বেদে বা বাইবেলে, আভেস্তায় বা তালমুদে, ত্রিপিটকে বা কোরাণে নাই। কারণ—"বেদাঃ বিভিন্নাঃ"। তাহা স্মৃতিতে নাই; কারণ "স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ"। তাহা মুনিজনের মীমাংসায় নাই, কারণ "নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং"। সে ধর্ম্মের তত্ত্ব "গুহায়াং নিহিতং"—মানব প্রকৃতির মূলে নিহিত আছে। আর গুহা-প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এ ধর্ম্ম সনাতন ও সার্ব্ব-জনীন। এই ধর্ম্মবস্তু প্রত্যেক মনুষ্যের মূল প্রকৃতি হইতেই ফুটিয়া উঠে; বাহির হইতে কাহারো উপরে আসিয়া চড়িয়া বসে না। আর সকল মানুষের প্রকৃতি যখন সমান নহে, তখন সকলের ধর্ম্মও কখনই এক হইতে পারে না। হিন্দু এই সত্যটা অতি দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া, কখনই খৃষ্টীয়ান্ বা মুসল-মানের মত, আপনার ধর্ম্মকে অপরের উপরে চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে হিন্দুর মানব-হিতৈষার অভাব বুঝায় না; কিন্তু তাঁর গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টিরই প্রমাণপরিচয় প্রদান করে।

ফলতঃ হিন্দু যে মানুষকে কেবল ভাল বাসেন, তাহা নহে; মানুষকে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্তি করাই তাঁর সাধনের একটা মুখ্য অঙ্গ। হিন্দুর চক্ষে মানুষ কেবল মানুষ নহেন, কিন্তু নারায়ণ। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীকে কেহ প্রণাম করিলে, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া, তাঁহারা সে ব্যক্তির প্রত্যভিবাদন করেন। এই রীতিটী জগতের আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। খৃষ্টীয় জগতে মানুষের মর্য্যাদা অশেষ প্রকারে বাড়িয়াছে, স্বীকার করি। "কোনো মানুষ, তার সাংসারিক অবস্থা ও সামাজিক পদমর্য্যাদা যাই থাক বা না থাক না কেন, আমা অপেক্ষা হীন নহে"—ইহা সাধন করাই খৃষ্টীয় সভ্যতার মানব-প্রেমের আদর্শ। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে, যিশুখৃষ্টের উপদেশে, এতদপেক্ষা একটা উচ্চতর আদর্শেরো আভাস পাওয়া যায়, স্বীকার করি। মানুষের সেবাতেই যে খৃষ্টের সেবা হয়, খৃষ্টীয় সাধনায় এ ভাবটা ফুটিয়াছে, মানি। কিন্তু তথাপি মানুষ যেমনটী আছে, ঠিক সেই ভাবে থাকিয়াই যে আমার অপেক্ষা বড়, আমার ভক্তির পাত্র, আমার ভজনার আধার ও অবলম্বন, হিন্দুর ভক্তি-সাধনেতেই কেবল এই ভাবটী যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, জগতের আর কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। এই জন্য মানুষের প্রতি যে হিন্দুর কখনো ভাল-বাসার অভাব ছিল বা আছে, তাহা নহে। তবে ভালবাসার অত্যাচারটুকু নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। খৃষ্টীয়ান্ যখন আমাকে ভালবাসেন, তখন তিনি আমাকে তাঁরই মত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হন। তাঁর ধর্ম্মটা যা'তে আমি গ্রহণ করি, তাঁর

সভ্যতা ও সাধনা যা'তে আমি অবলম্বন করি, তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে যা'তে আমি সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করি, তার জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। আমি যেমনটী আছি, তেমনটী থাকিয়া যাইব, ইহাতে তাঁর প্রীতির ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। যেখানে প্রীতির একান্ত ব্যাঘাত নাও জন্মে, সেখানেও প্রীতি আর প্রীতি থাকে না, কিন্তু নিরতিশয় স্নিগ্ধ অনুকম্পার আকার ধারণ করে। মর্য্যাদা, সম্মান, ভক্তি, ইহাই সত্য প্রীতির প্রাণ। প্রীতি যেখানে এই মর্য্যাদা-জ্ঞান রক্ষা করিতে পারে না, সেখানে তাহার প্রীতিত্ব নষ্ট হইয়া, তাহা অনুকম্পাতে পরিণত হয়। পাদ্রিজন-সুলভ প্রীতি তাই প্রকৃত পক্ষে প্রীতি নহে, কিন্তু অনুকম্পামাত্র। হিন্দুর সাধনায় মানুষকে প্রীতি করিবার পন্থা আছে, তাঁহাকে ভক্তি দিবার বিধান আছে, কিন্তু এই পাদ্রিজন-সুলভ অনুকম্পা করিবার স্থান নাই। যে যা'কে অনুকম্পা করে, সে নিজকে তার অনুকম্পার পাত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিবেই ভাবিবে। মুখে স্বীকার না করিলেও, এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অন্তঃসলিলার মত, তাহার প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া থাকিবেই থাকিবে। এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান যে সূত্রে ও যে আকারেই মানুষের প্রাণে প্রবেশ করুক না কেন, ইহা যে ধর্ম্মসাধনের আত্যন্তিক শত্রু, হিন্দু ইহা জানেন। সুতরাং তিনি লোককে ভক্তি দিতেই চাহেন, তাহাকে অনুকম্পা করিবার জন্য কদাপি ইচ্ছা করেন না। আর যে যা'কে ভক্তি করে, সে তার গুণভাগেরই প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলে, দোষভাগকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করে না। তা'কে ভক্তি দিতেই সে চাহে, তা'কে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে না। জগতের প্রচারক-ধর্ম্ম সকলে দুনিয়ার লোককে উদ্ধার করিবার বাসনাটাই অত্যন্ত প্রবল। হিন্দুর এ বাসনা নাই বলিয়া, হিন্দুর ধর্ম্ম প্রচারক-ধর্ম্ম নহে। আর ধর্ম্মবস্তুকে মানুষের মূল প্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দুর ধর্ম্ম প্রচারক-ধর্ম্ম হইতে পারে নাই।

কারণ, মানুষের ভিতরকার প্রকৃতি হইতেই যখন তার ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠে, তখন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা নিবন্ধন, তাহাদের ধর্ম্মও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। আর এই তত্ত্বটী অতি দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম যেমন একদিকে খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্ প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় দুনিয়ার লোককে আপনার ভিতরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই; সেইরূপ নিজের ভিতরেও অশেষপ্রকারের বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন। যেভাবে ও যে অর্থে খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম বা মুসলমান্ ধর্ম্মকে একটা ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, হিন্দুর ধর্ম্মকে সেই ভাবে ও সেই অর্থে একটা ধর্ম্ম বলা যায় না। বিশাল হিন্দুর ধর্ম্মের আশ্রয়ে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগকে মোটামুটি জড়োপাসক বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ইহাঁরা যে কাষ্ঠলোষ্ট্রের পূজা করেন, তাহা নহে। জগতের অতিশয় নিম্নস্তরের সাধনাতেও জড় বলিয়া জড়ের উপাসনা নাই। কিন্তু এই সকল জড়োপাসক জড় আধারে অজড়ের অধ্যাস করিয়াই, তাঁহার পূজা করেন। এই অধ্যাস-জনিত উপাসনাকে বেদান্তে প্রতীকোপাসনা বলেন। হিন্দুর ধর্ম্মে যেমন এই নিম্নতম

অধিকারের প্রতীকোপাসনা আছে; তেমনি অসংখ্য দেবদেবীর-পূজাও প্রচলিত রহিয়াছে। আর এই সকল দেবদেবী যে সকলেই এক জাতীয় তাহা, নহে। শিতলা বা ওলাবিবির পূজা যে শ্রেণীর, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা সে শ্রেণীর নহে। আবার এই সকল পৌরাণিক দেবদেবীর ভজনা যে শ্রেণীর, ভক্তিপ্রাণ বৈষ্ণব বা শৈব সিদ্ধান্তের রাধাকৃষ্ণের বা শিব-শক্তির ভজনা সে শ্রেণীর নহে। হিন্দুর ধর্ম্মে যেমন অতি নিম্ন অধিকারের প্রতীকো-পাসনার ব্যবস্থা আছে, তেমনি মধ্যমাধিকারের সম্পদুপাসনার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। দুই বস্তুর মধ্যে কোনো সামান্য ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহাদের ক্ষুদ্রতর যে বস্তু,—এবং ক্ষুদ্রতর বলিয়াই যাহা বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত,—তাহার সাহায্যে বৃহত্তর বস্তুর যাহা জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে সম্পদজ্ঞান বলে। ভূগোল শিক্ষার্থী দৃষ্ট ও করায়ত্ত কমলালেবুর সাহায্যে অদৃষ্ট ও অনায়ত্ত পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহা এই সম্পদজ্ঞান। কমলালেবু ও পৃথিবীর মধ্যে আকারগত যে সামান্য ধর্ম্ম আছে, কমলালেবুকে সম্মুখে রাখিয়া, সেই সামান্যধর্ম্ম অবলম্বনে কেহ যদি অদৃষ্ট পৃথিবীর ধ্যান ও আরাধনা করিতে যান, তাঁর সে উপাসনাকে সম্পদুপাসনা বলা যাইবে। সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুরও কতকটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ; আর কিছুতে সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না; সূর্য্য নিজেই নিজকে প্রকাশিত করেন। আর নিজকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই যুগপৎ তিনি এই জগতকেও লোকচক্ষে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সুতরাং সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ, তেমনি জগৎপ্রকাশক। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুও স্বপ্রকাশ ও জগৎ প্রকাশক। সেই চিদালোকেই আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় জগতের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়কে জানিতেছে। আর এই বিশ্বকে এইভাবে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই, চিৎজ্যোতি যে ব্রহ্মবস্তু তাহা আপনাকেও প্রকাশিত করিতেছেন; এই জন্যই শ্রুতি কহেন "তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবিব চক্ষুরাততং।" ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে সূর্য্যের এই সামান্য ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, গায়ত্রিমন্ত্র-সাহায্যে এই প্রত্যক্ষ সবিতার ধ্যান ও আরাধনা করা সম্পদুপাসনার অন্তর্গত। যেমন সূর্য্যোপাসনা, তেমনি মনোপাসনা, তেমনি প্রাণোপাসনা, এ সকলই সম্পদুপাসনা। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মে আরো উচ্চ অঙ্গের স্বরূপ-উপাসনারও ব্যবস্থা আছে। এখানে সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়চেষ্টার বৈষয়িক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভ করা আবশ্যক করে। এই নিবৃত্তিলাভ হইলে, উপাসক আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া, সমাধিযোগে ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়া, স্বরূপোপাসনার অধিকারী হয়েন। কিন্তু এই স্বরূপোপাসনাতেই হিন্দুর সাধনা আপনার চরম চরিতার্থতা লাভ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারেই স্বরূপোপাসনার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেও উন্নততর অবস্থা আছে। সে লীলার অবস্থা। এখানে উপনিষদের ব্রহ্ম ভাগবতের লীলার-সময় ভগবানরূপে ফুটিয়া উঠেন। আর সাধক উপনিষদ যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহাকেই নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই এই

নিখিললীলারসে আত্যন্তিকভাবে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া, জীবন্মুক্তিলাভ করেন। কাষ্ঠলোষ্ট্রের উপাসক হইতে এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর সাধকই হিন্দুগোষ্টভুক্ত। ইহারা সকলেই আপন আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঋজু কুটীল, উচ্চ নিম্ন, বিবিধ পন্থা অবলম্বনে একই চরম সাধ্যের সাধনা করিতেছেন। আর ধর্ম্মবস্তুকে মানুষের প্রকৃতির মূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দুর ধর্ম্ম আপনার মধ্যে এমন অশেষ বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছে।

ফলতঃ মানবপ্রকৃতি হইতেই যদি ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তবে এই প্রকৃতিতে যেমন অশেষ বিচিত্রতা থাকিবেই থাকিবে তেমনি এই প্রকৃতি সকলের সমান নয় বলিয়া, মানুষের মতামতও কখনো এক হয় না, তার শক্তি সাধ্যও কখনো সমান হয় না। আমাদের মতামত তো আর আকাশ হইতে উড়িয়া পড়ে না; আমাদের মনের, বুদ্ধির, প্রজ্ঞার যতটা বিকাশ হইয়াছে ও যে সকল বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া এই মন ও বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সকলের ফলেই আমাদের মতামত গড়িয়া উঠে। অতএব যেখানে লোকের মনবুদ্ধি ঠিক এক রকম বিকশিত হয় নাই, আর যেখানে তাহাদের বাহিরের অভিজ্ঞতাও সমান নয়, সেখানে তাদের মতামত কদাপি সমান হইতেই পারে না। মানুষের সত্যিকার মতামত যদি ভ্রান্ত হয়, সে ভ্রান্তির নিরসন করিতে হইলে, তাহার মনের প্রকৃতিটাকে বদলাইতে হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সেই মানস প্রকৃতিটী এতাবৎকাল আপনার সার্থকতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে, সে সকল অবস্থা এবং ব্যবস্থারও যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটান আবশ্যক হইবে। নতুবা কখনই তার সত্যিকার মতামতগুলির সংশোধন বা পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি জগতের প্রচারকধর্ম্ম এই সত্যটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। এ সকল ধর্ম্ম নানা অবস্থার, নানা অধিকারের, নানা জাতির মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তার ফল এই দাঁড়ায় যে খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্ম্মের কথাগুলিই এই সকল লোকে শিখিয়া রাখে, সে সকল কথার অন্তরালে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব লুকাইয়া আছে, তাহা কিছুতেই ধরিতে পারে না। এবং এইজন্য কাল ক্রমে হীন অধিকারের লোকের মধ্যে এই সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া, হীন অর্থ পাইয়া, খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি প্রচারকধর্ম্ম সকলের মৌলিক শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না।

যিশুখৃষ্ট জুদিয়ার লোক। ইহুদীয় সাধনার পরিণত ফলরূপেই সে দেশে যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। যিশুখৃষ্টের উপদেশ ও সাধনপন্থার সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ও ইহুদীয় সমাজ-জীবনের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই সকল উপদেশ ও সাধন যখন প্রাচীন গ্রীশীয় চিন্তার সঙ্গে মিলিয়া গেল, গ্রীশীয় সমাজের সুধীগণ যখন যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মকে গ্রহণ ও সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই ধর্ম্মই এক নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইহুদীয় সাধনার ঝোঁক চিরদিনই কর্ম্মের দিকে ছিল। জিহোভার সঙ্গে ইহুদীয় জাতির আদি-পুরুষ এব্রাহেমের একটা বিশেষ সর্ত্তের উপরেই

প্রাচীন ইহুদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য ইহুদীয় ধর্ম্মকে আজিকালিকার পণ্ডিতেরা সর্ত্তের ধর্ম্ম বা কভেন্যাণ্ট্যাল্ রিলিজিয়ন্—Covenantal Religion—বলিয়া থাকেন। "তোমরা আমার হুকুম মানিয়া চল, আমার নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ কর, আমাকে তোমাদের এক মাত্র দেবতা বলিয়া গ্রহণ কর; আমিও তোমাদিগকে আমার নিজের লোক বলিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব ও জগতের অপরাপর জাতি সকলের মধ্যে তোমাদিগকে বাড়াইয়া দিব"—ইহুদী-দেবতা জিহোভার এই সর্ত্তের উপরেই ইহুদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহুদীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম-প্রধান। আর কর্ম্ম-প্রধান বলিয়াই ইহুদীয় পন্থায় আত্যন্তিক বৈধভাব বা লিগ্যালিজম (legalism) দেখা গিয়া থাকে। যিশুখৃষ্টের উপদেশে এই বিধিআনুগত্যই দাস্যরসের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া একটা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করে। কেহ কেহ যিশুর রসকে বাৎসল্য বলিয়াছেন, জানি। যিশু আপনার উপাস্যকে সর্ব্বদাই পিতা সম্বোধন করিয়া, আপনাকে তাঁহার পুত্ররূপেই দেখিতেন, ইহাও সত্য। পিতৃআদেশের ঐকান্তিক ও সপ্রেম আনুগত্যই যিশুর সাধনার মূল বস্তু। পিতৃ-ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ইচ্ছার আত্যন্তিক যোগ সাধনেই এই আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু এই যোগ দাস্য সাধনেও সম্ভব৷ এই যোগ দাস্যরসেরও সাধ্য। ইহাই দাস্য ভাবের বিশেষত্ব। দাস্যের রস উচ্চতর বাৎসল্যতেও আছে। "পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের ভাব পরে পরে বৈসে।" কিন্তু ইহা বাৎসল্যের বিশেষত্ব নহে। দাস সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে চাহে। প্রভুর আজ্ঞা-পালনেই তার সুখ, তার আনন্দ, তার সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ হইল মনে করে। পুত্র পিতার অনুগত হয় বটে, কিন্তু সে আনুগত্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তার মধ্যে এমন একটা মুক্তভাব থাকে, এমন একটী সহজ স্বাধীনতা থাকে, যাহা দাস্য সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। পুত্র পিতার কথা যদি কখনও নাও শোনে, তাহাতে তার বাৎসল্য রসের নিতান্ত ব্যাঘাত হয় না। পুত্র কখনও বা আপনাকে পিতার সমান, কখনও বা পিতা অপেক্ষা বড়ও মনে করিয়া থাকে, আর কখনও বা আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসহায় বলিয়াও ভাবে। এরূপ রসবৈচিত্র্য দাস্যভাবে পাওয়া যায় না। এ সকল বৈচিত্র্য যিশুর মধ্যেও দেখা যায় নাই, এইজন্যই যিশুর ভাবকে ঠিক বাৎসল্য বলা যায় না। এরূপ ভাবের সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ঐকান্তিক সঙ্গতি অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই কর্ম্ম-প্রধান যিশুধর্ম্মই যখন গ্রীশে যাইয়া পড়িল, গ্রীশীয় সাধনা যখন যিশুকে আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই তাহার মৌলিক বৈধীভাবটা ক্ষীণ হইতে লাগিল, এবং আদিতে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম-প্রধান ছিল, তাহাই ক্রমে নূতন মাটির নূতন রসের জোরে একান্তই জ্ঞানপ্রধান হইয়া উঠিল। আমরা আজি কালি যাহাকে খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম বলিয়া জানি, তাহার ইহুদীয় ভাব একেবারে লোপ না পাইলেও নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আর গ্রীশের দার্শনিক চিন্তার প্রভাবেই তাহার মধ্যে অতি গভীর তত্ত্বাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি গভীর তত্ত্বকথা গ্রীশেরই কথা, ইহুদীর কথা নহে। যিশুর ইহুদী শিষ্যগণের হাতে এ সকল ফোটে নাই। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার তত্ত্বজ্ঞানী-

দের নিকট হইতেই বর্ত্তমান খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের সকল প্রকারের গভীর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আবার যখন, কালক্রমে এই খৃষ্টীয় ধর্ম্মই রোমক সাধনার সঙ্গে মিলিয়া গেল, তখন এই নূতন সাধনার প্রভাবে, তাহার মধ্যে পুনরায় একটা প্রবল বৈধীভাবেরও প্রতিষ্ঠা হইল। খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম প্রচারকধর্ম্ম। নানা সময়ে নানা লোকের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! কিন্তু সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে, এই একই ধর্ম্ম নানা আকারও ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের মূল কথাগুলি সকল স্থানেই রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র একই অর্থে এই সকল কথা লোকে বোঝে নাই, বুঝিতে পারে না।

ফলতঃ কেবল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এ কথা সত্য, সাধারণ ভাবে সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নয়, এমন কথাও বলা যায় না। জগতের অসংখ্য খৃষ্টউপাসকদিগের সকলের অন্তরে খৃষ্ট যেমন এক নহেন, ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে ও সাধনাতে একই খৃষ্ট অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া আছেন; সেইরূপ প্রত্যেকের ঈশ্বরও অপরের ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। জগতের নানা লোকে, নানা নামে যেমন একই ঈশ্বরের ভজনা করে, ইহা সত্য; তেমনি প্রত্যেক লোকের অন্তরের ঈশ্বরানুভূতি ও ঈশ্বরোপলব্ধি যে অপর লোকের ঈশ্বরানুভূতি হইতে পৃথক, ইহাও সত্য। ব্রহ্ম বল, জিহোভা বল, ঈশ্বর বল, খোদা বল, বিষ্ণু বল, শিব বল, রাধা বল, শক্তি বল, যে নামেই পরমতত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর না কেন, এ সকল নামের অন্তরালে যে সত্য বস্তুর অনুভূতি থাকে, তাহা তোমার নিজের, তোমার ভিতরকার প্রকৃতির দ্বারা, সেই প্রকৃতির রসে রঞ্জিত হইয়া আছে। তোমার প্রকৃতি যদি তামসিক হয়, সাত্ত্বিক বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলেই তোমার প্রাণের মধ্যে যে দেবতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা কখনো সাত্ত্বিক হইবে না; হইতেই পারে না। এই জন্য সাধকের প্রকৃতির বিশেষত্ব নিবন্ধন অনেক শৈব এবং শাক্ত সাধকও প্রকৃত বৈষ্ণব হইয়া থাকেন, অনেক বৈষ্ণব সাধকও ঘোরতর শাক্ত হইয়া রহেন। অনেক নিরাকারবাদী ব্রাহ্মও ভিতরে ভিতরে ঘোরতর পৌত্তলিক হইয়া রহেন। আর অনেক দেবোপাসকও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক শ্রীসম্পদ লাভ করিয়া, দেবতার নামে ও দেববিগ্রহে সেই "অলখ নিরঞ্জনেরই" ভজনা করিয়া থাকেন। "জয় জ্যোতির্ম্ময়" বলিয়া অনেক ব্রহ্মোপাসকও চক্ষু বুজিয়া কেবল একটা জগৎজোড়া আগুনের হল্কাই হয়ত দেখেন; আর কখনো উচ্চ প্রকৃতির কোনো সাকারোপাসকও হয়ত, "জয় জ্যোতির্ম্ময়" বলিতে বলিতেই ধ্যান মগ্ন হইয়া আপনার অন্তরে স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক চিজ্জ্যোতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোনো আকার সম্মুখে না রাখিলেই যে অমূর্ত্তের মানস-পূজা হয়, আর বাহ্যমূর্ত্তির সম্মুখে বসিলেই সর্ব্বদা যে মূর্ত্তেরই পূজা করিতে হয় সেখানে অমূর্ত্তের প্রকাশ অসম্ভব ও অসাধ্য, তাহা নহে। দেবতার মূর্ত্ত-প্রকাশ ও অমূর্ত্ত-প্রকাশ উভয়ই বাহিরের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার বা তাহার অভাবের উপরে নির্ভর করে না। কিন্তু উপাসকের ভিতরকার প্রকৃতির উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহার ভিতরকার

প্রকৃতির মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাহাকে অমূর্ত্তের উপাসনায় প্রবৃত্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কেবল শব্দ মাত্রই শুনিবে, সে শব্দের মর্ম্ম গ্রহণে কখনই সমর্থ হইবে না। সে নিরাকারের ভজনা করিতে যাইয়া, দেবতাপক্ষে যত ইন্দ্রিয়ের উপরে যাইবার চেষ্টা করিবে, নিজের সাংসারিক ও বৈষয়িক জীবনে ততই ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের দ্বারা আরও অধিক অভিভূত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় তার সাক্ষ্য। আর যার প্রকৃতি অতীন্দ্রিয়ের অধিকারে যাইয়া পৌছিয়াছে, সে রাম নামই করুক, আর খৃষ্ট নামই করুক, সে সেই নামের ভিতরেই যিনি নামরূপের অতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। অনেক হিন্দু ও ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান্ সাধক ইহার প্রমাণ। আর হিন্দু এ সকল তত্ত্ব অতি পরিস্কাররূপে ধরিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার ধর্ম্মে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার, অতি ঘোরতর তামসিক, অতি প্রবল রাজসিক, ও নিরতিশয় সাত্ত্বিক, এই সকল বিচিত্র ও পরস্পর বিরোধী মহা মতের ও সাধন-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর ধর্ম্মের তত্ত্বকে গুহাতে—মানব প্রকৃতির মূলে—প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দু আপনার ধর্ম্মকে এত উদার ও তাহাতে এত বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

ভারত, আয়র্ল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য নীতি

কেবল চীনের অভ্যুত্থান বা প্যান্‌ইস্লামিজ্‌মের আশঙ্কা হইতেই যে লাট হার্ডিঞ্জের বর্ত্তমান ভারত-শাসন-নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা নহে। সমস্ত সভ্য-জগতের, এবং বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে ইহার অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। সভ্যজগতে তিনটী বিপুল শক্তি ক্রমে পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতি সকল, আশিয়া ওআফ্রি-কার অভিনব অভ্যুদয় আকাঙ্খা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে শ্বেত-কৃষ্ণের একটা তুমুল বিরোধ বাধিবার আশঙ্কা জাগিয়াছে। শ্বেতাঙ্গসমাজ এখন এশিয়ায় ও আফ্রিকায় যে অসংযত প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন, ইহা আর বেশি দিন যে অপ্রতিহত থাকিবে, এমন মনে হয় না। জাপানের অভ্যুদয়-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ও পূর্ব্ব আশিয়ায় য়ুরোপের রাজ্য-বিস্তার চেষ্টা চিরদিনের জন্য প্রতিহত হইয়াছে। চীনের অভ্যুত্থানের ফলে আশিয়ার য়ুরোপের প্রভাব আরও কমিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে হয়ত য়ুরোপীয় জাতি সকলকে কেবল যে আশিয়া ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহা নহে; কিন্তু একবার যদি চীন-জাপান একত্রিত হইয়া, একটা মঙ্গোলীয় শক্তিস্তম্ভ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার দুর্নিবার

আত্মপ্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে য়ুরোপের পক্ষে আত্মরক্ষা করাও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। রুশ-জাপান সমরের অবসান হইতেই য়ুরোপের প্রাণে এ আতঙ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। রুশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড, এরা সকলেই স্বল্পবিস্তর এই আতঙ্কের দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন। এইজন্যই যে রুশিয়া শতাব্দধিক কাল হইতে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়া ছিল, যার ভয়ে ভারতে ব্রিটিশপ্রভুশক্তি সততই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, যাহাকে সন্দেহের ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখা ভারতীয় ইংরেজ-শাসনকর্ত্তাদের একরূপ প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সেই রুশিয়ার সঙ্গেই ব্রিটিশ-রাজ আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশেষভাবে সৌখ্যবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। জাপান-চীনের অভ্যুদয় যেমন রুশিয়ার তেমনি আমেরিকারও আশঙ্কার হেতু হইয়াছে। আর এইজন্যই ইংলণ্ডের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্ভাবিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটা সালিশীর ব্যবস্থা করিতে আমেরিকা এতটা ব্যগ্র হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ সমাজ এইরূপে যথাসাধ্য আপনাদের ঘরাও বিবাদ মিটাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এই ব্যাকুলতার অন্তরালে দীর্ঘকালনিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজের আকস্মিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা জাগিয়া আছে। এই আশঙ্কার তাড়নায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতরকার বিবাদগুলাও অতি সত্বর মিটানো আবশ্যক হইয়াছে। ইংরেজ মন্ত্রিসমাজ আজ যে এত ব্যস্ত ও ব্যগ্র হইয়া আয়র্ল্যাণ্ডে "হোমরুল" বা স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহার পশ্চাতেও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, অপরোক্ষে এই আশঙ্কাই জাগিয়া আছে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শান্তি-স্থাপন ও ঘননিবিষ্টতা সাধনের জন্য সর্ব্বাগ্রে এই পুরাতন বিবাদটা মিটানো আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডে এই হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অপরাপর প্রদেশেও অনুরূপ "হোমরুল" বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। ফলতঃ আয়র্ল্যাণ্ডে হোমরুল প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজমন্ত্রিগণ, স্কটল্যাণ্ডে এবং ওয়েলসেও ক্রমে অনুরূপ শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন। আয়র্ল্যাণ্ডের হোমরুল-বিল পাশ হইলে, সেখানে একটা পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং আয়র্ল্যাণ্ডের শাসন-কর্ত্তাগণকে এই পার্লেমেণ্টের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে।

A National Parliament in Ireland and an Executive subject to that Parliament—

আইরিশ স্বরাজ-পন্থীগণ বহুদিন হইতে ইহাই চাহিতেছিলেন। এতাবৎকাল ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকগণ কিছুতেই আয়র্ল্যাণ্ডের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি হন নাই। এরূপভাবে রাবণের চিতার ন্যায় একটা প্রধূমিত বিদ্বেষবহ্নি আয়র্ল্যাণ্ডে জাগাইয়া রাখিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত আশঙ্কার প্রতিরোধ করিয়া সম্যকরূপে আত্মরক্ষা করা যে একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য হইবে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াই, বর্ত্তমান মন্ত্রিসমাজ আয়র্ল্যাণ্ডে হোমরুল-প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই স্বরাজ পাইয়া আইরিশগণ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের

সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্বন্ধচ্ছেদন করিতে চেষ্টা করিবেন, এ আশঙ্কা কখনই বেশী ছিল না, এখন একেবারেই নাই। বরং ইংরাজসমাজের রাষ্ট্রনীতিবিশারদগণ এখন এইটাই বুঝিয়াছেন যে, আয়র্ল্যাণ্ডকে জোর করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত রাখিবার চেষ্টাতে সেই সাম্রাজ্যের শক্তিও ঘনিষ্টতা যে পরিমাণে নষ্ট হইবে, আয়র্ল্যাণ্ডে স্বরাজ প্রতিষ্টিত হইলে, সে পরিমাণে নষ্ট হইবার কোনোই আশঙ্কা নাই। বরং তাহাতে, সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-সফলতা লাভের সম্পূর্ণ অবসর পাইয়া, যেভাবে আয়র্ল্যাণ্ড সেই সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবে, জোর করিয়া তাহকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ও ন্যায়ানুগত আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম-সফলতা লাভের পক্ষে অথবা বাধা বিঘ্ন স্থাপন করিলে, কিছুতেই তাহার সে অনুরাগ জন্মাইবে না। প্রত্যুত কেবল বিরাগ ও বিদ্বেষই বাড়িয়া উঠিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য, সাম্রাজ্যের শক্তিপুঞ্জকে সংহত করিয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে হইলে, তাহার অঙ্গীভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও জাতি সমূহের স্বাভাবিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে যথা-যোগ্যভাবে পূর্ণ করাই আবশ্যক। আধুনিক জগতে যে সকল বিশাল ও বিভীষিকাজনক শক্তিসঙ্ঘ ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতরকার সকল প্রকারের বিবাদ মিটাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই, প্রকৃতপক্ষে, আয়র্ল্যাণ্ডে হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহারই জন্য ক্রমে স্কটল্যাণ্ডে এবং ওয়েল্‌সেও এইরূপ হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বশেষে শুদ্ধ আপনার প্রাদেশিক স্বত্বস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত এই প্রকারের হোমরুল বা স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইবে। আর যখন এইরূপে বর্ত্তমান ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের বা ইউনাইটেড্ কিংডমের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই সকল প্রাদেশিক হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেখানে আপনা হইতেই, মার্কিণের যুক্তরাষ্ট্রের বা 'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স'এর ন্যায় একটা ফেডারেল কনষ্টিটউসান Federal Constitution বা সমবায়-শাসন-তন্ত্র গড়িয়া উঠিবে। মার্কিনের যুক্তরাষ্ট্রে রাজার স্থান নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে সমবায়-শাসন-তন্ত্র গড়িয়া উঠিলেও, তাহা মার্কিণের মত প্রজাতন্ত্র হইবে না। ব্রিটিশ-রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে আজ যেমন, তখনও, এই নূতন সমবায়-শাসন-তন্ত্র বা ফিডারেল কনষ্টিটিউশন গড়িয়া উঠিলে, ইংলণ্ডেশ্বরই অধিষ্ঠিত থাকিবেন। আয়র্লাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে, ওয়েল্‌সে ও ইংলণ্ডে এই সকল প্রাদেশিক স্বরাজ বা হোমরুল প্রতিষ্ঠিত হইলে আপনা হইতেই ব্রিটিশ-প্রজাসভার বা পার্লেমেণ্টের প্রকৃতি ও শক্তি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এখন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট প্রাদেশিক আইন কানুনও বিধিবদ্ধ করেন, আবার সাম্রাজ্যের কল্যাণার্থে যে সকল সাধারণ বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহাও প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু প্রাদেশিক প্রজাসভা গঠিত হইয়া, প্রাদেশিক স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য যাহা যাহা বিশেষভাবে আবশ্যক হইবে, সে সকল

কাজ প্রাদেশিক প্রজাসভা ও সেই প্রজাসভার অধীনস্থ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই আপনারা করিবেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন ফেডারেল পার্লেমেণ্ট হইবে। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এই সাধারণ প্রজাসভা গঠিত হইবে। যে সকল বিষয়ে সকল প্রদেশের বা একাধিক প্রদেশের স্বত্বস্বার্থ আছে, কেবল সেই সকল বিষয়ই এই ফেডারেল পার্লেমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা করা, তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিরোধের মীমাংসা করা, সমগ্র সাম্রাজ্যের সন্ধিবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান ও তত্ত্বাবধান করা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে আপনাদের যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপন করা, ও এই সকল সম্বন্ধকে যথাযোগ্যভাবে রক্ষণ করা,—এই সকলই তখন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের কর্ম্ম হইবে। ব্রিটিশ প্রজাসভা ক্রমে এইভাবেই পুনর্গঠিত হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রজীবন এই দিকেই বিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে।

ফলতঃ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি-বিশারদেরা সুস্পষ্টই দেখিতেছেন যে কেবল এই পথেই অব্যবহিত ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধান সম্ভব। ইহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। এখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিতে যাহা বুঝি, তাহা তিন অঙ্গে পূর্ণ হইয়া আছে। এই সাম্রাজ্যের এক অঙ্গ, গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য, ইংরেজিতে ইহাকে United Kingdom of Great Britain and Ireland বলে। তার দ্বিতীয় অঙ্গ,—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানেডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকা, এই চারিটী উপনিবেশ। আর তার তৃতীয় অঙ্গ,—ভারতবর্ষ ও মিশর। এই তিনটী অঙ্গের মধ্যে, বলিতে গেলে, কোনো প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক, অচ্ছেদ্য যোগ, কিম্বা কোনো প্রকারের স্বত্বস্বাধীনতার বা শাসনতন্ত্রের সমতা নাই। এই তিনটী অঙ্গের শাসন-তন্ত্র তিনটী স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়া আছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির কথা। এই উপনিবেশগুলিকে কোনো মতেই ইংলণ্ডের অধীন বলা যায় না। ফলতঃ এগুলিকে এক একটী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিলেও চলে। তারা নিজেদের আইনকানুন নিজেরাই বিধিবদ্ধ করে, নিজেদের করভার নিজেরাই নির্দ্ধারণ করে, নিজেদের রাজস্ব নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতই ব্যয় করে। নিজেদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণ নিজেরাই নিযুক্ত করে। তারা ব্রিটনের আমদানী পণ্যের উপরে ইচ্ছামত শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশের লোককে তাহাদের দেশে ইচ্ছামত যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দিতে বা তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। তাহারা ইংরেজকে কোনো কর দেয় না। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগ বা সেনা-বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এক কপর্দ্দক অর্থও দান করে না। ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। ইংলণ্ডের যুদ্ধ বিগ্রহাদির সঙ্গেও তাহারা যোগদান করিবে কি না তাহাও সম্পূর্ণরূপেই তাহাদের ইচ্ছাধীন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ তাহাদের গবর্ণর-নিয়োগ করিবেন, আর তাহারা নিজেরা কোনও পররাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সন্ধিবিগ্রহাদি করিতে পারিবে না ইহাই তাহাদের উপরে ব্রিটিশ-আধিপত্যের চরম সীমা। কিন্তু সন্ধি

বিগ্রহ না করিতে পারিলেও, এই সকল উপনিবেশ স্বেচ্ছামত ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যগত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে। অতএব উপনিবেশ সকলের উপরে ব্রিটেনের প্রভুত্ব একটা মৌখিক বস্তু। স্বজাতীয় লোক বলিয়া ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম্ম জাতীয় প্রকৃতি ও প্রেরণা এ সকল বিষয়ে কোনও কোনও উপনিবেশের সঙ্গে ব্রিটেনের একটা আন্তরিক ঐক্য ও ভাবগত যোগাযোগ রহিয়াছে। ক্যানেডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার সঙ্গে এ যোগ ততটা নাই। কিন্তু ক্যানেডা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিকাংশ অধিবাসী ব্রিটিশ-শোণিতপ্রসূত না হইলেও, তারাও ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া যে সকল স্বাধীনতা ও সুখসুবিধা ভোগ করিতে পারে, তারই জন্য তাহাদের প্রাণেও এ মৌখিক যোগটা ভাঙ্গিবার কোনো প্রকারের প্রয়োজন বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এ সকল উপনিবেশের নিজেদের কোনও নৌ-শক্তি নাই। ইহাদের কোনো নির্দ্ধারিত সেনাবলও নাই বলিলেই হয়। আত্মরক্ষার জন্য ইহাঁদের আছে কেবল "মিলিশিয়া" বা প্রজা-সেনা। পুলিশ প্রহরী ছাড়া এ সকল উপনিবেশে আর কেহই অনন্যকর্ম্মা হইয়া সমর কৌশল শিক্ষা করিয়া, জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করে না। এ অবস্থায় এ সকল উপনিবেশের পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযুক্ত শক্তি ও ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। ব্রিটেন্‌কেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। আর ইহাই গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলের সর্ব্বপ্রকারের বর্ত্তমান বাধ্য বাধকতার মূল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকল অল্পে অল্পে নিজেদের নৌ-শক্তি ও সৈন্যবল গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছে। যে পরিমাণে তাহাদের এই আত্মরক্ষার শক্তি ও ব্যবস্থা করিয়া ও গড়িয়া উঠিবে, সেই পরিমাণে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলের বর্ত্তমান যোগ-বন্ধনও শিথিল হইবার খুবই আশঙ্কা আছে।

*　　*　　*　　*　　*

উপনিবেশগুলির সঙ্গে যদি বর্ত্তমান বন্ধনটা রক্ষা ও দৃঢ় করিতে হয়, তবে একটা সাম্রাজ্য-ব্যাপী সমবায়-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটা বিরাট যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত না করিতে পারিলে, এ সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা অল্পকাল মধ্যেই একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিবে। আর এটী করিতে গেলেই, এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলিকে কোনও না কোনও আকারে হোমরুল দিয়া, তাহাদের প্রত্যেকটীকেই স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। বর্ত্তমান ইংরেজ মন্ত্রিসমাজ এবং আমাদের বড়লাট ইহাঁরা সকলেই এটী পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়াছেন। তাই একদিকে মন্ত্রী সমাজ আয়ার্ল্যাণ্ডে হোমরুল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, অন্যদিকে লাট হার্ডিঞ্জ ক্রমে ভারতবর্ষেও একটা বিরাট যুক্ত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়া, তাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত রাখিয়া, সেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, ভারতের জাতীয় জীবনের স্বপ্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা, এবং সমগ্র মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণ বিধানের জন্য, তাঁহার এই নূতন শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহা কেবল

আমাদেরই ভালর জন্য করেন নাই; কেবল ইংরাজের বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভালর জন্যও করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সকলেরই কল্যাণ হইয়া, জগতেরও অশেষ কল্যাণ হইবে, এই ভাবিয়াই, এই নীতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লাট হার্ডিঞ্জ সচেষ্ট হইয়াছেন। এই জন্যই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর এই শাসন নীতির সমর্থন করি।

তরুণ রবি।

(পূর্ব্বকাহিনী)

যে কবির কথা আমরা বলিতেছি, সেই রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই দুরন্তর কল্পনা প্রিয়। নিখিলের রহস্য প্রকাশে কৃত-সঙ্কল্প। কবির বয়ঃক্রম অপ্রকাশ্য।

'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো,
কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে এত নজর কেন?'

কবিবরের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের পাক দেখিয়া আমরা বহুকালাবধি মুগ্ধ। কিন্তু কেশের পাক হইতে মনের পাক আরও জটিল। কবিকুলের মানস ক্ষেত্রে বীজ কোথা হইতে বপন হয় তাহার তথ্য দার্শনিকগণ এখনও সবিশেষ বুঝাইতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা transcendental দার্শনিক ফিক্টের মত গ্রহণ করিলে:—

'O, wonderful spirit, now for the first time do I wholly understand the doctrine. Man is not a product of the world of sense. His vocation transcends time and space, and every thing that pertains to sense where his being finds its home, there too his thoughts seek their dwelling place. Those are best known to the childlike devoted simple mind. How thou art and seemest to thy own Being. I shall never know any more than can assume thy nature. After thousands of spirit lives I shall comprehend thee as little as I do now in this earthly house.'

ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যই কবি কল্পনার স্বদেশ ভূমি। সেই অজ্ঞাতদেশে চেষ্টা করিয়া কোন কবি উপনীত হইয়াছেন এমন কথা আমরা কখনও শুনি নাই। কিন্তু সে দেশের কোন 'গোপন নূতন খবর, গুঞ্জনে কূজনে,' কিংবা ছন্দোবন্ধে যদি কোন কবি লইয়া আসেন তবে আমরা নিদাঘ সন্তপ্ত মাথা পাতিয়া বরষার বারিধারার ন্যায় সেগুলি গ্রহণ করিয়া খুসি হই।'

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'childlike, devoted

and simple mind' পূর্ব্ব সাধনার ফল। তরুণ কবির নির্ম্মল মন স্বর্গশিশুর প্রতিকৃতি। "বিশ্বপ্রকৃতি' তার কাছে তাই ছিলনাক' সাবধানে।" কবির বিশ্বাসঘাতকতা ও শিশুর মত। 'অসাবধান বিশ্বপ্রকৃতি'র গুপ্ত রহস্য উদ্ভেদ করিয়া তিনি লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। প্রথম অঙ্কে

> 'হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল
> নরনারী শুন সবে,
> কতকাল ধরে' কি যে রহস্য
> ঘটিছে নিখিল ভবে।
> একথা কে কবে স্বপনে জানিত,
> আকাশের চাঁদ চাহি
> পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে
> সারারাত নিদ্ নাহি '।

কুমুদীর সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত নবমালতীর সম্বন্ধ, কিংবা প্রকৃতির সহিত পুরুষের চিরন্তণ সম্বন্ধ আজিকার নূতন কথা নহে। পূর্ব্বে অনেক কবি গাহিয়া গিয়াছেন। হুগো হইতে টেনিসন পর্য্যন্ত অনেক কবি তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি সাবধান ছিল। অনেকে অনেক ভাবে প্রকৃতির উপাসনা করিয়াছিল, কিন্তু, হিন্দু সন্তান গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে যে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশ দৈবী প্রকৃতিকে মাতৃভাবে লক্ষ্য করে নাই। সেই পুরাতন শৈশব বাণী রবীন্দ্রনাথের গোটাকতক কবিতায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 'প্রকৃতি-গাথায়' রবীন্দ্রনাথের এইটুকু অভিনব। ইহা এদেশেরই গৌরব। কবির প্রশংসা না করিতে চাহেন, ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহার মানস শিশু বড় সুন্দর সৃষ্টি।

মানবাত্মার আদি-শৈশব পুরুষ সুক্তের এবং উপনিষদের কথা। কবি তাহাকে কত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার কাব্য হইতেই গোটা কতক অংশ লইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। ইতিহাসটাকে সত্য না ভাবেন, 'কল্পনা' বলিয়াই ভাবুন। কিন্তু কবি তাহাতে দুঃখিত হইবেন।

> '——সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার !—
> এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
> একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি !
> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ি !'

সংসারের তীরে স্বর্গের কথা শুনিতে সকলে প্রস্তুত নহে। তবে কাঙ্গালী কবির দৈন্যদশা দেখিয়া যদি আপনার পাষাণ হৃদয় টলিয়া উঠে তাহা হইলেই তিনি সার্থক হইবেন।

জীবাত্মা সনাতন পুরুষের অংশ। তাঁহারই জ্যোতিকণা। এই জন্য মানব মর্ত্ত্যের দুঃখের মধ্যেও স্বর্গের আনন্দ, জ্ঞান এবং চেতনা অনুভব করে। ইন্দ্রিয়াতীত 'ভাবের রাজ্য হইতে তাহার রূপের রাজ্যে আসে' এবং পুনরায় সেই দেশে ফিরিয়া যায়। ইহাই মোটামুটি মানবজন্মকথা। কিন্তু বিস্মৃতির কিংবা মায়া এবং অজ্ঞানের অন্ধকার দিয়া নূতন সংসারে অবতীর্ণ হইলেও তাহারা আভ্যন্তরিক বন্ধন হইতে বিচ্যুত হয় না। স্বপ্ন, কল্পনা, এবং ভাবের উন্মেষই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ কি তাহা আমরা বোধ হয় ভাবিয়া দেখি নাই। পুণ্য-বলে, ধর্ম্মবলে, হয় ত স্বর্গের আনন্দ অনুভব করিবার দাবী দাওয়া আমাদিগের থাকিতে পারে। হয় ত পুণ্যবল ক্ষয় হইলে আমরা পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে স্থূল ভাবে বিচরণ করিতে বাধ্য কিন্তু কবি তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার মতে মানবসন্তানের ধর্ম্মজগতে একটা দায়ীত্ব আছে। স্বর্গ হইতে বিদায়ের সময় কবি বলিতেছেন :—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত পাপী তাপী, সে'লি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়,
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা। অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ড গুলি!

অথচ,

'দেবগণ!
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম—যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিলবাহু' (লোকালয় ১৯৩।১৯৪)

তার পর নিদ্রিতা প্রেয়সীর কথা। পূর্ণিমা নিশিতে নিদ্রিতা প্রেয়সীর সোহাগ চুম্বন আমাদের কপালে কোন কালে ঘটিয়াছিল এমন মনে পড়ে না, এবং যদিও ঘটিয়া থাকে তবে তাহাতে সহস্রজন্মের পূর্ব্বের স্বর্গসুখ-কথা স্মরণ পথে আসিয়া ছিল, এহেন জাতি-স্মরতার দর্প আমরা করিতে অক্ষম। কিন্তু জননীমর্ত্ত্যভূমির অশ্রুধারা বিমোচন করার দায়ীত্ব যে আমাদিগের আছে, সে কথা কবির সহিত আমরা প্রাণপণে স্বীকার করি। সে অশ্রুধারা যে কেবল মূর্ত্তমানবের নয়ন বিগলিত তাহাই নহে। পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ এবং সমগ্র বিশ্ব তাহার অংশীদার। এই যে একটা অনাদি চিরন্তন মাতৃবন্ধন তাহা কেবল 'করুণা' এবং 'জ্ঞান' দ্বারা বুঝান যায় না। এবং, সে বন্ধন আত্মমুক্তি কল্পনা করিয়াও ছিন্ন করা যায় না, কারণ সমগ্র বিশ্বকে তাহা বেষ্টন করিয়া আছে।

'বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহপ্রেম আশাতৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হ'তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি',
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন মুক্তিভ্রমে?

আমরা হিন্দু। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, যাগ যজ্ঞ, পূজা এবং অর্চ্চনার মাধ্যে সেই বন্ধন চির-কালই রাখিয়া দিয়াছি। পাশ্চাত্যজগতে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, সেই বিশ্বজনীন বন্ধনের সম্পূর্ণ তথ্য কোন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। মাতৃস্বরূপা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে গূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা হিন্দুসন্তানের স্মৃতিপথে, ক্রিয়াকলাপে, চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়া গিয়াছে। সে ভাব ভোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবার নহে। মুক্তি কিংবা নির্ব্বাণদ্বারা মিটিবার নহে।

এই জন্যই পুনর্জন্ম আমরা মানিয়া থাকি
'অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবীভরি বালিকা বালক ,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

এই অদ্ভুত শৈশব-গাথা 'শিশু' নামক কাব্যখণ্ডে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারই মধ্যে অন্বেষণ করিলে the child is the father of the man, কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই গভীর বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। এই বিশ্বজগত 'শিশুর মহামেলা'। সেই শিশুর জন্মকথায় কবি সমগ্র সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া পূর্ব্বকল্পের শিশুগণ কি করিয়া মর্ত্ত্যে জননীর অঙ্ক পুনর্প্রাপ্ত হইল? ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে জীবের পুনরাবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত চিরন্তণ একটা পথ রহিয়া গিয়াছে যাহা দিয়া মানবসন্তানগণের অহরহ পুনরাবর্ত্তন হইতেছে। সে পথ প্রকৃতিরই ক্রোড়স্থ। যে তন্ত্রানুক্রমে সেই পথ সৃষ্টি হইতেছে, কবির অন্যান্য কাব্যাংশ হইতে তাহার আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রকরণের 'দ্বৈতরহস্য'টা মনে রাখা উচিত। ঈশ্বর আপনিই নিজের মায়াকে স্ত্রীপ্রকৃতিরূপে বিস্তার করিয়া ভাব-রাজ্যের সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রের মতও তাই, দার্শনিক হেগেলের মতও তাই। ইহা তাঁহার আনন্দ লীলা।

'যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যেভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি ক'রে দান
তটিনী ধারারে স্তন্য করাইছে পান,
যেভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুইএর মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণি! ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য আভাসে'!

তাই 'জন্মকথায়' খোকা 'মাকে শুধায় ডেকে' 'এলেম আমি কোথা থেকে?' জননী প্রকৃতি কহিল 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। যদি শিশুর মনে কোন খট্‌কা উপস্থিত হয় তাই কবি পুনরায় বুঝাইতেছেন,

'তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।'

এটা সনাতন ধর্ম্মের কথা। অন্য কোন দেশের কবিতায়, কোন মহাকাব্যে, একথা আমরা পাই নাই। বঙ্গের মা ষষ্ঠীর কুটীরে খোকার দর্শনশাস্ত্র, খোকার জন্মতন্ত্র ও বিজ্ঞান, সামান্য কয়টী কথায় কবি কি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! তাহাতে তাঁহার আর্য্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি হয়ত নিজে কখন সে দর্শন ও বিজ্ঞান স্বীয় কাব্যের মধ্যে প্রযুক্ত করিতে চাহেন নাই, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সহিত কথায় কথায়, ছন্দে ছন্দে তাহা প্রকাশ হইয়াছে। খোকা ইচ্ছা শক্তির স্বরূপ হইয়া, মনের মাঝারে দিয়া, কিরূপে আসিল? উত্তর সে 'চিরকালের আশায়' ছিল, 'মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে ছিল'; শুধু তাই নয়, গৃহদেবীর কোলের মধ্যে অনেক কাল লুকাইয়া ছিল। যৌবনের সঙ্গে মাতার তরুণ অঙ্গে 'সৌরভের মত' মিলাইয়া ছিল।

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী
তুই জগতের স্বপ্ন হতে

এসেছিল্ আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিকশি' !

সদানন্দ, চিরকুমার আত্মার প্রকৃতির ক্রোড়ে আত্মদর্শনের সুন্দর কথা !

সদানন্দ খোকার বিশেষ গোটাকতক লক্ষণ আছে তাহাতে তাহার জন্মরহস্য বুঝা যায়। আমরা, বদ্ধ সংসারী,

না পাই যারে, চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা'

কিন্তু খোকা,

'যা পাও চারিদিকে
তাহাই দীর তুলিছ গড়ি
মনের সুখটিকে'

এইত গেল নির্লিপ্তভাব। কিন্তু খোকা নির্লিপ্ত হইয়া অন্তঃপুরে থাকে কি করিয়া ?

'খোকা থাকে জগৎ সংসারের
অন্তঃপুরে
চরাচরের সকলকর্ম্ম
করে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা !
খোকার তরে গল্প হবে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে উঠে
বিশ্বজগৎ !

কিন্তু আমরা থাকি 'জগৎ পিতার বিদ্যালয়ে'। আমাদিগের নিকট সূর্যাচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে মত চলিতেছে। বিশ্ব নীরব। নাগ কন্যার কথা গল্প মাত্র ! আমাদিগের নিকট বিশ্বগুরু মহাশয় কঠিন হইয়া থাকেন।

বদ্ধজীবের জ্ঞান হইতে বহুদিন লাগে। কিন্তু এই যে মায়ার আগার জগত, মুক্ত খোকা তাহা জন্মিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহে। এই যে নশ্বর পরিবর্ত্তনশালী ক্ষণিক সুখ দুঃখের বিষয়-পুত্তলিকা, খোকার নিকট তাহারা তুচ্ছ। সে যাহা দেখে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

খোকার সাধ যে বড় হইলে সে খেয়াঘাটের মাঝি হইবে।

'আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরোনদী পার'

কবির খেয়াঘাটের দিকে খুব টান। ভবনদী, ও সোনার তরী লইয়া কবি-মাঝি অনেক ছবি আঁকিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব। আপাততঃ তাঁহার কাব্যপটের দুরন্ত খোকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। দর্শনিক Fitcheর কথায়, he transcends all time and space. সরলভাবে ঘরওয়া কথায় কবি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন:—

দাদা হেসে কেন
বল্লে আমায় "খোকা
তোর মতন দেখি নেইক বোকা !
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে
কেমন করে ছুঁই ?"
আমি বলি দাদা তুমি
জাননা কিচ্ছুই !
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জানালার ফাঁকে
তখন তুমি বল্‌বে কি, মা
অনেক দূরে থাকে ?"

খোকা ইহা অপেক্ষাও একটি গুরুতর প্রমাণ দিতেছে। চাঁদ যে নিকটে আসিলে মস্ত বড় দেখাইবে, সেটা কোন কাজের কথা নহে

'মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নীচু
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু' ?

এই যে ন্যায়রত্ন খোকা, তার হৃদয় স্নেহে ভরা। বৃক্ষ, পুষ্প, সকলেই তাহার নিকট পাঠশালার ছাত্র। তাদের পাঠশালা মাটীর নীচে। খেলিতে চাহিলে গুরুমহাশয় তাহাদিগকে দাঁড় করিয়া রাখে। তাদেরও মা আছে। যারা মেঘের মধ্যে থাকে তারাও খোকাকে ডাকে কিন্তু মাতৃবৎসল খোকা তাহাদিগের সহিত যাইতে রাজি নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিলাতী কথা

প্রথম যখন লণ্ডনে পৌছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। সেদিন রবিবার ছিল। ফরাসী দেশের ভিতর দিয়া গিয়া, কে'লে হইতে ডোবারের পথে সমুদ্র পার হইয়া, বিলাতের মাটিতে পা দি। ডোবার হইতেই পরিচিত বন্ধুদিগকে তারে খবর পাঠাই। ভাবিয়াছিলাম তাঁরা কেউ না কেউ ষ্টেশনে আসিবেন। তখন জানিতাম না যে বিলাতে, বিশেষ লণ্ডন সহরে, রবিবারে চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই বিলি হয় না। অন্ততঃ সেকালে এ ব্যবস্থা ছিল না; আজিকালি হইয়াছে। কাজেই ষ্টেশনে কেউ নিতে আসেনি। তবে তাতে বড় আসিয়া যায় না। লণ্ডনে হোটেলের অভাব নাই। যে সে হোটেলেই ওঠা যায়। একটা হোটেলের নাম আমার জানা ছিল। খুব জাঁকালো না হইলেও, হোটেলটী ভদ্রগোছের। সংবাদপত্রের লীলাভূমি ফ্লী ষ্ট্রীটে ইহার অবস্থিতি। নাম বলা মাত্রেই গাড়োয়ান এ হোটেলের পরিচয় পাইয়া আমাকে সেখানে লইয়া গেল।

হোটেলে ঢুকিয়াই তার আফিস। এই আফিসেই অভ্যাগতদিগকে নাম সহি করিয়া পছন্দমত ঘর ভাড়া করিতে হয়। সকল ঘরের ভাড়া সমান নহে। ছোট বড় ও আসবাবের তারতম্য হিসাবে ভাড়াও বেশ কম হয়। দু'তালার ঘরগুলোর ভাড়া সকলের চাইতে বেশী। যত উপরে ওঠা যায়, ততই ভাড়া কম হয়। আমি তেতেলায় একটা ঘর লইলাম। এ সকল হোটেলে ঘরের ভাড়া আলাহিদা ও খাবার খরচ আলাহিদা দিতে হয়। ঘর ভাড়ার ভিতরে আলো বাতি ও চাকর-চাকরাণীর কাজটা ধরা হয়, এর জন্য স্বতন্ত্র কিছু দিতে হয় না। কিন্তু চাকরচাকরাণীও বাড়ীর ভিতরকার কাজই করিবে। বাহিরের কাজে পাঠানো যায় না। সে কাজের প্রয়োজন হইলে অন্য লোক আছে। স্বতন্ত্র পয়সা দিয়া তাদের পাঠাইতে হয়। তাহাদের জন্য যেমন স্বতন্ত্র পয়সা দিতে হয়, স্নানের জন্যও সেইরূপ। স্নানটা সে শীতের দেশে একটা সখেরই মধ্যে গণ্য। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে প্রতিবারে ছয় পেনি ও গরম জলে স্নান করিলে তার দ্বিগুণ—এক শিলিং বা বারো আনা দিতে হয়। তবে স্নানের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রতিদিন নূতন সাবান ও ধোওয়া তোয়ালে মেলে; আর স্নানের টবটা প্রত্যেক বারই নূতন করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া দেয়। আহারটা হোটেলে দিনে একবার করা চাই, নইলে ঘরভাড়া বেশী লাগে। সকালের খাওয়াটা,—ইংরেজেরা ইহাকে ব্রেক্‌ফাষ্ট বলেন,—যাহা কিছু হউক হোটেলের খাবার ঘরেই খাইতে হয়। খাবারের দু'টা ব্যবস্থা আছে। একটা বাঁধা ব্যবস্থা—সে দেশের কথায় ইহাকে (Table d' Hote) বলে। এ কথাটা ইংরেজী নয়, ফরাসী। ইহার অর্থ হোটেলের টেবিলে যে দিন যেরূপ আহার্য্য রাখার ব্যবস্থা হয়, সে হিসাবে খাইতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ থাকে।

ইংরেজীতে এই ভিন্ন ভিন্ন পদকে কোর্স বলে। কোথাও বা হোটেলের টেবিলের খাওয়ায় তিন কোর্সের কোথাও বা পাঁচ, কোথাও বা সাত কোর্সের ব্যবস্থা থাকে। এটা পূরা খাওয়া। Table d' Hote মতে খাইলে একটা বাঁধা দাম দিতে হয়। প্রাতঃকালেও খাওয়ার জন্য মাঝারি রকমের হোটেলে দেড় কি দুই শিলিং—আমাদের টাকার আঠারো আনা কি দেড় টাকা দিতে হয়; ব- বড় হোটেলে আড়াই শিলিং হইতে সাড়ে তিন শিলিংও লাগে। কিন্তু হোটেলে থাকিলেই যে Table d' Hote এর হিসাবে খাইতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। প্রত্যেক পদেরও স্বতন্ত্র দাম ধরা থাকে। খাবার টেবিলে, একখানা কার্ডে জিনিসের নাম ও দাম লেখা থাকে। যার যেমন পয়সা ও যেরূপ রুচি সেই হিসাবে, এই কার্ড দেখিয়া যে পদ ইচ্ছা লইতে পারেন। এ ব্যবস্থাকে A la Carte বলে। কথাটা ফরাসী, অর্থ কার্ডের মাফিক। অনেক লোকেই প্রাতঃকালের খাওয়াটা কার্ড দেখিয়া, সংক্ষেপে চুকাইয়া থাকেন।

আমি হোটেলের আফিসে নাম ধাম লিখিয়া একটা ঘর লইলাম। অপরিচিত লোকে ঘর ভাড়া করিলে, ভাড়ার টাকাটা আগামই দিতে হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে আমার বড় ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য বাক্স্ ছিল বলিয়া, আমাকে আর আগাম টাকা দিতে হয় নাই। সে রাত্রে কেবল এক পেয়ালা চা খাইয়াই শুইয়া পড়িলাম।

আমার প্রত্যুষে জাগা চিরদিনের অভ্যাস। সেই অভ্যাস মত ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোক মেলিয়া দেখিলাম জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে দিব্যি আলো ঢুকিয়াছে। বাহিরে, রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার চলাচলের গোলও উঠিয়াছে। ভাবিলাম এখন ওঠা ভাল। কিন্তু ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধোওয়া তো চলে না, আর বিনা আগুনে ঘরে বসাও যায় না, তাই চাকরাণীর জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। একবার, দু'বার, তিন বার বারম্বার দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা? কেউ যে সাড়া দেয় না। শেষে হতাশ হইয়া আবার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। এদিকে ঘর আলোতে ভরিয়া উঠিল। বাহিরেও গাড়ীঘোড়ার গোলমাল বাড়িতে লাগিল। তথাপি চাকর-বাকর কারো উচ্চ-বাচ্য নাই। মনে মনে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। একবার ভাবিলাম কালো বলিয়া কি এরা তুচ্ছ করিতেছে? এত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি তবুও কেউ একজন এলো না। তখন মনে বড় রাগ হইল। তাই খুব জোরে ঘণ্টার দড়ি নাড়িতে আরম্ভ করিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আবার ঘণ্টা বাজাইলাম। তখন একজন আসিয়া দরজায় ঘা দিল। আমি ক্রোধভরে বলিলাম—"এতক্ষণ ধরিয়া আমি ঘণ্টা বাজাইতেছি, এক জনও তার উত্তর দিল না, এর মানে কি?" সে ব্যক্তি বলিল—"হোটেলের চাকরচাকরাণীরা আটটার আগে উঠে না; কাজেই কেউ সাড়া দেয় নাই। এখন সবে সাতটা বাজিয়াছে।" কাজেই আমাকে তৃতীয় বার

কম্বলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, চাকর-চাকরাণীদের শয্যাত্যাগের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিতে হইল। সে দিন হইতে বুঝিলাম—প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবে—শৈশবের এই শিক্ষা আধুনিক সভ্যতায় আর পালন করা চলে না। সভ্যতার জুলুমে গরিবের শৈশবের এ অভ্যাসটা কাজেই পরিত্যাগ করিতে হইল।

সেই প্রথম ক'দিন যা হোটেলে কাটাইয়াছিলাম, তার পর লণ্ডন সহরে আর কখনো বেশিদিন হোটেলে কাটাই নাই। হোটেলে সুবিধা অনেক আছে বটে, কিন্তু খরচ বড় বেশী। ভালো হোটেলে সপ্তাহে ৩০।৩৫ টাকার কমে একটা শোবার ঘর মেলে না। বোর্ডিং-হাউসে এই ৩০।৩৫ টাকায় সপ্তাহের যাবতীয় খরচ কুলাইয়া যায়। ছোট ছোট বোর্ডিং-হাউসে ২০।২২ টাকায়ও থাওয়া থাকা বেশ চলে। কিন্তু আমি কখনো বোর্ডিং হাউসে থাকি নাই। বোর্ডিং-হাউসে কোনো কোনো দিক্ দিয়া হোটেলের চাইতে বেশী বাঁধাবাঁধি আছে। আহারের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সে সময়ে উপস্থিত না হইলে, আর খাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু না খাওয়ার দরুণ সাপ্তাহিক বিলের টাকা কমে না। তার পর বোর্ডিং-হাউসে নানা লোক বাস করে, তাদের সকলের সঙ্গে একত্রে থাইতে বসিতে হয়। এ সকল লোকের পূর্ব্ব-পরিচয় কিছুই জানা থাকে না। তার জন্যও বোর্ডিং-হাউসে থাকিতে কখনো প্রবৃত্তি হয় না। তৃতীয় কথা এই যে বোর্ডিং-হাউসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা প্রায়ই অতি জঘন্য। খুব বড় বড় বোর্ডিং-হাউসে অবশ্য ভাল বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু সে সকলের দাম প্রায় হোটেলেরই মত। অত টাকা দিয়া সে সকল উঁচুদরের বোর্ডিং-হাউসে সকলের থাকা পোষায় না, আর যাঁরা সে টাকা খরচ করিতে পারেন, তাঁদের পক্ষে হোটেলে থাকাই শ্রেয়স্কর। বোর্ডিং-হাউসের খাওয়ার পরিচয়েই আমার পিত্ত উড়িয়া যাইত। বিলাতে সর্ব্বত্রই প্রধান খাদ্য মাংস। আমাদের যেমন ভাত, পাঞ্জাবী-পুরবীয়াদের যেমন রুটী, ইংরেজের তেমনি গোস্ত। আলু, কপি, শাকসবজী এ সকল উপকরণ মাত্র। আর সেখানে গোমাংসই বেশী চলে। বোর্ডিং-হাউস মাত্রেই গরু-রোষ্টের নিত্য ব্যবস্থা আর সকল রান্নাতেই লার্ড বা শূকরবসা ব্যবহৃত হয়। ঘি-জিনিসটা বিলাতে পাওয়া যায় না। মাখম মেলে, কিন্তু মাখমের রান্না অতি বিরল। কোনো কোনো মাছ-রান্নায় মাখম ব্যবহৃত হয়, নতুবা লার্ড প্রশস্ত। আর গরু ও শূকর দু'এর কোনোটাতেই কখন রুচি হয় নাই। যথাসাধ্য সর্ব্বদাই বিলাতপ্রবাসকালে এ দুই বস্তু বর্জ্জন করিয়া চলিতাম। কাজেই এই কারণেও কখনো বোর্ডিং-হাউসে থাকি নাই।

হোটেল এবং বোর্ডিং-হাউস ছাড়া, বিলাতে থাকবার আর একটা ব্যবস্থা আছে তাকে অ্যাপার্টমেণ্ট (Appartment) বলে। অনেক জায়গায় সাজশয্যাসমেত ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে পারা যায়। এই সাজানো ঘরগুলোকে অ্যাপার্টমেণ্ট বলে। এক জন বাড়ীওয়ালী বড় একটা বাড়ী লইয়া, তাহাকে নানা প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়া

সাজাইয়া রাখে, এবং একটী দুটী ঘর ভাড়া দিয়া তাহা হইতেই আপনার জীবিকা তুলিয়া লয়। ঘরভাড়ার ভিতরে এ সকল স্থলে আলো, বাতি ও চাকরচাকরাণীর খরচও ধরিয়া লওয়া হয়। আহারের ব্যবস্থা ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে বাড়ীওয়ালীর নিকটেও করা যায়, আর বাহিরে যে সকল খাবার স্থান বা Restaurant আছে, সেখানেও করিতে পারা যায়। বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করিলে, রান্না-বান্না সবই বাড়ীওয়ালী করিয়া দেয়। কেবল জিনিষপত্রের দাম তাহাকে ধরিয়া দিতে হয়। কখনো কখনো হুকুমমত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, ও তার জন্য স্বতন্ত্র দাম লইয়া থাকে।

আমার একটী বন্ধু লণ্ডনে প্রথমে আমাকে অ্যাপার্টমেণ্ট ঠিক করিয়া দেন। আমি নূতন লোক, সবে বিলাতে পৌছিয়াছি, তিনি তিন বৎসরকাল সে দেশে কাটাইয়াছেন, সুতরাং আমি সম্পূর্ণরূপেই এ বিষয়ে তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। বন্ধুটী স্বভাবতঃই অতি ধীর, শান্ত ও নির্ম্মল প্রকৃতির লোক! এ রকম সংযমী পুরুষ বিলাতে অতি কমই যান। কেবল সংযমী নন, কেহ কেহ তাঁহাকে একটু অতিমাত্রায় সুরুচিগ্রস্ত বা পিউরিট্যান বলিয়াও মনে করিতে পারেন। প্রথমে আমরা একটা বাড়ীর জানালায় অ্যাপার্টমেণ্ট খালি আছে এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া, তথায় ঢুকিলাম। যে চাকরাণী দরজা খুলিয়া দিল, তার রূপযৌবনের ছটা ও চাল্‌চলনের ঘটা দেখিয়া আমরা উভয়েই একটু সঙ্কুচিত হইলাম। বন্ধুটী বাংলাতে আমায় বলিলেন—"বাড়ীটা সুবিধামত মনে হয় না।" যা হউক যখন দরজা খুলাইয়া ঢুকিয়াছি, তখন একবার ঘরটা না দেখিয়া ফিরিয়া আসা ভাল নয় বলিয়া, দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু আমাদের নিবার ইচ্ছা থাকিলেও, ভাড়া শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এক খানা মাঝারি রকমের শোবার ঘর, তারই ভাড়া সপ্তাহে এক পাউণ্ড বা পোনর টাকা। বন্ধুটী বাহিরে আসিয়া বলিলেন এ সকল বাড়ীতে এরূপ ভাড়াই চায় বটে। আমি বুঝিলাম বিলাতে কেবল ঘরের গুণে ভাড়া হয় না, বাড়ীর চাকরচাকরাণীর শোভাসৌষ্ঠবেও ঘরের ভাড়া চড়িয়া যায়। এ কথাটা যে কত সত্য, পরে তার অনেক প্রমাণ পরিচয় পাইয়াছি। এই হ'তে বাড়ী খুঁজিতে যাইয়া, ঘরদোর দেখিবার আগেই চাকরাণীদের একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইতাম। যে স্থলে চাকরাণীদের রূপের চটক্ বা প্রসাধনের কলাকৌশল একেবারে চখের উপরে আসিয়া পড়িত, সেখানে আর ঢুকিতাম না।

অনেকগুলি ঘরই দেখিলাম; কিন্তু পছন্দমত একটীও পাইলাম না। কোথাও বা চাকরাণীর চাউনী দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম, কোথাও বা ঘরের ব্যবস্থা দেখিয়া বিমুখ হইলাম। আর যে যে স্থলে ঘর ও বাড়ীওয়ালী দুই আপত্তিশূন্য মনে হইল, সেখানেও স্নানের ব্যবস্থা নাই শুনিয়া, বাড়ী ঠিক করা সম্ভব হইল না। আগেই বলিয়াছি, স্নানটা ইংরেজসমাজে একটা সখের মধ্যে গণ্য। সুতরাং সেকালে

সকল বাড়ীতে স্নানের কোনোই বন্দোবস্ত ছিল না। যাঁদের স্নান করার একান্ত ইচ্ছা হয়, তাঁরা নিজেদের ঘরে একটা ছোট্ট টবে, খানিকটা গরম জল ও ঠাণ্ডা জল লইয়া, একরূপ "কাকস্নান" করিয়া সে সাধ মিটাইতে পারেন। বাঙ্গালীর ছেলে, আজন্মকাল নিত্যস্নান করা অভ্যাস। আমার এরূপ কাকস্নানে চলিবে কেন? কাজেই স্নানের বন্দোবস্ত যেখানে নাই, এমন বাড়ীতে ঘরভাড়া করা অসম্ভব হইল। অনেক কষ্টে, শেষ, একটা বাড়ী পাওয়া গেল। এখানে বাড়ীওয়ালী বর্ষীয়সী। চাকরাণীটী যুবতী হইলেও একান্তই কুৎসিৎ এবং সর্ব্বপ্রকারের প্রসাধন-পটুতাশূন্য। ঘরগুলোর আসবাব্ খুব দামী ও সৌখিনতাসাধক না হইলেও, চলনসহি রকমের। আর সর্ব্বোপরি এই পুরাতন বাড়ীতেও, কি ভাগ্যগুণে জানি না, একটা সুন্দর, পরিষ্কার স্নানাগার ছিল। আর কথা নাই। এত গুণের সমাবেশ অতি বিরল ভাবিয়া, একেবারেই এই বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া করিয়া ফেলিলাম।

থাকবার স্থান তো হইল, স্নানেরও ব্যবস্থা হইল। এখন আহারের বন্দোবস্ত কি করা যায়। বাড়ীওয়ালী নিজে প্রায়ই দেখা দিতেন না। চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে একখানা বড় কার্ড আনিয়া দিল। তাতে এরূপ ভাবে খাবার দর লেখা ছিল :—

১। প্রাতরাশ বা ব্রেক্‌ফাষ্ট ১ শিলিং।
২। মধ্যাহ্নাহার বা লঞ্চ্ ১।০ শিলিং।
৩। বিকালের চা ৬"পেনি।
৪। রাত্রের আহার বা ডিনার ২ শিলিং।

তখন লণ্ডনে আমি একেবারে নূতন। কোনে কিছুই জানি না। আর কোন ইংরেজ যে কাউকে কখনো ঠকায় বা ঠকাইতে পারে, এ জ্ঞানও জন্মায় নাই। কাজেই বিনা ওজরে, এই দর মানিয়া লইয়া, বাড়ীতেই আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। প্রথম সপ্তাহটা মন্দ চলে নাই। জিনিষগুলো যেন টাট্‌কাই পাইতাম, আর রান্নাবান্নাও মন্দ হইত না। কিন্তু লণ্ডনের বাড়ীওয়ালী একরূপ সেবিকা হইলেও, এদেশের প্রাচীন কথা—সেবকান্নে পুরাতনে—পুরাণ হইলে চাকর আর চাউল দুই ভাল হয়, এটী লণ্ডনে খাটে না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই খাওয়া খারাপ ও তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের শমতা নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। প্রাতরাশে—আধসিদ্ধ ডিম, খান দুই রুটী-টোষ্ট, এবং এক পেয়ালা ককো বা চা'এর ব্যবস্থা আমার ছিল। এরই জন্য আমাকে বারো আনা করিয়া দিতে হইত। ক্রমে দেখিলাম—ডিম কেবলই পচিয়া যায়, টোষ্ট পুড়িয়া উঠে, মাখন মার্জ্জেরীন্ হইয়া বসে, এবং চা ও ককো দুধ চিনির সঙ্গে মিলিয়াও কিছুতেই কবিরাজী পাঁচন হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। দু'এক দিন তো চ'খ বুজিয়া এ অখাদ্যই গলাধঃকরণ করা গেল। ভাবিলাম হাতের পাঁচ আঙ্গুল যখন কোথাও সমান হয় না, তখন প্রতিদিনই যে টাট্‌কা ডিম, সুপক্ক টোষ্ট, সুস্বাদু চা পাইব, এ তো বড় সম্ভব নয়। সর্ব্বত্রই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এখানেও তাই হচ্ছে। কিন্তু যখন

দেখিলাম—কনিষ্ঠাই পাঁচ আঙুলের সকল-গুলিকে আপনার সমান করিয়া অঙ্গুলীসমাজে অলৌকিক সাম্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে; আর যাহাকে নৈমিত্তিক ব্যতিক্রম ভাবিয়াছিলাম, তাহাই নিত্য নিয়মের আসন একান্তভাবেই অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তখন ধৈর্য্য রাখা মুস্কিল হইয়া উঠিল। কিন্তু ধৈর্য্য ভাঙ্গলে কি হবে? সভ্যতার বাঁধ তো আর ভাঙ্গা যায় না! এদেশে চাকর-চাকরাণী অপরাধ করিলে, দুটো গালিগালাজ দিয়া ভিতরকার বিরক্তির ষ্টিম্‌টা ছাড়িয়া দিয়া, কতকটা ঠাণ্ডা হওয়া যায়। সাহেব-মেমেদের তো গালগালাজ করা চলে না। চাকরাণী গুরুতর অন্যায় করেছে। চাই গরম চা, একেবারে ঠাণ্ডা চা আনিয়া হাজির করিয়াছে—তবুও ধন্যবাদ দিয়া লইতে হইবে। পরে "Please get a fresh pot" অনুগ্রহ করিয়া নূতন ক'রে তৈয়ার করিয়া আর এক পট চা আনিবে কি? এই বলিয়া প্রথমকার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু গালাগালি দেওয়া, এমন কি চেচাঁইয়া হুকুম করাও সে দেশে চলে না। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া, একজন চাকরাণীকে একটু গরম স্বরে বলেছিলাম "You must do it, you forget that you are paid for it—" "তোমাকে এ কাজটা কর্ত্তেই হবে; তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এ কাজের জন্যই তুমি মাহিয়ানা পাইতেছ।"—আর সে এমন কান্না জুড়িয়া দিল যে আমি চো'কে কাণে পথ দেখিতে পাই নাই। সে দুর্জ্জয় মান কি করিয়া ভাঙ্গে বহুক্ষণ আমায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া তার উপায় ধ্যান করিতে হইয়াছিল। এই যখন দেশের রীতি, সভ্যতার ইহাই যখন দস্তুর, তখন কিল্ খাইয়া কিল চুরি করা ভিন্ন তো আর উপায়ান্তর নাই। অবশ্য এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু যাই বা কোথায়? বাড়ীর ভাব তো দেখা গিয়াছে। আর অন্যত্র যে এই দশাই ক্রমে ঘটিবে না, তারই বা কথা কি? এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষটা বাড়ীতে আহার পরিত্যাগ করিলাম।

ক্রমে দেখিলাম বিলাত যাইয়া যারা শুদ্ধ ঘর ভাড়া করিয়া Appartmentএ থাকেন, তাঁদের পক্ষে বাহিরে আহারের ব্যবস্থা করাই সব চাইতে ভাল। আর এর জন্য ব্যবস্থাও কিছুই করিতে হয় না। বিলাতে সকল স্থানেই বিস্তর Restaurant বা খাবার-স্থান আছে। উত্তম, মধ্যম, অধম, সকল রকমের খাদ্যই পাওয়া যায়। যার যেমন পয়সা ও যেমন অভিরুচি সেইরূপ আহার্য্যই এ সকল Restaurantতে পাইতে পারেন। আর সামান্য জলযোগের সুন্দর পরিপাটী ব্যবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। এরেটেড্ ব্রেড্ কোম্পানী বলে একটা কোম্পানী আছে, সাটে ইহার নাম এ, বি, সি (A. B. C.)। এই A. B. C. দোকান অলিতে গলিতে সর্ব্বত্র আছে। আজি কালি এদের দেখাদেখি আরো অনেক কোম্পানী হইয়াছে, যাঁরা সস্তায় খাবার বিক্রী করেন। এ, বি, সি দোকানে দুই পেনিতে একটা আধসিদ্ধ বড় টাট্‌কা ডিম, দুই পেনিতে এক খানা খুব বড় মাখন-টোষ্ট (Buttered toast) এবং আর দুই পেনিতে

টাট্‌কা এক পেয়ালা চা বা ককো পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল দোকানে ছয় পেনিতে বা ছয় আনায় অতি সুন্দর, তৃপ্তিকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাতরাহার মিলে। এ অবস্থায় পচা ডিম, পোড়া টোষ্ট, তিতো চা'য়ের জন্য বাড়ীওয়ালীকে এক শিলিং বা বারো আনা দেওয়া একান্তই বোকামী নয় কি? আর কেবল তাই নয়, তার উপরে আপনার স্বভাবটী প্রতিদিন গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রোধ-পোষণে বিকৃত হইয়া যায়। আমি ক্রমে প্রাতরাহারের জন্য এ, বি, সির শরণাগত হইলাম। ইহাতে ভাল খাওয়া, মুক্ত হাওয়ায় একটু বেড়ানো ও মনের সন্তোষ সকলই মিলিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের আহারও এইরূপ বাহিরেই করিতে লাগিলাম। লণ্ডনে নিরামিষেরও বেশ ব্যবস্থা আছে। সে কালে তিন চারিটা খুব ভাল নিরামিষ-আহারের স্থান বা Vegetarian Restaurant ছিল। এখানে মুসুর বা মটর ডালের সূপ, কপি সিদ্ধ, বড়বটীর কোপ্তা, আলু ভাজা, সাগুদানার পায়স,—এরূপ তিন চারিটা পদের লঞ্চ্‌ বা মধ্যাহ্নাহার ছয় আনায় পাওয়া যায়, এটা table d' Hote lunch. তা ছাড়া A la Carte lunchও আছে। ইচ্ছামত বাছিয়া গুছিয়া খাইলে এক শিলিংএ অতি সুন্দর ও পরিতৃপ্ত আহার হয়। বাড়ী-ওয়ালীকে তার অখাদ্য লঞ্চের জন্য দেড় শিলিং দিতে হয়। যাঁরা একান্ত নিরামিষাশী নন, তাঁরা দশ আনা বার আনায় মাছ বা মাংসও খাইতে পারেন। আগে কারি-ভাত বেশি পাওয়া যাইত না। এখন দশ আনায় অতি সুন্দর কারি-ভাত পাওয়া যায়। রাত্রের আহারেরও ব্যবস্থা বাহিরে করিলে, খাওয়াও ভাল হয়, পয়সাও কম লাগে। যাঁরা সস্তায় বিলাতে থাকিতে চান, অথচ ভাল খাওয়ার দাওয়া হয় ইচ্ছা রাখেন, তাঁদের পক্ষে Appartmentএ থাকিয়া বাহিরে আহারের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। অন্ততঃ আমি তাই করিয়াছিলাম।

বিলাত-ফেরত।

জেগে কাঁদা

তারি নব অনুরাগ প্রভাতে মিশিয়া,
ঊষায় তুলিয়াছিল, মধুর করিয়া,
দিয়াছিল পক্ষীকণ্ঠে, সঙ্গীত নবীন
হৃদয়ে ফুটায়েছিল কণক নলিন,
স্বপ্ন এনেছিল বহি সোণার কল্পনা,
কেবল সংসারে ছিল, প্রেম-আলোচনা
যৌবন উঠিয়াছিল, উল্লাসে ফুলিয়া
নব ছন্দে, নব গীত, আলাপ করিয়া।

স্বপ্ন-রাজ্য হ'তে রত্ন, আনিতে আহার
ভাসাইয়া দিয়াছিনু প্রণয়ের তরী;
চলেছিনু গান গেয়ে বাজাইয়া বাঁশী,
বহুবিধ রতনের হইয়া প্রয়াসী;
তুলেছিনু পদ্মকলি, পদ্মের মৃণাল
পিয়েছিনু পদ্মমধু, সকাল, বিকাল;
বাঁশরী ধৈবতরাগ, উগারি উগারি
তুলিত হৃদয়মাঝে, কুহক লহরী,

নিদ্রা, জাগরণে যেন করিত মেইন
নয়নে স্বজিত তার মধুর স্বপন ;
জাগরণে ছিল নিদ্রা নিদ্রায় মদির,
সুখের প্রাচুর্য্যে দোঁহে হ'তাম অধীর,
তর তর, থর থর, বেতসী কম্পনে,
কাঁপিয়া উঠিত হিয়া, সতত সঘনে,
স্পর্শে স্পর্শে বিনিময়, ঈক্ষণে ঈক্ষণ
হর্ষে হর্ষে, বিকিকিনি, মধুর কেমন !
দিবসে আনন্দভরা, নিশায় মাধুরী
বসন্তের পিকের তান, বর্ষায় দাদুরী
অধর আনিত বহি অধরের হাসি
সুখের বিলাসে সুখ হইত উদাসী।
নয়নে আছিল ভরা শীতল বিজরী,
মধুর মাধুরী ছিল সর্ব্ব-অঙ্গ ভরি,
দখিন পবন ভরে, নাচিয়া নাচিয়া
যেতেছিল তরীখানি সুধীরে ভাসিয়া
পুলকের আলোকের, মাঝারে সহসা
ঘনাইয়া মান-মেঘ ঢাকিল ভরসা,
বাত্যা এলো অন্ধকারে ছাইল আকাশ
দোঁহাচিত্তে 'আমিত্বের' হইল বিকাশ
কোথা হ'তে ব্যবধান বিতস্তি প্রমাণ,
আনিল মালিন্যরাশি অমার সমান,
প্রেমেরে দলিত ক'রে দাঁড়াল গৌরব,
সৃজিল সম্মুখে এক ভীষণ রৌরব,
উঠিল গর্ব্বের ঝড় ডুবাইল তরী,
স্বপন গিয়াছে ঘুচি, জেগে কেঁদে মরি।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী

আকাঙ্ক্ষা

১

মরম-বেদনা মরমে লুকায়ে
রাখিয়াছি সাবধানে,
কি যে ব্যাকুলতা, কেহ তাহা নাহি জানে !
বীণা খানি লয়ে বসিয়া বিরলে
চাহি—নব নব তানে
আমার গোপন মরম কথাটি
বিকাশি' তুলিতে গানে ;
সে গান কখন পশিবে না তার কাণে !

২

যে গান নীরবে ধ্বনিয়া উঠিছে
আমার মরমতলে
পারিতাম যদি শিখাতে বিহগ দলে !
প্রতি নিশাশেষে ঊষা আসি হাসি'
যখন দাঁড়ায় ভবে,
স্বপনের ঘোর ত্যজিয়া নয়ন
মেলিয়া সে চাহে যবে,—
শুনিত সে গান শত বিহঙ্গরবে।

৩

কল্লোল তুলি' ক্ষুদ্র তটিনী
সুদূরে বহিয়া যায়,
গানটি আমার যদি সে শিখিত, হায় !
উপবনে আসি' বসি' নদীকূলে
যবে দিবা-অবসানে
স্বপনে মগন থাকে সে চাহিয়া
সন্ধ্যাগগন পানে,
বুঝিত সে—নদী কি যে গায় কলতানে।

৪

আমার এ গান পারিতাম যদি
শিখাইতে সযতনে
মন্দ মধুর বসন্ত সমীরণে!
সে যখন গৃহে থাকে আনমনে
খুলি দিয়া বাতায়ন,
গন্ধ বহিয়া আনি' সে পবন
জাগাইয়া ফুলবন,—
বেদনা আমার করিত সে নিবেদন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সুরমোপত্যকা সাহিত্য-সম্মিলন

প্রথম অধিবেশন

করিমগঞ্জ

১৩১৯ বঙ্গাব্দ

সভাপতির অভিভাষণ

ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। যাঁহার প্রেরণায় বাণীর সুরমোপত্যকাবাসী ভক্ত এবং অনুরক্ত সেবকগণ ভগবতী ভারতীর পূজার জন্য আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন, আসুন, সকলে ভক্তিপূর্ণ একাগ্রচিত্তে এবং আশা ও উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে সেই বিশ্বজননীর চরণে প্রণাম করি।

অভ্যর্থনা-সমিতির মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ, সমবেত ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ এবং স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ, আজ আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ এবং তাহার ফল অতি দূরব্যাপী। আপনারা আজ যে মাতৃযজ্ঞের মহানুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার আরম্ভ এবং ক্রমোন্নতি আছে, কিন্তু শেষ নাই। জাতীয় সাহিত্যের স্থিতি, পুষ্টি এবং উন্নতি-সাধনই আপনাদিগের উদ্দেশ্য, এবং এই সমস্তই জাতীয় স্থিতির সমকালব্যাপী। কিন্তু পুষ্টি এবং উন্নতি যতই দূরব্যাপী হউক, আরম্ভকে ছাড়িয়া দিলে কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। যে বিদ্যার আরম্ভ ককারাদি বর্ণজ্ঞানে এবং পরিণতি বেদ ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রসজ্ঞে, ককারাদি বর্ণ ছাড়িয়া দিলে তাহার অস্তিত্বই থাকে না। যে যত বড় এবং যত উন্নতই হউক, আরম্ভ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। আবার আরম্ভে যে প্রণালী, যে আদর্শ, যে প্রকৃতি অবলম্বিত হইবে, পরিণতিতেও সেই প্রণালী, সেই আদর্শ, সেই প্রকৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পরিণতি লাভ করিবে। উন্নতির অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া যদি প্রণালী বা আদর্শ কিম্বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া যায়, তবে সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইবে, আরম্ভের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব থাকিবে না, পরিণতি ত দূরের কথা। একখানি নৌকা বা একখানি গৃহ এক প্রণালীতে এবং এক আকারে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ সমাপ্ত না হইতেই যদি তাহার প্রণালী বা আকারের পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া যায়, তবে তাহার কিরূপ দুরবস্থা হইতে পারে, একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। বালকের বর্ণজ্ঞান-লাভের সময়ে যদি তাহার উচ্চারণের বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা না যায়, তাহা হইলে তাহার সে দোষের আর এ জন্মে সংশোধন হয় না, ইহা আপনারা সকলেই জানেন। এই জন্য আরম্ভটি যাহাতে বিচক্ষণ কারিকরের হাতে নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, সে বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

আপনাদিগের অদ্যকার এই জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, জাতীয় সাহিত্য-গঠনের আরম্ভে একজন স্থিরবুদ্ধি, ধীরস্বভাব, গম্ভীর চিন্তাশীল এবং লব্ধ-সিদ্ধি সাহিত্য-সাধককে সভাপতির আসনে বসাইতে পারিলে ভাল হইত। কেবল বৃদ্ধ হইলেই কেহ এ আসনের যোগ্য হয় না। আমি জানি, জ্ঞানে, গাম্ভীর্য্যে, উৎসাহে এবং বাগ্মিতায় আমা অপেক্ষা যোগ্যতর অনেক মহাত্মাই শ্রীহট্টে বর্ত্তমান আছেন। এই আসনে তাঁহাদের কাহাকেও অদ্য বসিবার সুযোগ দিলে তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ পরামর্শ শুনিয়া এই আরম্ভের শুভ সূচনা এমন ভাবে করিতে পারিতেন, যাহাতে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্য কালক্রমে সুসম্পন্ন হইতে পারিত, প্রণালী বা আদর্শের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কখনও সন্দেহ মাত্র উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যাহা হউক যখন এই অযোগ্যকেই আপনারা যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তখন ইহাকেই পুরোবর্ত্তী করিয়া আপনাদের আরব্ধ মাতৃযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে।

সম্রাট এবং সম্রাট-প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ

আমাদের মহামান্য সম্রাট্ রাজ্যলাভ করিয়াই এবার ভারতে পদার্পণ করিয়া প্রজা-বাৎসল্যের নূতন নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অন্যান্য বর-বাক্যের সঙ্গে বঙ্গভাষাভাষী প্রজাদিগকে এক শাসকের অধীন করিয়া রাখিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার ভারতে আগমন এবং আমাদিগকে এই স্বভাবদত্ত অত্যুচ্চ অধিকার প্রদানের জন্য আমরা সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার দয়াবতী সহধর্ম্মিণীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং তাঁহাদের স্বাস্থ্যযুক্ত শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবনের জন্য এবং ভারতের প্রতি তাঁহাদের সদ্ভাবের স্থায়িত্বের জন্য জগজ্জননীর নিকট একান্তচিত্তে প্রার্থনা করি। তাঁহার যে মহানুভব ভারত-রাজপ্রতিনিধি এবং ভারত-সচিবের সুমন্ত্রণায় এই অভাবনীয় অনুগ্রহে সম্রাট্ ভারতকে কৃতার্থ ও পরিতর্পিত করিয়াছেন, সেই মহানুভব ভারতবন্ধুদিগকেও আমাদিগের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করি।

প্রান্তবাসী বাঙ্গালী

আমাদের সম্মিলনের উদ্দেশ্য সাহিত্যের চর্চ্চা; রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সভার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রজার ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সম্মিলন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শান্তি এবং উন্নতি, এ সমস্তই রাজার আশ্রিত। রাজদৃষ্টি এবং রাজানুগ্রহ ব্যতীত এ সকলের কিছুই নিরাপদে তিষ্ঠিতে বা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজন হইলে ভাষা এবং সাহিত্য-চর্চ্চার সম্মিলনকেও রাজানুগ্রহের জন্য ভিক্ষার্থী হইতে হয়।

বিগত ১৯শে চৈত্র (১লা এপ্রিল) হইতে প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর বড়ই দুঃখের দিন উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য যখন উপস্থিত হয় তখন সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্যেই পরিণত হয়—"মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে"। যে ব্যবস্থা ভারতের জনসাধারণকে আনন্দিত করিয়াছে, যে ব্যবস্থা ১৯শে চৈত্রে সম্মিলিত বঙ্গের ঘরে ঘরে হাস্যময়ী দীপমালা প্রজ্জলিত করিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে সম্রাটের জয়ধ্বনি বিঘোষিত করিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ব্যবস্থাই সেই

আনন্দের দিনে প্রান্তবাসী সপ্ততিলক্ষ রাজভক্ত বাঙ্গালী প্রজার গৃহকে অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া তাহাদের নয়ন হইতে শোকাশ্রু-ধারা প্রবাহিত করাইয়াছে। আজিও সেই অন্ধকার এবং সেই অশ্রুপাত চলিতেছে, জানি না কবে তাহার নিবৃত্তি হইবে, মহানুভব বড়লাট কবে ৭০ লক্ষ বাঙ্গালীর গৃহের এবং হৃদয়ের সেই গাঢ় অন্ধকার ঘুচাইবেন, সেই বক্ষঃপ্লাবী অশ্রু মুছাইবেন! অন্যান্য প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর এ সম্বন্ধে কাহার কি বলিবার আছে, কাহার প্রাণে কিরূপ তীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ হইয়াছে ঠিক জানি না; কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রে যুগান্তর-প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণির জন্ম-স্থান, পতিত-পাবন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি, ভগবৎকৃপায় জ্বলন্ত বিশ্বাস-প্রদীপ্ত মহাপুরুষ অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্য-লীলা-নিকেতন শ্রীহট্ট, আজ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, ঐ সকল ভারত-বিশ্রুতকীর্ত্তি বাঙ্গালী মহাপুরুষদিগের স্বজাতীয় এবং স্বদেশীয়েরা আজ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত! ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে যে রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা প্রজাসাধারণের অবগতির জন্য বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ হইত, যে হেড়ম্ব-রাজ্যের বঙ্গভাষায় লিখিত দণ্ডবিধি বর্ত্তমান থাকিয়া আজও বঙ্গভাষার প্রাচীনতা এবং প্রভাব প্রচার করিতেছে, আজ কি না সেই হেড়ম্ব-রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষী প্রজাবর্গ মহিমান্বিত ব্রিটিশ জাতির অধিকারে আসিয়া বাঙ্গালী জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে! দগ্ধ-হৃদয় ব্যতীত এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান কোথায়? এ দুঃখের কথা মহামান্য সম্রাট্ এবং তাঁহার উদারচেতা প্রতিনিধি ব্যতীত আর কাহার নিকট নিবেদন করিব?

কেহ কেহ বলিতেছেন, আর কাঁদিয়া ফল কি? প্রান্তবাসী বাঙ্গালার অদৃষ্টে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর বৃথা আক্ষেপ এবং বৃথা আন্দোলনে কেবল মানসিক কষ্টেরই বৃদ্ধি। "যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথা সেই খানে" এই মর্ম্মন্তুদ ব্যবস্থা যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহারাই এই ক্রন্দন এবং এই আক্ষেপের অর্থ বুঝে, অন্যে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার কি বুঝিবে? কিন্তু আমাদের ক্ষীণকণ্ঠের ক্ষীণস্বর উত্থিত হইয়া আবার বাতাসেই লীন হইয়া যাইতেছে; যাঁহাদের কর্ণে পঁহুছিলে এ দুঃখের প্রতীকার হইতে পারিত, তাঁহাদের কর্ণে আমাদের এ ক্রন্দন তেমন ভাবে পঁহুছিতে পারিতেছে না। প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর এই ক্রন্দন রাজকর্ণে পঁহুছিবার অন্তরায় অনেক। এই ৭০ লক্ষ অধিবাসীর বসতি একস্থানে নহে, তাহাদের বাসস্থান একটি সঙ্কীর্ণ রেখায় ন্যায় দূর-বিস্তীর্ণ বঙ্গের প্রায় তিন দিক্ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাহার এক প্রান্তের ক্রন্দনরোল অন্যপ্রান্তে পঁহুছে না—আপনারা অদ্য এখানে যাহা বলিতেছেন এবং যাহা করিতেছেন, সাঁওতাল পরগণা বা মানভূম সিংহভূম প্রভৃতি স্থানের বাঙ্গালীরা কখনও তাহার সংবাদ পাইবেন কি না সন্দেহ। তাহার পরে এই সকল প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে একমাত্র শ্রীহট্ট ছাড়া আর এমন একটি স্থান নাই যাহা শিক্ষা প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণে বাঙ্গালার কোন জেলার সমকক্ষ হইতে পারে। সর্ব্বোপরি সভা-সমিতি বা সংবাদ-পত্রাদির এমন কোন ব্যবস্থা নাই, যদ্দ্বারা তাহারা পরস্পরের অবস্থা এবং মনোভাব

জানিতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিতে পারে। কর-পদের অঙ্গুলীগুলি যতদিন মূলদেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদের দ্বারা মূল-দেহের শোভা এবং কার্য্য উভয়ই সম্পাদিত হয়; কিন্তু তাহারা যদি কখনও দৈব-দুর্ব্বিপাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন দেহের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার শোভা এবং কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে, পরন্তু অঙ্গুলীগুলির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর বর্ত্তমান বিচ্ছেদে সম্মিলিত বঙ্গের অস্তিত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না বটে, কিন্তু এক দশমাংশ শক্তি যে কমিয়া গেল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর এই বিচ্ছিন্ন অংশের অস্তিত্বই বা কতদিন থাকিবে—কতদিন এই বিচ্ছিন্ন অংশের অধিবাসিগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার অবকাশ পাইবে? এখন ইহারা শাসন-সংরক্ষণ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালী জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইল, কেবল বাঙ্গালীর মাতৃভাষাটাই ইহাদিগের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার অবলম্বন হইয়া রহিল। ইহাও দীর্ঘকাল থাকিবে না। বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তির সংস্পর্শ হইলে বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, অধিকমাত্র জলের সঙ্গে বিন্দুমাত্র জলের যোগ করিয়া দিলে সেই বিন্দু আর ক্ষণমাত্রও আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। এই ৭০ লক্ষ বাঙ্গালী যে অল্পকাল মধ্যে আপনাদের অস্তিত্ব আসামবাসী এবং বিহারবাসীর অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিতে বাধ্য না হইবে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত কে বলিতে পারে? ব্যক্তিগত ভাবেই হউক আর জাতিগত ভাবেই হউক, আপনার অস্তিত্বের বিলোপ কেহ আকাঙ্ক্ষা করে না।

আমরা আজ নৈরাশ্যের অপার সমুদ্রে পড়িয়া সন্তরণ করিতেছি। সন্তরণদ্বারা যে কূল পাইব না, তাহা আমরা জানি; কিন্তু সন্তরণ ছাড়িলে যে জীবনের আশা একেবারেই যায়, তাহা বুঝিয়াই সন্তরণ করিতে আমরা বাধ্য। মানুষ জলে পড়িয়া যতক্ষণ হাবুডুবু খায়, যতক্ষণ হস্তপদ সঞ্চালন করে, ততক্ষণই তাহার বাঁচিবার আশা, কারণ ততক্ষণই অন্যের দৃষ্টি-আকর্ষণ এবং সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সে যখন মরিয়া ফুলিয়া ঢেপ হইয়া ভাসিতে থাকে, তখন লোকে তাহাকে দেখিলেই ঘৃণায় চক্ষু ফিরায়, তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য কেহ হস্ত প্রসারণ করে না। মানুষ বন্দুকের গুলি খাইয়া যতক্ষণ নড়ে চড়ে, যতক্ষণ হস্তপদের আক্ষেপ প্রদর্শন করে, ততক্ষণই তাহাকে বাঁচাইবার জন্য চিকিৎসক প্রাণপণ চেষ্টা করেন, গুলি উদ্ধার করিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করেন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার নড়া চড়া এবং খেঁচুনী থামিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই চিকিৎসকের যত্নও থামিয়া যায়, ডোমে তাহাকে লোক-নয়নের অন্তরালে লইয়া ফেলিয়া দেয়। যাঁহারা আত্মরক্ষার প্রকৃতির এইরূপ বিধানের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদের এই হাহুতাশে, এই অশ্রুপাতে, এই আক্ষেপ-উৎক্ষেপে বিরক্ত না হইয়া ভরসা করি আমাদিগকে সহানুভূতির চক্ষেই দেখিবেন, এবং যাঁহার যতটুকু শক্তি থাকে, আমাদিগের সহায়তায় তাহার প্রয়োগ করিবেন।

জাতি এবং ধর্ম্ম, এক হইলেও কেবল ভাষার পার্থক্যই বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতিকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন বাঙ্গালার ভাষা হইতে আমাদের ভাষা পৃথক্ হইবে, সে দিন সহস্র চেষ্টাতেও আমরা আর বাঙ্গালীর সঙ্গে এক জাতি হইয়া থাকিতে পারিব না; যাঁহারা স্থূলভাবে দেখেন, তাঁহারা বলিবেন, যে দিন শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেইদিনই শ্রীহট্টবাসী আসামবাসী—আসামী হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। কয়েক বৎসর হইল হবিগঞ্জে কি একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, কলিকাতার কোন সংবাদপত্রের সংবাদ-স্তম্ভে সেই সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গের হবিগঞ্জে অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনাটি এতই ক্ষুদ্র ও উপেক্ষণীয় যে, তাহার কিছুমাত্র আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ববঙ্গের কোন পত্রিকায় তাহার যে প্রতিবাদ হয়, তাহার গভীর স্মৃতি আজও আমার মনে রহিয়াছে। প্রতিবাদের মর্ম্ম এই যে, কলিকাতার সম্পাদক নিজের অজ্ঞতাবশতঃ পূর্ব্ববঙ্গের নামে একটা সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, হবিগঞ্জ আসামে, পূর্ব্ববঙ্গে নহে। একই কথা উপরে উপরে দেখিলে অনেক সময়ে হাসি পায়, কিন্তু আবার তলাইয়া দেখিলে তাহাতেই চক্ষের জলও আসিতে পারে।

প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর প্রতি সুবিধা এবং অনুগ্রহের জন্য রাজদ্বারে কাঁদিবার যেরূপ অধিকার আমাদের আছে, আমরা সেইরূপে কাঁদিতে থাকিবই, মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মহাবর এবং মহাবাক্য আংশিক ভাবেও ব্যর্থ হইতে দিব না। যতদিন রাজার সানুগ্রহ দৃষ্টি অভিশপ্ত প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর উপরে নিপতিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কম্পন, স্পন্দন প্রভৃতি জীবনলক্ষণ আমরা কখনও ছাড়িতে পারি না। কিন্তু রাজদ্বারে প্রতীকারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার অনুরাগ এবং অনুশীলন যাহাতে শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, এখন তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যবশতঃ মাতৃভাষার অনুশীলন আমাদের জাতীয় জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি হইয়া উঠিয়াছে।

যুক্তবঙ্গের সঙ্গে যোগ-রক্ষা

শিশু যতক্ষণ মাতার অঞ্চল ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ সে নিজেও নির্ভীক, তাহার মাতাও নিশ্চিন্ত। কিন্তু যদি কেহ কখনও সেই শিশুকে মাতার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইতে যায়, তখনই প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায় মাতার প্রতি শিশুর কিরূপ টান, শিশুর প্রতি মাতার কিরূপ মর্ম্মচ্ছেদী আকর্ষণ। যুক্তবঙ্গ আমাদের সেই মা এবং বঙ্গভাষা আমাদের সেই মাতৃ-অঞ্চল, আমরা প্রাণপণে সেই অঞ্চলটুকু আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিয়া তারস্বরে, করুণকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকিব, আমরা প্রাণ থাকিতে মা এবং ভাইকে ছাড়িয়া পৃথক হইয়া থাকিব না, প্রতিবাসীর জাতিত্বে আপনার জাতিত্বকে নিমজ্জিত করিতে পারিব না। বাঙ্গালার মধ্যে বাঙ্গালীর সঙ্গে আমরা সকলের ছোট হইয়া থাকি, সেও আমাদের গৌরব; বাঙ্গালী জাতি হইতে

ভ্রষ্ট হইয়া অন্যের মধ্যে গৌরবের উচ্চাসন লাভ করিলেও আমরা তাহাতে সুখী হইতে পারি না, শান্তি পাইতে পারি না।

বলিয়াছি, বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে যোগ-রক্ষার এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন বাঙ্গালাভাষা এবং বাঙ্গালাসাহিত্য। বাস্তবিক ইহাই বর্ত্তমানে উভয়ের মধ্যে একমাত্র বন্ধন-সূত্র। প্রান্তপ্রদেশে এই বন্ধন দৃঢ় করিবার পন্থা কোথায় কি অবলম্বিত হইতেছে, আমরা কিছুই জানি না, এবং জানিবার উপায়ও নাই; কিন্তু এই সুরমোপত্যকার মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, মাতৃভাষার উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে, যুক্তবঙ্গ এবং প্রান্ত-বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ কি উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নির্দ্ধারণ এবং অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গ-ভারতীর মনীষী সেবকগণ বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে জাতীয় সাহিত্যিক তপস্যায় বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াএ পর্য্যন্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সভা রাজধানীর উচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান থাকিয়া চারিদিকে সযত্ন এবং সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, বঙ্গভারতীর সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সীমারেখা কোন দিকে সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহার প্রভাবে কোন দিকে ক্ষুণ্ণতা না ঘটে, বুঝি বা ইহাই দেখিবার জন্য দৃষ্টিকে সজাগ রাখিয়াছেন। আবার উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ তারুণ্যের স্বভাব-সুলভ উৎসাহ এবং অনুরাগবশতঃ বঙ্গের প্রান্ত-প্রদেশকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন; পরন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া প্রতিবাসী আসামকেও নিতান্ত আপনার করিয়া লইবার জন্যই যেন ব্যগ্র হইয়াছেন। আমাদিগের প্রতি বঙ্গীয় ভ্রাতা-দিগের যখন এত স্নেহ এবং এত অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তখন আমাদের নিরাশ হইবার কোন কথা নাই, আমাদের এই মাতৃভাষা এবং জাতীয় সাহিত্যরূপ বন্ধনরজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদিগের সঙ্গে জাতীয় উন্নতি-পথে একযোগে চলিতে পারিব।

সাহিত্যের আদর্শ

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই যখন পতনের অবস্থা হইতে উত্থান করিতে হইবে তখন ইহার একটা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে স্থির রাখা উচিত। বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, অনেক সাহিত্যিকই যেন বৈচিত্র্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য সাহিত্য যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন বৈচিত্র্য-সংযোগে তাহার সৌন্দর্য্য, মাহাত্ম্য এবং সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমার যেন বোধ হয়, বঙ্গ-সাহিত্যের সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কেহ কেহ বঙ্গভাষাকে ব্যাকরণের নিগড় এবং বর্ণ-বিন্যাসের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ কেহ বা নিজ নিজ প্রদেশলব্ধ প্রাদেশিকতার আবর্জ্জনা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ভাষাকে অচল এবং অপরিচিত করিয়া তুলিতেছেন। আবার কেহ বা স্বাধীনতার ততদূর পক্ষপাতী না হইলেও ভাষার প্রসাদ-গুণকে নিতান্তই অবজ্ঞা করিতেছেন।

এই সকল লেখকের, ভাষায় এবং ভাবে কি জানি কি একটা তরলতা, একটা চঞ্চলতা, একটা অগভীরতা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না, কাজেই বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। এই সকল লেখকের লেখা তরতর করিয়া কাণের মধ্যে কি একটা মধুরতা, একটা লালিত্য, একটা ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ ঢালিয়া দিয়া যায় তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় পর্য্যন্ত যে তাহা প্রবেশ করে না, হৃদয়ে যে তাহার একটা দাগ অঙ্কিত হয় না, দুই দিন পরে চেষ্টা করিলেও যে তাহা আবার স্মৃতি-পথে আনিতে পারি না, এ কথা বুঝি। বঙ্গভাষায় লিখিত অনেক সুচিন্তিত সুন্দর প্রবন্ধ প্রাদেশিকতার বিষে এমনই মূর্চ্ছিত যে, প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার থাকা না থাকা তুল্য। আমার স্মরণ আছে, এক সময়ে বাঙ্গালার কোন প্রদেশে প্রায় দেড়শত বালককে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় সরল শরীর পালনের মৌখিক পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। লেখক ছাত্রদিগকে অবস্থা বিশেষে পলতার ডাল্না খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষকেরা এই সকল প্রাদেশিক শব্দ বুঝেন কি না জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইল, এবং বালকদিগকে ঐ দুইটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, তথা দুঃখেরও বিষয়, দেড়শত বালকের মধ্যে একজনও এ দুইটি শব্দের অর্থ বলিতে পারিল না। এই সকল পরীক্ষায় বালকেরা পুস্তকের অর্থ বড় একটা বুঝে না, শিক্ষকের কথাগুলি মুখস্থ করিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষকেরা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই ঐ দুটি ক্ষুদ্র শব্দকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের শ্রুতিধর ছাত্রদিগের নিরুত্তর থাকিবার কোন কথা ছিল না। অভিধানের সংগ্রহকর্ত্তারা সাধারণতঃ সাধু ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলিরই সঙ্কলন করিয়া থাকেন, এবং ইহাই সুসঙ্গত। প্রতি জেলার প্রাদেশিক শব্দ যদি বাঙ্গালার অভিধানে স্থান লাভ করে, তাহা হইলে তাহা যে শব্দকল্পদ্রুমের কত গুণ বড় হইবে তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ শিক্ষকেরা অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পল্তাও পান নাই, ডাল্নাও পান নাই। গ্রন্থকার যদি "পল্তার ডাল্না" না লিখিয়া "পটোল পত্রের ব্যঞ্জন" লিখিতেন, তাহা হইলে নিতান্তই যে সরলতার ব্যাঘাত ঘটিত, এমন নহে; পরন্তু তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইত, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সকলেই তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিত। আজকাল সরল লেখার একটা অর্থ হইয়াছে, সরল বর্ণের লেখা, যুক্তবর্ণের অভাব। যুক্তবর্ণ দেখিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলে বালকেরা যে যুক্তবর্ণকে বড় একটা ভয় করে না, তাহা ভাবিয়া দেখেন না।

যাহা হউক, এই সকল লেখক যে পথ প্রশস্ত মনে করিবেন সেই পথেই চলিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র চিৎকারে তাঁহারা নিরস্ত হইবেন না। কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি একটা গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে; এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সেই গুরুত্ব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা বঙ্গের এক নিভৃত প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছি; বঙ্গের সকল প্রদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সমস্ত প্রাদেশিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি, আমাদের সে সুযোগ বা ক্ষমতা নাই। এ

অবস্থায় যে সকল গ্রন্থ প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত এবং বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় লিখিত, যে সকল গ্রন্থের ভাব কর্ণে তরল মাধুর্য্য উৎপাদন অপেক্ষা হৃদয়ে বিমল আনন্দ এবং তৃপ্তি সম্পাদনে অধিক সমর্থ, যে সকল গ্রন্থের ভাব কেবল শ্রুতি মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া হৃদয়ে পাষাণাঙ্কবৎ স্থায়ী স্মৃতি মুদ্রিত করে, সেই রূপ গ্রন্থকেই আমাদের আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। বৈচিত্র্যের চটকে মুগ্ধ হইয়া নানা-গ্রন্থকারের পশ্চাতে দৌড়িলে আমরা কাহাকেও ধরিতে পারিব না, কাহারও গুণ আয়ত্ত করিতে পারিব না, সুতরাং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরাও ভাষায় বৃহস্পতি হইয়া পড়িব, এক এক স্থলে এক একটী খেচরান্ন প্রস্তুত করিয়া বসিব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গ-ভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্য এখন আমাদের জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি, এ সময়ে এই জীবনের সম্বলকে আমরা আমোদের, তামাসা বা খেয়ালের বিষয় করিতে পারি না। জীবিত কাহারও নাম লইয়া বিপন্ন হইতে চাই না; কিন্তু মৃতের নাম গ্রহণ নিরাপদ, কেননা তাঁহারা এখন হিংসা-দ্বেষের বাহিরে, তাহারা এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা জীবন-গঠনের জন্য, জাতীয় অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য বঙ্গ-ভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্যকে অবলম্বন করিতে যাইতেছি, সুতরাং ভাষা এবং সাহিত্যের আদর্শ অবলম্বন করিতে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার এবং তারানাথ যদিও সংস্কৃতকে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের অনুকরণ অসঙ্গত এবং হাস্য-কর হইবে, তথাপি তাঁহাদের গ্রন্থ অতি আদর করিয়া আমাদিগকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। গ্রন্থপাঠ কেবল অনুকরণের জন্য নহে, জ্ঞানের পুষ্টিসাধনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। আমি আশা করি, এই উপত্যকার শিক্ষিতদিগের মধ্যে এমন কেহই থাকিবেন না, যিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, কালীপ্রসন্নের মহাভারত, হেমচন্দ্রের রামায়ণ, মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, তারকনাথের স্বর্ণলতা, শ্রীশচন্দ্রের শক্তি-কানন বা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর পড়েন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠ করিব, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানলাভ করিবার জন্য; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়িব, তাঁহার জ্ঞান তাঁহার ভাব, এবং তাঁহার ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য। এই সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তকেও বিস্মৃত হইতে পারি না। তাঁহার শতবর্ষ চিরদিনই বঙ্গীয় যুবকের চিত্তে স্বদেশ-প্রীতির উৎস উৎসারিত করিবে। কিন্তু আজিও বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গ-সাহিত্যে সম্রাটের আসনে আসীন রহিয়াছেন, কবে কোথায় এ আসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী জন্মিবেন, তাহা অনুমান করা আমাদের সাধ্যাতীত। বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, জ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি স্বদেশ-প্রীতি কেবল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া তরতর করিয়া চলিয়া যায় না, কিন্তু আমাদের প্রাণের মধ্যে কিছু না, কিছু অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। সহজ, সরল, অথচ বিশুদ্ধ সাধুভাষা বঙ্কিমের লেখনী-মুখে প্রসূত হইয়া আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে; এতক্ষণ কি পড়িলাম এবং কেন পড়িলাম? ইত্যাকার প্রশ্ন উদিত হইয়া আমাদের মনকে

ব্যথিত করে না। বঙ্কিমের সম্বন্ধে কেবল একটা আপত্তি এই, তাঁহার উপন্যাসের ভাষা পাঠ করিয়া তরলমতি যুবকেরা সহসা তাহার গভীর অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে না, সুতরাং যতটা উপকৃত হইবার কথা ততটা উপকৃতও হয় না। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক শক্তিশালী লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল সমালোচনা পাঠ করিলে যুবকদিগের পক্ষে সে আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

ব্যাকরণের বন্ধন হইতে ভাষাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস আলস্য-প্রসূত একটা রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি ভরসা করি এই উপত্যকাবাসী কেহ এ প্রয়াসে যোগ দিবেন না। পরন্তু এ প্রদেশের বালকেরা বাল্যকাল হইতে যাহাতে ব্যাকরণে অভ্যস্ত হইয়া ভাষাকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে, আপনারা তাহার চেষ্টা করিবেন। বাঙ্গালাভাষায় শুদ্ধরূপে লিখিতে বা আলাপ করিতে যে পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা নহে; যে সে একখানা বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়িলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মানবীয় সকল কার্য্যের এবং সকল বিষয়েরই একটা কিছু বিজ্ঞান আছে। ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞান। "তুমি যাও" বলি কেন, "আমি যাও" বলি না কেন, ইহার হেতুবাদ ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে। যাহারা লেখা পড়া শিখে না, তাহারা গতানুগতির অনুসরণ করে, কিন্তু যাহারা লেখাপড়া শিখিবার গর্ব্ব রাখে, তাহাদের নিকট হইতে এরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা অসঙ্গত নহে।

উচ্চারণ শিক্ষা

বাঙ্গালার এক একটা জেলাকে উচ্চারণ সম্বন্ধে এক একটা প্রদেশ মনে করা যাইতে পারে। এক জেলা ছাড়িয়া অন্য জেলায় প্রবেশ করিলেই প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার এবং বর্ণগত উচ্চারণের পার্থক্যে বুঝিতে পারা যায় যে, একটা জেলা ছাড়িয়া এখন অন্য জেলায় আসিয়াছি। নিকটবর্ত্তী জেলায় এই পার্থক্য অতি অস্পষ্ট, বিশেষ প্রণিধান না করিলে এ পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু একটা জেলা মধ্যে ব্যবধান রাখিলে তাহার দুই প্রান্তের দুই জেলার ভাষাগত পার্থক্য বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী কোন একটা জেলাকে যদি কেন্দ্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেন্দ্র হইতে যে দিকে যতদূরে যাওয়া যাইবে, সে দিকে ততই কেন্দ্রের সঙ্গে এই পার্থক্য বাড়িতে থাকিবে এবং প্রান্তপ্রদেশে যাইয়া এই পার্থক্যটা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিবে। বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কাছাড় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেদিনীপুর অবস্থিত। এই দুই জেলার ইতর লোকের মধ্যে যে পারিবারিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা কতকটা উচ্চারণের দোষে এবং কতকটা প্রাদেশিকতা-বাহুল্যে এরূপ জড়িত যে, কাছাড় এবং মেদিনীপুরের অশিক্ষিত লোকে তাহাদের পরস্পরের কথা সহজে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যদি বিশুদ্ধ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা যায়, তাহা উভয়েই অক্লেশে বুঝিবে। সুতরাং প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে সাধু বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিবার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ অভ্যাস এক দিনে দুই দিনে হয় না। বালকদিগকে যখন

বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন হইতেই এদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিক্ষকদিগের অন্যান্য গুণ-পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কণ্ঠে উচ্চারণগত জড়তা বর্ত্তমান আছে কি না তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে, অনেকে ইচ্ছা করিলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারেন, কিন্তু অনেক স্থলে সে ভাবে আলাপ করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন। এ লজ্জার অর্থ বুঝিতে পারি না। প্রাদেশিক পারিবারিক ভাষা হইতে বিশুদ্ধ সাধু ভাষা যদি উৎকৃষ্ট সুতরাং প্রার্থনীয় হয়, তবে তাহার ব্যবহারে লজ্জার কারণ কি? সাহিত্যিক ভাষার পরিচয় কাগজে কলমে এবং কথিত ভাষার পরিচয় কথাবার্ত্তায়। কিন্তু কথাবার্ত্তায় বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতে যদি লজ্জা বা আলস্য হয়, তাহা হইলে সমাজের চলিত ভাষা উন্নত হইবে কিরূপে? অবশ্য সাহিত্যের ভাষা ঠিক কথিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কথায়-বার্ত্তায় সাহিত্যের ন্যায় গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইবারই কথা; কিন্তু তাই বলিয়া বাক্যালাপের সময় কেবল যে সাধুজন-বর্জ্জিত এবং সর্ব্ব-সাধারণের অপরিচিত প্রাদেশিক ভাষারই ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন কথাই নাই। ব্যক্তি-বিশেষ শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, তাহার ব্যবহৃত ভাষাই তাহার পরিচায়ক। দেশ-বিদেশের ভাষা উন্নত কি অবনত, তদ্দেশবাসী জনসাধারণের কথাবার্ত্তাই তাহার পরিচায়ক। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদের ব্যবহৃত ভাষাও যদি সেই সঙ্গে দিন দিন উন্নত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রাদেশিকতা যে অনেক পরিমাণেই বিদূরিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ-নির্ব্বাচন

কোন্ গ্রন্থের ভাষা আমাদের অনুকরণীয় কোন্ গ্রন্থের ভাব এবং উপদেশ আমাদের পক্ষে উপযোগী এবং মঙ্গলজনক, সুতরাং প্রার্থনীয়, তাহা অবধারণ করিবার জন্য দেশের মধ্যে অন্ততঃ সুরমোপত্যকাতে একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত মনে করি। গ্রন্থ বাহির হইলেই তাহার বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সচরাচর একটা সমালোচনা বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে বৈজ্ঞাপনিক সমালোচনা বলা যাইতে পারে। ইহাতে গ্রন্থের প্রকৃত দোষ-গুণ, প্রকৃত মূল্য, বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং এই বিজ্ঞাপনের জাঁকজমকে মোহিত হইয়া অনেকে আগ্রহ সহকারে পুস্তক ক্রয় করেন। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া অর্থব্যয় সফল হইল বলিয়া মনে করিতে পারেন না। দেশের লোকের অবস্থা এমন নহে যে সুপাঠ্য হউক আর নাই হউক বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহারা সমস্ত পুস্তকই কিনিতে পারে। এ অবস্থায় যদি এমন একটা সভাসমিতি কিছু থাকে যে, তদ্দ্বারা নূতন পুস্তকের ভাষা ও ভাব প্রভৃতির দোষ-গুণ সর্ব্বাগ্রে আলোচিত হয় এবং সেই সভার মত লইয়া তবে সাধারণ লোকে গ্রন্থ ক্রয় করে, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হয়। দেশের ভাষা এবং সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাধারণের সম্মুখে ভাষা এবং সাহিত্যের নির্দ্দোষ আদর্শই ধরিতে হইবে। আমি ভরসা করি, আপনারা এই বিষয়টি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এবং যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে ভাষা

এবং ভাবের আদর্শ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের উপকারের জন্য যাহাতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইতে পারে, আপনারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

সাহিত্য-প্রচার

প্রচারের একটা আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে বোধ হয় চিরদিনই বর্ত্তমান আছে। অবশ্য স্থানকাল বিবেচনায় প্রচারের প্রণালীতে পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রচার্য্য বিষয়ের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার পরেই রাজনীতি। ধর্ম্ম এবং রাজনীতিপ্রচারের জন্য কত লোক খাটিতেছেন, কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই প্রচারকার্য্য দুই প্রণালীতে সিদ্ধ হইয়া থাকে; প্রথম বক্তৃতার দ্বারা, এবং দ্বিতীয় সাহিত্য দ্বারা। জগতে যত গ্রন্থাগার আছে, তাহা হইতে যদি ধর্ম্ম এবং রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থগুলি পৃথক করিয়া ফেলি, তাহা হইলে মূল্যবান্ গ্রন্থ অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। যিনি যে বিষয় উপলব্ধি করেন, যাঁহার যাহা সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া ধারণা হয়, তিনি তাহাই প্রচার করিতে ব্যগ্র হন, তবে কৃতকার্য্যতা স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে নিতান্তই স্বাভাবিক; তাহার উপরে এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদেশ থাকাতে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, সংসারে যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞানরূপী ভগবান তাহাকে দয়া করেন না। যাহা হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলে তৎসম্পাদন বড়ই মধুর হইয়া উঠে। জ্ঞানপ্রচারের এই মাধুর্য্য পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ক্ষুদ্র আমরাও সেই স্বাভাবিক পিপাসার তাড়নায় তাহাদেরই উপদেশরূপ উপাদেয় প্রসাদ মানবজাতির মধ্যে যথাশক্তি বিতরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। কিন্তু এ বিষয়েও একটা ব্যবস্থা, একটা উদ্যোগ, একটা প্রণালী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। একা এক ব্যক্তিও কার্য্য করে, আবার বহুলোক সমবেত হইয়াও কার্য্য করে; কিন্তু এই কার্য্যের গুণ এবং পরিমাণে তারতম্য কত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমান যুগে সাধারণের জন্য একাকী খাটিবার প্রথা একরূপ রহিত হইয়া যাইতেছে, অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি মহৎ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই এক পরামর্শে, এক উদ্দেশ্যে এবং এক যোগে বহুলোকের সমবেতভাবে খাটিবার প্রথা সভ্য জগতের সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইতেছে। সাধারণভাবে সর্ব্বত্র, এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান সময়ে এই উপত্যকায়, বাঙ্গালা-সাহিত্যালোচনার কতদূর প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি আপনারা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই উপত্যকায় উৎকৃষ্ট আদর্শ সাহিত্যের প্রচারের যে কতদূর আবশ্যকতা, তাহা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। কোন্ কোন্ গ্রন্থ উৎকৃষ্ট, কোন্ গ্রন্থ কোন্ শ্রেণীর লোকের বিশেষ উপকারী, তাহা সাধারণকে কেবল বলিয়া দিলেই আপনাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হইবে না, কিন্তু যাহার যে গ্রন্থের প্রয়োজন, সেই গ্রন্থ লইয়া তাহার দ্বারে উপযাচকের

ন্যায় আপনাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে। বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লইয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, পরিশ্রমও সার্থক হইবে না। উদরান্নের জন্য বর্ত্তমান যুগের লোক এতই ব্যতিব্যস্ত যে, বৃহৎ গ্রন্থ পাঠের অবকাশ তাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, এবং বৃহৎ গ্রন্থ ক্রয় করিবার অর্থও তাহাদের ভাণ্ডারে কদাচিৎ জোটে। সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াও তাহার অধিক ক্রেতা মিলিবে না। যে গ্রন্থ যত অধিক লোকে আদর করে, তাহার প্রচার তত অধিক পরিমাণে হইল বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার দ্বারা এই কার্য্য সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। দুই চারি পয়সা, কি অন্ততঃ দুই চারি আনা মূল্যের পুস্তিকা কিনিয়া লইতে লোকের তেমন কষ্ট হয় না, উহা পড়িতেও কাহারও অবকাশের অভাব হয় না। ক্ষুদ্র পুস্তিকার মহিমা যে কত, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ সকল প্রচারকমণ্ডলীর কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, তাঁহারা প্রতি বৎসর এক এক খণ্ড পুস্তিকার লক্ষ লক্ষ সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় হইতেছে। এই কার্য্যের ফল কিরূপ হইতেছে, প্রত্যেক দশবার্ষিকী লোকগণনার বিবরণ পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের সে শক্তি নাই, সে অর্থ বলও নাই; কিন্তু মানবের প্রতি আমাদের যে ভালবাসা এবং নানা দুর্দ্দৈবের ফলে আমাদের যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা আছে, তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উৎসাহ এবং সমবেত চেষ্টা যোগ করিলে আমাদের অন্যান্য সমস্ত অভাবের পরিপূরণ হইতে পারে। এই সকল পুস্তিকার যথোচিত প্রচার পুস্তক-বিক্রেতার দ্বারা হইতে পারে না। পুস্তক-বিক্রেতা দোকান খুলিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে, বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কেহ ভাল পুস্তকের অনুসন্ধান লইতে তাহার দোকানে সচরাচর যায় না। পুস্তক লইয়া দ্বারে দ্বারে যাইতে পারিলে বিমুখ হইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিবার কথা নাই। বেদেনীদের দৃষ্টান্ত দেখুন। গৃহস্থের ঘরে কিছুরই অভাব নাই, স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইতেছে। গৃহস্থ যে সময়ে গৃহে উপস্থিত নাই, বেদেনীরা ঠিক সেই সময়ে ছাইভস্মের পশরা মাথায় লইয়া ডাক হাঁক ছাড়িতে ছাড়িতে গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হয়, এবং গৃহিণীদিগকে সেই ছাইভস্মে সন্তুষ্ট করিয়া অনায়াসে প্রতি গৃহস্থের গৃহ হইতে দুই চারি আনা লইয়া চলিয়া যায়। যদি বেদেনীর ছাইভস্মে এত আদর হইতে পারে, তাহা হইলে আপনারা যে অমূল্য ভালবাসার সঙ্গে অমূল্য জ্ঞানের খনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইবেন, তাহার কি অনাদর হইবে? কখনই না।

ধর্ম্মপ্রচারই হউক, আর সাহিত্যপ্রচারই হউক, পেট বাঁধিয়া—উপবাস থাকিয়া কেহ কিছু করিতে পারে না, সুতরাং আমাদের যুবকেরা যে বিনা অন্নে পেটকে বুঝাইয়া সাহিত্য-প্রচারের জন্য খাটিতে পারিবেন, এমন আশাই করা যায় না। কিন্তু এই কার্য্য ব্যবসায়ের হিসাবে অনায়াসে করা যাইতে পারে। গ্রন্থকারেরা এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিবেন, এবং প্রাগুক্ত

সভা-সমিতি ঐ সকল পুস্তিকার ভাষা, বিষয় ও উপযোগিতা বিচার করিয়া দেখিবেন। পুস্তিকা তাঁহাদের অভিমত হইলে প্রত্যেক উপবিভাগে কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট যুবক তাহার প্রচারের ভার লইবেন। গ্রন্থকারেরা গ্রন্থবিক্রেতাদিগকে যে কমিশন বা দস্তুরী দিয়া থাকেন, সেই দস্তুরী এই সকল যুবককে তাঁহারা অনায়াসেই দিতে পারেন। ইহাতে গ্রন্থকার এবং বিক্রেতা উভয়েরই উৎসাহিত হইবার কথা; বরং এমনও আশা করা যায় যে, লেখকেরা ধনাগমের দিকে তেমন দৃষ্টি না রাখিয়া প্রচার-সৌকর্য্যার্থ এই সকল পুস্তিকার মূল্য যতদূর সম্ভব অল্প করিয়াই নির্দ্ধারণ করিবেন।

পুস্তকালয়

ক্ষুদ্র পুস্তিকা কিনিতে কষ্ট হয় না। পড়িবার অবসর পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে অন্যকে দিতে পারা যায়। এক সময় হারাইয়া গেলেও কষ্ট হয় না; কিন্তু বড় গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। একখানা বড় গ্রন্থ পড়িতে অনেক সময় লাগে, তাহা কিনিতে অধিক অর্থ লাগে, সুতরাং সচরাচর তাহা দান করা পোষায় না। আবার হারাইয়া গেলেও কষ্ট হয়। অথচ সাহিত্যে বড় বড় গ্রন্থেরও বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে, চুটকি পুস্তিকায় সে প্রয়োজন কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের বড় বড় গ্রন্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। পুস্তকালয়ের নাম শুনিলে অনেকে ভীত হইতে পারেন। বড় বড় নগরে সহস্র সহস্র টাকা খরচ করিয়া যে পুস্তকালয় স্থাপন করা যায়, তাহাতেই যখন পুস্তকের অভাব দূর হয় না, পাঠকের পাঠস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয় না, তখন ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীদিগকে পুস্তকালয় স্থাপনের উপদেশ দেওয়া উপহাস করা মাত্র। কিন্তু আমি বলিতেছি, গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপন উপহাসের বিষয় নহে, অসম্ভব কথা নহে। যে ক্ষুদ্র গ্রামে দুই চারি জন মাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোক থাকেন, সেই গ্রামের জন্য তাঁহাদের গ্রন্থগুলি আগে চিহ্নিত করিয়া যদি একটা নিরাপদ কুঠারীতে রাখা যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামে পুস্তকালয় হইয়া গেল মনে করা যাইতে পারে। কালী সিংহের মহাভারত, হেমচন্দ্রের রামায়ণ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ ঘরে ঘরে না থাকুক, অনুসন্ধান করিলে হয় ত প্রায় গ্রামেই এক খানা দুই খানা পাওয়া যাইতে পারে। ইহার পরে প্রাগুক্ত সমিতির অনুমোদিত বড় বড় গ্রন্থ অর্থ সংগ্রহ দ্বারাও ক্রয় করা যাইতে পারে। গৃহস্থবিশেষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিবার জন্য যদি গ্রামে গ্রামে একজন দুইজন করিয়া ভদ্রলোক প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সভার অনুমোদিত নূতন নূতন বড় বড় গ্রন্থ পুস্তকালয়ে সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে না। বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার এখনও এমন সমৃদ্ধ হয় নাই যে, একটুকু যত্ন করিলেই তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট পুস্তক পাওয়া না যাইতে পারে। কয়েক বৎসর অতীত হইল একটি বন্ধু আমার নিকটে ৫০০৲ শত টাকা মূল্যের বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের একটা তালিকা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দেওয়া আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আমার বোধ হয়, খুব বিবেচনার সহিত গ্রন্থগুলি দেখিয়া শুনিয়া কিনিলে ২০০৲ শত টাকার মধ্যেই

বাঙ্গালা পুস্তকের একটা উল্লেখযোগ্য পুস্তকালয় হইতে পারে। উদ্যোগী লোক থাকিলে এক বৎসরে না হউক, অন্ততঃ ৫ বৎসরে যে কোন গ্রামে এই ২০০৲ টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। প্রয়োজন বুঝিতে না পারিলে ২৲ টাকা ব্যয় করাও অপব্যয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেশের সুখ, সুবিধা এবং উন্নতি সম্বন্ধে সাহিত্যের উপযোগিতা লোকে যদি বুঝিতে পারে, তাহা হইলে পুস্তকালয়ের জন্য ২০০৲ শত টাকা ব্যয় অতিদরিদ্র গ্রামও সার্থক মনে করিবে। কিরূপে পুস্তকালয়টি নিরাপদ থাকিবে, কি করিলে গ্রন্থগুলি বিনষ্ট বা অপহৃত হইবে না, কি নিয়মে সকলে ঐ সকল গ্রন্থ লইয়া পড়িয়া ফিরাইয়া দিলে পুস্তকালয়ের অপচয় হইবে না, অথচ লোকের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তৃতি লাভ করিবে, পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতাগণই তাহা অবধারণ করিবেন, সে বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করিয়া সময় হরণ করা নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্য-চর্চ্চার ফল

কোন গণিতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হোমরের নামে সকলেই পাগল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হোমর কি প্রমাণ করিয়াছেন?" ইহার উত্তরে হীরন্ নামক একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন "হোমর যদি সমগ্র গ্রীকজাতির বন্ধন-রজ্জুস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে সুখ, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার দিকে অগ্রসর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন"। আমাদের দেশের কোন পণ্ডিত কাব্যশাস্ত্রকে ভবরোগের সুখসেব্য ঔষধের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধন সাধারণ লোকের পক্ষে তিক্ত, কিন্তু কাব্যচর্চ্চা করিলে সুমিষ্ট রস-উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসাধন হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে সেই কথাই অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এক গুরুর শিষ্য, এক দেবতার উপাসক, এক গ্রন্থের পাঠক প্রায় একই স্বভাব সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য প্রায় একই প্রকৃতির হইয়া থাকে, একই খাতে চলিয়া থাকে। ইংলণ্ডে যে সময়ে মধ্যযুগের অবসান হইয়া নবযুগের আরম্ভ হইল, বাইবেলের অনুবাদ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডবাসী আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষের ভাব, চিন্তা, আবেগ এবং আদর্শ একই প্রকৃতির হইয়া দাঁড়াইল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন, "England became the land of a book and that book was the Bible." অর্থাৎ সমগ্র ইংলণ্ড তখন একখানি মাত্র গ্রন্থের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থখানি বাইবেল্। বাস্তবিক মনুষ্যসমাজে সদ্‌গ্রন্থের প্রভাব যে কতদূর গভীর এবং কতদূর বিস্তৃত, বর্ণনায় কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। যে জ্ঞানে জীব-জগতের মধ্যে মানবের অব্যাহত প্রভুত্ব, সাহিত্য তাহার সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার। যে দেশের সাহিত্য যত উন্নত এবং বিস্তৃত, আর যে দেশের লোক সেই সাহিত্যের প্রতি যত অনুরক্ত, জগতে সেই দেশ এবং সেই জাতি তত সুখী, তত উন্নত এবং তত প্রভাবশালী—এ, কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন হইবে না, এই ভারতবর্ষেই, আমাদের অতি নিকটেই, যাহাদের একটা সাহিত্য আছে, আর যাহাদের কোন প্রকার সাহিত্য নাই, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, চারিদিকে

একবার দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, শক্তি প্রভৃতি মানবের সুখের, মহত্ত্বের এবং গৌরবের যে কিছু উপাদান আছে, তাহার জন্য মানব-সমাজ এই সাহিত্যের নিকটেই ঋণী।

এই সকল সাহিত্যচর্চ্চার প্রত্যক্ষ মুখ্যফল। কিন্তু ইহা ছাড়া গৌণফল যে কত আছে তাহার অবধি নাই। দুই একটার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের পল্লীগ্রামগুলি এক সময়ে সৌহার্দ্দ্য, শান্তি এবং আনন্দের রঙ্গভূমি ছিল। পাশ্চাত্যদিগের ভাষায় যাহাকে জীবন-যুদ্ধ বলে, তাহার বাতাস তখন আমাদিগের পল্লীগ্রামকে স্পর্শ করে নাই। তখন অল্প আয়াসে জীবিকার সংস্থান হইত, সুখভোগের অল্প উপকরণে লোকের সন্তোষ জন্মিত এবং স্নান, পূজা, আহার, নিদ্রা সম্পাদন করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকিত, লোকে তাহা গান-বাদ্যের বিশুদ্ধ আমোদে, অথবা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিত। এখন পূজাতে আর সময় নষ্ট হয় না, স্বচ্ছন্দে স্নান আহার এবং নিদ্রা করিয়াও প্রচুর সময় অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এই অবশিষ্ট সময়ের ব্যবহার পূর্ব্বে যেরূপ হইত, এখন সেরূপ হইতে পারে না; এখন বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকর্দ্দমা, পরনিন্দা-পরচর্চ্চা এবং গ্রাম্যদলাদলি সেই বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ এবং সাহিত্য-চর্চ্চার স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে, অর্থাৎ সর্ব্বদা রামায়ণীয় এবং মহাভারতীয় কথার আলোচনায় মনে যে সকল সদ্ভাবের উদ্রেক হইত, তদ্দ্বারা মানবের চরিত্র উন্নত হইত এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে ও সম্পদ-বিপদে, পরস্পরের অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহায়তায় সেই উন্নতি, সেই সামাজিক সৌভাগ্য প্রকাশ পাইত। নিন্দাচর্চ্চা, মামলা-মোকর্দ্দমা, ঈর্ষা-নিন্দা এবং দলাদলির বৈরনির্য্যাতনে যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা আন্দোলিত, তাহাদের হৃদয়ে সেই সকল দেবভাব কেমন করিয়া স্থান পাইবে, নারকীয় দুর্গন্ধের মধ্যে মানবীয় সদ্ভাবরূপ স্বর্গীয় কুসুম কিরূপে বিকশিত হইবে? এই সকল কারণে বঙ্গের পল্লীগুলি এখন আর সেই নন্দন-কাননের শোভা ধারণ করে না, এখন সেগুলি শ্মশানের চিত্র, পিশাচের বিলাস-ভূমি, নরকের অভিনয় ক্ষেত্র। কিন্তু এখনও যদি আপনারা পল্লীগ্রামের মঙ্গল-সাধনে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত অগ্রসর হন, এখনও যদি সাহিত্যের দিকে পল্লীবাসীর অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের পল্লীগুলি আবার সেই নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিবে, আবার ইহা আমাদের চতুর্ব্বর্গ-সাধনের নিরুপদ্রব পবিত্র ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

যে-সকল বালক-বালিকা যেরূপ সমাজে প্রতিপালিত হয়, তাহারা সেইরূপ সমাজের উপাদানে আপনাদিগের চরিত্র গঠন করে। যে সকল শিশু সন্তান হিংসা-নিন্দা, ঝগড়া-বিবাদ, জন্মাবধি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহারা যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে সাধু সদাচারী পবিত্র এবং সদ্ভাবসম্পন্ন হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা বাতুলতা। দেশের মানুষগুলিকে যদি পবিত্র-চরিত্র, পরার্থপর, সদ্ভাবসম্পন্ন এবং প্রীতি-পরায়ণ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে শিশুগণ যে গ্রামের যে সমাজে প্রতিপালিত হইবে, সেই গ্রাম এবং সেই সমাজকে সেইরূপ মানুষ গঠিত করিবার উপ-

যুক্ত যন্ত্র করুন। মানুষকে মারিয়া পিটিয়া বা উপদেশ দিয়া ভাল করা যায় না, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে এবং শিক্ষিতসমাজে প্রত্যক্ষ হইতেছে। মানুষের চরিত্রগঠন যন্ত্রের সাহায্যে বা বলের সাহায্যে হয় না; অনুকূল ক্ষেত্রকে অনুকূল ঋতুতে উপযুক্ত রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন রস-বাত-তাপাদির সহায়তায় আশানুরূপ শস্য জন্মে, সেইরূপ পল্লীগ্রাম এবং পল্লী-সমাজকে আদর্শের অনুকূলভাবে প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বালকবালিকাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা সেই আদর্শের অনুরূপ হইবেই হইবে। আমার এ কথায় কেহ উপহাস করিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস, দেশে সাহিত্যের চর্চ্চা বর্দ্ধিত করিলে, গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপন, সদ্গ্রন্থের সংগ্রহ এবং তৎপাঠে সাধারণের আগ্রহ জন্মাইতে পারিলে আমাদের পল্লীর অবস্থা বাস্তবিকই নন্দনকাননের অনুরূপ হইবে, এবং তাহাতে যে সকল নরশিশু জাত ও প্রতিপালিত হইবে, তাহারা ভবিষ্যতে আপন আপন চরিত্রে নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে।

মহিলাদিগের সহায়তা

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা পুরুষদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল পুরুষদিগের দ্বারা এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। পুরুষেরা সভা-সমিতি স্থাপন করিতে পারেন, গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে পারেন, গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন, চাঁদা দিয়া গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন; কিন্তু শিশুকে শিক্ষা দিবার ভার, শিশুকে আদর্শের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার রমণীদিগের হাতে। প্রাথমিক অবস্থায় জননীই শিশুর ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী এবং উপদেশ-দাত্রী। সেই সময়ে জননী যদি শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে তুল্যরূপে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে শিক্ষিত এবং গঠিত করিতে পারেন, তবেই একদিন শিশুর আদর্শচরিত্র লাভের সম্ভাবনা থাকে; নতুবা প্রথম অবস্থায় ধরিয়াই যদি তিনি শিশুটির চরিত্রকে আঁকাবাঁকা করিয়া কুৎসিতভাবে গড়িয়া ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে সে শিশুর পক্ষে সহস্র চেষ্টাতেও আর সেই আদর্শের অনুরূপ সহজ, সরল, নির্ম্মল, উন্নত চরিত্র লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন্ দেশের মানুষগুলি কিরূপ, সেই দেশের শিশুদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখিলেই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা বিশুদ্ধ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই রমণীদিগের সহানুভূতি এবং সাহচর্য্যের প্রয়োজন। এই সাহচর্য্য কেবল ইচ্ছা, যত্ন বা অনুরাগ থাকিলেই হয় না। শিশুর সর্ব্ববিধ শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মতত্ত্বে জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু সে নিতান্ত সহজ কথা নহে। আমাদের সমাজের কথায় কাজ কি, যে সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছে, সে সমাজেও অধিকাংশ গৃহে এরূপ জননীর নিতান্ত অভাব। সুখের বিষয়, আমাদের রামায়ণ এবং মহাভারত যেভাবে লিখিত, তাহাতে নীতিতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে অধ্যয়ন না করিলেও ঐ সকল গ্রন্থ কেবল কাব্যের মত পড়িয়া গেলেই নীতি-তত্ত্ব

ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব অনায়ত্ত থাকে না। অবশিষ্ট রহিল শারীরতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব। এই দুই বিষয়ের যথাযথ অধ্যয়ন আমাদের মহিলা-দিগের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে; ভবিষ্যতে কখনও সম্ভব হইবে কি না তাহা ভবিষ্যৎ জানে। কিন্তু যাঁহারা গ্রন্থ নির্ব্বাচনের ভার লইবেন, তাঁহারা যদি বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া এই সকল বিষয়ে, পুরনারীদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ বাছিয়া বাহির করিতে পারেন ভালই; যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ে মহিলা-দিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য হইবে। এইরূপ সুব্যবস্থার ফলে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত ভাব-শুদ্ধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থলাভ করিয়া আমাদের মহিলাগণ যদি একদিকে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়া অন্যদিকে সতর্ক ভাবে শিশুর শিক্ষা চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে অচিরেই আমাদের এই উপত্যকা ভাষার বিশুদ্ধি, ভাবের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতি লাভ করিয়া অচিরেই ধন্য হইতে পারে। সমাজের এই সুন্দর আনন্দ-জনক চিত্র আজ কল্পনার বিষয় রহিয়াছে, কিন্তু আমাদিগের উৎসাহী যুবকেরা যদি সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যকে একটা মহাব্রত মনে করিয়া ইহার সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আজ যাহা কল্পনা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহাদের জীবিত কালের মধ্যেই তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। সাহিত্য-সেবার উপরে জীবিকার জন্য নির্ভর করিতে কাহাকেও উপদেশ দেই না। গ্রন্থ-বিক্রেতার ব্যবসায় লাভজনক হইলেও গ্রন্থকারের দারিদ্র্য জগতে চির-প্রসিদ্ধ। যিনি প্রকৃতির তাড়নায় এই দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সাহিত্যের সেবা, পরিচর্য্যা এবং প্রচারে যাঁহারা আত্মশক্তির প্রয়োগ করিবেন, তাঁহারা জীবিকার জন্য অন্য একটা না একটা কিছু অবলম্বন করেন, এই আমার অনুরোধ। এই উপত্যকাবাসী শিক্ষিত যুবকেরা জীবিকার জন্য যিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন, সাহিত্যের অনুরাগ তিনি ছাড়িবেন না, সাহিত্যের উপর হইতে তাঁহার সানুগ্রহ দৃষ্টি সরাইয়া লইবেন না, ইহাই আমার আশা।

কয়েক মাস পূর্ব্বে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "প্রভাত" নামক পাক্ষিক পত্রিকায় শ্রীহট্টবাসী জনৈক যুবকের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই পত্রখানি পড়িয়া আমি এই বার্দ্ধক্যেও যেন যৌবনের উৎসাহ অনুভব করিয়াছিলাম। ঐ পত্রের লেখক কে, এবং তিনি এই সভায় উপস্থিত আছেন কি না, জানি না। কিন্তু সেই পত্রখানিতে তিনি যে উদ্যম-উৎসাহ, যে আশা-ভরসা, যে স্বদেশ-প্রীতি ও গৌরব-লিপ্সার আভাষ দিয়াছেন, তাহা আজও আমার অন্তঃকরণকে যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সহকারী কয়েকটি বন্ধু নানা ভাষায় নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ঐ সকল ভাষার সম্পদরাশি আহরণপূর্ব্বক মাতৃভূমিকে গৌরব মণ্ডিত করিবেন। ভরসা করি, আজিও তাঁহারা সে সঙ্কল্প বিস্মৃত হন নাই, সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই।

এই সকল যুবক যখন দেশের হিতে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া সঙ্কল্পিত ব্রত পালনের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহাদিগের অল্পসাহসী ভ্রাতারাও আর ঘরে বসিয়া থাকা সম্ভব মনে করিবেন না, অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও তাঁহাদিগের অধিক অগ্রসর ভ্রাতাদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন। আপনারা সমগ্র বঙ্গের জন্য খাটিতে না যাইয়া যে এই ক্ষুদ্র উপত্যকাতেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, ইহা বড়ই মঙ্গলের কথা। ইহাতে কার্য্য করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে এবং কার্য্যের পরিমাণও বেশী দেখাইতে পারিবেন। সমস্ত বঙ্গের তুলনায় আপনাদের সংখ্যা এবং কার্য্যকরী শক্তি নিতান্তই ক্ষুদ্র; কিন্তু এই ক্ষুদ্র উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যদি আপনারা কার্য্য করেন, তাহা হইলে কার্য্যটা ঠিক শক্তির অনুরূপই হইবে, সুতরাং কার্য্য করিয়া যেমন সুখ পাইবেন, সেইরূপ ফলও পাইবেন।

বঙ্গভূমির সঙ্গে যোগরক্ষা

আপনাদের উপত্যকাতে স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে যে কোন সাহিত্যিক অনুষ্ঠান হউক, মূল বঙ্গদেশের সঙ্গে তাহার যোগ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি শ্রীহট্টে একটি স্থায়ী সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি এই সংবাদে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া আর একজন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছি, এবং উপত্যকাবাসী মাত্রেই এই সভার সভ্য হউন আর নাই হউন, ইহার কার্য্যকলাপে যোগ দিয়া খাটিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য বিষয়ক সভা-সমিতির শীর্ষস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে, সুতরাং ইহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই বঙ্গদেশীয় অন্যান্য সমস্ত সাহিত্য-বিষয়ক সভা-সমিতির সঙ্গে যোগ রহিল বলিয়া মনে করা অন্যায় নহে। বঙ্গদেশে জেলায় জেলায় এইরূপ সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাধীনভাবে স্ব স্ব জেলার জন্য কার্য্য করিবে, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত সাহিত্যিক সভা-সমিতির যোগসূত্র এবং নিয়ামকরূপে বর্ত্তমান থাকিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাই আমার নিকট নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী আজিও বিষয়-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সকলে একযোগে কার্য্য করিবার তেমন পরিচয় দিতে পারেন নাই; আমাদের আশা, অন্ততঃ সাহিত্য-বিভাগে এক উদ্দেশ্যে এবং এক যোগে কার্য্য করিয়া বাঙ্গালী আপন জাতীয় একতার প্রমাণ দেখাইবেন। আপনাদিগের মধ্যে যখন কোন সাহিত্যিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, তখন আপনারা বঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে সাদরে ও সাহ্লাদে নিমন্ত্রণ করিবেন, এবং বঙ্গদেশে যখন এই শ্রেণীর কোন অনুষ্ঠান হইবে, তখন, আমি ভরসা করি, আপনারাও সেইরূপ নিমন্ত্রণ পাইবেন। এইরূপ পরস্পরের যাতায়াত, আলাপ-আপ্যায়ন, এবং পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়ের ভাব-বিনিময় রক্ষা করা সর্ব্বকালেই বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়; বিশেষতঃ এই বিচ্ছেদের দিনে, সুরমা-উপত্যকার এই দুর্দ্দিনে সেই প্রয়োজন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনারা মনে করিবেন না যে, এই বিচ্ছেদ-ব্যাপারে কেবল আপনারাই

ব্যথিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে পরকর্তৃক বিচ্ছেদ ঘটিলে স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেরূপ ব্যথিত হন, আজ প্রান্তবাসী বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতি সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের বহুস্থানে আমার সর্ব্বদা যাতায়াত আছে, বহু বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে এই শাসন-বিষয়ক বিচ্ছেদে তাঁহারা কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, আমার তাহা অবগত হইবার বিলক্ষণ সুযোগ রহিয়াছে। বাঙ্গালার সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আপনারাও ইহার পরিচয় পাইতেছেন; তবে যে আন্দোলনের তেমন তীব্রতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, তাহার কারণ, আমাদের ন্যায় তাঁহাদেরও বিশ্বাস আছে, মহামনা পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বে, মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-কালে, ৭০ লক্ষ নিরপরাধ রাজভক্ত বাঙ্গালী প্রজার এই নিরর্থক নিগ্রহ, এই নিষ্কারণ হৃদয়-ক্ষত কখনও স্থায়ী হইবে না। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য আপনারা যে কোন সঙ্গত এবং বৈধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, আপনারা তাহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পূর্ণমাত্র সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পাইবেন।

সাহিত্যের ইতিহাস

আপনারা যখন সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন সাহিত্যের ইতিহাসকে আপনারা উপেক্ষা করিতে পারেন না। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহার ইতিহাস আলোচনা করা যে আপনাদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, এ কথা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইল না। আপনাদের অনেকেই ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত; যাঁহারা বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, ইংরাজীতে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা প্রায়ই দেখা যায় না। যাঁহারা মাতৃভাষায় সাহিত্য-সেবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, জাপানী প্রভৃতি জগতের উন্নত জাতি-দিগের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিতে বিস্মৃত না হন। ঐ সকল জাতি কিরূপে বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের ন্যায় তাঁহাদের সাহিত্যের ইতিহাসেও তাহার আভাস, তাহার মূলসূত্র দেখিতে পাইবেন। এ জন্য ঐ সকল জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-সমুদ্রে অবগাহন না করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে, অনুসন্ধান করিলে ইংরাজী ভাষাতেই ঐ সকল উন্নত জাতির সাহিত্যের ইতিহাস দেখিতে পাইবেন।

অনুবাদ

দেশের ভাষা এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে গেলে অনুবাদ অনিবার্য্য। জগতের যে দেশে যে জাতির মধ্যে যে বিষয়ে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র মানবজাতির অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে, সমস্ত মানব-মণ্ডলী তাহার ফল উপভোগ করিতেছে। বাষ্পীয় যান এবং তাড়িতবার্ত্তা আমাদের দেশের, আমাদের জাতির কেহ আবিষ্কার করে নাই;

কিন্তু বিদেশীর আবিষ্কৃত সেই সম্পদ সুদূর ভারতের সুদূর বঙ্গের এক নিভৃত কোণে থাকিয়া আমরাও তুল্যরূপে উপভোগ করিতেছি। জড়জগতের উন্নতি সম্বন্ধে যে কথা অন্তর্জগতের উন্নতি সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু সেই উন্নতি আয়ত্ত করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। বাষ্পীয়যান এবং তাড়িতবার্ত্তা পাইবার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হয় নাই, পয়সার লোভে বা কার্য্যের সুবিধায় যে গরজ মনে করিয়াছে, সে ঐগুলি বিনা প্রার্থনায় আনিয়া আমাদিগের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছে। ঐগুলি এখন আমাদের দেশের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ, কেননা আমরা সকলেই তুল্যরূপে ঐ সকলের সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছি। যাহা ভোগ করিবার অধিকার বা সুবিধা তুল্যরূপ নহে, তাহাকে জাতীয় সম্পদ বলিতে পারি না। সাহিত্যকে তখনই প্রকৃত জাতীয় সম্পদ বলিতে পারিব, যখন তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ এবং অধিকার জাতীয় আপামর সাধারণ সকলের তুল্যরূপ হইবে। বাষ্পীয়যান এবং তাড়িতবার্ত্তা এদেশে যে ভাবে আসিয়াছে, ইংরাজের সাহিত্য-সম্পদ, সাহিত্যের ইতিহাস সে ভাবে আসিতে পারে না। দেশে সে সম্পদ আনিতে হইলে অনুবাদ দ্বারা মাতৃভাষার ভিতর দিয়া তাহাকে আনিতে হইবে, তবে তাহাতে সকলের অধিকার জন্মিবে, সকলে তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইবে। সত্য বটে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার গুণে এখন আপনারা অনেকেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইতেছেন ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ সকল উপাদেয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া স্বজাতীয় সর্ব্বসাধারণের দ্বারে উপস্থিত করিতে না পারিতেছেন, সে পর্য্যন্ত সে সম্পদ আপনাদের জাতীয় সম্পদ নহে, আপনাদের দেহ-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রভাব এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। যে ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য, যে সাহিত্যের চিত্র, সৌন্দর্য্য এবং প্রভাব উপলব্ধি করিবার জন্য আপনারা বাল্যকাল হইতে এত যত্ন পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদি স্বজাতির উন্নতি করিতে না পারিলেন, সেই কষ্টোপার্জ্জিত সম্পদ যদি স্বজাতিকে উপহার দিতে না পারিলেন, তাহা হইলে আপনাদের সেই কষ্ট, সেই জ্ঞান, সেই আহৃত সম্পদ সার্থক হইল, কেমন করিয়া বলিব ?

হিন্দু-মুসলমান

মাতৃভাষায় এবং মাতৃভাষার সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এবং অধিকার এক। বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে কাহারও স্বার্থ বা অধিকারের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এখানে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান স্বার্থ, সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ। পণ্ডিত এবং মূর্খেরও অধিকার এবং স্বার্থ এক, তবে ভাষার বিশুদ্ধি-সাধনে এবং সাহিত্যের উন্নতিবিধানে পণ্ডিতের অর্থাৎ শিক্ষিতের যে পরিমাণ সুযোগ আছে, মূর্খের সে পরিমাণ সুযোগ নাই, এইমাত্র প্রভেদ।

হিন্দুর ন্যায় অনেক মুসলমানও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ অনেক মুসলমান গ্রন্থকারের গ্রন্থ-বিবরণ ও জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের

ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কতিপয় মুসলমান যুবকের মধুর কবিতা পাঠ করিলে কাহার হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত না হয়? মীর মুশারেফ হোসেনের অগাধ বিষাদদ্রব "বিষাদ-সিন্ধু" পাঠ করিলে কাহার চক্ষে জল না আইসে, কোন্ পাষাণ দ্রবীভূত না হয়? মুসলমান সম্পাদকের সুপরিচালিত, মুসলমান পুরুষ ও রমণীর সুচিন্তিত প্রবন্ধ-মালায় সমলঙ্কৃত "কোহিনূর" যেরূপ উন্নতমস্তকে পদবিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালার সাময়িক-সাহিত্য-সমাজে চলিতেছে, তাহাতে কাহার হৃদয় আশার আনন্দে উৎফুল্ল না হয়? আবার সহৃদয়, সুলেখক, শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী ও সুন্দর-চরিত্র, দরিদ্র মুন্সী তালিমুদ্দীন সরকারের ন্যায় কত উৎসাহী মুসলমান বন-জাত কুসুমের মত লোক-নয়নের অন্তরালে থাকিয়া কেবল জীবন-যুদ্ধেই জীবনান্ত হইতেছেন, আপনার অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটুকু হাস্য, এক বিন্দু অশ্রু, কিম্বা একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও স্বদেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারে রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন না, তাহার গণনা কে করিবে?

কোন কোন মুসলমানের সাধ, বঙ্গ-ভাষার আসনে উর্দ্দু ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা বঙ্গ-ভাষাকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন না, তাঁহাদের অভিধানে বাঙ্গালী-শব্দটি হিন্দুশব্দের প্রতিশব্দমাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন হিন্দুও মনে করিতেন, সংস্কৃতই আমাদের মাতৃভাষা, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যই পাঠের যোগ্য; বঙ্গ-ভাষা কেবল অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী এবং স্ত্রীলোকের ভাষা, কেবল নিত্য-ব্যবহার্য্য বর্ব্বরোচিত ভাষা। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; এখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নের ন্যায় দেশ-পূজ্য পণ্ডিতও বঙ্গ-ভাষাকে অবলম্বন করিয়া আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ বাগ্মিত্বের পরিচয় দিতে কষ্ট, লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই অস্বাভাবিক সংস্কৃত-প্রীতি বা উর্দ্দু-প্রীতি এই প্রান্ত-প্রদেশে প্রবেশ করে নাই;—এই সুদূর নিভৃত উপত্যকাটি অনেক কুবাতাস হইতেই রক্ষা পাইয়া আসিতেছে; ভরসা করি, ভবিষ্যতেও অনেক কুবাতাসই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

সংস্কৃত এবং উর্দ্দু, আমাদের পরম আদরের জিনিস বটে; সংস্কৃত না শিখিয়া হিন্দু, বা উর্দ্দু না শিখিয়া মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সত্য; কিন্তু সুপুত্র যেমন যেখানে যাহা উপার্জ্জন করেন, জননীর হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন, সেইরূপ দেশের যিনি সুসন্তান, তিনি যে ভাষাই অধ্যয়ন করুন, আর হিন্দু বা মুসলমান যে জাতিই হউন, তিনি যেখানে যে সম্পদটুকু পাইবেন, তাহাই যত্ন করিয়া জননী জন্মভূমির সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিবেন, তাহাই দিয়া মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য এবং গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন, আমাদের জননী জন্মভূমি এই প্রত্যাশাই করেন।

ধনবানের সাহিত্য-সেবা

লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ। এ বিরোধ কেবল এ দেশে নহে, সর্ব্বত্র। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী যদি পরস্পর পরস্পরের সপত্নী না হইতেন, তাহা হইলেও এ বিরোধ

থাকিয়া যাইত, কারণ এ বিরোধ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর—ধন এবং জ্ঞানের প্রকৃতিগত।

গল্প আছে, সম্রাট্ তৈমুর যখন সমরখণ্ডের অধিপতি, তখন সেই রাজ্যে একজন প্রসিদ্ধ কবি বর্ত্তমান ছিলেন। কোন রূপবতী রমণীর গণ্ডদেশে একটি তিল-চিহ্ন ছিল, তাহাতে সেই রমণীর সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কবি ঐ রমণীর রূপ বর্ণনা করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এবং বর্ণনার একস্থলে বলিয়া ফেলেন, "আমি ঐ তিলের সৌন্দর্য্যটুকু পাইলে সমরখণ্ডের রাজত্বটা দিয়া ফেলিতে পারি।" কালক্রমে তৈমুর একদিন ঐ কবিতা শুনিতে পাইয়া কবিকে ডাকিয়া পাঠান। কবি উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত আস্পর্দ্ধা যে একটা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে আমার রাজ্যটা দিয়া ফেলিতে চাও?" তখন কবি শান্ত ও বিনীতভাবে যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, 'রাজন! কবিরা চিরকাল এইরূপ অমিতব্যয়ী, তাই তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচে না।"

এই গল্পটার মধ্যে—লক্ষ্মী-সরস্বতীর চির-প্রসিদ্ধ বিরোধের মধ্যে—একটা বিজ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে। যাহারা জ্ঞানের সেবা করে, তাহারা স্বভাবতই ধনকে অসার ক্ষণস্থায়ী তৃণবৎ মনে করে, সুতরাং ধন উপার্জ্জন করিলেও সঞ্চয় করিতে পারে না। আর যাহারা ধনের সেবা করে, তাহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিলেও তাহার আদর করিতে পারে না—পাছে দরিদ্র হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসিতে চায় না। এই হইল সাধারণ নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম অল্প স্থলেই দেখা যায়।

জ্ঞান-সেবকের হৃদয়ে পার্থিব সম্পদের উচ্চাভিলাষ কুত্রাপি দেখা যায় না। কেবল অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তিনি হৃদয়ের অবিভক্ত অনুরাগ জ্ঞান-সেবায়—সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসর্গ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকের ভাগ্যে এই সামান্য অন্ন-বস্ত্রের চিন্তাই সাহিত্য-সেবার ঘোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। অন্ন-চিন্তায় কালিদাসের কবিতাও কুণ্ঠিত হইয়াছিল, অন্নাভাবে সেক্সপীয়রকেও হরিণ চুরি করিতে হইয়াছিল। আর অন্যে পরে কা কথা।

এইখানে ধনবানের একটি কর্ত্তব্য দেখা যাইতেছে। ধনবান বলিতেছেন, জাতীয়-জীবনীশক্তি সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত, সুতরাং জাতীয়মঙ্গলের জন্যই জাতীয়সাহিত্যের পরিপোষণ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত উচিত। প্রত্যক্ষ ভাবে, স্বয়ং লেখনী ধারণ করিয়া যদি সরস্বতীর অর্চ্চনা করিতে পারেন, ভালই; কিন্তু যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে প্রতিনিধি বা পুরোহিতের দ্বারা—যাঁহারা সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের সহায়তাদ্বারা—এ অর্চ্চনা সম্পাদন করিতে পারেন। কত রাজা, কত মহারাজা, বিলাসের ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া, মণি-মাণিক্যে দেহ খচিত রাখিয়া, স্বর্ণ-রৌপ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতে, স্তাবকবর্গের শ্রুতি-মধুর স্তবলহরী শুনিতে শুনিতে ভবনাট্যশালা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারা সকলেই বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, নিজের নামটি পর্য্যন্ত জন-সমাজে

রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু যে সকল সৌভাগ্যশালী ধনী বাগ্দেবীর সেবকদিগকে মুষ্টিমাত্র অন্ন দিয়া সাহিত্য-সেবায় সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানব-স্মৃতিতে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, মানবজাতি কৃতজ্ঞতাভরে আজিও তাঁহাদের নামকীর্ত্তন করিতেছে। সাহিত্য-সেবায় সহায়তা করিলে যুগপৎ দেশের মঙ্গল-সাধন এবং নিজের নামকীর্ত্তন ও যশোলাভ হয়; ক্ষণস্থায়ী সংসারে নশ্বর দেহধারী মানবের পক্ষে ইহা কি সামান্য লাভ?

শ্রীহট্ট-সম্মিলনী

আপনাদের সাহিত্য-সেবার মহানুষ্ঠানে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র কথা যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। উপসংহারে শ্রীহট্ট-সম্মিলনী সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিয়া বক্তব্যের শেষ করিব। শ্রীহট্ট-সম্মিলনী বহুদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে অনেক জেলায় এইরূপ সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের এই সম্মিলনী বোধ হয় তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা শ্রীহট্টের পক্ষে গৌরবের কথা বলিয়া মনে করিতে পারি। আজ আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন, বিবেচনা করিতে গেলে শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য তাহা হইতে অভিন্ন। ভাষাকে এবং সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে কেবল আমাদের যত্নে তাহা সিদ্ধ হইবে না, তাহার জন্য শিশুর ধাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী-স্বরূপিণী জননীকে প্রস্তুত করিতে হইবে। বিপুল-অর্থব্যয়সঙ্কুল স্কুল-কলেজ স্থাপন দ্বারা আর্য্যসমাজে যাহার সম্পাদন অসম্ভব, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী অতি অল্পমাত্র ব্যয়ে, কেবল নিজের উৎসাহ এবং অনুরাগের বলে, সেই দুরূহ অন্তঃপুরশিক্ষার ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন। উৎসাহ এবং অনুরাগে যতদূর সম্ভব, যুবকেরা তাহাই করিতে পারেন; কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ পরামর্শ, যেরূপ ব্যবস্থা এবং যে সামান্য অর্থব্যয় অনিবার্য্য, যুবকেরা তাহা কোথায় পাইবেন? দেশের এবং সমাজের জ্ঞান-বৃদ্ধ নেতৃগণ দূরে দাঁড়াইয়া কেবল তামাসা দেখিলে এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। যুবকেরা এই শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, এই বিনা-বেতনের চাকরি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া আপনাদিগেরই কার্য্য করিতেছেন। আপনারা ইহাদিগের সঙ্গে যোগ দিলে ইহাদিগের উৎসাহ, অনুরাগ এবং কার্য্যকরী শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনারা এই সুযোগ ছাড়িবেন না। ইহারা যে অন্তঃপুর-শিক্ষার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং পরিণত চিন্তা-শক্তির সহায়তা পাইলে ইহারা আজ বহু চেষ্টাতেও যতটুকু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহার শতগুণ কার্য্য করিতে পারিবেন, আমাদের পারিবারিক, জীবনে তাহার শতগুণ-সফলতা দেখাইয়া, শতগুণ মঙ্গল সাধন করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। কর্ণধার-বিহীন তরণীর ন্যায় আজ শ্রীহট্ট-সম্মিলনী বিব্রত। তাহার ভুল-ভ্রান্তি থাকে, ব্যবস্থায় দোষ থাকে, প্রণালীতে ত্রুটি থাকে, আপনারা অগ্রসর হইয়া উপদেশ দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া দিন; কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপে উদাসীন থাকিয়া অথবা ভ্রম-ত্রুটির জন্য তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া এই মঙ্গলকার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন না। আজ আপনাদের উদাসীনতায় ভগ্নহৃদয়

লইয়া যুবকেরা কার্য্য করিতেছে, তাই পদে পদে তাহাদের কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহারা আশানুরূপ ফল পাইতেছে না। আপনাদের সহানুভূতি পাইলে, আপনাদের সহাস্য মুখ দেখিয়া, আপনাদের আশীর্ব্বাদ এবং পদধূলি মাথায় লইয়া যুবকেরা যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহার সুফল সমাজে এবং পরিবারে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনারা আনন্দিত হইবেন। যাহা অনিবার্য্য, তাহার প্রতিকূলতায় কোন ফল নাই, তাহার সুপরিচালনই বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার কার্য্য। আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাহাকে আর জোর করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় যাহাতে সেই শিক্ষা সুপ্রণালীতে এবং সুব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, যাহাতে তাহা কুফলের পরিবর্ত্তে সুফল উৎপাদন করিতে পারে, যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমাদের ভাষা পরিশুদ্ধ এবং সাহিত্য উন্নত হয়, যাহাতে আমাদের বালক-বালিকাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে উন্নত পবিত্র চরিত্র গঠিত হইতে পারে, আপনারা তাহারই ব্যবস্থা করুন, সেইদিকেই মনোযোগ প্রদান করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

মহাভারতী

পুথি পত্র বন্ধ নাহি আজ সাথে
ভাবিয়াছি একবার
পড়িব লিখন, নীলাম্বর পাতে
পুরাবৃত্ত সমাচার।
শুনিব পবনে ভুবন বাহিনী
পুণ্য ভাগবত গান
পড়িব পৃথ্বীর পুরাণ-কাহিনী
শ্যাম শষ্পে দিনমান।
শুনিব ঝর্ঝর বাদল বর্ষণে
মেঘের মাদল রবে,
বজ্র বিদ্যুৎ অস্ত্র ঘর্ষণে
করকাতাড়িত ভবে
মহাভারতের সমর উল্লাস,
শ্রীহরির শঙ্খনাদ,
শরশয্যা পরে ভীষ্মের নিশ্বাস
অভিমন্যু পরমাদ।
ঋতু পর্য্যায় জানাবে শোভায়
অবতার জন্মকথা,
শ্যামের শ্যামল তনুর ছায়ায়
রাধিকা মাধবী লতা!

রুদ্র নিদাঘে রৌদ্র যবে জ্বলে
তীব্র পরশুর মত,
পরশুরামের ব্রহ্মতেজ বলে
হবে পৃথ্বী পরাহত।
করুণা ধারায় প্লাবিয়া ধরায়
বারি ঝরে বরষার
করুণা আধার মনে পড়ে তাঁয়
যিনি বুদ্ধ অবতার।
নির্ম্মল উদার প্রশান্ত সংযত
শরতের নীলাম্বর,
দেখাবে রামের তপস্বীর মত
ত্যাগরিক্ত কলেবর!
কুয়াসা ঝাঁপিয়া আসিবে হিমানী
অশ্রু প্লাবিত বুকে,
কৌরব জননী ধৃতরাষ্ট্র রাণী
গান্ধারী আবৃত মুখে!
স্তব্ধ সংগ্রাম, সাঙ্গ অভিনয়
জীর্ণ পত্র মরমরে,
'মহাপ্রয়াণের জানাবে সময়
রাজ্য ধন তুচ্ছ করে'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ফলিত জ্যোতিষ।

(গল্প)

উপযুক্ত পরিশ্রম সত্বেও বার বার তিনবার এফ্ এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে অদৃষ্টের রহস্যোদ্ভেদে স্বতঃই আগ্রহ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং বিফল মনোরথ অনুকূল যে পড়াশুনা ছাড়িয়া বন্ধুর সাহায্যে "জ্যোতিষরত্নাকরের" রত্নোদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

অনুকূলের পিতৃব্যের ইচ্ছা ছিল যে যখন অনুকূলের পক্ষে জননী সরস্বতীর মন্দির-প্রবেশের পথে এমন একটা দুরতিক্রম বাধাই উপস্থিত হইল তখন দ্বারে বসিয়া সময় নষ্ট না করিয়া অনুকূলের পক্ষে তাঁহার সপত্নীর প্রসাদ লাভের চেষ্টা করাই সুব্যবস্থা। কিন্তু "প্রত্যক্ষফলপ্রদ" জ্যোতিষ শাস্ত্রের আস্বাদ লাভ করিয়া অনুকূল পিতৃব্যের কথায় কর্ণপাত করিল না।

অধ্যবসায়শীল অনুকূল অল্প দিনের মধ্যেই 'লগ্নমান' 'পতাকীচক্র', 'গ্রহবলাবল', 'সপ্তবর্গসাধন' 'গ্রহগণের শত্রুমিত্র কথন প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বন্ধু সাহায্যে আয়ত্ত করিতে লাগিল। "ভাবস্ফুট" "ভাবসন্ধি" প্রভৃতি সূক্ষ্ম গণনাও তাহার অপরিচিত রহিল না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ফল নির্ণয় করিতে গিয়া অনুকূলের দ্রুত উন্নতি কিছু বাধা পাইল; তাহার জীবনে প্রত্যক্ষ লব্ধ ফলের সঙ্গে কোষ্ঠী নির্দ্দিষ্ট ফলের কেমন যেন একটা "নৈসর্গিক শত্রুতার" ভাব দেখা যাইতে লাগিল। যে মাসে সে ধন লাভের "যোগ' দেখিল, সেই মাসেই রজক তাহার মূল্যবান কোটটাকে ছিঁড়িয়া লইয়া আসিল এবং যে মাসেই সে "স্ত্রীলাভের" সম্ভাবনা দেখিয়া শ্বশুরালয় গমনের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া রহিল সেই মাসেই তাহার শ্বশুর মহাশয় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। "যান বাহনের শুভযোগে"র ফলেত বেচারাকে এক সপ্তাহ শয্যাতেই থাকিতে হইল। মানলাভের পরিবর্ত্তে রায় মহাশয়ের দ্রুত চালিত "টম্‌টম্" তাহার পায়ের অঙ্গুলির উপর দিয়াই চলিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের "প্রত্যক্ষ ফলের" প্রতি কিছু সংশয়সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অনুকূল জ্যোতিষ শিক্ষা ব্যাপারে কেবলমাত্র বন্ধুর উপর নির্ভর করিতে পারিলনা। সে উপযুক্ত গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একদিন বসন্ত সায়াহ্নে তাহার অন্ধকার জীবনে জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুবতারার মত এক তেজঃ পুঞ্জ সন্ন্যাসী যেন তাহারই প্রতি কৃপা করিয়া কল্যাণপুরের বটবৃক্ষতলে দর্শন দিলেন। সন্ন্যাসীর কাছে সে শুনিল—তন্ত্র, ও জ্যোতিষ শাস্ত্র যাহা কিছু আছে তাহা তিব্বত এবং নেপালেই আছে; গুরু কৃপাব্যতীত সে বিদ্যা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু-কৃপালাভ সময়সাপেক্ষ জানিয়া অনুকূল আপাততঃ নিজের জীবনের

ফলাফলটা জানিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া একদিন সন্ন্যাসীকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিল। সন্ন্যাসী অনুরুদ্ধ হইয়া একান্তভাবে তাহার জন্মকুণ্ডলী, কররেখা এবং ললাটফলক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; ক্ষণমধ্যেই সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন "অতিপ্রবল রাজযোগে তোমার জন্ম। ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট এইযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তোমার জীবনে অতুল সম্পদ এবং অসীম উন্নতি অপরিহার্য্য।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া অনুকূল বলিল "ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত কবে হইতে?" সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন "চৌত্রিশ বর্ষ সাত মাস একুশ দিনে তোমার ভাগ্যারম্ভ। এই প্রবল উন্নতি আমরণ স্থায়ী হইবে।"

সপ্তাহান্তে সন্ন্যাসী গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। নবোদ্যমে অনুকূল "শঙ্কুনির্ম্মাণ" "সর্ব্বদেশীয় লগ্নমান আনয়ন" "রবিভুক্তি" "সপ্তশলাকা বিচার" প্রভৃতি গভীর গবেষণায় চিত্ত সমর্পণ করিল।

অনুকূলের সৌভাগ্যখ্যাতি দেখিতে দেখিতে গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। যুবতীগণ দলে দলে আসিয়া অন্তরাল হইতে অনুকূলকে দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়া গেলেন। বালিকারা আসিয়া তাহাকে মালা পরাইয়া গেল। প্রবীণারা মুক্ত কণ্ঠে তাহার রূপগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবকেরা তাহাকে বন্ধুভাবে পাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে জানাইয়া গেলেন যে তাহার জন্য নিতান্ত নিষ্কাম ভাবে তিনি আজ এক বৎসর কাল নারায়ণকে তুলসী দিয়া আসিতেছেন এবং কবিরাজ মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গেলেন যে তিনি যে এতদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রমে ১০০৲ টাকা ভরির "ষড়গুণবলি জারিত মকরধ্বজ" কাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন তাহা এইবার গ্রামের অদূরদর্শী লোকেরা অচিরেই জানিতে পারিবে।

এইরূপে চারিদিক হইতেই যখন অনুকূলের আসন্ন সৌভাগ্য সূচিত হইতেছিল, সেই সেই সময়ে অনুকূল তাহার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া ধৈর্য্য হারাইল।

অনুকূলের শ্বশুর মাখন লাল চক্রবর্ত্তি পুলিস বিভাগে দারগার কাজ করিতেন। সুতরাং মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার একটা স্বভাবগত অনাস্থা জন্মিয়াছিল। জামাতার ভাবী সৌভাগ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান দারগা সহসা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি তাঁহার অধীনস্থ একটি জমাদারের পদ শূন্য হওয়ায় জামাতাকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার বিবেচনায় আপাততঃ অনুকূলের সেই পদটি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পুলিস বিভাগে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি আছে তাহাতে অনুকূল একবার এ কার্য্যে প্রবেশ করিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাহাকে দারোগার পদে উন্নীত করিয়া দিতে পারিবেন। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া এ বয়সে অলস ভাবে বসিয়া থাকা উচিত

নয়। রাজত্ব হাতে আসিলে চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন ব্যাপার নহে, কিন্তু একবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেলে চাকরি পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ভবিষ্যতে অতুল সমৃদ্ধির অধীশ্বর কোন্ ব্যক্তি এরূপ পত্র পাইয়া ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? অনুকুল—অতুল সম্পদের অধিকারী, অসীম উন্নতির সাধক—অনুকুল ১০৲ টাকা বেতনের জমাদারের পদ গ্রহণ করিবে? এরূপে তাহার মানহানি করিবার অধিকার কাহারো আছে? অনুকূল পত্র হাতে করিয়া গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"দেখ দেখি একবার তোমার বাবার আক্কেল! আমাকে কি না জমাদারের কাজ করতে লিখছেন। আমাকে এ রকম করে অপমান করার কি প্রয়োজন ছিল?"

পত্নী তিলোত্তমা ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীর অগ্রদূত রূপে স্বামীকে উপর্য্যুপরি দুই কন্যা উপহার দিয়া আপনার মাতৃত্বের অধিকার পাকা করিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বোধ হয় পিতার অবিশ্বাসও তাঁহার চিত্তে কিয়ৎপরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল; সুতরাং পত্নী স্বামির তর্জ্জনে ভীত না হইয়া বধুজনোচিত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া হাসিয়া বলিলেন "রাজ্য লাভের ত এখনো ৭ বৎসর দেরি; তৎদিন "তরুতলে" রাজত্ব না করে কোন একটা কাজ কর্ম্ম করলে এমনিই বা কি ক্ষতি?"

অনুকূল আর সহ্য করিতে পারিল না। সেইদিনই সে খুড়িমাকে বলিয়া পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিল।

কন্যার মুখে সকল কথা শুনিয়া মনুষ্য চরিত্রজ্ঞ মাখন বাবু বলিলেন "তা হলে বাবাজির অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে দেখচি।"

সুখে দুঃখে আশায় নিরাশায় পাঁচবৎসর কাটিয়া গেল। গ্রামের বারোয়ারি পুজার অবসানে অনুকূলের কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা বন্ধু তাহাকে বলিল—"ভাই তোমার শুভদিন ত নিকট হয়ে এলো। এই সময়টা দিনকতক আমোদ করলে হয় না?"

বন্ধুবৎসল অনুকূল কহিল "বেশত, বল কি করতে চাও।" বন্ধুরা বলিল—"যাত্রার দল করলে হয় না? যাত্রার দলে যেমন পয়সা তেমনি আমোদ। মতিরায় ত যাত্রার দল করে, রীতিমত জমিদারি করে গেল! দিব্যি এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ান যাবে। খাওয়া দাওয়ারও জুত আছে। কি বল ভাই? রাজার পার্ট তোমার বাঁধা রহিল।" কথাটা তাহারও নিতান্ত মন্দ লাগিলনা। যতদিন আসল যাত্রা না হওয়া যায় ততদিন রাজার পার্ট করিয়া চালচলনটা পাকা করিয়া লইলে ক্ষতি কি? মাসখানেকের মধ্যে সে উদ্যোগী বন্ধুবর্গের সাহায্যে পৈতৃক জমি জমা বাঁধা দিয়া এবং মহাজনের কাছে হাণ্ডনোট কাটিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ করিল।

উদ্যোগ পর্ব্বটা পরম উল্লাসেই কাটিয়া গেল। 'ছোকরা' সংগ্রহ, গায়ক বাদক পরীক্ষা, পোষাক খরিদ প্রভৃতি ব্যাপারে দিনগুলা নদীর খরস্রোতের মত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিল।

কিন্তু অবশেষে যমন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল তখন দেখা গেল যে সংগৃহীত

মূলধন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, শুনিয়া বিস্মিত অনুকূল বলিল—সে কি? তাহলে দল চলিবে কি করে? উদ্যোগী মন্মথ বলিল আর সে জন্য ভাবনা নেই। সুমুখেই আশ্বিন মাস। দুটো একটা বায়না জুটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" অনুকূল বলিল "সে কি মন্মথ? এখনো গান বাজনা কিছুই ঠিক হয়নি। এ অবস্থায় বায়না পেলেই বা নেবো কি করে?" চতুর মন্মথ হাস্য করিয়া বলিল—সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। সে ভার আমার উপর রইল, তুমি কেবল হরিশ্চন্দ্রের পাঠটা ঠিক করে নাও।"

বন্ধুর উৎসাহে আনন্দিত অনুকূল সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া নির্জ্জন প্রান্তরে অপরাহ্নের সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া 'হা বিবস্বান হায় সূর্য্যবংশের কুলপতি—আজ এখনি উদিত হ'লে! নিজের অকৃতী সন্তানের সর্ব্বনাশ দর্শন করতে তোমার এত আগ্রহ কেন দেব?"—বলিয়া প্রাণপণে আপনার "পার্ট" মুখস্থ করিতে লাগিল।

৪

মন্মথনাথের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহে—অনুকূলের "দলের" এক বায়না জুটিল। গন্তব্যস্থান পদ্মাপারের এক জমিদার গৃহ। পরম উৎসাহে নূতন হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিয়া অনুকূলের যাত্রার দল বিস্মিত গ্রামবাসীর নিমিষহীন নেত্রের উপর দিয়া কল্যাণপুরের ঘাটে নৌকারোহণ করিল। বেচারা অনুকূল সমস্ত পথ 'পার্ট' মুখস্থ করিতে করিতে চলিল এবং অবসর মত "হরিশ্চন্দ্রের" দাঁড়াইবার, রোদন করিবার ভাবভঙ্গী কিরূপ হইলে ঠিক স্বাভাবিক হয় মনে মনে তাহাই ভাবিয়া লইতে লাগিল।

তিন দিনের পর অবসন্নদেহে প্রজ্জ্বলিত জঠরে মুমূর্ষু মানবসন্তানগুলি "মৌন, মূক ধীরা মাতৃভূমির" তটলাভ করিয়া আশ্বস্ত হইল। গ্রামের লোকে পরম সমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া জমিদারের সুবৃহৎ গোশালায় তাহাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল।

নিশীথরাত্রে মোটা চাউলের অন্ন, জলবৎ তরল দাইল এবং মশক সঙ্কুল, গোমূত্র সুরভিত গোশালার তৃণ শয্যায় শয্যাগ্রহণ করিয়া অনুকূলের সৌভাগ্য গর্ব্ব অনেকটা লঘু হইয়া আসিল।

তাহার পর রাত্রি দুইটা বাজিতে না বাজিতেই যখন গ্রামের অবশিষ্ট দলপতিগণ, নাসিকা গর্জ্জন সহকারে নিদ্রা দিবার জন্য তাহাদের ডাকিয়া আনা হয় নাই বলিয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া দিল এবং অনুকূল তাহাদের অভদ্রতায় প্রতিবাদ করিবা মাত্র যাত্রার দলের লোকদের পৃষ্ঠের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য তীব্র আকাঙ্খা প্রকাশ করিল,তখন হতভাগ্য অনুকূলের পক্ষে শুভাদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে এবং অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সে শয্যা ত্যাগ করিল।

রাত্রি তিনটা হইতে যাত্রা আরম্ভ হইল।

একেই পার্ট, ভাল করিয়া তৈয়ারি হয় নাই, তাহার উপর পথশ্রমে এবং অনিদ্রায় সমস্তই আরও গোলমাল হইয়া

গিয়াছিল; সুতরাং যাত্রা করিতে গিয়া অভিনেতারা আপনাপন ভূমিকা ভুলিয়া গেল, বালকদের ঐক্যতান সঙ্গীত তাল ও রাগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিল না, ঢোল "চপচপ" করিতে লাগিল এবং "ছড়ি" লাগাইবা মাত্র বেহালা করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবামাত্র গৃহস্বামী"অধিকারী"কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কম্পিত বক্ষে অনুকূল গৃহস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিই এ দলের অধিকারী?" অনুকূল নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বাবু বলিলেন "আজ ৩০ বৎসর আমাদের বাটীতে যাত্রা হইতেছে কিন্তু এমন সুন্দর যাত্রা কখন শুনি নাই। আমার ইচ্ছা আপনাকে এজন্য উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করি।

অধিকারীর পুরস্কারের ব্যবস্থা দেখিয়া দলের লোক "যঃ পলায়তি স জীবতি" ভাবিয়া যে যেখানে পাইল সরিয়া পড়িল।

তৃতীয়-দিন নিশীথরাত্রে বিদীর্য্যমান হৃদয়ে অবসন্ন সর্ব্বস্বান্ত অনুকূল চোরের মত আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যসুখ তাহার ভাগ্যে ঘটিবার পূর্ব্বেই ভাগবিপর্য্যয়ের অঙ্কটা অভিনীত হইয়া গেল। এখন অনুকূলের আশা—হরিশ্চন্দ্রের প্রথম অঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যসুখ বুঝিবা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেই অনুকূল অবস্থার জন্য অনুকূল আশাপথ চাহিয়া রহিল।

৫

কিন্তু —

'আশাপথ চেয়ে চেয়ে দিন ত ফুরায়ে গেল!'

ভাগ্যোদয়ের শুভদিন অতীত হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য অনুকূল আর একবার ভাল করিয়া জন্মনক্ষত্রের "ভোগ্যদণ্ডের পরিমাণ" এবং গ্রহগণের চক্র ও মন্দগতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কোন ত্রুটি বুঝিতে পারিল না।

মহাজনেরা ইতি পূর্ব্বেই তাহার বিরুদ্ধে একতরফা ডিগ্রি কবিয়া লইয়াছিল।

শ্বশুর জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছিলেন— "স্মরণ করিও যে তোমার স্ত্রী কন্যাকে গ্রহণ করা না করা একমাত্র তোমর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অধীন নহে। তোমার পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ করিতে তুমি আইনতঃ বাধ্য। অতএব যদি তুমি সত্বরে তোমার হীন চরিত্র বন্ধু বান্ধবের কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী কন্যাসম্বন্ধে সুব্যবস্থা না কর, তাহা হইলে আমি অধিক দিন তোমাকে জামাতা বলিয়া ক্ষমা করিতে পারিব না।"

পিতৃব্য জানাইয়াছিলেন যে তিনি প্রাচীন হইয়াছেন, চিরকাল সংসারে জড়িত থাকিয়া পরকালের পথে কণ্টক রোপন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার ইচ্ছা আগামী বৈশাখের প্রথমেই তিনি বৃন্দাবন বাস করেন।

চারিদিক হইতে এইরূপে বিপন্ন হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে অনুকূল চিন্তামগ্নচিত্তে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল।

তবে কি অনুকূলের অদৃষ্ট বলিয়াই জ্যোতিষও প্রতিকূল? ফলিত জ্যোতিষও ফলে না?

সহসা জ্যোৎস্নালোকিত বৃক্ষতলে পূর্ব্বদৃষ্ট সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "তোমারি নাম অনুকূল না? আমাকে তোমার কোষ্ঠি দেখাইয়াছিলে?" অনুকূল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল "আজ্ঞা হাঁ।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "এইখানে বস। আমি তোমার জন্য আবার এখানে আসিয়াছি। আমি তোমার 'রাজযোগে'র, কথা বলিয়াছিলাম না? আমার গণনায় কিছু ভ্রম হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া জ্যোতিষ-চর্চ্চা করি নাই। গতবৎসর একদিন হিমালয়ে বসিয়া ঝুলির মধ্যে কি খুঁজিতে খুঁজিতে তোমার লগ্নকুণ্ডলীটী বাহির হইয়া পড়িল। আর একবার ভাল করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম 'ভাবস্ফুট' সম্বন্ধে সামান্য একটু ভ্রম হইয়াছে।" রুদ্ধ নিশ্বাসে কম্পিত বক্ষে অনুকূল বলিল "কি ভ্রম, ঠাকুর?" সন্ন্যাসী বলিলেন "আর কিছু নয়। তোমার তুঙ্গী বৃহস্পতি 'ভাগ্যাধিপ" না হইয়া "অষ্টমাধিপ" হইয়াছেন। ইহার ফলে তোমার "রাজযোগ" ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু রাজযোগ ভগ্ন হইলেও তোমায় কোষ্ঠিতে অতি প্রবল 'তীর্থমৃত্যু' যোগ ঘটিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ তীর্থে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই পথ দিয়া ত্রিবেণী যাইতেছিলাম, মনে করিলাম তোমার সংবাদটা দিয়া যাওয়া ভাল।"

শুনিবামাত্র সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুকূলের চক্ষে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া উঠিল। অনুকূল ব্যথিত মস্তিস্ক স্থির করিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তবুও জ্যোতিষশাস্ত্র যে মিথ্যা নয় ইহা বুঝিয়া কতকটা সে সোয়াস্তি অনুভব করিল।

প্রহরাতীত রাত্রে অনুকূল গৃহে পৌঁছিয়া শুনিল আদালতের পেয়াদা সন্ধ্যা হইতে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই পেয়াদা তাহার হাতে এক 'নোটিস্' দিল। 'নোটিসে' কেন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে না তাহারই কারণ দেখাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ ছিল।

সমস্তরাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া সকল দিক ভাবিয়া দৈববিড়ম্বিত অনুকূল সন্ন্যাসী বেশে কাশী যাত্রাই এ অবস্থায় একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল।

পরদিন হইতে আর অনুকূলকে কল্যাণপুরে দেখা যায় নাই। তাহার অদৃষ্টে "তীর্থমৃত্যু" ঘটিয়াছিল কি না সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে তাহার বৃদ্ধা পিশি আক্ষেপ করিতেন—যাত্রায় রাজা সেজেই তাঁর অনুকূলের রাজযোগ খণ্ডে গেল। আর, যাঁরা তাঁর ছেলেকে সখের রাজা সাজাইয়াছিল, তারাই যত নষ্টের মূল ভাবিয়া বৃদ্ধা কেবলি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

জ্ঞানদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমরা জ্ঞানদাসের নৌকা-বিহার ও রাসলীলা-সম্বন্ধীয় পদগুলিতে গূঢ় অগূঢ়, এই দুই প্রকার ব্যঙ্গের অনেক পরিচয় পাইতে পারি। কেবল শব্দ-ব্যঙ্গ নয়, অর্থব্যঙ্গও সে গুলিতে অনেক আছে।

কর্ণধারবর চড়িয়া তরণীপর
আওল রাইক পাশ।
চড় সভে পারে উতারব এখন
কছু নাহি ভাব তরাস॥
মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়
কখন না জানে কাল, বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥
নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবিহ বিষাদ॥

"নৌকা বিহারের ও রাস-লীলার" মধ্যে যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এখানে তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই. কেবল নৌকা-বিহারবিষয়ক আর একটী পদ এই খানে উদ্ধৃত করিব। এই পদে শুধু শব্দের ও অর্থের ব্যঞ্জনাশক্তিই প্রকাশিত হয় নাই, ছন্দের আত্মপ্রকাশিকা শক্তিও বিশেষরূপে উদাহৃত হইয়াছে।

একি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা।
জীরণ শীরণ আয়স ভিন্ন
অতি পুরাতন না॥
অথির নীর গভীর ধীর
অগাধ নাহিক যা।
বিধিব ঘটন আসিয়া পবন
উপজিল বহু বা॥
পাইয়া আশ্রয় দিয়া জয় জয়
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল হিল্লোল কল্লোল
দেখিয়া হাসিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে
চল কল স্রোত সা।
জ্ঞানদাসের কেবল ভরসা
ও রাঙ্গা দুখানি পা॥

এ সকল শ্রীরাধার উক্তি; পবন চঞ্চল, কাল যমুনার জলে শ্রীরাধার জীর্ণ তরী হেলিতেছে দুলিতেছে, যমুনা গভীর—অস্থির অগাধ জল অবসর পাইয়া কল্লোল তুলিয়া হিল্লোল সৃজন করিয়া খর স্রোতে বহিয়া যাইতেছে; একটা বিপদ-সঙ্কুল অথচ সুন্দর দৃশ্য আমাদের নয়নের কাছে উদ্ভিন্ন হইতেছে। দৃশ্যটী করুণ, কিন্তু ইহা সৌন্দর্য্য-রসদ্বারা আর্দ্রীকৃত। তাহার উপর ভক্তির একটা সুন্দর আবরণে কবি ইহার ভয়ানকত্ব ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। আমি

বলিয়াছি যে এ সকল চিত্রে একটা গূঢ় ভাব নিহিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে সেই ভাবটা পরিস্ফুট হয়; কবি তাহার মধ্যেও শব্দ-ব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গের অবতারণা করিয়া রহস্য-জালে আবৃত করিয়া তাহাকে আরও মনোরম করিয়াছেন।

করে তুলি কেলি করি ডুবিল ডুবিল তরী
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড় তরঙ্গ হইল বড়
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
একূল ওকূল দুকূল নিরাকুল
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেতে নহি রয়॥
এত দিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড় যৌবন পাতল কর—
তবে জে বাহিয়া যাইতে পারি॥

নৌকা-বিহারের শেষ পাদ এতৎসম্বন্ধীয় পদাবলীর তাৎপর্য্যার্থ কবি নিজে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন ঃ—

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তব আগে কি ছার যমুনা।
চরণ তরণী যার যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ হইয়া পড়ে। বাসনার বোঝা না নামাইতে পারিলে জলস্রোতে যে তরণী ডুবিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে "যৌবন পাতল" করিতে বলিয়াছেন। যৌবনেই বিষয়-বাসনা, ভোগ-বাসনা প্রবল হইয়া দাঁড়ায়; তাই বিষয়-বাসনা বোঝাইবার জন্য "যৌবন" শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। শব্দের লক্ষণাশ্রিত ব্যঞ্জনা-শক্তির পরিচয় এই স্থানে ভালরূপে আমরা পাইতেছি। দানলীলায় উপস্থিত হইয়া আমরা ইহার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইব। একটা মাত্র উদাহরণ দিলেই চলিবে।

অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আবার লাজে॥

ঐ চারিটী ছত্রের মধ্যে অনেক সুন্দর ভাব লুকাইত আছে, 'খসাইয়া' দেখিতে পারিলে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রথম সাদাসিদে অর্থটাই দেখা যাউক। অবশ্য সে অর্থ আজকালকার রুচির সম্পূর্ণ অনু-মোদিত হইবে না, না হইলেও কবির বাক্য-রচনা-শক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা তাহা বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। কেবল বাক্যার্থ ধরিলে এই বুঝিতে হইবে যে দানী সন্দেহ করিতেছে যে যাত্রীর হৃদয় মধ্যে কোনও ধন গুপ্ত আছে, তাই সে তাহা খুলিয়া দেখিতে চাহে। আজকালকার Octroi officerরা যেমন যাত্রীর সমস্ত বাস্ক পেটরা খুলিয়া দেখিয়া লয়, ইহাও এক রকম সেইরূপ দেখিবার দাবী। কিন্তু আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কবির অভিপ্রেত অর্থ অন্য রকম; তিনি শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তিদ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে কৃষ্ণ রাধিকার বসনাবৃত স্তনযুগল দেখিতে চাহিতেছেন। এই ত গেল সহজ ব্যঞ্জনা;

যদি কবি জ্ঞানদাস বৈষ্ণবকবি না হইয়া সাধারণ কবি হইতেন, তাহা হইলে ইহার অধিক আমরা আর কিছু দেখিতে বা বুঝিতে চাহিতাম না। কিন্তু আমরা জানি যে জ্ঞানদাসের গীতি ইতর ইন্দ্রিয়পরায়ণের গীতি নহে, তুচ্ছ কামগাঁথা নহে। যদি তাহা ভাবিতাম তাহা হইলে জ্ঞানদাসের পদাবলী লইয়া এতটা বকাবকি করিতাম কি না সন্দেহ। অতএব এই চরণ কয়টীর যথার্থ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। আমরা এখন যে অর্থ করিব তাহাও শব্দপ্রয়োগচাতুর্য্য-ব্যঞ্জক এবং সেই জন্যই এই স্থলে সে ব্যাখ্যার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদিগকে এই স্থলে বৈষ্ণবকবির যথার্থ স্বরূপের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, নচেৎ এ চরণের অর্থ পরিস্ফুট হইবে না। বৈষ্ণবকবির কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রণয়ীপ্রণয়িনী মাত্র নহেন, তাঁহাদের কাছে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এবং রাধা ভক্তিময়ী—ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ; শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা —শ্রীরাধা জীবাত্মা। এইটুকু মনে রাখিয়া উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেই উহার তাৎপর্য্য আর ঢাকা থাকিবে না। কবি "দানলীলা" বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা জীবাত্মার কাছে তাঁহার প্রাপ্য দান বুঝিয়া লইতেছেন, ভগবান্ ভক্তের কাছে আত্মসমর্পণরূপ দান গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি দেখিয়া লইতে চাহেন যে ভক্ত তাঁহাকে কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে, কত খানি আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে। ভগবান্ বুঝিতেছেন যে এই জীবাত্মা এই ভক্ত তাঁহারই অন্বেষণে ঘরের বাহির হইয়াছে. ইহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির, ভগবানে আত্মসমর্পণের আত্যন্তিক আগ্রহ বিরাজমান রহিয়াছে ; ভক্তিরূপ মুক্তা তাহার হৃদয়ে ঝলকিতেছে, তাই তিনি বলিতেছেন—

অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে।

যখন ভক্ত প্রথম ভক্তির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার অনেক বাধাবিপত্তি উপস্থিত হয় ; তখন তাহার মন একদিকে সংসারের টান আর দিকে ভগবানের টান, এই দুই বিপরীতমুখী বৃত্তির মধ্যে পড়িয়া সংশয়ে দোলায়মান হয়। সংসার বলে আমাকে ঠেলিয়া কোথায় যাও, আমিই তোমার সব, আবার ভক্তি বলে তুমি এ কি করিতেছ, তুচ্ছ সংসারমোহে পড়িয়া আসল জিনিষ অবহেলা করিতেছ। এইরূপ দ্বিধা-ভাবাপন্ন হইয়া জীবাত্মার হৃদয় সংশয়াকুল হয়। সে সংসারও ছাড়িতে পারে না, অথচ ভগবান্‌কে ছাড়িবার প্রবৃত্তি তাহার হয় না। যতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাহার অনেক লুকোচুরি থাকে, অনেক বিমিশ্র ভাব থাকে, লজ্জা ঘৃণা ভয় তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে! এমন অবস্থায় সংসারাসক্তি আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে, 'নহু কুলটা হম বর কুলকামিনী নিকটে ইত্যাদি।" তখন মনে হয় যে ভক্তির প্ররোচনা সকল বুঝি খাঁটি নয়, এমন সংসারকে কি ছেনা যায়? ভগবানের বাক্য তখন "ইহ সব কুবচন" বলিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছাও না জাগে তাহা নহে। নব অনুরাগ জাগিয়াছে, আমার তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা

হইতেছে না, সংসারানুরাগরূপ বসনে তাহা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে তাই হৃদয়ের যে অমূল্য রত্ন ভক্তি তাহা হৃদয়ে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ভক্ত অমূল্য রতন গোপন করিয়া হিয়ার মাঝে রাখিয়াছে।

কিন্তু দাসী আজ আর তাহা গোপন করিয়া রাখিতে দিবেন না।

যৎ করোষি যদশ্নাসি
যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়
তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

যদি আমাকে পাইতে চাও, তবে আমায় সব অর্পণ কর, ইহাই তাঁহার চিরদিনের প্রতিজ্ঞা। কথায় বলে 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকৃতে নয়।' শ্রীরাধার হৃদয়ে এখনও এই তিনই বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি কৃষ্ণ প্রেম চাহেন, কিন্তু সেই প্রেমে এখনও আত্মহারা হইতে পারেন নাই, এখনও সংসারের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি রহিয়াছে ;—ভগবানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আবার সংসারের প্রতিও অনেক প্রকার আসক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে। ভগবদাসক্ত জীবকে লোকে পাগল বলে, সাংসারিক লোকে "কুল" বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই কুলরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। জীবাত্মার এই মোহ ভাঙ্গে কিসে ? ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন ঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের মায়াবরণ ঘুচাইয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে প্রস্তুত। তবে তাঁহার সেই কৃপালাভের জন্য ভক্তকেও সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, কিছু ঢাকিলে চলিবে না, পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ভক্ত যদি নিজের ভাল চায়, তবে তাহার হৃদয় কোনও প্রকার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে না ; যদি সে, হৃদয়ের সমস্ত ভাব, সমস্ত বৃত্তি ভগবচ্চরণে ঢালিয়া দিয়া লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে, যদি সেই মহাদানীকে সমস্ত দান করিতে পারে তবেই তাহায় শ্রেয়ঃ ; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরূপিণী নিজের রসাস্বাদগ্রাহিণী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি আনন্দময়ী শ্রীরাধাকে সেই লজ্জা ভয় ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, সংসারানুরাগরূপ বসন খসাইয়া তাঁহার হৃদয়ে কি কি মহাভাব আছে তাহাই দেখাইতে বলিয়াছেন—

নিজ ভাল চাহ খসাইয়া দেখাহ

কিন্তু এই যে খসাইয়া দেখান, এ কি সহজ গা ? মানুষ সব করিতে পারে, কিন্তু সংসারের নিন্দাস্তুতিকে অবহেলা করিতে পারে না। তাই মানুষ সর্ব্বদা আত্মগোপনে তৎপর, যতক্ষণ না ভগবৎকৃপায় ভগবানে সম্পূর্ণরূপ আত্ম নিবেদিত হয় ততক্ষণ সে কিছুতেই সাংসারিক লজ্জা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু এ লজ্জা না ছাড়িলেও তো ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নাই ; তাই শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ, চরম প্ররোচনা—

ইথে কি আবার লাজে ?

হয় তো ইহাতেও ফল ফলিতে না পারে ; তাই 'দুই বাহু পসারি' ভগবান্ তাঁহার পথ আগলাইলেন। যদি এ পথে আসিয়াছ

তবে আমাকে ছাড়াইয়া আর যাইও না,—যাইতে পারিবে না, আমার দান আমাকে দিয়া যাও। কয়টী ছত্রে কবি জ্ঞানদাস একটা মহান্ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু সেই ভাবরূপ অমূল্য রত্ন তাঁহার বাক্যের হৃদয়ের মাঝে গোপন ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে আমাদের খসাইয়া দেখিতে হইবে—"ইথে কি আবার লাজে"। হয় তো অনেকে ইহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মনে করিয়া গায়ে জ্বরের প্রকোপ অনুভব করিবেন, কেহ বা এই চরণের ভিতর হইতে এ ব্যাখ্যা আসিতে পারে তাহা ভাবিতেও পারিবেন না. কেহ চরণটীকে অশ্লীল ভাবিয়া মুখ ফিরাইবেন। যে যে ভাবেই ইহাকে গ্রহণ করুন্ কেহই কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, এই চরণে কবি বাক্যের ব্যঞ্জনা-শক্তির নিপুণ ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা জ্ঞানদাসের শব্দপ্রয়োগ পরিচয় দিতে গিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর মূলসূত্রে আসিয়া পড়িয়াছি—সময়ে এই সূত্রের অনুসরণ করিব; আপাততঃ তাঁহার পদাবলীর সম্বন্ধে অপরাপর কথা বলিয়া লই। এখনও আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীর ভাব সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার অবসর পাই নাই, অতঃপর তাঁহার ভাবের পরিচয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

ফোয়ারা *

(সমালোচনা)

বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর শ্রীললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্তার এই পরিচয়, পুস্তকের কভারেই পাওয়া যায়! পুস্তকের ভিতরে একস্থানে কোকিল প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা নিজের অন্যরূপ পরিচয় ইঙ্গিতে দিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। † গ্রন্থকারের বাকী পরিচয় গ্রন্থখানিই দিবে; আর দিবে তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাসমূহ! আমরা এখন পুস্তকখানির কিছু পরিচয় দিব।

গ্রন্থকারের মতে দুইটি কারণে সচরাচর গ্রন্থকারগণ পুস্তক প্রকাশ করেন,—একটি সুকুমার মতি বালকবালিকাগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে দ্বিতীয়টি বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে।" কথাটা সত্য বটে. এ যেন কতকটা বৃদ্ধ জননীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে, তৃতীয় পক্ষে দার পরিগ্রহ,—অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মেয়েদের মানুষ করার লোকাভাবে বাধ্য হইয়া বিবাহরূপ গলগ্রহ করা!

নিবেদনে গ্রন্থকার বলেন এই দুইটির কোন কারণেই তিনি গ্রন্থ * প্রকাশ করেন নাই। শুধু তাঁর মনের তৃপ্তির জন্য! আরও একটা কারণ এখানে বলেন নাই, কিন্তু

* শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স হইতে প্রকাশিত।

† ফোয়ারা ১৫৯ পৃঃ ১০ম লাইন।

* অন্ততঃ এ পুস্তক।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই সঙ্কোচের সহিত নিবেদনের প্রথমেই বলিয়াছেন—'বালুকা কঙ্করময় মরুভূমিতে স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে, শিক্ষকের শুষ্ক জীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে; এই ফোয়ারায় আধি ব্যাধি শোক তাপ ক্লিষ্ট সংসার-পথিকের একদণ্ডের তরেও কি শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইবে না?'

গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি "গ্রন্থকারের এই আশায় আশঙ্কার কোন কারণ নাই! তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশ সার্থক হইয়াছে।

কথা উঠিতেছে, শিক্ষকের জীবন কি শুষ্ক! যে জীবন শত শত জীবনকে সরস করিয়া দেয়, তাহা কি শুষ্ক! হিন্দুর আদর্শ বাল-বিধবা, যিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সংসারে বহু জীবনকে সুখ শান্তিময় করিয়া রাখেন সেই বিধবার পবিত্র জীবন কি শুষ্ক? অন্যের পক্ষে যাহা সরস, নিজের পক্ষে তাহা সেরূপ না হওয়া কি অসম্ভব? কিন্তু সে অনেক কথার কথা! ইহা তর্কের বিষয় নহে, অনুভবের। শিক্ষকের জীবন অনেকটা হিন্দুর ঘরের বাল-বিধবারই মত, কিন্তু এ প্রসঙ্গ তুলিয়া, গ্রন্থের সমালোচনারূপ 'টেকনিকালিটি'তে মোকদ্দমা নষ্ট করিলে ত চলিবে না। 'মেরিটে' বিচার করিতে হইবে। সুতরাং এ সকল প্রসঙ্গে আর কাজ নাই।

মরুভূমে ওয়েসিস্ ছুটে, পাষাণে ফোয়ারা ফুটে, এ কথা খুব সত্য। উপস্থিত প্রমাণ ললিত বাবুর এই ফোয়ারা। ফোয়ারায় অধিকাংশই রসের উৎস, তাহার ষোলটি ধারা। ঠিকই হইয়াছে, অন্নে ষোড়শ ব্যঞ্জন বড় তৃপ্তিকর। 'রমণীর ষোড়শ বৎসর বড় মধুর, আবার ষোলকলা ভিন্ন সুধাকরের পূর্ণতা ঘটে না। কিন্তু, হাতের পাঁচ অঙ্গুল সমান হয় না। ফোয়ারার ষোলটি রচনাই যে, সমান রসের ফোয়ারা তা বলিতে পারি না। বারাণসী-দর্শনে কবিতাটি এ গ্রন্থে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং না দিলেই ছিল ভাল, ইহাতে রস নাই, বরং একটু কস আছে; তবে গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন প্রাণীজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতে অপত্যস্নেহ অন্ধ। ইহার উপরে আর কথা চলে না। তারপর তীর্থ-দর্শন। লেখাটি বেশ, কিন্তু এ গ্রন্থে উহা তেমন খাপ খায় নাই। আর 'বিরহ'? বিরহে লেখার নূতনত্ব আছে, মুন্সিয়ানা আছে, ভাবুকতা আছে, কিন্তু এ গ্রন্থের পক্ষে বড় গুরুপাক। বাসরের মজলিসে "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর," এ সঙ্গীত—হইলেনই বা বর বড় সুকণ্ঠ—বরের পক্ষে শোভন হয় না; এ ক্ষেত্রেও বিরহে সেই দোষ ঘটিয়াছে। আর বাকি তেরটি রচনা, সত্যই রসের ফোয়ারা। এই রসের সঙ্গে আবার নানা মূল্যবান উপলখণ্ড আছে। এই সকল রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বহু-দর্শিতা প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে মিশিয়া গেছে, অথচ বিদ্যা জাহির করিবার লেশমাত্র চেষ্টা আছে বলিয়া কুত্রাপি মনে হয় না। ললিত বাবু বিদ্যা দেখাইয়াছেন, রত্নও দিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যারত্ন উপাধি সার্থক।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে খুঁত নাই

এমন বলি না, স্থানে স্থানে এক আধটা অসাবধানতা আছে, 'প্রবাসের সুখে' অত্যাচারের অত্যাচার আছে, দুই একটা ফুট নোটেও রসিকতা একটু 'মেঠো' হইয়াছে। তা এ সকল ত্রুটি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

ফোয়ারা রচনায় পাণ্ডিত্য আছে, এ কথা বলিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডিত্যের চেয়ে সরলতার জন্যই ফোয়ারার আদর বেশী হইবে।

ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল; সে বোধ হয় মান্ধাতার আমলের নির্দ্দেশ; সকল দেশের কথা ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু এখন বাঙ্গালার নদ নদী খাল বিলের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, জলের পরিমাণ বাড়িতেছে। পৃথিবীতে রসের ভাগও এইরূপে ক্রমেই কমিতেছে। কি প্রকৃতিতে কি মানবহৃদয়ে সর্ব্বত্রই সরসতা কমিয়া কাঠিন্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সাহিত্য-জগতে যে ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ইহা বিচিত্র নহে। অন্য দেশের সাহিত্যের কথা, জোর করিয়া বলিবার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে আজকাল হাস্যরসের, পরিহাসরসিকতার বড়ই অভাব। বাঙ্গালার দীনবন্ধু, মাইকেল বঙ্কিমবাবুর "কমলাকান্ত' যে ভাবে হাসাইয়া গিয়াছেন, সে হাসি আর কেহ হাসাইতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন আধুনিক কমলাকান্ত প্রয়াগে দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়াগে হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের জন্য যাহা "দান" করিতে যান নবীন কমলাকান্তও স্বর্গীয় কমলাকান্তের বা বঙ্গ রস-সাহিত্যের তাহাই "প্রদান" করিয়াছিলেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এখন আর রহস্য আলোচনা করেন না, তিনি এখন ঋষিত্বে অগ্রসর; অমৃতলালের অমৃতধারাও ক্ষীণ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এখন রস পরিপাক করিয়া "নাটক" জমাইতেছেন—আর দুই একজন যাঁরা রসের পাক চাপাইয়াছিলেন তাঁরাও রসিয়া গিয়াছেন, তাই আজ বঙ্গসাহিত্যের এই রসহীনতার দিনে ললিত বাবুর ফোয়ারায় আমরা তৃপ্ত এবং আশান্বিত হইয়াছি।

ফোয়ারায় ষোলটি মূল প্রবন্ধের মধ্যে ১৮টি চুটকি, আর খানিকটা চুটকি সাহিত্য—সেটাকে আধখানা রচনা বলিলেই চলে—সুতরাং মোটের উপর সাড়ে আঠারটি চুটকি আছে। অক্ষয় বাবুর "সাধারণী" সাড়ে আঠার ভাজার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ইহাতে সব আছে, এমন কি আধখানা লঙ্কাও আছে, নাই কেবল একটু জল অর্থাৎ রস। কিন্তু আমাদের ললিত বাবুর এই সাড়ে আঠার ভাজায় লঙ্কাও আছে আবার জল বা রস তাও ঢালাও। যদি সে রস কেহ খুঁজিয়া না পান তবে বুঝিব তাহার রসাস্বাদনের দিন কাল গিয়াছে।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব, কিন্তু "কূপে পশ্য পয়োনিধাবিব জলং গৃহ্লাতি তুল্যং ঘটং" এ রসের সাগরের পরিচয় ঘটের সাহায্যে কি বুঝাইব?

যিনি এ রসের পরিচয় ষোল আনা পাইতে চান, তিনি বারো আনা খরচ করিয়া পাঠ করুন, হাতে হাতে চারি আনা লাভ

পাইবেন। আমরা ফোয়ারার আর বেশী সুখ্যাতি করিতে কিছু সঙ্কুচিত হইতেছি, কারণ ফোয়ারার ষোলটি মূল প্রবন্ধের মধ্যে 'বঙ্গদর্শনে' চারিটি বাহির হইয়াছিল, সুতরাং ফোয়ারার সুখ্যাতিতে আমাদের কিছু আত্মপ্রশংসা আসিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি বলিয়াছিলেন আত্মহত্যা ও আত্মপ্রশংসা দুইই সমান। ললিত বাবুর জন্য আমাদিগকে শেষ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে হইল! এমন স্বার্থত্যাগ সাহিত্যজগতে কি দুর্লভ নহে?

ফোয়ারার কয়েকটি রচনা বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, আমরা ভাগলপুরের সম্মিলনে উপস্থিত ছিলাম, ললিত বাবুর "বর্ণমালার অভিযোগ" প্রবন্ধ শ্রবণে সভায় কি হাস্যলহরী উঠিয়াছিল, কি আনন্দের উচ্ছ্বাস খেলিয়াছিল, কি প্রশংসার হাওয়া বহিয়াছিল, তাহা যিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহাকে বুঝান শক্ত। ললিত বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন যে রহস্য রচনারূপ রঙের সাতা ক্রফ করিয়া বদরঙ্গের টেক্কা জিতিয়া নিলে হয় না? "উড়ুপেনাস্মি সাগরং" আর কি! -সত্য সত্যই ললিতবাবুর অনেক রচনা অনেক টেক্কাকেও টেক্কা দিয়া থাকে ফোয়ারার যথাযথ সমালোচনা আমরা করিতে পারিলাম না, কারণ আমরা রসিক নহি। ললিতবাবু আমাদিগকে এ গ্রন্থ উপহার দিয়া ভুল করিয়াছেন, কারণ তিনি ত জানেন—

"অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

সমালোচক সম্বন্ধে সে আক্ষেপ করিতে হইলেও, আমরা আশা করি,—বাঙ্গালার পাঠক সমাজ সম্বন্ধে এ প্রকার অভিযোগ করার কোন কারণ গ্রন্থকারের ঘটিবে না?—ফোয়ারার নূতন সংস্করণে আমরা শীঘ্রই তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিব।
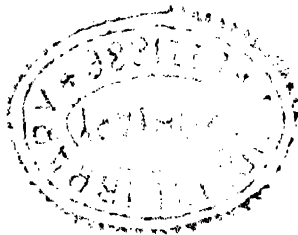
১ম, ২য়, ৩য়, ৫, ৬, ৭ম, ফর্ম্মা আর সি চৌধুরী কর্ত্তৃক বিজয়া প্রেসে, ৪র্থ ফর্ম্মা কৃষ্ণচন্দ্র আইচ কর্ত্তৃক কলিকাতা কমার্শিয়াল প্রেসে ও ৮ম ও ৯ম ফর্ম্মা এবং কভারিং ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

চরিত-চিত্র

সুরেন্দ্রনাথ

আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনে সুরেন্দ্রনাথের স্থান

সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও অনেক শক্তিশালী লোকনায়ক আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ কোনও কোনও বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁদের সকলের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাই আপন আপন প্রদেশেতে আবদ্ধ। লালা লাজপত্ রায়ের নাম ভারতবিশ্রুত হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র, প্রকৃত পক্ষে, পঞ্চনদের সীমা অতিক্রম করে নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও সেইরূপ কেবল এলাহাবাদ ও আগ্রার যুক্ত-প্রদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেই কতকটা নেতৃত্ব-মর্য্যাদা পাইয়াছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকে অনেকেই তাঁর নাম জানে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিভার বা কর্ম্মজীবনের প্রেরণা অনুভব করে নাই। স্যার্ ফিরোজসাহ মেহেতার আসন্নবন্ধুবর্গ যাহাই বলুন না কেন, তাঁর রাষ্ট্রীয়-নেতৃত্বও বোম্বাই'এর পার্শী ও গুজরাটের বেনিয়া সম্প্রদায়েই সাক্ষাৎভাবে স্বীকৃত হয়; বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় সমাজ, কিম্বা বাংলার কি পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তবে কন্‌গ্রেসে বা জাতীয় মহাসমিতিতে কিছুদিন পর্য্যন্ত যে তাঁর একটা অনন্যপ্রতিদ্বন্দী প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর ইহার হেতুও একরূপ চক্ষের উপরেই পড়িয়া আছে। জন্মাবধিই কন্‌গ্রেস স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতা, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এল্যান্, ও হিউম্ এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ, ইহাঁদের অর্থেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অনেক সময় কন্‌গ্রেসের অপরাপর নেতৃবর্গ কন্‌গ্রেসের ব্যয় সংকুলনের জন্য আপনাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা যথাসময়ে আদায় করেন নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়া এই চারিজনকেই বহুদিন পর্য্যন্ত এই অনাদায় টাকার দায়ভারও বহন করিতে হয়। এ অবস্থায় যাঁহাদের কার্পণ্যে বা ঔদাসীন্যে স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতাকে বৎসর বৎসর এত

টাকার ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কন্‌গ্রেসের কার্য্যকলাপে মেহেতা সাহেবের অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। মেহেতা সাহেবের নিকটে কন্‌গ্রেসের এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ন-ঋণ স্মরণ করিয়াই, অপরাপর নেতৃবর্গ কন্‌গ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় তাঁর অভিমত ও আবদার মানিয়া চলিয়াছেন। কন্‌গ্রেসের অন্যতম উত্তমর্ণ বলিয়াই কন্‌গ্রেস্‌-মণ্ডপে স্যার ফিরোজশাহ মেহেতার একটা প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা কন্‌গ্রেসের বাহিরে, দেশের সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকর্ম্মের উপরে, কিম্বা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আধুনিক-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিত্তে, মেহেতার চরিত্রের বা প্রতিভার কোনোই প্রভাব কখনই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কোনো কোনো বিষয়ের আলোচনায়, অপরাপর সভ্যগণের তুলনায়, কখনো কখনো, অসাধারণ সাহসিকতার ও বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ প্রদান করিয়া, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলে ভারতব্যাপী একটা খ্যাতি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, সত্য। আর এ খ্যাতি ও মর্য্যাদা তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের উপরেই যে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, ইহাও অতিশয় সত্য। গোখেলে সম্বিদ্বান, ও কোনো কোনো বিদ্যায় স্বল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞতাও তাঁর আছে। য়ুরোপীয় অর্থনীতি-শাস্ত্রে গোখেলের যে পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, ভারতের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কের তাহা আছে কি না সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বনে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকেরা বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিচার-আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে পরমত-খণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠায় গোখেলে একরূপ সিদ্ধহস্ত। ইংরেজের চিরাভ্যস্ত বাদ-বিদ্যায় ইংরাজিতে ইহাকে ডিবেট (Debate) বলে—লাট কার্জ্জনের মত পারদর্শী লোক ইংলণ্ডেও এখন কম। অথচ কখনো কখনো এই লাট কার্জ্জনকেই এ বিষয়ে গোখেলের নিকটে হার মানিতে হইয়াছে। আর আপনার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, গোখেলে এ পর্য্যন্ত যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে এই সেবাব্রত উদযাপন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, ভারতের অন্য কোনো লোকনায়কের মধ্যে সেরূপ ঐকান্তিকী নিষ্ঠাও দেখা যায় নাই। গোখেলের মধ্যে যে সকল গুণের সমাবেশ হইয়াছে, সে সকল গুণ এদেশের অন্য কোনো প্রসিদ্ধ লোকনায়কের মধ্যে সে মাত্রায় দেখা যায় নাই; ইহা সত্য বটে, কিন্তু তবুও গোখেলের বর্ত্তমান ভারতব্যাপী খ্যাতি যে কেবল তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্র বলেই অর্জ্জিত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যদি গোখেলেকে হাতে ধরিয়া না তুলিতেন; পুনার সার্ব্বজনীন সভা যদি, রাণাডের অনুরোধে, গোখেলেকে ওয়েল্‌বী কমিশনের সম্মুখে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ না করিতেন; প্রথম বারে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বিলাতী সংবাদপত্রে, প্লেগ-বিধানের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পুনার ইংরেজ সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন, গোখেলে যদি জাহাজ-ঘাটেই সর্ব্বোতোভাবে

তার প্রত্যাখ্যান করিয়া বোম্বাইএর রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহভাজন না হইতেন; ফিরোজশাহ মেহেতার শিষ্যত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাহারই প্রসাদে, যদি তিনি বোম্বাই-ব্যবস্থাপকসভার বে-সরকারী সভ্যগণের প্রতিনিধি হইয়া বড় লাটের ব্যবস্থাপকসভায় না আসিতেন; সেখানে লাট কর্জ্জন আপনার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে যদি গোখেলের বিচারযুক্তির যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াই, যদি তার মেধার ও পাণ্ডিত্যের সম্বর্দ্ধনা না করিতেন; ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তথাকথিত চরমপন্থীদিগের অভ্যুদয় হইলে, মিণ্টো ও মর্লে প্রভৃতি ভারতশাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষেরা যদি এই নূতন রাষ্ট্রীয়-শক্তিকে সংযত ও প্রতিহত করিবার জন্য গোখেলে ও তাঁর দলের লোকনায়কগণকে লোক-চক্ষে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা না করিতেন;—এই সকল বাহিরের ঘটনাপাত না হইলে, গোখেলে যে শুদ্ধ আপনার প্রতিভার বা চরিত্রের বলে, ভারতব্যাপী এই খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, ধীরভাবে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু এ সকল যোগাযোগ সত্ত্বেও গোখেলে যে সমগ্র ভারতের আধুনিক-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল এক সুরেন্দ্রনাথই এই দেশে, এই কালে, এই অনন্যপ্রতিযোগী নেতৃত্বের দাবী করিতে পারেন।

যে সকল বাহিরের ঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগে এ দেশের অপরাপর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত, তাঁহার ভাগ্যে সে সকল যোগাযোগ ঘটে নাই। রাজপুরুষদিগের আসন্নসংসর্গলাভ এ দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র প্রশস্ত পথ। আর এ দেশে ধনবলে ও পদবলেই রাজপুরুষদিগের প্রসাদলাভ করিতে পারা যায়। আজ লোকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ লক্ষপতি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভসময়ে সুরেন্দ্রনাথের এ ধনপরিবাদ ছিল না। গোখেলেকে রাণাডে নিজের হাতে ধরিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার তদানিন্তন লোকনায়কগণের মধ্যে একজনও এরূপভাবে সুরেন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাংলার ধনী ও পদস্থ লোকেরা আজ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া কোনো স্বাদেশিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে সাহস পান না। কিন্তু ইঁহাদের জ্যেষ্ঠেরা একদিন রাজদ্বারে-লাঞ্ছিত সুরেন্দ্রনাথকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, তাঁহা হইতে দূরে থাকিতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত রাজপ্রসাদলোলুপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করিতেও শঙ্কিত হইতেন। আজ সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজরাজপুরুষদিগের দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তিনি এই রাজকর্ম্মচারী সম্প্রদায় নিকট লাঞ্ছিত হইয়া রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। আর বহুদিন পর্য্যন্ত সে লাঞ্ছনার কথা এ দেশের ইংরেজ-

রাজপুরুষেরা বিস্মৃত হন নাই। প্রত্যুত যতই সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনি সেই শক্তি সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, ততই তাঁহারা সেই প্রাচীন লাঞ্ছনার স্মৃতিকে প্রাণপণে জাগাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও সকলেই জানেন। সেই রাজপুরুষেরাই, আজিকার অবস্থাধীনে, আপদ-বিপদে, প্রতিপদেই দেশের প্রজামতের পোষকতা-লাভের লোভে, সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। যে কন্‌গ্রেসের কাজকর্ম্ম আজ সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া কিছুতেই চলে না ও চলিতে পারে না; একদিন, কন্‌গ্রেসের জন্মকালে, তাহার জন্মদাতা ও ধাত্রীবর্গ সকলে প্রাণপণে সেই সুরেন্দ্রনাথকে তাহার বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এ কথাও মিথ্যা নয়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথকে কন্‌গ্রেসের কর্ম্মে আমন্ত্রণ করিতে চান নাই। হিউম সাহেবও প্রথমে তাঁহাদের মতেই মত দিয়াছিলেন। হিউম ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যে অশ্রদ্ধা বহুদিন হইতেই জাগিয়াছিল, হিউমের মনেও যে তাহা ছিল না, এমন নহে। তার উপরে যখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতি কন্‌গ্রেসী নেতৃবর্গ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন হিউম যে সেই মতে সায় দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য হিউম যখন কলিকাতায় আসিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া বাংলা দেশের লোকমতকে কন্‌গ্রেসে টানিয়া আনা যে একান্তই অসম্ভব, ইহা দেখিলেন ও বুঝিলেন, তখন তাঁর মত ফিরিয়া গেল এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতির আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, গুণগ্রাহী হিউম স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথকে কন্‌গ্রেসের কর্ম্ম-নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। আজ সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহায়-সম্পদ লাভ হইয়াছে। আজ তিনি দেশের রাজপুরুষ ও রাজারাজড়ার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তাঁহাকে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়, "শোথের শেয়ালার" মত, দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মস্রোতের ঘাটে ঘাটে ফিরিতে হইয়াছিল। আর আজ তিনি আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যে অনন্যপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা কোনো প্রকারের অনুকূল ঘটনাপাতের ফল নহে। এ কীর্ত্তি অর্জ্জনে কেহ তাঁহাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবেই তাঁর স্বোপার্জ্জিত। কেবল আপনার প্রতিভা ও পুরুষকারের বলেই সুরেন্দ্রনাথ এ দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-জীবনে এই অনন্যপ্রতিযোগী নেতৃত্ব-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ব।

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র

অশেষ প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তাঁর এই কর্ম্মজীবন যে এমন অদ্ভুত সফলতা লাভ করিয়াছে, ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ মানসিক বলেরই প্রমাণ প্রদান

করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বীর পুরুষ নহেন। আমরা সচরাচর যাহাকে বীরত্ব বলি, তার অন্তরালে অনেক সময় একটা ফলাফল-বিচার-বিরহিত এক-গুয়ামো লুকাইয়া থাকে। এই প্রকারের একগুয়ামো সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাই; থাকিলে, সুরেন্দ্রনাথ যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কখনই পাইতেন না। সুরেন্দ্রনাথ যে খুব সাহসী পুরুষ, এমনো বলা যায় না। যে অসমসাহসিকতা অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, পরিণামে নিঃশেষ নিষ্ফলতা মাত্র লাভ করে, সুরেন্দ্র-নাথের মধ্যে কখনো সেরূপ অসমসাহসিকতা দেখা যায় নাই। কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে বীরত্বের লক্ষণ, আর নিন্দা-স্তুতি উভয়কে সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে সাহসিকতা লুক্কায়িত থাকে, সে বীরত্ব ও সে সাহস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে। যে মনের বল থাকিলে লোকে বিরোধী শক্তির আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু কখনোই তাহার নিকটে নত হয় না;— এই আত্মঘাতী মানসিক বল সুরেন্দ্রনাথের কখনো ছিল না। কিন্তু যে মনের বল আপনার রুচি ও প্রবৃত্তি, মান ও অপমান, আয়াস ও শ্রম-ক্লেশ, এ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া, সকল অবস্থাতেই, সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব সন্ধি ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, আপনার লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে পারে, সুরেন্দ্রনাথের সে মানসিক শক্তি যে পরিমাণে আছে, আমাদের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয়-নায়কের মধ্যে তাহা নাই। যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াও, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুযায়ী, আত্মরক্ষায় ও আত্মচরিতার্থতালাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্য্যরূপে সে কৌশলটী লাভ করিয়াছেন। এই কৌশলটী যে জীব লাভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্বব্যাপী নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করিতে পারে। এই কুশলতা-গুণেই সুরেন্দ্রনাথও জীবন-সংগ্রামের জয়টীকা ললাটে ধারণ করিয়া, ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের রজঃপ্রাধান্য

সুরেন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতি যে খুব সাত্ত্বিক তাহা নয়। নির্ম্মলত্ব, ভাস্বরত্ব ও অনাময়ত্ব, এ সকলই সত্ত্বের লক্ষণ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় বস্তু-ধারণায় তৎপর হয়; চিত্ত বিকারশূন্য ও কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। এ সকলের কোনো লক্ষণই এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চরিত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনা, যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফলে, বহুদিন হইতেই সত্ত্বপ্রধান হইয়া আছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে কালে কর্ম্মবশে এই সমাজের পুরাভ্যস্ত সাত্ত্বিকতাও ঘোর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্রই যুগসন্ধিকালে এইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য যে শিক্ষা ও সাধনায় এই সাত্ত্বিকীভাব ফুটিয়া উঠে, সুরেন্দ্রনাথ সে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, স্বদেশের সনাতন ভাব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি একেবারেই লোপ পাইতেছিল। সমগ্র দেশই তখন ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার প্রাণহীন ও অর্থশূন্য বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের অনুসরণেই নিযুক্ত ছিল। তার ভিতরকার সত্যের ও মহত্ত্বের অনুভূতি, সাধু-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ক্বচিৎ থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থদিগের মধ্যে একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। তার উপরে, সুরেন্দ্রনাথের পিতা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার প্রবল রাজসিক আদর্শের দ্বারা একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্বল্পবিস্তর এই দশা ঘটিয়াছিল। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে কেবল ইংরেজী শিখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইংরেজের চালচলন অভ্যাস ও ইংরেজের চরিত্র লাভ করিবার জন্য, তিনি অতি অল্প বয়সেই সুরেন্দ্র-নাথকে ডভ্‌টন স্কুলে প্রেরণ করেন। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ একরূপ বাল্যাবধিই কলিকাতার ইংরেজ ও ইউরেশীয় বালকগণের সংসর্গে থাকিয়া স্কুল কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তার পরে, বিলাতে যাইয়া এই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করিয়া সিবিলিয়ানী-পদ লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসেন। আজিকালি বিলাত ও ভারত যেন এ'ঘর ও'ঘর হইয়া পড়িয়াছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন শিক্ষার্থী হইয়া বিলাত গমন করেন, তখন এইরূপ ছিল না। সেকালে বিলাত যাওয়া এত সহজ ছিল না বলিয়া, বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দুদিগের নিজেদের প্রাণে একটা প্রবল অহঙ্কার এবং কোনো কোনো দিক্ দিয়া সমাজেও তাঁহাদের একটা অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা ছিল। সে কালের বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে, তাঁহাদের প্রাচীন পৈতৃক সমাজের কোনো প্রকারের যোগাযোগ প্রায়ই থাকিত না। সমাজও তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিত। আর তাঁহারা নিজেরাও সাহেব সাজিয়া, সহধর্ম্মিণীকে গাউন পরাইয়া মেম সাজাইয়া, "নেটিভ্‌দের" সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মেশামেশি করিলে কি জানি এই সদ্যলব্ধ সভ্যতার মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সেই ভয়ে আপনাদের সমাজ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে তাহাই করিয়াছিলেন। তার বিধাতার চক্রান্তে ও তাঁর স্বদেশের সুকৃতি বলে, সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ানী-পদ যদি খসিয়া না পড়িত, তাহা হইলে আজি পর্য্যন্তও তিনি এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝাই বহন করিয়া চলিতেন। অতএব এই সকল ঘটনাবশে সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যে স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনার নিগূঢ় প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের টান্‌টা পুরাদমেই স্বদেশাভিমুখী হইলেও তাঁর মত, প্রকৃতি এবং ভিতরকার ভাব ও আদর্শ যে সত্যই স্বদেশী, এমন বলা যায় না। শুদ্ধ সাত্ত্বিকী প্রকৃতিই আমাদের স্বদেশী চরিত্রের চিরন্তন আদর্শ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের কোনও না কোনও একটা গুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের

প্রকৃতিকে বিশেষভাবে সাত্ত্বিক, বা রাজসিক, বা তামসিক করিয়া তোলে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতিতেও গুণ বিশেষের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। কোনও জাতি বা এই জন্য তামসিক, আর কেহ বা রাজসিক, আর কেহ বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। কোনও জাতির সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান, আর কাহারও বা তমোপ্রধান, আর কোনও জাতির সভ্যতা ও সাধনা বা সত্ত্ব-প্রধান হইয়া থাকে। য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান। ভারতের সভ্যতা ও সাধনা সত্ত্ব-প্রধান। য়ুরোপের সাধনাতেও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আছে। রজঃ-প্রধান বলিয়া য়ুরোপীয় সাধনায় তামসিকতা নাই, বা সাত্ত্বিকতা ফুটে নাই, এমন নহে। জীব সাধন-বলে কখনও কখনও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ মুক্তলোক সর্ব্বত্রই অতি বিরল। সাধারণ মানুষের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সর্ব্বদাই এই গুণত্রয় বিদ্যমান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধনায় এবং সভ্যতায়ও সর্ব্বদাই এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। ভারত-বর্ষেও অনেক তামসিক এবং রাজসিক লোক আছেন। ভারতের বহুমুখী সাধনায় রাজসিক এবং তামসিক উভয় প্রকৃতিরই যথাযোগ্য অনু-শীলনেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ভারতের সভ্যতার ও সাধনার ঝোঁক সাত্ত্বিকতারই দিকে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্রই আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্র। য়ুরোপীয় সাধনার ঝোঁক রাজসিকতারই দিকে। এই জন্য রাজসিক চরিত্রই সে দেশের আদর্শ চরিত্র। সুরেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ঐকান্তিক প্রভাবের ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়াছেন বলিয়া, এই য়ুরোপীয় আদর্শের রাজসিক চরিত্রই লাভ করিয়াছেন।

আর সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র শুদ্ধ সাত্ত্বিক নয়, কিন্তু একান্তই রাজসিক, ইহা কোনোই নিন্দার কথাও নহে। ফলতঃ প্রকৃত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অন্য দেশের তো কথাই নাই, আমাদিগের এই সত্ত্ব-প্রধান সভ্যতা এবং সাধনাতেও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্র যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সচরাচর লোকে যাহাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহা কেবল ঘোরতর তামসিক-তারই রূপান্তর মাত্র। সত্ত্ব এবং তমঃ উভয়েরই কতকগুলি বাহিরের লক্ষণ এক প্রকারের বলিয়া অতি সহজেই এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধিতে অনেক লোকের মধ্যে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারের বাহিরের কর্ম্মচেষ্টা হইতে বিরত করে। এই কর্ম্মচেষ্টাহীনতা তমোগুণেরও লক্ষণ। তবে এই সাত্ত্বিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে ভগবন্নির্ভর আর তামসিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়গুণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ দু'য়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, লোকে অনেক সময় এই নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়ধর্ম্ম-সম্ভূত নিশ্চেষ্টতাকেই সাত্ত্বিকতার লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করে। প্রত্যেক যুগসন্ধিকালে পূর্ব্বতন যুগের বিধিব্যবস্থা ও রীতি নীতি যখন লোকের একান্ত অভ্যস্ত হইয়া তমোধর্ম্মা-ক্রান্ত হয়, তখন, সত্ত্ব-প্রধান সমাজেও, এই জাল সাত্ত্বিকতার প্রভাব অত্যন্তই বাড়িয়া

উঠে। এই জাল সাত্ত্বিকতাতেই আমাদের দেশটা এখন ছাইয়া ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় লোক-সমাজে পুনরায় সত্য সাত্ত্বিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনগণের অন্তরস্থিত রজোগুণকেই আগে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক হয়। সুরেন্দ্রনাথ আচরণ ও উপদেশের দ্বারা আপনার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে এই যুগপ্রয়োজন সাধন করিয়াই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ যখন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন যদি তিনি লোক-চক্ষে কোনো উচ্চ সাত্ত্বিকী আদর্শ ধরিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাহাতে দেশব্যাপী তামসিকতারই প্রভাব বাড়িয়া যাইত, প্রকৃত সাত্ত্বিকতা লোকচরিত্রে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। দেশের কল্যাণের জন্য সে সময় রজোগুণের প্রেরণারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর সমাজপ্রকৃতির এই অন্তঃপ্রয়োজনের অনুরোধে সে সময়ে সর্ব্ব প্রকারের লোকহিতব্রতই বিশেষ ভাবে রজোধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারক নহেন। স্বদেশের ধর্ম্মজীবনে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে ডাকেন নাই। সামাজিক, এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই ভগবান তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্মসংস্কারকগণও তখন দেশের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে একটা প্রবল রাজসিক ভাবই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে এইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন এবং তাহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। অতএব কালধর্ম্মবশেই সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র রাজসিক হইয়াছে।। এরূপ না হইলে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা কখনই করিতে পারিতেন না। লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা এই সকলই রাজসিকতার প্রধান লক্ষণ। ধনমানাদি লাভ হইতে আরম্ভ করিলে, তাহা উত্তরোত্তর আরও অধিক পরিমাণে লাভ হউক, এই যে অভিলাষ তাহারই নাম লোভ। পরদ্রব্যাদিতে যে লালসা তাহাকেও লোভ বলে বটে, কিন্তু সে লোভ নিরতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু, অতি নিম্ন অধিকারের ধর্ম্মও এই লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। এই লোভ রাজসিক বস্তু নহে। কিন্তু ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে উত্তরোত্তর ধনমানাদি বৃদ্ধি করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই রজো-গুণের লক্ষণ। নিয়ত কর্ম্ম করিবার যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রবৃত্তি। কোনো বিষয় বা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার যে উদ্যম, তাহাই আরম্ভ। ইহা করিয়া, পরে উহা করিব, এইরূপ সংকল্প-বিকল্পাত্মিকা যে বুদ্ধি, তাহাই অশম। সর্ব্বপ্রকারের সামান্য বস্তুতে যে তৃষ্ণা তাহাই স্পৃহা। এই লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা, শাস্ত্রে এই সকলকেই রজোলক্ষণ বলিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই সকল লক্ষণগুলিই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকলের দ্বারাই তাঁর প্রকৃতির রজোপ্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এই রাজসিকতাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একদিকে বলের ও অন্যদিকে দুর্ব্বলতার হেতু হইয়া আছে। তাঁর ভাল ও মন্দ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উভয়ই এই রাজসিক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আপনার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই সুরেন্দ্র-

নাথ যে ঘোর বিপাকে পতিত হন, সেরূপ দুর্বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। ধন-মানের আশা করিয়াই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সহসা ধন-মান-পদ সকল হারাইয়া, নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাঁহার পদচ্যুতির আদেশের বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করিতে যাইয়া, তাহাও একরূপ নিঃশেষ হইয়া গেল। পৈতৃক ভদ্রাসনের নিজের অংশটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া, দারিদ্র্যের বিভীষিকা মাথায় লইয়া, সুরেন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজকর্ম্মেই জীবন অতিবাহিত করিবেন ভাবিয়া, তাহারই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কোনো প্রকারের ব্যবসায়িকবিদ্যালাভ করেন নাই। রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইয়া অন্যত্র তাঁহার বিদ্যার ও যোগ্যতার উপযুক্ত কর্ম্ম লাভ করাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদচ্যুত এবং একরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই দমিয়া গেলেন না। আপনার পুরুষকারের প্রভাবে সমুদায় প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া নূতন ক্ষেত্রে নূতন কর্ম্মজীবন গড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তিনিই এখন সামান্য বেতনে মেট্রোপলিটন কালেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেক লোকই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইত। পুনরায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে শক্তি ও উদ্যম আবশ্যক, অনেক লোকেই তাহা আর সংগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু দমিয়া যাওয়া কাহাকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ ইহা একেবারেই জানেন না। জীবন-সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ সময় সময় হটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনই পরাভূত হ'ন নাই। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ অঙ্গের রাজসিকতারই ফল। জীবের জীবনী-শক্তি একদিকে ব্যাঘাত পাইলে যেমন আর একদিকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুরেন্দ্রনাথের বলবতী কর্ম্মস্পৃহাও এই রূপে যখনই একদিকে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা প্রত্যাহত হইয়াছে তখনই অপূর্ব্ব কুশলতা সহকারে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাতেই যেন, অজ্ঞাতসারে নূতন পথে যাইয়া আত্মচরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। রাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশায় সুরেন্দ্রনাথ প্রথম সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে আশা যখন অকালে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, তখন তিনি স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই দিকে আপনার শরীর মনের সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের যোগসিদ্ধি

সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো ধর্ম্মজীবনের কোনো প্রকারের বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বর মানেন; কিন্তু সার্থক বা নিরর্থক ঈশ্বর-প্রসঙ্গে কখনো কালাতিপাত করেন বলিয়া শুনা যায় নাই। স্বদেশের বা বিদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের বা তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে তাঁহার যে কোনো প্রকারের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বা আছে, এমনও কোনো

প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলেই হউক, আর অহেতুকী ভাগবতী-কৃপাগুণেই হউক, সুরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম্ম-জীবনের ভিতর দিয়াই যে এক প্রকারের যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ রাগদ্বেষ-বিমুক্ত বৈরাগী পুরুষ নহেন। পুত্রদার-গৃহাদিতে তাঁর আসক্তি নাই এবং এ সকলের ইষ্টানিষ্টলাভে তাঁর চিত্ত বিচলিত হয় না, এমনও নহে। প্রত্যুত তাঁর মত প্রীতিশীল পতি ও সন্তানবৎসল পিতা আমাদের দেশেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের আহ্বানে, নলিনীদলগত জল-বিন্দুর ন্যায়, এই সকল স্নেহমমতার আসক্তি তাঁহার চিত্ত হইতে সর্ব্বদাই অনায়াসে ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। প্রথম জীবনে নবীন পুত্রশোক এবং শেষ জীবনে নিদারুণ পত্নী-বিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টার কোনোই ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা-দিনে সুরেন্দ্রনাথের পুত্র-বিয়োগ হয়। বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে সভাস্থলে আসিবার জন্য ডাকিতে যান, তখন সুরেন্দ্রনাথ নিদারুণ পুত্র-শোকে অধীর হইয়া, ছিন্নমূল কদলীর ন্যায়, ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। কিন্তু ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার জন্য সভাস্থলে তাঁহার উপ-স্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে শুনিয়া, সেই শোকাহত সুরেন্দ্রনাথ তখনই শোকবেগ সংবরণ করিয়া, চক্ষের জল ও অঙ্গের ধূলি মুছিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ধৈর্য্য ও সংযম পূর্ব্বজন্মলব্ধ যোগশক্তির প্রভাবেই প্রাকৃত জনে সম্ভব হয়। আবার বিগত কংগ্রেসের প্রাক্কালে, এই বৃদ্ধ বয়সে, পত্নীবিয়োগবিধুর সুরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও যে আপনার দৈনন্দিন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। এই মুক্তভাব সাধনালব্ধ নহে, কিন্তু সহজসিদ্ধ। ইহাই তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের মূলসূত্র। আর সেই কর্ম্মজীবনে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এই সহজসিদ্ধ মুক্তভাবই তাহার নিগূঢ় হেতু। এই মুক্তভাব আছে বলিয়াই, সুরেন্দ্রনাথ কখনও অতীতের নিষ্ফলতার স্মৃতিকে ধরিয়া ভূতলে পড়িয়া থাকেন নাই। ইহার জন্যই তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কখনো আত্মহারা হ'ন নাই। আর এই জন্যই সময়ে সময়ে অশেষ প্রকারের নিন্দা ও অপবাদের ভাগী হইয়াও, সুরেন্দ্রনাথ কখনই আপনার অভীষ্ট কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক হইয়াও কোনো দিনই লোক-নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে তিনি এতটাই লোক-নিন্দার ভাগী হইয়াছেন যে, অন্য লোকে সেই অপবাদ মাথায় লইয়া আবার কখনও লোক-নেতৃত্বের দাবী করিতে সাহস পাইত কি না সন্দেহ। রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে যে বিদ্যাসাগর তাঁহাকে অযাচিত আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র-নাথ যখন সেই বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কালেজের প্রতিদ্বন্দ্বী সিটি কালেজে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পদিন মধ্যে আপনি সেই মেট্রোপলিটন কালেজের আর একটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, রিপণ কালেজের, প্রতিষ্ঠা করেন

তখন তাঁহার কুযশে বাংলার শিক্ষিত সমাজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নীরবে সেই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করিয়া অল্প-দিন মধ্যেই জনসাধারণের চিত্তে আপনার পূর্ব্বতন প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার রিপণ কালেজের আইন বিভাগের অবৈধ আচার আচরণ লইয়া, একটা বিষম গোল বাধিয়া উঠে এবং এই কালেজ একেবারে উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। আর যে ভাবে তখন সুরেন্দ্রনাথ এই আসন্ন বিপদ হইতে আপনার কালেজটী রক্ষা করেন, তাহা লইয়াও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র তাঁহার যে কুযশ রটনা হয়, সেরূপ কুযশকে ঠেলিয়া অন্য কোন লোকনায়ক স্বাদেশিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আর শোকে সংযম, বিপদে ধৈর্য্য, নিন্দা-অপবাদে উপেক্ষা, প্রত্যক্ষ নিষ্ফলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্ম্মো-দ্যম, এ সকলই সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ যোগশক্তির প্রমাণ প্রদান করে। সুরেন্দ্র-নাথের জীবনের কৃতিত্বের পশ্চাতে এই যোগ-শক্তিকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। সুরেন্দ্রনাথের এই সংযম, এই উপেক্ষা ও এই কর্ম্মোদ্যম, এ সকল উচ্চতম রাজসিকতারই লক্ষণ। এ সকলে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পুরুষকারেরই প্রমাণ পরিচয় প্রদান করে।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে পুরুষকার ও দৈব

কিন্তু এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন প্রবল হউক না, দৈবের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, তাহা কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। সর্ব্ব বিষয়েরই সিদ্ধি দৈব ও পুরুষকারের শুভ যোগাযোগের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে। সুরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম্মজীবনে যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহা কেবলই তাঁহার অনন্যসাধারণ পুরুষকারের ফল নহে। পুরুষকার আমাদিগের ভিতরকারই কথা। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুরুষকারের দ্বারা আমাদের জীবনের বাহিরের অবস্থাও ব্যবস্থার সৃষ্টি বা যোগাযোগ সাধিত হয় না। এ সকল যোগাযোগ দৈবই সংঘটন করিয়া থাকেন। নেপোলিয়ানের অসাধারণ পুরুষকার লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গমুখে না পড়িলে, আর যে সকল আদর্শের প্রেরণায় এবং যে সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষে সেই মহাবিপ্লবের সূচনা হয়, তাহার অনুকূলতা না পাইলে, সে অলোকসামান্য পুরুষকার কখনই স্ফুরিত হইত না এবং স্ফুরিত হইলেও কখনই আপনার সম্যক্ চরিতার্থতা লাভে সমর্থ হইত না। আর যে সকল ঘটনা-সম্পাতে ও যে সকল ব্যবস্থা ও অবস্থার যোগাযোগে নেপোলিয়ানের পুরুষকার স্ফুরিত ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্বকৃত নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই দৈবকৃত। সুরেন্দ্রনাথের পুরুষকারের আত্মপ্রতিষ্ঠাতেও এই দৈবের কার্য্যই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।

যে সকল বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থাদির যোগাযোগে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার আত্মপ্রকাশের অনুকূল এবং সময়ো-চিত অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা দৈবেরই কার্য্য। এরূপ ক্ষেত্র ও অবসর না পাইলে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন যে অসাধারণ সফলতালাভ

করিয়াছে, তাহা কখনই লাভ করিতে পারিত না। ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় অলোকসামান্য, কিম্বা তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা বা প্রসার যে খুবই বেশী, তাহা নহে। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষী তাঁর পূর্ব্বেও অনেকে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন; তাঁর জীবনকালেও অনেকে ছিলেন এবং আছেন। কৃষ্ণদাসের মত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি কিম্বা রাজেন্দ্রলালের মত পাণ্ডিত্য সুরেন্দ্রনাথের কখনই ছিল না। এমন কি কোনো কোনো দিক্ দিয়া শিশিরকুমারের প্রতিভাও সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অথচ সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাঁদের কেহই সে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের যে অনুকূল যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এ দেশের তাঁর সমসাময়িক কিম্বা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোনো লোকনায়কগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্রলাল, শিশিরকুমার আপন আপন শক্তি অনুসারে সকলেই স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের সাধনবলে বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবন অনেক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহাঁদের কাহারো নাম থাকিবে কি না সন্দেহ। পণ্ডিতসমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া অনেক দিন রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি থাকিবে। বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের এবং শিশিরকুমারের নামও কতকটা থাকিবারই কথা। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এই দুই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম কতকটা থাকিয়া যাইবে। কারণ "হিন্দু-প্যাট্রিয়ট" ও "অমৃত-বাজার"কে উপেক্ষা করিয়া এদেশের আধুনিক সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের জীবনে ও চরিত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, কৃষ্ণদাস কিম্বা রাজেন্দ্রলাল কিম্বা শিশিরকুমার হইতে তাহা হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তি ইহার একটা প্রধান কারণ বটে; কিন্তু কেবল এই বাগ্মিতা-প্রভাবেই সুরেন্দ্রনাথ এই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তি

সত্য বলিতে কি, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তিও যে অত্যন্ত উচ্চ-অঙ্গের এমন কথাও বলা যায় কি না সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী-বক্তৃতার শব্দ-সম্পদ অতি অদ্ভুত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের বক্তাদের ত কথাই নাই, ইংরেজবাগ্মিগণের বক্তৃতাতেও এরূপ অসাধারণ শব্দসম্পত্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুললিত শব্দযোজনায় সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা যে অনন্যসাধারণ দক্ষতালাভ করিয়াছে, চিন্তার গভীরতায় কিম্বা ভাবের মৌলিকতায় অথবা যুক্তিপরম্পরা-প্রয়োগে কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠার নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা বহুল পরিমাণেই ধ্বন্যাত্মক। সঙ্গীতের শক্তিও

এইরূপই ধ্বন্যাত্মক। আর সঙ্গীত যেমন ধ্বন্যাত্মক স্বরগ্রামের দ্বারাই মানবের চিত্তকে বিবিধভাবাবেগে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাও সেইরূপ শক্তিশালী শব্দপ্রবাহের বলেই শ্রোতৃবর্গের চিত্তে তড়িৎ-সঞ্চার করিয়া থাকে। সঙ্গীতের স্বরগ্রাম যতক্ষণ কর্ণপটাহে আহত করিতে থাকে, ততক্ষণই যেমন তার প্রভাব চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে, কিন্তু সে সুরলয় প্রবাহ যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন তার অশরীরী স্মৃতিমাত্র পড়িয়া থাকে, কিন্তু তার মধ্যে ধরিবার ছুঁইবার বড় বেশী কিছুই থাকে না ; সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার শব্দপ্রবাহও সেইরূপ ফলই উৎপাদন করে। যতক্ষণ তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে বাজিতে থাকে, ততক্ষণই তার উন্মাদিনী উদ্দীপনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া রাখে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সেই শব্দ-স্রোতের যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উদ্দীপনার নেশাও ধীরে ধীরে ছুটিতে আরম্ভ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তার স্মৃতিমাত্রই জাগিয়া রহে, কিন্তু সে বক্তৃতার চিন্তাযুক্তির প্রভাব শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান ও চরিত্রকে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সুরেন্দ্রনাথ কেবল আপনার অসাধারণ বাগ্মিতাবলেই যে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আর সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার এই অদ্ভুত শব্দসম্পদও প্রকৃতপক্ষে সহজসিদ্ধ নয়। যে সকল সাহিত্যিকের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের শব্দবিন্যাসের অন্তরালে সর্ব্বদাই হয় ভাবরাজ্যের কিম্বা জ্ঞানরাজ্যের কিম্বা বাহিরের বিষয়জগতের কিম্বা সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটা অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে। এই বস্তুতন্ত্রতা হইতেই সহজসিদ্ধ সাহিত্যিকের শব্দশক্তি উৎপন্ন হয়। যে সকল লেখক ও বক্তার শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের রচনা বা বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক উদ্দীপনাতেই পর্য্যবসিত হয় না; কিন্তু পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানে ও জীবনে সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যাঁহাদের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ নয় কিন্তু কঠোর সাধনালব্ধ, তাঁহাদের সাহিত্যচেষ্টা অনেকসময় বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া এই স্থায়ী ফললাভে অসমর্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদ্ও সাধন-লব্ধ। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। এই স্মৃতিবলে অনেক শব্দসম্পদশালী ইংরেজ-লেখকের গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। এই সকল ইংরেজ-লেখকের শব্দসম্পদ আয়ত্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা এমন সম্পত্তি-শালী হইয়াছে। আর পরধনপুষ্ট বলিয়াই সুরেন্দ্র-নাথের বাগ্মিতার শব্দশক্তির পশ্চাতে সর্ব্বদা কোনও সজীব বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে না এবং এই কারণেই তাহার উদ্দীপনাও স্থায়ী হয় না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও প্রধানতঃ আপনার বাগ্মিতাবলেই সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ও কর্ম্মজীবনে যে স্থায়ী প্রতি-পত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুরুষকারই ইহার একমাত্র হেতু নহে, ইহার অন্তরালে দৈবপ্রভাবও প্রত্যক্ষ হয়।

দেশকালের যথাযোগ্য যোগাযোগ ব্যতীত এ জগতে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক কোনো প্রকারের সাধনাতেই লোকে সিদ্ধি

লাভ করিতে পারে না। আর দৈবকৃপায় সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে এই যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি এতটা সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আজি পর্য্যন্তও তাঁর স্বদেশের প্রাণবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথমে যে তিনি এই প্রাণ-স্রোতের একান্ত বাহিরে পড়িয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ইংরেজিশিক্ষিত স্বদেশবাসিগণের সকলেরই এই অবস্থা ছিল। সেকালে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইংরেজিতেই কথাবার্ত্তা ও পত্র-ব্যবহার করিতেন, ইংরেজি ধরণেই চিন্তা করিতেন, ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারাদি অবলম্বনেই নিজেদের ভাবাঙ্গসাধনের চেষ্টা করিতেন। ইংরেজসমাজের আদর্শে নিজে-দের সমাজকে এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুযায়ী আপনাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহারা সকলেই স্বল্পবিস্তর লালায়িত ছিলেন। এই অবস্থায় যে সুরেন্দ্র-নাথের ইংরেজি-শব্দ-সম্পদ-পুষ্ট, ইংরেজি-অলঙ্কার-ভূষিত, ইংরেজি ভাবে অনুপ্রাণিত, য়ুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত বাগ্মিতা তাঁহার স্বদেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ইংরাজি-শিক্ষা, স্বাধীনচিন্তা ও ব্যক্তিত্বাভিমান

ইংরেজিশিক্ষা এদেশের শিক্ষিত সম্প্র-দায়ের প্রাণে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইতেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনা এই ব্যক্তিত্বাভি-মানকেই সত্য স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, প্রাচীন যুগের য়ুরোপীয় সাধনায় এই ব্যক্তিত্ববোধ—ইংরেজিতে যাহাকে sense of personality বলে—ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রীসীয় সাধনা জনসমাজকে অঙ্গীরূপে এবং সেই সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অঙ্গরূপেই দেখিয়াছিল। অঙ্গীকে ছাড়িয়া যেমন অঙ্গের কোনই সার্থকতা নাই ও থাকা সম্ভবে না, সেইরূপ সমাজকে ছাড়িয়াও সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সার্থকতা যে আছে বা থাকিতে পারে, গ্রীসীয় সাধনায় এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং গ্রীসে যে সকল ব্যক্তি সমাজ জীবনের পরিপুষ্টিসাধনে একান্ত অসমর্থ হইত, তাহা-দিগের বাঁচিয়া থাকারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমাজের ঐকান্তিক আনুগত্যই সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন গ্রীসে সেইরূপ প্রাচীন ইহুদায়ও কোনো প্রকারের ব্যক্তিত্ব-বোধ জাগিতে পায় নাই। ইহুদীয় সাধনা জনসমাজের সমষ্টিগত সার্থকতাই উপলব্ধি করিয়াছিল। ব্যষ্টিভাবে সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরও যে একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সার্থকতা আছে, এই জ্ঞান ইহুদীয় চিন্তাতে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনা এক দিকে ইহুদীয় এবং অন্যদিকে গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং রোমক ব্যবহার-তত্ত্বের প্রভাবে এই নূতন খৃষ্টীয় সাধনায় কিয়ৎ-পরিমাণে পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কারসম্বন্ধে একটা ব্যক্তিত্ব-বোধ জাগিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহুদীয় সমাজতন্ত্র এবং গ্রীসীয় ও রোমক রাষ্ট্রতন্ত্রের

স্থানে নূতন খৃষ্টীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া খৃষ্টীয়ান জনমণ্ডলীর ব্যক্তিত্বাভিমানকে এখানেও চাপিয়া রাখিতে লাগিল। ইহুদায় ও গ্রীসে যেমন সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে একান্ত ভাবেই সমাজশক্তির ও রাষ্ট্রশক্তির অধীন করিয়া রাখিয়াছিল, প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনাও সেইরূপই খৃষ্টীয়ান জনসাধারণকে একান্তভাবেই Churchএর বা খৃষ্টীয় সঙ্ঘের অধীন করিয়া রাখে। প্রভুশক্তির রূপান্তর ও নামান্তর হইল মাত্র, কিন্তু জনমণ্ডলীর ঐকান্তিক পরাধীনতার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। এইরূপে যেমন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক তন্ত্রে, সেইরূপ নূতন খৃষ্টীয় তন্ত্রেও জনগণের ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বহু শতাব্দ ব্যাপিয়া এক দিকে পৌরহিত্য-প্রধান রোমক খৃষ্টীয় সঙ্ঘ ও অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী প্রজারঞ্জনবিমুখ খৃষ্টীয়ান ভূপতিবর্গ, উভয়ে মিলিয়া য়ুরোপীয় জনমণ্ডলীর অন্তর্বাহ্য সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীন চেষ্টাকে একান্ত ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহাদের প্রাণগত ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে নিতান্ত নির্জীব করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রামাণ্য-বিচারে স্বাভিমতের এবং রাষ্ট্রীয়-শাসন-ব্যাপারে লোকমতের কোনই অধিকার ও মর্য্যাদা ছিল না। রোমক সঙ্ঘের প্রধান পুরোহিত বা পোপ একদিক দিয়া লোকের ধর্ম্মজীবনে আপনাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান রাজন্যবর্গও জনগণের সাংসারিক কর্ম্মজীবনে ঐশ্বরিক মর্য্যাদার দাবী করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক পৌরহিত্যের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়া মার্টিন লুথার খৃষ্টীয় জগতে ধর্ম্মের প্রামাণ্যবিচারে জনগণের স্বাভিমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতেই খৃষ্টীয় সমাজে স্বাধীন চিন্তার বা Free Thoughtএর উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে। মার্টিন লুথার রোমক সঙ্ঘের অধিপতি পোপের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের দাবীই অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তিনি প্রত্যেক খৃষ্টীয়ান্ সাধক ও যজমানকে, ভগবৎ প্রেরণাধীন হইয়া, আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের যথাযথ মর্ম্ম-নির্দ্ধারণের অধিকার প্রদান করেন। রোমক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের মর্ম্মনির্দ্ধারণের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তি-সম্পন্ন গুরুরই কেবল প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু সাধারণ খৃষ্টীয় সাধক ও সাধনার্থী জনমণ্ডলীর স্বাভিমতের কোনোই স্থান ছিল না। মার্টিন লুথার যে সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করেন, তাহাতে শাস্ত্র ও স্বাভিমতেরই প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সদ্‌গুরুর কোনো স্থান হয় নাই। ধর্ম্ম-শাস্ত্র মাত্রেই প্রাচীন কালের ধর্ম্মজীবন ও অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হইলে দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যার বলে তাহার অনুরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক হয়। সর্ব্বপ্রকারের গভীর আধ্যাত্মিক-অভিজ্ঞতা-বিহীন প্রাকৃত জনের পক্ষে কেবল ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির কিম্বা লৌকিক ন্যায়ের যুক্তির বলে অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন

করা একান্তই অসম্ভব। সে অদ্ভুত চেষ্টা সর্ব্বদাই বন্ধ্যার পুত্রশোকের ব্যথার ন্যায় কল্পিত ও অলীক হইবেই হইবে। কেবল সন্তানবতী রমণীই যেমন আপনার অন্তরের বাৎসল্য রসের অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরের মাতৃ-স্নেহের বিবিধ প্রকাশের প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন; সেইরূপ অনন্যসাধারণ সাধনসম্পদ-সম্পন্ন সদ্‌-গুরুগণই নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পুরাতন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন। প্রত্যেক বিদ্যার শাস্ত্রই, বহুকালব্যাপী সাধনা দ্বারা যাঁহারা সেই বিদ্যাকে প্রকৃতভাবে অধিগত করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যাপক ও আচার্য্যগণের শিক্ষার সত্যাসত্যের সাক্ষ্য দেয়; আর এই সকল অধ্যাপক এবং আচার্য্যগণও নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে আপনাদের বিদ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। অতএব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে সদ্‌গুরুর প্রামাণ্য ও প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? অথচ মার্টিন লুথার-প্রবর্ত্তিত Protestant খৃষ্টীয় সাধনা ধর্ম্মসাধনে যেমন শাস্ত্রের ও স্বাভিমতের সেইরূপ সদ্‌গুরুরও যে একটা সঙ্গত স্থান ও অধিকার আছে, ইহা অস্বীকার করে। ইহার ফলে প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মনির্দ্ধারণে প্রাকৃত জনের অসংস্কৃত বিচারবুদ্ধি এবং লৌকিক ন্যায়ের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান এই প্রমাণদ্বয়ই একমাত্র কষ্টিপাথর হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে প্রাকৃত বুদ্ধি বিচারের প্রাবল্য হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্যমর্য্যাদাটুকুও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই রূপেই য়ুরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তার বা Free Thought এর এবং যুক্তিবাদের বা Rationalism এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্বাধীনচিন্তা ও যুক্তিবাদ প্রবল হইয়াই য়ুরোপীয় লোকচরিত্রে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইয়া তুলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানই ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গ-মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ও আত্মচরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে। আমার বুদ্ধি যাহা সত্য বলে তাহাই কেবল সত্য, সত্যের আর কোনো বাহিরের প্রামাণ্য নাই, আমার সংজ্ঞান বা Conscience যাহাকে ভাল বলে তাহাই ভাল,—ইহার উপরে ভালমন্দের আর কোনো উচ্চতর বিচারক নাই—এই বস্তুকেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনা স্বাধীন চিন্তার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবেই য়ুরোপে স্বাধীনতার নামে একটা অসঙ্গত ও অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া উঠে, এবং ইহার ফলে ক্রমে সমাজের গ্রন্থি শিথিল, ধর্ম্মের প্রভাব ম্লান এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও সত্য ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক ভারতে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার

ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও এই য়ুরোপীয় স্বাধীনচিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের প্রাণে স্বাধীনতার নামে একটা অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের সূত্রপাত করে। এই ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার-চেষ্টার বহুবিধ ভ্রম-ত্রুটী এবং অসম্পূর্ণতাসত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনগঠনের জন্য তাহা

যে একান্তই প্রয়োজন ছিল, কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত না হইলে কেহ এ জগতে সত্যের সাধনা করিতে পারে না। এই সংস্কারবর্জ্জনের নামই চিত্তশুদ্ধি। কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়েরই আত্মচরিতার্থতালাভের জন্য এই চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক হয়। 'নেতি'র ভিতর দিয়াই 'ইতি'তে যাইতে হয়। ব্যতিরেকী পন্থার পরেই অন্বয়ী পন্থার প্রতিষ্ঠা। ইহাই আমাদিগের প্রাচীন বেদান্তের শিক্ষা। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল, Through Eternal Nay to Eternal Yea, এই সূত্রে আমাদের এই প্রাচীন উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সমাজের সকল অযৌক্তিক বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া, ধর্ম্মের শাস্ত্রবদ্ধ সকল অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও সংজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইতে যাইয়া, আমাদিগের দেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায় এই নেতি বা "না"-এর পথ ধরিয়াই, নিজেদের ও সমাজের চিত্তশুদ্ধিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙালী শিক্ষিত সমাজ যেরূপ আগ্রহ সহকারে যতটা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া এই নূতন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন, ভারতের আর কোনো প্রদেশের লোকে সেরূপ করেন নাই। আর এই সাধনবলেই আধুনিক স্বাধীনতার আদর্শ বাংলাদেশে যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে ভারতের আর কোথাও সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই।

বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্য্যার আদর্শ

ফলতঃ যে যাহাই বলুন না কেন বাংলার নিকট হইতেই যে ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসিগণ বহুল পরিমাণে এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বদেশচর্য্যার উদ্দীপনা লাভ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারত যখন নিদ্রিত, কেবল বাংলাই তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয় নাই, বাঙালী তখনও এই মুক্তিমন্ত্রসাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই জন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সজীবতা বাঙালীর স্বাদেশিকতার ধর্ম্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা, এ সকল এ পর্য্যন্ত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্ম-সংস্কার-চেষ্টা একদিকে নূতনকেও নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অন্যদিকে পুরাতনের সনাতন প্রাণ-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেও সজীব ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু নূতনের কুযুক্তি এবং পুরাতনের কুসংস্কারের মধ্যে একটা খিচুড়ী পাকাইবারই চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ-সংস্কারচেষ্টাতেও অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতিদোষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া বাংলা আপনার বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী শুদ্ধ শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, প্রেয়ের পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সমাজ সংস্কারের চেষ্টাতে ন্যায়ের প্রেরণা অপেক্ষা সুখের প্রলোভনই বলবত্তর হইয়া আছে। সত্যের আনুগত্য অপেক্ষা সুবিধার অন্বেষণই তাহাতে বেশী। অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত একটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান

রহিয়াছে। কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রীয় আদর্শ চির দিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক একত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেইরূপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, কেবল বাংলা দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর অন্যান্য প্রদেশের স্বাদেশিকতাও একদিকে ভারতের সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আর অন্যদিকে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব-হিতৈষা ও বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই। এই স্বাদেশিকতা কোথাও বা একটা অন্ধ,অযৌক্তিক স্থবির ও গতানুগতিক রক্ষণশীলতার, আর কোথাও বা একটা শ্রেয়-জ্ঞানশূন্য প্রেয়-সন্ধিৎসু বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষেরই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র হইয়া আছে। অনেক স্থলেই এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার যথোপযোগ্য সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল বাংলা দেশেই আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalismএর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইহার কারণ এই যে ইদানীন্তন কালে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসিগণ এ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার অবসর পান নাই। বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন,— রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

পরযুগের যুগ-আদর্শ ও রাজা রামমোহন

বাংলার এবং বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেরই, আধুনিক ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু রাজা রামমোহন। ইংরেজি শিক্ষায় ইংরেজের শাসনে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভাই সম্যক্‌রূপে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া, কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে, ইহা দেখাইয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন কিরূপে সমাজজীবনের সকল বিভাগে এই নূতন যুগধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে, নানা দিক্ দিয়া, ঋজু কুটিলভাবে, বিগত শত বৎসর ধরিয়া, দেশের শ্রেষ্ঠজনেরা নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। এই শতাব্দব্যাপী সাধনার বলে সেই আদর্শ ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হয় নাই।

কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ যোগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত করিয়াও আপনার কর্ম্মজীবনে বিশেষভাবে তার তত্ত্বাঙ্গ বা theoretic sideই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন যুগের সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় ও তাহার প্রাণহীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্ম্মজঞ্জাল পরিষ্কার করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার সমুদায় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। রামমোহনের শিক্ষা

সমাজজীবনের সকল অঙ্গকেই অধিকার করিয়াছিল সত্য। একদিকে যেমন ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ, উভয় অঙ্গকেই তিনি সুশোভিত ও সুসংস্কৃত করিয়া, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বনেই তাহাকে সত্যোপেত ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজজীবনেও যে সকল অহিতাচার পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কারসাধনে সময়োচিত যত্ন করিতে ক্রটী করেন নাই। আর দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেও যাহাতে প্রজা-সাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয়, রাজা রামমোহন সে দিকেও যথাযোগ্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কর্ম্মজীবনের এই ব্যাপকতা ও বহুমুখীনতা সত্ত্বেও রাম-মোহন বিশেষভাবে ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কোনও একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে কোনও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহাকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য রাজা রামমোহন নবযুগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাঁহার কর্ম্মের ঝোঁক যে ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

রাজার স্বাধীনতার আদর্শ

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূল মন্ত্র ছিল। ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনার স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজা বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিগূঢ় যোগ ছিল। বেদান্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া, ইদং প্রত্যয়বাচক সর্ব্ববিধ অনাত্ম-বস্তুর ঐকান্তিক অধীনতা হইতে, অহং প্রত্যয় বাচক আত্ম-বস্তুকে মুক্ত করাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ মোক্ষ-সম্পর্ক ছিল। আর এই মোক্ষ-সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। রাজার দেশ-প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই। অন্য-দিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদকেও একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও রামানুজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভারতের প্রাচীন ঋষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপের

উচ্চতম সামাজিক আদর্শের একটা অপূর্ব্ব সঙ্গতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের ন্যায়, রামমোহন কি তত্ত্ববিচারে কি ধর্ম্মসাধনে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎ-পরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্দ্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্যদিকে লুথারের ন্যায় রাজা শাস্ত্রার্থ-নির্দ্ধারণে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এইজন্যই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture এবং Private Judgment এর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে, সদ্‌গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এইরূপেই রাজা রামমোহন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজার সামাজিক সিদ্ধ

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতেরও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের বর্ত্তমান যুগ-আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ-জীবনের শৈশবে জগতের সর্ব্বত্রই সমাজের কর্ম্ম বিভাগ বংশ-মর্য্যাদার অনুসরণ করিয়া চলে। যে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বংশের পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম ও অধিকারই সমাজ-জীবনে তার নিজেরও কর্ম্ম ও অধিকার হয়। যখন পিতা বা পিতৃব্য বা তাঁহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই প্রত্যেক শিশুর একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বাল্যশিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে জীবিকা উপার্জ্জন করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের কুলধর্ম্মই সমাজ-দেহে তাহার বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম্ম ও অধিকার-ভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিতও ছিল। সমাজ-বিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

এই সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিয়াই যে অভেদ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জগতের আর কোনো জাতি সমাজ-জীবনের শৈশবে ও কৈশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন

নাই। সুতরাং এই আশ্রমধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দু সাধনার সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাবসুলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতিসুলভ রজোগুণ হারাইয়াও কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্য্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থে প্রাচীন কুলধর্ম্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই জন্যই গীতায় ভগবান প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে, গুহ্যাদপি গুহ্যতম যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন ঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অতএব বর্ণাশ্রমপ্রধান হিন্দুর সমাজতত্ত্বেও সর্ব্বকর্ম্মন্যাসপূর্ব্বক, মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্ম্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই, সমাজজীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য প্রথমে ঐকান্তিক সমাজানুগত্য, তৎপরে সমাজের এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মার্পণ, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন,—এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্ম্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুয়ানী নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, লোক সংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর আশ্রম-বিরহিত সুতরাং ধর্ম্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মজীবনের সংস্কার সাধনার্থে, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াই, লোক-শ্রেয়কে একমাত্র প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্ম্মতত্ত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে কিম্বা সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

কিন্তু এই উন্নত, উদার, একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদর্শটাই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব, তখনও সে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র এবং অন্য দিকে সুরেন্দ্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

তরুণ-রবি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দার্শনিক শিশুর দুইটী গান ঘুমপাড়ানো। (১) 'সাতভাই চম্পার' গান জগদ্বিখ্যাত। সকল দেশের কাব্য কিংবা পুরাণেই (mythology) ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে, (২) 'বিষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ,' এবং 'শিবঠাকুরের বিয়ে', ও 'তিন কন্যের' কথার তত্ত্ব এখনও অন্যদেশের স্ত্রীমহলে প্রচারিত হয় নাই।

"ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং
যত্রেসা বিশ্বভুবনাধিতস্থুঃ'
(ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত)

কোন্ কালের মহাপ্রলয়ের পর এই বিশ্বভুবনের ত্রিলোকস্বরূপ নাভিচক্রের সহিত শিবঠাকুর সংযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সেই মৌলিক জন্মবৃত্তান্তের সহিত শিশুর নিগূঢ় স্মৃতির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সে তাহা শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঘুমাইয়া পড়ে।

"কবে বিষ্টি পড়েছিল
বাণ এল সে কোথা ?
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা ;
তিন কন্যে বিয়ে করে
কি হ'ল তার শেষে ?
না জানি কোন নদীর ধারে
না জানি কোন দেশে !
কোন ছেলেরে ঘুমপাড়াতে
কে গাহিল গান
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদী এল বাণ !"

এই অতুল গৌরবময় আধ্যাত্মিক জন্মকাহিনী কবি পরে প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্বে বুঝাইবেন। এখন কেবল শিশু তাহার কবিতা শুনিয়া বিস্মিত হউক।

বহুপূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ আদিত্যের সপ্তপুত্রকে দেখিয়াছিলেন,

শ্বতপৃষ্ঠো অস্যত্রাপশ্যং বিশ্‌পতিং
সপ্ত পুত্রং (১ম মণ্ডল—১৬৪ সূক্ত)

কবি পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে তাহারা মাতার (প্রকৃতির) মনের মধ্যেই ছিল।

'মাতা পিতর মৃত বভাজ ধীত্যগ্রে
মনসা সং হি জন্মে'
(১ মণ্ডল—১৬৪ সূক্ত, ঋগ্বেদ)

এই যে আদিত্যের রশ্মিকণাস্বরূপ কুমারগণ তাহাদের সঙ্কল্প কি ?

'জেনো মা এ সুখে দুঃখে আকুল সংসারে,
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না কো'রো না অবিশ্বাস।

আবার,

'তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্রে করিয়া নিষ্ফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ,
পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে,
যেন দুটী বাল্মিকীর শ্লোক।
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে
করুণার অমৃত নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে।'

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে করবলার ক্ষেত্রে স্বীয় পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত মহম্মদীয় ধর্ম্মের দ্বিতীয় ইমাম হুসেনের তৃষ্ণা, শোণিত দিয়াও মিটে নাই। ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের সন্তান যীশুর তৃষ্ণা এখন ধর্ম্মজগতের রহস্যময় কথা, চিতোরের জলন্ত চিতায়ও যে তৃষ্ণার সামঞ্জস্য হয় নাই, এই স্বার্থপূর্ণ জগতে সে তৃষ্ণা কে মিটাইবে?

মাতার করুণা।

তবে মাতা পাষাণী কেন? চারিদিকে নৃশংসতার হানাহানি কেন?

'এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন।'

এই পরিপূর্ণ জীবন, পরিপূর্ণ সংসার এবং সমাজ অলক্ষ্যে আসিতেছে। শিশু তাহা পরে দেখিবে।

'This fine old world of ours is but a child
Yet in the go-cart. Patience! Give it time
To learn it limbs: there is a hand that
guides

* * * * * * *

When the war-drum throbs no longer,
and the battle flags are furled
In the Parliament of men, the Federation
of the world,

টেনিসনের ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এ পথে
"The little boys will shoot and stab"

এই খুনাখুনি ছাড়া কি সম্পূর্ণ জীবনের অন্য পথ নাই। এ শাক্ত মন্ত্র ছাড়া কি কোন বৈষ্ণবী মন্ত্র নাই?

ভারতবর্ষ তাহা জানিত এবং সমগ্র জগতের ভারতবর্ষের নিকট তাহা লিখিতে বাকি আছে।

'যেদিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিক হেরিবে সবে পথ!
অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ!
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি
চেয়ে দেখ আকাশের পানে
পড়ুক বিমল বিভা, পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমলনয়ানে!'

শিশুর বাসনা করুণা-বিজড়িত,

'যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ!
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক।'

এই প্রেমের পথেই কবি আদর্শ শিশুকে অঙ্কে লইয়া অফুরাণ পথে যাইতে চাহেন।

সে পথ বসন্তময়, জরাশোক বর্জ্জিত।

"The Lark
Soars up and up shivering for very joy;
Afar the ocean sleeps; white fishing gulls
Flit where the strand is purple with its tribe
Of nested limpets; savage creatures seek
Their loves in wood and plain—and God
renews
His ancient rapture."

—Browining.

করুণাময়ী মা শিশুকে ক্রোড়ে লউন। যখন মায়াতরবারি লইয়া বিশ্বগৃহ-প্রাঙ্গণে ভাই ভাই খুনাখুনি করিবে তখন মাতার অশ্রু দেখিয়া তাহারা ভুলিয়া যাইবে। খুনাখুনির মধ্যে আমরা জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, আত্মার এবং জড়ের অমরত্ব দেখিতে চাহি না। মহাভারতের আমল হইতে আমরা কৃষ্ণের জীব। কৃষ্ণ যদুবংশ প্রভৃতি ধ্বংস করুন। আমরা যেন অচল আয়তনের মধ্যে থাকি। কবি যেন সেটা ভুলিয়া না যান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

দ্বিপ্রহর—বর্ষানিশা

১

দ্বিপ্রহর; বর্ষানিশা;
অন্ধকার দশ দিশা,
দুর্গদ্বারে একা সান্ত্রী মত,
জীবনে জাগিয়া অবিরত!

২

প্রতি পলে, প্রতি শ্বাসে
জীবন গুটায়ে আসে—
বুঝিতেছি অতি পরিষ্কার!
উঠি, বসি, চলি বার বার।

৩

নিশা না পোহাতে চায়,
জীবন না ছুটী পায়!
দূরে বাজে রাজার তোরণে
তৃতীয় প্রহর—কতক্ষণে!

৪

একে একে, গণি গণি—
মিলাল ঘটিকা-ধ্বনি
দুলে দুলে সমীরে, তিমিরে,
নদীপারে অরণ্যের শিরে।

৫

দ্বিগুণ নিস্তব্ধ সব;
করিতেছি অনুভব—
নিশ্বাস হ'তেছে ক্ষীণতর,
বাড়িছে মৃত্যুর পরিসর।

৬

কিছুতে কাটে না কাল,
রচিতেছি চিন্তাজাল
কত কি যে জড়ায়ে—জড়ায়ে,
'গুটী' সম, আপনা হারায়ে।

৭

মাঝে কোথা ভুলে যাই—
আকাশের পানে চাই
অভ্যাসে জুড়িয়া দুই কর।
শূন্য দৃষ্টি—কি শূন্য অন্তর!

৮

পেচক ডাকিল দূরে,
বাদুড় পলাল উড়ে,
ফেরুপাল করিল চীৎকার।
অচল অটল অন্ধকার।

৯

নাহি আশ, নাহি ত্রাস,
খুলে দেছি বক্ষোবাস,
এস মৃত্যু, নির্ম্মম বিজয়ী!
প্রতীক্ষায় শত মৃত্যু সহি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

মিলন *

প্রিয়তম,

আজ ছেলেবেলার একটা খেলা মনে পড়িয়াছে। তোমার সঙ্গে কতদিন সে খেলা করিয়াছি। আজ এস সেই খেলা খেলি, আজ তুমি আর ইহলোকে নাই—কিন্তু আমি মনে করিব যেন তুমি বাঁচিয়া আছ, আর আমি তোমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পত্র লিখিব—যেন তুমি পড়িবে। কেন জান?—এ সংসারে আমার দুঃখের কথা বলি—এমন কেহ নাই। তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই বা আমাদের আপনার বলিবার কে ছিল?

প্রিয়তম, যখন কবরের ধারে দাঁড়াইয়া, কফিনের উপর তোমার নাম পড়িলাম, তখনও আমি সে ভীষণ সত্য সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারি নাই! আমার সমস্ত হৃদয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—আমি যেন সমস্ত অনুভব-শক্তি হারাইয়াছিলাম—শোক, দুঃখ কিছুই মনে আসিতেছিল না। পাদরী যখন গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়িতেছিলেন তখন আমি তাঁর হাতের দিকে চাহিয়াছিলাম এবং অত গরমেও যে কেন তিনি গরম দস্তানা পড়িয়াছেন—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম—তুমি বলিতে যে পাদরী সাহেবের মুখ খানা যেন ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত। তুলনাটা মনে করিয়া হাসি আসিতেছিল। পাশে দেখি তোমার পিসি চোখ রগড়াইয়া রগড়াইয়া অনেক চেষ্টার পর এক ফোঁটা জল বাহির করিয়া চারিদিকে দেখিতেছিলেন—কেহ তাঁর চোখের জল দেখিল কি না। তখন আমার বেশ একটু আমোদ বোধ হইতেছিল। আমার মনে হইতেছিল যেন আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখিতেছি ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিব জানালা দিয়া রোদ আসিতেছে তুমি পাশেই শুইয়া আছ—তোমাকে জাগাইয়া স্বপ্নের কথা বলিয়া দু'জনে খুব হাসিব।

হঠাৎ মাটি পড়ার শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল—সব কথা মনে পড়িয়া গেল—হা জগদীশ্বর! তবে ইহা স্বপ্ন নয়—সব সত্য! আমি আর থাকিতে পারিলাম না—তোমার পার্শ্বে যাইবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলাম—কে আমার হাত ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম তোমার ভগিনী ইদা—সে পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সকলেই কাঁদিতেছে! আর আমি, আমি হতভাগিনী—যে তোমাকে জীবনে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে,— আমার পোড়া চোখে এক ফোটা জল নাই! আর যারা কাঁদিতেছে তারা কি তোমাকে আমার মত ভাল বাসিত!

কাতরকণ্ঠে ইদাকে বলিলাম, "আমাকে ছাড়,—আমি আর ঘরে ফিরিব না—আমি আমার প্রিয়তমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না! আজ তিন বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে—এক দিনও সে আমাকে ছাড়িয়া থাকে নাই—আজ সে একলা কেমন করিয়া থাকিবে! তাহারই পাশে আমার স্থান।"

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

ইদা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল, বলিল,—"এত অধীর হয়ো না, একটু শান্ত হও, তুমি সহমরণে যাবে না কি?"

ঠিক কথা, সহমরণে যাওয়ার প্রথা ত আমাদের নাই! হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হউক, কিন্তু সমাজের বিধি ত টলিবার নয়—সে ত নির্ম্মম—অটল! তারপর কি হইল ঠিক মনে নাই। সকলে বাড়ী ফিরিয়া খানায় বসিল—আমাকেও বসিতে হইল; সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাও কহিতে হইল—আহারের ভানও করিতে হইল। জগতের কাছে ইহারই নাম 'ধৈর্য্য'—নিমন্ত্রিতদের খাতির আমার প্রথম কাজ—নববৈধব্যের দুঃখ—সে ত পরের কথা! ইহাই সামাজিকতা! কিন্তু কে যে কি বলিল আর আমি যে তার কি উত্তর দিলাম—তাহা জগদীশ্বরই জানেন, আমার একটুও মনে নাই!

তারপর আমি পাশ কাটাইয়া তোমার ঘরে গেলাম! সে ঘর তেমনিই অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে! তুমি যেখানে যে জিনিষটা রাখিয়া গিয়াছ, তেমনিটিই রহিয়াছে! দাসী জানিত সে ঘরের কোন জিনিষে হাত দেওয়া আমি পছন্দ করি না—তোমার ঘরটি আমি নিজে গোছাইতাম তুমি হাসিতে। আজো তেমনি সব অগোছানো হইয়া রহিয়াছে। একটা আরাম-কুর্চ্চির উপর তোমার গল্‌ফ খেলার ছড়িটা, একটা চেয়ারের উপর ফোটোগ্রাফ তোলার যন্ত্রটা, একটার উপর কতকগুলো ছবির কাগজ! আর টেবিলের উপর তোমার গল্‌ফ খেলার জামাটা পড়িয়া আছে। আমি জামাটাতে মুখ লুকাইয়া, সেটাকে বার বার চুম্বন করিলাম। আমার চোখে কিন্তু জল ছিল না। কেবল বিধাতাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিলাম—এটা কি পাপ!

এ ত গেল কালকের কথা। আজ সকালে আমি তোমার কবরের কাছে গিয়াছিলাম। চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ—প্রভাতালোকে হাসিতেছে। ক্ষণেকের জন্য আমি আমার দুঃখ ভুলিয়া গেলাম, বিধাতার উপর রাগ করিতে ভুলিয়া গেলাম, অনেকক্ষণ তোমার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম—ভাবিতেছিলাম তুমি আমার আসা জানিতে পারিয়াছ কি না? হয় ত রাত্রে একলা একলা তোমার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই ভাবিতেছিলাম। এমন নির্ব্বোধ আমি! আমি জানি তোমার নিষ্পাপ আত্মা চিরসুখের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি ত কেবল তোমার আত্মাটিকেই ভাল বাসিতাম না—আমি যে তোমার হাসিদুষ্টুমিমাখা মুখখানি—তোমার সর্ব্ব-শরীরকে ভাল বাসিতাম। তোমার সেই সুন্দর সহাস্য মুখখানি মনে করিয়া বিধাতার উপর আক্রোশ ফিরিয়া আসিল। জগতে এত কদাকার, এত পাপী থাকিতে আমার প্রিয়তমের সে দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবার তাঁর কিসের অধিকার!

আত্মীয়-স্বজনেরা মনে করিলেন এ সময়ে একা থাকা আমার পক্ষে ভাল নহে—তাই পিসিমা আমার কাছে রহিয়া গেলেন। আমাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য তিনি নানান্ বই পড়িয়া শুনাইতে

লাগিলেন! তিনি চলিয়া গেলে যে আমি কত সুখী হইতাম—তাহা তিনি বুঝিলেন না।

প্রিয়তম, আজ এখন বিদায়! আমি শুইতে যাইতেছি; কিন্তু বারান্দাটা বড় অন্ধকার, আমার ভয় করিতেছে। তোমার ত মনে আছে অন্ধকারে আমার বড় ভয়—রাত্রে তোমার আগে শোবার ঘরে যাইতে হইলে আমি নানা ওজর করিয়া তোমার জন্য বসিয়া থাকিতাম। রাত্রিতে আমার বড় ভয়! কাল রাত্রে আমি একবারও ঘুমাই নাই, সমস্ত রাত ঘড়ি বাজা শুনিয়াছি। এত দুঃখেও আমি জগদীশ্বরকে ডাকিতে পারি নাই—যে এত নিষ্ঠুর, তাকে ডাকিয়া কি হইবে।

তোমার আদরের

হেলেন।

(২)

বুধবার

আমার প্রিয়তম,

আজ বৈকালে পাদরী সাহেব আসিয়াছিলেন—প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তোমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন—বলিলেন তুমি বড় ভাল লোক ছিলে। আমার একবার মনে হইল জিজ্ঞাসা করি—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?" কিন্তু কিছু বলিলাম না—বলিলে অভদ্রতা হইত। তারপর তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"জগদীশ্বর যাহা করেন ভালর জন্যই।"

"ভালর জন্য!" এই যে তিনি তোমার মত বলিষ্ঠদেহ, কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে যৌবনের পূর্ণ উদ্যমের মধ্যে সংসার হইতে কাড়িয়া লইলেন, ইহাও কি ভালর জন্য—আমাকে কি ইহাই বিশ্বাস করিতে হইবে! আমি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না, বলিলাম,—"আমাকে ও সব কথা বলিয়া কোনো ফল নাই। তোমরা যে বল পরমেশ্বর দয়াময়, তাহা মিথ্যা; কেবল মানুষকে ভুলাইবার উপায় মাত্র। তিনি দয়াময় হইলে আজ আমার প্রিয়তম আমাকে ছাড়িয়া যাইতেন না—আমার এমন ঈশ্বরে আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই।"

দেখিলাম বৃদ্ধ আমার কথায় অত্যন্ত আঘাত পাইলেন—কি করিব, তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন আমিও থাকিতে বলিলাম না। আমার চা'য়ের টেবিলে স্থান না পাওয়ার জন্য কিম্বা অবিশ্বাসের জন্য তাঁর বেশী দুঃখ হইল—বুঝিলাম না। না, এ কথা আমার বলা ভাল হইল না, আমি বড় দুষ্ট, আর এমন কথা বলিব না; প্রিয়তম, আমার দোষ লইও না।

পিসিমা আজ সন্ধ্যার সময় চলিয়া যাইবেন। আজ তিনি আমার উপর বড় চটিয়া গিয়াছেন। আহারাদির পর আমি চুপ করিয়া বসিয়া তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, তাঁর ইচ্ছা আমি তাঁর সঙ্গে একটু তাস্ খেলি, আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। তিনি একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন—"দেখ, দিন রাত কি দুঃখ পুষে রাখবে? মনকে স্থির কর—বাছা আমার স্বর্গে গিয়াছে—সে এখন সুখেই আছে।" "এখন কেন, সে ত আমার কাছে, জীবনেও সুখী ছিল! তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে সে

স্বর্গেই সুখে আছে! তার কথা, তোমার মুখে আমার ভাল লাগে না। তুমি স্বর্গের কি খবর রাখ?"

পিসিমা ত চটিয়া আকুল—একেবারে ঘরে গিয়া বাক্স গোছাইতে বসিলেন। আমি জানি এতটা রূঢ় কথা আমার ভাল হয় নাই। কিন্তু পিসিমা যখন চোখদুটো আকাশের দিকে করিয়া মুখটা অন্ধকার করিয়া স্বর্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন আমি কোন মতেই ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না। যেন স্বর্গটা তাঁর ইজারা মহল—যেন তিনি সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই শীতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া টিকিটও খরিদ করিয়াছেন।

আজ বাড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ। তুমি যে নাই আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার আসার আশায় বসিয়া আছি, যেন এখনি তোমার পায়ের শব্দ শুনিব। তুমি যখন আসিতে দুম্‌দাম্ করিয়া দরজাগুলো খুলিয়া, একসঙ্গে দু'তিন সিঁড়ি লাফাইয়া একেবারে ঝড়ের মত আমার ঘরে ঢুকিতে। আমি বড় রাগ করিতাম—তুমি হাসিয়া বলিতে—"রাগ করো না, লক্ষ্মীটি! আমি সামলাইতে পারি না—আমি চিরকালই ঝড়ের মত দুরন্ত।"

আর আজ! আজ তুমি পাথরের মত স্থির!

হা ঈশ্বর! এমন করিয়া আর কত দিন বাঁচিব! প্রিয়তম, আজ আর লিখিতে পারিতেছি না, আমার সর্ব্ব কাঁপিতেছে। তোমারই হেলেন।

(৩)

প্রিয়তম,

আজ তোমার সেই ছোট ডায়েরীখানি পড়িতেছিলাম। এই ক্ষুদ্র লাল বইখানি লইয়া তোমার সঙ্গে কত কাড়াকাড়ি করিয়াছি, মনে আছে? তোমার মৃত্যুর—না না, তুমি চলে যাওয়ার পর এ পর্য্যন্ত এক দিনও আমি চোখের জল ফেলি নাই, আজ তোমার ডায়েরী পড়িতে পড়িতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছি।

তোমার অসুখের আগের দিন পর্য্যন্ত তোমার লেখা আছে।

"আজ বৈকালে টেনিস্ খেলিলাম। * * সন্ধ্যায় হেলেনকে লইয়া থিয়েটারে গিয়াছিলাম, খুব ভাল লাগিল।"

এ কথায় কাঁদিবার কি আছে?

"মঙ্গলবার ২৬শে—আজ হেলেনের শরীর ভাল নাই, আমিও কোথাও যাই নাই, খেলা বন্ধ। দিনটা বড় খারাপ।"

"বুধবার ২৭শে—আজ হেলেন ভাল আছে। আজ দিনটা খুব আনন্দে কাটিয়াছে। সমস্ত দিন বৃষ্টি আমি ছেলেগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলিলাম।"

* * * * *

ত্রিশবৎসর বয়সেও তোমার ছেলেমানুষী যায় নাই—তুমি বালকের মতই সরল ছিলে। আমার একটু মাথা ধরিয়াছিল তাই খেলাধূলা বন্ধ করিয়াছিলে, আমি ভাল আছি সেই আনন্দে তুমি সহিসের ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতে গেলে।

আজ সমস্ত জগৎ আমার কাছে অন্ধকার,

কোন আশা, কোন আলো দেখিতেছি না। জানি না তোমাকে হারাইয়া এমনি দুঃখের ভিতর কতদিন বাঁচিতে হইবে। হা ভগবান—আমার কি কোন উপায় নাই!—না, না ভগবানকে ডাকিব না—তিনি ত নিষ্ঠুর!

হেলেন।

(৪)

শুক্রবার

প্রিয়তম,

কাল সমস্ত রাত ভেবে ভেবে আমি একটা উপায় স্থির করেছি! আচ্ছা, আমার কাঁদার কি দরকার। তুমি চলিয়া গিয়াছ এখন এ জীবন ত আমার—ইহা রাখি না রাখি আমার হাত! বেশ কথা! কথাটা লোকে ভাল বলিবে না, জানি। কিন্তু মনে কর, ডাক্তার আমার ঘুমের জন্য যে ওষুধটা দিয়েছে—সেইটি যদি একটু বেশী করে খাই—খেয়ে একবারে ঘুমিয়ে পড়ি—তারপর, যখন জাগিব—দেখিব তোমার কাছে পৌঁছিয়াছি; বেশ মজা হয়! আমি কি বোকা, এ সোজা কথাটা আগে কেন মাথায় আসেনি?

আজ মিসেস্ ওয়েলস্ আসিয়াছিল, সমস্ত ক্ষণ কেবল তোমার গুণগান করিল—তোমার মত ভদ্রলোক না কি সে কখনও দেখে নাই! কি মিথ্যুক! তোমার ত মনে আছে যে একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তুমি চাকরকে বলিলে—"বল গে আমরা দু'জনেই মরিয়া গিয়াছি।" দরজাটা খোলা ছিল, মিসেস্ ওয়েলস্ সব কথা শুনিতে পাইয়াছিল। আর আজ সে আসিয়াছে তোমার সুখ্যাতি করিতে? সে কথা যাক্।

তোমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে, এই আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। ক'দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই বসিয়া বসিয়া তোমাকে মনে আনিতেছিলাম। মনে পড়িতেছিল তুমি যেন টেনিস খেলিয়া ফিরিতেছ—সাদা ফ্লানেলের পোষাকে তোমার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ আরো সুন্দর দেখাইতেছে! তুমি যেন নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছ—সর্বাঙ্গ তোয়ালে জড়ান—মাথার চুলগুলো এলো মেলো—আজ তোমার সেই 'ভীমকান্ত'রূপ মনে পড়িতেছে।

আচ্ছা, তুমি কি জানিতে আমি তোমাকে কতটা ভাল বাসি? না! আমি ত তোমাকে সব বলিতে পারি নাই। পুরুষ মানুষ যত-টুকু বুঝিতে পারে, তুমি ততটুকু বুঝিতে—তার বেশী নয়!

তোমার ঘরে, তোমারই টেবিলে বসিয়া আমি লিখিতেছি। তুমি চিরকালই অগোছালো—টেবিলের চারিদিকে কাগজ পত্র ঘর ছড়ান, তুমি যে বইখানা পড়িতে-ছিলে, সেখানা তেমনি খোলাই পড়িয়া রহিয়াছে।

কাল তোমার জন্মদিন! আজ ত আমার মরা হবে না। কাল সকালে যে তোমার গোরটি ফুল দিয়ে সাজাইতে হইবে। আমাদের মিলন আর এক দিন পিছাইয়া গেল। এ একদিন—কি করিয়া কাটাইব?

তোমার আদরের

হেলেন।

(৫)

শনিবার

প্রিয়তম,

আজ সকালে তোমার কাছে গিয়াছিলাম। নানা রংয়ের চন্দ্র মল্লিকায় তোমার গোর সাজাইয়া আসিয়াছি—"আমাদের সুখের দিনের জন্মোৎসব স্মরণ করিয়া—আবার প্রিয়তমকে এই ফুলগুলি উপহার দিলাম।"

* * * * *

আর কয়েক ঘণ্টা দেরী, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।

তোমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি। গত বৎসর এমনি দিনে তুমি—এই চেয়ার খানায় বসিয়াছিলে। সে কি আনন্দের দিন—সে দিনের কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিজে চা তৈয়ার করিয়া আমাকে দিলে এবং চা খাইয়া চুরোট ধরাইয়া গল্প করিতে বসিলে। আজো যেন সে চুরোটের গন্ধ ঘরটার মধ্যে রহিয়াছে। সুখের দিনের ছোটখাট সামান্য ঘটনার স্মৃতি দুঃখের দিনে কেন কষ্টকর—বলিতে পার ?

যাক্ সে কথা—আর ত ঘণ্টা কতক আছে !

* * *

এখন রাত্রি ১০টা। হঠাৎ আমার একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা আসিয়া জুটিয়াছে। আচ্ছা, আমি যে আত্মহত্যা করিব—তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে ত। আত্মহত্যা যদি পাপ হয়, তবে ত মৃত্যুর পর তোমার কাছে আমি যাইতে পারিব না। তবে! কাল যখন লোকে জানিবে আমি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছি, ডাক্তার আসিয়া বলিবে—আমার মাথা খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু এ কথায় ত পরমেশ্বরকে ভুলান যাইবে না। তবে কি করিব ! না, আমাকে মরিতেই হইবে—তোমাকে ছাড়িয়া এ জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে বড় কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে ! প্রিয়তম, তুমি এ সময় যদি একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও আসিতে ! জগদীশ্বর, আমি তোমার অনন্ত দয়া, অপার করুণা সকলই বিশ্বাস করিব। পাদরী সাহেব যে বলিয়াছিলেন—যে তুমি যাহা কর সবই ভালর জন্য—আমি তা'ও ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইব—কেবল একবার মাত্র—এক মিনিটের জন্য আমার প্রিয়তমকে আমার কাছে আসিতে দাও, আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—কেবল এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইব ! আমি আর এ প্রার্থনা করিব না, আর কিছু চাহিব না !

* * *

প্রিয়তম এক বার এস ! একবার মাত্র ! এ নিরানন্দ গৃহে এ নির্জ্জনতা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, আর ত পারি না। একবার এস, প্রিয়তম। হেলেন।

(৬)

রবিবার

প্রিয়তম,

কাল তুমি স্বপ্নে আমার কাছে আসিয়াছিলে। তুমি আমার হাত দুটি ধরিয়া, কাণের কাছে মুখ আনিয়া আমাকে বলিলে, —"হেলি, এমন ছেলেমানুষি করলে ত চলবে না। তোমাকে একটু শক্ত হ'তে

হ'বে। মনে রেখো—আমরা আবার সুখী হ'ব, আমাদের আবার মিলন হ'বে—হয় ত খুব শীঘ্রই হ'বে।"

আমি যেন তোমার গলা জড়াইয়া তোমাকে আদর করিতে গেলাম—এমন সময় আমার সে সুখের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল—ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! তুমি আমাকে শক্ত হইতে বলিয়াছ—আমি শক্তই হইব। ভাগ্যে কাল রাত্রে সে ওষুধটা খাই নাই—তা' হ'লে ত তোমার কথার অবাধ্য হইতাম। আমি তোমার কথাই শুনিব—আমি মনকে দৃঢ় করিব। আমি হাসি মুখে তোমার সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষা করিব। পরমেশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন—আর আমি তাঁর নিন্দা করিব না। আমি শক্ত হইব—যেন তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তুমি আমার উপর রাগ করিবে না।

আজ কি সুন্দর দিন,—সমস্ত পৃথিবী আজ আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছে—আকাশে মেঘে কি রংয়ের বাহার! এমন দিন আসিলে তুমি বলিতে—আজ গল্‌ফ খেলার দিন—তুমি চিরদিনই এমনি অকবি!

কাল মালী ফুলের গাছগুলো দেখিবার জন্য বলিতেছিল—আমার উৎসাহ ছিল না। তুমি ডাফোডিল ফুল বড় ভাল বাসিতে—এবার ডাফোডিলে বাগান আলো হইয়া উঠিবে! দেখো,—আমি বাগানটিকে কেমন সুন্দর করিয়া তুলিব।

* * * *

রবিবার সন্ধ্যা।

প্রিয়তম,

আমি ঠিক করেছি কাল লণ্ডনে যা'ব। দিন কতক গিয়া ইদার কাছে কাটাইয়া আসি। তুমি ত জান নভেম্বর মাসে কুয়াসায় আর বৃষ্টিতে এ জায়গাটা কেমন হয়—প্রাণ যেন হাঁপিয়ে আসে, সারাদিন কান্না পায়। আর কি আমার কাঁদা উচিত—আমি যে হাসিমুখে থাকিব তোমার কাছে স্বীকার করেছি। ইদার সেই বড় ছেলেটিকে মনে আছে। কেমন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বড় বড় হাসিমাখা চোখ দু'টি। তোমার নামে তার নাম। তার সঙ্গে খেলা করে আমার দিন বেশ কাটবে—হয় ত আমি অনুরোধ করলে ইদা তাকে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এখানে আসতেও দেবে।

আজ সন্ধ্যার সময় আমি গির্জ্জায় গিয়াছিলাম—তখন গির্জ্জার ভিতরে গান হইতেছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া তোমার গোরের পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম—পাহাড়ের উপর নীল আকাশে চাঁদ উঠিতেছিল, স্নিগ্ধ শুভ্র চন্দ্রকিরণে সব যেন স্বপ্নরাজ্যের মত দেখাইতেছিল। দূরে হথরণের ঝোপে একটা নাইটিংগেল সঙ্গীত-স্রোতে আকাশ ভাসাইয়া দিতেছিল। আর আমি তোমার গোরের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিয়া এমন শান্তি একদিনও পাই নাই।

আজ তবে আসি, প্রিয়তম, আবার কাল লণ্ডনে গিয়া তোমাকে পত্র লিখিব।

তোমার আদরের

হেলেন।

* * * *

বৃদ্ধ ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

"জীবনের কোনো আশা নাই।" বলিয়া তিনি রেল-সংঘর্ষে অন্যান্য আহতদিগকে দেখিবার জন্য চলিয়া গেলেন। চার পাঁচ ঘণ্টা পরে হেলেনের একবার জ্ঞান হইল--ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রল, "আমি কোথায়?" সুশ্রূষাকারিণী বলিল "ভয় নাই, আপনি হাঁসপাতালে—"

"ভয়! আমার মৃত্যুতে কোনো ভয় নাই।"

মৃত্যুর পূর্ব্বে হেলেনের আর একবার জ্ঞান হইয়াছিল—তার মুখে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। "প্রিয়তম, কে জানিত এত শীঘ্র আমি তোমার কাছে যাইতে পাইব। ভগবান্, তোমার বড় দয়া।" বলিয়া হেলেন চক্ষু মুদিল। সব ফুরাইয়া গেল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

ভাদ্র-শ্রী

টোপর পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান্-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুণ্ডগুলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগ্‌ছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁত্‌রে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোল্‌না বেঁধে দুল্‌ছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে!

কল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বল্‌ছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিকুলি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্ হাতে কে ওই মাঠে?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে?

নকুলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হ'চ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে;
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠ্‌ছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশী।

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে।
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজ্‌লী হ'ল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জগন্নাথের "নবকলেবর"

এবার জগন্নাথের নবকলেবর হইবে, পাণ্ডারা "নবযৌবন" কথাটাও ব্যবহার করেন। জগন্নাথের আবার নবকলেবর ও নবযৌবন -কথাটা আমাদের বিদেশীয়-ভাবে অভ্যস্ত কাণে অত্যন্তই বাজে। যিনি ত্রিকালাতীত, নিত্য ও নিরাময়, তাঁর আবার নবকলেবর ও নবযৌবন কি? একদিন ভাবিতাম হিন্দু বুঝি তার কর্ম্ম-কাণ্ডের এ সকল বালকত্ব কিছুই বোঝে না।

কিন্তু জগন্নাথের যে কোনো ভৌতিক দেহ নাই, সুতরাং সে দেহের উৎপত্তি-লয়াদি যে অসম্ভব, এ সকল কথা কোন্ হিন্দু না জানে? আর এ সকল কথা অমন ভাল করিয়া জানে ও বোঝে বলিয়াই হিন্দু নানা মূর্ত্তির এবং নানা বিগ্রহের পূজা অর্চ্চনা করিয়াও, প্রকৃত পক্ষে কখনই সাকারবাদী বা জড়োপাসক হয় না।

হিন্দুর দেবতা আর সে দেবতার মূর্ত্তি এক নহে। নিজের আত্মবস্তুকে হিন্দু অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিয়াছিল। আর তার নিজের দেহ যেমন তার আত্মা নয়, কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন, দেহের রোগশোক উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতিতে সেই আত্মাকে স্পর্শ করে না; সেইরূপ তার দেবতার যে মূর্ত্তি নিজের হাতে হিন্দু গড়িয়া তোলে, সে মূর্ত্তি বা বিগ্রহও যে প্রকৃত দেবতা নয়, এ কথাও হিন্দু বেশই জানে। আর এ কথা জানে বলিয়াই, হিন্দুর ধর্ম্মে মূর্ত্তি-পূজা, কোনও কোনও সিদ্ধান্তে, নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও, কখনও পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহুদীয়, মোহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা মহাপাপ। ইহার কারণ এই যে অতি প্রাচীনকালে, ইহুদীয় ও আরব প্রভৃতি জাতির সাধনাতে, মানুষের আত্মা যে তার দেহ হইতে স্বতন্ত্র এ জ্ঞান ফুটিয়া উঠে নাই।

হিন্দু চিরদিনই তার আত্মাকে নিত্য ও দেহকে অনিত্য, অহংবস্তুকে অবিনাশী ও দেহাদি যাবতীয় ইদংবস্তুকে নশ্বর বলিয়া জানে। সুতরাং দেহের পরিণামে আত্মার যে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় না, এ বিশ্বাস তার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া আছে। তাঁর দেবতা জড় নহেন, অজড়; অনাত্মা নহেন আত্মা। তাঁর নিজের আত্মা যেমন কর্ম্মবশে বিদেহী হইয়াও দেহ ধারণ করে, হিন্দুর দেবতাও সেইরূপ অমূর্ত্ত হইয়াও সাধকের হিতার্থে, সাধনার সাহায্য করিবার জন্য, মূর্ত্তিতে অধ্যাসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেবতা নিজে সেই মূর্ত্তি নহেন। সুতরাং মূর্ত্তি জলে ভাসাইয়া, শ্মশানে ফেলিয়া, আগুনে পোড়াইয়াও, হিন্দু আপনার দেবতাকে নষ্ট করিল, এমন কল্পনা করে না। বরং মোহবশে কখনো কখনো তাঁর নিজদেহে আত্মবোধ জন্মে বটে, কিন্তু কদাপি তাঁর দেবতার মূর্ত্তিতে নিষ্ঠাবান হিন্দুর কখনও দেবতা-জ্ঞান জন্মে না।

এই জ্ঞান বা অজ্ঞান কখনো জন্মে না বলিয়াই, জগন্নাথের নবকলেবর বা নব-

যৌবনের কাহিনী শুনিয়া, হিন্দু তাহাকে একটা একান্ত উপহাসাস্পদ ব্যাপার বলিয়াও ভাবে না।

জগন্নাথকে দারুব্রহ্মও বলে। পুরীতে যে জগন্নাথ-বিগ্রহ আছেন, তাহার উপাদান মৃত্তিকাও নয়, ধাতুও নয়, কিন্তু কাঠ। আর এই মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গড়াও নয়, খোদাও নয়; কেবল রং করা মাত্র। এই রং যতই কেন পাকা হউক না, প্রতিদিন তৈল-চন্দনাদির দ্বারা অভিষিক্ত হইলে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবেই যাইবে। এই জন্য অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া ইহার নূতন রং করা আবশ্যক হয়। জগন্নাথের স্নানযাত্রার পরে, রথযাত্রার পূর্ব্বে এই নূতন রং দেওয়া হয়। এই কারণে এই একমাস কাল জগন্নাথের মূর্ত্তিকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়। মাসান্তে, রথের দিনে, আবার নবরঞ্জিত দেবমূর্ত্তিকে রথারূঢ় করাইয়া, তাঁর রথযাত্রা হইয়া থাকে।

কিন্তু কাঠ তো আর চিরদিন থাকে না। সুতরাং জগন্নাথের মূর্ত্তির কেবল রং বদলাইলেই চলে না, মাঝে মাঝে দারুখানাও বদলাইয়া নূতন করা আবশ্যক হয়। এই দারুবদলান-ব্যাপারকেই জগন্নাথের নব-কলেবর বা নবযৌবন বলে। পূর্ণিমা দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়। পরবর্ত্তী অমাবস্যা-রাত্রে, জগন্নাথের পুরাতন দেহ "শ্মশানে" লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণের ভিতরেই একটা স্থান আছে, যাহাকে জগন্নাথের শ্মশান বলে। স্নানযাত্রার পরবর্ত্তী অমাবস্যা-রাত্রে "দ্বৈতপতি" নামে এক বিশেষ গোত্রের পাণ্ডা, সপরিবারে জগন্নাথের পুরাতন দারুকে নারায়ণ-বিগ্রহ বা শালগ্রামশীলার সঙ্গে এক ছোট রথে চড়াইয়া প্রথমে মন্দির প্রদক্ষিণ করায়, পরে সেই শ্মশানে লইয়া গিয়া দারুখণ্ডকে ফেলিয়া দেয়। সে দিন সন্ধ্যা হইতে মন্দির একেবারে বন্ধ থাকে। দ্বৈতপতি পাণ্ডা ও তাঁর পরিবারের লোক ব্যতীত আর কেহ সে রাত্রে মন্দিরে প্রবেশ করিতে বা মন্দিরের ভিতরে থাকিতে পারে না। এইরূপে জগন্নাথের পুরাতন কলেবর শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া, নারায়ণকে সেখান হইতে শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া আনিয়া যথাস্থানে রক্ষা করা হয়। এই নারায়ণই নিত্য বস্তু। ইনিই দারুব্রহ্মের আত্মাস্বরূপ। দারু কালবশে জীর্ণ হইয়া যখন পরিত্যাগযোগ্য হয়, তখন তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসা হয়; কিন্তু তার আত্মাস্বরূপ নারায়ণের তো আর বিনাশ নাই। সুতরাং নারায়ণকে শ্মশান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া রাখা হয়। নূতন মূর্ত্তি যখন আবার গঠিত হয়। তখন এই নারায়ণই তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে আপনার বিগ্রহ করেন। তখন আবার এই সামান্য কাঠের বস্তুই দেবতার দেহরূপে অর্চ্চিত চর্চ্চিত পূজিত সেবিত হইয়া থাকে। এই রূপেই জগন্নাথের "নবকলেবর" বা "নব-যৌবন" হয়। ভক্তেরা এ ব্যাপারকে লীলা বলেন। তুমি আমি ইহাকে রূপক বলিতে পারি। কিন্তু হিন্দু যে আপনার দেবতার রোগে, মৃত্যুতে ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে, তার দেবতার যে সত্য সত্যই নবযৌবন বা নবকলেবর হয় বলিয়া মনে করে, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ যত হিন্দুদেবতা-বিগ্রহ আছেন, তার মধ্যে মনে হয় জগন্নাথের এই বিগ্রহের রূপকতা যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জগন্নাথের এই বিগ্রহের কোনও বিশিষ্ট রূপ নাই, এমনও বলা যাইতে পারে। শিশুরা যেমন দুইটা তিনটা রেখা যেমন তেমন ভাবে এদিক ওদিক টানিয়া বলে, এটা কেমন মানুষ বা কেমন ঘোড়া, বা কেমন হাতী দেখ; জগন্নাথের এই দারুমূর্ত্তি যেন অনেকটা সেই ভাবেই রচিত হইয়াছে। শিশু-হস্তাঙ্কিত মানুষ বা ঘোটক বা হস্তীর চিত্রের মানুষত্ব বা ঘোটকত্ব বা হস্তিত্ব যেন সে সকল চিত্রেতে নাই, আছে কেবল চিত্রকরের নিজের মনে, এ সকল চিত্রের মানুষত্ব প্রভৃতি যেমন একান্তই মানস-বস্তু, কিন্তু সত্য সত্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়; জগন্নাথ-মূর্ত্তিরও অনেকটা সেইরূপ। পুরীর এই জগন্নাথবিগ্রহ কত দিনের, কবে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা বা প্রচার হয়, পণ্ডিতেরা সে কথা বলিতে পারেন। সে প্রত্নতত্ত্বের বিচার এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে যখন পুরী-তীর্থ প্রথমে স্থাপিত হয়, পুরীর মন্দির সর্ব্ব প্রথমে যখন নির্ম্মিত ও এই জগন্নাথ-বিগ্রহ রচিত হয়, তখন হিন্দুজাতির নিতান্ত শৈশবাবস্থা নহে। সুতরাং শৈশবের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা হইতে এই জগন্নাথ-মূর্ত্তির সৃষ্টি হয় নাই। যে মন্দিরে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাবলীই সেকালের হিন্দু চিত্রকলার অসাধারণ উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ; আর যারা অন্যদিক দিয়া এমন কলাকুশলতাপূর্ণ চিত্রাদি রচনা করিতে পারিত, তারা যে নিতান্তই অজ্ঞতা বা অক্ষমতা-হেতু এ অদ্ভুত জগন্নাথ-মূর্ত্তিটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ইহা কল্পনা করাও যায় না। বরং এই মূর্ত্তিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই মনে হয় যেন কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহার কারিকরেরা এমন ভাবে বোকা সাজিয়া এ অপরূপ দেবমূর্ত্তিটী গড়িয়াছিলেন।

বস্তুতঃ জগন্নাথকে মূর্ত্ত না অমূর্ত্ত বলিব, অনেক সময় তার এই বিগ্রহ দেখিয়া এই প্রশ্নই মনে জাগে। আমাদের ইংরেজি শিক্ষার অঞ্জনরঞ্জিত চক্ষে যাহা জগন্নাথ-মূর্ত্তির দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি তার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুণের কথাও নয়? আমরা ইহাকে কিম্ভূত-কিমাকার ভাবি। গ্রীসের দেবমূর্ত্তি সকল কেমন সুন্দর, কেমন চিত্তাপহারক, কেমন ভাবে আমাদের রঞ্জিনীবৃত্তিকে তৃপ্ত করিয়া সে মূর্ত্তি সকল অপূর্ব্ব রসে প্রাণমনকে পূর্ণ করিয়া দেয়! ভিনাস বা এপলো, জুনো বা এফ্রডাইটিস আমাদের চক্ষে আর দেবতা নন। কিন্তু তথাপি এ সকল প্রাচীন মূর্ত্তির যতটুকু নির্ম্মমকালতরঙ্গাভিঘাত বহন করিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতেই কত না দেবভাব আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দেয়। মূর্ত্তিপূজা যদি করিতেই হয়, তবে এমনি সব মূর্ত্তিরই পূজা করা যায়, আমরা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়া অনেক সময় এরূপই মনে করি। আর এ সকল গ্রীশীয় দেবমূর্ত্তির তুলনায় আমাদের

দেবতা সকল অনেক সময়ই কত অদ্ভুত, কত উদ্ভট, কত ভয়ানক ও বীভৎস বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই মূর্ত্তিপূজা কতই না গ্রোটেস্ক (grotesque) বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জগন্নাথের এই ন্যাড়া ও নুলো মূর্ত্তিকে যে আমরা উদ্ভট ও grotesque বলিয়া ভাবিব ইহা আর বিচিত্র কি ?

কিন্তু গ্রীশ তার দেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার ভিতর দিয়া যে বস্তুর সন্ধানে গিয়াছিল, হিন্দু যে সে বস্তুর সন্ধান পায় নাই। সুতরাং তাদের উভয়ের চেষ্টা কখনও এক রকমের হওয়া সম্ভব নহে। গ্রীক রূপের সন্ধানে যাইয়া তার দেবমূর্ত্তি সকল গড়িয়াছিল। হিন্দু অরূপের সন্ধানে যাইয়া তার দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিল। দু'এর মধ্যে এই আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল। গ্রীক রূপের উপাসক ছিল। হিন্দু আজন্মকাল অরূপেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছে। গ্রীক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্কেত ও সন্ধান আছে, তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দু অতীন্দ্রিয়ের মধ্যেও যে ইন্দ্রিয়গুণাভাস আছে, তাহাই, সাধনসৌকার্য্যার্থে, ইন্দ্রিয়জ রূপরসাদির সঙ্গে কায়ক্লেশে মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তার অতীন্দ্রিয় দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধ্যান করিতে যাইয়াও, হিন্দু সর্ব্বদাই সে দেবতার অতীন্দ্রিয়ত্ব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীশীয় দেবমূর্ত্তি সকলের ধ্যানে সাধু ও সুধীজনের চিত্তে যতই উন্নত ও পবিত্র ভাবের উদয় হউক না কেন, প্রাকৃতজনের প্রাণে তাহাতে ইন্দ্রিয়-ভোগলালসার উদ্রেক না হওয়া একরূপ অসম্ভব। মাইলোর ভিনাসের ভাঙ্গা মূর্ত্তিটা দেখিয়া অসাধারণ আধ্যাত্মিকসম্পদসম্পন্ন পণ্ডিতদের চিত্তবিকার উপস্থিত হউক বা না হউক, সাধারণ লোকের যে তাহা হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর গ্রীশের উত্তরাধিকারীসূত্রে যাঁরা এই কলানুশীলনতৎপরতা লাভ করিয়া, আধুনিক য়ুরোপীয় কলাশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মধ্যে যেগুলিতে এই ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসার উদ্রেক করে, জনসাধারণে সেগুলিকেই সকলের চাইতে বেশি পছন্দ করে, ইহাও কে না জানে? অন্যদিকে হিন্দুর দেবমূর্ত্তিতে এরূপ কোনও কিছুর আভাস পাওয়া যায় না। আর এই ইন্দ্রিয়রসকে শুষ্ক করিবার জন্যই যেন, মনে হয়, হিন্দুদেবমূর্ত্তির মধ্যে অশেষবিধ অপ্রাকৃতত্বের সমাবেশ হইয়াছে। আমাদের দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির দর্শনে ও ধ্যানে কাম-ক্রোধাদি উদ্রিক্ত না হইয়া, আপনা হইতেই প্রশমিত হইয়া যায়। আর এ সকলের অপ্রাকৃতত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্বই ইহার প্রধান কারণ।

জগন্নাথমূর্ত্তিতে কালী দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তির ন্যায় কোনও প্রকারের অপ্রাকৃতত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্ব নাই। কিন্তু অন্যদিকে ইহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-সঙ্কেতটী যেরূপ ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর কোনও হিন্দুদেবমূর্ত্তিতে সেরূপ হয় নাই। জগন্নাথমূর্ত্তিকে কতকটা নিরাকার মূর্ত্তি বলিলেও চলে। আমরা সচরাচর

নিরাকারের যে অর্থ করি, তাহাতে নিরাকারবাদ আর শূন্যবাদ মূলে এক হইয়াই যায়। যার আকার নাই, মোটামুটি আমরা তাহাকেই নিরাকার বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরাকার তাহাই যার **কোন বিশেষ** আকার নাই। যে বস্তু কোন **বিশেষ আকারেতে আবদ্ধ হয় না,** হইতেই পারে না, তাহাই সত্যসত্য নিরাকার। আর একই কালে যাহা বহুবিধ আকারে থাকিতে পারে, তাহারই কোনও **বিশেষ** আকার নাই। আর তাহাই সত্য সত্য নিরাকার। আকাশ-বস্তু এই জন্য নিরাকার। অথচ এই আকাশই একই সময়ে ঘটপটাদিতে সাকাররূপ ধরিয়াও থাকে। প্রাণ-বস্তু নিরাকার; কারণ সর্ব্বদাই দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও, কোন বিশেষ দৈহিক আকারেতে তাহা আবদ্ধ হয় না। যে প্রাণ বহুদিন পূর্ব্বে একরত্তি অপোগণ্ড শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ছিল, আজ তাহা পরিণত বয়সের পরিপক্ক অস্থিপঞ্জর ও লোল পেশিচর্ম্মাদির মধ্যেও সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাজনেরা বলেন দেহান্তেও এই প্রাণ থাকিবে ও ক্রমে কর্ম্মবশে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া আবার শারীর চেষ্টা প্রকাশ করিবে। এই প্রাণ-বস্তুর যদি কোনো একটা বিশেষ আকার থাকিত, কোনো এক সাকার দেহের সঙ্গে যদি তার এমন ঐকান্তিক যোগ থাকিত যে, সে যোগ নষ্ট হইলে সে প্রাণও নষ্ট হইয়া যাইত, তবেই কেবল সে প্রাণকে সাকার বলা যাইতে পারিত। কিন্তু বিবিধ আকারেই প্রাণ-বস্তু থাকে ও থাকিতে পারে বলিয়াই তাহাকে নিরাকার বলি। আর এই অর্থে জগন্নাথ সাকার নহেন, কিন্তু তাঁর যতই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তিনি সর্ব্বদা, সর্ব্বোতোভাবেই নিরাকার। কারণ যার কোনো আকার-বিশেষ নাই, যুগপৎ যে বস্তু বহু আকারেতে প্রকাশিত হইতে ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত নিরাকার। নতুবা কোনো আকারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে গেলেই যার নিজত্ব'ও বস্তুত্ব নষ্ট হইয়া যায়, সে বস্তু শূন্য হইতে পারে, কিন্তু সত্যিকার নিরাকার হইতে পারে না। কারণ নিরাকারের প্রকৃত অর্থ সর্ব্বাকার।

আর জগন্নাথ-মূর্ত্তির মধ্যে এই সর্ব্বাকারত্ব যতটা পরিমাণে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর কোনও হিন্দু-দেবমূর্ত্তিতে তাহা হয় নাই। ইহাই জগন্নাথের ন্যাড়া-নুলো ছবির ভিতরকার কথা। একদিক দিয়া জগন্নাথের কোনো রূপ নাই। শিশুরা যেমন বালুকামুষ্টি ধরিয়া বলে, এই নেও পোলাও বা পায়স; যে সাধক জগন্নাথের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, তিনিও সেইরূপই যেন বলিতেছেন,—এই নেও তোমার ঠাকুর। আজ জগন্নাথকে বৈষ্ণবেরা বিশেষভাবেই দখল করিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু জগন্নাথের মূর্ত্তির সঙ্গে বিষ্ণু-মূর্ত্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। বিষ্ণু চতুর্ভুজ। জগন্নাথের চার হাত নাই। শ্রীকৃষ্ণের এক শ্রেষ্ঠতম, গূহ্যতম, দ্বিভুজ মূর্ত্তি আছে বটে; কিন্তু সে দ্বিভুজ মূর্ত্তিও ত্রিভঙ্গ ও মুরলীধর। জগন্নাথের সঙ্গে তারও কোন মিল নাই। অথচ এই জগন্নাথকে দেখিয়াই যুগে যুগে বৈষ্ণবসাধক ও

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণদর্শন-সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়াছেন। রথের দিনে এই জগন্নাথের মূর্ত্তির অগ্রেই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে গাহিয়াছিলেন—

সেই তো পরাণ নাথ পাইনু
যাঁর লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।

আর রথারূঢ় জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখিয়া কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন-সারথির রূপ মনে করিয়া, এই মূর্ত্তিতেই সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, আর এক রসের উচ্ছ্বাসে পুরাতন শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্র স্নাপা
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধ সিবেতন্বী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

আর বৈষ্ণবেরা জগন্নাথকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া যতই ধরুন ও প্রচার করুন না কেন, শৈবেরাও তাঁহাকে নিজেদের ইষ্টদেবতা, লোকনাথ বলিয়াই দেখেন। এই জন্য শ্রীক্ষেত্র বৈষ্ণব, শৈব, সকল সম্প্রদায়েরই পীঠস্থান হইয়া আছে। আধুনিক কালে যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্য, এই দুই লীলার সাক্ষী নীলাচল, পুরীধামের ধূলিকণা হইতে মন্দিরচূড়া পর্য্যন্ত সকল যেমন চৈতন্যলীলা-মুখরিত হইয়া আছে; পুরাতন কালে সেইরূপ এই নীলাচল শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনের সঙ্গেও জড়িত হইয়া ছিল। সাকারবাদী বৈষ্ণব ও শাক্ত, নিরাকারবাদী নানকপন্থী ও কবীর-পন্থী, জ্ঞানপথাবলম্বী বৈদান্তিক ও ভক্তি-মার্গচারী বৈষ্ণব, সকলেই এই পুরীধামকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। এখানে শঙ্কর, নানক, কবীর সকলেরই মর্য্যাদাও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর ইহার একটা প্রধান কারণ বোধ হয় জগন্নাথ-মূর্ত্তির বিশেষত্ব।

এই মূর্ত্তি ঠিক সাকারও নয়, ঠিক নিরাকারও নয়। ইহাতে ইন্দ্রিয় নাই, অথচ ইন্দ্রিয়ের আভাস মাত্র আছে। জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যেন শ্রুতি যাহাকে "অপাণিপাদো যবনোগ্রহিতা"—"সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্." বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই শ্রুতিনির্দ্দেশ অনুযায়ীই কোনও ভক্তসাধক এই অদ্ভুত, উদ্ভট, অস্ফুট মূর্ত্তির ভিতর দিয়া সেই পরমতত্ত্বকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রায়ই বলিতেন যে শকুনি আকাশে উঠিলেও তাহার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের উপর, তেমনি অনেক সমালোচক বৈষ্ণব-কবির ভাবের কথা বলিতে গিয়াও তাঁহাদের কবিতার কেবল অশ্লীলাংশ—তাঁহাদের মতে যাহা অশ্লীল—সেই সব অংশ বাছিয়া বাহির করিয়া খুব গম্ভীর স্বরে মত প্রকাশ করেন যে, এই সকল

আদিরসের ছড়াছড়ি আছে বলিয়াই বৈষ্ণব-কবির প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে বড় প্রবল ভাবে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মতের সমর্থনার্থ বৈষ্ণব-কবির শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা কামাতুর যুবক, রাধিকাকে কামাতুরা নায়িকা ও সখীগণকে দূতীতে পরিণত করিয়াছেন। এই মত কি সত্য? বৈষ্ণব-কবির প্রভাবের কি ইহাই একমাত্র হেতু?

আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে এই অভিমতের ভিতর সারাংশ নিতান্ত অল্প। অবশ্য আমরা এ কথা বলিব না যে যাহা সাধারণ লোকচক্ষে অশ্লীল বা আদিরসঘটিত বলিয়া বোধ হয়, এমন অংশ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে অথবা আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে নাই, আছে সত্য; কিন্তু বৈষ্ণব-কবির গানের প্রতিষ্ঠা ভাবে, ইন্দ্রিয়পরতায় নহে। এই মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে বিশেষ কোনও পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কেবল রসসংগ্রহণেচ্ছু হৃদয়ের সহিত বৈষ্ণব-কবির চর্চ্চা। যিনি কেবল তাঁহাদের বিষয় লিখিবার জন্য বা বলিবার জন্য তাঁহাদের কবিতা পাঠ করেন, তাঁহার দ্বারা বৈষ্ণব-কবির—বৈষ্ণব-কবির বলি কেন, কোনও কবির যথার্থ ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। কবির হৃদয় কবির হৃদয় দ্বারা ধরা পড়ে, আর কিছুতেই নহে।

বৈষ্ণব-কবির পদাবলী মুখ্যতঃ ভক্তির গান, প্রেমের গান; গৌণভাবে তাহারা ভালবাসার গান। অতএব বৈষ্ণব-পদাবলী ভালবাসার সকল লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে তাহাতে বৈচিত্র্যও নাই। এই যে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রিয়সম্ভোগব্যাপার তাহাকে ভালবাসার রাজ্য হইতে একেবারে তাড়াইয়া দেওয়া যায় কি? তাহা যদি না যায়, তাহা হইলে সত্যতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-কবি যদি তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন তো তাহাতে এমন অন্যায় কিছু হয় নাই যে জন্য বৈষ্ণব-কবির মাথা তুলিতে লজ্জা হইবে। জ্ঞানদাস ভালবাসার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাই তিনি সূত্ররূপে কহিয়াছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

এবং ইহারই রূপান্তর রবি বাবুর

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন॥

তবে প্রভেদ এই যে রবি বাবু শুধু সূত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, দৈহিক মিলনের বর্ণনা করিতে পারেন নাই, বৈষ্ণব-কবি তাহা করিয়াছেন। রবি বাবুর সময়ের শিক্ষা ও দীক্ষা অন্যরকমের, বৈষ্ণব-কবির শিক্ষা ও দীক্ষা অন্যরকমের। রবিবাবুর সময় ও বৈষ্ণব-কবির সময়—এই দুই সময়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য হইয়াছে। সেক্ষপীয়র, কালিদাস, বায়রণ, গেটে যাহা লিখিতে পারিয়াছেন, এখনকার কোনও য়ুরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় কবি তাহা লিখিতে সাহস করিবেন না, লিখিলেও তাঁহাকে আজকাল বৈষ্ণব-কবির মত সমালোচকের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইত। সময়ের গুণে

মনুষ্যের আস্বাদ-শক্তির পরিবর্ত্তন হয়, তাই বৈষ্ণব-কবির সময়ে যাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইত না এখন তাহা দোষ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। এই জন্য বৈষ্ণব-কবি দৈহিক সম্ভোগ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এখন যদি কেহ তাহা করে তাহা হইলে তাহাকে সে লেখা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দৈহিক মিলনবর্ণনারও প্রকার আছে। বৈষ্ণব-কবির দৈহিক মিলন কামুকের দেহ-সম্ভোগ নহে, ভালবাসার যে স্বাভাবিক পরিণতি, এ দেহ-সম্ভোগ তাহাই, তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি মাত্র নহে। সেক্ষপীয়রের ভীনস এবং এডোনিসে ভীনসের অথবা বায়রণের ডন জুয়ানের নায়ক-নায়িকাগণের কিম্বা বিদ্যাসুন্দরের নায়ক-নায়িকার মত বৈষ্ণব-কবির নায়ক ও নায়িকা কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্যই দৈহিক সম্ভোগ খোঁজেন নাই। এই সম্ভোগব্যাপার আজকাল অশ্লীল মনে হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহার সহিত অনেক পরিমাণে হৃদয় মিশ্রিত আছে। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে এই সম্ভোগসূত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেম পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই মিলন হইতেই রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছে—এ মিলনে অবসাদ নাই বরং উল্লাস আছে। যাহা কেবলই ইন্দ্রিয়পরতা, তাহা ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র, সেই উত্তেজনান্তে উপভোক্তৃ-দ্বয়ের হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে, ক্রুটজার সোনাটায় (Kreutzer Sonata) কাউণ্ট টলষ্টয় তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবির নায়কনায়িকার হৃদয়ে উপভোগ দ্বারা রসের সঞ্চার, ভাবের বিকাশ হইয়াছে—

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রবে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জাগি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফাঁদে।
মুখে মুখে দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে।
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
তেঞি সে এমন দেখি কাঁদে জ্ঞানদাস॥

যাঁহার হৃদয় আছে, ভাবানুসন্ধানপ্রবৃত্তি ও রসগ্রাহিতা আছে, তিনি বুঝিয়া দেখুন এই যে সম্ভোগ-রসোদ্গার তাহা কত উপাদেয়, একবার ভাবিয়া দেখুন যে বৈষ্ণব-কবির সম্ভোগ কোন্ জাতীয়।

তার পর আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে জ্ঞানদাসের নায়ক-নায়িকার চিত্তের কোন্ ভাব এই মিলন ঘটাইয়াছে। তাহা কি কেবলই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা অথবা যথার্থ ভালবাসা? বৈষ্ণব-কবির অতএব জ্ঞানদাসের নায়ক-নায়িকা রূপ গুণ দুই দেখিয়া ভাল-বাসার জালে জড়িত। রূপজ প্রণয় যে কেবল ইন্দ্রিয়ের মোহ তা নয়, ইহা হইলেই অগাধ প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে। সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট, কালিদাসের শকুন্তলা, গেটের মার্গারেট, ভিক্টর হিউগোর লা এস্মেরাণ্ড, ইহারা সকলেই রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিল, রূপে ভুলিয়া ভাল বাসিয়াছিল,

ভালবাসিয়া কেহ প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিল, কেহ বা অনন্ত বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছিল। প্রথম দর্শনে যে প্রেমের উৎপত্তি সে প্রেম অনেক সময়ে দৈবানুশাসন স্বরূপ, ইংরাজীতে যাহাকে revelation বলে তাহাই। সেই দর্শনেই যেন জন্মজন্মান্তরের বিস্মৃত ভাবাবলী, চির পুরাতন প্রেম নূতন হইয়া উঠিয়া জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দেয়। এক কোন শুভক্ষণে, এক মুহূর্ত্তে একটী চাহনির ভিতর দিয়া—আকাঙ্ক্ষার পথে দুইটী প্রাণ এক হইয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের ভালবাসা বৈষ্ণব-কবি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমদর্শনেই শ্রীরাধার অন্তরে যে অপূর্ব্ব অনুরাগ জাগিয়াছে, যে আকাঙ্ক্ষার রাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছে, যে সব-ভুলানো ভাব জাগিয়াছে, যে ভালবাসা—প্রিয়ের তিল মাত্র বিচ্ছেদ সহনাক্ষম ভালবাসা—আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে, দেহের মিলন, প্রাণের মিলন এই উভয় বিধ মিলনের জন্য যে তীব্র বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, শিল্পকুশল কবি জ্ঞানদাস যেন সে সকল ভাব অনুভব করিয়া, শ্রীরাধার সেই বাসনাকর্ষিত দিব্য-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার ছবি তুলিয়াছেন—

সহজে ননীক পুতলি গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
শুমরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহনুঁ তোয়।
শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর ফুল॥
ফুরল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ভোল!
গলায় এ গজ মোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুর অঙ্গুলি বলয় ভেল।
জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল॥

এমন প্রণয়ে অঙ্গসঙ্গাসক্তি থাকিলেও মনের কার্য্যই বেশী, ভাবের প্রাবল্যই বিশেষ ব্যক্ত। তাই জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

কান্নর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকড় দেখি।
প্রেম কলেবর ততহি সখি॥

শ্রীরাধার প্রণয় কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগের জন্য লালায়িত নহে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে উদ্যত, ইহা কামপরতন্ত্রার ইন্দ্রিয়লালসা নহে, বিদ্যার চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খলতা ইহার মধ্যে নাই; সংসারে যাহা কিছু লোকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিশেষতঃ স্ত্রী-জাতির পক্ষে যাহা কিছু সংসারের সার শ্রীরাধার প্রণয় এ সকলকেই তুচ্ছ করিয়া সেই প্রিয়তমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এ প্রেম গভীর, স্বার্থহীন আত্মনিবেদন—

শ্যামরূপ দেখিয়া আকুল হইয়া
দুকুল ঠেকিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া অপযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বদনে নয়ান ভুলাল
আর মনে নাহি লয়॥
অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে
সে মোর চন্দন চুয়া।

শ্যামের রাঙ্গা পায় এ তনু সঁপেছি
তিল তুলসী দিয়া।
কি মোর সরম ঘর ব্যবহার
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে এ তনু নিছিনু
শ্যামের ও রাঙ্গাপায়।

যে প্রণয়ে হৃদয়ে এমন ভাবের উৎপন্ন হয়, এমন নিরবচ্ছিন্ন আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি জন্মায়, যে ভালবাসায় আপনার বলিয়া কিছু রাখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, সেই প্রণয়ের ভাব কি একজন সামান্য দূতীর উপলব্ধি করা সম্ভব? যদি তাহা না হয়, তবে যাহারা সেই ভাব বুঝিয়া দৌত্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহাদের সামান্য দূতী বলা চলে না। বৈষ্ণব কবির-সখী ইতর দূতী নহে, তাহারা রাধাপ্রেমে আত্মত্যাগিনী, রাধার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, রাধার সুখের জন্য তাহারা সব করিতে পারে, সব ছাড়িতে পারে, সব ভুলিতে পারে তাই শ্রীরাধার হৃদয়ে যখন এমন সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের উদয় সখী বুঝিতে পারিল, যখন সে বুঝিল যে ভালবাসা ভিন্ন রাধার আর কোনও সুখ নাই, তখন সে কৃষ্ণের কাছে দূতীগিরি করিতে চলিল—যাঁহার হৃদয়ে মাধুর্য্যানুভূতি আছে তিনি কবি জ্ঞানদাসের সখীর এই দৌত্যের মর্ম্ম বুঝিয়া আনন্দিত হইবেন—

মন্দির মাঝে বৈঠল বর সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছল পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেমজলে ভরল নয়ানে॥
মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসাঙ্গ অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥
ভাবে ভরল তনু পুনঃ পুনঃ কম্পিত
পুনঃ পুনঃ শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভূঁয়ে শুতয়ে পুন রেরি॥
ফুরল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহে তুহুঁ ভালে সমঝত
কোন করব চিতে আনে॥

শ্রীরাধার ভাবের কি সুন্দর পরিচয় এই দূতীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে! জ্ঞানদাসের কাব্যে সখী কখনও দূতী, কখনও সেবিকা, কখনও বন্ধু, কখনও মন্ত্রী;—সর্ব্বদাই ইহারা রাধার মর্ম্মগ্রাহিণী, রাধার ভাবে বিভোর, ভাবের ভাবিনী। রাধার হৃদয়ে যত ভাবের উদয় হয় তাহারা সব ধরিতে পারে, সব কহিতে পারে।

কত কত ভাব পেখনু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই॥

মিলনের পূর্ব্বে রাধিকার হৃদয়ে কত অপূর্ব্ব ভাবেরই উদয় হইয়াছে তাহা এই সখীরাই জানে ও বুঝে।

হাসি রহল করে বসন ঝাঁপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই॥
আন দিনে শ্রবণে না দেই পরথাব।
আজু আপনে ধনি কহিলি সুধাব॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী কয়ল তুয়া পর সঙ্গ॥

শ্রীরাধার মনে এত উল্লাস, এত আকাঙ্ক্ষা, এত ভাব, কিন্তু তিনি সবই লুকাইয়া রাখিতে চাহেন, এত যে অন্তরঙ্গ সখী তাহাদের অনেক সময় সেই সকল ভাব অনুভবে বুঝিয়া লইতে হয়, ইঙ্গিতে

অনুভব করিতে হয়। প্রেমতত্ত্বজ্ঞ কবি জ্ঞানদাস কহিয়াছেন,--

রসের বেভার লুকা না যায়।

তাই সখীদের জানিতে বিলম্ব হয় না যে রাধার হৃদয়ে কোনও এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছে; তাহাদের সহানুভূতি-সম্পন্ন হৃদয় রাধার অন্তরের নূতন ভাব লুকান থাকিলেও ধরিয়া ফেলে—

ক্ষণে ধনী চমকায় ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর পরশিলে নহে এত অঙ্গ তাপ ॥
মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে ॥
সবে এক দেখিয়া করএ পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া চকিত হয় চিত ॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুর ভাবে আছে।

যাহারা এমন মর্ম্মজ্ঞা, এমন অন্তরঙ্গ তাহাদের কাছে মনের ভাব গোপন করিবার প্রয়াস বৃথা, তাই রাধার মুখ ফুটে, প্রাণের আবদ্ধ যাতনা আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য সব উন্মুক্ত পথে ছুটিয়া বাহির হয়।

আগে মুঞি জানিলে যাইতাম না
কদম্বের তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রইল বান্ধা।
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া ॥
জাতি কুলশীল মোর হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥

যে আপনার জন তাহার কাছে একবার মুখ খুলিলে সব প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই রাধার মনের সকল কথা একে একে সখীর কাছে ব্যক্ত হইয়াছে—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কার নই ॥

সমবেদনাময়ী সখী আর স্থির থাকিতে পারে না, তাই তাহাকে আমরা দূতীর কার্য্যে রত হইতে দেখি।

যেমন নায়িকার ভাব তেমনি নায়কেরও ভাব,—ইহাতেও দৈহিক মিলনের আনন্দ বর্জ্জিত হয় নাই, কিন্তু প্রাণও মিশিয়া আছে।

চিত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি ॥

নায়ক-নায়িকার এমন অবস্থায় মিলন অবশ্যম্ভাবী তাই কবি জ্ঞানদাস কহিয়াছেন—

জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার ॥

এই মিলনে যে রস উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে করিতে কবি বিহ্বল হইয়াছেন—যে কয়টী পদ এই উল্লসিত অবস্থায় তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলি কবিত্বের পরাকাষ্ঠা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি স্থান থাকিত

তাহা হইলে সবগুলি তুলিয়া দেখাইতাম; স্থানাভাব সত্বেও কতকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, রসজ্ঞ পাঠক সেগুলির ভাবপ্রবণতা ও প্রণয়ৈকরসতায় মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোল্লাস ও একাগ্রতা এই পদগুলিতে উজ্জল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—ইহাদের প্রত্যেক চরণ, প্রত্যেক বাক্য, ভাবের এক একটা প্রস্রবণ ছুটাইয়াছে।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণ লেহ।
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া পাসরিতে নারে
কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখনে যে দিকে পায়।
বাহু পাসরিয়া বাউল হইয়া
তখনে সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী
পিরীতে কিনিল তায়॥

প্রিয়ের প্রণয়ে রাধার হৃদয়ে কি মধুর গর্ব্ব! প্রিয়ের প্রণয়-কীর্ত্তনে তাঁহার কি আনন্দ, কত উল্লাস!

যব দেখা দেখি হয়ে হেন তার মনে লয়ে
নয়নে নয়নে মোরে গ্রিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি।
কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥
রসিক নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয় তোমার চরিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥

কিন্তু ইহা কেবল গর্ব্বোথ ভাবই নহে, ইহার সহিত প্রিয়তমের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য-স্মৃতিও জড়িত আছে, তাই এ সৌভাগ্যমদে তীব্রতা না আসিয়া ভাববিহ্বলতা আসিয়াছে—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয়॥
সহজে রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি ভগিম দোলনী
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে সো পিয়া পিরীতি
মরমে পশিল তোর॥

ভাবের নেশা—ভালবাসার তন্ময়তা প্রেমার্দ্রী-কৃত "আমিত্বের" তরল ও সরল প্রসার এমন মধুরভাবে আর কোথাও বর্ণিত হইতে দেখিয়াছি কি না জানি না।

যাহা শ্রীরাধার মুখে ব্যক্ত তাহাই কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখেও ব্যক্ত করাইয়াছেন—

সুন্দরি আ রে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিশ গণে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্দা॥

এমন "পিরীতিতে" যিনি বিভোর না হইতে পারেন তাঁহার পক্ষে বৈষ্ণব-কবির পদাবলী লইয়া নাড়াচাড়া করা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রার মুখে কোন ইন্দ্রিয়পরাভূত কামুকের মুখে এমন ভাব প্রকাশিত হইতে পারে কি? বৈষ্ণব-কবির গান ইন্দ্রিয় সুখের গান কহে, তাহা আত্মবিলোপকারী ভাবোন্মাদের হৃদয়োত্থ ধ্বনি—কোথাও চঞ্চল, কোথাও বিহ্বল, কোথাও বেদনাময়, কোথাও আবার আনন্দ-মুখরিত। কৃত্রিমতা কোথাও নাই, তাহা নহে, তবে তাহা এত বিরল যে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়। (ক্রমশ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার *

অনেকের বিশ্বাস, অনুপ্রাস জিনিসটা নিতান্ত কৃত্রিম, সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক ভাষার সহিত অনুপ্রাসের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আজ আমি দেখাইব, শুধু সাধুভাষায় নহে, † সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায়ও অনুপ্রাসের অনুপাত কম নহে। এক কথায়, অনুপ্রাস ভাষা-শরীরের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাষাগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

অনুপ্রাসাত্মক শব্দসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ধ্বন্যাত্মক' শব্দ, 'বাংলা শব্দদ্বৈত' ও 'ভাষার ইঙ্গিত' এই প্রবন্ধত্রয়ে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়াছেন (তৎপ্রণীত শব্দতত্ত্বনামক পুস্তক দেখুন।) ইহার ভিতরকার কথাটাও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বুঝাইয়াছেন—"মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে—একটা

* উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

† ভাষাতত্ত্ব হিসাবে, সাধুভাষায় অপেক্ষা সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত অনুপ্রাসের দৃষ্টান্তগুলিই অধিকতর মূল্যবান্। কেননা সেগুলি আদিম ও অকৃত্রিম।

শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, জোড়ামিলের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে —সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়।" (ভাষার ইঙ্গিত)। আমার বক্তব্য বিষয়ের অনেক মশলা তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ তিনটি হইতে সংগৃহীত।

১। খাঁটি সংস্কৃত কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কল্লোল, কাক, কুক্কুট, কুক্কুর, কেকা, কোকিল, গদ্গদ, গর্গর, ঘর্ঘর, চর্চ্চরী (হাততালি!), ছুছুন্দরী, ঝঞ্ঝা, মর্ম্মর, মুর্ম্মুর, বর্ব্বর, বুদ্বুদ, প্রভৃতি শব্দে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ এগুলি মূলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ (onomatopœtic); তবে বৈয়াকরণেরা অন্য উপায়ে পদগুলি সাধিয়া দিবেন কি না জানি না। বাঙ্গালায় প্রাণীর সংজ্ঞা, কুকুর, কুকড়ো, ঘুঘু, ছুঁচো, টাটু, তোতা ঘুরঘুরে (পোকা), টুনটুনি, বুলবুলি, টিকটিকি, গিরগিটি ও বাদ্যযন্ত্র ডুগডুগি, চড়বড়ে, প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এই গোত্রের।

ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি শব্দ ধ্বন্যাত্মক না হইলেও অনুপ্রাসাত্মক। সুবিধার জন্য সেগুলিও এই অনুচ্ছেদে দিলাম। যথা -

(/০) খাঁটি সংস্কৃত—অরহর, অবয়ব, অহহ, আশীষ, কঙ্কর, কঙ্কাল, কণ্টক, কনীনিকা, করকা, করঙ্ক, কলঙ্ক, কর্কট, কর্কশ, কল্কী, কাকু, কার্ত্তিক, কুঙ্কুম, কুহক, কেতকী, গুগ্‌গুল, তাত, তারতম্য, তিন্তিড়ী, দদ্রু, ননান্দ্‌, পর্পটী, পল্লল, পিপীতিকী, পিপীলিকা, পিপ্পল, মর্ম্ম, মাম, যোজন, রবাব, রৌরব, ললিত, লাঙ্গল, লাঙ্গূল, লালা, লীলা, লোল, বর্ব্বুল, বল্কল, বড়বা, শশ, শস্য, শাল্মলী, শিরীষ, শিশু, শিংশপা, শীর্ষ, শেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্মশান, সদস্য, সর্ষপ, সহসা, সাহস, সামঞ্জস্য, সীসক, স্বসা।

এবং (৵০) চলিত বাঙ্গালা, বাবা, মামা, কাকা, দাদা, দিদি, ননদ, (চাচা, নানা, ফুফু,) প্রভৃতি সম্পর্কসূচক শব্দে; কাকাতুয়া, কাঁকড়া, চামচিকে, ঝিঁঝি, পাপিয়া, বাবুই, শুশুক, প্রভৃতি জীবজন্তুর সংজ্ঞায়; আমআদা, কণ্টিকারি কাঁকরোল, কাঁকুড়, কিসমিস, ঘলঘসে, চিচিঙ্গে, তেঁতুল, পেঁপে, মর্ত্তমান, বরবটি, শশা, শুশুনি, সর্ষে, প্রভৃতি উদ্ভিদের সংজ্ঞায়; আনান, ককান, কড়কান, কোঁকড়ান, কোঁচকান, কোঁতকান, খেঁকান, খেঁচকান, গগান, গেঙ্গান, গোঁগান, গোণান, ঘনান, চাঁচা, চেঁচান, ছোঁচান, ছেঁচড়ান ঝাঁজান, টাটান, টুটা, তাতান, তোতলান, থতান, থিতোন, থেঁতলান, দাঁড়ান, ধাঁদান, নলান, নিকোন, নিবোন, নিড়োন, নিংড়োন, নেটান, নেয়ান, পানান, ফেণান, ফোঁফান, ম্যামান, বানান, বিনোন, বুনোন, রগড়ান, শাণান, শাসান, শিষোন, শোষা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদে, এবং আরও বহুতর শব্দে অনুপ্রাস আছে।

যথা, আড়গোড়া, আলথাল্লা, উনান, একরার, কতক, কয়েক, কল্কে, কাঁকাল, কাবাব, কাঁহাতক, কুক, কুকি, কুলকুচো, কেলেঙ্কারি, কোঁতকা, খয়েরখাঁ, খামখা, খামখেয়ালি, খিরকিচ, খিটকেল, গুণোগার,

ঘোঘো, চামচে, চাঁচ, চাঁচি, চোঁচ, চোঁচা, চোঁচালি, জঞ্জাল, জবরজঙ্গ, জবাব, জরুরী, জাজিম, জাঁহাবাজ, জুজু, জেরবার, ঝঞ্ঝাট, টাটকা, টোটকা, টুঁটি, টোটা, টাট, টাটী, ট্যাঁটা, ঠাট্টা ঠুঁটো, ঠোঁট, ডাণ্ডা, ঢেটরা, তফাত, তরিবত, তাঁত, তুতে, দফারফা, দরদ, দাদ, দামামা, দালাল, দিগদারি, দেদার, দোঁদ, নমুনা, নাস্তানাবুদ, নেয়ান, পাপস, পাঁপর, পাঁপড়ী, মখমল, মলমল, মলম, মরসুম, মহরম, মামদো, মামলা, মামুলি, মালামো, মালুম, মুসলমান, রড়, রগড়, রোকড়, রোবকারী, রোজগার, বন্দোবস্ত, বরাবর, বিলকুল, বোম্বেটে, সরফরাজী, সরগরম, সরকার, সরবরাহ, সরেস, সালসা, সামসারা, সাঁড়াশী, হরকরা, হামেহাল, হিমসিম। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আরব পারসী হইতে গৃহীত।

(৶৹) ইংরাজী হইতে গৃহীত—কেক, কোক, কোকেন, কোকো. কুইনাইন, টিকিট, ডিসমিস, লণ্ঠন, রবার।

২। খাঁটি সংস্কৃত বীপ্সাত্মক শব্দদ্বৈতে অনুপ্রাস সপ্রকাশ। যথা অহরহঃ, পুনঃপুনঃ, মুহুর্মুহুঃ, শনৈঃ শনৈঃ, ভূরিভূরি, তন্নতন্ন, মুহু মুহু, ইত্যাদি। এগুলি বাঙ্গালায় চলিত আছে। আবার সংস্কৃত বারংবারং, মন্দং মন্দং, প্রভৃতির অপভ্রংশ বারবার, মন্দমন্দ, ঘনঘন, লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে, কালোকালো, শাদা শাদা, দুষ্টুদুষ্টু, প্রভৃতিও অনুপ্রাসের উদাহরণ। পড়পড়, মরমর, হাজাহাজা, গলাগলা, ধরাধরা (গন্ধ), বাধবাধ, ছাড়ছাড়, ইত্যাদিও আর এক শ্রেণীর শব্দ। বাঙ্গালা—থাকিয়া থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া, পড়িয়া পড়িয়া, প্রভৃতি বোধ হয় সংস্কৃত পীত্বা পীত্বা, স্মারং স্মারং, প্রভৃতির অনুরূপ। ঘরে ঘরে, পথে পথে, জলে জলে, জন্ম জন্ম (সপ্তমী বিভক্তির লোপ), ঝোপে ঝোপে, হাতে হাতে, গায়ে গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, কোলে কোলে, বুকে বুকে, মানুষে মানুষে, প্রভৃতি রকম রকমের বহুতর উদাহরণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবুর 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে আছে। এ সকল স্থলেই অনুপ্রাস অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সারাৎসার, পরাৎপর, গয়ংগচ্ছ, সর্ব্বেসর্ব্বা, সচরাচর, ইত্যাদিতে অনুপ্রাসের রেশ।

৩। এক্ষণে অনুপ্রাসাত্মক কয়েক-শ্রেণীর শব্দের কথা বলিব। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ধ্বন্যাত্মক; কতকগুলির এক অংশ অর্থযুক্ত হইলেও অপর অংশ অর্থশূন্য, কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত।

(/০) একটি শব্দেরই অবিকল দ্বিরুক্তি। সংস্কৃত মকমক, কলকল ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। চাকচক্যও বোধ হয় এই শ্রেণীর। বাঙ্গালায় কন্ কন্, কড়্‌কড়্, ঝন্ ঝন্, চক্ চক্, চিক্ চিক্, তাই তাই, ধেই ধেই টো টো, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্ত্বে বহুতর দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। এগুলি সবই ধ্বন্যাত্মক।

(৵০) এই সকল শব্দের দ্বিতীয়ভাগের শেষে একারযোগে বিশেষণ গঠিত হয়, যথা চট্‌চটে, তুলতুলে, গুড়গুড়ে ইত্যাদি। এবং আনি যোগ করিয়া বিশেষ্য গঠিত হয় যথা টনটনানি, ফরফরানি।

(৵০) দ্বিরুক্তিকালে দ্বিরুক্ত অংশের পূর্ব্বে আকার আগম। এই শ্রেণীতে ধ্বন্যাত্মক ছাড়া অন্যরূপ শব্দও আছে। সংস্কৃত ভাষায় ফলাফল, যোগাযোগ, মতামত, এই শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। বৈয়াকরণেরা অবশ্য এগুলি নঞ্যোগে সিদ্ধ বলিবেন। 'হলাহল' 'যথাযথ' দেখিতে এইরূপ, তবে অবশ্য অন্য প্রকারে ব্যুৎপন্ন। বাঙ্গালায় খবরাখবর, শরীর অশরীর (?) এই শ্রেণীর। ধ্বন্যাত্মক শব্দে বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা কপাকপ, গবাগব, সপাসপ, (বরাবর অবশ্য এ দলের নহে)। রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্ত্বে অনেক উদাহরণ আছে: থমথমা, রবরবা, গড়গড়া, চটচটা, ঝনঝনাতে আকার সর্ব্বশেষে বসিয়াছে। সংস্কৃত হলহলা এই শ্রেণীর নহে কি?

(৷০) দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে ইকার আগম। যথা, খড়খড়ি, গড়গড়ি (উপাধি), চড়চড়ি, সড়সড়ি, টিকটিকি, ধুকধুকি। জ্বরজ্বারি একটু নিয়মভঙ্গ করিয়াছে।

(৷৵০) প্রথমার্দ্ধের শেষে আকার ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে ইকার আগম। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ নিয়ম আছে, যথা, দন্তাদন্তি, নখানখি। এইরূপ বাঙ্গালায় কাণাকাণি। অনেক স্থলে প্রথমার্দ্ধের আকার পূর্ব্ব হইতেই আছে, যথা ধাকাধাক্কি, রশারশি, জানা, হানা প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে নিষ্পন্ন জানাজানি, হানাহানি, মারামারি। অনেক স্থলে আকার উচ্চারণে ওকার হইয়া যায় যথা, ছুটোছুটি, উঠোউঠি, হুলোহুলি। খুনোখুনি, মুখোমুখি প্রভৃতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। দুনোদুনি, ঘুঁষোঘুঁষি প্রভৃতির ওকার পূর্ব্ব হইতেই আছে। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত শব্দগুলি ধ্বন্যাত্মক নহে। রবীন্দ্র বাবুর বহুতর দৃষ্টান্ত আছে, অতএব মিছামিছি বকাবকি করিব না। পূর্ব্বার্দ্ধের একার দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইকারের মত উচ্চারিত হয় যথা টেপাটিপি, মেশামিশি (কখন কখন এরূপ উচ্চারণ ঘটে না, যথা ঘেঁসাঘেঁসি); এইরূপ পূর্ব্বার্দ্ধের ওকার দ্বিতীয়ার্দ্ধে উকারের মত উচ্চারিত হয়, যথা মোটামুটি, রোখারুখি, খোলাখুলি পোঁটলাপুঁটলি, বোঁচকাবুঁচকি, রোয়ারুয়ি।

(৷৷০) দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বরের অন্যরূপে পরিবর্ত্তন। এ শ্রেণীতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে। অন্য শ্রেণীর শব্দও আছে। প্রথমার্দ্ধে যে স্বরই থাকুক না কেন, দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহা আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যথা,—টিপিয়া টাপিয়া, ঠিকঠাক, ঝোঁপ ঝাঁপ, মিটমাট, যুৎযাৎ, যো যা, যোগে যাগে, গোছগাছ, গোলগাল, হুকুমহাকাম, (ধ্বন্যাত্মক গুপগাপ), চুপচাপ, ধুমধাম, শুকনা-শাকনা, খোলাখালা, চূণাচাণা, (চুণো উচ্চারণ), তল্পীতল্পা, ইত্যাদি বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বরের অন্যরূপ পরিবর্ত্তনও ঘটে। যথা কালোকোলো, খাটোখোটো, গ্যাগোঁ, গ্যাটমগোটম, গ্যাটাগোটা, গ্যামা-গোমা, ঘাঁটঘোঁট, ঘাঁতঘোঁত, ঘেরাঘোরা, ঘা ঘো, ছ্যাঁকছোঁক, টায়টোয়, টান্‌টোন, ঠারেঠোরে, ঢ্যাবাঢোবা, দাগদোগ ফারফোর, ফাঁকেফোঁকে, ভাতেভোতে, ভাবেভোরে, সাফসোফ, (এ গুলিতে ওকার); কাতুকুতু, কারিকুরি (?), গাঁইগুঁই, জারীজুরী, ফারিফুরি, ঝেড়েঝুড়ে, ডালডুল, তাড়াতুড়ি,

নাদুসনুদুস, (এগুলিতে উকার)। ডামডিমে ইকার। ভাজাভুজোয় শেষ আকারের উকার উচ্চারণ। মানুষ মুনিষে দুইটি স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে

(।৶৹) দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যঞ্জনের বা অসংযুক্ত স্বরের অন্য ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তন। এইটী বাঙ্গালা ভাষার একটী বিষম মুদ্রাদোষ। সাধারণতঃ ট বা ফ বসাইয়া শব্দের দ্বিরুক্তি ঘটান হয়; যথা—শালটাল, সাপটাপ, বইটই, শশাফশা, নিষ্ঠাফিষ্ঠা, (ধ্বন্যাত্মক ছটফট, ধড়ফড়, হাঁসফাঁস, উত্তম-ফুত্তম, হেলাফেলা)। ইহার উদাহরণ দিয়া শেষ করিবার যো নাই। কতকগুলি স্থলে ম বা ব বসাইয়া শব্দের দ্বিরুক্তি করা হয়; যথা—কটমট, কচমচ, ডগমগ, থতমত, ছিনিমিনি, তোধামোধা, গ্যাডম্যাড, হাঁউ-মাঁউ (খাঁউ) ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ঘোলামোলা, শেষমেষ ইত্যাদি; চাকরবাকর, অদলবদল, এংবেং, আস্তেব্যস্তে (?)* কাঁচ্ছাবাচ্ছা * কাণ্ডবাণ্ড, খড়েবড়ে, চাঁটী-বাঁটী, * তাগবাগ, তাঁতবাঁত, আঁকাবাঁকা, শোধবোধ, সুদিবুদি, (?) ইত্যাদি ও আগড়ুম বাগড়ুম, তড়বড়, দড়বড়, নড়বড়, কলবল, কিলবিল, খিচিবিচি, টুলবুল, চুরবুর, চড়বড়, চিড়বিড়, হিজিবিজি, হিলিবিলি ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ইহারও উদাহরণ দিয়া শেষ করিবার যো নাই। অন্যান্য ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তনের উদাহরণ দিতেছি।

অ—অঙ্গলঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ), অন্ধিসন্ধি, * অলিগলি, * অবরেসবরে।

আ—আইঢাই, আঁকুপাঁকু, আঁটাসাঁটা, আগেভাগে (?), আটেকাটে (?), আতালি-পাতালি, আলাভোলা, (বা ভুলো), আলু-থালু, আনচান, আশপাশ, * আবোলতাবোল আলেডালে, *।

উ—উলঢুল, উলকোফুলকো, উসখুস, উস্কখুস্ক।

এ—এবড়োখেবড়ো।

ও—ওরঘোর।

খ—খাওয়া দাওয়া (দাবী দাওয়ার দাওয়া নহে—খাবার দাবার তাহার প্রমাণ)

চ—চটপট, চ্যাভ্যা।

ছ—ছটেপটে, ছাতুনাতু, ছারখার।

জ—জড়সড়, জবুথবু।

ঝ—ঝালাপালা।

ত—তচনচ, তম্বিগম্বি, তড়িঘড়ি।

ধ—ধানপান (তাম্বুল নহে), ধানাই-পানাই, ধাইপাঁই, ধুকপুক, ধেড়ছেড়।

ন—নড়চড়, নড়াচড়া, (আরোহণ চড়া নহে), নাড়াচাড়া, নটঘট, নিড়িকচিড়িক, নিটপিট, নিশপিশ, ন্যাতাক্যাতা।

প—পড়েধড়ে (ধরিয়া ?), পোড়াধোড়া, পাকশাক (শাকান্ন নহে)।

ফ—ফষ্টিনষ্টি, ফাটকিনাটকি।

ভ—ভাবসাব।

ম—মোটাগোটা, মোটাসোটা।

য—যবেস্থবে (জলে স্থলের দেখাদেখি ?), যো সো।

র—রকমসকম, রুণুঝুণু।

* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি আসল, প্রথমটি তাহার বিকার। অতএব ঠিক এই সূত্র খাটে না।

* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি আসল, প্রথমটি তাহার বিকার। অতএব ঠিক এই সূত্র খাটে না।

ল—লণ্ডভণ্ড, লুটেপুটে।

ব-বকাঝকা, বদলসদল, বাদসাদ বা ছাদ, বুদ্ধিসুদ্ধি (শুদ্ধি বোধ হয় নহে, 'বুঝে সুঝে' দেখুন), বেয়েছেয়ে, বেঁটেখেটে।

শ স—শিকুটিবিকুটি, শসাকসা, স্থিতভিত।

হ—হম্বিগম্বি, হরেদরে, হাউচাউ, হাড়গোড়, হাবীজাবী (পূর্ব্ববঙ্গে), হাব্বা-তাব্বা, হানপান, হাতেনাতে, হাঁসফাস, হিল্লীদিল্লী, হুলস্থুল, হেরফের, হেস্তনেস্ত, হেজিপেজি, হৈচৈ, হৈরৈ, হোমরাচোমরা।

এই সূত্রের একটা বিশেষ বিধি আছে। কতকগুলি স্থলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের স্বরও ব্যঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা, অষুধ বিষুধ (বষুধ হইল না), আঁটিসুঁটি, অষ্টাকষ্টি, আঁকজোঁক, আছাড়িপিছাড়ি, উবদোখাবদা, উবদোপাবদা, আমলাফয়লা, কাটচিট, কাপড়চোপড়, কামালে-জোমালে, নিকুলে-চুকুলে, কষ্টেসৃষ্টে, খুটিনাটী, গিন্নীধন্নী বা গিন্নীবান্নী, গিরগিটি, গোলমাল, চাষাভূষো, চুরমার, চোটপাট, চেঁচামেচি, ছেলেপিলে, ছুতোনাতা, ঝটাপটি, টোটামুটি, ডাকাবুকো, তুতিয়েপাতিয়ে, থরহরি, নিন্দাবান্দা, নেকড়াচোকড়া, পিঠানাটা, পাখীচুখী, ফাঁকিজুঁকি, মাপযোপ, মিলেগুলে বা মিলেজুলে, মিশেগুশে, মেখেচুখে, যোটপাট, যোড়াতাড়া, রাক্ষসখোক্ষস, লুঠপাট, লেখাযোখা, বাসনকোসন, বিয়া (বিয়ে) থাওয়া সাজগোজ, সাপকোপ, সেজেগুজে সোণাদানা, হাবাগোবা, হাবজাগোবজা, হাবুডুবু, হাডুডুডু, হাড়গোড়, হুড়পাড়।

(॥০) নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বীপ্সা ঘটিয়াছে। কিন্তু বড় অনিয়ম। কান্নাকাটি কান্নাকিং, কারকারবার, কাঁ্যা কটকট, খৈখেল্লা, গরিবগুরবো, গালিগালাজ, গোং গুষ্টি, ঘুরঘুটি, ঝগড়াঝাঁটি, টইটম্বুর, টাল-মাটাল, ঠিকঠিকানা, তরীতরকারী, তাকতম্বি, তালতোবড়া, তুচ্ছতাচ্ছল্য, ধনধোকড়া, ধূমধারাকা, পাখীপাখালী, ফণিফস্যি, (ফণিভাষ্য ?), ফাইফরমাশ, ভরাভর্ত্তি, ভুজোভাং, ভুলোভাটকা, মোটমাটারি, যোগসাযোগ, রাজারাজড়া, বনিবনাও, বরাবড্ডে, বুড়োহাবড়া, সময়শিরে, সাহেবসুবো, হাবরহাটী। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

থিওসফি ও বৌদ্ধধর্ম্ম

মিঃ সিনেট্ বলেন—"আদি বুদ্ধের অর্থ :—সেই সর্ব্বাদিম জ্ঞান, অতিপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে"; স্বর্গীয় ধ্যানী-বুদ্ধদিগের অনুরূপ মর্ত্ত্যলোকের মানব-বুদ্ধগণ; এই মানব-বুদ্ধগণ ধ্যানী-বুদ্ধগণ হইতেই উদ্ভূত; তাহার পর, স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বগণ; জ্ঞানের অভিব্যক্তিস্বরূপ—অবলোকিতেশ্বর; পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের অনুরূপ

পঞ্চ মানব-বুদ্ধ; এই পঞ্চ মানব-বুদ্ধের মধ্যে চতুর্থ বুদ্ধ শাক্যমুনি; প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের পর এক এক বুদ্ধ পৃথিবীতে আগমন করেন। ঈশ্বরের সহিত অর্হৎ-আত্মার যোগ হয়। এই সমস্ত কথা মিঃ সেনেট্ বিবৃত করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, এই সমস্ত মতবাদ, "যোগাচর্য্য" শাস্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সিনেট যে বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও আদিবুদ্ধের উল্লেখ আছে, আমরা শুধু তাঁহার সেই উক্তির প্রতিবাদ করিব। Schmedt,Csomado Coros, Burnouf, Wilson, Hodgson ও Schlaginweit সকলেই একবাক্যে এই কথা অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে এই আদিবুদ্ধ-বাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা আদিম বুদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত নহে। আর, যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম বুদ্ধধর্ম্মের আরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এই মতবাদ সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্তর্গত ত হইতেই পারে না।

প্রথমে আমরা দেখাইব, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত এই মতবাদগুলি, যে দর্শন-শাস্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়াছে সেই দর্শনশাস্ত্র অস্মৎযুগের দশম শতাব্দীতে তিব্বৎদেশে আবির্ভূত হয়। তাহার পর আমরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, এই মতবাদ-গুলি প্রাচীনকালের যেকোন ধর্ম্মপদ্ধতি হইতে গৃহীত হইতে পারে। প্রথমতঃ সিনেট যে গুপ্ত মতবাদের কথা একটা রহস্যের আবরণ দিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, উহা অতীব প্রাচীন-কালেও সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে বিদ্যমান ছিল। সভ্যতার পথে যাহারা সর্ব্বাগ্রগামী, সেই মিশরবাসীদিগের মধ্যে, দীক্ষিতদিগের মন্দিরাদি ছিল। চ্যাল্ডীয়, হিন্দু, পারসীক, চীনীয়, ইহুদি—ইহাদের মধ্যেও ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত গুপ্ত মতবাদগুলি মূলতঃ অভিন্ন। Lao-Tsen-র Tao মতবাদ এবং ভারত ও মিশরের বিশ্ব-ব্রহ্ম মতবাদ যে সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহুদীদিগের "কাবাল"-গ্রন্থদ্বয় ঐ একই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।' আর, সৃষ্টি-প্রকরণসম্বন্ধে, কি মিশরীয়, কি চাল্ডীয়, কি হিন্দু, কি ইহুদি, কি গ্রীস এই সকল জাতির মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতে উহাদের সাধারণ উৎপত্তিই সপ্রমাণ হয়। সিনেট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

"এই গ্রন্থে, অর্হৎ বৌদ্ধদিগের যে সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা আমরা বিবৃত করিয়াছি, উহা দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগেরই পদ্ধতি। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল।"

জীবপর্য্যায়ের পদ্ধতি, বৌদ্ধদিগের বিভিন্ন স্বর্গ, যাহার অনুরূপ—চিত্তশুদ্ধি ও ধ্যানসমাধির বিভিন্ন অবস্থা,—এই সমস্ত বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছে; অবশ্য উহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও করিয়াছে।

অতএব, কিসে যে থিয়োসফি বিশেষ-রূপে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

"বৌদ্ধ গৌতম এই মতবাদের পূর্ণতা-বিধান কল্পে এতটা করিয়াছেন যে ইহা তাঁহারই নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছে"—এই

বিশ্বাসের উপর ভর করিয়াই তিনি উক্ত প্রকার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, থিয়োসফির মতবাদ-গুলি আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের মতবাদ নহে। তা ছাড়া আমরা ইহাও দেখাইব যে, শাক্য-মুনির দর্শন-পদ্ধতি থিয়োসফির দর্শন পদ্ধতি নহে। ল্যাসেন, বুর্ণুফ্, প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শনপদ্ধতি কপিলের সাংখ্য সিদ্ধান্ত হইতে বিকাশলাভ করিয়াছে। এ কথা সকল প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তারাই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বুর্ণুফ্ এইরূপ বলেন—"শাক্যমুনি ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া, নাস্তিক সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধান্তগুলি এই ঃ—ঈশ্বরের অসদ্‌ভাব, মানব-আত্মা-সমূহের বহুত্ব ও নিত্যত্ব, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির নিত্যত্ব। সেই প্রকৃতিও রূপান্তরিত হইয়া থাকে; এবং তাহার কতকগুলি উপাদান আছে; সেই উপাদান-গুলি দিয়া, প্রকৃতি, সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান মানবআত্মাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। এই মতবাদ হইতে শাক্যমুনি,—ঈশ্বরের নাস্তিত্ব, মানব-আত্মার বহুত্ব, যোনিভ্রমণবাদ, নির্ব্বাণ-মুক্তি— এই সমস্ত গ্রহণ করেন। এই নির্ব্বাণ-মুক্তির কথা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মণ্যিক দর্শনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

সিনেটের গুহ্যবৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এই সকল মতবাদই আমরা দেখিতে পাই।

যে কর্ম্মবাদ থিয়োসোফির একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়, উহা কি বৌদ্ধধর্ম্ম, কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম —উভয়েরই অনুভূত।

থিয়োসফির মতানুসারে, যে সকল উপাদানে মানুষ গঠিত, তন্মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই "রূপ"। এই রূপ-শব্দের অর্থ আকার; সমস্ত হিন্দুদর্শনেই ইহার উল্লেখ আছে।

থিয়োসফির তৃতীয় তত্ত্ব— "অ্যাষ্ট্রাল্ বডি" অর্থাৎ "লিঙ্গশরীর"। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সাংখ্যদর্শনের সংজ্ঞা। কতকগুলি বিশুদ্ধ উপাধি লইয়া এই শরীর গঠিত,—ইহাই সাংখ্যদর্শনের "সূক্ষ্মশরীর"।

পঞ্চম উপাদান—"মনঃ"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মনঃ কি? না, অন্তঃকরণ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই মতে, ইহা চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় আর একটি ইন্দ্রিয়।

ষষ্ঠ উপাদান "বুদ্ধি"। কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ উভয়ের ভাষাতেই ইহার অর্থ—যে মনোবৃত্তির দ্বারা মনুষ্য জ্ঞান লাভ করে।

সপ্তম উপাদান—আত্মা। বৌদ্ধদিগের এই আত্মা, এই আমি,—জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতাদি সংযুক্ত ব্যক্তিগত দেহ নহে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, কত প্রকার বিভিন্ন উপাদান লইয়া থিয়োসফি গঠিত। ইহার আরও অন্যান্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। থিয়োসফি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দাবী কিয়ৎপরিমাণে সপ্রমাণ করিতে পারিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যমুনির সহিত কোন প্রকার যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিবে না।

পরিশেষে, মিঃ সেনেটের গ্রন্থের কতক-গুলি ভ্রম প্রদর্শন করিব। এই ভ্রমগুলি উপেক্ষা করা যায় না; কারণ, তিনি "মহা-ধীশক্তি সম্পন্ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত সংস্কৃত

ব্রাহ্মণ" শঙ্করাচার্য্যকে প্রমাণ মানিয়া এই সকল ভ্রমের অবতারণা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধেরই এক অবতার; এবং তাঁহার মতে বুদ্ধের মৃত্যুর ৬০বৎসর পরে, শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। আরও তিনি এই কথা বলেন—"শঙ্করাচার্য্য—বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও তিনি ব্যাসের গ্রন্থাদি হইতে ইহার পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদান্তের প্রকৃত অর্থ—জ্ঞানের চূড়ান্ত অংশ। শঙ্করাচার্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যিক দর্শন বেদান্তের সংস্থাপক বলায়—এমন কি সাংখ্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলায় মিঃ সিনেট্ একটা কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বয়ং ব্যাস যিনি দ্বিতীয় বেদান্ত-দর্শনের সংস্থাপক, প্রাচীন বেদান্ত-দর্শনকে সমর্থন করাই যাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই ব্যাস বৌদ্ধধর্ম্মের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। সেনেট, যে শঙ্করাচার্য্যকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছেন, তাঁহাকেই আবার এমন এক দর্শন-তন্ত্রের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন যাহা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত, কোল্‌ব্রুকের মতে, ব্যাস বা বেদব্যাসের অর্থ "বেদের সঙ্কলনকর্ত্তা।" বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই দর্শনের নাম "বেদান্ত" হইয়াছে। পক্ষান্তরে শাক্যমুনি, শুধু যে বেদের প্রামাণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি বেদান্ত দর্শনের সেই বিষম শত্রু কপিলের দর্শন হইতে তাঁহার দর্শনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা—শঙ্করাচার্য্য,,, বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, ব্রহ্ম-সূত্রের একজন প্রখ্যাত ভাষ্যকার। সেই ভাষ্যগ্রন্থে, তিনি বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র—যাহা বৌদ্ধদিগের আদিম দর্শনগুলির পরবর্ত্তী—সেই ব্রহ্ম-সূত্রের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দর্শনগুলি ভ্রান্ত, ইহাই সপ্রমাণ করা। কেননা, তাঁহার মতে, ঈশ্বর পূর্ণরূপে এক ও অখণ্ড এবং জগৎ বাস্তবসত্য নহে। সুতরাং, ইহা শাক্যসিংহের প্রচারিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এই বেদান্তদর্শন যে বৌদ্ধদিগের প্রতিপক্ষ, তাহার প্রমাণ—বর্ত্তমান কালেও বৈদান্তিক ব্রাহ্মণেরা, জৈননামক হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরোধী তাঁহারা বলেন, যে প্রকারেই ভৌতিক পদার্থের যোগাযোগ কর না কেন, তাহা হইতে জ্ঞানবস্তু কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না; এবং ভৌতিক পদার্থের দ্বারা মনোবৃত্তি ও মানসিক ব্যাপারেরও ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

অতএব শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের প্রতিপক্ষ; সুতরাং তিনি বুদ্ধের অবতার হইতে পারেন না।

মিঃ সিনেট ব্রহ্মের যে উৎপত্তি দিয়াছেন তাহাতেও বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "ব্রহ্ম শব্দ 'বৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ, প্রসারিত হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া, ফলপ্রসূ হওয়া।"

পক্ষান্তরে Eichhoff এর ব্যাকরণ অনুসারে ব্রহ্মশব্দ "ব-র-হ" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ ধারণ করা। বস্তুত, ব্রহ্ম বিশ্ববিধরণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ, নিজ স্বরূপে পূর্ণভাবে অবস্থিত। তিনি সেই

আধ্যাত্মিক রসস্বরূপ. যিনি পবিত্র বাক্যকে বাক্য হইতে উর্দ্ধে উত্তোলন করেন, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে সত্যরূপে বিরাজ করেন সেই জন্যই, Oldenburg বলেন,"যিনি পবিত্র বাক্য অবগত হইয়াছেন, তিনিই একটি আশ্রয় লাভ করেন, কেননা ব্রহ্মই সকলের আশ্রয় ও অবলম্বন।"

পরিশেষে মিঃ সেনেটের "একটি স্পর্দ্ধা-বাক্য এইখানে উদ্ধৃত করিব—"কোন প্রামাণিক বৌদ্ধলিপি আমাকে কেহ দেখান দেখি যাহাতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে—এই মতবাদটি এইরূপ শিক্ষা দেয় যে, কোন জীববিবর্ত্তনক্রমে একবার মানব-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর আবার কোন সময়ে পশুরাজ্যে নামিয়া আসিতে পারে। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এরূপ বাক্য কখনই কেহ দেখাইতে পারিবে না।"

আমি মিঃ সেনেটকে এই সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক বৌদ্ধ বাক্য প্রদর্শন করিব। ইহা সংস্কৃত "দিব্য-অবদানের" অন্তর্গত "সংঘ-রক্ষিতার" কাহিনী। তিব্বতীয়দিগের "Dul-va" গ্রন্থের মধ্যেও এই কাহিনীটি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভূত। বুর্ণুফ এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—"মাননীয়া সংঘরক্ষিতা ভগবান্ বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া এই রূপ বলিলেন—"প্রভো, আমি এই জগতে এমন সকল জীব দেখিয়াছি যাহাদের আকৃতি প্রাচীরের ন্যায়, স্তম্ভের ন্যায়, বৃক্ষের ন্যায়, পুষ্পের ন্যায়, ফলের ন্যায়, রজ্জুর ন্যায়, সম্মার্জ্জনীর ন্যায়, ঘটের ন্যায়, উদুখলের ন্যায়, কটাহের ন্যায়; আমি এমন জীবও দেখিয়াছি যাহার দেহ মধ্যস্থলে বিভক্ত হওয়ায়, যাহারা কেবল মাংসপেশীর ভরে, বিচরণ করে। প্রভো, কিরূপ কর্ম্মফলে জীব এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়?" ভগবান উত্তর করিলেন—"সংঘ-রক্ষিতা, তুমি প্রাচীরাকৃতি যে সকল জীবকে দেখিয়াছ, তাহারা সম্বুদ্ধ কাশ্যপের শ্রোতৃবর্গ। উহারা নিষ্ঠীবনের দ্বারা সংঘারামের প্রাচীরকে কলুষিত করিয়াছিল! এই কর্ম্মফলে উহারা প্রাচীরের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কারণেই, অন্য শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ বা বৃক্ষকারে, কেহ বা উদুখলের আকারে, কেহ বা কটাহ আকারে পরিণত হইয়াছে।" ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে?

এইখানে আমি উপসংহার করিব। বড় বড় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের গ্রন্থ হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, আমি যে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি, উহা প্রধানত ব্যবহারিক ধর্ম্মনীতির সংহিতামাত্র। সকল জনসমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ নিম্ন-শ্রেণীদিগের মধ্যে, সাধুতা চিত্তশুদ্ধি, মাধুর্য্য মৈত্রী প্রভৃতির জ্ঞান উন্মেষ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ শাক্যমুনি, "ধর্ম্মমিত্র" ও "মানব-মিত্র" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মুক্তির জন্য তিনি সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলেন, "আমার এই ধর্ম্ম সর্ব্বজনের মুক্তির জন্য।" অনেক পণ্ডিত এই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানানুশীলনের উচ্ছেদ করে, সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ করে,

এক কথায়, মানুষকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জড়তার দিকে লইয়া যায়। কিন্তু আমার বোধ হয়, শাক্যমুনির প্রকৃত উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এইরূপ দোষারোপের কোন ভিত্তি থাকে না। জ্বলন্ত উৎসাহ-পূর্ণ করুণহৃদয় বুদ্ধ, যতটা সম্ভব, মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি পার্থিব সুখসম্ভোগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন, এই সকল সুখ অতীব অসার। তাহার পর, যে অহংবুদ্ধি আমাদিগকে জীবনের প্রতি আসক্ত করে ও আমাদের অন্তরে ভবতৃষ্ণার উদ্রেক করে, সেই অহংবুদ্ধিকে মানব-অন্তর হইতে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, তিনি যোনি-ভ্রমণবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সকলকে এই আশ্বাস দিলেন যে, যে ব্যক্তি নির্ব্বাণের অনুসরণ করিবে সেই চরম মুক্তি বা মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। এক কথায়, তিনি মনুষ্যের হৃদয় হইতে সুখের অভাব-বোধ তিরোহিত করিয়া, মানুষকে পার্থিব সুখ হইতে বিযুক্ত করিয়াছেন। মানসিক ও সামাজিক উন্নতির উচ্ছেদ হউক বা যাহাই হউক, তিনি মানুষের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কি দীনহীন দুঃখপীড়িত মানবমণ্ডলীর পরম কল্যাণ সাধিত হয় নাই? তিনি যখন কারিগর-দিগকে, শূদ্রদিগকে, দীনদরিদ্রদিগকে, অস্পৃশ্যদিগকে আপনার নিকট আহ্বান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রচারকালে তখন এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কথাই তাঁহার মনে হইয়াছিল, উচ্চশ্রেণীর কথা তাঁহার মনে হয় নাই। পক্ষান্তরে, আমরা যাহাকে উন্নতি বলি, সভ্যতা বলি, তাহাতে অবশ্য মানুষের জ্ঞানসম্পদ বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু সে একপ্রকার ভৌতিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান নহে। উদ্দাম প্রবৃত্তি-সমূহ দমন করা দূরে থাকুক, তথাকথিত উন্নতি এমন-সব নূতন অভাবের সৃষ্টি করে, যাহা কখনই পূরণ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মানুষের হৃদয়-ভাব, মানুষের অভাবসমূহ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, মানুষকে অতি সূক্ষ্মচেতা করিয়া দিয়া, সেই সঙ্গে তাহার দুঃখবোধও তীব্র করিয়া তুলে। আমাদের যেরূপ ভৌতিক বা বৈষয়িক সভ্যতা, তাহাতে দারুণ জীবন-সংগ্রামের উদ্ভব হয়। দীনহীন দরিদ্র ও দুর্ব্বলের প্রতি দারুণ নির্দ্দয় এই যে সভ্যতা, ইহা সামাজিক সংগ্রাম-উৎপাদন-কারীর সহিত মূলধনীয় বিরোধ, পররাজ্যের সহিত যুদ্ধ, পরদেশাক্রমণপ্রবৃত্তি এই সমস্ত উত্তেজন করে। এই সমস্ত আয়াসের বিনিময়ে মানুষ পায় কি?—ততটুকু শিক্ষা পায় যাহাতে করিয়া মানুষ তাহার অবস্থার হীনতামাত্র অনুভব করিতে পারে এবং সেই বিলাসসুখের আস্বাদ পায় যাহা তাহাকে কখনই পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি দিতে পারে না।

প্রকৃত কথা, বাসনাহীন প্রশান্ত ধ্যানাত্মক বৌদ্ধজীবন—সেই জ্বালাময়, অত্যুত্তপ্ত পাশ্চাত্য মানব-জীবন অপেক্ষা কি বাঞ্ছনীয় নহে, যে জীবন ভৌতিক সভ্যতার ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া সতত বিক্ষুব্ধ

হইতেছে? সুখ দিতে না পারুক, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিলেও, বৌদ্ধধর্ম্মকে মানবমণ্ডলীর পরম হিতকারী সুহৃৎ বলিতে হইবে। এই মর্ত্ত্যজীবনের—বিশেষত আমাদের সভ্যতার চিরসহচর দারুণ দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রামে হতাশ হইয়া সমাজের হতভাগ্য অসহায় যে সকল ব্যক্তি আত্মহত্যার দ্বারা মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহারা কি পরিশেষে সেই পরম কল্যাণময় বিরামের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, যে বিরামকে কপিল-বস্তুর মধুর-প্রকৃতি শাক্যমুনি "নির্ব্বাণ"-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তির লোকশিক্ষা।

যত প্রকারের সামাজিক সমস্যা আছে, তার মধ্যে লোকশিক্ষার সমস্যাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই জটিল সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই লোকশিক্ষার সমস্যার অসাধারণ গুরুত্ব ও জটিলতা প্রত্যক্ষ করিয়া, একান্ত সরাসরি ভাবে, শুদ্ধ একটা সদিচ্ছার উৎসাহে, ইহার মীমাংসা করিতে সাহস হয় না।

যথাযোগ্য অনুশীলনের দ্বারা মানুষের যাবতীয় স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তিকে ভাল রূপে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহাদের সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, নিজ নিজ সমাজের বিচিত্র কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়া, আপনার জীবনের যথাসম্ভব সার্থকতা লাভে সমর্থ করাই—আধুনিক শিক্ষার আদর্শ। এই শিক্ষার দুইটী মুখ্য অঙ্গ। এক অঙ্গ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে, ও অপর অঙ্গ তাহার সামাজিক জীবনকে অধিকার করিয়া আছে। এই শিক্ষার ব্যক্তিগত অঙ্গ মনোবিজ্ঞানের উপরেই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আর ইহার সামাজিক অঙ্গ সমাজতত্ত্বের উপরেই গড়িয়া উঠিতেছে।

জগতের প্রাচীন সাধনা সকলে সকল স্থানে লোকশিক্ষার এই ব্যক্তিগত অঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। আজিকালি আমরা ব্যক্তিত্ব বলিতে যে বস্তু বুঝি, ইংরেজীতে যাহাকে Human Personality বলে, প্রাচী সাধনায়, ভারতবর্ষের বাহিরে, তাহার জ্ঞান কোথাও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের বাহিরে, মানবের অন্তঃপ্রকৃতিকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাও কুত্রাপি হয় নাই জগতের প্রাচীন সাধনায় মানবপ্রকৃতির অশেষ জটিলতার জ্ঞানও ভাল করিয়া ফোটে নাই। মানুষের প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দের মধ্যে যে একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া আছে, তাহার জ্ঞানই প্রাচীন কালের লোকচিত্তকে অনেক স্থলে একান্ত অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। আর এই বিরোধের জ্ঞান এমন একটা প্রবল দ্বৈতভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল যে, তাহাতে মানবপ্রকৃতির

মৌলিক ও অনতিক্রমনীয় একত্বের জ্ঞানকে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেয় নাই। সুতরাং সে কালের লোকশিক্ষার আদর্শ অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রবিশেষের আদেশের কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের অনুশাসনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইত। সে আদর্শ সর্ব্বতোভাবে মানুষের নিজের প্রকৃতির উপরে এবং সেই প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। সে কালের লোকশিক্ষা বাহির হইতে কি ভাল এবং কি মন্দ তাহার প্রামাণ্যলক্ষণ সংগ্রহ করিয়া, উপর হইতে সেই বাহিরের আদর্শকে জনগণের উপরে চাপাইবার চেষ্টা করিত এবং মানুষের আপাত ভালকে বাড়াইয়া তাহার আপাত মন্দকে নিরস্ত করিবার প্রয়াসেই আপনার সফলতা অন্বেষণ করিত।

এ শিক্ষার প্রকৃত মূল্য ও সত্য সার্থকতা যাহাই হউক না কেন, উহা যে অনেকটা সহজ ছিল, এ কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু এ কালের মনোবিজ্ঞান মানবপ্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্য ও আপাত-বিরোধের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় একত্ব আছে, তাহাকে যতই আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই পুরাতন দ্বৈতবোধ নষ্ট হইয়া, আধুনিক শিক্ষার সমস্যাকে ক্রমশঃই অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিতেছে। মানবপ্রকৃতি স্বরূপতঃ এক, যদিও অশেষ প্রকারের রূপের ভিতর দিয়া সেই প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। ছায়াতপের ন্যায় ভাল ও মন্দ মানুষের মধ্যে মিশিয়া আছে। মানুষের ভালোর মধ্যেই তার মন্দ এবং মন্দের মধ্যে তার ভাল লুকাইয়া আছে। আত্যন্তিক ভাল বা আত্যন্তিক মন্দ, দুয়ের কিছুই তাহার মধ্যে নাই। সুতরাং মানব-প্রকৃতির কিছুই একান্ত ভাবে উপেক্ষণীয় বা পরিত্যজ্য নহে। প্রাচীন কালের শিক্ষা মানুষের প্রকৃতির ভাল ও মন্দের প্রত্যক্ষ বিরোধকে জাগাইয়া রাখিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়াই আপনার আদর্শলাভে চেষ্টা করিত। আধুনিক শিক্ষা এই বিরোধকে বিবর্ত্তনের একটী প্রক্রিয়া মাত্র মনে করে, এবং এই বিরোধের ভিতর দিয়াই মানব-প্রকৃতি যে সামঞ্জস্যের দিকে যাইতেছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া চলে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা মন্দের ভিতর দিয়াই ভালকে বাড়াইয়া তুলিয়া এবং ভালোর ভিতর দিয়া মন্দকে শোধিত করিয়া মানুষের প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সুর মিলাইয়া কলাবিশারদ বাদ্যকরেরা যেমন একটা অপূর্ব্ব সঙ্গত করিয়া তোলেন, সেইরূপ মানুষের ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি আপাত-বিরোধী বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকলের যথাযোগ্য অনুশীলন করিয়া, তাহাদের মিলনে একটা অপূর্ব্ব সঙ্গত করাই আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ভাল মন্দ সেই প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত হইয়া আছে, তাহার সকল গুলিকে মিলাইয়াই এ সঙ্গত করিতে হইবে। এ সকলের মধ্যে কোনো বৃত্তিকে ছাড়াইয়া এ সঙ্গত পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিবে না। একটীকে খাটো করিয়া অপর কোনোটীকে বাড়াইয়া দিলে এ সঙ্গত নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রত্যেক বৃত্তির এক একটী নিজস্ব লক্ষ্য

আছে। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির এই নিজস্ব লক্ষ্যটীকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রত্যেক বৃত্তি আপনার নিজস্ব লক্ষ্যেরই অনুসরণ করিবে, অথচ তারই ভিতর দিয়া সকলে মিলিয়া সমগ্র প্রকৃতির যে লক্ষ্য, তাহাকেই বাড়াইয়া দিবে। ইহাই আধুনিক শিক্ষার ব্যক্তিগত অঙ্গের উৎকৃষ্ট আদর্শ। আর এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াই এ কালের মনোবিজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে লোকশিক্ষার সমস্যাকে এমন বিষম জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীন সাধনা সকলে অনেকস্থলেই মানব-প্রকৃতির এই জটিলতার জ্ঞান ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সে সকল সাধনা মানুষের ভিতরে একটা আত্যন্তিক দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়া, কতকগুলি বৃত্তিকে ভাল আর কতকগুলিকে মন্দ ভাবিয়া, ভাল বৃত্তিগুলিকে সতেজ ও মন্দগুলিকে নিস্তেজ করিবার জন্য, লোক-শিক্ষার নামে মানুষের উপরে অশেষবিধ অস্বাভাবিক শাসনসংযমের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে নিষ্পেষিত করিত। সুতরাং সে কালের লোকশিক্ষাতে মানবপ্রকৃতিকে সাহায্য করার চেষ্টা অপেক্ষা শাসন করার চেষ্টাই বেশী ছিল। ভিতর হইতে, যথাযোগ্য অনুশীলনের দ্বারা, মানবের প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদনের চেষ্টা অপেক্ষা, সে কালের লোকশিক্ষাতে মানুষের উপরে কতকগুলি বাহিরের বিধিনিষেধ চাপাইয়া দিয়া সেই প্রকৃতিকে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার চেষ্টাই অধিক ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান লোকশিক্ষার যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহা এই প্রাচীন আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ আদর্শে প্রাচীন শাসনের স্থলে নূতন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ আদর্শের প্রেরক ও পরিচালক অপরের আদেশ নহে, কিন্তু নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি। এই আদর্শ শিক্ষাকে কঠিন ও ক্লেশকর না করিয়া সর্ব্বতোভাবে সহজ ও সুখকরই করিতে চাহে। এই আদর্শের অনুসরণের জন্য জনগণকে প্রবৃত্ত করিবার মূল মন্ত্র ভয় নহে কিন্তু লোভ।

অতএব আধুনিক আদর্শের লোকশিক্ষা কোথাও প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সকলের আগে সে শিক্ষা সম্বন্ধে জনগণের রুচি জন্মান আবশ্যক। আর তাহা করিতে গেলেই বর্ণ-জ্ঞানপ্রচারের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, আগে জনমণ্ডলীর প্রাণে বস্তুজ্ঞানলাভের জন্য যাতে একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তারই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিকী বুদ্ধিবৃত্তি অপরাপর দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে। সুতরাং জ্ঞান-উপার্জ্জনের মূল যন্ত্রটী আমাদিগের জন-সাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই সক্ষম হইয়া আছে। যে ক্ষেত্রে এই যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, আমাদিগের যা কিছু অভাব, কেবল তারই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে এই ক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠাই লোকশিক্ষার প্রথম কর্ম্ম। কতকগুলি পাঠশালা খুলিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণ শিশুদিগকে সেখানে পাঠাইলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বরং সাক্ষাৎভাবে শিক্ষার্থীদিগের অভি-ভাবকদিগের প্রাণে এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদিগেরও মধ্যে এই জবরদস্তির

ব্যাপারে শিক্ষালাভে অনুরাগ না জন্মাইয়া বিরাগই উৎপাদন করিবে। অতএব দেশের জনসাধারণের মধ্যে সৎশিক্ষাবিস্তারের পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিবার জন্যই এই জবরদস্তির লোকশিক্ষার ব্যবস্থ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আর জনমণ্ডলীর প্রাণে জ্ঞানপিপাসার উদ্রেক করিতে হইলেই তাহাদের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া তাহার যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয় বলিয়া সকল বিষয়ে সকলের সমান কুতূহলও জন্মে না। এই জন্য সকলে সকল বিষয়ের অনুশীলন এবং অধ্যয়ন করিতেও পারে না। এই কারণেই কেহ বা গণিতের, কেহ বা জড়বিজ্ঞানের, কেহ বা জীবতত্ত্বের, কেহ বা ইতিহাসের, কেহ বা কাব্যের, কেহ বা সঙ্গীতের, কেহ বা স্থাপত্যের, আর কেহ বা ভাস্কর্য্যের অনুশীলনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রস পাইয়া থাকে এবং যে যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রস পায়, সে সেই বিষয়ের অধ্যয়ন ও আলোচনাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বও লাভ করিয়া থাকে। যার যে বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, জোর করিয়া তাহাকে সেই বিষয়ের অধ্যয়নে নিয়োগ করিলে, তাহাতে অযথা শক্তিক্ষয় হয় মাত্র। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান এই অযথা শক্তিক্ষয় নিবারণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে সর্ব্ববিধ শিক্ষিতব্য বিষয়ের অধ্যয়নে নিযুক্ত করে না। কিন্তু জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে তাহাদের নিজ নিজ রুচি, প্রবৃত্তি ও পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত করিয়া থাকে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ব্যক্তিগত শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর রুচি ও অভ্যাস ও শক্তি অনুযায়ী তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে; সেইরূপ জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধেও জাতির প্রকৃতি ও রুচি, ভিতরকার ও বাহিরের প্রয়োজন ও আয়োজন তাহাদের পূর্ব্বশিক্ষারই অনুসরণ করে। সকল লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি, সংস্কার ও অভ্যাস যেমন সমান নহে, সেইরূপ জগতের সকল জাতির রুচি ও প্রবৃত্তি, সংস্কার এবং অভ্যাস সমান নয়। ইংরেজের রুচি ও প্রবৃত্তি আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তি হইতে ভিন্ন। যে সকল বিষয়ে সচরাচর ইংরেজ জনসাধারণের অসাধারণ কুতূহলের উদ্রেক হইয়া থাকে, সে সকল বিষয়ে অনেক সময়েই আমাদের দেশের লোকের বিন্দু পরিমাণ কুতূহলও জন্মে না। যে রস ইংরেজকে মাতাইয়া তোলে, সে রস অনেক সময় হয় ত আমাদিগের জনগণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। আবার আমরা যে রসে সহজেই মগ্ন হইয়া যাই, ইংরেজ হয় ত সে রসের স্বাদ কিছুই জানে না। সুতরাং যে উপায়ে ইংরেজসমাজে লোকশিক্ষা বিধান করা সম্ভব ও সহজ, সেই উপায়ে, সেই সকল বিষয় অবলম্বনে ও সেই রূপ প্রণালীর অনুসরণে, আমাদের দেশে লোকশিক্ষা বিধানের চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না।

ইংরেজের আইন আদালতের উদ্যত-

শাসনদণ্ডের ভয় দেখাইয়া, দেশের জনসাধারণকে বর্ণজ্ঞ করিয়া যে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা যে দেশের লোক-প্রকৃতির এবং জনমণ্ডলীর পুরাগত সভ্যতা ও সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনোই সম্ভাবনা নাই। সরকারী আইনের সাহায্যে যে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যে ইংরেজ-রাজের আপনার স্বজাতির শিক্ষা ও সাধনা, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস এবং তাঁহাদেরই রুচি ও প্রকৃতির স্বল্পবিস্তর অনুসরণ করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য।

আর লোকশিক্ষার সঙ্গে সর্ব্বত্রই দেশের রাষ্ট্রশক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এই জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের রাষ্ট্রশক্তি যাঁহাদের হাতে থাকে, তাঁরা সর্ব্বদাই জনমণ্ডলীর শিক্ষার ব্যবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের করতলগত করিয়া রাখিতে চাহেন। সুতরাং ইংরেজ-রাজ আপনার রাজবিধানের তাড়নায় দেশের সর্ব্বসাধারণ শিশুমণ্ডলীকে পাঠশালায় পাঠাইয়া, তাহাদের শিক্ষার ভার আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, এমন কল্পনাও করা যায় না। ইংরেজ আইন করিয়া যদি এ দেশে কখনো সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে শিক্ষিতব্য বিষয় নির্দ্ধারণ এবং শিক্ষার প্রণালী নির্ব্বাচন,—এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল কর্ম্মই—একান্ত ভাবে আপনার হাতেই রাখিবেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও নীতিসঙ্গত। আর তাহাই যদি হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার যেমন আমাদের জাতীয় শাস্ত্রের ও সাহিত্যের, সভ্যতার ও সাধনার, অভ্যাসের ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; সেইরূপ এই সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষার সঙ্গেও দেশের সত্যিকার প্রাণবস্তুর কোনোই সম্পর্ক থাকিবে না। উচ্চশিক্ষা পাইয়া আমরা যেমন বহুল পরিমাণে স্বদেশের প্রাণ হইতে সরিয়া পড়িয়াছি, দেশের সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যেও এই জবরদস্তির লেখাপড়ার ফলে ক্রমে তাহাই ঘটিবে। এই বিপদ নিবারণের জন্য এই উৎকট সংস্কারচেষ্টার প্রতিরোধ করা আবশ্যক।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতীয় ইতিবৃত্তের বিভাগ

মহাভারতের সমাজ কাল্পনিক না হইলেও তাহাতে যখন মহাভারত ইতিহাস না হইয়া ইতিহাসবাদ-পদবাচ্য হয়, তখন মহাভারতের ইতিবৃত্ত সত্য কি না অনুসন্ধেয়। পাণ্ডবগণের কার্য্যকলাপ-বর্ণনা মহাভারতের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ব্যাসদেব চন্দ্রবংশের আমূল পরিচয় দিয়াছেন। অব্জযোনি হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই ইতিবৃত্তকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দার্শনিক, দ্বিতীয় লৌকিক। পদ্মযোনি হইতে বুধ পর্য্যন্ত দার্শনিক।

পুরূরবা হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত লৌকিক। লৌকিককে আবার দুইভাগ করা যাইতে পারে প্রাচীন ও সমসাময়িক। পুরূরবা হইতে প্রতীপ পর্য্যন্ত প্রাচীন। শান্তনু হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত সমসাময়িক। প্রাচীনাংশকে আবার লৌকিকালৌকিক ও শুদ্ধলৌকিক এই দুই শাখায় বিভাগ করা যাইতে পারে।

দার্শনিক অংশ

দার্শনিক অংশ এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, উহা উপকথা নহে, উহাতে গভীর সৃষ্টতত্ত্ব নিহিত। ব্রহ্মাই দার্শনিকের অহঙ্কারতত্ত্ব; সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার প্রভৃতি সেই তত্ত্বের পুত্রীভূত মনস্তত্ত্বের ইচ্ছোপসর্জ্জনজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, মরীচ্যাদী মনের জ্ঞানোপসর্জ্জন-ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। কশ্যপ মনোধর্ম্ম-সংকল্পের পরিচালক। দক্ষ সৃষ্টিকৌশল, ব্রহ্মার জ্ঞানেচ্ছোপসর্জ্জন কর্ম্মের ফল। তাহার পত্নী প্রসূতি ক্রিয়াশক্তি। তাঁহার পঞ্চাশটী কন্যা সেই ক্রিয়াশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানভেদ। চতুর্দ্দশ ক্রিয়াশক্তির সহিত মিলিত হইয়া কশ্যপ সূক্ষ্ম সাত্বিক দেবসর্গ, সূক্ষ্মরাজসিক গন্ধর্ব্বাদি-দেবযোনিসর্গ, সূক্ষ্মতামসিক অসুরসর্গ, স্থূলতামসিক পশুপক্ষিসর্গ করেন। ব্রহ্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ অত্রি হইতে ইচ্ছাশক্তির বাসনারূপ অংশই চন্দ্র। কামনামণ্ডলই চন্দ্রের অধিকার। জীব যত দিন কামী, ততদিনই কামনামণ্ডলে ঘূর্ণায়মান। তাই গীতায় বলা হইয়াছে "তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।" সেই চন্দ্রের পুত্র বুধ কামকামীর বুদ্ধি। এদিকে মনু স্রষ্টার মনীষা। তাঁহার কন্যা ইলাই পৃথিবী বা পার্থিবভাব। তিনি যখন বুধের সহিত মিলিত তখনই কামকামী মানববংশ পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত।

লৌকিকালৌকিক অংশ

পুরূরবা মর্ত্ত্যধামে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। অবশ্য মানববংশের পূর্ণপরিচয় দিতে গেলে এরূপ একস্থলে না একস্থলে দাঁড়াইতেই হইবে যাহার পূর্ব্বে আর যাওয়া চলে না। ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচ্যলেখক দেবতা হইতে সেই আদিপুরুষের জন্ম বলেন। প্রতীচ্যগণ তাঁহাকে ব্যাঘ্রাদির দুগ্ধে পোষিত বলেন। চন্দ্রবংশীয় নৃপগণের বংশ পুরূরবার পূর্ব্বে আর লইয়া যাওয়া যায় না, এইভাবে গ্রহণ করিতে চান গ্রহণ করুন, আর পুরূরবাকে দেবতার পুত্রই বলুন উভয়ের কোনটীতেই পুরূরবার অস্তিত্ব লোপ হয় না। তিনি একরূপ আদিমনুষ্য, অতএব তাঁহাতে অনেক অমানুষভাব আরোপিত হইয়াছে। অপ্সরা উর্ব্বশী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরণ করেন এবং সেই অপ্সরার গর্ভে তাঁহার আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু, ও শতায়ু নামে ষট্‌পুত্র জন্মে। এই ব্যাপারের যদি এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে উর্ব্বশীসদৃশ উর্ব্বশী নাম্নী কোন রূপবতী তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য দেন, তাহা হইলে ইতিবৃত্তের অলৌকিকতা যায়। পিতার চরিত্রে অলৌকিকতা থাকিলেও পুত্র আয়ু মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বর্ভানবীর গর্ভে তাঁহার নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা,

রজি এবং অনেনাঃ নামক চারি পুত্র হয়। নহুষ প্রবল পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্ত্তী। ইন্দ্রত্বাদি অমানুষিক ব্যাপার মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিবার পর ঘটায় নহুষের নর-লীলা অসম্ভবপর নহে। অবশ্য নহুষের ভ্রাতা রজির চরিত্র পুরাণে যেরূপ অঙ্কিত তাহা অসম্ভব। কিন্তু মহাভারতে সেই অলৌকিকতা না থাকায় মহাভারতের ইতিবৃত্ত সে দোষে দূষিত নহে। নহুষের ষট্‌পুত্র—যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অযতি ও ধ্রুব। যতি ক্ষণিক ভোগ ছাড়িয়া চিরানন্দকর যোগে নিমগ্ন হন। সুতরাং যযাতি সিংহাসন পান। তিনি শাসনগুণে প্রজাপুঞ্জকে, যাগযজ্ঞাদিদ্বারা দেবগণকে, অধ্যয়নাদিদ্বারা ঋষিগণকে সন্তুষ্ট করেন। সসাগরা ধরণি তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার দুই পত্নী—গুরুকন্যা দেবযানি ও অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানির গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অণু এবং পুরু নামে তাঁহার তিন পুত্র হয়। শুক্রাচার্য্যের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করায় কবি তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে অচিরে জরাগ্রস্ত হও। ঋষির চরণে পতিত হইলে তিনি রাজাকে ঐ জরা যে কোন পুত্রে সংক্রামিত করিবার শক্তি দেন। তদনুসারে যযাতি ক্রমে ক্রমে যদু, তুর্ব্বসু দ্রুহ্য ও অনুকে স্বীয় জরা বিনিময়ে তাহাদের যৌবন দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অবাধ্য পুত্রগণ কেহই পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে চাহিলেন না। কনিষ্ঠ পুরু নিজের যৌবন বিনিময়ে পিতার জরা লইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। পিতা সহস্র বর্ষ পুত্রের যৌবন লইয়া ভোগ করতঃ যখন দেখিলেন যে ভোগবাসনা কমিল না তখন হঠাৎ তাঁহার নির্ব্বেদ হইল। নির্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান জন্মিল। তখন অবাধ্য পুত্রচতুষ্টয়কে নির্ব্বাসিত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকে সিংহাসনে বসাইলেন ও স্বয়ং বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। যযাতির সহস্রবর্ষভোগ ও জরা সংক্রমণ ইত্যাদি সম্ভবপর না হইলেও উহার মূলে সত্য থাকা সম্ভব।

লৌকিকালৌকিকাংশের সত্যতাবিচার।

উক্ত অংশের সত্যতা নিরাকরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। পুরূরবা প্রভৃতি এত প্রাচীন যে সেই সময়ের কোন লেখ্য নাই। নিখিল পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও পুরূরবার উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যান গাথাতে চিররক্ষিত হইয়া পরে মহাভারত ও পুরাণে গ্রথিত হয়। ক্রমে উহা সংস্কৃত নাটকে ও কাব্যে প্রচলিত হইল। শর্ম্মিষ্ঠার উপাখ্যান লইয়া বঙ্গকবিও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঋগ্বেদ অভ্রান্ত বলিয়া যদিও বিশ্বাস না করেন, উহার উপাখ্যান-গুলি যে সত্যমূলক নহে তাহার কোন প্রমাণ নাই। আবার যদি দেখি সেই প্রবাদ কেবল মুখে না থাকিয়া বহুকাল যাবৎ লিখিত গ্রন্থে পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, তখন উহা বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিতে হইবে। এই অংশ যে গাথামূলক তাহা মহাভারত ও পুরাণাদিতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যযাতির পুত্র সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত অনুবংশশ্লোক সকলেই ধরিয়াছেন

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপার্ব্বণী॥

যযাতির নির্ব্বেদসম্বন্ধে

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
ইত্যাদি গাথাও উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঐ গাথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ও ভিত্তিহীন নহে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

শুদ্ধলৌকিক অংশ

পুরু হইতে প্রতীপ পর্য্যন্ত নৃপতিগণকে শুদ্ধলৌকিক অংশভুক্ত করা যাইতে পারে। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনুর বংশ পুরাণে বিশদরূপে দেওয়া আছে। মহাভারতে তাহা প্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

পুরুর পূর্ণবংশও মহাভারতে নাই। কেবল যে শাখা হইতে জনমেজয়ের উৎপত্তি সেই শাখা বঙ্গীয়সংস্করণের আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ে আনুপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে পুরুর প্রথিতবংশধর প্রবীর, মনস্যু, রৌদ্রাশ্ব প্রভৃতির পরিচয় আছে। জনমেজয় তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া স্বীয় বংশের আমূল পরিচয় চাহিলেন। তদুত্তরে বৈশম্পায়ন দক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত বংশাবলী দিলেন। ঐ অধ্যায় মতেই শুদ্ধলৌকিক অংশ দেওয়া গেল। পুরুর কৌশল্যা নাম্নী পত্নীতে জনমেজয় নামে পুত্র জন্মে। জনমেজয় তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও একবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মধুবংশীয়া অনন্তা নাম্নী ভার্য্যাতে তাহার প্রাচীন্বান্ নামক পুত্র হয়। প্রাচীন্বান্ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। নিখিল প্রাচীদিক্ জয় করায় তাঁহার প্রাচীন্বান্ আখ্যা হয়। তিনি যদুবংশীয়া অশ্মকীকে বিবাহ করিয়া সংযতি নামে পুত্র লাভ করেন। সংযতি দৃষদ্বৎ রাজার পুত্রী বরাঙ্গীর পাণিগ্রহীতা। তাঁহার পুত্র অহংযাতি কৃতবীর্য্যের দুহিতা ভানুমতীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌম নামে পুত্র পান। সার্ব্বভৌম কেকয়বংশীয়া সুনন্দাকে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ঐ বিবাহের ফল জয়ৎসেন। তিনি বিদর্ভবংশীয়া সুশ্রবার গর্ভে অবাচীন নামে পুত্র পান। অবাচীনের পত্নীও বিদর্ভবংশীয়া। তাহার নাম মর্য্যাদা। তাঁহার গর্ভে অবাচীনের অরিহনামক পুত্র হয়। তিনি অঙ্গরাজকন্যা আঙ্গীকে বিবাহ করিয়া মহাভৌমের জন্ম দেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে অনুবংশীয় বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটী ক্ষেত্রজ পুত্র হয়। ঐ পঞ্চ ভ্রাতার অধিকারই অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্র নামে প্রথিত। রামায়ণে প্রসিদ্ধ দশরথের সখা অঙ্গরাজ রোমপাদ অঙ্গের পৌত্র, দিবিরথের প্রপৌত্র। মহাভৌম প্রসেনজিতের কন্যা সুযজ্ঞার পাণিপীড়ন করিয়া তাঁহার গর্ভে অযুতনায়ী নামক পুত্র উৎপাদন করেন। অযুত পুরুষমেধযজ্ঞ করায় উহার নাম অযুতনায়ী হয়। তিনি পৃথুশ্রবার কন্যা কামাকে বিবাহ করেন। কামার গর্ভে জাত অযুতনায়ীর পুত্র অক্রোধন কলিঙ্গবংশীয়া করম্ভার স্বামী। তাঁহাদের পুত্র দেবাতিথি বৈদেহী মর্য্যাদার গর্ভে অরিহ নামক পুত্র পান। অরিহই পুরাণের রৌদ্রাশ্ব। এবং মহাভারতেও রৌদ্রাশ্ব নাম আছে। অঙ্গরাজবংশীয়া সুদেবার গর্ভে অরিহের ঋক্ষনামে পুত্র হয়। ঋক্ষই বোধ হয় ৯৪ অধ্যায়ের অনাধৃষ্টি। তিনি তক্ষকদুহিতা জ্বালার গর্ভে মতিনার নামক পুত্র পান। পুরাণে মতিনারের পরিবর্ত্তে রন্তিনার নাম দেখা যায়। মতিনার সরস্বতী-তীরে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করিলে সরস্বতী প্রীতা হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন, ইহা প্রবাদ। সেই পত্নীতে মতিনারের তংসু নামে পুত্র জন্মে। মতিনার অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তংসু ব্যতীত মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্যু নামক তাঁহার আরও তিনটী পুত্র হয়। তংসুর পত্নী কলিঙ্গবংশীয়া। কিন্তু তাঁহার নাম নাই। তংসু নিখিল বসুন্ধরা জয় করিয়া সম্রাট্ হন। তাঁহার পুত্র ঈলিনের পঞ্চ পুত্র—দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু। কালিদাসের কৃপায় দুষ্মন্ত আমাদের সকলের সুবিদিত। তিনি অপ্রতিরথ সম্রাট্ হন। বিশ্বামিত্র-দুহিতা কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার গর্ভে তাঁহার পুত্র ভরত জন্মে। ভরত হইতে ভরতবংশ। ভরত যেমনি যুদ্ধবীর তেমনি দানবীর। সর্ব্বস্বদক্ষিণযজ্ঞে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য কণ্বমুনিকে দান করেন। ভরতের চারিটী স্ত্রী। তিনটীতে তাঁহার নয়টী পুত্র হয়। ঐ পুত্রগণ অপদার্থ ছিল। তিনি সৎপুত্রের জন্য ভরদ্বাজের সাহায্যে যজ্ঞ করিলেন।

সেই যজ্ঞস্থলে সুনন্দার গর্ভে ভূমন্যু জন্মে। সেই পুত্রই বংশের গৌরব। তিনি দাশার্হবংশীয়া বিজয়ার পাণিগ্রহণ করেন। বিজয়ার গর্ভে ভূমন্যুর সুহোত্র, সুহোতা, সুহবিঃ, সুযজুঃ ও দিবিরথ নামক পঞ্চ এবং পুষ্করিণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ঋচিকনামে এক পুত্র হয়। সুহোত্র সাম্রাজ্য পান। তিনি ইক্ষাকুবংশের সুবর্ণাকে বিবাহ করেন। সুবর্ণার গর্ভে তাঁহার হস্তীনামক পুত্র জন্মে; সেই হস্তীই হস্তিনাপুরের স্থাপয়িতা। হস্তী ত্রিগর্ত্তদেশীয়া পত্নী যশোধরার গর্ভে বিকুণ্ঠনের জন্ম দেন। দাশার্হী সুদেবার গর্ভে বিকুণ্ঠনের অজমীঢ় নামে যে পুত্র হয়, তাঁহার যশোরাশি সকল পুরাণে গীত। অজমীঢ় হইতে চতুর্ব্বর্ণের প্রবৃত্তি। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে আজমীঢ় বলিয়া মহাভারতে প্রায়ই সম্বোধন করা হইয়াছে। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা, ঋক্ষিণী প্রভৃতি অনেক ভার্য্যার অনেক পুত্র হয়। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার কেশিনী নাম্নী পত্নীতে যে কণ্বনামে এক পুত্র হয় তাঁহার বংশধরগণ কাণ্বায়ন দ্বিজ হন। অজমীঢ়ের আর এক পত্নীর সন্ততি কতক নীপ ও কতক পৌরব নামে অভিহিত। তাঁহার নীলিনী-নাম্নী পত্নীর বংশই পাঞ্চাল আখ্যা পান। ঐ বংশেই সোমকের পৌত্র, পৃষতের পুত্র দ্রুপদ জন্মে। ধূমিনী-নামক পত্নীতে অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে এক পুত্র হয়। যদিও মহাভারতের ৯৫ অধ্যায়ে ঋক্ষের নাম নাই, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাঁহার নাম আছে এবং সংবরণ যে তাঁহার পৌত্র তাহাও ৯৫ অধ্যায়ে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। অজমীঢ়ের বংশধর সংবরণ এইরূপ বলায় সংবরণ যে পুত্র নহে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত উভয় অধ্যায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। সংবরণ সূর্য্যের তপস্যা করিয়া সূর্য্যদুহিতা তপতীকে পত্নীত্বে লাভ করেন। আদিপর্ব্বের চৈত্ররথো-পাখ্যানে গন্ধর্ব্ব চৈত্ররথ অর্জ্জুনকে কেন তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যামুখে তপতী এবং সংবরণের সহিত তাঁহার বিবাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে সংবরণের রাজ্যকালে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা প্রজাক্ষয় হইলে পাঞ্চালরাজ দশ অক্ষৌহিণী সেনা সহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহাতে সংবরণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন ও সিন্ধুতটস্থপর্ব্বতনিকুঞ্জে আশ্রয় লন। পরে তিনি বশিষ্ঠের কৃপায় পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হন। তপতীর উপাখ্যানেও বশিষ্ঠ যে সংবরণ কর্ত্তৃক পৌরহিত্যে নিযুক্ত হন তাহা প্রকাশ। সংবরণের পুত্র কুরু ধর্ম্মাত্মা তপস্বী। তাঁহারই নামে রাজ্যের নাম কুরুজাঙ্গল হয়। তাঁহার তপস্যার ক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্ররূপে অভিহিত। কি দৈব বিড়ম্বনা! ভবিষ্যতে সেই ধর্ম্মক্ষেত্রই, সেই শান্তিনিকেতনই, ভারতের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। হস্তিনাপুরের সিংহাসন জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের বীর ঐ ক্ষেত্র-শোণিতে প্লাবিত করেন। ঐ ক্ষেত্রেই ভারতের ক্ষত্রিয়বীর্য্য নির্ব্বাপিত হয়। পরে আবার ঐ ক্ষেত্রেই পৃথ্বিরাজের সময়ে কাল-চক্রে হিন্দুর গৌরবরবি ডুবিয়াছে। ঐ ক্ষেত্রেই পাঠান, মোগল ও মহারাষ্ট্রের গৌরবও অস্তমিত। যাহাই হউক কুরু দাশার্হনন্দিনী শুভাঙ্গীকে বিবাহ করেন ও বিদূরথ নামে পুত্র পান। পুরাণের মতে তাঁহার সধন্বা, সুধন্বা, জহ্নু ও পরীক্ষিৎ নামে তিনটী পুত্র হয় এবং বিদূরথ জহ্নুর পৌত্র। বিদূরথ যদুবংশীয়া সুপ্রিয়া নাম্নী পত্নীতে অনশ্বের জন্ম দেন। অনশ্বের ঔরসে মগধবংশীয়া অমৃতের গর্ভে-জাত পরীক্ষিৎ বাহুদাবংশের সুযশাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সুত ভীমসেন কেকয়বংশীয়া কুমারীর গর্ভে প্রতিশ্রবানামক পুত্র উৎপাদন করেন। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ গিরিনন্দিনী সুনন্দার গর্ভে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

বঙ্গদর্শন

ভিক্টর হুগোর কথা

(১)

ফরাসী পরিষদের সহিত ভিক্টর হুগোর প্রথম পরিচয়, অর্থাৎ যশস্বী হইবার সূচনা, বড়ই কৌতুকাবহ ও চিত্তাকর্ষক। ১৮১৭ সালের পরিষদের পুরস্কার-কাব্যের বিষয় ছিল—"জীবনের সর্ব্বাবস্থায় অধ্যয়নলভ্য সুখ।" ভিক্টরের বয়স তখন সবে পনর বৎসর ও তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু প্রতিভা চিরকালই আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন ও আত্ম-নির্ভর-শীল। ভিক্টর মনে করিলেন, এই প্রতি-যোগিতায় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না? যেমন সঙ্কল্প, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কার্য্যে পরিণতি। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে তিন শত বিংশতি ছত্র সমন্বিত খণ্ড-কাব্য লিখিয়া প্রস্তুত করিলেন।

প্রতিযোগিতার জন্য কাব্য ত লেখা হইল, কিন্তু এক মহা সঙ্কট উপস্থিত। রচনাটি পরিষদের সম্পাদকের হস্তে দিবার উপায় কি? ভিক্টর তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও বলেন নাই—তাঁহার মাতাকেও না, তাঁহার অগ্রজ ইউজিন্‌কেও না। লর্ড বাইরন লিখিয়া-ছেন—"একদিন্ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ দেখিলাম, আমি যশস্বী হইয়া উঠিয়াছি।" ভিক্টর হুগো বোধ হয় কতকটা এইরূপ অতর্কিত ভাবে সহসা যশস্বী হইবার মানস করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ ছিল যে, যদি সফলোদ্যম হই, তাহা হইলে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে যশস্বী হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিব; আর, যাহা অধিকতর সম্ভব, যদি বিফলমনোরথ হই, তাহা হইলেও এই প্রতিযোগিতার কথা কেহই জানিবে না বলিয়া কাহারও কাছে মাথা হেঁট হইবে না।

যাহা হউক, ভিক্টর ভাবিয়া চিন্তিয়া কূল-কিনারা দেখিতে পাইলেন না। ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রেরা রবিবারে বাহিরে যাইতে পারিত বটে, কিন্তু পরিষদের সম্পাদকের অফিস্ সে দিন বন্ধ। তদ্ব্যতীত, কবিতা-রচনা সমাপ্ত হইল এক সোমবারে; তাহার পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার রচনা গ্রহণের শেষ দিন। অগত্যা তিনি তাঁহার বন্ধু বিস্কারাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বিস্কারা প্রথমতঃ যেন আকাশ হইতে পড়িল—পনর বৎসরের বালক ফরাসী-পরিষদের পুরস্কার-রচনায় প্রতিযোগিতা করিতে সাহস করে! কি অভাবনীয় কথা! এমন অসম্ভবও কি সম্ভব! তার পর তাহার অতিপ্রিয় নবীন বন্ধুর অভাবনীয় ও দুঃসাহসিক উদ্যমে সে মুগ্ধ ও আনন্দে অধীর

হইল; বলিল—"ইহারই জন্য তোমার এত ভাবনা? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সব আমি করিয়া দিব।" ভিক্টর আশ্বস্ত হইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেই বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ রচনা-গ্রহণের শেষ দিন, ছাত্রদিগের বহির্গমণের দিন। অধিনায়করূপে বিস্কারা ছাত্রদিগকে লইয়া বহির্গত হইলেন ও পরিষৎ-মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরিষৎ-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিস্কারা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন—যেন দ্বারস্থ সিংহের মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছেন। ফোয়ারা হইতে জল-ধারা অতি সুন্দর ভাবে উৎসারিত হইতেছিল; ছাত্রগণ মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। এই অবসরে বিস্কারা ভিক্টরকে লইয়া ত্বরিত পদে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষকের ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের কক্ষ কোন্ খানে? তার পর ছুটিয়া উপরে উঠিলেন। ভিক্টর তখন ভাবিলেন, বিস্কারাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিয়া বড়ই ভাল কার্য্য হইয়াছে; তিনি নিজে ত এমন দুঃসাহসের কার্য্য কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

বিস্কারা সম্পাদকের ঘরের দরজা ঠেলিয়া প্রথমে প্রবেশ করিলেন; স্পন্দিত হৃদয়ে ভিক্টর তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজ; তাহার সম্মুখে বসিয়া পলিতকেশ, অতি-গম্ভীর ও ভীষণ-মূর্ত্তি এক বৃদ্ধ। কম্পিত হস্তে ভিক্টর তাঁহার কাব্য ও শীলমোহর-আঁটা চিঠিখানি তাঁহার হাতে কোন প্রকারে দিলেন, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিস্কারা কতকটা আত্মস্থ ছিলেন; তিনি জড়িতকণ্ঠে আবশ্যকীয় দুই একটা কথা কোন রকমে বলিয়া উভয়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে আসিয়া উভয়েই যেন একটা অসাধ্য সাধন করিয়াছেন মনে করিয়া সানন্দগর্ব্বের প্রফুল্লতা অনুভব করিলেন। উভয়েই মনে করিলেন, যদি দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝি পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উদিত করাও যাইতে পারে।

গুরু শিষ্য উভয়ে তাঁহাদের সার্থক দুঃসাহসিকতার জন্য পরস্পরকে অভিনন্দিত করিতে করিতে যেমন সিঁড়ি হইতে নামিয়াছেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে ভিক্টরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবেল্। আবেল বলিলেন—"দাঁড়াও! তোমরা এখানে কি জন্য?"

ভিক্টরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বিস্কারাও হাতে নাতে ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া কিছুই গোপন করিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা সমস্তই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ভিক্টর আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, এই ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহসিক অপকর্ম্মের জন্য নিশ্চয়ই ভর্ৎসিত হইতে হইবে। কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ আবেল, পনর বৎসরের বালক নহেন, ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রও নহেন; পরিষদের নামে তাঁহার হৃদ্‌-কম্প হইবার নহে। পরিষদের পুরস্কার-রচনায় ভিক্টর যে প্রতিযোগিতা করিয়াছে, ইহাতে তিনি দোষাবহ বা অন্যায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না—ইহা তাঁহার কাছে খুবই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তথাপি ভিক্টর তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, ব্যাপারটা যেন প্রকাশ করা না হয়। আবেল

বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এ কথা আমি ছাদের উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিব।"

কিরূপ সশঙ্ক উদ্বেগে বিস্কারা ও ভিক্টর পরিষদের অভিমত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তখনকার ফরাসী-পরিষদ্ কবি-যশঃ-প্রার্থীদিগের ভাগ্য-বিধাতা। তাঁহাদের প্রদত্ত প্রশংসা বা নিন্দা বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত ও সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ভিক্টরের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য যতই কেন উদ্বেগ থাকুক না, ভিক্টর তাঁহার খেলা-ধূলা ভুলেন নাই। এক দিন তিনি খেলায় উন্মত্ত, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবেল দুই জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। তাঁহাদের গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভিক্টরের মনে কেমন একটা অস্পষ্ট সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। আবেল ডাকিয়া বলিলেন—"এদিকে এস ত, নির্ব্বোধ!" ভিক্টর ভয়ে ভয়ে, যেন কতকটা অভিভূত ভাবে অগ্রসর হইলেন। আবেল বলিলেন—"তুমি একটি অদ্ভুত জীব! তোমার পুরস্কার-রচনায় ওরূপ পাগলামি লিখিতে গিয়াছিলে কেন? তোমার বয়স কত, তাহা কে জানিতে চাহিয়াছিল? তাহার জন্য কাহার মাথা ব্যথা পড়িয়া গিয়াছিল? পরিষদ্ মনে করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছ। তুমি যদি তোমার বয়সের উল্লেখ না করিতে, তাহা হইলে পুরস্কার ত তোমারই প্রাপ্য হইয়াছিল। তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ! যাহা হউক, তোমার কাব্যের সসম্মান উল্লেখ হইয়াছে।"

এইরূপে ভিক্টর হুগো তাঁহার কাব্যোদ্যমের সফলতার সংবাদ প্রথম অবগত হইলেন। আবেলের কথা গুলি তীব্র হইলেও তাঁহার চোখ মুখ হর্ষোৎফুল্ল দেখিয়া ভিক্টর আশ্বস্ত হইলেন। তবে তাঁহার নিজের অবিবেচনাতেই যে পরিষদের পুরস্কারলাভে বঞ্চিত হইলেন, এজন্য কিছু ক্ষুব্ধ অবশ্যই হইয়াছিলেন।

ব্যাপারটা এই—ভিক্টর হুগো তাঁহার পুরস্কার-কাব্যে লিখিয়াছিলেন—"আমার বয়স সবে পনর বৎসর মাত্র।" * তাঁহার কাব্য যখন সর্ব্ব সমক্ষে পরিষদের সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হয়, তখন 'ডিডোর' প্রণয়-ব্যাপারের বর্ণনা শুনিয়া সকলেই, বিশেষতঃ মহিলামণ্ডলী, ধন্য ধন্য করিয়াছিল। পরিষদের মন্তব্যে লিখিত হইয়াছিল—"রচয়িতা তাঁহার কাব্যে নিজের বয়ঃক্রম পনর বৎসর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যদি সত্যই তাঁহার বয়স এত অল্পই হয়" ইত্যাদি। পরিষদ্ তাঁহার বয়সে সন্দিহান হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অসাধারণ কবিপ্রতিভার গৌরব কীর্ত্তনই করিলেন বটে, কিন্তু পুরস্কার তিনি পাইলেন না।

না পান, কিন্তু প্যারিসের সংবাদপত্র-মহলে তাঁহার জয় জয়কার পড়িয়া গেল। সে সময়ে ফরাসীপরিষদ্ কর্ত্তৃক কোন রচনার সসম্মান উল্লেখ একটা অসামান্য ও স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত—পনর বৎসরের বালকের রচনার পক্ষে তাহা অচিন্তনীয় ঘটনা।

---

* "De trois lustres a peine ai vu finir le cours."

নিজের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে পরিষদের সদস্যগণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, তজ্জন্য ভিক্টর স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরিষদ্ কর্ত্তৃক তাঁহার রচনার সসম্মান উল্লেখ জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক এক পত্র ও তৎসহ তাঁহার জন্মের সন তারিখের নিদর্শনপত্র পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রোত্তরে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পত্র খানি ভিক্টর তাঁহাদের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্‌ডিয়র সাহেবকে দেখাইলেন। তিনি ভিক্টরকে নিজেরই ইচ্ছানুসারে যে কোন দিন যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে ভিক্টর সম্পাদকের সহিত দেখা করিবার জন্য একদিন পরিষদ্‌মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ভিক্টরকে পঞ্চদশ বর্ষের বালক বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই;

তিনি তাহার বালকত্বে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস করিলেন, অর্থাৎ ভিক্টরকে একবার বসিতেও বলিলেন না। তারপর অতি হিতৈষী মুরুব্বির মতন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, পরিষদ্ তাঁহার বয়সের বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অনুকূল মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন যে, এত অল্প বয়সে পরিষদের পুরস্কার না পাওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল হইয়াছে এবং এত অল্প বয়সে পরিষদের পুরস্কার পাইলে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও ভ্রম-বিমুখতার সম্ভাবনা ছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ব্যাপারে ভিক্টরের পক্ষে দুইটি সুফল ফলিল। প্রথম, তাঁহার অধ্যাপক ডেকোটি, যিনি কবিতারচনা বিষয়ে ভিক্টরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার দুরাশা এতদিন করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি নিরস্ত হইলেন। ফরাসী-পরিষদের সদস্যেরা যাহার কবিতার সসম্মান উল্লেখ করেন, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া যে বাতুলতা মাত্র, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। ঈর্ষ্যানল নির্ব্বাপিত হউক বা না হউক, তাহার বিস্তার রুদ্ধ হইয়া গেল। আর একটা সুবিধা এই হইল যে, ভিক্টরের পক্ষে ছাত্রাবাস হইতে বাহিরে গমনাগমন বিষয়ে আর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ রহিল না—সেটা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইল। যে বিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষৎ কর্ত্তৃক সম্মানিত, সে বিদ্যালয়ের যে কত গৌরব তাহা অধ্যক্ষ কর্‌ডিয়র সাহেব সগর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। আর যে ছাত্রের ফরাসীপরিষদের সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার চলে, তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা ত দুঃসাহসিকতা। অতএব ছাত্রাবাসে থাকিয়াও ভিক্টর এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেন।

পরিষৎসম্পর্কিত এই ব্যাপারের আরও একটু কৌতূহলজনক অনুবৃত্তি আছে। ফরাসীপরিষদের একজন প্রাচীন ও সম্মানিত সদস্য ও ধর্ম্মোপদেষ্টা নুফ্‌সতো নিজেও তের বৎসর বয়সে কোন প্রাদেশিক পরিষদ্ হইতে পুরস্কারলাভ করিয়াছিলেন, ও তখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্রাট্ ভল্‌টেয়ার স্বয়ং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই পত্রে ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন—"আমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এমন একজনের প্রয়োজন আছে; তুমি আমার স্থান অধিকার

করিতে পারিবে মনে করিয়া আমি প্রীতিলাভ করিতেছি।"* আজি আবার সেই গৌরব-মণ্ডিত অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই তের বৎসরের বালকের কথা ও এই পনর বৎসরের বালকের কথা তুলনা করিয়া বিদ্বৎ-সমাজে জল্পনা হইতে লাগিল যে, কালে ভিক্টর আর একজন নুফ্-সতো হইয়া উঠিবে।

শুদ্ধ ইহাই নহে। ভল্‌টেয়ার তাঁহাকে তাঁহার বাল্যরচনার জন্য যেরূপ অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, আজ নুফ্-সতোও একজন উদীয়মান নবীন কবিকে সেইরূপে অভি-নন্দিত করিবার অবসর পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইহা অবগত হইয়া ভিক্টর এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইহার পর উভয়ের মধ্যে অভিনন্দন-কবিতার বিনিময় হইল। ভিক্টর তাঁহার অভিনন্দন-কবিতায় অনেক মহিমাকীর্ত্তনের পর শেষে লিখিয়াছেন—"হে নুফ্-সতো, তুমি একদিন ভল্‌টেয়ারের আশাস্থল হইয়াছিলে; এখন তুমি তাঁহারই অসীম গৌরবের উত্তরাধিকারী। আজ তুমি দয়া করিয়া আমার নবীন বয়সের আশ্রয় ও অবলম্বন হও।" প্রত্যুত্তরে অনেক প্রশংসাবাদের পর নুফ্-সতো লিখিয়াছিলেন —"আমি বৃদ্ধ; প্রশংসাবাদের দ্বারা প্রশংসা-বাদের ঋণ পরিশোধ করিব না। প্রতিদানে আমার সাধ্যানুসারে সদুপদেশ দ্বারা তোমাকে সম্বর্দ্ধিত করিব।"

ইহার অনতিবিলম্বে নুফ্-সতো এক দিন ভিক্টরকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে ডেকোটির বিদ্যালয়ের গৌরবের সীমা রহিল না। পরিষদের এই বৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত সদস্য তৎকালে Lesage এর "Gil Blas" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের একটি সংস্করণের সম্পাদনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। একটা কথা লইয়া এই সময়ে তিনি কিছু ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। একজন জেসুইট তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, লেসেজের ঐ উপন্যাসখানি আদৌ মৌলিক রচনা নহে; উহা একখানি স্প্যানিশ্ ভাষায় লিখিত উপন্যাসের অনুকরণ মাত্র। কথাটার সত্যা-সত্য নির্ণয় না করিলেই নয়; অথচ তিনি নিজে স্প্যানিশ্ ভাষাও জানিতেন না, সেই পুস্তকের ফরাসী অনুবাদও ছিল না। সুতরাং নুফ্-সতো কিছু বিপন্ন, একটু দিশাহারা, হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ভিক্টর বলিলেন—"আমি স্প্যানিশ্ ভাষা জানি।" নুফ্-সতো হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"বটে! তুমি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুস্তক খানি পড়িয়া, জেসুইটের কথাটা সত্য কি না আমাকে বলিতে পার, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার করা হয়।"

যে ব্যক্তি ভলটেয়ারের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যথাযথরূপে রক্ষা করিতে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। পরদিনই তিনি স্প্যানিশ্ উপন্যাসখানি সংগ্রহ করিলেন। অতি মনো-যোগের সহিত তাহা পাঠ করিয়া উভয় গ্রন্থের একটি বিস্তৃত তুলনা ও সমালোচনা লিখিলেন। তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোনই

* "Il faut bien que l' on me succede,
Et jeaime en vous mon heritier."

সাদৃশ্য নাই—লেসেজের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক। বৃদ্ধ অতিরথ বালক ভিক্টরের এই সমালোচনার উৎকর্ষে এতটাই বিমুগ্ধ হইলেন যে, ইহার একটি শব্দও পরিবর্ত্তিত না করিয়া সমগ্র নিবন্ধটি তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলেন ও তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। পনর বৎসরের বালকের পক্ষে কি অচিন্তনীয় গৌরব! প্রতিভা কোন কালেই অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে না।

ভিক্টরের ছাত্রাবস্থার আর একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা এই স্থলে উল্লেখ করিতে হইতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ আবেলের কয়েকটি বন্ধু সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন ইউজিন্ ও ভিক্টরের সহিত ইহাঁদের পরিচয় হইলে সকলেই অল্পাধিক সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-সেবী বলিয়া পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা সত্বরই বিলক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অনতিবিলম্বে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ক্ষুদ্র একটি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি মাসের প্রথম দিনে এই সভার একটি করিয়া অধিবেশন হইত; যৎকিঞ্চিৎ আহারের ব্যবস্থাও থাকিত। আহারান্তে প্রত্যেকেই এক মাসের সাহিত্যচেষ্টার কিছু কিছু নমুনা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতেন। একদিন তাঁহাদের মধ্যে এক জন সহসা বলিয়া উঠিলেন—"আমার মনে একটা মৎলবের উদয় হইয়াছে।"

"কি?"

"আমরা সকলে মিলিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিলে কেমন হয়?"

"তোমার মৎলবটা খুলিয়া বল।"

"মনে কর যেন কতকগুলি সেনানী কোন যুদ্ধের প্রাক্কালে একত্র মিলিত হইয়া নিজ নিজ জীবনকাহিনী বিবৃত করিতেছে। সকলেই মরিবার ও মারিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত; ইহাতেই উপন্যাসগুলির মধ্যে একটা একতা থাকিবে। আর প্রত্যেকের রুচির পার্থক্য ও শক্তির তারতম্য হেতু উপন্যাস-গুলির বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে গ্রন্থকার বলিয়া কাহারও নাম থাকিবে না। নানাবিধ রুচি ও শক্তির একত্র সমাবেশ দেখিয়া পাঠক সাধারণ অবশ্যই মুগ্ধ হইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"বাহবা! অতি উত্তম কল্পনা।" প্রস্তাবটা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। প্রত্যেক গল্পের আয়তনও স্থিরীকৃত হইল; কেননা গ্রন্থ বৃহদায়তন হইলে মূল্যও অধিক করিতে হইবে; কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসিদ্ধ নহে। সভা ভঙ্গ কালে সকলকে সম্বোধন করিয়া আবেল বলিলেন— ত স্থির হইল; এখন যাহাতে আমরা অনলস হইয়া কার্য্যে নিবিষ্ট হই, তজ্জন্য উপন্যাস লিখিয়া সম্পূর্ণ করিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আসুন, উপন্যাস লিখিতে কতটা সময় দেওয়া যাইবে তাহা স্থির করা যাউক।"

ভিক্টর বলিলেন—"এক পক্ষ।"

আর সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ী করিতে লাগিল। এক পক্ষের ভিতর একখানি উপন্যাস লিখিয়া শেষ করা—ভিক্টর কি রঙ্গ করিতেছে, না, পাগল হইয়াছে? ভিক্টর তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আমি এক পক্ষের মধ্যেই আমার উপন্যাস লিখিয়া শেষ করিব।"

কেহ কেহ বলিল—"অসম্ভব!"

ভিক্টর বলিলেন—"যে বাজি রাখিতে ইচ্ছা কর তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

"বাজি, সকলকে একদিন খাওয়ান।"

ভিক্টর বলিলেন—"তাই স্বীকার"

পনর দিনের দিন প্রাতে ভিক্টর সকলকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার উপন্যাস সমাপ্ত হইয়াছে। উপন্যাসের আয়তন লইয়া পাছে কেহ ছল ধরে, সেই জন্য তিনি তাঁহার উপন্যাসকে একখানি গ্রন্থেরই আয়তন প্রদান করিয়াছেন। সেইদিনই রাত্রি আটটার সময় যদি তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে সমবেত হইতে পারেন, তাহা হইলে ভিক্টর তাঁহার উপন্যাস সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিবেন।

সকলেই অতিমাত্র কৌতূহলপরবশ হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্টর তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন তাঁহার সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজন সমাদৃত উপন্যাস "Bug Jargal"।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে, বাজি তাঁহারা হারিয়াছেন ও ভোজের উদ্যোগ করিতে তাঁহারা প্রত্যেকেই বাধ্য প্রথম দিন ভোজ দিলেন ভিক্টরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবেল। বাজির ইহাই শেষ ভোজ হইল, কেননা আর সকলের অর্থাভাব। ভিক্টরের এই উপন্যাস খানি ছাড়া আর কোন উপন্যাস লিখিতেও হইল না, কেননা আর সকলের সময়াভাব। সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সঙ্কলিত উপন্যাসসংগ্রহ গ্রন্থ আর লোকলোচনের গোচরীভূত হইল না বটে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্য একখানি উপাদেয় উপন্যাসে সমলঙ্কৃত হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

অনুপ্রাসের অধিকারবিচার

(২)

এ পর্য্যন্ত ধ্বন্যাত্মক ও বীপ্সাত্মক শব্দের বিচার করা গেল। এ গুলির হয় দুই অংশেরই অর্থ নাই অথবা এক অংশ অপর অংশের (পরিবর্ত্তিত) পুনরাবৃত্তি। এক্ষণে এমন কতকগুলি যোড়া-শব্দের দৃষ্টান্ত দিব, যে গুলির প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র সত্তা ও অর্থ আছে। অথচ অনুপ্রাসের অনুরোধেই সে গুলির উদ্ভব, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এ গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। (১) সমার্থ (২) সমপর্য্যায় (৩) বিপরীতার্থক বা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। কতকগুলি উদাহরণ রবীন্দ্রবাবুর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তমভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় (১৩০৭) আমিও বহুসংখ্যক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এবারকার ফর্দ্দ তদপেক্ষাও পূর্ণাঙ্গ।

শ্রেণীবিভাগে হয় তো অনেক ত্রুটি আছে। অনেকগুলি শব্দযুগ্ম সমার্থ শ্রেণীতে ধরিব বা সমপর্য্যায় শ্রেণীতে ধরিব, সে একটা সমস্যা—কেননা শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থের প্রভেদ অতি সামান্য। সমপর্য্যায় শ্রেণী ও বিপরীতার্থক বা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধবাচকশ্রেণী লইয়াও

গোল আছে। এক হিসাবে ধরিলে 'সাধনা ও সিদ্ধি' সমপর্য্যায়, আবার আর এক হিসাবে ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ। এক হিসাবে ধরিলে 'ইতস্ততঃ' বা 'কুলীন ও কাপ' সমপর্য্যায়, আবার অন্য হিসাবে বিপরীতার্থবোধক। এ সব ত্রুটি সর্ব্বত্র সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শব্দযুগ্মগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে অনেক রহস্য ধরা পড়ে। উপসর্গ-পরিবর্ত্তন বা প্রত্যয়পরিবর্ত্তন বা নঞ্‌যোগে অনেক অনুপ্রাসাত্মক শব্দযুগ্মক নির্ম্মিত হয়—যথা আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন, অনুচর-সহচর, আপদ্‌-বিপদ্‌ ক্রিয়াকর্ম্ম, ওতপ্রোত। এই প্রকারের উদাহরণ নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসম্ভব। কতকগুলি শব্দযুগ্মে দুইটিই সাধুভাষার শব্দ, যথা—আমোদ-আহ্লাদ, জন-মানব, ক্রিয়াকাণ্ড; কতকগুলিতে একটি সাধুভাষার শব্দ ও অপরটি সংস্কৃত শব্দের (হয় তো সেই শব্দটিরই) অপভ্রংশ, যথা ছন্ন-ছাড়া, বালবাচ্ছা, অতিথ-অভ্যাগত, কিছু কিঞ্চিৎ; কতকগুলিতে দুইটিই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, যথা ঝড়ঝাপটা, মাথামুণ্ড, আকুলি বিকুলি, গা গতর; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব্দ অপরটি মুসলমানী শব্দ, যথা কাজিয়া কলহ, তত্ত্ব তল্লাস; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ অপরটি মুসলমানী শব্দ, যথা ধর পাকড়; আবার কতকগুলিতে দুইটিই মুসলমানী (বা দেশজ ?) শব্দ, যথা জমিজায়গা, জোতজমা, মামলামোকদ্দমা।

(১) সমার্থ শব্দযুগ্ম

অনুপ্রাসের অনুরোধ এত অধিক যে সমার্থ শব্দযুগ্ম ব্যবহার করিয়া পুনরুক্তি-দোষ (tautology) অগ্রাহ্য করা হয়।

অ—অতিথ-অভ্যাগত, অনুচর-সহচর, অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ, অসুখ-বিসুখ, অলঙ্কার-প্রতিকার (?)।

আ—আকুলি বিকুলি, আদর আপ্যায়িত, আদর আবদার, আদর আহ্বান, আপদ্‌ বিপদ্‌, আমোদ আহ্লাদ, আমোদ প্রমোদ, আবেদন নিবেদন, আলাপ পরিচয় (মধ্যে প), আশা ভরসা।

ই—ইশারা ইঙ্গিত।

উ—উদ্যম উৎসাহ।

এ—এলোমেলো (এলান মেলান)।

ক—কটুকাটব্য (?), কথাবার্ত্তা, কথোপকথন, করা কর্ম্মা, কাকুতি মিনতি, কাজিয়া কলহ, কাণ্ডকারখানা, কাযকর্ম্ম, কালো কিষ্টি (কৃষ্ণ), কায়দাকানুন, কিছু কিঞ্চিৎ, কুড়ী কুষ্ঠী (কুষ্ঠ), কূট কচালে, কূল কিনারা, কৃষ্ণবিষ্ণু, কেউকেটা, কেঁদে ককিয়ে, ক্রিয়াকর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড।

খ—খবর বার্ত্তা, খাতির নাদারত, খানাখন্দ, খালবিল, খেলাধূলা, (রবীন্দ্র বাবুর মতে ধূলা ধুলি নহে, দেয়ালা) খোজখবর, খোলা খাবরা।

গ—গয়না গাঁটি (?), গল্প গুজব (?), গা গতর (দুইই 'গাত্র'শব্দের অপভ্রংশ), গুণ জ্ঞান (?), গোঁড়িগুগলি, গোঁড়ে গর্ত্ত।

ঘ—ঘরণী গৃহিণী, ঘর গৃহস্থালী (?), ঘরবাড়ী।

চ—চড়চাপড়, চাঁচাছোলা, চালচলন, চালাকচতুর, চিঠিচপাটি, চোরছেঁচর।

ছ—ছন্নছাড়া (দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপ-

ভ্রংশ) ছলছুতা, ছালচামড়া, ছেলে ছোকরা।

জ—জন্তু জানোয়ার, জমি জায়গা, জমি জিরেৎ, জাঁকজমক, জীবজন্তু, জোতজমা, জ্ঞাতগুষ্টি (জ্ঞাতিগোষ্ঠী), জ্ঞাতগোত্তর (জ্ঞাতিগোত্র), জ্ঞান গোচর (?), জ্বালা যন্ত্রণা।

ঝ—ঝড়ঝাপটা (দুইই ঝঞ্ঝার অপভ্রংশ?)

ড—ডলামলা, ডেঙ্গাডহর

ত—তত্ত্বতল্লাস, তর্কবিতর্ক, তর্জ্জন গর্জ্জন, তাড়া হুড়া।

দ—দরদাম, দাবীদাওয়া, দীনদরিদ্র, দীনদুঃখী, দীনহীন, দেখাসাক্ষাৎ (খ ক্ষ)।

ধ—ধরপাকড়, ধনদৌলত (লাট)।

ন—নাড়ীভুঁড়ি, ন্যাকাবোকা, নষ্টদুষ্ট, ন্যাড়ামুড়ো।

প—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পাকাপোক্ত, পাকেপ্রকারে, পাখীপাখালী।

ফ—ফেরফাঁফর, ফৌতফেরার।

ভ—ভরপূর, ভয়ভীত, ভাইভায়াদ, ভুল ভ্রান্তি, ভূতপ্রেত, ভ্রমপ্রমাদ।

ম—মাঝে মিশেলে, মাথামুণ্ডু, মান অভিমান, মানমর্য্যাদা, মানসম্ভ্রম, মামলা মোকদ্দমা, মায়ামমতা, মিলে মিশে, মৃদুমন্দ।

য—যাগ যজ্ঞ।

র—রঙ্গ ভঙ্গ (ভঙ্গ 'ব্যঙ্গ'র অপভ্রংশ?)

ল—লম্ফ ঝম্প, লাঠি ঠেঙ্গা, লালন পালন, লীলা খেলা।

ব—বন বাদাড়, বন্ধু বান্ধব, বর্ষা বাদলা, বল বিক্রম, বল বীর্য্য, বসবাস, বাকী বকেয়া, বাজনা বাদ্যি, বাদ বিচার, বাদ বিসংবাদ, বাধা বিঘ্ন, বাঁধা ছাঁদা, বাল বাচ্ছা, বিচার বিতর্ক, বিজ্ঞ বিচক্ষণ, বিদেশ বিভূম, বিপদ্ আপদ্, বিবাদ বিসংবাদ, বিষয় সম্পত্তি, বুঝ সমজ, বৃষ্টি বাদলা, বেঁচে বর্ত্তে, বেঁটে বক্সুর, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণবটু।

শ—শক্ত সমর্থ, শক্তিশেল, শক্তি সামর্থ্য, শাক সবজী, শালা সম্বন্ধী, শিক্ষা সহবৎ, শূর বীর, শৌর্য্য বীর্য্য, শ্রান্ত ক্লান্ত।

ষ—ষণ্ডা গুণ্ডা, ষাঁড়া গাঁড়া।

স—সচরাচর (?), সতী সাধ্বী, সদাসর্ব্বদা, সন্ধান সুলুক, সভা সমিতি, সভ্য ভব্য, সম্মান সম্ভ্রম, সর্ব্বসাকল্য (?), সলা পরামর্শ, সাড়াশব্দ, সাধ আহ্লাদ, সাজ সজ্জা, সাজ সরঞ্জাম, সাক্ষী সাবুদ, সুখ শান্তি, সুখ সম্পদ, সুখ-সৌভাগ্য, সুখ স্বস্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সুখে স্বচ্ছন্দে, সেবা শুশ্রূষা, সেবাসুস্থ, (সুস্থতা বা শুশ্রূষার অপভ্রংশ). সৈ স্যাঙ্গাতি, স্তব স্তুতি, স্তব স্তোত্র, স্বত্ব স্বামিত্ব।

হ—হাঁক ডাক, হাঙ্গামা হুজ্জুৎ, হাব ভাব।

(২) সমপর্য্যায় শব্দযুগ্ম

সম-পর্য্যায় বুঝাইতে অনুপ্রাসের শরণ গ্রহণ না করিলে রস জমাট বাধে না।

অ—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, অজর অমর, অধ্যয়ন অধ্যাপন, অন্নব্যঞ্জন, অনুকরণ ও অনুসরণ, অন্ত (অন্ত্র?) দন্ত, অভাব অভিযোগ, অযুত নিযুত, অবহেলা অপমান, অশন বসন, অস্ত্র শস্ত্র, অষ্টেপৃষ্ঠে (ওষ্ঠেপৃষ্ঠে?)।

আ—আইন আদালত, আইন কানুন, আকার প্রকার, আকাশে বাতাসে, আকৃতি প্রকৃতি, আগে ভাগে, আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা, আচার বিচার, আচার ব্যবহার, আঁচড়

কামড়, আঁচান ছোঁচান, আত্রেয়ী মৈত্রেয়ী, আদর আহ্বান, আধি ব্যাধি, আনা নেওয়া, আপিস আদালত, আম জাম, আমীর ওমরা, আয় পয়, আবর্ত্তন বিবর্ত্তন, আলা ভোলা, আসন বাসন, আসাসোটা, আহার বিহার, আহার ব্যবহার।

ই—ইট পাটকেল, ইন্দ্র চন্দ্র, ইরাণ তুরাণ।

উ—উঁকিঝুঁকি (ঝুঁকিয়া পড়া), উচ্চবাচ্য (?), উড়ে পুড়ে, উৎসাহ উত্তেজনা, উনিশ বিশ, উপত্যকা অধিত্যকা, উল্লা মুল্লা, উল্লুক ভল্লুক, উদূখল মুষল, (রঙ্গপুরে উড়ুন-গান), উড়ু উড়ু, ছাড় ছাড়।

ঋ—ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি (কন্দদ্বয়), ঋদ্ধি সিদ্ধি।

এ—একতালা দোতালা, একলা দোকলা, একমনে একধ্যানে, এখন তখন অবস্থা, এলাচ লঙ্গ।

ও—ওতপ্রোত।

ঔ—ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য।

ক—কচু ঘেঁচু, কদু কুমড়ো, কণাদ কপিল, কফ কাসী, কড়া ক্রান্তি, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া, কল কবজা, কল কাঠী, কল কারখানা, কল কৌশল, কলাকৌশল, কলা মূলা, কর্পূর পূগ, কাকুতি মিনতি, কাকে কোকিলে, কাকে বকে, কাগজে কলমে, কাছা কোঁচা, কাঠ কয়লা, কাঠখড় (লাট), কাণা কুঁজো, কাণা খোঁড়া (লাট), কানাই বলাই, কাপড় চাদর, কামক্রোধ, কামরূপ কামাখ্যা, কামার কুমার, কালিয়া কাবাব, কোপ্তা কোর্ম্মা, কালিয়া পোলোয়া, কালী কলম কাগজ, কালী কলম মন, কালীঝুলি (ঝুল), কাষ্ঠ লোষ্ট্র, কাশ কুশ, কাশী কাঞ্চী, কুঙ্কুম কস্তুরী, কুচ কাওয়াজ, কুঁচকি কণ্ঠা, কুল বেল, কুল শীল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে, কেন কণ্ঠ, কেনা কাটা, কেয়ূর কুণ্ডল, কোদালে কুড়ুলে (মেঘ), কোশাকুশী (কোশী), ক্ষীর চিড়ে, ক্ষীর সর।

খ—খড় দড়ি, খন্তা কোদাল (লাট), খাই আর শুই, খাজা গজা জেলাপি, খাতা পত্র, খাতির নাদারত, খাড়া বড়ি থোড়, খানা পিনা, খাল বিল, খুন খারাপি, খুন জখম, খেতাব খেলাত, খেলাধূলা (দেয়ালা ?), খৈ দৈ, খোরাক পোষাক, খোল করতাল (লাট)।

গ—গড়ন পিঠন, গণ পণ, গণা গাঁথা, গণ্য মান্য, গণ্ডে পিণ্ডে, গরু গাধা, গয়া গঙ্গা গদাধর, গাঁইগোত্র, গাওনা বাজনা, গাছ গাছড়া, গাঁজা গুলি, গাড়ু গামছা, গাল গলা, গুড় চিড়ে, গুড় মুড়ি, গুয়ে গোবরে, গুরু গম্ভীর, গুরু পুরুত, গুলি গোলা, গো গর্দ্দভ, গো গবয়, গোঁসাই গোবিন্দ, গ্রহ উপগ্রহ, গ্রাহক অনুগ্রাহক, গ্রীষ্ম বর্ষা।

ঘ—ঘট পট, ঘটী বাটী, ঘর দোর, ঘর বর, ঘাট মাঠ হাট বাট, ঘাড়ে গর্দ্দানে (লাট), ঘোর ফের, ঘোরা ফেরা।

চ—চর্ব্ব্য চুষ্য, চাঁচা ছোলা (লাট), চাকুরী ও কুকুরী, চাঁচী পুঁচী, চাঁপা চন্দন, চা'ল চিঁড়ে, চা'ল কলা, চা'ল ডাল, চা'ল চুলো, চা'ল জল, চাষ বাস, চিঠি চপাটি, চিড়ে মুড়কি, চুরি চামারি, চুয়া চন্দন, চেযে চিন্তে, চেঁচে পুঁচে, চেষ্টা চরিত্তির (চরিত্র ?), চৈতন চুটকি, চোখ মুখ, চোখোলো মুখোলো, চোর ছেঁচড়।

ছ—ছকড়া নকড়া, ছয় নয়, ছলে বলে কৌশলে, ছাঁট কাট, ছাতা ছড়ি, ছাঁদনদড়ী গোদানড়ী, ছিটা ফোঁটা, ছিদ্ধি ভিদ্ধি, ছিন্ন

ভিন্ন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ছিরি (শ্রী) ছাঁদ, ছেঁড়া খোঁড়া (খণ্ডিত), ছেঁড়া ছুটো (?), ছোট খাট, ছোলা কলা।

জ—জগাই মাধাই, জটা জূট, জটিলা কুটিলা, জপ তপ, জমি জমা, জল কয়লা, জল্পনা কল্পনা, জলে জঙ্গলে, জাগ্রৎ জীবন্ত, জাত-জন্ম (জাতি), জাতী যূথী, জান ও মান, জানাশুনা, জামু ভানু কৃশানু, জামাই বেহাই, জামা জোব্বা, জামাযোড়া, জীর্ণ শীর্ণ, জীবন যৌবন, জুতা ও গুতা, জুতা ছাতা, জুতা জামা, জুতা মোজা, জেলে মালা (মালো), জৈত্রী জায়ফল, জ্বর জ্বালা, জ্বরবিকার।

ঝ—ঝড়তি পড়তি, ঝাড়ে গোড়ে (গোড়ায়), ঝালে ঝোলে অম্বলে, ঝোড় জঙ্গল (লাট), ঝোড় ঝাড়, ঝোঁপ ঝাড়।

ট—টীকা টিপ্পনী, টেনে বুনে, টাকা কড়ি।

ড—ডাকাবুকো (?), ডাকিনী যোগিনী, ডাল ঝোল, ডাল ডালনা, ডিথ ডবিথ, ডেরা ডাণ্ডা, ডোম ডোকলা।

ঢ—ঢাকঢোল, ঢিল পাটকেল, ঢোলক তবলা।

ত—তাউই মাউই, তামাক টিকে, তামা তুলসী, তাল বেতাল, তাল বেল, তালুক মুলুক, তিত (ত্যক্ত? তিক্ত ?) বিরক্ত, তিল তণ্ডুল, তাশ পাশা শতরঞ্চ, তুরী ভেরী, তুল-রাম খেলারাম, তেড়ে ফুঁড়ে, তেল তামাক, তেলি তামুলি, তেলি মালী, 'তোড় যোড়, তৈল তরুণী, ত্রিশ ত্রিশ (বিশ) ?

দ—দণ্ড মুণ্ড, দধি দুগ্ধ, দর দস্তর, দল বল, দলিল দস্তাবেজ, দয়া মায়া, দয়া দাক্ষিণ্য, দশ পঁচিশ (খেলা), দশ বিশ, দড়াদড়ি, দাঙ্গা ফ্যাসাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, দান ধ্যান, দানা পানি, দাঁতে ভাতে, দায় দৈব, দারুচিনি কাবাবচিনি, দাবী দাওয়া, দিগ্‌ দেশ, দিল্লী লাহোর, দুধ দই, দুলী মালী, দেব দ্বিজ, দেশ ও দশ, দৈত্য দানা (দানব), দোল দুর্গোৎ-সব, দৌড় ধাপ (লাট), দ্বন্দ্ব দ্বেষ, দ্বীপ উপদ্বীপ।

ধ—ধড়া চূড়া, ধন ধান্য, ধন জন যৌবন, ধন মান, ধরা বাঁধা, ধরম করম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধর মার, ধবলী শ্যামলী, ধুতী ফোতা, ধূপ দীপ, ধূপ ধুনা, ধূলা বালি, ধোপা নাপিত, ধ্যান জ্ঞান, ধ্যান ধারণা।

ন—নদ নদী, নদী উপনদী, নয় ছয়, নর বানর, নদী নালা, নাক কাণ, নাকানি চুবানি, নাকে মুখে চোখে (কথা), নাড়ী ভুঁড়ি, নাড়ী নক্ষত্র, নাতি পুতি, নাল ঝোল, নাম ও কাম, নাম ধাম, নিতাই নিমাই, নিত্য সত্য, নিদ্রা তন্দ্রা, নিপট কপট, নিম নিসিন্দে, নুনে ফেনে, নুন নেবু, নেত্র শ্রোত্র।

প—পত্র পল্লব, পত্র পুষ্প, পদ পসার, পরশু তরশু, পর্য্যায় পটী, পরিবর্ত্তিত পরি-বর্দ্ধিত পরিবর্জ্জিত, পশু পক্ষী, পসার প্রতি-পত্তি, পাঁজি পুঁথি, পাইক পেয়াদা, পাণ সুপারি (প), পায়েস পিঠে, পাল পার্ব্বণ, পাষণ্ড ভণ্ড ত্রিপণ্ড, পাহাড় পর্ব্বত, পিঠে পুলি, পিতা মাতা (বাঙ্গালায়), পীর পয়গম্বর, পুঁজি পাটা, পুড়ে ঝুড়ে (ঝুড়িভাজা হইয়া), পুলিশ পাহারা, পূজা পাঠ, পোকা মাকড়, পূজা পার্ব্বণ, প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চারণ।

ফ—ফল ফুল, ফাটা চটা, ফাঁসী শূলী, ফুটকড়াই মুড়কি, ফুটো ফাটা, ফুল ফল।

ভ—ভক্তি মুক্তি, ভক্ষ্য ভোজ্য, ভজন

পূজন, ভয় ভাবনা, ভাই ভগিনী ভাই ভায়াদ, ভাত তরকারী, ভাতে হাতে, ভাব ভঙ্গী, ভাব ভক্তি, ভিটে মাটী, ভূত ভবিষ্যৎ।

ম—মক্কা মদিনা, মঠ মন্দির, মজুর মিস্ত্রী, মণি মাণিক্য, মণি মুক্তা, মণ্ডা মিঠাই, মতি গতি, মৎস্য মাংস, মদ মাৎসর্য্য, মদ মাংস, মদ্য মাংস, মনঃ প্রাণ, মন্ত্র তন্ত্র, ময়লা মাটি, মল মূত্র, মশা মাছি, মাছ মাংস, মাঠ গোঠ, মাঠ ঘাট, মাঝী মাল্লা, মান্দ্রাজা মুখতাব মুশাফিরখানা, মান মাথুর, মান্য গণ্য, মা মাসি, মারা ধরা, মাল মশলা, মাসি পিসি, মুগ মুসুরী, মুচি মুসলমান, মুটে মজুর, মুড়ি মুড়কি, মুণ্ডক মাণ্ডূক্য, মৃদঙ্গ মন্দিরা, মেথর মুদ্দফরাস, মেষ বৃষ (রাশি), মোল্লা মুয়াজ্জিন।

য—যক্ষ রক্ষঃ, যজন যাজন, যম জামাই, যথা তথা, যন্ত্র তন্ত্র, যা তা, যাদু মাধু, যান বাহন, যীশা মূশা, যুড়ে হেড়ে, যুৎবরাত, যেথা সেথা, যেন তেন প্রকারেণ, যে সে, যোড়া তাড়া, যোগাড় যন্ত্র।

র—রঙ্গ বেরঙ্গ, রদ বদল, রণে বনে, রয় বয়, রয় সয়, রস কষ, রাখা ঢাকা, রাজা রুজী (উজীর?), রাজা মহারাজা, রান্না বান্না (বাটনা?), রামা শ্যামা, রীতি নীতি, রূপ রস, রেখে ঢেকে, রেশম পশম।

ল—লতা পাতা, লাগান ভাঙ্গান, লাঠি সোটা, লুচি কচুরি, লুচি চিনি, লোক লস্কর, লোহা লকড়, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, লাট্টু ও লেট্টি।

ব—বউড়ী ঝিউড়ী, বন্দুক বারুদ, বনে বাদাড়ে, বর্ম্ম চর্ম্ম, বল বুদ্ধি, বসন ভূষণ, বাগ্ বিতণ্ডা, বাঘ ভালুক (লাট), বাঙ্গালা বিহার, বাছ গোছ (গোছান), বাছ বিচার, বাত পিত্ত, বাদ বিচার, বাদ বিতণ্ডা, বাধা বিঘ্ন, বাঁধা ধরা, বাঁড়ুয্যে মুখুজ্যে চাটুজ্যে, বালক বালিকা, বায়ু বরুণ, বার ব্রত, বিকি কিনি, বিড়ে বারণ, বিদ্যে বুদ্ধি, বিদ্যে সাধ্যি, বিদায় আদায়, বিধি বিষ্ণু শিব, বিন্দু বিসর্গ, বিল ও ঝিল, বিশ ত্রিশ, বিষয় আশয়, বুদ্ধি বিবেচনা, বেইমান বেতমিজ, বেয়ে ছেয়ে, বোল চাল, ব্যয় ভূষণ (ব্যসন?), ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যাকরণ অভিধান, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বৈদ্য।

শ—শকুনি গৃধিনী, শত সহস্র, শয়নে স্বপনে, শরৎ শীত, শরম ভরম, শাক সুক্ত, শাঁখা শাড়ী, শাদা সিধে, শান্ত দান্ত, শান্ত সংযত, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, শালী শালাজ, শিক্ষা দীক্ষা, শিষ্য সেবক, শুক সনক, শুক শারী, শুচি শুদ্ধ, শুদ্ধ বুদ্ধ, শেল শূল শরাসন, শোয়া বসা, শৌচ আচমন, শ্মশানে মশানে, শ্রাদ্ধ শান্তি, শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, শ্রীদাম সুদাম, শ্বাস কাস, শ্বশুর ভাসুর।

স—সই সুপারিশ, সৎ চিৎ, সত্য ত্রেতা, সত্যং শিবং সুন্দরং, সময় সুযোগ, সময় ও সুবিধা, সরিৎ সাগর ভূধর, সর্দ্দি কাসি, সহায় সম্পদ্, সহায় সম্পত্তি, সহায় সামর্থ্য, সহি মোহর, সাঙ্গোপাঙ্গ, সাড়া শব্দ, সাত সতের, সাধ সেমন্তন, সাধু সজ্জন, সাধু সন্ন্যাসী, সাবান সোডা, সিপাই শান্ত্রী, সুখ সৌভাগ্য, সুযোগ সুবিধা, সুশীল ও সুবোধ, সূঁচ সূতা, সোণা দানা, সৃষ্টি স্থিতি সংহার, সৈন্য সামন্ত, স্থির ধীর গম্ভীর, সৃষ্টি পুষ্টি, স্তুতি নুতি, স্নান দান, স্বাহা স্বধা, স্কুল কলেজ (ল)।

হ—হরিৎ পীত লোহিত, হ'য়ে ব'য়ে, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, হব্য কব্য, হরে দরে (?)

হড় গুড়, হাওলাত বরাত, হাঙ্গামা হুজ্জুৎ, হাট ঘাট বাট মাঠ, হাড় চামড়া, হাড়ি ডোম, হাঁড়ি কুড়ী (কুণ্ডী), হাঁড়ি বেড়ী, হাঁড়ি সরা, হাঁড়ি হেঁশেল, হাড়ে নাড়ে, হাতে হেতেরে, হায়রাণ পেরশান, হারাণে পরাণে, হাসি খুসি, হাসি তামাসা, হা হুতাশ (হতোহস্মি), হিসেব কিতেব, হীরা জহরৎ, হুকা কলিকা, হৃষ্ট পুষ্ট, হেন তেন, হেনা তেনা, হেমন্ত বসন্ত, হেলা ফেলা, হেলে দুলে, হোড়া পোড়া, হোসেন হাসান, হেজে যা'ক ম'জে যা'ক।

(৩) বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম

বৈপরীত্য, (antithesis) ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে অনুপ্রাসের আশ্রয় না লইলে ভাব ও ভাষা ঘোরালো হয় না।

অ—অজলে অস্থলে, অনলে অনিলে সলিলে, অনুকূল প্রতিকূল, অনুকরণ না হনুকরণ, অনুরাগ বিরাগ, অনুলোম প্রতিলোম, অনুলোম বিলোম, অনুবাদ না হনুবাদ, অর্থী প্রত্যর্থী, অবস্থা ও ব্যবস্থা।

আ—আগাগোড়া, আদান প্রদান, আনা গোনা (আসা যাওয়া অর্থ নহে কি ?), আপন পর, আমা ও ঝামা, আয় ব্যয়, আলোকে আঁধারে, আবালবৃদ্ধবনিতা, আবির্ভাব তিরোভাব, আশা আশঙ্কা, আসমান জমীন (স্বর্গ মর্ত্ত্য ?), আসল ও নকল, অ্যাও হয় অও হয়।

ই—ইতস্ততঃ, ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ।

উ—উচ্চ নীচ, উচ্চাবচ, উৎকর্ষ অপকর্ষ, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, উত্তম মধ্যম অধম, উত্তরাপথ দক্ষিণাপথ, উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি, উপায় অপায়, উল্টো পাল্টা।

ঊ—ঊর্দ্ধ অধঃ।

এ—(হয়) এস্পার (না হয়) ওস্পার।

ও—ওস্তাদ ও সাকরেদ, ওলে ঝোলে (খেও না)।

ক—কড়ি ও কোমল, কথা বনাম কায, কাচ ও কাঞ্চন, কার্য্য কারণ, কালা ধলা, কুলীন ও কাপ, কোরাণ পুরাণ, ক্রয় বিক্রয়, কোমল ও কঠোর।

খ—খাদ্য খাদক।

গ—গতায়াত, গদ্য পদ্য, গমনাগমন, গরু ও জরু, গুণনীয়ক ও গুণিতক।

ঘ—ঘর বা'র, (না) ঘরকা (না) ঘাটকা, ঘরে বাইরে, ঘোড়া ডিঙ্গে ঘাস, ঘোড়া ভেড়ার একদর, ঘুঁষ বা ঘুঁষি।

চ—চকোর ও চাতক, চড়াই উতরাই, চাঁদ ও চকোর, চোরে কামারে।

ছ—ছায়া ও কায়া (কায়)।

জ—জল স্থল, জয় পরাজয়, জীব ও জড়, জীব ও শিব, জীবে শিবে, জীবাত্মা পরমাত্মা, জীবন মরণ, জীবিত মৃত, জেলে ও হেলে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ।

ট—টানা পড়েন।

ঠ। ঠাকুর কুকুর, ঠেকে শেখা আর দেখে শেখা।

ত—তাত (তাপ ?) ও বাত, তিলে তাল, তুষ্টি ও রুষ্টি, তেলে জলে, ত্যাগী ও ভোগী, তীর তুক্ক, তালে আর ঘোলে।

দ—দানব মানব, দেওয়া থোওয়া, দেনা পাওনা, দেব দৈত্য, দিলে নিলে, দেশ বিদেশ।

ধ—ধলা ও কালা।

ন—নরম গরম, নরনারী, নিগ্রহ অনুগ্রহ, নিন্দা ও বন্দনা, নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নেড়া নেড়ী, নূতন পুরাতন।

প—পতঙ্গ ও মাতঙ্গ, পত্নী ও পেত্নী, পাপ তাপ (কার্য্যকারণ), পাপ পুণ্য, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, পিতাপুত্র, পেঁয়াজ পয়জার, পীযূষ ও বিষ, পূর্ব্ব পশ্চিম, পুরুষ ও প্রকৃতি, পুলক ও আতঙ্ক, পূর্ব্বাপর, পেটে পিঠে, প্রকৃতি ও বিকৃতি, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, প্রজা ও জমীদার, প্রবীণ ও নবীন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রাচীন ও নবীন, প্রাচী ও প্রতীচী, পাতাচাপা কপাল আর পাথরচাপা কপাল।

ভ—ভক্ত ও ভাক্ত, ভক্ত ও ভণ্ড, ভয় ও ভক্তি, ভয় ও ভরসা, ভাব ও ভাষা, ভিতর বাহির, ভূত ভবিষ্যৎ, ভূলোক দ্যুলোক।

ম—মরণকাঠি জীয়নকাঠি, মর্দ্দা ও মাদী, মাগী মিন্সে, মান অপমান, মায়ে ছায়ে, মায়ে পোয়ে, মিছা সাঁচা, মুড়ি মিছরি, মেয়ে মর্দ্দ, মেষ ও মহিষ।

য—যাতায়াত, যুক্ত ও মুক্ত, যোগ বিয়োগ, যোগী ও ভোগী।

র—রক্ষক ভক্ষক, রসা কষা (কষায়), রাং রূপা, রাজা প্রজা, রাম রহিম, রাম রাবণ।

ল—লাভ লোকসান (নোক্সান), লাল কালা, লেনা দেনা।

ব—বর বধূ, বাঘে গরুতে, বাঘে ছাগে, বাঘে বকরীতে, বাদী প্রতিবাদী, বাপে বেটায়, বাঘে বলদে, বাহাল বরতরফ, বিধি নিষেধ, বিপদ্ সম্পদ্, ব্যস্ত সমস্ত।

শ—শস্ত্র ও শাস্ত্র, শিক্ষা ও পরীক্ষা, শিয়া ও সুন্নি, শিব-সতী, শিশির ও সমুদ্র, শূন্য ও পূর্ণ, শূদ্র ভদ্র, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, শ্রেয়ঃ ও হেয়।

স—সংসার ও সন্ন্যাস, সকাল বিকাল, সদর অন্দর, সত্য মিথ্যা, সরেশ নিরেশ, সাঁঝ সকাল, সাবিত্রী সত্যবান্, সান্ত অনন্ত, সাম্নে পিছনে, সাধনা ও সিদ্ধি, সুখ দুঃখ, সুয়ো দুয়ো, সুর নর, সুরু হইতে শেষ, স্থূল ও সূক্ষ্ম।

হ—হনু ভানু, হরণ পূরণ, হর্ষ বিষাদ, হ'ল আর গেল, হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর। (ক্রমশ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বয়কট ও হিন্দু-জাতিভেদ

(সামাজিক প্রবন্ধ)

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ কথা স্বীকার করেন যে, কোনো না কোনো আকারে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত আছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন দেশের সভ্যতার প্রকারভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকারের আকার ধারণ করে। শুধু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর স্ব-শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ দেখা যায় না, অথবা আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না। নিম্নশ্রেণীর অসভ্য লোকদিগের মধ্যেও জাতিভেদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে হিন্দুজাতির

মধ্যে জাতিভেদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যেই সেরূপ আকার প্রাপ্ত হয় নাই; ইহার নাম স্পর্শ-দোষজনিত জাতিভেদ। ভিন্ন জাতির কিম্বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের স্পৃষ্ট অন্ন খাইলে জাতি যাইবে, এমন কি, জল খাইলেও জাতি যাইবে, জাতিভেদের এরূপ বন্ধন পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। আমাদের বিদেশীয় বন্ধুগণ এবং পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন স্বদেশীয় সমাজ-হিতৈষিগণ মনে করেন, ইহা একান্তই সাম্য-মৈত্রীর বিরোধী এবং অসভ্যতার পরিচায়ক। এটা হিন্দুর উপরে একটা ভীষণ অভিযোগ,—যাহা কোথাও নাই, তাহা তোমার মধ্যে কেন থাকিবে?

উত্তর এই যে, ইহা অসভ্যতার লক্ষণ নহে; কেননা, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো অসভ্য জাতির মধ্যেই এরূপ স্পর্শদোষজনিত জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত নাই। যদি ইহা অসভ্যতার লক্ষণ হইত, তবে কোনো না কোনো অসভ্যজাতির মধ্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইত। আর এরূপ প্রথা অন্যত্র প্রচলিত নাই বলিয়াই যে এই প্রথাটা জঘন্য, ইহাও যুক্তিযুক্ত কথা নহে। তবে সাম্য-মৈত্রীর নাম যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উত্তর দিতেছি।

প্রত্যেক সমাজেই সমাজশাসনের জন্য একটা "বয়কট-প্রথা" প্রচলিত থাকা আবশ্যক। প্রথাটার এ দেশী নাম এক-ঘ'রে করা। কিন্তু আজকাল বয়কট শব্দটা আমাদের দেশের লোকের এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে উহাকে পরিত্যাগ করা যায় না। এই স্বদেশী আন্দোলনে সকলের মুখেই "বয়কট কর, বয়কট কর" এই শব্দ ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর উচ্চারিত হইয়াছে। যাঁহারা জাতিভেদের নিন্দা করেন, একঘ'রে করাকে ঘৃণিত আচরণ মনে করেন, তাঁহারাও বিদেশী দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতাকে বয়কট করিতে বালবৃদ্ধযুবক এবং মহিলা ও বালিকা সকলকে মাতৃভূমির নামে, ঈশ্বরের নামে, আরাধ্য দেবতার নামে শপথ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বাধা না দিলে এখনও সেই প্রতিজ্ঞার স্রোত খরবেগে প্রবাহিত থাকিত। এ কথা সকলেই বুঝিয়াছেন যে, সমাজ-দ্রোহীকে শাসন করিতে হইলে বয়কটের একান্ত প্রয়োজন।

এ দেশের বয়কট কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। অমুক ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড়ের চালান আনিয়াছিল, তাই তাহাকে বয়কট করা হইল অর্থাৎ তাহার গুরু পুরোহিত, ধোপা নাপিত বন্ধ করা হইল, তাহার স্পৃষ্ট অন্নজল পরিত্যক্ত হইল, সমাজে সে একঘ'রে হইল। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে শক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অনাথ ও অপমানিত করিতে পারে, এই শক্তির মূল কোথায়? মূল ঐ অন্নজলে, মূল ঐ স্পর্শ-দোষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অপরাধী ব্যক্তির অন্নজল পরিত্যক্ত হইল, যে তাহার অন্নজল গ্রহণ করিবে, তাহারও অন্নজল অব্যবহার্য্য হইবে; সুতরাং গুরু গেল, পুরোহিত গেল, চাকর গেল, চাকরাণী গেল, সে একটা হোটেল ঘরে ঢুকিয়া ভাত পাইতে পারে না; কেননা, সে ঘরে ঢুকিলে ঘরের

অন্নজল নষ্ট হইবে। কি বিষম বন্ধন! কি ভীষণ শাস্তি!

আজকাল সমাজ-শৃঙ্খলা না থাকায় এবং দেশে হিন্দু ভিন্ন অপরাপর জাতির বসতি ও আধিপত্য হওয়ায়, লোকের সমাজ-ভয় কমিয়া গিয়াছে। এখন কোন ধনী লোককে বয়কট করা বড়ই কঠিন কার্য্য; কেননা, সে গুরু-পুরোহিতের কাঙ্গাল নহে, সামাজিক অনুষ্ঠানের ধার ধারে না, পূজা-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদিকে আপদ জ্ঞান করে, তাহার মিলিবার মিশিবার জন্য তাহারই ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব বন্ধুজনের অভাব নাই এবং আহারের জন্য গ্রাণ্ড্ হোটেল কি গ্রেট্ ইষ্টরণের দ্বার খোলা আছে। আর যদি ঘরে রান্না বান্না করিতে হয় তাহার জন্য হিন্দু পাচক কি হিন্দু চাকরের দরকার নাই; তাই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের বয়কট-ব্যাপারে রাজধানী অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহর, সহর অপেক্ষা মফঃস্বল এবং পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ সমধিক জয়যুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে সমাজের বন্ধন যেমন দৃঢ়, সেইখানে সেইখানে বয়কট ততটা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পৃথিবীর যে সকল দেশে হিন্দু-জাতিভেদের ন্যায় জাতি-ভেদ-প্রথা নাই, অর্থাৎ যে সকল দেশে স্পৃষ্ট অন্নজল পরিত্যাগ করা সামাজিক শাসনের অঙ্গ নহে, সে সকল দেশে কি "বয়কট" হয় না? "বয়কট" শব্দের উৎপত্তি ইউরোপেই হইয়াছে। এ কথার উত্তর এই যে, সে সকল দেশের বয়কটের প্রণালী স্বতন্ত্র, আমাদের দেশে যেখানে "কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষঃ," সেদেশে সেখানে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।" আসল কথা এই যে, সে দেশে যদি কাহাকেও বয়কট করা হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই বয়কট-ব্যক্তির সাহায্য করে, অথবা কোনরূপে তাহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র সহানুভূতি দেখায়, তবে বয়কটকারী জনমণ্ডলী সেই ব্যক্তির বাড়ী ঘর ঘেরাও করিবে, তাহার ঘরে আগুন দিবে এবং তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে হয় প্রাণে মারিবে, নতুবা তাহাকে বিকৃতাঙ্গ করিবে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ যখন ইংলণ্ডের "চা" বয়কট করিয়াছিল, তখন বয়কটকারিগণ তূলায় আলকাতরা মাখাইয়া সঙ্গে রাখিত এবং বয়কটের বিরুদ্ধবাদী কোনো ব্যক্তিকে রাস্তায় দেখিতে পাইলে, তাহার চোকে মুখে আচম্বিতে সেই আলকাতরা-মাখা তূলা চাপিয়া লাগাইয়া দিত; সে সব দেশে বয়কটের সময় অন্যান্য যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকলের তুলনায় এই প্রথাটিকে বিশেষ শিষ্টতা ও সভ্যতাব্যঞ্জকই বলিতে হইবে।

আমি পাশ্চাত্য বয়কট প্রথার সমালোচনা করিতে চাহি না। আমি শুধু বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্যমণ্ডলে বয়-কটের যে বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে আমাদের জন্য কোন্টী বাঞ্ছনীয়? পাশ্চাত্য বয়কটপ্রণালীতে বয়কট-ব্যক্তি বিপক্ষের নিকট হইতে কোনো সাহায্য পায় না; কিন্তু আমাদের দেশে যাহাকে একঘ'রে করা হয়, কেহ তাহার বাড়ীতে আহার করে না বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি বিপন্ন কি বুভুক্ষু হইয়া আসিলে, সকলেই তাহাকে যত্নের সহিত অন্নজল প্রদান করে। এদেশের একান্ত কঠোর শাসনও দয়াকে কখনই অতিক্রম করে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ-

সংস্থানে সুপ্রণালীক্রমে একঘ’রে করার উপায় না থাকায় সে দেশের বয়কট-প্রথা একান্ত বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং উহা ভীষণ সংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্ম ও রাজ-বিধি উভয়কেই লঙ্ঘন করে। ইহা পাশ্চাত্য মণ্ডলে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ-প্রথাকে আজকাল অনেক চিন্তাশীল ইংরাজও প্রশংসা করিয়া থাকেন। যখন এদেশের গ্রাম্য পঞ্চায়েৎপ্রথা বর্ত্তমান ছিল, তখন সামাজিক শাসনই সেই প্রথার মূল শক্তি ছিল এবং সেই শক্তির মূল-মন্ত্র ছিল সামাজিক বয়কট অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির পৃষ্ঠ অন্নজল পরিত্যাগ করা। যদি বল যে জরিমানা করার প্রথাও প্রচলিত ছিল, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সামাজিক শাসনের ভয়েই লোকেরা জরিমানা দিত, নতুবা দিবে কেন?

আমি এই প্রবন্ধে এই মাত্র দেখাইতেছি যে, সমাজ-শাসনের জন্য যদি বয়কট প্রথার আবশ্যক থাকে (যাঁহারা উহা অস্বীকার করেন তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার নাই) তবে হিন্দুবয়কট-প্রথা অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির পৃষ্ঠ অন্নজল পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রচলিত প্রথা অপেক্ষা উহা শিষ্ট ও নিরীহ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন। যদি কেহ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রথার আবিষ্কার করিতে পারেন, আমরা অবশ্যই মাথা পাতিয়া তাঁহার কথা গ্রহণ করিব। *

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

* ন্যূনাধিক ২০ বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের খৃষ্টান মিশনের অন্তর্গত বাগধা ও আস্কর গ্রামের আলোক ও কালীচরণ নামক ব্যক্তিদ্বয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে একঘ’রে করিল, কেবল যে তাহাদের অন্নজল পরিত্যাগ করিল এরূপ নহে, তাহাদের ক্ষেতের ধান কাটিল না, তাহাদের জীর্ণঘর মেরামত করিল না, এই প্রবন্ধ লেখক কোন একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজপত্নীকে এ কথা জানাইলে তিনি উত্তর করিলেন যে এরূপ শাসন-প্রণালী অবলম্বন না করিলে তাঁহারা তাঁহাদের মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিবেন না। লেখক।

জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব-কবির মিলন-গীতিও কেবল ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চামাত্র নহে, এ সকল গানেও ভাব-বাহুল্য বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছে।

না পুছ না পুছ সখি পিয়ার পিরীতি।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচতি॥
হিয়ার উপর হইতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদ্রার আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

জ্ঞানদাসের রাধা-চরিত্র আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমন্বয় হইয়াছে। বিদ্যাপতির রাধিকা রসিকা, চঞ্চলা, সরলা, স্ফুটিত-মাত্র-যৌবনা, প্রণয়রস-মুগ্ধা, দৈহিক-সুখ-প্রিয়া নায়িকা—চণ্ডীদাসের রাধিকা যৌবনে যোগিনী, মনোময়ী, দেহবুদ্ধিহীনা। বিদ্যাপতির রাধিকার মন লুকাইয়া কাজ করে, দেহবৃত্তি স্বপ্রকাশ; চণ্ডীদাসের রাধিকার দেহ আছে, তাহা বুঝিবার যো নাই, মন ও ভাব স্বতঃ-বিকশিত। বিদ্যাপতির শ্রীরাধা লালসাময়ী, চণ্ডীদাসের রাধিকা পাগলিনী। বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের রাধিকা-চরিত্রের বিভিন্নতা এই ক্ষুদ্র লেখক অপর এক প্রবন্ধে সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছে।* এই কারণে বিদ্যাপতির রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে মিলন—আর চণ্ডীদাসের রাধিকার সম্ভোগে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈন্য। জ্ঞানদাসের রাধিকা ভাবময়ী, পূর্ব্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের রাধিকার মত বেদনাময়ী, কিন্তু দেহ-বুদ্ধিহীনা নহে; এইজন্য সম্ভোগে আনন্দময়ী ও ভাবময়ী, বৈচিত্র্যানুসন্ধানময়ী। মিলনেই কবি রাসলীলা দোললীলা, ঝুলন প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার মত তীব্রলালসাময়ী নহেন, তাই বিরহে তাঁহার বিদ্যাপতির রাধিকার তুল্য একাগ্রতা নাই। বিদ্যাপতির রাধিকা বিরহে অনুক্ষণ মাধব মাধব চিন্তা করিতে করিতে "ভেল মাধাই"; চিন্তার এমন প্রখরতা আমরা জ্ঞানদাসে বা চণ্ডীদাসে দেখিতে পাই না। কিন্তু জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার আসঙ্গলিপ্সা ছিল বলিয়া বিরহে তাঁহার হৃদয়ে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা অপেক্ষা বেদনার প্রাখর্য্য আছে। এইরূপে জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য হইয়াছে।

কিন্তু এমন মধুর মিলনে বিরহ কেন? ইহার সোজাসুজি উত্তর—পুরুষের অনেক কাজ, শুধু প্রেম লইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার চলে না, কাজেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। এমন উত্তরে কিন্তু বৈষ্ণব-কবির বিরহ বুঝা যাইবে না; এইখানে আবার তাঁহাদের পূর্ব্বকথিত মূল সূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি যে, বৈষ্ণব-কবির গানে একটা গূঢ়ভাব নিহিত আছে এবং অল্প পরিমাণে তাহা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছি। জ্ঞানদাস নৌকাবিহারের পদে তাহা কতক পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। আমরা যখন বুঝিব যে, বৈষ্ণব-কবির গান পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন-সঙ্গীত, ভগবান্ ও ভক্তের প্রেমলীলা বর্ণন, তখন এই বিরহ বোঝা সহজ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত কহিয়াছেন যে, ভগবৎপ্রেম-লাভে গোপীদিগের হৃদয়ে, বিশেষতঃ যে গোপী-প্রধানার কথা ভাগবতে আছে, এবং যিনি শ্রীরাধা ভিন্ন আর কেহই নহেন, তাঁহার হৃদয়ে গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল। আমরাও দেখিয়াছি যে, জ্ঞানদাসের শ্রীরাধাও প্রিয়তমের প্রেমলাভে একটু গর্ব্বশালিনী, একটু আমিত্ব-ময়ী হইয়াছেন—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমারি নাম॥

* উদ্বোধন—শ্রাবণ, ১৩১৮।

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখনে যে দিকে যায়।
বাহু পাসরিয়া বাউল হইয়া
তখনে সেদিকে ধায়॥

ইহাতে বেশ একটু "আমার আমার" ভাব আছে। "আমি যে কৃষ্ণকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি" এই রকম ভাব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার—

পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে।

বেশ প্রেম-দর্পের পরিচয় দিতেছে। এ দর্প মিষ্টতা-বর্জ্জিত নহে; কিন্তু দর্প যেমনই হউক, তাহা ভাল নয়। লৌকিক কবিও গাহিয়াছেন—

প্রেম সরু সূতে বাঁধাবাঁধি
বাতাসের তো ভর সবে না।

তাই শ্রীরাধার এই ভালবাসার দর্পে—এই সৌভাগ্যমদে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীরাধার হৃদয়ে প্রেম পরিপূর্ণমাত্রায় ছিল বলিয়া তিনি আবার প্রিয়তমকে ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে বড় কষ্টের, অনেক সাধনার পরে। এমন সাধনা ভিন্ন, সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব-বর্জ্জিত না হইতে পারিলে, দেহ, মন, প্রাণ, সংসার-সুখ, লোকনিন্দা, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এ সকল একেবারে ত্যাগ করিয়া পূর্ণমাত্রায় তদেকচিত্ত না হইতে পারিলে, ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না—ভগবান্‌কে বাঁধা যায় না; তাই শ্রীরাধার এই বিরহ-পরীক্ষা। ভাগবত বলিয়াছেন যে, যখন ভগবান্ গোপীদিগের চিত্তে এই দর্প দেখিলেন, তখন তিনি সেই গর্ব্ব শান্ত করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য—"প্রশমায় প্রসাদায়" অন্তর্হিত হইলেন। এ বিরহ ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ-সঞ্জাত। এই বিরহ হইতেই শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সর্ব্বস্বার্পণ। এই সর্ব্বস্বার্পণ-প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রেমোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই, অনেক বাধা-বিপত্তি, অনেক আততায়ী ভাব তাহা হইতে দেয় নাই; এই বিরহের পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। মিলনে চপলতা আছে, মান আছে, অভিমান আছে; এতদ্ভিন্ন মিলনে ঐহিকতার প্রতি দৃষ্টিও আছে; এমন একটা ভাব আছে যে, কৃষ্ণ ব্যতিরেকেও আমার এমন আরও অনেক জিনিষ আছে, যাহা রাখা প্রয়োজন; এ কথাও তখন মনে আসে যে, কৃষ্ণ ও সংসার দুই রাখিতে হইবে। কিন্তু বিরহান্তে আর শ্রীরাধার কিছুই নাই—কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাই ভাগবত বলিয়াছেন—

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।

ভক্ত বৈষ্ণব-কবি এইজন্য বিরহচিত্র আঁকিতে বড় উৎসাহী ও বড় নিপুণ। লৌকিক কবির কাছে যাহা কলামাত্র, বৈষ্ণব-কবির কাছে তাহা সাধনায় উন্নীত হইয়াছে—অশ্রু-জল-সিক্ত হইয়া চিত্রগুলিও পবিত্র হইয়াছে।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সেই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।

যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেথানে নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া ॥
আপন বন্ধুয়া আনিব বান্ধিয়া
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারী বধ দিব তারে ॥
পুন ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে
সে শ্যাম বন্ধুয়া হাতে!
বান্ধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে
তাই ভাবিতেছি চিতে ॥
জ্ঞানদাসে কহে বিনয় বচনে
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা ॥

শুধু ভগবান্ নয়, আজ কবিও একটু পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু শ্রীরাধার এখন আর কোনও বিষয়েই অনুরাগ নাই, মুখে হাসি নাই, দেহে বেশবিন্যাস নাই, কোনও সুখে আকাঙ্ক্ষা নাই—

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চুর ॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বিথ।
মন্দ পবন জনু আনল শিখ ॥

শ্রীরাধার এখনকার অবস্থা বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাসের প্রত্যক্ষীকৃত স্বরূপ; এমন সাত্ত্বিক অবস্থা মহাপ্রভুর জীবনে অহরহঃ দেখা দিত-

কানু কানু করি ক্ষিতিতলে মুরছলি
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ ॥
এক সখী তুরিতহিঁ কোরে আগোরল
কহতহিঁ আগোরত কাল।
শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
পাওল জীবন দান ॥
চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ,
অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকারায়
অবহুঁ না আওল সোই ॥
রোয়ত হসত খসত মণি যোজত
পন্থহিঁ নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে
মথুরা নগর সিধারি ॥

কবি জ্ঞানদাস বিরহের বড় মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন; কারণ, তিনি বিদ্যাপতির শিষ্য। বিদ্যাপতির বিরহচিত্রের মধ্যে যে উপাদান আছে, জ্ঞানদাসের চিত্রেও সেই সকল বর্ত্তমান। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার বিরহের সম্ভাবনা নাই; কারণ, তিনি দেহের দ্বারা প্রিয়োপভোগের ধার ধারেন না, ভাবরসে বিভোর হইয়া আছেন। জ্ঞানদাসের রাধা যেমন ভাবে বিভোর, তেমনি অঙ্গ-সঙ্গ-রসাস্বাদিনী, তাই তাঁহার বিরহে মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন ফুটিয়াছে; আবার ইহা হইতেই তাঁহার দেহবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়াছে, হৃদয়ে প্রিয়তমের প্রতি নির্ব্বিকল্পচিত্তে সর্ব্বস্বার্পণের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাই বিরহের পর মিলনে অমৃত উঠিয়াছে। আর তাঁহার ঘর নাই, সংসার নাই—

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া ॥

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মরমের দুখ
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান লোরে॥

শ্রীরাধা এখন বুঝিয়াছেন যে তাঁহার নিজস্ব কিছুই নাই; তাঁহার গর্ব্ব এখন নিজেকে লইয়া নয়, সে গর্ব্বে আর অহমিকা নাই। তাই যিনি বলিয়াছিলেন—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম।

তিনি এখন বলিতেছেন—

বঁধু তোহারি গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোহারি রূপে।
হেন মনে লয় চরণ যুগল
সদা ধ'রে রাখি বুকে॥

এই যে বঁধুর গর্ব্বে গর্ব্ব, বঁধুর রূপে রূপ, এই যে চরণযুগল সদা বুকে ধরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি—ইহাই আত্মসমর্পণ; আধখানা নহে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই গর্ব্বে, এই রূপানুভূতিতে, এই আকাঙ্ক্ষার আধ্যাত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত দেখা যাইতেছে; কারণ, ইহা কোনও ইন্দ্রিয়ময় জীবের ক্লেদময় গর্ব্ব নহে, জ্বালাময়ী আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা নহে; ইহা যেমন প্রেমিকার সর্ব্বস্বার্পণ, তেমনি আর এক দিকে ভক্তের আত্মনিবেদন। ভক্তের ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই নাই; তাহার কাছে প্রাণ ভগবানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর--

অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম বলি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি হে কালিয়া চাঁদা।
জ্ঞানদাসে কহে তোমারি পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

এই আত্ম-বিলোপন কত সুন্দর! ধরিয়া লইলাম, জ্ঞানদাসের কোনও আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই; তাহা হইলেও কি এই অত্যন্ত আত্মত্যাগ, এই নিবিড় আত্মসমর্পণ, এই একান্ত নির্ভরশীলতা, গভীর প্রেমের পরিচায়ক নহে?—ভাবের বিকাশ করিতে সক্ষম নহে? এ আত্ম-ত্যাগে চুক্তি নাই, দেনা-পাওনার হিসাব নাই, লাভালাভের খতেন নাই, এ ত্যাগ যথার্থই সর্ব্বস্ব-ত্যাগ; জাতিত্যাগ, কুলত্যাগ, এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ। তোমার জুলিয়টই ভালবাসার খাতিরে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু চুক্তি ছাড়িতে পারে নাই; প্রথমেই সে

চুক্তি করিয়া লইয়াছিল—তাহার লৌকিক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিল। সংসারের যাহা কিছু ভাল—নামধাম, কুলশীল, ধর্ম্মাধর্ম্ম—সব বিসর্জ্জন দিয়া যে প্রেমে আত্মহারা হয়, তাহাকে সমাজে পতিত হইতে হউক, লোকে কুলটা বলিয়া গালি দিক্, কিন্তু সেই যথার্থ ভাল বাসিয়াছে, সেই যথার্থ প্রেমিকা। এমনি সর্ব্বনাশী প্রেম হৃদয়ে না জাগিলে ভগবান্‌কে বাঁধা যায় না। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরকীয়া নায়িকার এত কদর; তাই মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, পরবাসনিনী নারী যেমন সকল সময়েই সংসারের কার্য্য করিতে করিতেও, প্রেমিকের নবসঙ্গরূপ রসায়ন উপভোগ করে, ভক্তের ভগবান্ সম্বন্ধে ঠিক সেই রকম ভাব হওয়া চাই। ভাবে ঢল ঢল, অনুরাগে বিহ্বল হইয়া ভগবান্‌কে ভালবাস; সংসার কি বলে, তাহার দিকে কান দিও না; সংসারে কত কি হারাইলে, তাহা দেখিতে যাইও না; শুধু ভালবাস, কেবল ভাবরসে সেই ভাবের ভাবুককে ধরিয়া রাখ, যে তাঁহাকে এমন করিয়া ভালবাসে, যে জ্ঞানদাসের রাধিকার মত তাঁহাকে সর্ব্বময়, সর্ব্বাধিষ্ঠিত ভাবিয়া বলিতে পারে—প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে—আমার কিছুই নাই, সবই তোমার, আমি শুধু তোমায় ভালবাসিতে জানি, যে বলিতে পারে—

বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ বদন সদা নিরখিব
সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি মিলাওল বিধি
পূরিল মনের সাধ॥
প্রেম ডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়া
দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥

যে বলিতে পারে—

ওহে নাথ কি দিব তোমারে।
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার নাথ আমি যে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার নিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।

যে ভালবাসা দিতে জানে,—নিরাবিল, নিরবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-রহিত ভালবাসা দিতে জানে, তাহার প্রতি ভগবানের উত্তর জ্ঞানদাসের কথায় এই—

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥

* * * * *

তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥

নায়ক ও নায়িকার এই প্রকার আত্মসমর্পণে জ্ঞানদাসের কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে—এই স্বার্থহীন প্রেম কি ইন্দ্রিয়-চপলতার পরিচয় দেয়? না, আমরা ইহার ভিতরে ভক্তের ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের এবং অমানী ও মানদ এবং তৃণের চেয়েও নীচু

হৃদয়ের মধুর স্বার্থহীনতার সু-বাতাস অনুভব করিয়া আমাদের সংসার-ক্লিষ্ট, আত্মসুখান্বেষী রিপুবশীভূত অন্ধ হৃদয়কে একটু উন্নত, একটু আনন্দময়, একটু নিঃস্বার্থ ও আমিত্ব-বর্জ্জিত করিতে পারি। "এই গীতি-কবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য-প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি—আত্ম-গরিমার রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দকে আত্ম-বিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।"*

"বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনে নিয়মিত। তাহা অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ততা মাত্র নহে।"†

অতএব যদি বৈষ্ণব-কবির চিত্রিত প্রেমকে সাধ্যসিদ্ধ প্রেম বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রেমের এমন মধুর, এমন গভীর মূর্ত্তি, এমন দুর্দ্দমনীয় বেগ আমরা আর কোথাও চিত্রিত দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। "বৈষ্ণব-কবির সেই স্বাধীন প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রে, অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসার-পথ হইতে মানস-পথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।" ‡

বৈষ্ণব-কবির প্রভাবের ইহাই মূল কারণ এবং এইজন্যই বলিয়াছি যে, সংসার-বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে বৈষ্ণব-কবির সরল সতেজ আত্মত্যাগ-ময়ী প্রেমগীতি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃজন করিয়া যেন জীবনীশক্তি ফিরাইয়া দেয়, তাপদগ্ধ শ্রান্ত ও ক্লান্ত চিত্তে শান্তি-সুধার প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়।

জ্ঞানদাসের প্রেমসঙ্গীতের সমালোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু জ্ঞানদাসে এতদরিক্তও কিছু আছে, যাহা দ্বারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সমসাময়িক কবি গোবিন্দ-দাসের পদাবলীতে যাহা নাই তাহা আমরা জ্ঞানদাসে দেখিতে পাই। প্রেম-পদাবলীর ভিতর তাঁহার নূতনত্ব বংশীশিক্ষা; কিন্তু ইহার আভাস তিনি চণ্ডীদাসে পাইয়া-ছিলেন। সখ্যরসের চিত্রাবলী তাঁহার নিজস্ব। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ মধুর রস ভিন্ন অন্যরসের সাধনা করেন নাই। মহাপ্রভু প্রথমে সকল রসের সাধনার আদর্শ বৈষ্ণব-গণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সেই সুশিক্ষার ফলে বৈষ্ণব-কবিগণ সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের মাধুর্য্যও অনুভব করিয়া তত্তৎ রস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মধুর রস সকল রসের শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহাতে অন্যান্য সকল রসের অস্তিত্ব আছে এবং ইহাতে যেমন আত্মসমর্পণের ভাব আছে, তেমন আর কোনও রসে থাকিতে পারে না, বাৎসল্যেও নয়। তাই বৈষ্ণব-কবি মধুর রসের সাধনায় উৎসাহী ও কৃতী। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানদাসের সখ্যরসের চিত্রাবলী নিতান্ত অবহেলার বস্তু নহে। ইহাদের রসবত্তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নির্ম্মল ও হৃদয়গ্রাহী। সখার কাছে সখার আবদার, সখার উপর সখার জোর বড় উপাদেয় ভাবে এই পদ-গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের গোপালগণের সখ্য নিরাবিল সখ্য; ইহাতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-জনিত সঙ্কোচ নাই, খোসামুদি নাই, কেবল আছে প্রাণঢালা ভালবাসা।

* দীনেশ বাবু—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

† রবিবাবু—গ্রাম্য সাহিত্য।

‡ রবিবাবু—গ্রাম্য সাহিত্য।

এইজন্য বৃন্দাবনবাসীদের কৃষ্ণে রতিকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে "কেবলা রতি" বলে। এই গোপ-বালকদের হৃদয়ে এমন ভাব পাই যে, আমরা একজন মহামহিমান্বিত ব্যক্তির সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ, অতএব আমরা খুব মস্ত লোক; তাহারা জানে, গোপাল তাহাদের সাথী, তাহাদের সখা; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর তাহারা কিছু জানে না, জানিতে চাহে না। তাই ইহাদের কত জোর—

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥

কিন্তু ইহাদের প্রাণে স্নেহ অগাধ; ইহারা রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ভয় দেখায়, কিন্তু পারে না। কানাই না হইলে, তাহারা খেলিয়া সুখ পায় না, প্রাণে আনন্দ পায় না—

একেলা মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণ।
যদি বা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই
যাইতে কেমনে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি।

এমন সখা পাইয়া গোপালেরও আনন্দের সীমা থাকে না; তাহাদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের মত হইয়া, তাহাদের সখ্যরসাস্বাদ পরিতৃপ্ত করিয়া, গোপালের হৃদয় সুখে উছলিয়া উঠে।

গিরিধর লাল গিরিপর খেলল
তরু হেলয়া পদ পঙ্কজ দোলনীয়া।
অতি বল সুবল মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাঁড দোহনিয়া॥
গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনা তট
চঞ্চল ধায় গোপাল॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন
উপনীত যমুনাতীর।
পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥

গোপালের এই বালক সখাগণ একান্ত তদ্‌গত-প্রাণ; ইহারা তাহার কোনও কষ্ট সহিতে পারে না, অল্প মাত্র অদর্শনে আকুল হইয়া উঠে; গোপাল তাহাদের কোমল হৃদয়ের একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভালবাসার অবলম্বন।

হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন্ বনে ছিলা গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
নবঘনশ্যাম তনু ঝামর হইয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সঁপে দিলে
ঘরকে গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমার সনে
বসিয়া তরুর ছায়।
বনে বনে উচাটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী শুন ভাই নীলমণি
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অন্য স্থানে
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥

বিমল উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে গোপবালকগণের হৃদয় পরিপূর্ণ; ইহাদের সখ্যে খাদ নাই, ইহা খাঁটি সোনা। "এই কি করিলাম, বুঝি বাড়াবাড়ি হইল" এমন ভাব ইহাদের মনে আসে না; ইহারা খালি ভালবাসিতে জানে,

ভালবাসা দিতে জানে, আর কিছুই জানে না। মহাপুরুষ অর্জ্জুনও কৃষ্ণকে সখা বলিয়া অপরাধ হইয়াছে বলিয়া নিজ অপরাধ ক্ষালনের প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গোপশিশুরা অবিমিশ্র সখ্যরসে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নাই। ইহাকেই বলে "কেবলা রতি" এবং তাহা বৃন্দাবনেই সম্ভব হইয়াছিল। যশোদার বাৎসল্যেও এইরূপ নির্ম্মল ও পবিত্র স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার ভিতরও কোনও প্রকার সঙ্কোচের বাধা-বিঘ্ন নাই। যশোমতী গোপালকে কেবল স্নেহ দিতে চান—সেই স্নেহরসে তাঁহার গোপালকে আপ্লুত করিয়াই তিনি তৃপ্ত। ইহাতে কেবল বাৎসল্য-রতি। এইরূপ অবিমিশ্র ভালবাসা ভগবান্‌কে উল্লসিত করিতে পারে, বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস তাহাই বুঝাইয়াছেন। তিনি আনন্দময় ভক্তিময় হৃদয়ের মধুর আবেগে এই সকল বিভিন্ন রসের চিত্র আঁকিয়া ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিয়াছেন—বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রকে ভাবোর্ব্বর করিয়া—বহুফল-শালী করিয়া, আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদাবলী ভাব-সর্ব্বস্ব ভাবের সার মাত্র নহে; ইহারা প্রেম-পুলকিতচিত্ত ভক্তের ভগবৎপদে সচন্দন-তুলসীস্বরূপ, অশ্রুসিক্ত-নির্ম্মাল্য-স্বরূপ, স্নিগ্ধ ও কোমল, সরল ও পবিত্র। যিনি যে ভাবেই ইহাদের গ্রহণ করুন, ইহারা কাহাকেও বঞ্চিত করিবে না; ভক্ত ইহাদিগের কাছ হইতে ভক্তি ভিক্ষা লইবেন, রসিক ইহাদিগকে রসের আকর বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ভাবুক ইহা-দিগকে ভাবপরিপোষক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ জ্ঞানদাসের পদাবলী নির্দ্দোষ না হইলেও, বহুগুণসম্পন্ন; সে বিষয়ে নিতান্ত পরীবাদপ্রিয় সমালোচক ভিন্ন আর সকলেই স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

লৌকিক অংশ গাথামূলক

এক্ষণে বিচার্য্য যে, উক্ত বংশাবলী প্রামাণিক কি না। ইহাতে কোন অলৌকিকতা নাই। ইহাও যে গাথামূলক এবং কবির স্বকপোল-কল্পিত নহে, তাহা ৯৫ অধ্যায় পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তংসুর ও দুষ্মন্তের ও শান্তনুর উপাখ্যানে প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তংসুর উপাখ্যানে যে অলৌকিক 'ব্যাপার অর্থাৎ সরস্বতীর তংসুকে পতিত্বে বরণ, তাহা বিশ্বাস না করিলেও, এইরূপ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় যে, সরস্বতী-তীরে দ্বাদশবার্ষিক-যজ্ঞফলে তংসু সরস্বতীর বরে সরস্বতীর অংশভূতা সরস্বতী নাম্নী কোন পত্নী লাভ করেন। মহাভারতে দুষ্মন্তোপাখ্যানে দুর্ব্বাসা নাই। তাঁহার অভিসম্পাতবশতঃ দুষ্মন্তের স্মৃতিলোপ ও অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পুনঃ-স্মৃতির কথাও নাই। ইন্দ্রের সাহায্য জন্য দুষ্মন্তের স্বর্গে গমনও মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। কালিদাস ঐ সমস্ত অলৌকিকতা কতক পদ্মপুরাণ ও কতক স্বীয় কল্পনা হইতে পাইয়াছেন। মহাভারতে অলৌকিকতার মধ্যে এই মাত্র আছে যে, যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পরিণীতা জানিয়াও, লোকলজ্জার ভয়ে স্বীকার করেন নাই, তখন দৈববাণী হয়—

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাত স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত! মাবমংস্থা শকুন্তলাম্॥
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহঃ শকুন্তলা॥

মাতা ভস্ত্রা বা চর্ম্মপুটক স্বরূপ। পুত্র পিতারই সম্পত্তি। যাহার ঔরসে যার জন্ম, সেই তাহার। হে দুষ্মন্ত! পুত্রকে ভরণ কর, শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না। হে নরদেব! রেতসোৎপন্ন পুত্র যমগৃহ হইতে (পিতৃগণকে) উদ্ধার করে, তুমিই এই গর্ভের ধাতা। শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছেন।

ঐ দৈববাণীর পর দুষ্মন্ত সভাসদ্গণকে বলিলেন যে, দেবগণ যাহা বলিলেন, আপনারা শুনিলেন ত? শকুন্তলা যথার্থই আমার পত্নী, ভরত আমার বীজোৎপন্ন। এক্ষণে আপনারা অনুমোদন করিলে, আমি শকুন্তলাকে লইতে পারি। তাঁহারা একবাক্যে অনুমোদন করায় দুষ্মন্ত পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। এই আখ্যানে দুষ্মন্ত রামচন্দ্রের ন্যায় যে প্রজারঞ্জক, তাহা বুঝায়। যদি আকাশবাণীতে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে রাজা যে প্রজাগণের অনুমোদন লইয়া গোপনে বিবাহিতা পত্নীকে গ্রহণ করেন, ইহাই দৈববাণীর ব্যাখ্যা করিতে পারেন। সুতরাং অলৌকিকতা প্রযুক্ত ঐ বংশাবলী অবিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না।

ঐ বংশাবলী প্রক্ষিপ্ত কি না?

কিন্তু ঐ বংশাবলী গ্রহণে দুইটী আপত্তি হইতে পারে। একটী এই যে, ঐ বংশাবলী মহাভারতের বঙ্গীয় সংস্করণগুলিতেই দেখা যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্য পুস্তিকাবলম্বনে কৃত নির্ণয়-সাগর প্রেসের সংস্করণে নাই। বঙ্গীয় সংস্করণগুলির ৯৫ অধ্যায়ই বোম্বাইএর সংস্করণে নাই। সুতরাং উহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি কোন বঙ্গীয় মহারথের সুচতুর রচনা ও পরে প্রক্ষিপ্ত, ইহা বোধ হয় কোন মহাত্মা বলিবেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বোম্বাই সংস্করণের পাঠ সমীচিন নহে। জনমেজয় স্বীয় বংশের আমূল পরিচয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা ঐ সংস্করণেই প্রকাশ। যযাতির উপাখ্যান সমাপ্ত হইলে উক্ত পুস্তকে জনমেজয়ের মুখে এই দুই শ্লোক দেওয়া আছে—

পুত্রং যযাতেঃ প্রব্রূহি পূরুং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
আনুপূর্ব্ব্যেণ যে চান্যে পুরোর্ব্বংশবিবর্দ্ধনাঃ॥
বিস্তরেণ পুনর্ব্রূহি দৌষ্মন্তের্জনমেজয়াৎ।
সংবভূব যথা রাজা ভরতো দ্বিজসত্তম॥

যযাতির পুত্র ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য পূরুর বিষয় ও অপর যে সকল পূরুর বংশধর জন্মেন, তাঁহাদের বিষয় বিশদরূপে বলুন। আরও হে দ্বিজবর! দুষ্মন্ত হইতে রাজা ভরত যেরূপে জন্মলাভ করেন, তাহাও সবিস্তর বলুন।

এই প্রশ্নের উত্তরে পূরু হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত অখণ্ড বংশধারাই দেওয়া উচিত। কিন্তু বোম্বাই সংস্করণে যে বংশাবলী আছে, তাহা খণ্ডিত। উহাতে কেবল প্রসিদ্ধ পুরুষগণেরই উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় সংস্করণে যে অগ্রে ৯৪ অধ্যায়ে প্রথিত বংশধরগণের উল্লেখ করিয়া, ৯৫ অধ্যায়ে অখণ্ড বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত।

মহাভারতের সহিত পুরাণের বিসম্বাদ ও সামঞ্জস্য

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ের বংশাবলী স্বীকারে দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ঐ সম্বন্ধে মহাভারতের সহিত পুরাণের বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়। সেই বিসম্বাদ দেখাইবার জন্য উভয় বংশাবলীই দেওয়া গেল।

মহাভারতের বংশাবলী।	বিষ্ণুপুরাণের বংশাবলী।
১। পূরু	১। পূরু
২। জনমেজয়	২। জনমেজয়
৩। প্রাচিন্বান্	৩। প্রাচিন্বান্
৪। সংযাতি	৪। প্রবীর
৫। অহংযাতি	৫। মনস্যু
৬। সার্ব্বভৌম	৬। অভয়দ
৭। জয়সেন	৭। সুদ্যুম্ন
৮। অবাচীন	৮। বহুগব
৯। অরিহ	৯। সংযাতি
১০। মহাভৌম	১০। অহংযাতি
১১। অযুতনায়ী	১১। রৌদ্রাশ্ব
১২। অক্রোধন	১২। ঋক্ষেয়ু
১৩। দেবাতিথি	১৩। রন্তিনার
১৪। অরিহ	১৪। তংসু
১৫। ঋক্ষ	১৫। ঈলিন
১৬। মতিনার	১৬। দুষ্মন্ত
১৭। তংসু	১৭। ভরত
১৮। ঈলিন	১৮। বিতথ
১৯। দুষ্মন্ত	১৯। ভবন্মনু
২০। ভরত	২০। বৃহৎক্ষেত্র
২১। ভূমন্যু	২১। সুহোত্র
২২। সুহোত্র	২২। হস্তী
২৩। হস্তী	২৩। অজমীঢ়
২৪। বিকুণ্ঠন	২৪। ঋক্ষ
২৫। অজমীঢ়	২৫। সংবরণ
২৬। ঋক্ষ	২৬। কুরু
২৭। সংবরণ	২৭। জহ্নু
২৮। কুরু	২৮। সুরথ
২৯। বিদূরথ	২৯। বিদূরথ
৩০। অনশ্বা	৩০। সার্ব্বভৌম
৩১। পরীক্ষিৎ	৩১। জয়সেন
৩২। ভীমসেন	৩২। আরাবী
৩৩। প্রতিশ্রবাঃ	৩৩। অযুতায়ু
৩৪। প্রতীপ	৩৪। অক্রোধন
৩৫। শান্তনু	৩৫। দেবাতিথি
	৩৬। ঋক্ষ
	৩৭। ভীমসেন
	৩৮। দিলীপ
	৩৯। প্রতীপ
	৪০। শান্তনু

বিষ্ণুপুরাণের উপরোক্ত বংশাবলী সকল পুরাণেরই সম্মত। প্রভেদ এই পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, কচিৎ কোন কোন পুরুষ সম্বন্ধে এক নামের পরিবর্ত্তে অন্য নাম আছে। যথা আরাবীর পরিবর্ত্তে আরাধি—

পুরাণের বংশাবলী-মতে পূরু হইতে কুরু পর্য্যন্ত ২৬ পুরুষ, কিন্তু মহাভারতের বংশাবলী মতে ২৮ পুরুষ। পুরাণ-মতে কুরু হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত ১৫ পুরুষ, মহাভারত মতে ৮ পুরুষ। সুতরাং কুরুর অধস্তন পুরুষে যতদূর উভয়ের মধ্যে অনৈক্য, ততদূর ঊর্দ্ধতন পুরুষে নাই। এই অংশেই উভয়ের মধ্যে নিশ্চয় একটীতে ভ্রম আছে, বলিতে হইবে। মহাভারতে কে কোন্ বংশীয়াকে বিবাহ করিয়া কি পুত্র উৎপাদন করেন, ইহা বিশদভাবে লিখিত আছে। পুরাণে তাহা নাই। সুতরাং পুরাণেই লিপিকর-প্রমাদ থাকা সম্ভব। পুরাণের অংশে যে লিপিকর-প্রমাদ আছে, তাহা পুরাণ হইতে দেখা যায়। পুরাণ-মতে জরাসন্ধ কুরুর পুত্র সুধনু বা সুধন্বার বংশে এবং যুধিষ্ঠির কুরুর পুত্র জহ্নুর বংশে জাত। জরাসন্ধ ও যুধিষ্ঠির যে সমসাময়িক, তাহা পুরাণ এবং মহাভারত উভয়েই স্বীকার করেন। উভয়ের মতেই জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক হত হন এবং জরাসন্ধপুত্র সহদেব ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করেন ও নিহত হন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুষঙ্গ পাদে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

"সংগ্রামে ভারতে তস্মিন্ সহদেবো
নিপাতিতঃ॥"

সেই ভারত-সংগ্রামে (জারাসন্ধি) সহদেব নিহত হন। পুরাণে জরাসন্ধকে কুরু হইতে অষ্টম পুরুষ বলা হইয়াছে। যথা—কুরুর পুত্র সুধনু বা সুধন্বা, তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র

চ্যবন, তৎপুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর বসু, তৎপুত্র বৃহদ্রথ ও তৎপুত্র জরাসন্ধ। এক্ষণে বিচার করুন যে, কুরু হইতে জরাসন্ধ যদি অষ্টম পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সমসাময়িক যুধিষ্ঠির কুরু হইতে অষ্টাদশ পুরুষ হইতে পারেন কি না। সাত পুরুষের মধ্যে জ্যেষ্ঠের ধারা হইতে কনিষ্ঠের ধারা কখনই এত বৃদ্ধি পাইতে পারে না যে ১০ পুরুষের পার্থক্য হইয়া পড়ে। মহাভারতের বংশাবলীমতে কুরু হইতে যুধিষ্ঠির একাদশ পুরুষ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধস্তন অষ্টম পুরুষ কনিষ্ঠ ভ্রাতার একাদশ পুরুষের সমসাময়িক হইতে পারে। সুতরাং কুরুর অধস্তন বংশ সম্বন্ধে পুরাণের পরিচয়ে যে ভ্রান্তি আছে, ইহা পুরাণমতেই স্থির। অন্য দিক্ হইতেও দেখিতে গেলে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। উপরিচরবসুর রেত ভক্ষণে মৎস্যগর্ভে সত্যবতীর জন্ম। সেই সত্যবতীর কানীন পুত্র বেদব্যাস। ঐ সত্যবতী পরে শান্তনুর বৃদ্ধাবস্থার ভার্য্যা হন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য তাঁহার পুত্র। সুতরাং উপরিচর শান্তনুর পিতা প্রতীপের সমসাময়িক হন। মহাভারতের বংশাবলী স্বীকার করিলে তাহাই ঘটে; কারণ, কুরু হইতে প্রতীপ সপ্তম পুরুষ এবং পুরাণ-মতে কুরু হইতে উপরিচরবসু ষষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং পুরাণে যে কুরু হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত পঞ্চদশ পুরুষ ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে সপ্ত পুরুষ নিশ্চয়ই অধিক ধরা হইয়াছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সার্ব্বভৌম হইতে ঋক্ষ পর্য্যন্ত সপ্ত পুরুষ লিপিকরের দোষে কুরুর অধস্তন হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সপ্ত পুরুষই কুরুর ঊর্দ্ধতন হইবেন। কিন্তু কুরু হইতে মতিনার পর্য্যন্ত উঁহাদের স্থান নাই, কারণ, ঐ অংশে মহাভারতে ও পুরাণে কেবল বৃহৎক্ষেত্র ও বিতথ এই দুই পুরুষ ভিন্ন কোনও বিসম্বাদ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মতিনারের পূর্ব্বে ঐ সপ্ত পুরুষ যাইবেন। মহাভারতে তাই দেখা যায় যে, অহংযাতির পুত্র সার্ব্বভৌম ও পৌত্র জয়সেন। অতএব পুরাণের সার্ব্বভৌম ও জয়সেনকে পুরাণের অহংযাতির পরবর্ত্তী বলা যুক্তিযুক্ত। পুরাণের অযুতায়ু, অক্রোধন ও দেবাতিথি যে মহাভারতের অযুতনায়ী, অক্রোধন ও দেবাতিথি, এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। পুরাণের বংশাবলীতে উঁহাদের স্থান জয়সেনের পরই হওয়া উচিত। পুরাণের আরাবী বা আরাধি মহাভারতে অক্রোধসেনের পৌত্র অরিহ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পুরাণের ৩৬ নং ঋক্ষ যদি অবাচীন বা মহাভৌমের মধ্যে কেহ হন, তাহা হইলে সংযাতি হইতে দেবাতিথি পর্য্যন্ত মহাভারতের ও পুরাণের বংশাবলী মিল হয়। পুরাণের রন্তিনারই মহাভারতের মতিনার, এ বিষয় সন্দেহ নাই। রন্তিনারের পিতা ঋক্ষেয়ুই যে মতিনারের পিতা ঋক্ষ, ইহাও ঠিক। ঋক্ষেয়ুর পিতা রৌদ্রাশ্বই মহাভারতের মতিনারের পিতামহ অরিহ। ৯৪ অধ্যায়ে রৌদ্রাশ্বের নাম আছে, এই অধ্যায়েই ঐ ব্যক্তিরই অপর নাম অরিহ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এক নৃপতির দুই তিনটী করিয়া নাম পুরাণ ও তাম্রশাসনাদি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে দেখুন যে, সংযাতি হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত মহাভারতে বাকি রহিল অবাচীন, মহাভৌম, বিকুণ্ঠন,

অনশ্বা ও পরীক্ষিৎ পাঁচজন ; পুরাণেও বাকি রহিল পাঁচজন বিতথ, বৃহৎক্ষেত্র, জহ্নু, সুরথ ও ঋক্ষ। মোট সংযাতি হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত মহাভারতে ৩১ পুরুষ, পুরাণেও ৩১ পুরুষ। সুতরাং পুরাণের অবশিষ্ট ৫ জনকে মহাভারতের অবশিষ্ট ৫ জন স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে সংযাতি হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত কোন বিসম্বাদই রহিল না। সংযাতির উর্দ্ধতন পুরুষে যে পুরাণের সহিত বিরোধ, তাহাও লিপিকরপ্রমাদ-ঘটিত বটে। পুরু, জনমেজয় ও প্রাচীন্বান্ মহাভারতে এবং পুরাণে আছে। পুরাণে প্রবীর, মনস্যু, অভয়দ, সুদ্যুম্ন ও বহুগব এই ৫ পুরুষ অধিক আছে, মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ের বংশাবলীতে তাঁহাদের নাম নাই। কিন্তু পূর্ব্ব-অধ্যায়ে মহাভারতে প্রবীর, মনস্যু, ও তৎপুত্র অভয়ভানু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সুদ্যুম্নের উল্লেখ শান্তিপর্ব্বে পাওয়া যায়। সুতরাং ৯৫ অধ্যায়ে লিপিকরের প্রমাদবশতই উহাদের সম্বন্ধে যে পাঁচটী বাক্য ছিল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত, তাহার নিদর্শন মহাভারতের ৯৫ অধ্যায়েই আছে। ঐ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, অহংযাতি কৃতবীর্য্যের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করেন। পুরাণে দেখিতে পাই, কৃতবীর্য্য যদু হইতে দ্বাদশ পুরুষ ; যথা— ১। যদু, ২। সহস্রজিৎ ৩। শতজিৎ, ৪। হৈহয়, ৫। ধর্ম্মনেত্র, ৬। কুন্তি, ৭। সাহঞ্জি, ৮। মহিষ্মান, ৯। ভদ্রশ্রেণ্য, ১০। দুর্দম, ১১। ধনক ও ১২। কৃতবীর্য্য। পুরাণের এই বংশাবলী মহাভারতে ধারাবাহিক না থাকিলেও, হৈহয়গণের উল্লেখ আছে। কৃতবীর্য্য যে হৈহয়ের বংশধর, তাহা বহু স্থলে বলা হইয়াছে। মাহিষ্মতী যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী, তাহাও দেখা যায়। ঐ মাহিষ্মতী যে মহিষ্মান্ নৃপের নামে ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং পুরাণে কৃতবীর্য্যের বংশাবলী মহাভারতের স্বীকৃত বলিতে পারা যায়। মহাভারতের ৯৫ অধ্যায়ের বংশাবলী-মতে অহংযাতি যদুর ভ্রাতা পুরু হইতে পঞ্চম পুরুষ হন। তিনি কখন যদুর দ্বাদশ অধস্তন পুরুষের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না। প্রবীর, মনস্যু প্রভৃতি পঞ্চম পুরুষ অহংযাতির উর্দ্ধতন হইলে, অহংযাতি পুরুর দশম পুরুষ হন এবং যদুর দ্বাদশ অধস্তন পুরুষের কন্যার স্বামী হইতে পারেন। সুতরাং মহাভারতে ও পুরাণে বিরোধ—বিরোধাভাস মাত্র, যথার্থ বিরোধ নহে।

মহাভারতের বংশাবলীর প্রামাণিকতা

মহাভারতের বংশাবলী যে প্রামাণিক, তাহা চালুক্যবংশোদ্ভূত রাজরাজা পরনামা শ্রীবিষ্ণু-বধন মহীপতির দানপত্র ও উক্ত রাজরাজের অনুজ চালুক্যবীর চোড় মহীপতির দানপত্র প্রভৃতি তাম্রশাসন হইতে প্রকাশ পায়। প্রথম দানপত্র Indian Antiquaryর ১৪ ভাগে ৫০—৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, রাজরাজ ৯৪৪ শকে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ও ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত চীড়মার্য্যকে চন্দ্রগ্রহণে ঐ দানপত্র দ্বারা কোরুমেল্লি নামক গ্রাম দান করেন। দ্বিতীয় দানপত্র খানি South Indian Inscriptionএর ১ম ভাগে ৫৩—৫৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। ঐখানির কাল ১০০১ শক। ঐ দুইখানিতে চালুক্যবংশ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন বলা আছে এবং ব্রহ্মা হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে—

ব্রহ্মা
|
অত্রি
|
সোম
|
বুধ
|
পুরূরবা
|
আয়ু
|
নহুষ
|
যযাতি
|
পুরু
|
জনমেজয়
|
প্রাচীন
|
সৈন্যযাতি
|
হয়পতি
|
সার্ব্বভৌম
|
জনমেজয়
|
মহাভৌম
|
ঐশানক
|
ক্রোধানন
|
দেবকি
|
ঋভুক
|
ঋক্ষক
|
মতিবর
|
কাত্যায়ন
|
নীল
|
দুষ্মন্ত
|
ভরত
|
ভূমন্যু
|
হস্তী
|
বিরোচন
|
অজমীঢ়
|
সংবরণ
|
সুধন্বা
|
পরীক্ষিৎ
|
ভীমসেন
|
প্রদীপন
|
শান্তনু

এই বংশাবলী যে মহাভারতের বংশাবলী অবলম্বনে লিখিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশ হইতে পারে না। প্রাচীনই প্রাচিন্বান্, সৈন্যযাতিই সংযাতি, হয়পতিই অহংযাতি, সার্ব্বভৌমস্থত জনমেজয়ই জয়সেন। তাম্র-শাসনে জয়সেনের পর অবাচীন ও অরিহ এই দুই পুরুষ ছাড়িয়া মহাভৌমের নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐশানকই যে অযুতনায়ী, দেবকিই দেবাতিথি, ঋভুকই অরিহ, মতি-বরই মতিনার, কাত্যায়নই ঈলিন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভুমন্যুর পর সুহোত্রকে ছাড়িয়া তাম্রশাসনে হস্তীর নাম উল্লেখ করিয়া বিকুণ্ঠনের নামান্তর বিরোচন দেওয়া হইয়াছে। পরে তাম্রশাসন-লেখক কুরু ও বিদূরথকে ছাড়িয়া সুধন্বার নাম দিয়াছেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে যে দুই এক পুরুষ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানাইবার জন্যই লেখক দানপত্রদ্বয়ে অমুকের পুত্র অমুক না বলিয়া অমুকের পর অমুক বলিয়াছেন। দান-পত্রের বংশাবলী হইতে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, মহাভারতের বংশাবলী আধুনিক কোন বঙ্গীয় পণ্ডিত আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য প্রক্ষিপ্ত করেন নাই; উহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশ বলিয়া খ্যাত চালুক্যবংশীয়গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ কারণ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, গাথা ও লেখ্যে রক্ষিত প্রাচীন লৌকিকাংশের ইতিবৃত্ত অবিশ্বাস করা দুঃসাহসমাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

সালিশ-নিষ্পত্তি

পবন মুখুয্যের খিড়কীরাস্তার ধার এবং মধু মোড়লের পুকুরের পাড়, এই দো-সীমানার উপর একটা আমগাছ লইয়া আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিবাদ চলিতেছে। লোকে বলে, গাছটার মূল্যের বিশ গুণেরও অধিক টাকা এ বিবাদে ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

যে বারে প্রথম এ গাছে আম পাকিল—পবন মুখুয্যে তার কৃষাণ লইয়া আম পাড়িতে গেল। গোটাকতক আম পাড়ার পর মধু মোড়ল খবর পাইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল এবং অভিধানবহির্ভূত ভাষায় ব্রাহ্মণের কৃষাণকে নামাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে ভীষণ অভি-সম্পাত দিতে আরম্ভ করিল এবং উপবীত ছিঁড়িবার ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু অভিশাপের মাত্রা যখন ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল, মধু মোড়ল তখন ব্রহ্মশাপের জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া তাহার সুদীর্ঘ বংশদণ্ড আন্দোলিত করিয়া যাহা বলিল, তাহাতে ব্রাহ্মণতনয় সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা সদ্‌যুক্তি মনে করিল না। মুক্তকচ্ছ পবন মুখুয্যে পবনবেগে একেবারে জমী-দারের কাছারীতে গোমস্তার নিকট উপস্থিত হইল।

গোমস্তা হলধর রায় ওরফে হলা নাপিত তখন তামাক টানিতে টানিতে জমা-ওয়াশীল-বাকীর কাগজ লিখিতেছিল; এবং মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া উপরি-পাওনার উপায় ভাবিতেছিল। এমন সময় পবন মুখুয্যেকে এ ভাবে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া ভবিষ্যৎ আয়ের গন্ধ পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল, এবং সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—"দাদাঠাকুর, পেন্নাম হই" বলিয়া আভূমিপ্রণত হইল।

হলা নাপিত অনেক 'মোসী' মারিয়া তবে চিকিৎসক হইয়াছে। যেদিন পাঠশালা ছাড়িয়া জমীদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া পুরস্কারস্বরূপ সে জমাসেরেস্তার মোহরের পদ পাইল, সেইদিন হইতে তাহার কপাল ফিরিয়াছে। ক্রমে জাতিসুলভ চতুরতার গুণে সে আজ তিনখানা গাঁয়ের গোমস্তা—কেহ কেহ তাহাকে 'নায়েব ম'শায়' বলিয়া থাকে। হলা নাপিত আজ হলধর রায় এবং সে দেশের সমস্ত মামলা-মোকর্দ্দমার পরামর্শ-দাতা এবং তদ্বিরকারক।

পবন মুখুয্যে বহুক্ষণে শ্বাসকষ্ট শান্ত করিয়া যখন সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল, তখন হলধর বলিল—"তার আর ভয় কি, দাদাঠাকুর? আমি এখনি এর ব্যবস্থা করচি। দশ টাকা খরচ হবে, তা ব'লে ত' কেউ আর নিজের হক্ ছেড়ে দেয় না! দেখে নেবো কেমন বেটা চাষা!" তার পর নানাবিধ শলা-পরামর্শ করিয়া কতকটা শান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিল।

সন্ধ্যার পর মধু মোড়লও গোমস্তা মহা-শয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যথোপযুক্ত উপ-দেশ পাইল। পরদিন পবন মুখুয্যে মহ-কুমায় গিয়া, জোর করিয়া ফল কাড়িয়া লওয়া ও মারপিটের ভয় দেখান ইত্যাদি অজুহাতে

ফৌজদারি কোর্টে দরখাস্ত পেশ করিল। মধু মোড়লের পক্ষ হইতেও একজন মোক্তার ফল চুরির জন্য পবন মুখুয্যের নামে নালিশ দায়ের করিল। গোমস্তা হলধর রায়ও সেদিন 'দৈবক্রমে' মহকুমায় উপস্থিত—তার না কি মুন্সেফকোর্টে কি একটা কাজ ছিল।

এমনি করিয়া মোকর্দ্দমা বাধিল। পবন মুখুয্যে একে বৃদ্ধ, তায় কালা; কাজেই একটু জেদী। তার উপর একটা চাষা তাকে এমনতর অপমান করিয়াছে; এর প্রতীকার না করিতে পারিলে সে আর গ্রামে বাস করিবে কোন্ মুখে? মধু মোড়ল চাষার গোঁয়ার, তার উপর দু'পয়সার সংস্থান আছে;—সে কি একটা মোকর্দ্দমা লড়িতে ভয় পায়? সর্ব্বোপরি ক্ষৌরকার-নন্দন উভয়েরই হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতা। এহেন মণিকাঞ্চন-সংযোগে উভয় পক্ষের ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বেশ জেদের সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

ডেপুটিবাবু উভয়পক্ষের মোক্তারের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; এবং কেহই যাহাতে শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে, সেজন্য উভয়পক্ষকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া দেওয়ানী আদালতে আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার আদেশ দিলেন। এদিকে দারোগার উপর হুকুম হইল—যে পর্য্যন্ত না দেওয়ানী আদালতে স্বত্বের মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হয়, ততদিন দারোগা গাছের ফল পাড়াইয়া নিজের হেফাজাতে রাখে।

সে আজ পাঁচ বছরের কথা। কিন্তু কোন পক্ষই এ পর্য্যন্ত দেওয়ানীতে স্বত্বের মোকর্দ্দমা রুজু করে নাই; কেননা, যে নালিশ করিবে, প্রমাণের ভার তার উপর। এদিকে দারোগা বাবু আদালতের হুকুম মত চৌকিদার দিয়া আম পাড়াইয়া বিশেষ হেফাজাতে রাখিলেন—সেবারকার মত বিবাদ মিটিল। পর বৎসর আবার আম পাকিবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের দরখাস্ত পড়িল। আবার পূর্ব্বের মতই হুকুম হইল। এমনি করিয়া প্রতি বৎসরই মোকর্দ্দমা দায়ের হইবামাত্র শান্তিভঙ্গভয়ে দারোগা বাবু গাছের আমগুলি পাড়াইয়া লইতেন—কেননা, স্বত্ব সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ত কাহাকেও তাহা দেওয়া যায় না। আর তিনি গভর্ণমেণ্টের নিমকহালাল কর্ম্মচারী হইয়া কেমন করিয়া শান্তিভঙ্গের প্রশ্রয় দিবেন? ফলগুলি কাজেই তাঁহাকেই বাধ্য হইয়া সাম্লাইতে হইত। আম-পাড়া হইয়া গেলে উভয় পক্ষ শান্তভাব ধারণ করিত; এবং বৎসরান্তে আবার যথাসময়ে যথারীতি বিবাদ সুরু হইত। এমনি করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিল। বিবাদীদের স্বত্ব স্থির হউক বা না হউক ক্রমে এ গাছের আমের উপর দারোগা বাবুর 'দখলীস্বত্ব' পাকা হইবার উপক্রম হইল।

শেষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধৈর্য্য হারাইয়া দেওয়ানীতে নালিশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গোমস্তার পরামর্শে দারোগা বাবুর নিঃস্বার্থ উপদেশ সব ভাসিয়া গেল। মুখুয্যে এবার কাহারও কথা না শুনিয়া মুন্সেফী আদালতের আশ্রয় লইল। এবার পাকা রকমের মোকর্দ্দমা চলিবার সূত্রপাত হইল।

বিবাদের হেতু ও বিবরণ শুনিয়া মুন্সেফ বাবু সালিশ-নিষ্পত্তির উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রথমে উভয় পক্ষকে রাজী করা শক্ত

হইল। অবশেষে মুন্সেফ বাবুর তাড়নায় এবং প্রতিবেশিগণের পরামর্শে উভয়ে তাহাতে স্বীকৃত হইল এবং আদালতের নির্ব্বাচনে এক জন কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। হুকুম হইল—তিনি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবেন, উভয় পক্ষ তাঁহার ফিস্ ও পাথেয়াদি বহন করিবে।

এই হুকুমের সপ্তাহ পরে একদিন পল্লী-বাসী বালক-বালিকা এবং বধূবৃন্দের সবিশেষ কৌতূহল উৎপাদন করিয়া উকীল বাবুর পাল্কী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। নিরপেক্ষ উকীল বাবুর বিবাদীদের কাহারও গৃহে থাকা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, এবং গ্রামে এক পবন মুখুয্যে ভিন্ন আর ব্রাহ্মণ নাই,—অগত্যা তিনি সকলের বিশেষ অনুরোধেই মুখুয্যে মহাশয়ের গৃহে থাকাই স্থির করিলেন। দেখিতে দেখিতে পবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ লোকে ভরিয়া গেল এবং গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে উকীল বাবুর চোগা চাপকান ও স্বর্ণচেনশোভিত বরবপু এবং চশমাবিমণ্ডিত গম্ভীর মুখমণ্ডল নির্নিমেষ-নয়নে দেখিতে লাগিল।

এদিকে মধু মণ্ডল ছুটিয়া গোমস্তা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত। উকীল বাবু পবন মুখুয্যের গৃহে অধিষ্ঠান করায়, তাহার সব আশা ভরসা উড়িয়া গিয়াছে; তাই সে হলধরের নিকট কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে আসিয়াছে। হলধর গম্ভীরভাবে বলিল—"এখন কিছু বলা যায় না। আমি বৈকালে দেখা করব; তার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।" মধু মণ্ডল চিন্তিত হইয়া গৃহে ফিরিল।

পরদিন প্রাতে উকীল বাবু মহাধুমধামে গ্রামের মাতব্বরদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে সরেজমিনে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। রশি ধরিয়া নানাদিক্ হইতে মাপ হইতে লাগিল; উকীল বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি তাঁর নিরপেক্ষতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন কিছুই স্থির হইল না। কেননা, একবার মাপিয়া লাইন ফেলিতে গিয়া আম গাছটা এবং মুখুয্যের বাড়ীর আধখানা মধু মণ্ডলের পুকুরের সামিল হইল; দ্বিতীয় বারে সেটা এবং তৎসঙ্গে আরও দু পাঁচটা গাছ, যাহা মধু চিরকাল নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতেছে, সে গুলাও পবন মুখুয্যের জমীর মধ্যে পড়িল। কাজেই সেদিনকার মত কাজ বন্ধ রহিল।

মধ্যস্থের অটল নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া গ্রামবাসীরা যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল, বিবাদীরা তেম্‌নি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। গোমস্তা হলধরের পরামর্শে সেই রাত্রে আহারাদির পর পবন মুখুয্যে মরিয়া হইয়া উকীল বাবুর নিকট একটা নীতিবিগর্হিত প্রস্তাব করিয়া বসিল। ফলে বাবুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল; তিনি ভদ্রভাষায় ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন। বিপরীত ফলের ভয়ে ব্রাহ্মণ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় দিন আবার মাপ আরম্ভ হইল। সেদিনও কি একটা গোল বাধিয়া গেল—কিছুই স্থির হইল না। সন্ধ্যার সময় উকীল বাবুর প্রিয় ভৃত্য ফকির চাঁদ আসিয়া খবর দিল—উকীল বাবুর বিবাহের দরুণ ১০০৲ টাকা মূল্যের অঙ্গুরীয়টি আমতলায় হারাইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ২০। ২৫ জন

লোক খিড়কীর রাস্তা হইতে পুকুরের পাড় সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু কোনোখানে সে হারানিধির দর্শন পাওয়া গেল না। সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং নানাপ্রকারে আন্তরিক দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল।

মধু মণ্ডলও এই আকস্মিক ঘটনায় চিন্তিত হইল, কিন্তু সে চিন্তা অন্য প্রকারের। কই, কাল বা আজ প্রাতে সে ত উকীল বাবুর হাতে এই বহুমুল্য আংটিটি দেখে নাই। সে তখন তাহার সচিবপ্রবর হলধরকে এই সন্দেহের কথা জানাইল। হলধর, ভাবিল,—কথাটা ত ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে তার উর্ব্বর মস্তিষ্কে একটা অভিনব প্ল্যানের উদয় হইল। প্রাতেই হলধর নিজের "বুদ্ধি" ও মধু মণ্ডলের "কড়ি" লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। সেখানে না কি হাইকোর্টে জমীদার বাবুদের একটা মোকর্দ্দমার তদ্বির আবশ্যক। রওনা হইবার পূর্ব্বে হলধর কমিশন বাবুর শ্রীচরণকমল হইতে বিদায় লওয়ার উপলক্ষে তাঁর শ্রীকরপল্লব পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভুলিল না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মধু মণ্ডলের রাখাল পুকুরের 'গাবায়' উকীল বাবুর আংটিটি কুড়াইয়া পাইল এবং মধুমণ্ডল আসিয়া উকীল বাবুকে তাহা সমর্পণ করিল। উকীল বাবু তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া হারাণো আংটি হাতে পরিলেন।

তারপর সালিশের রিপোর্টে এবং মুন্সেফ বাবুর বিচারে আম গাছটি মধু মণ্ডলের সম্পত্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইল। এতদিনের বিবাদের এইবার নিষ্পত্তি হইল দেখিয়া গ্রামের লোক সকলেই সুখী হইল। মোড়লদের দাওয়ায় এবং বারোয়ারীতলায় "কমিশন" বাবুর কথা লইয়া প্রায়ই আন্দোলন হইত, এবং গ্রামবৃদ্ধগণ তাঁহার নিরপেক্ষতার তারিফ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিত—"এমন না হ'লে আর জজে সালিশি কর্ত্তে পাঠায়!" মধু মোড়ল কিন্তু এ আলোচনায় যোগ দিত না; সে গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে টানিতে ভাবিত—'একটা আম গাছের জন্যে পাঁচ কুড়ি টাকা!'

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধে (সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩১৮) বলিয়াছিলাম, "বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া এখন এক-রূপ ঝকমারি হইয়া উঠিয়াছে", সে ঝকমারি ত আছেই, তাহার উপর আমি এইবার ঝক্-মারির মাসুল দিতে বসিলাম।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে এইটুকু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, "যিনি এক সময়ে বাঙ্গালাগদ্যের সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেই ঐশ্বর্য্যময় গদ্যের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলা করিয়া-ছিলেন। * * * বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা ত ছিলই না,

গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যও তিনি তখন কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজি কবিতা, সেক্সপিয়র হইতে বায়রণ, তিনি বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা গান কীর্ত্তনের কথা এখন বলিব না।"

সেবার বলি নাই, এবার বলিব—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। এমন 'রাশভারি' লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। অনেক দিন, তাঁহাকে একটি প্রণাম করা পর্য্যন্ত আমার তাঁহার সহিত আলাপের সীমা, তবে আলাপের দিন একাদশী হইলেই বড় গোলে পড়িতাম। সেইদিন, অতি যত্নে, অতি আদরে, আমার উপর পুত্রাধিক স্নেহে, তিনি কাছে বসিয়া আমাকে 'জল' খাওয়াইতেন। 'এটি খাও,' 'ওটি খাও' করিতেন, ফলসন্দেশের স্বাদুতা বর্ণন করিতেন। নিজে রসগ্রাহী লোক ছিলেন, অন্যকে রসগ্রহণের পদ্ধতি-প্রকরণ দেখাইয়া দিতে আনন্দ বোধ করিতেন। একদিন ঐরূপ একাদশীতে আমি রসগোল্লা লইতে ইতস্তত করিতেছিলাম, তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, "এ কি তোমার ও পারের ফিরিঙ্গি-মুলুকের রসগোল্লা পেয়েছ, যে, সুজীর বাঁধন দিবে?—এ পারে সে সকল হবার যো নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।" এই যে 'রাশভারি' লোকের রহস্যে রসাস্বাদ—সেটি বড় অপূর্ব্ব পদার্থ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রস-পরিগ্রহ না কি সকল বিষয়েই সমান ছিল। কেবল খাইতে খাওয়াইতে নয়। তিনি সঙ্গীত-সাহিত্যের রস বিশেষ উপভোগ করিতে পারিতেন, এবং স্বয়ং বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া নিজ ভবনে সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া আপামর সাধারণকে রস উপভোগের সুচারু সুবিধা দান করিতেন। অতি বালককাল হইতেই বঙ্কিম বাবু উৎকৃষ্ট যাত্রা গান, কবি, কীর্ত্তন, কথকতার রস উপভোগ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। অনেকের অদৃষ্টে সেরূপ সুবিধা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না।

আমাদের ওপারের রায় বাহাদুরদের বাড়ী ছিল যাত্রা-গান-মহোৎসবের মিলনমন্দির। এতদঞ্চলের একরূপ টাউন হল্। পালিপার্ব্বণ ত ফাঁক্ যাবেই না, অন্য সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে, কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির উৎকৃষ্ট কুম্ভকার শশী পাল ঠাকুর গড়িবে, উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চ কণ্ঠে মা মা রবের মোহিনী শক্তি। অথবা নীলকমলের প্রসিদ্ধ রামায়ণ গান। যাত্রা অঙ্গে বদন অধিকারীর তুক্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর 'কালীয়দমন' গান। দাশরথী রায়ের কথার ছটা-ঘটা * সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সুরে তালে মাখামাখি গান; ফরাসডাঙ্গার জগৎমনমোহিনীর ঢপ্; বর্দ্ধমানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্ত্তন; মধুকানের গান; এইরূপ ছোট বড় মাঝারি

---

* দাশরথি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু আমায় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন;—"The fellow was master of the colloquial Bengalee."

কতরূপ গান প্রায়ই হইত। এই ধরণীর কথকতা ক্রমাগত তিন মাস চলিয়াছে। এ সকলের আর কত পরিচয় দিব? বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থসমূহ-মধ্যে কীর্ত্তনের ও সহজ গানের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সংগ্রহ ছিল বিস্তর, তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার আর একরূপ উপকরণ, তাঁহাদের ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজী ও তাঁহার নিত্য সেবা। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 'বঙ্কিম জীবনী' * হইতে সেই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে একদা অপরাহ্লে জনৈক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া 'অর্জ্জুনা'র তটে বটচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধে একটি দীর্ঘ বিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর "রাধাবল্লভজীউ" ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুছায়ায় উপবেশন করিলেন।

বিশ্রামান্তে যখন সন্ন্যাসী ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর তুলিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থ্যে কুলাইল না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, ঠাকুরের সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন (সেই গ্রামের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি) রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুর-সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্মুহূর্ত্তে স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী অর্জ্জুনার সন্নিকটে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রঘুদেবকে প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক রাধাবল্লভজীউ বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র। বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-বাটী, রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দানপ্রাপ্ত ভূমির উপর দণ্ডায়মান।" * * * তাহার কয়েক বৎসর পরে ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রে লিখিত ছিল:—

বাণ সপ্ত কলা নাকে রঘুদেবেন মন্দিরম্।

রঘুদেবের দৌহিত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। রামহরি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের এবং অতিথি-অভ্যাগত-সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, এখনও অনেকটা আছে। সেই সুন্দর বিগ্রহ ও তাঁহার ঐকান্তিক সেবা সন্দর্শনে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন।

কেবল কৃষ্ণভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস তিনি আপনার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে ত সকলেই জানেন;— আমি বলিতেছি—এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অলৌকিকত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। এই সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে একটু জেরার ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি প্রথমে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহাস্যবদনে,

* স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

বলিতে থাকেন "তোমাদের চুঁচুড়ার একটি সুবর্ণ-বণিক-মহিলা, বিশ ত্রিশ জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এ পারে আমাদের এই ঠাকুর দেখিতে আসেন।" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল, বলিতে লাগিলেন "কিন্তু সকলেই ঠাকুর দেখিল, তিনি দেখিতে পাইলেন না; আমরা বাড়ীতে ছিলাম, সকলেই তাঁহার কাছে গেলাম, সমস্ত লোক জন সরাইয়া দিয়া, তাঁহার ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা করাইয়া দিলাম, অভাগিনী কিছুতেই ঠাকুরকে দেখিতে পাইল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল"—বঙ্কিম বাবুও কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলা হইল না। তাঁহার বিগ্রহ-ভক্তি দেখিয়া আমিও অভিভূত হইলাম।

বালক-কাল হইতেই বঙ্কিমবাবু ভক্তি-চর্চ্চায় অভ্যস্ত হন। কৃষ্ণচরিত্রে সেই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের হিন্দু মতে মানুষে মানুষে তারতম্য হয়—ত্রিবিধ কারণে;—(১) সংস্কারে, (২) শিক্ষায়, (৩) সাধনায়।

এই সংস্কার অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের প্রভাব য়ুরোপ আমেরিকা বুঝেন না, কাজেই মানেন না। এটি তাঁহাদের আংশিক বর্ব্বরতার পূর্ণ পরিচয়। আমাদের দেশেও যে কোন কোন নব্য সম্প্রদায় এই সংস্কার স্বীকার করেন না, সেটা কেবল অনুকরণের বিষময় ফল মাত্র। এই যে দুই সহোদরের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনায় বিষম বৈষম্য দেখা যায়, ইহার কি কোন কারণ নাই? যদি শিক্ষাবৈষম্যে ওরূপ বৈষম্য ঘটে,—তাই বা কেমন করিয়া বলি? সর্ব্ব শিক্ষার অগ্রে বালক বঙ্কিম, একদিনেই পঞ্চাশৎ বর্ণ লিখিতে বা পড়িতে পারেন, এটা কি কেবল genius কথা দ্বারাই বুঝা যাইবে? না জিনিয়স্ শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ করিয়া বুঝিতে হইবে? Genius সেই 'জন' ধাতু, আর পূর্ব্বজন্মজাত সংস্কারও সেই 'জন' ধাতু। পূর্ব্বজন্মের কথা য়ুরোপের শিক্ষাদাত্রী গ্রীস্‌-ভূমিতে স্বীকৃত ছিল, খৃষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের ঐটি সনাতন বিশ্বাস, আমরা বিলাতের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া সেই বিশ্বাস চাপিয়া রাখিব কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের genius বা প্রতিভা ত ছিলই, শিক্ষাও বিশেষভাবে হইয়াছিল। এক শিক্ষা প্রকৃতির নিকট, উহার কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি—"তিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।" আর একরূপ সমাজের বা মানবের নিকট হইতে; তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিতা শিক্ষার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন যাত্রা-গান-কীর্ত্তনাদি শুনিবার তাঁহার যে অত্যধিক সুবিধা হইয়াছিল, সেই কথাই বলিলাম। বঙ্কিম বাবুর পিতার এই সকল বিষয়ে রসজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে ছিল, আর রস উপভোগের জন্য প্রভূত ব্যয় করিতেন, আপনার বাসভবনে প্রায়ই সঙ্গীতোৎসব হইত, তাঁহার পরিবারের সকলেই সেই অপূর্ব্ব রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এটি বড় অল্পভাগ্যের কথা নহে।

"রসভোগ, সুসংযোগ হয় কি সকল কপালে?
দরিদ্রের কি স্বর্ণ মিলে, রোদন করিলে
সিন্ধুকূলে?"

আর কি বিপরীত ব্যবস্থা দেখুন, আমাদের রবীন্দ্রনাথের কপালে। তিনি নিজেই তাঁহার দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার "ভৃত্য রাজক তন্ত্র", আর অন্ধকূপের মাসতুত ভাই—সেই শ্রীমন্দির "বাহির বাড়ীতে চাকরদের মহলে, দোতলার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের ঘর।" এখনও পড়িতে গেলে,—যতই বাঁচাইয়া লেখা হোক্ না কেন—পড়িতে গেলে চোখে জল আসে। রবিবাবু নিজেই নিজ বাল্যশিক্ষার পরিচয় অতি সুন্দর কাহিনী করিয়া লিখিতেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করিয়া না লিখিলেও, আমি তাঁহার মুখে, শুনিয়া জানি,—যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কোনরূপ দেশীয় সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা বাল্যে কৈশোরে তিনি কিছুই পান নাই। তিনি যেদিন আমাকে এই কথা বলেন, সেই দিন আমি তাঁহাকে অভাগাবান্ বলিয়া মনে করি; আর সেইজন্য বঙ্কিম বাবুকে মহাভাগ্যবান্ বলিতেছি। নিজ ভবনে ভক্তির উপকরণের কথা এই মাত্র বলিলাম।

তাহার পর সাধনার কথা—সেই কার্লাইলের Indefatigable exertion in pursuit of an object. কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রম।

যে দেশের অতি নিরক্ষর বর্ব্বর পর্য্যন্ত, পল্লীবাসের অতি দীনা রমণী পর্য্যন্ত, ধ্রুব-ভগীরথের সাধনার কথা জানে ও বিশ্বাস করে, সে দেশে সাধনার কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বটে; কিন্তু সে সাধনা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, আমরা মনে করিতেছি, একটি সভা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, গোটা কয়েক প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করাইয়া লইতে পারিলেই, সাধনার পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ হইল! হায় ভগবান্! ধ্রুব-ভগীরথের দেশে এ কি বিড়ম্বনা!

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সাধনা—মনপ্রাণের সাধনা।—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'। সাহিত্য-সাধনায়—তাঁহার একটু বিরতি বা ক্লান্তি ছিল না; আহার-নিদ্রার সময়-জ্ঞান নাই, পারিপাট্য বোধ নাই, ছুটি লইয়াছেন, আর দিবারাত্রি সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন আছেন। নিজের লেখা নিজে নষ্ট করিতে প্রাণ ধরিয়া মানুষে যে সেরূপ পারে, বঙ্কিম-বাবুর সাধনা দেখিবার পূর্ব্বে আমার জ্ঞানই ছিল না। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দ-মঠের সূতিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষ-বৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল, 'উভয়েরই দোষ', নগেন্দ্রে ও দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দমা হাইকোর্টে পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র উভয়ের দোষ পাল্‌টাইয়া লেখা হইয়াছে 'বিষবৃক্ষ'। সমীচীন পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে—সূর্য্যমুখীর নিতান্তই দুর্দ্দশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্ত্রস্ত হইতে হয়। সেই সাধনাই একরূপ প্রতিভা—"এই প্রতিভাতেই বঙ্কিম বাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।" আর 'আনন্দ-মঠ' নির্ম্মাণে সাধনাই বা কত! এই সময় আমার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া, একটু গল্প বলি—যখন আনন্দমঠ সূতিকাগারে, তখন ক্ষেত্রনাথ

মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন; উভয়ের পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই। তিনি সুরজ্ঞ, বড় টেবল হারমোনিয়ম্ লইয়া তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিম বাবুকে সুরের খাতিরে যৎসামান্য অদল বদল করিতে হয়। একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিম বাবু আনন্দ-মঠের শেষে যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতের লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম, অজয় নদের উভয় পার্শ্বে স্থান, আমি 'সন্তান' শব্দ বুঝিতে না পারিয়া 'সন্তাল' পড়িতেছিলাম—মনে মনে। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এবার কি Santal Insurrection theme হইল না কি"। তিনি বলিলেন, "না Sanyasi Insurrection." আমি বলিলাম এই যে, আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন, সন্তাল, সন্তালগণ"। তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুল—সন্তাল নয়, 'সন্তান', আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূমি।" তখন হো হো করিয়া দুইজনে হাসিতে লাগিলাম। পাঠক, পুথী বেড়ে যায়, আজি হাসিতেই থাকুক না কেন?

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

হিন্দুধর্ম্মের বহুমুখীনতা

মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে ধর্ম্ম-বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হিন্দু আপনার ধর্ম্মকে যুগপৎ সর্ব্বজনীন, বিচিত্রতাপূর্ণ ও বহুমুখ করিয়াছে। মানবপ্রকৃতির সর্ব্বজনীনতা, বিচিত্রতা এবং বহুমুখীনতা হইতেই হিন্দুধর্ম্মের এ সকল লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মানুষ যেমন, তার ধর্ম্মও যে সেইরূপই হইবে,—এই সামান্য কথাটা, জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। তাহারই জন্য সে সকল ধর্ম্মে, হিন্দু যাহাকে অধিকারিভেদ বলে, সে বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হিন্দু জানে, ধর্ম্মবস্তুটিকে মানুষের ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, বাহির হইতে ও উপর হইতে তাহার উপর এ বস্তুটিকে চাপাইতে গেল ইহার সত্য ও শক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। তখন সে ধর্ম্ম পোষাকী বস্তু হইয়া উঠে; আটপৌরে হইতে পারে না। আর হিন্দু তাহার ধর্ম্মকে বাহির হইতে কাহারও উপরে না চাপাইয়া, ভিতর হইতে ফুটাইতে গিয়াছে বলিয়া, তাহাকে এমন সর্ব্বতোমুখ করা আবশ্যক হইয়াছে।

কারণ, মানুষের প্রকৃতিও অত্যন্ত জটিল এবং সর্ব্বতোমুখ। ভাল মন্দ কত কি যে এই প্রকৃতির মধ্যে, তাহার অঙ্গীভূত হইয়া আছে, বলা যায় না। এই প্রকৃতি একদিকে জড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, জড়ের সঙ্গে অশেষবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ, জড়জগতের নিয়মাধীন হইয়া আছে। জড়ের উপরে জীব। অন্নময়

কোষের ভিতরে প্রাণময় কোষের প্রতিষ্ঠা। মানুষের প্রকৃতি এই প্রাণময় কোষের ভিতরেও আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং প্রাণ-ধর্ম্মও তাহাতে আছে। প্রাণিজগতের নিয়মগুলি এই প্রকৃতিকে দখল করিয়া রহিয়াছে। আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি প্রাণি মাত্রেরই ধর্ম্ম; সুতরাং মানবপ্রকৃতিরও সাধারণ ধর্ম্ম। প্রাণময় কোষের ভিতরে মনোময় কোষ। এই মনের দ্বারাই মানুষ বাহিরের জড়জগতের ও অপর প্রাণিমণ্ডলীর সঙ্গে তাহার প্রতিদিন যে সকল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে, সে সকল সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ করিয়া, ইহা চাই, ইহা চাই না—ইহা করিব, ইহা করিব না;—এই সকল সংকল্পবিকল্পের দ্বারা তাড়িত হইয়া সংসারচক্রে নিয়ত ঘুরিতেছে। যেমন তার জড়দেহ, যেমন তার প্রাণ, তেমনি এই সংকল্পবিকল্পাত্মক যে মন, তাহাও মানুষের প্রকৃতিরই অন্তর্গত। এ সকলকে লইয়াই মানুষ মানুষ হইয়াছে। প্রাণবস্তু যে জড়ের উপরে, তাহা সত্য; মন আবার প্রাণেরও উপরে, ইহাও সত্য। কিন্তু জড়ে প্রাণের অধীনতা ও প্রাণের অপেক্ষা, এবং প্রাণেও মনের অধীনতা ও মনের অপেক্ষা সত্ত্বেও,—মানুষ প্রাকৃত অবস্থায় জড়েরও অধীন, প্রাণেরও অধীন, মনেরও অধীন হইয়া বাস করে। এ সকলের কোনোটিকেই সে একান্তভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। এই মনের উপরে তার বিজ্ঞান বা বুদ্ধি। মন ভেদের প্রতিষ্ঠা করে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি ভেদের মধ্যেই অভেদকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মন সন্দেহাত্মক, বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। মন নিয়তই ভেদের সৃষ্টি করিতেছে। বিজ্ঞান তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া এই ভেদকে নষ্ট করিয়া একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। কেবলই যদি ভেদের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে মানব বুদ্ধি স্থিতিলাভ করিতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন অভেদই যদি কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাতে মানুষের বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান দুইয়ের কিছুই জন্মিতে পারে না। ভেদাভেদের উপরেই মানুষের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত। এই অশেষ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদকে আশ্রয় করিয়াই এই মানবপ্রকৃতি আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতেছে। কিন্তু এখানেই মানবপ্রকৃতির জটিলতার ও বিচিত্রতার শেষ নাই। যেমন অন্নময় কোষের ভিতরে প্রাণময় কোষ, যেমন এই প্রাণময় কোষের ভিতরে মনোময় কোষ, যেমন এই মনোময়কোষের ভিতরে বজ্ঞানময়কোষ, সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় কোষের ভিতরে আনন্দময় কোষ আছে। এই কোষপঞ্চক লইয়াই মানব প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। জড় ও প্রাণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। জড় বলিতেই আমরা অপ্রাণী বুঝি। প্রাণী বলিতেই অজড় বুঝি। অথচ জীবেতে এই দুই পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মই সম্মিলিত হইয়া, তার জীবত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার জড়ভাগ, অর্থাৎ এই দেহপ্রপঞ্চ, প্রাণাপেক্ষী হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবের প্রাণবস্তু তাহার মনের অপেক্ষা করিয়া থাকে। মন বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান আনন্দের, অপেক্ষা রাখে। এই সকলের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। মানুষ যতক্ষণ মানুষ আছে, এই দেহের সঙ্গে যতক্ষণ তাহার সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে এই

কোষপঞ্চকের জটিল ও অপরিহার্য্য সম্বন্ধের মধ্যে বাস করিতেই হয়। বহুতপস্যাবলে, সিদ্ধ অবস্থায়, যোগিজনেরা এ সম্বন্ধসকলকে অতিক্রম করিতে পারেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহারা, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি ও যাহাকে অধর্ম্ম বলি, তদুভয়েরই অতীত হইয়া যান। দেহে আবদ্ধ থাকিয়াও তখন তাঁহারা বিদেহী। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও তখন তাঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া বাস করেন। এই সকল সিদ্ধ মহাজনকে লক্ষ্য করিয়াই, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!"

"গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়াই বেদসকলের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; হে অর্জ্জুন! তুমি এই ত্রিগুণের অতীত হইতে চেষ্টা কর।" হিন্দুর ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার এই ত্রিগুণাতীত রাজ্যের কথা নহে; তাহার অনেক নিচের কথা। হিন্দু বলেন যে সে অবস্থায় ধর্ম্মও থাকে না, অধর্ম্মও থাকে না; কর্ম্মও থাকে না, অকর্ম্মও থাকে না; পুণ্যও থাকে না, পাপও থাকে না।

যে মানব-প্রকৃতির উপরে হিন্দু ধর্ম্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এই সাধারণ, এই প্রাকৃত, এই অসিদ্ধ, এই জড়-অজড়ধর্ম্ম-সমন্বিত, এই কোষপঞ্চকে আবদ্ধ মানব-প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মধ্যে পশুও আছে, মানুষও আছে, দেবতাও আছেন। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম মানুষের অন্তর্নিহিত জড়ত্ব ও পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব, সকল অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, সকল চেষ্টাকে সফল করিয়া, সকল প্রবৃত্তির তৃপ্তিদান করিয়া, আপনার সার্থকতালাভের প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মের অদ্ভুত বিচিত্রতার ও অপূর্ব্ব বহুমুখীনতার মূল কারণ।

জগতের আর যত ধর্ম্ম আছে, সকলেই মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভাল ও মন্দের একটা আত্যন্তিক ভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেবল হিন্দুর ধর্ম্মেই তাহা করে নাই। অপর সকল ধর্ম্মে মানুষের কতকগুলি বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে মন্দ ও কতকগুলিকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আর মন্দ বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত করিয়া, তদ্বিপরীত ভাল প্রবৃত্তি ও বৃত্তিগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এরূপ একটা আত্যন্তিক ভাগ-বাটোয়ারা করিবার নিস্ফল প্রয়াস হয় নাই। ছায়াতপের মধ্যে যেমন কোনও ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ঘটান অসাধ্য, সেইরূপ মানবপ্রকৃতির ভিতরে যা'কে আমরা মন্দ বলি ও যা'কে ভাল বলি, তা'র মধ্যেও কোনও প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা করা যায় না;—হিন্দু চিরদিনই এই কথা বলিয়াছেন। মানবের মধ্যে একটা মানবীয় দিক্ ও একটা ঐশ্বরিক দিক্ আছে। একদিকে মানুষ জীব—সর্ব্ববিধ জীবধর্ম্মের অধীন; অন্যদিকে সে শিব—নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবসম্পন্ন;—হিন্দু অতি প্রাচীন কালেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই হিন্দুর শ্রুতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে এই জীব-শিবের মিলনকে ছায়াতপের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।"

সুতরাং হিন্দু মানব-প্রকৃতির সকল দিক্‌কে ধরিয়াই, ধর্ম্মবস্তুকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, ধর্ম্মকর্ম্মে বা ধর্ম্মসাধনে এই প্রকৃতির কোনও অঙ্গকে উপেক্ষা করিতে বা চাপিয়া রাখিতে চান নাই।

মানুষের জড়দেহ আছে। মরণ পর্য্যন্ত এই জড়দেহের সঙ্গে তার অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তার মন, মনকে আশ্রয় করিয়া তার বুদ্ধি, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, দেহী অবস্থায়, মানুষ যাহাকে আত্মা বলে, সে বস্তু বাস করে। এই আত্মবস্তুকে ফুটাইয়া তোলা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হইলেও, এই শরীর বা জড়দেহ হইতে আরম্ভ করিয়াই সেই ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে হয়। ইহা বুঝিয়া শুনিয়াই হিন্দু বলেন,—"শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" তাহারই জন্য হিন্দুর ধর্ম্ম সামান্য শারীর চেষ্টার প্রতি একটাই দৃষ্টি রাখিয়া চলে।

মানুষের শরীরের সঙ্গে তার মনের সম্বন্ধ কতটা যে গভীর ও ঘনিষ্ঠ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ইহা বুঝিয়াছিলেন। মানুষের প্রবৃত্তি সকল যে কতটা পরিমাণে তাহার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর অধীন, আধুনিক য়ুরোপীয় ও আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও ইহা একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু বহুকাল পূর্ব্বেই এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এইজন্য এই স্নায়ুমণ্ডলীকে অবলম্বন করিয়াই হিন্দু মানবচরিত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু জানেন যে, 'ভাল হও' বলিলেই লোকে ভাল হয় না। পরের উপদেশ শুনিয়া বা দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাল হইতে ইচ্ছা করিলেই কেহ ভাল হইতে পারে না। মনে মনে সাময়িক ভাবের প্রেরণায় যতই সাধু সংকল্প সে করুক না কেন,—তার শরীর অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী যদি সে সংকল্প-রক্ষার অনুকূল অবস্থা লাভ না করে,—কেবল মনের জোরে সে সংকল্প রক্ষা করা কখনও সম্ভব বা সাধ্যপর হয় না। ফলতঃ আমরা যাহাকে মনের জোর বলি—ইংরেজিতে যাহাতে inhibitive power of the will বলে,—তাহাও সর্ব্বথাই স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থ ও সবল অবস্থার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। উন্মাদরোগগ্রস্ত লোকের এই মনের জোর একেবারেই নাই। যখন যে ভাব মনে জাগে, তাহাতেই তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলে। সে উত্তেজনাকে রোধ করিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। ইহার কারণ, তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ, আত্যন্তিক উত্তেজিত অবস্থা। সেইরূপ যাহাদের কুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, আজন্মকাল যাহারা চৌর্য্য, পারুষ্য, নরহত্যা প্রভৃতি সমাজদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, আধুনিক য়ুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদ্গণ যাহাদিগকে instinctive criminals বলেন, তাঁহাদের এই অদম্য কুকর্ম্মাসক্তিও বিকৃত স্নায়ুমণ্ডলীরই ফল। কামক্রোধাদি সকল রিপুরই মূল আমাদের শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজিত ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। এ সকল কথা অল্পে অল্পে, আধুনিক য়ুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণায় ও সিদ্ধান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দু সাধকেরা বহুকাল হইতেই এ সকল কথা জানেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথমাবধিই মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে যাইয়া, সর্ব্বাদৌ তাহার শরীরকে শোধন করিতে চাহিয়াছেন।

হিন্দুর ধর্ম্মের স্নানাদি নিত্যকর্ম্মের ও ব্রতোপবাসাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মের ব্যবস্থা

এই দেহশুদ্ধির জন্যই বিহিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই পানাহার সম্বন্ধে হিন্দুর ধর্ম্ম অশেষ প্রকারের আচার-বিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এইজন্যই, উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মসাধনায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সকলের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সিদ্ধির কথা নানা-ভাবে, লোকসংগ্রহার্থে, যুক্ত হইলেও, এ সমস্তই প্রকৃতপক্ষে ভূতশুদ্ধির উপায় মাত্র। শরীরের স্নায়ুসকলকে স্নিগ্ধ ও সুস্থ রাখিবার জন্য, স্নায়বীয় উত্তেজনা-নিবন্ধন যাহাতে অযথা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য, এ সকল স্নান, ব্রত, উপবাস, আসন, প্রাণায়ামাদির বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এ সকলের মধ্যে অতি প্রাকৃত বা সুপারন্যাচারেল্ (supernatural) কিছুই নাই।

কিন্তু এ সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম মানুষের শারীর প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনেরই চেষ্টা করিয়া-ছেন, তাহাকে পীড়ন করিতে কখনও চাহেন নাই। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু এ সকল সাধন প্রকৃত পক্ষে উচ্চাঙ্গের হিন্দু সাধন বলিয়া কখনই পরিগণিত হয় নাই। অধিকাংশ স্থলেই ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য এ সকল সাধন অবলম্বিত হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভাষায় এই প্রকারের সাধনের নিন্দা করিয়াছেন। এই সকল কৃচ্ছ্রসাধনকে আসুরী সাধন বলে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

"যাহারা দম্ভাহঙ্কারযুক্ত ও কামরাগবলা-ন্বিত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত পীড়াজনক তপস্যা করে এবং তাহাতে দেহস্থিত ভূতসকলকে বৃথা ব্রতোপবাসাদির দ্বারা ক্লিষ্ট করে, এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ আত্মারূপী আমাকেও পীড়ন করে, তাহাদিগকে অসুর বলিয়া নিশ্চয় জানিবে।" প্রকৃত ধর্ম্মের পথ এ নহে। হিন্দুর ব্রতোপবাসাদি শরীরকে দুর্ব্বল ও দুস্থ করিবার জন্য বিহিত হয় নাই, শক্ত ও সুস্থ করিবার ও রাখিবার জন্যই বিহিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও শক্তিলাভেই জীবের শরীরের সার্থকতালাভ হয়। আর হিন্দুর ধর্ম্মের শারীরিক সাধনের উদ্দেশ্যও আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য বিধান করা।

আর এ বিষয়েও হিন্দুর ধর্ম্ম কাহারও উপরে কোনও প্রকারের অযথা জোরজবর-দস্তি করিতে চায় না। সকল মানুষের শারীর প্রকৃতি একরূপ নহে। সুতরাং শারীর ধর্ম্মও সকলের সমান হইতে পারে না। এ বিষয়েও হিন্দুর ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া চলিতে চাহে না। গতানু-গতিক পথ ধরিয়া কোনও কোনও হিন্দু সকল লোকের উপরেই একই প্রকারের ব্রতোপবাসাদি চাপাইতে চেষ্টা করিলেও, হিন্দুর ধর্ম্মের সনাতন আদর্শে বা উপদেশে এরূপ জোরজবরদস্তি কদাপি সমর্থিত হয় না। ফলতঃ জগতের আর কোনও ধর্ম্ম সমর্থ ও অসমর্থের মধ্যে যমনিয়মাদির এমন পার্থক্য করেন কি না, জানি না। সমর্থ-জনের পক্ষে একরূপ বিধান, আর অসমর্থের

পক্ষে অনুরূপ বিধান,—খৃষ্টীয় বা মোহম্মদীয় ধর্ম্মে আছে বলিয়া শুনি নাই। যাহা এক জন খৃষ্টীয়ানের পক্ষে ধর্ম্ম ও বিহিত, অপর খৃষ্টীয়ানের পক্ষেও তাহাই ধর্ম্ম ও বিহিত। সবলের জন্য এক নিয়ম, দুর্ব্বলের জন্য অপর নিয়ম,—সেখানে এমন ব্যবস্থা নাই। হিন্দুর ধর্ম্মে এ ব্যবস্থা আছে। আর তারই জন্য হিন্দুর ধর্ম্ম এমন বিচিত্র ও বহুমুখীন হইয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিলাতের কথা

(২)

খাওয়া দাওয়া

দেশে থাকিতে সাহেবী খানার প্রতি বেশ একটা লোভ ছিল। তখন জানিতাম না যে, আমরা এদেশে যাকে সাহেবী খানা বলি, তা বাস্তবিক সাহেবী খানা নয়। কারী ভাতের তো কথাই নাই, চপ্, কাট্‌লেটের খবরও বিলাতের ইংরেজেরা কিছুই রাখেন না। নাম দুটা ইংরেজি বটে এবং ইংরেজও এক রকমের চপ্ কাট্‌লেট্ খাইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা এদেশে চপ্ বা কাট্‌লেট্ বলিতে যে উপাদেয় বস্তু বুঝি, ইংরেজের চপ্ কাট্‌লেটের সঙ্গে তার নামগত সাদৃশ্য থাকিলেও, বস্তুগত বা স্বাদগত কোনও সুদূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরেজের প্রধান খাদ্য মাংস, আর তার মধ্যে আবার গোমাংসই প্রশস্ত। ইংরেজের প্রিয়তম খাদ্য "রোষ্ট বীফ্" (Roast Beaf)। একটা বড় মাংসের টুক্‌রাকে তন্দুরের ভিতরে রাখিয়া সেই উত্তাপে কতকটা ঝলসাইলে বীফ্ রোষ্ট হয়। যে মাংসখণ্ডের উপরের ভাগটা কতকটা পুড়িয়া যায়, কিন্তু ভিতর হইতে কাটিলেই পাতলা রক্ত বাহির হয়, ইংরেজের রুচিতে তাহাই অতি সুখাদ্য বস্তু। এই মাংসের slice প্লেটে করিয়া যখন খাইতে দেয়, তখন তাহা রক্তের ঝোলের মধ্যে ভাসিতে থাকে; আর তাহাই একটুকু রাই বা mustard এবং লবণ সংযোগে ইংরেজেরা অতি তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন। ইংরেজের পাক-প্রণালী দেখিলে সর্ব্বদাই মানবের আদি অবস্থার কথা মনে পড়িয়াছে। এক সময় মানুষ আম-মাংসই ভোজন করিত। যখন ক্রমে আগুন জ্বালিবার সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইল, তখন মানুষ বনে পশু শিকার করিয়া সেইখানেই তাহাকে পোড়াইয়া খাইত। ইংরেজ বনে যাইয়া পশু শিকার করে না, কসাইখানাতে বধ করে, আর ঘরে আনিয়া তন্দুরের ভিতরে সেই মাংসকে পোড়াইয়া ভক্ষণ করে। রন্ধনব্যাপারে ইংরেজের সভ্যতা এতটুকুই অগ্রসর হইয়াছে।

বিলাতে সুপক্ব খাদ্যও পাওয়া যায়; কিন্তু সে সকল খাদ্যের রন্ধন-প্রণালীর আবিষ্কার ইংরেজ করেন নাই। বিলাতের

ভাল ভাল খাদ্য—মাংসই হউক, আর মাছই হউক বা মিষ্টিই হউক, হয় ফরাসীসের না হয় ইতালীর আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে রান্না হয়। ইংরেজের ভাল ভাল খাদ্যের নামই তার প্রমাণ। ফলতঃ ইংরেজী খানায় ভোক্তা-দিগের সম্মুখে খাদ্যের যে তালিকা দেওয়া হয়, তাহা প্রায়ই ফরাসী ভাষায় লিখিত হয়। এ সকল তালিকাকে মেনু (menu) বলে। এ সকল তালিকায় প্রায়ই সুপের (soup) পরিবর্ত্তে পটাজ (potage), রোষ্ট ফাউলের পরিবর্ত্তে পোলে রোটী (poulet Roti), ফল বা fruitএর পরিবর্ত্তে ফ্রোমাঁজ (fromage)—এই সকল ফরাসী শব্দ ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনের বড় বড় হোটেলে খাইতে গিয়া এই জন্য আমার মত লোকে অনেক সময় অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। কোন্‌টা যে গরুর, আর কোনটী যে ভেড়ার মাংস, ইহা বুঝিবার জন্য হোটেলের খান-সামার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। আর ইংরেজের রন্ধন-বিজ্ঞানের এই সকল বৈদেশিক পরিভাষাই, ইংরেজের রন্ধন-বিদ্যা যে একান্তই পরের নিকট ধার করা বস্তু, ইহা প্রমাণ করে। ইংরেজ অনেক বিদ্যা শিখিয়া-ছেন বটে, কিন্তু এখনও যে মানুষের মত রাঁধিতে শিখেন নাই, বিলাতে যাইয়া দিন দুই তিন বাস করিলেই, এই জ্ঞানটা লাভ করা যায়।

ফরাসীস্ ও ইতালীয়ের রন্ধন-প্রণালী, ইংরেজের রন্ধন-প্রণালী অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাঁহাদের খাদ্যও আমাদের নিকট তত মুখরোচক হয় না। আমরা যে পরিমাণে নানাপ্রকারের ঝালমসলা ব্যবহার করিয়া থাকি, য়ুরোপের কোন জাতি তাহা করেন না। ঝালের মধ্যে তাঁহারা কেবল গোলমরিচের গুঁড়াই ব্যবহার করে, আর তাহাও রান্নায় অতি অল্পই ব্যবহার, হয়, খাইবার সময় প্রত্যেকে আপনার রুচিমত নিজ নিজ খাদ্যের সঙ্গে তাহা মিশাইয়া লন। দশ পনেরো বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে লাল লঙ্কার ব্যবহার একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। আজ্‌কাল গোল মরিচের গুঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়াও অনেক সময় টেবিলে সাজানো থাকে। পূর্ব্বে ইংরেজ এক সিরকা (vinegar) এবং ওয়ারষ্টারসায়ার সস্ (worcestershire sauce) ভিন্ন অন্য কোন মুখরোচক অম্ল ব্যবহার করিতেন না। আজ কাল অনেক নূতন নূতন অম্ল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও এখনও ইংরেজ জনমণ্ডলী সিদ্ধ-পোড়ারই বেশী ভক্ত। আর ফরাসীর বা ইতালীয়ের রান্নাতেও আমাদের রান্নার স্বাদ বা গন্ধ পাওয়া যায় না।

প্রথম প্রথম বিলাতে যাইয়া ইংরেজের খানা খাইতে বড়ই অসুবিধা হয়। একে তো রান্নার শ্রী এইরূপ, তাহার উপরে খাদ্যের পরিমাণও কোথাও প্রচুর পাওয়া যায় না। বহু দিন হইল, একজন হিন্দু-মহিলা স্বামীর সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে একদিন বলিয়া-ছিলেন যে, ইংরেজের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁর কান্না পাইত। আমরা নিরামিষাশী জাত, ভাতই খাই আর রুটীই খাই, পরিমাণে বেশী না খাইলে আমাদের শক্তিও থাকে না, উদর-

পূর্ত্তিও হয় না। ইংরেজ মাংসাশী জাত, আর ডাক্তারেরা বলেন যে, যে পরিমাণ নিরামিষ আহার করিলে শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প-পরিমাণ মাংস খাইলেও চলে। সুতরাং আমরা যে পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করি, ইংরেজের সে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই ইংরেজের কাছে আহার করিতে যাইয়া প্রথম প্রথম কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না। কিন্তু ইংরেজ আমাদের তুলনায় পরিমাণে কম খাইলেও বারে বেশী খায়। গরীব লোকেরা সচরাচর দিনে তিনবার খায়; মধ্যবিত্ত লোকেরা চারবার, আর বড় লোকেরা ছয়বার খাইয়া থাকে। আর কে কোন্ সময়ে আহার করে, ইহা দ্বারা তাহার সামাজিক পদমর্য্যাদারও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমজীবীদিগকে ছয়টা কি সাতটার সময় খাইয়া আপন আপন কর্ম্মস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়; সুতরাং অতি প্রত্যুষেই তাহাদিগকে breakfast বা প্রাতরাশ সমাপন করিতে হয়। মধ্যবিত্ত লোকেরা সচরাচর বেলা নয়টার সময় আপন আপন কর্ম্মস্থলে গমন করেন; ইহাদিগকে সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রাতঃকালের আহার শেষ করিতে হয়। বড় লোকেরা সঞ্চিত ধনের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন প্রতিদিন খাটিয়া তাঁহাদিগকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় না। সুতরাং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ন'টা কি দশটায় এমন কি এগারোটা পর্য্যন্তও প্রাতঃকালের আহারের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। ইঁহারা অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকেন। শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ইঁহাদিগকে একটু আধটু কিছু খাইতে হয়। অতি প্রত্যুষে শয্যাপার্শ্বেই ভৃত্য আসিয়া ইঁহাদিগের জন্য এক পেয়ালা কাফি বা চা এবং কিছু বিস্কুট রাখিয়া যায়।

প্রাতরাশ বা Breakfast

সচরাচর বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজেরা প্রাতঃকালে প্রায়ই লঘুভোজন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দুটী আধ সিদ্ধ ডিম, খান দুই toast, পেয়ালা দুই চা কিম্বা কোকো দিয়াই প্রাতঃকালের ভোজন শেষ করেন। কেহ বা ডিমের সঙ্গে অতি পাতলা শূকরমাংস ভাজা খাইয়া থাকেন, কেহ বা মাছ ভাজা খান। গরীব লোকেরাই কেবল প্রাতঃকালে মাংস খায়। কেহ কেহ প্রাতঃকালে কোন প্রকারের আমিষ ব্যবহার করেন না। পারিজ (porridge), টোষ্ট (toast) এবং কলা কমলালেবু কিম্বা অন্য কোন সুপক্ক ফল বা ফলের মোরব্বা খাইয়া থাকেন।

লাঞ্চ বা টিফিন

এখানকার ইংরেজেরা যাহাকে টিফিন বলেন, বিলাতে তাহাকেই লাঞ্চ বলে। ইহাই ইংরেজের মধ্যাহ্নাহার। গরীব লোকেদের মধ্যাহ্নারকে ডিনারও বলে। শ্রমজীবিগণ সচরাচর ১২টা হইতে ১২॥০ টার মধ্যে মধ্যাহ্নাহার করিতে বসেন। মাংস আর মিষ্টি এই দুই পদেই তাঁহাদের মধ্যাহ্ন-আহার শেষ হয়। গরুর রোষ্ট এবং তার সঙ্গে কিছু আলু ও সব্‌জী সিদ্ধ, ইহাই গরীব লোকের প্রধান খাদ্য। তার সঙ্গে একপদ

মিষ্টি বা পুডিং (pudding) হইলে তাহাদের মধ্যাহ্নাহার শেষ হয়। মধ্যবিত্ত ইংরেজ সূপ্ (soup), রোষ্ট (roast) বা কাট্‌লেট্ এবং পুডিং বা 'মিষ্টান্ন' এই দিয়াই মধ্যাহ্নাহার করিয়া থাকেন। ইহারা এই মধ্যাহ্নাহারকে ডিনার (dinner) না বলিয়া লাঞ্চ (lunch) বলেন। লাঞ্চের পরে কেহ কেহ এক পেয়ালা কাফি পান করেন। আর কি ছোট কি বড়, সকলেই মিষ্টি খাবার পরে, মুখ বদলাইবার জন্যই বোধ হয়, রুটী ও পনির খাইয়া থাকেন। বড়লোকদের লাঞ্চ একটু সমারোহের ব্যাপার। তাহাতে প্রথমে মুখরোচক ঝাল ও অম্ল খাইয়া ভোজন আরম্ভ করিতে হয়। কাঁচা মূলো জারক জলপাই, টিনের সার্ডিন (sardines) মাছ, সিরকায় ভিজান বীটপালং সিদ্ধ আর কোনো কোনো কাঁচামাছের আচার,—এ গুলিই য়ুরোপীয়দিগের অতিশয় মুখরোচক বস্তু। ইংরেজের আহার্য্যের তালিকায় বা menuতে এগুলিকে Hors D'vour বলে। বড় লোকের লাঞ্চে ইহাই প্রথম পদ। তার পর সূপ্। এই সূপ্ অশেষবিধ হইয়া থাকে। কতকগুলি সূপ্ পাত্‌লা ও পরিষ্কার জলের মত হয়। ইংরেজিতে এগুলিকে clear soup বলে। আর কতক-ঘন হয়, তাহাকে thick soup কহে। প্রায় সকল সূপেই মাংসের কাথ ব্যবহৃত হয়। তবে নিতান্ত নিরামিষাশীদের জন্য একেবারে নিরামিষ সূপেরও ব্যবস্থা হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। শুদ্ধ মাংসের সূপের মধ্যে ox-tail বা ষাঁড়ের লেজের সূপই প্রশস্ত। Turtle soup অথবা কাঠুয়ার সূপই সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ। বিলাতে কচ্ছপ বা কাঠুয়া জন্মায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে জীবন্ত কাঠুয়ার আমদানি হয়; তাহাও খুব বেশী পরিমাণে আসে না। তারই জন্য সে'দেশে কাঠুয়ার দাম এত বেশী। শীতকালে পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তর কাঠুয়া পাওয়া যায়। এগুলিকে বিলাত পাঠান যায় কি না চেষ্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। মধ্যবিত্ত লোকেরা এই turtle soup খাইতে পান না। ঘন সূপে হয় বিলাতী বেগুন বা tomato কিম্বা মটর শুঁটী কিম্বা অন্য কোন ফল বা সব্‌জী ব্যবহৃত হয়। এ সকলের মধ্যে মটরশুঁটী এবং বিলাতী বেগুনের সূপ্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু বড়লোকদের লাঞ্চে সূপের পরে মাছ, মাছের পরে এক পদ কি দুই পদ মাংস, মাংসের পরে মিষ্টি, তার পর বিস্কুট্, মাখম ও পনির এবং সর্ব্বশেষে সুপক্ক ফল দেওয়া হয়। এইরূপে লাঞ্চ বা মধ্যাহ্নাহার কতকটা গুরুতর হইয়া উঠে।

Afternoon tea বা বৈকালিক চা।

বিকাল বেলা চা খাওয়ার পদ্ধতি পূর্ব্বে ছিল না। কিছুদিন হইতে ইহা অত্যন্ত চলিত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত ও বড় লোকেরাই বিকাল বেলা চা, কেক্, বিস্কুট্, কেহ কেহ বা টোষ্ট খাইয়া থাকেন। গরীব লোকেরা দুপুর বেলা ডিনার করে, আর দিনান্তে কাজ কর্ম্ম হইতে ফিরিয়া গিয়া, সাঁজের বেলা চা খায়। সাড়ে চারটা কি পাঁচটার সময় চা খাইবার অবসর এবং পয়সাও তাহাদের জোটে না। মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যেও ধন ও সামাজিক পদমর্য্যাদার হিসাবে ছোট বড় ভেদ আছে। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা একটু ছোট, তাঁরা মধ্যাহ্নকালেই লাঞ্চ না করিয়া একেবারে ডিনার করেন, আর কাজকর্ম্ম হইতে ফিরিয়া গিয়া ৫।০টা কি ৬টার সময় একটু ভারী গোছের চা খাইয়া থাকেন। ইহাকে ইংরেজেরা high tea, আর কেহ কেহ বা meat tea'ও বলিয়া থাকেন। ইহারা চায়ের সঙ্গে মাছ বা মাংস নানা প্রকারের মিষ্টি এবং ফল খাইয়া থাকেন। গরীব লোকেরা চায়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাংস বা cold meat খাইয়া থাকে।

ডিনার—Dinner

ইংরেজ-সমাজে কে কোন্ সময়ে ডিনার খায়, তাহার দ্বারা তাহার সামাজিক পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। গরীব শ্রমজীবীরা দুপুর বেলা ডিনার খায়। নীচুদরের মধ্যবিত্ত ইংরেজ একটা হইতে দেড়টার মধ্যে ডিনার খাইয়া থাকেন। তাঁর চাইতে বড় যাঁরা, তাঁরা সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে ডিনার করেন। আর রাত্রি ৮টাই সমাজে শীর্ষস্থানীয় অভিজাতশ্রেণীর ডিনারের সময়। বড় লোকদের এই ডিনার অতি সমারোহের ব্যাপার ডিনারের সময় সাহেব ও মেম সকলকে বিশেষ পোষাক পরিতে হয়। ইংরেজিতে ইহাকে evening dress বলে। সাহেবদের evening dress সর্ব্বদাই কাল হওয়া চাই এবং কামিজের বুক ভাল রকমে ইস্ত্রী করা ও খোলা থাকা আবশ্যক। Evening dress-এর সঙ্গে বুট চলে না, কাল রঙের বার্ণিস করা court shoe পরিতে হয়। মেমেদের evening dressএ বাহু, গ্রীবা ও কণ্ঠের নিম্নদেশ অনাবৃত থাকে। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। ইহাই সে দেশের নিয়ম। যেমন সাজসজ্জার পারিপাট্য সেইরূপ ডিনারে আহারেরও পারিপাট্য বেশী। ডিনারে Hors D'vour ছাড়া, সুপ, মাছ, গোমেষা-দির দুই তিন পদ, হাঁস, মুরগী, পারা-বত বা অন্য কোন পাখীর মাংসের দুই এক পদ, মিষ্টি, বিস্কুট, মাখন ও পনির এবং সর্ব্বশেষে সুপক্ব ফলের ব্যবস্থা থাকে। সকলেই যে সকল পদ আহার করেন, তাহা নহে, কিন্তু নানা লোকের রুচি অনুযায়ী নানাপ্রকারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়। আহারান্তে সকলে drawing roomএ গিয়া বসিলে সেখানে গরম কাফি ও বিস্কুটের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজের বিশেষতঃ বড়লোকদিগের মধ্যে ডিনার একটা অতি বৃহৎ সামাজিক ব্যাপার তার আদব-কায়দা বিস্তর। বড় ঘরের গৃহিণীদিগকে এর জন্য অনেক মাথা ঘামাইতে হয়।

বিলাত-ফেরত।

চরিত-চিত্র

সুরেন্দ্রনাথ

(২)

কেশবচন্দ্র

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইয়া এই অভিনব যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়া যাইতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহার সর্ব্ববিধ পূর্ব্ব-সংস্কার নষ্ট করা আবশ্যক ছিল। প্রত্যেক গঠন কার্য্যের পূর্ব্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও যে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগ-সন্ধি কালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায়, কিরূপে এই সংগ্রামের শান্তি হইবে, কোন্ সূত্র ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্যক্ দৃষ্টি হইাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়াই, নূতনকেও আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন। এবং নূতনের অভিষেক দিয়াই পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া সমাজ-ক্ষেত্রকে তাঁহাদের প্রকাশিত যুগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, কোথাও তাঁহাদের এই মহাজন-প্রতিভাসুলভ সম্যক্ দর্শন থাকে না। থাকিলে তাঁহারা যে বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হ'ন, সেই কার্য্যের সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক্ দর্শন সচরাচর সংস্কার-কার্য্যের গতি-বেগকে একান্তভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাদিগের কর্ম্মোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্যই সংস্কারকের পক্ষে কর্ম্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সম্যক্ দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশদর্শিতা বেগবতী সংস্কার-চেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্যক। অতএব রাজা যে সমুন্নত যুগ-আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্ত্তীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী-সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশব-চন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে, স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ব্ববিধ পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রমাণ্য, সদ্গুরুর মর্য্যাদা, সমাজ-বিধানের ধর্ম্মপ্রাণতা, এ সকলকে স্বল্পবিস্তর

অস্বীকার না করিলে, মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার-বর্জ্জিত ও নির্ম্মল হইতে পারে না। এই সর্ব্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। "নেতি" "নেতি" বলিয়াই "ইতিতে" পৌছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে "নেতি" "নেতি" বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বশূন্য করিয়াই, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম,—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয় কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার-চেষ্টা রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই "নেতি"র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির পথ, সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের পথ নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে Independence বা অনধীনতা বলে তারই পথ; সত্য-স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া একপ্রকারের ফ্রিডমে (Freedom) পৌছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য বলিয়াছেন, সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ Rightsএর পথ, স্বত্বের পথ; Reconciliationএর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; সমাজের বিধি-নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা;—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টার মূল সূত্র ছিল। ধর্ম্মের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার-প্রয়াস সর্ব্ব বিষয়ে ব্যক্তিগত Rights বা স্বত্বকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসাধনে ও সমাজশাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্য-প্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আধুনিক যুগে কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারে, অন্যদিকে ডেভিড্ হেয়ার এবং ডি, রোজেরিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংস্কারে অষ্টাদশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা Independenceএর আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে আপনার কর্ম্মজীবনে এই দুই সংস্কার-স্রোতকে একীভূত করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে এই অনধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্য দিকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ, যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ জীবনের বিচ্ছিন্ন কর্ম্মোদ্যমের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইতে-

ছিল, কেশবচন্দ্র সেই সকল বিচ্ছিন্ন শক্তি-কেন্দ্রকে একত্রিত করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, এই সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহর্ষি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর প্রভুত্বই কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিম্বা সংজ্ঞানের (Conscience) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন পরিচালনায় শাস্ত্র-গুরুর প্রাচীন অধিকার মহর্ষির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনার্থীকে আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকারের সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন। ধর্ম্ম সাধনে ব্যক্তিবিশেষের অসঙ্গত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশব-চন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজটীই করিয়াছেন।

" সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবন

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের সূচনার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ দেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধিই বাংলার এবং বিশেষতঃ কলিকাতার সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বে-সরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সময়ে সময়ে, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। বোধ হয় সুরেন্দ্র-নাথের জন্মের পূর্ব্বেই কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, সে'কালের বাংলার মনিষীবর্গ সকলেই, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্-ভুক্ত ছিলেন। সে-কালে ইঁহারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে প্রেরণ করিতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহা-দিগকেই জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক অধিনায়ক বা Natural Leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহা-দিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভা সর্ব্বদা জমীদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জমীদারগণের স্বত্বস্বার্থরক্ষার জন্যই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অধিনায়ক সকলেই জমীদার-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণ-দাস পাল জমীদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমীদারি স্বত্বস্বার্থের পরিপোষক এবং জমী-দার-সমাজের মুখপাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভা জমীদারদিগের সভা হইলেও প্রয়োজনমত আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজা-বর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের বিচার-আলোচনায় জনসাধারণের তো কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষেও সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল না। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভার নেতৃবর্গ জমীদারী স্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এক যোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জাগাইয়া, সংহত লোকমতের দুর্জ্জয় শক্তি প্রয়োগে, রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

আধুনিক স্বদেশাভিমান ও স্বাদেশিকতা

ফলতঃ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত ধর্ম্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাতেই আবার তাঁহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার হয়। আমাদের সে'কালের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা বহুলপরিমাণে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল সত্য। ইহা সত্ত্বেও যে এই সকল সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমানও জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাও অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, এবং য়ুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর এই হীনতাবোধ সর্ব্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে অত্যন্ত আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই, আমরা তখন এতটা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কারসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার-চেষ্টা যদি সর্ব্বতোভাবে খৃষ্টীয়ানী পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে, সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বাভিমান বা Individualism এবং যুক্তিবাদ বা Rationalism, আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং য়ুরোপীয় সমাজবিধানের বশ্যতাগ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া তুলে। স্বদেশের বেদপুরাণাদিকে মনুষ্যপ্রতিভা-রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধি-সহজ ভ্রম-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া, প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া, খৃষ্টীয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বরপ্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোনো পথ রহিল না

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া, যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হিন্দু-ধর্ম্মের উপরে নিজেদের ধর্ম্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধর্ম্মের মত-বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের এই অযথা নিন্দাবাদের ফলেই,—যে স্বদেশের ধর্ম্মকে এককালে আমরা হীন বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগিয়া উঠিল। মানুষ এ জগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্য প্রেমকে ফোটায়। ঘৃণা ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দেয়। একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের অহঙ্কার-অভিমানে আঘাত করিয়াই তাহাকে জাগাইয়া তুলে। মানব-প্রকৃতির এই নিয়মবশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত ধর্ম্মাভিমান আমাদিগের অন্তরে স্বদেশের ধর্ম্মসম্বন্ধেও একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়া দিল। যাঁহারা একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসিগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্ম্মের ভ্রমপ্রমাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এখন তাঁহারাই আবার জগতের অপরাপর ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান হইলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, ইঁহারা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন সেইরূপ অন্যদিকে, বিদেশীয় প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্ম্মেরই সনাতন-তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Natonalismএর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবোদিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয়, সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানাবিষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশ-প্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতি-বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের" প্রতিষ্ঠা করেন। নব্যশিক্ষিত বাঙালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, মনোমোহন,

প্রভৃতির কবিপ্রতিভা, নানা দিকে ও নানা ভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত"; সত্যেন্দ্র-নাথের "গাও ভারতের জয়, হোক্ ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়"; গোবিন্দচন্দ্রের "কতকাল পরে, বল ভারতরে" এবং প্রাচীন স্মৃতিবাহিনী "যমুনা লহরী"; মনোমোহনের "দিনের দিন সবে দীন";—এই সময়েই এই সকল জাতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নীলদর্পণের মর্ম্মঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিয়া দেয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দী-পনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। "ভারত মাতা" প্রভৃতি নূতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-স্রোত যখন শিক্ষিত বঙ্গসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরঙ্গ-মুখে, এই নূতন দেশচর্য্যার পুরোহিতরূপে, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। আর দৈবকৃপায় দেশ-কাল-পাত্রের এরূপ শুভ-যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই, তাঁহার কর্ম্মজীবন এমন অনন্য-সাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার শিক্ষা

কোনো দেশে যখনি কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্ব্বাদৌ তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিবিহীন, উদ্যমশীল যুবকমণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেমও সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার্থী যুবক-গণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের যৌবনস্বভাবসুলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্য এই অভিনব স্বাদেশিকতা প্রথমেই কোনো প্রকারের বস্তুতন্ত্রতাও লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের নূতন স্বাদেশিকতাকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, সত্য। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধনার লুপ্ত-গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বতন রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই। বিশেষতঃ দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচার-আলোচনা কখনই প্রকাশ্যভাবে বঙ্গদর্শনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। "কমলাকান্তের দপ্তরে" লেখকের অসাধারণ শ্লেষালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া, আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শেরই

গভীর আলোচনা রহিয়াছে, সত্য ; কিন্তু অতি অল্প লোকেই সে সময়ে "কমলাকান্তের" সুমধুর বিদ্রুপাত্মক সুরসিকতার নিগূঢ় মর্ম্ম-উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্য-শিক্ষাভিমানী লোকেও কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যরসটুকুই আস্বাদন করিতেন, লেখকের অদ্ভুত কৌতুককুশলতা এবং অসাধারণ শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এ সকল ছলাকলার অন্তরালে যে গভীর সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব লুকাইয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভ করেন নাই। এই সকল কারণে, বঙ্গদর্শন নানাদিক্ দিয়া আমাদিগের নবজাত স্বাদেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিয়াও, বিশেষভাবে ইহাকে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব এবং উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল না বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্তু সে সকল ইতিহাস ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে য়ুরোপেও ইতিহাস বলিতে লোকে কেবল কতকগুলি রাজার নাম এবং তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণই বুঝিত। ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ, ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে মানব-প্রকৃতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার আত্মচরিতার্থতা-লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস যে পরবর্ত্তী যুগের জনমণ্ডলীর কর্ম্মজীবনের উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল সূত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়া যায়, এ সকল কথা সে কালের য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও ভাল করিয়া ধরেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমরা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলকালেজে যে সকল ইতিহাস পাঠ করিতাম, তাহার ভিতরে কোনো উন্নত আদর্শ কিম্বা কর্ম্মের উদ্দীপনা আছে, ইহা অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণেই যদিও ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের —আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন গ্রীস্, রোম ও মধ্যযুগের য়ুরোপখণ্ডের—ইতিহাসও পাঠ করিতাম, কিন্তু এ সকল আমাদিগের প্রাণে কোনো প্রকারের সজীব স্বদেশ-প্রেমের কিম্বা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের একযোগে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়া এক ছাত্র-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্র-সভাই তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। যে অলোকসামান্য বাগ্মিতা-শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক প্রতিপত্তির

প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্রসভাতেই তাহা সর্ব্বপ্রথমে স্ফুরিত হয়। এই ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ "শিখ-শক্তির অভ্যুদয়"— The rise of Shikh Power,—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি,—সেই বক্তৃতা যাহারা শুনিয়াছিলেন—তাহাদিগের চিত্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবে না। শিখধর্ম্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল এবং পরে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে, শিখ খালসার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্ব্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্রপ্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িতসঞ্চারিণী বাগ্মীপ্রতিভাই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্য্যাদাজ্ঞান তখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদিগের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন স্বাদেশিকতা তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোনো গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষানুগত বিশ্বাস একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ-প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের প্রতিও গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল কারণে ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি ভারতে যে মহা হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উন্নত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অন্য পক্ষে বাবা নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্ম্মবাহুল্য ছিল না, অন্য দিকে সেইরূপ গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনো বৈষম্যও ছিল না শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের পিউরিট্যান (Puritan) সাধারণ-তন্ত্রের বা Commonwealth অনুরূপ ছিল। আর এই জন্যই আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। টডের রাজস্থান ইহার অনেক পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানের ভিতর দিয়া রাজপুত-সমাজের অলৌকিক স্বদেশচর্য্যার উদ্দীপনা বাংলা সাহিত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, সত্য; কিন্তু পদ্মিনীর উপাখ্যান যে একান্তই "পৌরাণিকী" কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব পরিপুষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্ত্তিকাহিনীর উপরেও

গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়াও আমরা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে প্রকৃত পক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়াও তাহার ভিতরে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে অদ্ভুত কর্ম্মচেষ্টা, য়ুন-ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।

সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-জীবনের ব্যাপকতা

এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ যে স্বদেশ-প্রীতিকে আশ্রয় করিয়া আপনার রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-জীবনের প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমাবধি সমগ্র ভারতবর্ষই তাহার উপজীব্য ছিল। বাঙালীর প্রকৃতির এবং বাংলার ইতিহাসের বিশেষত্ব হইতেই আমাদিগের স্বদেশ-প্রীতির এই অপূর্ব্ব উদারতার উৎপত্তি হইয়াছে এই আধুনিক স্বাদেশিকতা এ পর্য্যন্ত বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব, এই তিন প্রদেশেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলার স্বাদেশিকতার আদর্শ যতটা উদার ও উন্নত, মহারাষ্ট্রের কিম্বা পাঞ্জাবের স্বাদেশিকতার আদর্শ ততটা উদার ও উন্নত নহে। ইংরেজ এদেশে না আসিলে ভারতরাষ্ট্রে মারাঠা ও শিখ, ইহারাই সম্ভবতঃ মোগলের উত্তরাধিকারী হইয়া দেশের শাসন-শক্তিকে অধিকার করিয়া বসিতেন। ব্রিটিশ-প্রভুশক্তির প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইলেও তাহার স্মৃতি শিখ বা মারাঠার চিত্ত হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আর এই কারণে পাঞ্জাবের কিম্বা মহারাষ্ট্রের স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব লুকাইয়া আছে। বাংলায় সেরূপ কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি নাই বলিয়াই, বাঙালীর স্বাদেশিকতার কোনো প্রাদেশিক আশ্রয়ও নাই। অন্যদিকে বাঙালীর প্রকৃতিও শিখ বা মারাঠার প্রকৃতির মত নহে। শিখ খাল্‌সা ভারতমাতার বাহুতেই বল সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে তাঁহার বাণী-শক্তি অধিকার করিতে পারে নাই। অন্যদিকে মারাঠা ও বাঙালী ইহাদের বুদ্ধি-বল ভারতের অপরাপর জাতির বুদ্ধি-বল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও বাঙালীর বুদ্ধিতে ও মারাঠার বুদ্ধিতে প্রভেদও বিস্তর। মারাঠার বুদ্ধি কার্য্যকরী, ইংরাজিতে ইহাকে practical বলে। বাঙালীর বুদ্ধি ভাবময়ী, ইংরাজিতে ইহাকে idealistic বলা যায়। কার্য্যকরী বুদ্ধি ফলসন্ধিৎসু;

কর্ম্মাকর্ম্মের আসন্ন ফল লক্ষ্য করিয়া চলে। ভাবময়ী বুদ্ধি সত্যসন্ধিৎসু; কর্ম্মাকর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলাফলকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবরাজ্যে ও তত্ত্বাঙ্গে তাঁহার কি পরিণাম ঘটিবে, তাহাই কেবল দেখে। কার্য্যকরী বুদ্ধি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তবকে ধরিতে চাহে; ভাবময়ী বুদ্ধি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শেতেই আত্মসমর্পণ করে। দেশচর্য্যায় কার্য্যকরী বুদ্ধির প্রেরণা প্রাদেশিকতাকে বাড়াইয়া তোলে এবং স্বদেশ-ভক্তিকে সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে। ভাবময়ী বুদ্ধি দেশচর্য্যা ও দেশভক্তিকে সর্ব্ব প্রকারের প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া উদার ও সার্ব্বজনীন করিতে চাহে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্য্যকরী বুদ্ধি আসন্নফলসন্ধিৎসু politicianএর বা রাজনীতিকের সৃষ্টি করে। আর ভাবময়ী বুদ্ধি দূরদর্শী ও সম্যক্‌দর্শী নীতিজ্ঞ বা Statesmanএরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্ম্মজীবনের তুলনায় এই দুই জাতীয় মানববুদ্ধির ভেদাভেদের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আর বাঙালীর প্রকৃতির গুণে এবং আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় গৌরবস্মৃতির অভাবে, আমাদিগের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ বাঙালী কর্ম্মনায়ক সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনও সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িতে আরম্ভ করে। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টা প্রাদেশিক শাসনের ভালমন্দ লইয়াই বিব্রত এবং প্রাদেশিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কবি-কল্পনাতে এবং সংবাদপত্রেই কেবল ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ব-বোধের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত, নতুবা এক প্রদেশের সুখ-দুঃখ অন্য প্রদেশের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত কি না সন্দেহ। কলিকাতার ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভা, পুনার সার্ব্বজনিক সভা ও মান্দ্রাজের মহাজন-সভা, এ সকলই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারতসভার বা Indian Associationএর জন্ম হয়, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও চিন্তাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বিশাল কর্ম্মজালে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভারতসভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই উত্তর ভারতের বড় বড় সহরে শাখা সভা সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগে, কাণপুরে, মীরাটে ও লাহোরে শাখা-ভারতসভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে। যে স্বদেশাভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভারতসভা দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, কংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যদি তাহা একান্ত বহির্ম্মুখীন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত ইহা এখন কল্পনা করাও সুকঠিন।

ফলতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতসভার কর্ম্মনায়কগণ একটা বিরাট জাতীয়-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নানা স্থানে শাখা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আর কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনৈতিক লাট ডফ্‌রিণেরও যে কতকটা সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন। বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ভারতসভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটা জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতীয়-সমিতির বা National Conferenceএর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সংবাদ রাখিতেন কি না, জানি না। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সে দেশের নানাস্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁরা যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা জানি। ইঁহারা সকলেই এই National Conferenceকে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যৎ প্রজাশক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস যদি সহসা এই স্থানটী পূর্ণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের এই National Conference আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তি-কেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী এল্যান্‌ ও হিউম। ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইএর প্রধানতম কৌন্সিলী ফিরোজসা মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল সুব্রহ্মণ্য আয়ার। কংগ্রেস এই রূপে প্রথম হইতেই অসাধারণ পদ-বল ও ধনবলের উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-চেষ্টার অন্তরালে তখন এ দু'য়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত National Conferenceকে সহজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃত পক্ষে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি হইয়াছে, না লাভ হইয়াছে বলা কঠিন নহে। কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কন্‌ফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম্ম-চেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত না হইত, তাহা হইলে দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস তাহা যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন ও করিতেছিলেন সে গুলির শক্তিহরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্ব্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীর্ত্তি দুটী ---এক লাট ক্রসের ১৮৯১ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট, আর অন্য লাট মর্লের আধুনিক কাউন্সিল্‌সংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকে নষ্ট করিয়া দেশের কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। ফলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথের অনন্যপ্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ কিয়ৎ পরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি প্রথমে যে পথে চলিয়া দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া, বহুল পরিমাণে আপনার কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণ সফলতারও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন।

কিন্তু ইহাতে যে দেশের কোনো সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে, এমনও বলিতে পারি না। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টা সময়োপযোগী হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার কিম্বা তাঁহার স্বদেশী লোকপ্রকৃতির অনুযায়ী হয় নাই। সমাজসংস্কারে কেশবচন্দ্র যেমন প্রথম জীবনে বহুল পরিমাণে বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় যে সেই বিরোধের সঙ্গতি ও মীমাংসা হইবে, তাহার নিগূঢ় সন্ধান ও সঙ্কেত ধরিতে পারেন নাই; সুরেন্দ্রনাথও সেইরূপ ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শাসনসংস্কার করিতে যাইয়া, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধই জাগাইয়া তুলেন, কিন্তু কোন্ পথে যাইয়া শাসিতেরা যে প্রকৃত পক্ষে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, আর কোন্ সূত্র ধরিয়াই বা এ দেশের শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিরোধ জাগিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ সে সন্ধান এবং সঙ্কেত প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে সংযত করিয়া ক্রমে প্রজাশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পথই সুরেন্দ্রনাথের সুপরিচিত। সুরেন্দ্রনাথের অলোকসামান্য মেধা আছে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতা নাই। যেটী যেমন আছে বা হইয়াছে, তিনি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ধরিতে পারেন, কিন্তু যে মানসিক শক্তি চারিদিকের বিষয় ও বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কোনো নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারে, সে শক্তি সুরেন্দ্রনাথের নাই। সুতরাং স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশ সাধনে ব্রতী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, সাধনা ও প্রকৃতির অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের ভাষা যে তার স্বদেশের লোকে

বুঝিতে পারে না, ইংরেজের ভাব যে তারা ধরিতে পারে না, ইংরেজের পথ যে তাদের একেবারেই অপরিচিত, ইংরেজের প্রকৃতি যে তাহাদের প্রকৃতি হইতে একান্তই ভিন্ন; এ সকল কথা সুরেন্দ্রনাথ এখনও ভাল করিয়া বুঝেন কি না সন্দেহ। আর স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের লোকপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তার এবং আদর্শের কোন জীবন্ত যোগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবনব্যাপী রাষ্ট্রীয় কর্ম্মোদ্যম কেবলমাত্র একটা অসম্বদ্ধ, অনির্দ্দিষ্ট, প্রবল রাষ্ট্রীয় অভাববোধকেই জাগাইয়াছে; কিন্তু এখনোও দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো অঙ্গকেই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এইরূপ অভাববোধ হইতে উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু কখনই দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম্মই তারা বোঝে, ধর্ম্মের নামেই তারা মাতে, ধর্ম্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব। অথচ সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজি পর্য্যন্ত লোকসম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচনা দেশের মুষ্টিমেয় নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উপরেই যাহা কিছু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জনমণ্ডলীর চিত্তকে স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ক্রমে ক্রমে নূতন পথ ধরিয়া, নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের জনমণ্ডলীর চিত্তে এক নবশক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট চিরঋণী রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও জনগণের চিত্তে যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে তাহা কোনো কোনো দিকে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের এবং কর্ম্মচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথের অশেষপ্রকারের ত্রুটী দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি যে কাজটী করিয়াছেন তাহা না করিলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাজটী করিয়াছেন, সে কাজ অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না। আর এইজন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্‌লা-লেখার রীতি

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহু লেখাতেই অনেকস্থলে শব্দসমূহের পরস্পর সম্বন্ধরক্ষা নাই, বা থাকিলেও যথোচিত চিহ্নদ্বারা তাহা সূচিত হয় না। বলিবার সময় ভাষায় যে ত্রুটি লক্ষিত হয় না, লিখিবার সময় তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

অনেকে লিখিয়া থাকেন 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চ্চা', কিন্তু ইহা ঠিক নহে। 'প্রাকৃতিক' পদের সহিত 'বিজ্ঞান' পদের, এবং ইহার সহিত 'চর্চ্চা' পদের সম্বন্ধ; অতএব সংযুক্ত করিয়া লিখিতে হইবে 'প্রাকৃতিকবিজ্ঞানচর্চ্চা।'

লিখিত হইয়া থাকে 'অনুরূপ ফললাভাশা', এখানে 'অনুরূপ' পদের 'ফললাভাশা' পদের সহিত সম্বন্ধ নহে, 'ফল' পদের সহিত সম্বন্ধ। অতএব লেখা উচিত 'অনুরূপ-ফললাভাশা' অথবা 'অনুরূপফললাভাশা'।

সমস্ত পদ অতিদীর্ঘ হইয়া উঠিলে পদগুলিকে হাইফেন ও কমার যোগে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিলে পাঠের কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, 'প্রবাদ-, কাহিনী- ও জনশ্রুতি-সমূহ।' এখানে 'সমূহ' পদের 'প্রবাদ', 'কাহিনী' ও 'জনশ্রুতি' এই তিনটি পদেরই সম্বন্ধ, এবং তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে স্পষ্টভাবে সূচিত হয়।

লেখা হয় 'ধাতু ও প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি।' এখানে 'ধাতু' ও 'প্রস্তর' উভয়েরই সহিত ময়ট্‌প্রত্যয়ের সম্বন্ধ। অতএব তাহার সূচনার জন্য হাইফেন দিয়া লিখিতে হইবে 'ধাতু- ও প্রস্তর-ময়ী মূর্ত্তি।' এইরূপ 'ধাতু- ও প্রস্তর-মূর্ত্তি। 'ধাতু ও প্রস্তরমূর্ত্তি নহে'; 'স্থাপত্য- ও ভাস্কর্য্য-বিদ্যা', 'স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যবিদ্যা' নহে; 'ঋক্- ও সাম-বেদ', 'ঋক্ ও সামবেদ নহে; 'জাতি- ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে', 'জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে' নহে; 'যুক্তি-ও তর্ক-বলে', 'যুক্তি ও তর্কবলে' নহে। 'সৎ-, চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ,' 'সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ' নহে; 'হিন্দু,- বৌদ্ধ- ও জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী,' 'হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী' নহে; 'নিন্দা- বা প্রশংসা-মাত্র', নিন্দা বা প্রশংসামাত্র' নহে; ইত্যাদি।

আবার 'ঐ সমস্ত যুক্তিতর্কপ্রদর্শন' না লিখিয়া 'ঐ সমস্ত যুক্তিতর্ক-প্রদর্শন' লেখা সঙ্গত, ইহাতে 'সমস্ত' পদের সহিত 'যুক্তিতর্ক' পদের সম্বন্ধ সূচিত করিতে পারা যায়।

'তিনি যে শিক্ষার পক্ষপাতী তাহা কল্যাণকর নহে' এই ব্যাক্যটিকে অসন্দিগ্ধ করিবার জন্য বক্তার বিবক্ষা-অনুসারে দুই প্রকারে লিখিতে পারা যায়—'তিনি যে, শিক্ষার পক্ষপাতী ইত্যাদি;' অথবা তিনি যে-শিক্ষার পক্ষপাতী ইত্যাদি'; এইরূপ 'তখন যে-কোন ব্যক্তি', অথবা 'তখন যে, কোন ব্যক্তি'; 'কল্য যে-কেহ আসিবে', অথবা 'কল্য যে, কেহ আসিবে'; ইত্যাদি।

'এই পুস্তকখানি তাঁহার জনৈক শিষ্য প্রণীত' অথবা 'এই......শিষ্যপ্রণীত লেখা

ঠিক নহে, লেখা উচিত 'এই...শিষ্য-প্রণীত', তাহা হইলেই 'শিষ্য' পদের ন্যায় 'জনৈক' পদেরও 'প্রণীত' পদের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে।

'সত্য সত্যই', 'প্রধান প্রধান' ইত্যাদি পদগুলিকে সংযুক্ত করিয়া অথবা স্থানবিশেষে হাইফেন দিয়া লেখা উচিত। যথা, 'সত্যসত্যই', 'প্রধানপ্রধান', অথবা সত্য-সত্যই, প্রধান-প্রধান; 'এক-এক', 'আর-আর', 'অন্য-অন্য'; ইত্যাদি। 'মুসলমান অধিকার প্রবর্ত্তনের পর' না লিখিয়া 'মুসলমান-অধিকার-প্রবর্ত্তনের পর' লেখা সঙ্গত। 'দ্বারবর্তী অভিমুখে' না লিখিয়া 'দ্বারবতী-অভিমুখে' লেখা উচিত। 'যে যে রাজ্যে রেশম, পশম, কার্পাসাদিজাত বস্ত্র' স্থলে 'যে যে রাজ্যে 'রেশম-পশম-কার্পাসাদি-জাত' অথবা 'যে যে রাজ্যে রেশম-, পশম- ও কার্পাসাদিজাত' লেখা সঙ্গত। 'এই কর্ম্ম বহুল আয়াসসাধ্য' না লিখিয়া 'এই কর্ম্ম বহুল-আয়াস-সাধ্য লেখা উচিত। এইরূপ 'উচ্ছৃঙ্খলতা- ও যথেচ্ছাচারপ্রভৃতি-নিবারণ', 'উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচার প্রভৃতি নিবারণ নহে'; 'শারীরিকসুখলাভই পুরুষার্থ', 'শারীরিক সুখলাভই পুরুষার্থ' নহে।

'যা তা', 'যে সে', 'কোন না কোন' ইত্যাদি বাক্যখণ্ডকে হাইফেন দিয়া যোগ করিয়া, লিখিলেই ভাল হয়; যথা, 'যা-তা' 'যে-সে', 'কোন-না-কোন'।

ইহা ছাড়া মুদ্রিত পুস্তকসমূহে মুদ্রণসম্বন্ধে সামান্য-সামান্য এত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যে, সাধারণ পাঠকও একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু কোনো সমালোচকও ইহার সংশোধনের দিকে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। যে সকল সম্পাদক নিজ নিজ মাসিকপত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, দুঃখের বিষয়, তাঁহারাও এ সম্বন্ধে কোনোরূপ মনোযোগ করেন নাই।

গুরুত্ব প্রভৃতি সূচনার জন্য ইংরাজীতে ইটালিক অক্ষর ব্যবহৃত হয়। দেবনাগর তদনুসরণে স্বতন্ত্র অক্ষর করিয়া লইয়াছে। বাংলা এ বিষয়ে এখনো পশ্চাৎপদ। আমি এ অভাব অনুভব করিয়া সেই-সেই শব্দের অক্ষরগুলিকে ফাঁক-ফাঁক করিয়া লিখিবার প্রস্তাব করি। যেমন বৈ দা ন্তি ক। রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বহু পালিগ্রন্থে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে এই নিয়ম অনুসরণ করিতে দেখা যায়।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ

মন্দির

দূর হ'তে শ্রীমন্দির করি দরশন
প্রেম পুলকিত হিয়া
স্মৃতি অশ্রু উথলিয়া
জন্ম জন্মান্তর যেন হইল স্মরণ।
এই সে শ্রীক্ষেত্রধাম
আশৈশব যার নাম
শুনিয়াছি, সেই যার অপূর্ব্ব কাহিনী
অঙ্কিত মন্দির অঙ্গে
বরণে বিচিত্র ভঙ্গে
কঠিন প্রস্তরে চারু মূরতি মোহিনী!
ঘৃণা লজ্জা কুলমান
নাহি হেথা ব্যবধান
ভগবৎপ্রেমার্ণবে সব একাকার,
পতিতপাবন হরি
জগন্নাথ রূপ ধরি
অপূর্ণ শরীরী প্রভু, হৃদয় তাঁহার
অধম জীবের তরে
সদা উথলিয়া পড়ে
বাহুহীন আলিঙ্গনে বাঁধিছে সবায়,
শোকার্ত্তের শোক দূর
পতিতের মুক্তি পুর
এ মহা নির্ব্বাণ তীর্থে কামনা বিলয়।
জাতিভেদ হেথা নাই
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে তাই
মহাপ্রসাদের অন্ন অমৃত সমান,
একত্র বসিয়া খায়
ভকতি পুলক কায়
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা সর্ব্ব সমজ্ঞান!
দীনবন্ধু নাম তব করিয়া শ্রবণ
শোক তাপে পরিশ্রান্ত
গৃহহীন পথভ্রান্ত
নির্ব্বাণ তীর্থের যাত্রী তোমার সদন
আসিয়াছি, শুনিলাম,
ইহ লোকে মোক্ষধাম
তীর্থ এই, শোকবহ্নি করিতে নির্ব্বাণ
পারো তুমি প্রেমদানে,
সর্ব্বদুঃখ পরিত্রাণে
লোকান্তরে মুক্তি চির করিতে বিধান

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

১ম হইতে ৬ষ্ঠ ফর্ম্মা শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মেটকাফ প্রেসে, এবং ৭ম ও ৮ম ফর্ম্মা ২০নং পাটুয়াটোলা লেন বিজয়া প্রেসে, আর, সি, চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।"

বঙ্গদর্শন

প্রেমিক রবি

প্রেমের যে দর্শন-শাস্ত্র নাই, এ কথা অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু ইহার দর্শন কাব্যের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়, টানিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম যুগের কবিগণ প্রেমের কোন বিশদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। মধ্য যুগের কবিবর্গ মনুষ্যবর্গের মধ্যেই প্রেম-সঞ্চারের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রাণিবর্গ এমন কি উদ্ভিদ্-বর্গের সহিত প্রেম-সংস্থাপন আরম্ভ হইলে পর, প্রেমের সম্মান সমধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখন সমগ্র বিশ্বই প্রেমের ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রকে পাশ্চাত্য কবিগণ nature বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন ; আমরা তাহাকে 'প্রকৃতি' বলিয়া থাকি। ঈশ্বর কে ? প্রকৃতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি ? প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার তত্ত্ব এবং আভাস কি পাওয়া যায় ?—এ সকল কথা পূর্ব্বে দার্শনিকগণেরই খাদ্য ছিল, ক্রমে ইহা কবিগণের খাদ্য হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্যের মধ্যে, ছন্দের মধ্যে, গানের মধ্যে, এমন কি রাজনীতি ও সমাজনীতির মধ্যেও এই নিগূঢ় তত্ত্ব আন্দোলিত হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ কি ? প্রেম কি সেই সম্বন্ধ ? এটা কি চিরন্তন সম্বন্ধ ? ইহার কত প্রকার ভাব, এবং ভাবের রূপান্তর দেখিতে পাই ? ইহার উদ্দেশ্য কি এবং সার্থকতা কি ? এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি সৎ কি অসৎ ?

প্রকৃতি ও ঈশ্বরের কথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোন্ খানে, তাহা জানিবার কৌতূহল সকলেরই উদ্দীপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

'প্রকৃতি' একটা কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থ। দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান, কাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র সকলেরই নিকট 'প্রকৃতি'র একটা না একটা অর্থ আছে। কিন্তু 'পুরুষ' শব্দটি 'কিম্ভূত' না হউক, 'কিমাকার' কথা, কারণ অন্যান্য দেশে এ কথা ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার ব্যবহার প্রথম ও শেষ। আমাদিগের শাস্ত্রে 'পুরুষে'র পরিবর্ত্তে আত্মা বলিলেও চলিবে না, 'ঈশ্বর' বলিলেও চলিবে না।

দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দোহন করিয়া 'মানবতত্ত্ব' নামক একখানি গ্রন্থে কোন খ্যাতনামা পরিব্রাজক 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থের একটা তালিকা দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) মায়া ও প্রকৃতি একই,—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(২) গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। মায়া ও অবিদ্যা। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি (পরা প্রকৃতি—গীতা) 'মায়া' এবং মলিনসত্ত্বা প্রকৃতি (মন, ইন্দ্রিয়াদি—অপরা প্রকৃতি—গীতা) অবিদ্যা। মায়া যাহার অধীনা, এবং যিনি মায়াতে অধিষ্ঠিত, সেই পরমপুরুষ ঈশ্বর।

(পঞ্চদশী)

(৩) আত্মা ও প্রকৃতির সম্বন্ধ, যেমন স্পন্দন ও পবন।

(কূর্ম্মপুরাণ)

(৪) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্বজগৎ। মহদাদি সপ্ততত্ত্ব বিষ্ণুর একদেশবর্ত্তী, এই জন্য 'অর্দ্ধগর্ভা' নামধেয়া।

(ঋগ্বেদ-সংহিতা ২।২১।৬৪)

(৫) কিন্তু 'অর্দ্ধগর্ভা' প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াও যিনি মুক্ত, তিনিই সত্য, পূর্ণ অমৃতময় পুরুষ।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

(৬) প্র+কৃ+ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া প্রকৃতি। প্রকৃষ্ট প্রকারে কর্ম্মসম্পাদনের ভাব। (নিরুক্ত)

(৭) প্র+কৃ+ক্তিচ্ প্রত্যয়, অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্ট প্রকারে কার্য্য সম্পাদন করে।

(তত্ত্বকৌমুদী)

(৮) প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, অবিদ্যা সকলেই 'প্রকৃতি'র পর্য্যায়। (বাচস্পতি মিশ্র—বৈদিক অর্থ)

(৯) প্রকৃতি উপাদান-কারণ, পঞ্চমী।

(পাণিনি—১।৪।৩০)

(১০) পরমেশ্বরের অদৃষ্টরূপা সহকারিশক্তি মায়াই প্রকৃতি, অবিদ্যা প্রভৃতি।

(উদয়নাচার্য্যের ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি)

(১১) বিষয় এবং তদ্গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নাই, ক্রান্তদর্শী কবিগণ তাহা বুঝিতে পারেন।

(ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।১৭।১)

(১২) শিবাই এক অদ্বিতীয় 'শক্তি', শক্তিমান্ হইতে শক্তির ভেদ নাই।

(কূর্ম্মপুরাণ)

(১৩) প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী। জগৎ প্রকৃতি হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়। (পাতঞ্জল মহাভাষ্য)

(১৪) 'সর্ব্বোপাদানম্'। (সাংখ্য)

এই শব্দার্থের মধ্যে প্রেমের স্থান কোথায়, তাহা প্রেমিকগণই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি' 'পুরুষ' ও 'কাল' আমারই ত্রিমূর্ত্তি।' বিজ্ঞান ভিক্ষু কণাদকে অবলম্বন করিয়া পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতিকে দেখিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার পরিপোষক। কিন্তু মোট কথা প্রকৃতি অজ্ঞেয়। এহেন অজ্ঞেয় এবং অর্থহীন পদার্থের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করা কিরূপ গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কবিগণ তাহা করিতে ছাড়েন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহার সেরা।

তিনটী অবস্থার কথা শুনা যায়। জাগ্রত, সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন। প্রেম কোন্ অবস্থা, তাহা বলা সহজ নহে; কেবল কবি জানেন। অতএব আমাদিগের মত সাধারণ লোকের মাথায় 'প্রকৃতি', এবং 'প্রকৃতি'র প্রেম

কিংবা তদ্বিষয়িণী কবিতা কিংবা সংহিতা-দর্শনাদির অর্থ প্রবেশ করা কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা বলিতে হইবে কি ?

কিন্তু 'বিশ্বপ্রকৃতি', 'পরমাত্মা', 'জীবাত্মা' প্রভৃতি কথার এত বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সর্ব্বপ্রথমে প্রতীচ্য জগতে ইহা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের জন্মের শতাধিক বৎসর পরে গ্রীস্ দেশে প্লেটোর জন্ম হয়। ভারত-বর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র তখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। প্লেটোর পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ প্রকৃতির সহিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্নবান হয়েন নাই। প্লেটোর মতে Psyche (জীবাত্মা) বিশ্বাত্মা (world soul) এবং বিশ্বপ্রকৃতির (Nature) মিলনের ফল। উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবাত্মার ঊর্দ্ধে (মুক্ত ও আনন্দ-ময় অবস্থা) এবং রসাতলে (বদ্ধ এবং নিরা-নন্দময় অবস্থা) ক্রমান্বয়ে গতি হয়। কামনা-বর্জ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যের উপভোগ ধর্ম্ম-জীবনের (spiritual life) উপযোগী। ইহাই উপাসনার মূল। লক্ষ্য পরমাত্মা।

প্লেটো কিছুই নূতন কহেন নাই উপ-নিষদোক্ত বৃক্ষস্থিত দুইটি পক্ষীর কথা দর্শনের ভাষে প্রকটিত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইহা দ্রষ্টব্য যে, সখ্য ও প্রেম এবং তজ্জনিত আনন্দের আভাস্ প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রে আমরা প্লেটোর নিকট প্রথমে প্রাপ্ত হই। প্লেটোর প্রেম দার্শনিক প্রেম, তাঁহার republic ঠিক সাধারণতন্ত্র নহে। প্রেমের রাজা এবং সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক কর্ম্মবীরগণ সেই রাজ্যের নেতা। এমন কি, সঙ্গীত, চিত্র ও কাব্যেও জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুর লেশ থাকিবে না। ভারতবর্ষেরও তাহাই আদর্শ ছিল।

তাহার পর সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে আমরা কোন দেশে প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ-জনিত পরম আনন্দের কথা দর্শনশাস্ত্রে কিংবা কাব্যে দেখিতে পাই না। এই তমিস্রা-পূর্ণ মহাযুগ নূতন জাতি-সংগঠনে কাটিয়া গিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসর কালে গ্রীস দার্শনিক এপিকুরস্ আনন্দের চরম উপভোগ সম্বন্ধে একখানি অপূর্ব্ব সংহিতার সৃষ্টি করিয়া দর্শনশাস্ত্রের ঊর্দ্ধগতি নিবৃত্তি করিয়া দিয়া-ছিলেন। সেই উপভোগের ইতিহাস মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের মধ্যে সমধিক ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। কামিনী কাঞ্চন-লাভ এবং ইন্দ্রিয়ের উপভোগই তখন Psyche এর আদর্শস্থল। রণ মদিরা, প্রেম-মদিরা, এবং 'সিরাজী', কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের তামসিক প্রতিবিম্ব। তদানীন্তন সাহিত্য, কাব্য এবং ইতিহাস তাহাতেই পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে তন্ত্রের এবং ভাগবত ধর্ম্মের ব্যভি-চারও সেই পথের দৃশ্য।

এই বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে পরাপ্রকৃতি (Holy Spirit) লুপ্ত এবং গুপ্ত হইয়া প্রতীচ্য জগতে যে অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে স্পিনোজা, কাণ্ট, ফিক্টে এবং সেলিং। যীশুখৃষ্ট সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে ধর্ম্মের প্রথম উন্মেষের কালে প্রকৃতি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরালে স্থিত। ঈশ্বর এবং মানব, পাপ এবং পুণ্য, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম

সকলেই পৌরুষেয়। প্রকৃতি জড়মাত্র। পুরাতন তন্ত্র রোমান কাথলিক ও যেশুইটগণের মধ্যে পরিচ্ছিন্নভাবে রহিয়া গেল। নূতন প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্ম কর্ম্মজগত লইয়া ব্যস্ত হইল। সেটা নৈতিক জগৎ (moral world)। বিজ্ঞান জড়-প্রকৃতি লইয়া ব্যস্ত হইল। কর্ম্মক্ষেত্রই সকলের রঙ্গস্থল। ডেকার্টে, হিউম্ প্রভৃতি ন্যায়দর্শনের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি কে? আমার ভাব কি? জড়-প্রকৃতি মিথ্যা কি সত্য? ভাববাদিগণ ও জড়বাদিগণের মধ্যে মহা সংগ্রাম বাধিল। কর্ম্মক্ষেত্রই প্রেমের ক্ষেত্র, কর্ম্মবীরই প্রেমের বীর, মানবসমাজই তাহার উৎকর্ষস্থল। ইউরোপের Feudalism এবং রাজস্থানের Feudalism একই ঠাটে সংগঠিত। কিন্তু রাজস্থান ও কালিদাস, রামানুজ ও কবীর, পরাপ্রকৃতি বিস্মৃত হন নাই। Round Table এবং সেক্ষপীয়র, Neoplatonists এবং নব্যযুগের দর্শন, প্রকৃতি হইতে বহুদূরে। বিজ্ঞান তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হইল। ফিক্টে এবং সেলিং দর্শনশাস্ত্রে তাহার পুনর্ব্বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। Transcendentalismএর এই প্রথম সূত্রপাত।

স্পিনোজা দেখাইয়াছিলেন, ঈশ্বরই প্রকৃতির কর্ম্মের নেতা এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার ক্ষেত্র। কেবল মানবসমাজই যে তাঁহার রঙ্গস্থল এবং ধর্ম্মস্থল, তাহা নহে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পালন করা আমাদিগের স্বতঃই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও ধর্ম্মের পার্থক্য কি? এই মহাদ্বন্দ্বসঙ্কুল বিশ্বের মধ্যে ধর্ম্মের সত্য এবং অক্ষুণ্ণ পথ কোথায়? ফিক্টে বলিলেন, প্রকৃতির অবগুণ্ঠন তুলিয়া দেখ—

"Quite clear the veil is
raised from thee and lo!
'Tis Self: let die, then,
this destructible:
And henceforth God will
live in all thy strife.
Consider what survives
this strife below;
Then will the veil,
as veil be visible.
And all revealed thou'lt
see celestial life."

——Fichte's Sonnets.

সেলিং তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্রষ্ট এবং দৃশ্য, পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্পূর্ণভাবে একতা-স্থাপনই transcendental philosophyর উদ্দেশ্য। একটি conscious subjective, অন্যটি conscious objective. চৈতন্যময় এবং চৈতন্যময়ী। বস্তুতঃ উভয়ই এক, ব্যবহারিক ভাবে পৃথক্। কিন্তু এই পার্থক্য সমীকরণ হইলে আর থাকে না। ভাব দ্বারা সেই সমীকরণ হয়। জীবাত্মার মধ্যে সেই ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। মানবসমাজে তাহা উৎকর্ষ লাভ করে। জীবাত্মা উভয় পক্ষের উকীল। প্রকৃতির তরফে কহে 'আমি ও তুমি এক', পুরুষের তরফেও কহে 'আমি ও তুমি এক'। এই জন্য Schwegler কহিয়াছেন—"God, whom Fichte conceived only as an object of moral

belief, has become for Schelling a direct object of æsthetic institution."

জ্ঞানমার্গে, এবং অদ্বৈতবাদে আমরা এই æsthetic institution দেখিতে পাই না। এই সুন্দর মুখশ্রী, বাহু, কেশ, দন্ত, সকলিই আমার। 'আমার'? এ গুলিকে 'আমি' বল না কেন? বলিবার যো নাই। আমি স্বতন্ত্র। ঐ যন্ত্রণায় এগুলিকে এড়াইয়া মুক্ত হইতে চাই, কিন্তু পারি কৈ? মায়ার মত ইহারা সঙ্গে লাগিয়া থাকে। বেদান্ত বলেন 'উপায় নাই, কিন্তু উহারা অসৎ'। দ্বৈতবাদী কহেন "বাঃ তবে কাব্য থাকে কোথায়?" এই মুখশ্রী অন্য একটি মুখ দেখিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিয়াছি, এই বাহু দ্বারা তাহার কার্য্য সাধিয়াছি, এই কেশ দ্বারা সেই চরণ মুছাইয়াছি, এবং এই দন্ত দ্বারা আনন্দে হাসিয়াছি। জড় হইলে কি হয়, ইহারা সঙ্কেত মাত্র, ছবি মাত্র। সমগ্র বিশ্ব যে একেরই ছবি, তাহা জানিবার যো কি? অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যে দ্বৈতভক্তির সঞ্চারণা করাই transcendental কাব্যের লক্ষ্য। হেগেল বলেন—"Nature is a Baochantic God, uncontrolled by, and unconscious of himself." কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব নহে। ভাবের সমাবেশের মধ্যে আত্মজ্ঞান ও আত্মচৈতন্য না থাকিলে তাহা কেবল প্রতিবিম্বের মত হইয়া পড়ে, অতএব জ্ঞানী ভক্তই সম্পূর্ণ মনুষ্য। কবিবর Wordsworth এর trance এর মধ্যেও আত্মজ্ঞান কখনও বিচলিত হয় নাই। আত্মহারা কবি ও আত্মজ্ঞানরহিত কবির কাব্য, স্বপ্ন-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইলেও নিকৃষ্ট। তাই হেগেলের নিকট "Poetry forms the transition of art into religion. In art the idea was present for perception, in religion it is present for conception. All religions seek unity of the Divine and Human."

কেবল কতগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বাছা বাছা কথায় একটা স্বপ্নজড়িত ভাবের সৃষ্টি করিয়া, অর্থহীন কতকগুলি অসত্যের অবতারণা করা কবিত্ব নহে। কবির বাস্তবিক অনুভূতি চাই। প্রাণের কথা এবং সত্য কথা ভিন্ন কাব্যের মহিমা থাকে না। 'এই তোমার বীণা, মুরলী ও মৃদঙ্গ, গান গাহিতে পার ত গাও।' যদি স্বর্গীয় প্রতিভা তোমার থাকে, তোমার গানে সকলেই আকৃষ্ট হইবে। 'এই তোমার প্রকৃতি, যদি ঈশ্বরকে তাহার মধ্যে দেখাইতে পার ত দেখাও, নচেৎ অন্য কোন যাদুকরী চলিবে না।' হে মানবসন্তান! হে সাধক কবি! তোমার সম্মুখে এই মহাকর্ত্তব্যতা পড়িয়া আছে। ঈশ্বর স্বামী, প্রকৃতি সতী। মানব তাহার সন্তান এবং ধর্ম্মপ্রচারক। কাব্য সেই ধর্ম্মের গাথা। বিশ্বের জনন, ধারণ, পালন করুণা-প্রমুখ। এই বিরাট্ নারীত্ব (feminism) প্রকৃতির এক অংশে প্রতিভাত। বিশ্বের উৎকর্ষ সংহার-প্রমুখ, ক্রম-বিকাশ বিধানের অন্তর্গত, সেখানে পুরুষের স্থির অচল হৃদয় প্রতিভাত। দ্বন্দ্ব হানাহানি দেখিয়া ভয় পাইও না। করুণা এবং নৃশংসতার সামঞ্জস্য জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যস্থলে। উপাধি ভঙ্গ না করিয়া যদি অল্প আয়াসে সত্যের আভাস পাইয়া মানব কামনা ও কামনা-

জনিত দুঃখ হইতে নিস্তার পায়, তবে কুরু-ক্ষেত্রের দরকার কি? যদি প্রতাপ ডাক্তার এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক দিয়া আরোগ্য করিতে পারে, তবে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সর্ব্বাধি-কারীকে ডাকিয়া বিড়ম্বনা কেন?

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি-বেন যে, কাব্যজগতে transcendentalism-এর দিকে ঘেঁসিলে বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে হয়। ঈশ্বরের স্বরূপত্ব চতুর্দ্দিকে প্রমাণিত করিতে হইবে। এক দিকে জড়প্রকৃতি ও বিজ্ঞান, অন্য দিকে মায়াবাদ ও দর্শন, মধ্যে মানবপ্রকৃতির লৌকিক এবং অলৌকিক সংমিশ্রণ। এই বিচিত্র ক্ষেত্রে স্বপ্নময় হা-হুতাশ এবং উন্মত্ত বাক্যলহরীর প্রলাপ ছাড়িয়া দিলে কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং Mathew Arnold তাঁহার Essays on Criticism নামক গ্রন্থে trans-cendental schoolএর উপর কশাঘাত করিয়াছেন। সেক্ষপিয়র ও স্পেন্সর, গেটে ও হেনের সহিত তুলনায় বাইরণ, শেলি ও কীট্‌স বহু অংশে নিকৃষ্ট। "They do not belong to that which is the main current of literature of modern epochs, they do not apply modern ideas to life."

কিন্তু এই modern ideas ও তদানু-ষঙ্গিক যন্ত্রণাময় উত্তাল তরঙ্গরাশি ভারতক্ষেত্রে আসিয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে, ও ভবিষ্যতে কিরূপ একটা অভিনব জাতির সৃষ্টি করিবে, এবং সনাতন ধর্ম্মের পূর্ব্বকর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করিতে জগৎ বাধ্য হইবে কি না, সে প্রশ্নের এখনও ভাল করিয়া মীমাংসা হয় নাই। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, রবীন্দ্রনাথ সেই পথে কতদূর কৃতকার্য্য এবং অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া সেদিনকার মত তাঁতবাঁত তুলিয়াছি। গভীর রাত্রিতে তন্দ্রাবশে অনুপ্রাস আমার স্কন্ধে ভর করিয়া বলিলেন—যদি আমার অধিকার বিচার করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে মিছা-মিছি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া আসর সরগরম করিতেছ কেন? আমি কত স্থানে কত ভাবে বিরাজ করিতেছি, বলিয়া যাই, লিখিয়া লও। এক রাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রচার করিয়া দেখ, যদি ইহা নাটক-নভেল-পরিপ্লাবিত বঙ্গভূমিতে আদর পায়, তবে আরও সহস্র রজনীর বৃত্তান্ত বিবৃত করিও।

১। রাশি রাশি দ্বন্দ্বসমাসের দৃষ্টান্ত দিয়াছ। কিন্তু অন্যান্য সমাসও আমার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সাধুভাষার যে সব প্রয়োগ চলিত ভাষায় অত্যন্ত প্রচলিত, কেবল সেইগুলিই উল্লেখ করিতেছি। যথা—

অকিঞ্চিৎকর, অগ্রগণ্য, অঙ্গভঙ্গী, অনন্ত, অন্নপূর্ণা, অসাধ্যসাধন, আদ্যশ্রাদ্ধ, ঈশ্বর, ইচ্ছা, একবাক্যে, একাকার, কন্তাকর্ত্তা, কষ্টকল্পনা, কায়ক্লেশে, কাশীবাস, কুরুক্ষেত্র, কুবের-ভাণ্ডার, কুশাসন, কৃষ্ণকালী, গতানুগতিক, গলগণ্ড, গলগ্রহ, চর্ম্মচক্ষুঃ, চিররোগী, ছন্দো-বন্ধ, জড়ভরত, জরাজীর্ণ, জ্ঞানগোচর, তিল-তর্পণ, তিলোত্তমা, ত্রিপত্র, দগ্ধাদোষ, দেব-দারু, দৈববাণী, ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মধ্বজী, নরককুণ্ড, নামগান, নববিধান, নষ্টকোষ্ঠী, পক্ষপাত, পরপ্রত্যাশী, পাতালপুরী, পিশাচসিদ্ধ, পুষ্পপাত্র, পূর্ণপাত্র, পূর্ব্বপুরুষ, পৌষপার্ব্বণ, প্রজাপতি, প্রভুভক্ত, প্রসববেদনা, প্রাতঃ-প্রণাম, প্রাণপণে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, ফণিমনসা, ভুক্তভোগী, ভূভারত, ভ্রূভঙ্গী, মধ্যমান, মলমাস, মহামায়া, মানমণ্ড, মানমন্দির, মুণ্ডমালা, রাজযোটক, রামনাম, রামরাজ্য, রীতিমত, লোকলজ্জা, লঙ্কাকাণ্ড, বকধার্ম্মিক, বহির্ব্বাস, বাক্যবাগীশ, বাক্যব্যয়, বাধকবেদনা, বাধ্যবাধকতা, বারবেলা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধদেব, বৃন্দাবন, বেদ-বাক্য, বেদব্যাস, বৈষ্ণব, বন্দনা, ব্যস্তবাগীশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণভোজন, শবশিবা, শবসাধনা, শবাসনা, শশব্যস্ত, শিখিপাখা (পক্ষ), ষোড়শোপচার, সৎসঙ্গ, সরোবর, সর্ব্বশরীর, সাগরসঙ্গম, সাধ্যসাধনা, সিংহাসন, সুখাসন, সুখশেল, সুখস্বপ্ন, সেবাদাসী, স্বর্গসুখ, স্বয়ং-সিদ্ধ, হরগৌরী, হরিহর।

চলিত ভাষায়ও সমাস আছে। যথা—

আটপিঠে, আনমনা, উপরপড়া, এক-কাট্টা, একরোকা, কপিকল, করিৎকর্ম্মা, কসাইকালী, কড়িকোটা, কাঁচকড়া, কাঁচকলা, কাঠকয়লা (কাঠের কয়লা), কাঠকবুল, কাঠঠোকরা, কাঠফাটা (রৌদ্র), কাঠাকালি, কাণকাটা, কাণাকড়ি, কারিকর (কারুকর), কালীতলা, কোলকোঙ্গা, খাই-খরচা, গণ্ডগোল, গরুচুরি, গাছগরু, গাঁটকাটা, গালগল্প, গোইগাঁ (গণ্ডগ্রাম), গোবরগাদা, চড়কপাক বা চরকীপাক, চাণাচুর, চালচিত্তির, চাৎপাত, চুলচেরা, চোখচাঁটা, চৌচির, ছবিছুট, ছেলে-খেলা, ছেলেবেলা, ছাগলছানা, জগৎযোড়া, জলজ্যান্ত, তালফোঁপোল, তেলকল, তেল-গোল, দিনদুপুর, দরদালান, ধানভানা (কল), নকলনবিশ, নিঘিন্নে, নীলগোলা, নৌকাকালি, পগারপার, পদ্মপুকুর, পরশপাথর, পাছা-পেড়ে, পাড়াপড়শী, পাততাড়ী, পারৎ-পক্ষে, পানিপাঁড়ে, পাতাচাপা, পাথর-চাপা, পানাপুকুর, পালিশপাতা, পাশবালিশ, পিছপাও, পিছুপানে, পিঁজরাপোল, পিটুটান, পুকুরপাড়, পুণ্যিপুকুর, পুতুলপূজা, ফুলদোল, ফোঁটাকাটা, ভুবনভোলান, ভোজবাজী, ভাঁয়রাভাই, মজামারা, মদমাতালে, মধুমাখা, মনমরা, মনমজান, মনমাতান, মড়িপোড়া, মহামুস্কিল, মাখনমাটী, মাছিমারা (কেরাণী), মাটকোঠা, মাথাব্যথা, [মার্কামারা], মাসমাহিনা, মেড়াপোড়া, মৌমাছি, রাজরাণী (রাজারাণী দ্বন্দ্বসমাসে, রাজরাণী ষষ্ঠীতৎপুরুষ), লালনীল, লোকনকুতা, লোণাপানি, বছরবিউনী, বাঙ্গালাবাহাদুর, বামুনবাড়ী, বাজরাবোঝাই, বাক্সবন্দি, বাঁশবন, বাঁশবাজা, বিয়েবাড়ী,

বিশ্ববাঙ্গালা, বিষবড়ি, বীরবৌলি, বেগুনবীচি, বেণাবন, ব্রহ্মবুলি, সমবয়সী, সাঁজপূজনী, সৃষ্টিছাড়া (ছিষ্টিছাড়া উচ্চারণ), স্বত্বসাব্যস্ত, হোড়াপোড়া।

২। সমাস না করিয়া বিশেষ্য-বিশেষণ একত্র করিতে আমার কৃতিত্ব কম নহে। কেবল চলিত কথারই উদাহরণ দেখ ;—

অষ্ট অঙ্গ (অষ্ট অঙ্গে অভরণ=আভরণ), অর্দ্ধ অঙ্গ (পত্নী), অবাক্ কাণ্ড, আট ঘাট (বাঁধা), আঙ্গুল আবডাল, উড়ে ম্যাড়া, উপরি পাওনা, উল্টা উৎপত্তি, এঁড়ে গরু, একগলা গঙ্গাজল, এক গা গয়না, কটাস কামড়, কড়া কথা, কাঁচা কায, কাচা কাপড়, কাটা কাপড়, কাটা কাণ, কাটা কৈ, কাঁধ-কাটা কাপড়, কাঙ্গলা কাচ, কাঁচা কলা, কাণা কড়ি, [কালো কোট], কালো কোর্ত্তা, কায়েত ধূর্ত্ত, কুড়ে গরু, কোদালে ক, খোস খবর, গরম মুড়ি, গড়ো গোয়ালা, গর্ব্ব খর্ব্ব, গিরি গোবর্দ্ধন, গোলগাল গড়ন, গোল লণ্ঠন, গোল আলু, গোঁয়ার গোবিন্দ, ঘরপোড়া গরু, ঘোষাল রসাল, চটাস চাপড়, চারি চক্ষুঃ, চোঁচোঁ চুমুক, চৌদ্দ চুপড়ি (কথা), ছেলে ভুলোন ছড়া, ছোট ছেলে, জোনাকী পোকা, টোপা পানা, ডেঙ্গো ডাঁটা, তেমাথা পথ, দক্ষিণ দুয়ার, দশ দিক্, দু'দণ্ড, দু'দিন, দু'দশ দিন, দুটা দুখান, দুধে দাঁত, দুণো দর, দেশী শাড়ী, ধনেবেচা বেণে, [নম্বরী নোট], না প'ড়ে পণ্ডিত, নাপিত ধূর্ত্ত, পটোলচেরা চোখ, পাকা কলা, পড়া পাখী, পাঁচ পীর, পার্শ্বনাথ পাহাড়, পাতাচাপা কপাল, পাথর-চাপা কপাল, পুরাণ পাপী, পুরুষ মানুষ, পূবে বাতাস, পেট মোটা, পৈত্রিক প্রাণ, পোষ্য পুত্র, ফুলেল তেল, ভায়রা ভাই, ভিজে ভাত, ভিজে জাব, মড়িপোড়া মিনসে, মরা মানুষ, মাখন মাটী, মাগুর মাছ, মালিনী মাসী, মাসী মা, মাড়োয়ারী মহাজন, মিছে কায, মিছে মায়া, মিথ্যা কথা, মিরগেল মাছ, মুখুটী কুটিল, মুচে মিগ, মুড়া মাখন, মেয়ে মানুষ, মোটা মাহিয়ানা, মৌরলা মাছ, রাই রাজা, রাখাল রাজা, রাঁধুনী বামুন, রাম রাজা, রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, লম্বা নাক, লম্বা লেজ, লড়াইয়ে মেড়া, লাল কালী, লাল চেলী, লালা বাবু, বকনা বাছুর, বড় বাড়ী (পাইখানা), বড়বাবু, বড় বেগতিক, বড়াই বুড়ী, বত্রিশ বাঁধন, বাইশ বাজার, বাঁকা বাঁকা বুলি, বাঙ্গালী বাবু, বাজে কায, বাজে জমা, বাজে জিনিষ, বাজে বকুনি, বাঁধা বুলি,বাঁদুরে বুদ্ধি, বাবা বিশ্বনাথ, বাবা বৈদ্যনাথ, বাহাত্তুরে বুড়ো, বিধাতা বিমুখ, বিটলে বামুন, বিদেশী বঁধু, বীচে বড়ি, বুড়ো বর, বুড়ো বাঁদর, বুড়ো হাড়, বেউড় বাঁশ, বেণে বৌ,বোকা বাম্‌না,বৈশাখী বাচ্ছা, শিকলিকাটা টিয়া, শিকারী কুকুর, শীতলা ষষ্ঠী, শুষ্ক কাষ্ঠ, শুশুনী শাক, শুদ্ধ বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, শ্রীগুরু গোপেশ্বর, শ্রীমন্ত সদাগর, ষোল শ (গোপী), ষোল কলা, সরু চিড়ে, সাত সমুদ্র, সাপের পাঁচ পা, সাফাই সাক্ষী, সূতিকা ষষ্ঠী, স্নিগ্ধ সরবৎ, স্বদেশী শিল্প।

৩. করণ কারকে ও অধিকরণেও আমার অধিকার আছে। আমারই জন্য অমৃতে অরুচি, আনন্দে গদগদ, আহ্লাদে আটখানা, আহ্লাদে আত্মহারা, কপালে করাঘাত, কমলে কণ্টক, কুসুমে কীট, গোড়ায় গলদ, পলকে

প্রলয়, বিষে বিষক্ষয়, মুখে মধু হৃদে হলাহল, ভক্তিতে মুক্তি, শুক্তিতে মুক্তা, শিয়রে শমন, শোকে সান্ত্বনা, সাধে বাদ, সাধনায় সিদ্ধি, সোণায় সোহাগা, হরিষে বিষাদ, চিতে বিপরীত, হেলায় হারান, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ, বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ। আমারই কর্ত্তৃত্বে নাপিতে নরুনে নখ কাটে, কাঁচিতে চুল ছাঁটে, ও ক্ষুরে মাথা মুড়ায়। আমার প্রসাদাৎ—লোকে চোখে দেখে, কাণে শোনে, নাকে সোঁকে, মুখে খায়।

আবার দেখ, আমারই প্রসাদে উড়িষায় উড়াপট, গুজরাটে গরবা, গৌড়ে গাজন, ঢাকে কাঠি, চৈত্রে চড়ক, জ্যৈষ্ঠে জামাইষষ্ঠী ও যুগল, ফাল্গুনে ফাগুনকোণা ব্রত ও ফুটকড়াই মুড়কি, রমজানে রোজা। আমারই কৃপায় শীতকালে শাঁখ আলু, মুখে মেছেতা, পাণে চূণ (বা পোকা) [বা পিপারমেণ্ট], পথে পাথর, ধূলায় ধুসর, কড়ায় কড়া, কাহনে কাণা, ধনস্থানে শনি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ভাঁড়ে মা ভবানী। গলায় গাঁদা, গোগ্রাসে গেলা, ঘোড়ায় চড়া (চাপায় আমি চাপা পড়ি), ঘরে রাখা, জলে ফেলা, জেলে যাওয়া, নাকে কান্না, পায়ে পড়া, প্রেমে পড়া, ফাঁদে ফেলা, মরমে মরা, সরমে মরা, বুকে বাজা, বুকে বসা, আমারই যোগাযোগে ঘটে। মাঠে মারা যাইতে, বংশে বাতি দিতে, কুলে কালী দিতে, বুকে বাঁশ দিতে, গলায় গামছা দিতে, হাতে দড়ি দিতে—হাতে দড়িতে কাবারস নাই, হাতে সূতাতে আছে—বুকে বসে' দাড়ি উপড়াইতে, চারি চক্ষে চাহিতে, ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ি মারিতে, হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে, হুজুরে হাজির হইতে, আমি মূর্ত্তিমান্। আমিই রোগে রোজা ডাকার বন্দোবস্ত করিয়াছি, ভূতের ভয়ে রামনামের ব্যবস্থা করিয়াছি, সশরীরে স্বর্গবাসের সুবিধা দেখাইয়াছি, স্বর্গে শচী ও সুধা রাখিয়াছি, অমরায় অপ্সরার আমদানি করিয়াছি, গায়ে একগা গয়না গড়াইয়া দিয়াছি, কেরাণীর কাণে কলম, চ্যাংরার চোখে চশমা, কুলকামিনীর কাঁকে কলসী, নাকে নথ নোলক, পরণে পাছাপেড়ে শাড়ী পাকাপাড়, সীঁথায় সিন্দূর পরাইয়াছি, দুয়োরাণীর হেঁটে কাঁটা দিয়াছি, শ্রীমন্ত সদাগরকে কমলেকামিনী দেখাইয়াছি। শ্মশানে বা কৈলাসে শিব, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু—সে তো আমারই লীলা। আমিই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আমহাউস রাখাইয়াছি, বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয় বসাইয়াছি, এবং সিমলায় শৈলাবাস স্থাপন করিয়াছি।

৪। সম্বন্ধ-স্থাপনেও আমার সম্বন্ধ আছে। আফগানিস্থানের আমীর, খেলাতের খাঁ, পারস্যের সা, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, শৃঙ্গেরীমঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু, বিশ্বকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশ-কর্ম্মা—সকলেই আমার তাঁবেদার। জয়সিংহের জয়পুর, মানসিংহের মানমন্দির, জাপানের জিউজিৎসু, দিল্লীর দরবার, দিল্লীকা লাড্ডু, [লাটের লেভি], চৈতককা চবুতারা, গাজীপুরের গোলাপজল, সুখচরের চিনি, প্রয়াগের পায়োনিয়ার, কোটালীপাড়ার কূটশাসন, তপনদীঘির তাম্রশাসন, ইত্যাদি সর্ব্বঘটে আমি। কলের কুলি, কলিকালের ছেলে, কালীঘাটের কাঙ্গালী, ব্রহ্মার বর, শিবের বর, বিয়ের বর, বরের বাপ, আদালতের আমলা, মানহানির বা মাননাশের মামলা, ব্যারি-

ষ্টারের বাবু, হরির খুড়ো, বরের ঘরের মাসী ক'নের ঘরের পিসী, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, গাজীর গান, মেড়ার লড়াই, বুলবুলির লড়াই, কাঙ্গালের কর্কট রাশ, বড়দিনের বন্ধ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, শনির শেষ, চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক, ভক্তের ভগবান, হবিষ্যের মালসা, শিবরাত্রির সলিতা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সবই আমার জন্য। গৌরাঙ্গের রাঙ্গা পায়ে আমি, শ্রীচরণের ছুঁচোতেও আমি, মগের মুল্লুকে, কাতলা ফেলার দেশে, হাবড়ার হাটে, স্বর্গের সিঁড়িতে, আমার যাতায়াত আছে। আমারই জন্ত শালগ্রামের শোয়া বসা সমান, আইনের আমলে পড়ে আমারই ফেরে। চটীর ফটফট, বুটের টক্কর, জুতার গুঁতা, ব্রাহ্মণবটুর টিকি, চোখের চাহনি, চোখের দেখা, জিভের জল, নাকের নিশ্বাস, প্রাণের টান, পেছন-কার পা, প্রস্রাবের পীড়া, সবই আমার যোগাযোগে।

আবার দেখ, আউড়ের আটি, আকন্দের আঠা, আমের আচার, আমের আঁঠী, উড়কিধানের মুড়কি, কথার কথা, কলার কাঁদি, কলের জল, কলসীর কানা, কলুর বলদ, কাঁকড়ার দাড়া, কাজীর বিচার, কাটারির কোপ, কাঁঠালের কোষ, কাপড়ের পাড়, কাযের কথা, কুলের কথা, কুলের কলঙ্ক, কোকিলের কুহু, খাটের খুরো, খুসীর সওদা, খোদার খাসী, গরুর গাড়ী, গাছের আগা, গাছের গোড়া,[গিল্টির গয়না], গোলার তলা, গোসাপের গা, ঘুমের ঘোর, ঘোড়ার ঘাস, ঘোড়ার ডিম্, চটির পাটি, চুলের কলপ, চেলির পুঁটুলি, জুতার ফিতা, ছোলার ছাতু, [জাহাজের জেটি ও জালিবোট], জোয়ারের জল, ডেঙ্গোর ডাঁটা, ঢাকার শাঁখা, দুষ্টলোকের মিষ্টকথা, দুষ্টের দমন, দেনার দায়, ধোপার পাট, নপুংসকের নৃত্য, নাটুয়ার নাচ, পটুয়ার পট, পাগলের প্রলাপ, পাটের গাঁট, পানি-ফলের পালো, পাণের দোনা, পাপিয়ার পিউপিউ, পালাবার পথ, পিতলের পিলসুজ, পুঁঠিমাছের প্রাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, পূজার বাজার, পেটের পীড়া, পেটের পুত, প্রাণপিঞ্জরের পাখী, ফণীর মণি, ভাটার টান, ভূতের ভয়, ভেকের মকমক, মতির মালা, মনের ময়লা, মনের মানুষ, মনের মিল, মরার মত, মাটির মানুষ, মাথার মণি, মাথার মাণিক, মাথার মুকুট, মাছের মুড়ো, মিছরির ছুরি, মুক্তার মালা, রামানন্দের রাস, রাণী রাসমণির রূপার রথ, লাখ কথার এক কথা, বখরার বন্দোবস্ত, বনের বাঘ, বনের বানর, বাঘের বাচ্ছা, বাপ্‌কা বেটা, বাপের বাড়ী, বামুনবাড়ীর বেড়াল, বালির বাঁধ, বিকারের ঘোর, বুকের বল (ভাত পাথরটা), বেদব্যাসের বিশ্রাম, ব্যথার ব্যথী, শত্রুর শেষ, (শুভস্য শীঘ্রং), ষাঁড়ের গোবর ষাঁড়ের শত্রু, সোণার খনি, সোণার বেণে, সোণার সামগ্রী, হাতীর হাওদা, সর্ব্বত্র আমি।

৫। কর্ত্তা বা কর্ম্ম ও ক্রিয়া অথবা সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া একত্র করিয়া যে সব চলিত শব্দসজ্ঞ (phrase) আছে, *

* কতকগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণভাবে সমাসবদ্ধ হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—কচুকাটা করা, কাঠফাটা রৌদ্র, চাঁদচাওয়া ছেলে, কাণকাটা রাজা, মাছিমারা

সেখানেও আমার অবাধ অধিকার।

(স্বর)—আলো জ্বালো, আঙ্গুল ফুলা (ফুলিয়া কলাগাছ), আপত্তি তোলা, এগিয়ে এস, ওং পাত।

ক—কথা কহা,*কচুকাটা করা, কড়া নাড়া, কড়া পড়া, কলঙ্ক কেনা, কাচ করা, কাটনা কাটা, * কাঠ কাটা, কাঠ ফাটা, কাণ কাটা, কাণ টানা, কাপড় কাচা, কাপড় কোঁচান, কাপড় ছাড়া, কাপড় ঝাড়া, কাপড় কেনা, কামাই করা, কামান ডাকা, কায কর্ম্ম করা,* কারচুপি করা, কাল কাটান, কিরা করা, কুটো কাটা, কুটনো কোটা *, কুমড়ো কোরা, কুমারী করা, কুষ্ঠী (কোষ্ঠী) কাটা, কুস্তি করা।

খ—খড়ি ওড়া বা পড়া, খাতির রাখা, খানা খাওয়া, খাপ খাওয়া, খাবি খাওয়া, খাসী পোষা, খিল লাগা, খুঁটে খাওয়া, খেটে খাওয়া।

গ—গরু চরান, গহনা গড়ান, গান গাওয়া, গুণ গাওয়া, গুণ টানা, গুণ মানা।

ঘ—ঘর করা, ঘর পোড়া, ঘাড়ে পড়া, ঘুড়ি উড়ান, ঘোমটা টানা, ঘোল ঘাঁটা, ঘোল ঢালা।

চ—চকমকি ঠুকি, চড় মারা, চাঁদ চাওয়া, চাপা পড়া, চাল চিত্তির করা, চা'ল চিবান, চাবুক চালান, চিত্তির (চিত্ত) চটা, চিমটি কাটা, চুল চেরা, চুল ছাটা, চুরুট টানা, চুণ চাওয়া, [চেক কাটা], চোখ চাওয়া।

ছ—ছাঁদা বাঁধা, ছাল ছাড়ান, ছাল ছেঁড়া, ছিকে ছেঁড়া, ছিটে টানা, ছুঁচ-বেচা (কামার-বাড়ী), ছেলে ছোঁচান, ছেলে লেখান।

জ—জল গলা, জল তোলা, জাল ফেলা, জাত যাওয়া।

ঝ—ঝাল ঝাড়া, ঝালা ঝাড়া, ঝাঁপাই ঝোড়া, ঝুলি ঝাড়া।

ট—টিকি কাটা, [টিকিট কাটা], টিপনি কাটা, টেনে আনে, টেনে বোনা, টোল ফেলা।

ঠ—ঠেকে শেখে, ঠেলে ফেলে।

ড—ডা'ল গলা, ডুবে যাবে।

ঢ—ঢিল বা ঢেলা ফেলা।

ত—তহবিল তছরূপ করা, তান-তোবড়া তোলা, তোপ পড়া।

দ—দম দেওয়া, দর দেওয়া, দড়া ছেঁড়া, দড়া ছেঁড়াছিড়ি করা, দরজা দেওয়া, দাগ দেওয়া, দাগ লাগা, দাগা দেওয়া, দাঁত দেখা, দাঁত দেখান, দাঁতে দড়ি দেওয়া, দাম দেওয়া, দাড়ী উপড়ান, দুধ দেওয়া, দুয়ার দেওয়া, দেখা দেওয়া, দেখে' শেখা, দৃষ্টি দেওয়া, দোষ দেওয়া, দোষ দেখান, দৌড় দেওয়া।

ধ—ধরা পড়া, ধান ভানা, ধান শুকান, ধামা ধরা, ধার করা, ধৈর্য্য ধরা।

ন—নথ কাটা, নথ নাড়া, নস্য টানা, নস্য নেওয়া, নস্য লোসা, নাম কেনা, নুদি নামা, ন্যাজ নাড়া।

প—পগার পার হওয়া, পঞ্চাশ পেরোন, পটোল তোলা, পটোল পোড়ান, প'ড়ে পাওয়া, পাক পড়া, পাক পাড়া, পাকা কলা পাওয়া, পাখী পড়ান, পাটিয়ে পড়া, পাট কাটা, পাঁঠা কাটা, পাত পাড়া, পাতা পাতা, পা

কেরাণী, মনমরা, টোলফেলা, নাড়ীছেঁড়া, ধামাধরা, মজামারা লোক, হাতভোলা খাওয়া, হাড়যোড়া (গাছ)।

* এগুলি ইংরাজী Cognative accusativeএর মত নহে কি?

পড়া, পার পাওয়া, [পাশ পাওয়া], পা পিছলিয়া পড়া, পালাবার পথ পাওয়া, পিচুটি পড়া, পিণ্ডি পাওয়া বা পাকান, পিণ্ডি পড়া, পুঁথি পড়া, পুঁয পড়া, পোকা পাড়ান, পোঁটা পড়া, পেঁচোয় পাওয়া, পেছিয়ে পড়া।

ফ—ফল ফলা, ফাঁদে পা পড়া, ফুটকড়াই ফোটা, ফুঁ ফুটান, ফুটি ফাটা, ফুল ফোটা।

ভ—ভয় ভাঙ্গা, ভুল ভাঙ্গা, ভূত ভাগান, ভুর ভাঙ্গা, ভুরভুরি ভাঙ্গা, ভেরেণ্ডা ভাজা, ভেড়া চরান, ভেলকী লাগা, [ভোট ভাঙ্গান, ভোট ভিক্ষা করা]

ম—মজা মারা, মটকা মারা, মন কেমন করা, মন মজান, মন মাতান, ময়দা মাখা বা মসটান, মাছ মারা, মাছি মারা, মাথা মুড়ান, মাথা ব্যথা করা, মাছ বাছা, মানুষ মারা, মুখ দেখা, মুখ দেখান, মুখ রাখা, মুগুর মারা, মুলুক মারা, মুড়ো মারা, মেড়া পোড়ান।

র—রা কাড়া।

ল—লোক লাগান।

ব—বগল বাজান, বাজনা বাজা, বাজে বকা, বাজার জাঁকান, বাজার যাওয়া, বাটনা বাঁটা, বাড়ী বহিয়া, বাদ সাধা, বাঁশী বাজান, বাসা বদলান,বাসা বাঁধা, বুক বাঁধা (আশায়), বুক ঠোকা, বেরিয়ে পড়া, বেয়াকুব বানান, বোকা বানান, বোকা বুঝান, বোঝা বহা।

শ—শরীর সারা,শব্দ শোনা,শাক সিজন।

স—সং সাজা, সরা সাজান, স'রে পড়া, সবুর সহা।

হ—হাওয়া খাওয়া, হাত তোলা, হাত পাতা, হাড় গুঁড়া করা, হাড় যোড়া, হাঁড়ী চড়ান।

৬। উপসর্গ উপপদ প্রভৃতি যোগেও আমার দর্শন পাইবে। যথা, আলুলায়িত, উৎখাত, উৎপাত, উদ্ভিদ, উপপদ, কর্ম্মকার, কারুকর (কারিকর), কুম্ভকার, কোলাহল, তদ্ধিত, দায়াদ, দোহদ, নগণ্য, নির্ণয়, নির্নিমেষ, নিমন্ত্রণ (নেমন্তন্ন), নির্ঘৃণ (নির্ঘিন্নে, পরিপক্ক, পরিপাক, পারিপাট্য, পারিপার্শ্বিক, প্রপিতামহ, প্রতিপক্ষ, প্রতীত, মহার্ঘ, মুষ্টিমেয়, যমজ, বলীবর্দ্দ, বিবস্ত্র, বিবাদ, বিবাহ, বিবিধ, বিবেচনা, ব্যতিব্যস্ত, সংশয়, সংসার, সমস্যা, সমাস, সরস, সন্দেশ, সুস্থ, সুশ্রুত, সুষমা, সৌসাদৃশ্য।

৭। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেও অনেক স্থলে আমি মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠি। যথা (সংস্কৃত)—অতীত, একক, একাকী, কণিকা, কথকতা, কনক, কপর্দ্দক, কলিকা, কারক, কৃষক, কুৎসিত, কুলীরক, কুজ্ঝটিকা, তত্ত্ব, তার্কিক, তাড়িত, নন্দন, নয়ন, নবীন, নূতন, পতিত, মজ্জমান, মনন, মহিমা, মাননীয়, মাতামহ, মূর্ত্তিমান্, ম্রিয়মাণ, রণন, লৌকিক, বান্ধব, সরস্বতী, স্রোতস্বতী।

চলিত কথা—গররাজি, গরহাজির, গুরুগিরি, গোমস্তাগিরি, দিগদারি, দেনদার, দোকানদার, দৌড়দার, পাগলপাড়া, মাতলামো, মালামো, মুখোমো, বিবাগী, বে-আকুব, বে-আদব, বেকবুল, বেবন্দোবস্ত, বেবাক।

আমারই খাতিরে নানা প্রত্যয় ও বিভক্তি-যোগে ধাতু অভ্যস্ত হয়। যথা—গঙ্গা, চঞ্চল, জর্জ্জর, জাজ্জল্যমান, দোদুল্যমান, দেদীপ্যমান, মীমাংসা, মুমূর্ষু, যুযুৎসু, রোরুদ্যমান, লালসা, লেলিহান, শুশ্রূষা, সরীসৃপ।

৮। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কা[illegible] যে ব্যাকরণ-বিরোধ ও বর্ণ-

বিন্যাসে ব্যতিক্রম বা বাণান-বিভ্রাট্ বর্ণনা করিয়া ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত (দুইটি স্থানেই আমার এলাকায়) হুলস্থূল লাগাইয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রেও আমার "ঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। আমারই মায়ায় অলীক-সাদৃশ্য-বশতঃ নানান্ বিভ্রাট্ ঘটে।

(৵০) নিরাকার সাকার হয়, সাকার নিরাকার হয়। যথা ছায়া-কায়া, কলা-ছলা, কলা-মূলা, লতা-পাতা, রাজারাণী ও রাজা-প্রজা (বাঙ্গালায় দ্বন্দ্ব সমাসে)। দয়া-ময়া (মায়া)।

(৶০) বিসর্গ-বিসর্জ্জন ঘটে। যথা—প্রাণ—মন, যক্ষ—রক্ষ, হেয়—শ্রেয়, আয়—পয় (পয়স্ ?)

(৷০) স্বরসাম্য ঘটে। যথা—ধূলা (ধূ'ল) খেলা বা খেলাধূলা, নিশি (নিশা) দিন, নিশি দিসি, নিশির শিশির, মুগ-মুসুরী (মসূরী), হনূমান্-জাম্বুবান (জাম্ববান্), ঘোষ বোস (বসু)।

(।০) ব্যঞ্জনসাম্য ঘটে। যথা—(সাধারণ উচ্চারণ) (লক্ষ্মী) নক্ষ্মী-নারা(য়)ণ, লাভ-লোকসান (নোক্সান), ছিরি (শ্রী)-ছাঁদ, ছিষ্টি (সৃষ্টি) ছাড়া।

(।৵০) অক্ষরের লোপাপত্তি ঘটে। যথা—রাম—শাম (শ্যাম)।

বিভীষিকার বিকট বদন-ব্যাদানে নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

(সমাপ্ত)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ণ কাম

তোমারে বেসেছি ভাল পেয়েছি জীবনে,
মোর প্রেমপঞ্চতপ তুষ্ট দেবতার
প্রসাদ প্রদত্ত বর তুমি যে আমার,
সর্ব্বার্থসাধিকা সিদ্ধি ব্রত-উদ্‌যাপনে।
ভূর্জ্জে লেখা মন্ত্রপূত কবচের সম
বক্ষে থাকি ভয়াতীত করেছ আমারে
নিখিল ঐশ্বর্য্য সার রত্ন শ্রেষ্ঠতম
হে মোর কৌস্তুভমণি, একাবলী হারে
কণ্ঠে মোর আছ বাঁধা। কিম্বা, সুরুচিরা,
তুমি মোর বনমালা আমি বনমালী,
তুমি সে বৈকুণ্ঠপুরী তুমিই ইন্দিরা
প্রেমপদ্মসদ্মলক্ষ্মী। একি গৃহস্থালী
প্রণয়বিভূতিলিপ্ত ভিখারীরে লয়ে
পাতিলে কল্যাণী মোর অন্নপূর্ণা হয়ে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

সমসাময়িক অংশ।

শান্তনু হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত নৃপতিগণ এই অংশভুক্ত, কারণ ঐ কয় পুরুষ ব্যাসের সমকালীন বলিয়া মহাভারতে প্রসিদ্ধ। এই অংশ লইয়া পুরাণ ও মহাভারতে কোন বিসম্বাদ নাই। একই বংশ, একই ইতিবৃত্ত পুরাণে ও মহাভারতে বর্ণিত। নিম্নে উভয় বংশাবলী উদ্ধৃত হইল—

মহাভারতের বংশ

পুরাণের বংশ

শান্তনু
পত্নী গঙ্গা
পত্নী সত্যবতী
সত্যবতীর পরাশর ঔরসে কানীনপুত্র
দেবব্রত বা ভীষ্ম
বেদব্যাস
চিত্রাঙ্গদ
বিচিত্রবীর্য্য
পত্নী অম্বিকার গর্ভে বেদব্যাসের বীর্য্যে
পত্নী অম্বালিকার গর্ভে বেদব্যাসের বীর্য্যে
ধৃতরাষ্ট্র (পত্নী গান্ধারী)
পাণ্ডু
দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র

পাণ্ডু
পত্নী কুন্তী
কুন্তী
কুন্তী
মাদ্রী
ধর্ম্মরাজ
বায়ু
শক্র
যুধিষ্ঠির
ভীম
অর্জ্জুন
অশ্বিনী কুমারদ্বয়
দ্রৌপদী
যৌধেয়ী
দ্রৌপদী
হিড়িম্বা
কালী
নকুল
সহদেব
প্রতিবিন্ধ্য
দেবক
শ্রুতসোম
ঘটোৎকচ
সর্ব্বত্রগ
দ্রৌপদী
বিজয়া
দ্রৌপদী
করেনুমতী
শতানীক
সুহোত্র
শতানীক
নিরমিত্র

অর্জ্জুন
দ্রৌপদী
উলূপী
মণিপুরপতিপুত্রী
সুভদ্রা
শ্রুতকীর্ত্তি
ইরাবান্
বভ্রুবাহন
অভিমন্যু
উত্তরা
পরীক্ষিৎ
জনমেজয়
শ্রুতসেন
উগ্রসেন
ভীমসেন

উপরোক্ত বংশাবলী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাণে যুধিষ্ঠিরের যৌধেয়ী নামে দ্বিতীয়া পত্নী থাকে ও তাঁহার পুত্র দেবক। এইরূপ ভীমের কালী নামে তৃতীয়া পত্নীর সর্ব্বত্রগ নামে এক পুত্র হয়। নকুলের দ্বিতীয়া পত্নী করেণুমতী নিরমিত্র নামক পুত্রের জননী ও সহদেবের বিজয়া নামে দ্বিতীয়া পত্নী সুহোত্রের মাতা। মহাভারতে উঁহাদের ঐ ঐ পত্নী ও ঐ ঐ পুত্রের নাম নাই। এতদ্ভিন্ন পুরাণের ও মহাভারতের ইতিবৃত্ত সমান। সুতরাং বিসম্বাদজনিত কোন সংশয়ে কোন অবকাশ নাই। কিন্তু অনেকে বলিবেন যে,—

সমসাময়িক অংশ প্রত্যয়ের দুইটী প্রতিবন্ধক আছে।

প্রথম প্রতিবন্ধক—অলৌকিকতা, দ্বিতীয় —প্রমাণাভাব। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, শান্তনুর গঙ্গাকে বিবাহ ও সেই পত্নীর একে একে সদ্যোজাত সাতটী পুত্রকে গঙ্গাজলে নিমজ্জন, ভীষ্মের অজ্ঞাত বাল্যজীবন, সত্যবতীর মৎস্যগর্ভে জন্ম ও যোজনগন্ধাত্বলাভ, চিত্রাঙ্গদের গন্ধর্ব্ব সহ বর্ষত্রয়ব্যাপী যুদ্ধ, পাণ্ডুর মৃগরূপী মুনিবধ ও মুনিশাপে ক্লীবত্বপ্রাপ্তি, কুন্তী ও মাদ্রীর দেবসংসর্গে গর্ভ, দ্রোণের দ্রোণ হইতে বিনা মাতৃশোণিতে জন্ম, কৃপ ও কৃপীর ঐরূপ ঋষিবীর্য্যে শরবনে জন্ম, যজ্ঞবেদী হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনীর উত্থান, শিখণ্ডীর পুংস্ত্বপ্রাপ্তি, অগ্নির নিকট অর্জ্জুনের গাণ্ডীবাদি লাভ, অর্জ্জুনের পশুপতি-প্রীণন ও দেবলোকে গমন প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বাসের সীমা থাকে না। সুতরাং শান্তনু প্রভৃতির চরিত্রে কতদূর অলৌকিকতা মহাভারতে বর্ণিত ও তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহার পর্য্যালোচনা আবশ্যক।

শান্তনুচরিত্র অলৌকিক নহে

ব্যাসদেব শান্তনুর সমসাময়িক হইলেও, শান্তনুকে যে তিনি দেখেন নাই, তাহা মহাভারতেই প্রকাশ। এমন কি, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যকেও তিনি দেখেন নাই। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর সত্যবতী যখন ভীষ্মকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেও ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না এবং অন্যোপায় না দেখিয়া যখন সত্যবতী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য ব্যাসকে আহ্বান করিলেন, তখনই কৌরবরঙ্গমঞ্চে ব্যাসের আবির্ভাব। সুতরাং বেদব্যাস শান্তনু ও বিচিত্রবীর্য্যের চরিত্র পরের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন। শান্তনুচরিত্র যে গাথামূলে লিখিত, তাহা আদিপর্ব্বে ৯৫ অধ্যায়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

প্রতীপঃ খলু শৈব্যামুপযেমে সুনন্দাং নাম। তস্যাং পুত্রানুৎপাদয়ামাস দেবাপিং, শান্তনুং, বাহ্লীকং চেতি। দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ। শান্তনুস্তু মহীপালো বভূব। অত্রানুবংশশ্লোকো ভবতি—

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং স সুখমশ্নুতে।
পুনর্যুবা চ ভবতি তস্মাত্তং শান্তনুং বিদুঃ॥

ইতি তস্য শান্তনুত্বম্।

অনুবাদ—প্রতীপ শিবির কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাতে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিনটী পুত্র উৎপাদন করেন। দেবাপি বাল্যকালে অরণ্যে প্রবেশ করেন। শান্তনু মহীপাল হন। এই স্থলে এই অনুবংশশ্লোক আছে—

"যে যে জীর্ণব্যক্তিকে তিনি স্পর্শ করিতেন সেই সেই ব্যক্তি সুখী হইত ও পুনরায় যুবা হইত।" এজন্য তাঁহাকে শান্তনু বলিয়া লোকে জানিত। ইহা তাঁহার শান্তনুত্বের কারণ।

ইহা হইতে সুপ্রকাশ যে, ব্যাসদেব গাথা-বলম্বনে শান্তনুর চরিত্র লেখেন। শান্তনু-কর-স্পর্শে যৌবনলাভ, যিশুকর-স্পর্শে ব্যাধির উপশমাদির ন্যায়। উহা বিশ্বাস করুন, আর উপহাস করুন, সেই দোষ-গুণ ব্যাসদেব লইতে অনিচ্ছুক বলিয়াই বোধ হয় ঐ প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শান্তনুর রাজ্যপালন, সত্যবতীর সহিত পরিণয় এবং সত্যবতীর গর্ভে পুত্রদ্বয়োৎপাদন সম্পূর্ণ মানুষিক ব্যাপার। গঙ্গার সহিত তাঁহার বিবাহ অলৌকিক বলিয়া সাধারণের প্রতীতি আছে। কিন্তু তাহাও নিপুণ ভাবে দেখিলে অলৌকিক নহে। মহাভারতে শান্তনুর মর্ত্ত্যধামে আগমন-কথা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। একদা রাজর্ষিগণের সহিত সুরগণ ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজর্ষি ইক্ষাকুবংশীয় মহাভিষ ছিলেন। তৎকালে গঙ্গা তথায় আসেন। মারুতহিল্লোলে তাঁহার বসন বিচলিত হইলে দেবগণ অধোবদন হইলেন। কিন্তু মহাভিষ সেই দৃশ্য সকাম-নয়নে দেখিলেন। পিতামহ মহাভিষের ভোগ-বাসনা বুঝিতে পারিয়া ভোগের জন্য তাঁহাকে মর্ত্ত্যধামে যাইতে আদেশ করিলেন। মহাভিষ তখন পৃথিবীতে কাহার পুত্রত্ব স্বীকার করা উচিত বিচার করিয়া ধার্ম্মিক ক্ষত্রকুলাবতংস ভূরিতেজাঃ প্রতীপকেই পিতৃত্বে বরণ করিলেন। এই সময় প্রতীপও পুত্রার্থী হইয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। মহাভিষ তাঁহার পুত্র শান্তনু নামে অবতীর্ণ হইলেন। শান্তনুর এই পূর্ব্বজন্ম কথা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তিনি প্রতীপের পুত্র—ইহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা নাই। গঙ্গাও মহাভিষের প্রতি সকামা হন এবং ঐ সময়েই বসুগণকেও ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিতে আসিতে হইবে বলিয়া বশিষ্ঠ অভিশাপ দেন। তাঁহারা আসিয়া গঙ্গাকে অনুরোধ করেন যে,তাঁহার পুত্ররূপে জন্মিবেন ও জন্মমাত্র তিনি গঙ্গাজলে তাঁহাদিগকে একে একে ডুবাইয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় দিবেন। পরে শান্তনু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে মৃগয়া নিমিত্ত পর্য্যটন করিতেছেন, এমন সময় একটী অনবদ্যাঙ্গী সুদতী পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। রাজা অমনি স্মরশরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার ভজনা করিলেন। সেই ললনা বলিলেন যে, আমি যাহা করিব, তাহাতে যদি আপনি কখন প্রতিবাদ না করেন এবং আমার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিলেই আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইব এই নিয়ম যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার পত্নী হইতে পারি। রাজা তখন রূপে মুগ্ধ। তাহাতেই স্বীকার। উভয়ের বিবাহ হইল। মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৯৮ অধ্যায়ে স্পষ্টই লেখা আছে যে, মানুষীরূপে আবির্ভূতা গঙ্গার সহিত শান্তনুর বিবাহ হয়।

দিব্যরূপা হি সা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা শ্রীমন্তং বরবর্ণিনী॥
ভাগ্যোপনতকামস্য ভার্য্যা চোপনতাভবৎ।
শান্তনোর্নৃপসিংহস্য দেবরাজসমদ্যুতেঃ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিপথগা গঙ্গাদেবী মানুষ

শরীর গ্রহণ করিয়া দিব্যরূপসম্পন্ন হইয়া শ্রীমান্ সৌভাগ্যবান্ ইন্দ্রতুল্য নৃপসিংহ শান্তনুর পত্নী হন।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শান্তনুর বিবাহ মানুষীর সহিত হয় এবং সেই মানুষী অলৌকিকরূপশালিনী। শান্তনুও তাঁহাকে গঙ্গা বলিয়া জানিতেন না। গঙ্গার অংশে জন্ম বলিয়া তিনি গঙ্গা নাম লইয়াছিলেন। শান্তনু তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিন্তানুরঞ্জনে সতত ব্যাপৃত রহিলেন। তিনিও সাধ্যানুসারে পতির সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শান্তনুর ঔরসে তাঁহার আটটী পুত্র হইল। জন্মিবার পর একে একে সাতটীকে তিনি গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া মারেন। এইরূপ মাতার পুত্রনাশ ভীষণ হইলেও অসম্ভবপর নহে। সেই ভীষণ দৃশ্যে রাজা বিস্মিত, চকিত; কিন্তু কিছুই বলিতে পারেন না। অষ্টম পুত্রকেও মাতা নষ্ট করিতে যান। পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। প্রতিবাদ করিলেন। তখন সেই মানুষী বসুগণের শাপ ও জন্ম ও গঙ্গার সহিত তাঁহাদের চুক্তির উল্লেখ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অন্তর্ধানকালে তিনি বলেন যে,—

তস্মাত্তজ্জননীহেতো র্মানুষত্বমুপাগতা।
জনয়িত্বা বসূনষ্টৌ জিতা লোকাস্ত্বয়াক্ষয়াঃ॥

অনুবাদ—সেই কারণ তাঁহাদের অর্থাৎ বসুগণের জননী হইবার জন্যই আমি মানুষ বিগ্রহ ধারণ করি। অষ্ট বসুগণের জন্ম দিয়া আপনিও অক্ষয় লোক জয় করিয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ যে, গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রীর সহিত শান্তনুর বিবাহ নহে, গঙ্গাদেবী মানুষী হইয়া শান্তনুর পত্নী হন। অন্তর্ধানকালে তিনি অষ্টম পুত্র দেবব্রতের যে পরিচয় দেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে,—দেবব্রত মানুষীর পুত্র, গঙ্গার প্রসাদে জাত, গঙ্গানদীর পুত্র নহে। সেই পরিচয় এই—

মৎপ্রসূতং বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং সুতম্।

এই পুত্রকে গঙ্গাপ্রসাদে আমার প্রসূত বলিয়া জানিবেন।

মানুষী গঙ্গার অন্তর্ধানও অসম্ভবপর নহে।

দেবব্রতচরিত অলৌকিক নহে

দেবব্রতের জন্ম অমানুষিক নহে দেখান হইয়াছে। শৈশবে মাতৃ কর্তৃক তাঁহার পরিপোষণও অলৌকিক নহে। পরে মাতৃ কর্তৃক শান্তনুর সহিত পরিচয়ও সঙ্গত। তাঁহার বাল্যচরিত্র মহনীয় ও অত্যুদার, কিন্তু অলৌকিক নহে। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদত্ব, পিতৃসুখের জন্য আত্মবলি, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অদ্ভুত হইলেও অমানুষিক নহে। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবগণের কালেও তাঁহার জীবনীতে কোন অলৌকিকতা নাই।

সত্যবতী

সত্যবতীর জন্ম অলৌকিক হইলেও, কর্ম্ম অলৌকিক নহে। পরাশরের সহিত কন্যাবস্থায় বিবাহ ও ব্যাসের জন্ম অসম্ভব নহে। শান্তনু যেরূপ কামী, তাহাতে সত্যবতীর ন্যায় বয়ঃস্থা কন্যাকে বিবাহও সম্ভবপর। যদি মৎস্যগর্ভে তাঁহার জন্ম বিশ্বাস না হয়, তবে তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন যে—রাজরাজেশ্বর ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি শান্তনু বৃদ্ধবয়সে রূপের মোহে কামোপহতচেতন হইয়া যখন উপযুক্ত পুত্র দেবব্রতকে বলি দিয়া

দাসরাজার পালিত কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তখন রাজপক্ষ হইতে সেই কন্যার ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে অলৌকিক জন্মপ্রবাদ রটিত হইল। সেই প্রবাদ মিথ্যা হইলেই যে সত্যবতী কবির কল্পনা হইবেন তাহা বলা অযৌক্তিক।

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য

পিতার মৃত্যুকালে চিত্রাঙ্গদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন মাত্র, কারণ রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে বর্ষত্রয়ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হয়। সেই যুদ্ধেই কুরুক্ষেত্রে তাঁহার অকৃতদারাবস্থায় প্রাণান্ত হয়। ঐ বিগ্রহ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সহিত হয় বলিয়া অনেকে উহা বিশ্বাস করিবেন না। গন্ধর্ব্বশব্দে সাধারণতঃ দেবযোনিবিশেষ বুঝায় সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্ব নামে এক জাতিও তখন কুরুজাঙ্গলের নিকট হিমালয়ের প্রত্যন্তপ্রদেশে গঙ্গাতীরে বাস করিত, ইহা মহাভারতের ১৭২ অধ্যায়ে চিত্ররথোপাখ্যানের প্রারম্ভেই বুঝিতে পারা যায়। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া যখন একচক্রা হইতে উত্তরাভিমুখে পাঞ্চালগণের রাজধানীর উদ্দেশে চলিলেন, অল্প সময় পরেই তাঁহারা সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতটে উপস্থিত। তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ গঙ্গায় কেলি করিতেছিলেন ও পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে চিত্ররথ এইরূপ আত্মপরিচয় দেন। *

অঙ্গারপর্ণং গন্ধর্ব্বং বিত্ত মাং স্ববলাশ্রয়ম্।
অহং হি মানী চের্ষুশ্চ কুবেরস্য প্রিয়ঃ সখা॥
অঙ্গারপর্ণমিত্যেব খ্যাতং চেদং বনং মম।
অনু গঙ্গাং চরন্ কামাংশ্চিত্রং যত্র রমামাহম্॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অঙ্গারপর্ণ নামক এক বন অনুগাঙ্গদেশে একচক্রার সন্নিকট ছিল এবং তাহাই গন্ধর্ব্বরাজ মানী বা ঈর্ষু বা চিত্ররথের ক্রীড়াভূমি। এজন্য বোধ হয় যে, চিত্রাঙ্গদকে কুরুরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী উপরোক্ত মনুষ্যজাতিবিশেষ গন্ধর্ব্বগণই আক্রমণ করেন।

চিত্রাঙ্গদের চরিত্রে যদি কোন অলৌকিকতার ছায়া থাকে বিচিত্রবীর্য্য-চরিত্রে কিন্তু অলৌকিকতার গন্ধও নাই। ভ্রাতার মৃত্যুকালেও তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক। ভীষ্মদেব তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিমাতা সত্যবতীর মতে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পরে ভ্রাতা যৌবনে আরূঢ় হইলে, ভীষ্ম নিখিল ক্ষত্রিয় সমাজকে পরাজিত করিয়া, কাশীরাজের তিন কন্যাকে তাঁহার জন্যই স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া আনেন। জ্যেষ্ঠা অম্বা শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন প্রকাশ করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইল। রাজা পত্নীগণের সহিত সম্ভোগে সপ্ত বৎসর কাটাইলেন। অতিরিক্ত ভোগে যক্ষ্মা আসিয়া জুটিল এবং তিনি অপুত্রক অবস্থায় কালকবলে পতিত হইলেন। যে আশায় সত্যবতীর পিতা ভীষ্মের প্রাপ্য সিংহাসন কৌশলে কাড়িয়া লন, এক্ষণে সেই আশালতা বিধির নির্ব্বন্ধে ছিন্ন হইল। সত্যবতী দেখিলেন, স্বামীর বংশ লুপ্ত হয়। তখন তিনি ভীষ্মকে রাজ্য লইতে ও বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্মদেবের চরিত্র এতই উদার যে, কি সামান্য হস্তিনাপুরের সিংহাসন, সমগ্র জগতের

প্রভুত্বের জন্যও তিনি কখনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারিতেন না। তিনি বিমাতাকে বিনীতভাবে জানাইলেন যে, তিনি যে কৌমার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জীবনের সহিত উদ্‌যাপন করিবেন, পিতৃরাজ্যও লইবেন না, বিবাহও করিবেন না। সত্যবতী চিন্তাকুলা হইয়া তখন স্বামীর বংশরক্ষার জন্য বিচিত্র-বীর্য্যের ক্ষেত্রে ভীষ্মকে পুত্র উৎপাদন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাতে কৌমারব্রত ভঙ্গ হয় বলিয়া ভীষ্ম তাহা করিতে চাহিলেন না। তখন সত্যবতী নিরুপায় হইয়া স্বীয় কানীন পুত্র বেদব্যাসকে স্মরণ করিলেন—ভাবিলেন, যে বেদব্যাসও তাঁহার সম্বন্ধে ত বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা বটে, ভ্রাতার দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎ-পাদন শাস্ত্রসম্মত এবং কালোচিত প্রথার বিরোধী নহে। ব্যাসদেব কুরুবংশ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া অম্বিকা ও অম্বালিকাতে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্য পাইলেন না। পাণ্ডু রাজা হইলেন। নিজ ভুজবলে দিগ্‌বিজয় করিয়া সম্রাট্‌ হইলেন। কখনও বা হস্তিনাপুরে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, কখনও বা পরিজন-পরিবৃত হইয়া হিমালয়ে মৃগয়াসুখে তিনি দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্ত কোন অলৌকিকতা নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিন মৃগয়ায় একটি সঙ্গমরত মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মৃগশাবক মর্ম্মাহত হইয়া মনুষ্যস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, মৃগবেশে পত্নীকে মৃগী সাজাইয়া বিহারসুখে রত ছিলেন। এই রন্ধ্রে তাঁহাকে হত্যা করায় পাণ্ডুর দোষ হইয়াছে, অতএব তিনি রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, যেমন নৃপতি তাঁহাকে রতিকালে অপূর্ণকামাবস্থায় হত্যা করিলেন তেমনি কামের উদ্রেক হইলেই অপূর্ণকাম হইয়া নৃপতিকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পাণ্ডুর প্রতি শাপ

এই শাপেই বিষম গোলযোগ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহানুভবগণ বলিবেন, ইহাও কি সম্ভব, যে মানুষ মৃগের আকার ধরিতে পারে এবং মানুষের কথায় লোকের ভোগশক্তি যায়। মানুষের মৃগবেশধারণ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টাবকাশে যখন কুক্কুটাদির বেশ মানুষ আজও সভ্য প্রতীচ্যজগতে ধরিতেছে, তখন সকাম প্রাচ্য মুনির মৃগবেশ ধরা এবং দূর হইতে রাজার তাঁহাকে মৃগ ভ্রম হওয়া সম্ভবপর বটে। শাপের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি কখনও অদৃষ্টে সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে তবে

ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি

ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আর সাধারণতঃ দেখিতে গেলে জীবমাত্রেরই মনস্তাপ দিলে মনস্তাপ পাইতে হয়। মনের সহিত শরীরের এরূপ সম্বন্ধ যে, মনস্তাপে শরীর পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে, ইন্দ্রিয়বিশেষের শক্তিহ্রাস হওয়া ত সামান্য। ঐ ব্রহ্মহত্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘনবিষাদ-মেঘ পাণ্ডুর হৃদয়াকাশ ঘেরিয়া ফেলিল। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া রাজাভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক রাজপরিজনবর্গকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে হস্তিনাপুরে চলিয়া গেলেন। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন

না। অগত্যা পাণ্ডুও, তাঁহাদিগকে লইয়া হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া শতশৃঙ্গপর্ব্বতে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ঘোর তপস্যায় তাপসগণও তাঁহার নিকট পরাভূত। অনঙ্গ তাঁহার নিকট পরাজিত। কিন্তু বংশলোপ-চিন্তা তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিল। তখন কুন্তী তাঁহাকে জানাইলেন যে, কন্যাকালে দুর্ব্বাসা মুনির সেবা ও শুশ্রূষা করায় ঋষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এমন এক মন্ত্র দিয়াছেন যে তাহার প্রভাবে যে কোন দেবতাকে তিনি আহ্বান করিবেন, সেই দেবতাই তাঁহাকে পুত্র দিবেন। পাণ্ডু আনন্দিত হইয়া ধর্ম্ম, বায়ু, ও ইন্দ্রকে আহ্বান করিতে বলিলেন।

শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নগেন্দ্রনাথ

(বিষবৃক্ষ)

বিষবৃক্ষে স্বর্গের চারিটি ছবি, চারিটিই রত্নপ্রভা-মণ্ডিত। আমরা রমণীরত্নত্রয়ের মূল্যাবধারণে প্রয়াস পাইয়াছি; এখন পুরুষরত্নের সৌন্দর্য্যাবলোকন করিয়া এ আলেখ্যদর্শন শেষ করিব। নগেন্দ্রচিত্র লিখনে আবার কবির সেই প্রথা—প্রসঙ্গক্রমে অন্যের দ্বারা সে চিত্রের আভাস প্রদান করিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে, তাহার মাতা জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা গগনোপান্তে দেখাইলেন, কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল "নীলগগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইঁহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে।" কি কৌশলময় তুলিকা-সংযোগ! এক রেখাপাতে একটি সমগ্র চিত্রের বহিরঙ্গ পূর্ণতাপ্রাপ্ত! অথচ কবি যেন এ স্থলে সে চিত্রের প্রতিফলনে চেষ্টিত নহেন।

প্রথম দর্শনেই নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে পরস্পরের আকৃতিগত মাধুর্য্য বা বিশেষত্ব অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আকর্ষণ প্রথমেই কাহার হৃদয়ে প্রণয়ানুরাগে পরিণত হয় নাই। কুন্দের অপার্থিব দেহলাবণ্যে নগেন্দ্রের চিত্ত বিমোহিত হইয়া থাকিলেও, কুন্দ নগেন্দ্রের হৃদয়ে দর্শনমাত্রেই প্রণয়পাত্রীরূপে স্থানাধিকার করিতে পারে নাই কেন, তাহা আমরা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সূর্য্যমুখীর পূর্ণাধিকার অন্যের জন্য স্থানাবশিষ্ট রাখিয়াছিল না। কুন্দও তখন বালিকামাত্র, নগেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যপ্রভাব অন্তরে অনুভূতি করিয়া থাকিলেও, সে তাহার স্বভাব-সারল্যে তাহার হৃদয়ভাবের প্রকৃতি অবধারণ করে নাই। পরে যৌবনের পূর্ণ সৌন্দর্য্যের নিত্য সান্নিধ্যে পূর্ব্বানুভূতি পুষ্টিলাভ করিয়া যেমন একের হৃদয়ে রূপোন্মাদ আনিয়া উপস্থিত করিল, অন্যও সেইরূপ যৌবনের সতেজ হৃদয়বৃত্তির পরিপোষণোন্মুখী হইয়া পূর্ব্বানুরাগে সজীবতা লাভ করিল।

কাব্যে রূপোন্মাদ সচরাচর আকস্মিক ব্যাপার-রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে,—মোহের কার্য্য, চিত্তের বিহ্বলতা, দৈবঘটিত, বা মানুষের আত্মশাসনশক্তির অতীত কুন্দ-নগেন্দ্রের অনুরাগ আকস্মিক ভাবে মূলস্থাপন করিয়া থাকিলেও, তাহার পুষ্টি কতক পরিমাণে ক্রমিক, কিন্তু ক্রমিক হইয়াও তাহা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে এবং আকস্মিক রূপোন্মাদের সহিত তাহার কোনরূপ প্রভেদ নাই। নগেন্দ্রকে কবি উন্মাদ করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার রূপোন্মাদের সহিত তাঁহার নিরন্তর সংগ্রামজনিত চিত্ত-বিকলতা তাঁহার চরিত্রে মদ্যপানাদি নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলিয়াছে। এ উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার আত্মদমনচেষ্টার পরাভব জন্য আপনার প্রতি বিরক্তির ফল, আত্মানাদর হইতে উদ্ভূত, তাঁহার চিত্তের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক, প্রবৃত্তির দোষবিজ্ঞাপক নহে। কাব্যে রূপোন্মাদ মিলন বা পরিণয়ে পরিণত হইয়া পাত্রদ্বয়ের চরিত্র-মহত্ত্বে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্টহৃদয় পাঠকগণকে আনন্দ প্রদান করে; অথবা কাব্য বিয়োগান্ত হইলে, নায়ক-নায়িকার ভাগ্যহীনতায় ক্রন্দন করিয়া তাহাতেও পাঠক একরূপ আনন্দানুভব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বিবাহিত পুরুষের হৃদয়ে স্ত্রী বর্ত্তমানে, অন্যের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করিয়া এক সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন। কলুষিত চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তৎপ্রতি পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দেওয়া এ স্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত এ চিত্র-সংসৃষ্ট সকলকেই তিনি পাঠকের প্রীতির, শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র করিয়া আঁকিয়াছেন, সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধাভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাঁহাকে এ সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। নগেন্দ্রের রূপোন্মাদও তাঁহার হস্তে মিলনে পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে মিলন বিয়োগের পূর্ব্বায়োজন, এবং মিলন ও বিয়োগ উভয়ই কবির মহৎ এবং বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুবর্ণ দগ্ধ হইলে তাহার স্বরূপ অধিকতর প্রকাশ পায়, নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্য প্রণয় পূর্ণতর করিয়া দেখাইবার জন্যই কি কবি কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত করিয়াছেন? ফলে তাহা হইয়া থাকিলেও, তাহাই কবির মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিলে, নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী সম্বন্ধে বিষবৃক্ষের কোন অর্থ থাকে না। কবির অভিপ্রায় ভিন্ন এবং মহত্তর এবং আধুনিক সময়ের মার্জ্জিত উন্নত নৈতিক ধারণার উপযোগী। শকুন্তলার রূপদর্শনে দুষ্মন্তের চিত্তবিকারস্থলে, দুষ্মন্তের চরিত্রবিশুদ্ধতারক্ষার জন্য শকুন্তলার কবি গান্ধর্ব্ব বিবাহই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। বিষবৃক্ষের কবিও নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর সম্বন্ধের বিশুদ্ধতারক্ষার্থ বিধবা-বিবাহ-বিধির শরণ লইয়াছেন। কিন্তু তিনি, তাঁহার অভিমত উচ্চ নীতি তাহাতেই রক্ষিত হইল, মনে করেন নাই। তিনি লৌকিক ব্যবহারের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র, সামাজিক শিক্ষার জন্য যে কাব্য লিখিত, তাহা সামাজিক হিসাবে নায়ক-নায়িকার অপবিত্র সংযোগ দ্বারা কলুষিত হইতে দেন নাই, এই মাত্র। তিনি যে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য এ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা লৌকিক নীতির অনেক উচ্চে সংস্থাপিত। তিনি নগেন্দ্রকে মহৎ এবং কুন্দকে পবিত্র করিয়া

সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রেমানুরাগে দোষারোপ করেন নাই; ঘটনাক্রমে অবস্থাগতিকে, মানুষের যাহা হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহাদের ঘটিয়াছিল; তাঁহারা মানুষ, মনুষ্যস্বভাবের অতীত হইতে পারেন নাই; আর হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক প্রসারণ তাঁহাদিগকে না দেখাইলেও, তাঁহাদের স্বভাবসৌন্দর্য্য রক্ষিত হইত না। কিন্তু তিনি বলিতেছেন, "নগেন্দ্র, তোমার ন্যায় মহাপুরুষও, তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিও যদি সাধারণ মানুষের মত অবস্থাপ্রভাবে পরাভূত হইল, তবে তোমার বিশেষত্ব, তোমার শিক্ষার গৌরব রহিল কোথায়? মানুষ মাত্রেই স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইলেও, শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা মানুষ সংযমী হইতে সমর্থ হয়। তোমা হইতে আশা করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ তোমার যখন সূর্য্যমুখী ঘরে ছিল, তখন তোমার পক্ষে ইহা সম্ভবপর মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি চিত্তসংযমে অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহা তুমি পারিলে না, তাহাতেই তোমার পক্ষে বিষবৃক্ষের সৃজন হইল। তোমার অদৃষ্টে যে অসামান্য একরূপ লোকাতীত, অতিপবিত্র, অতিবিশুদ্ধ, অতিরমণীয় দুর্লভ দাম্পত্যসুখ ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিলে না। কেবল ইহাই তোমার ক্ষতি নহে, তুমি দেবতা হইবার যোগ্য হইয়াও, মানুষের নিম্নতলে রহিয়া গেলে, তাহাই আমার দুঃখ।" —"আর তুমি কুন্দনন্দিনী, তুমি স্বর্গীয়, পবিত্র বিশুদ্ধ সৃষ্টি, তুমি তোমার সেই স্বর্গীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, অন্যের অমঙ্গল সম্ভাবনাস্থলে, অন্যের সুখের বিঘ্নপরিহার জন্য, তোমার আত্মত্যাগের, আত্মনিগ্রহের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে না, জ্যোতির্ম্ময় লোকের অধিবাসী হইয়াও তোমার মানবজন্মে তোমার মানবীত্বের প্রমাণ প্রদান করিলে।" এই অত্যুচ্চ স্বর্গীয় তুলাদণ্ডে মাপিলেই কেবল কুন্দ-নগেন্দ্রের অভাব বুঝিতে পারা যায়; এবং কবি তাঁহার শিক্ষা মানুষের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ করিবার জন্য ইহাদিগকে এই অভাব দিয়া সৃজন করিয়াছেন; মানুষকে বলিতেছেন, "শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া দেবত্বলাভের চেষ্টা কর", অনুকরণীয়ের অনুকরণে কেবল সন্তুষ্ট না হইয়া, অনুকরণীয়কে অতিক্রম করিতে উৎসাহিত করিতেছেন, এবং অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় উচ্চ নীতি সংরক্ষণে অসমর্থ হইলে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, কুন্দ-নগেন্দ্রের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া, সে উৎসাহের ঘটনাগত সমর্থন সংযোজিত করিয়াছেন। উচ্চ নীতিরক্ষণে অসমর্থতার জন্য কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত কবি কম করিয়া আঁকেন নাই। কুন্দ জীবনেও যারপরনাই মনোদুঃখ ভোগ করিয়াছিল, পরে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথই কি কম কষ্ট পাইয়াছেন? প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামেও তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছে। তৎপরে সকল সুখের সামগ্রী, সকল আরামের উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অশেষ ক্লেশপরম্পরায় জীবন শেষ করিয়া, সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁহার অন্যায়াচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং কতক পরিমাণে কষ্টভোগও করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পাপ তত অধিক

নহে, অল্প প্রায়শ্চিত্তের পরেই পুনঃ পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সুখে জীবনাতিপাত করিয়াছেন। সুখে বলিব কি? যদি বলি, তবে কবির উচ্চ নীতির লাঘব করা হইবে। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া কি নগেন্দ্রনাথকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হয় নাই? কুন্দনন্দিনীর রূপমোহে একবার ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, আবার যে কুন্দের প্রতি তিনি অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার অনুতাপ না হইয়া থাকিলে, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব থাকে কোথায়? নৈতিক বিচ্যুতির ইহাই এক অবশ্যম্ভাবী ফল, তদ্দ্বারা যে দুঃখ-যন্ত্রণা, যে সমস্যার অবস্থা আনিয়া ফেলা হয়, তাহার এককালীন নিরাকরণ আর সম্ভবে না। পূর্ণ শরীরে যে আত্মকৃত ক্ষত, তাহা একেবারে মিলায় না। তাই, শিক্ষা দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা, চরিত্র-ভিত্তি এরূপ দৃঢ় করা কর্ত্তব্য যে, কখনও এরূপ সমস্যায় পড়িতে না হয়। নগেন্দ্র-চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই এই, এবং এ অতি উচ্চ শিক্ষা।

নগেন্দ্রনাথকে কবি ভার্য্যাবৎসল করিয়া আঁকিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর জন্য তাঁহার আত্মানুশোচনা, আক্ষেপ ও দুঃখভোগ, এবং তাঁহার ভার্য্যাবিনোদন-প্রণালীর আলোচনা করিলে, তাঁহার কুন্দে আসক্তি সত্ত্বেও, তাঁহার চরিত্রের এই অংশ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এরূপ ভার্য্যাপ্রেমস্থলেও যে রূপমোহ এরূপ অনর্থ ঘটাইতে পারে, ইহা কেবল মানুষের ভাগ্য। মানুষ যে শাপভ্রষ্ট জীব, মানুষের সুখের যে অসংখ্য বিঘ্ন, ইহা তাহাই প্রমাণ করে। অথবা মানুষের সুখদুঃখের মূলে এ সকল না থাকিলে, মানুষের যে কুহেলিকাপূর্ণ জীবন, তাহা ওরূপ হইত না। শিক্ষা নৈতিক শক্তির প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষের সুখ যে পরিমাণে আপনার চরিত্রের উপর নির্ভর করে, সে পরিমাণে সুখের স্থায়িত্ব সংস্থাপন করিতে পারে, এবং সে অবস্থার উচ্চতা বিবেচনা করিলে তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে; কিন্তু ভাঙ্গা-গড়ার দুঃখ-দুর্ব্বলতার মধ্যেও একরূপ রমণীয়তা আছে, তাহার ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ভাঙ্গা-গড়া, দুঃখ-দুর্ব্বলতা কি শিক্ষার জন্যও প্রয়োজন নহে? কবি বলিতেছেন, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা। দুঃখ নিজের কর্ম্মফল এবং সে কর্ম্ম চরিত্রের দুর্ব্বলতা হেতু। নৈতিক দুর্ব্বলতা যে সুখ ভাঙ্গে, সে সুখ পুনর্গঠিত হইলে, দুঃখভোগ দ্বারা অন্তঃকরণের শিক্ষা জন্য নৈতিক বলের পুনরাধান হইয়া সেই নূতন সুখের বা পূর্ব্ব সুখের নবগঠিত অবস্থার স্থায়িত্ব জন্মায়। অভাবজনিত দুঃখও আছে, যাহা আত্মকার্য্যের ফল নহে। অভাবে লোভের কারণ উপস্থিত হইলে, লোভের বস্তু পরিহারের চেষ্টা এবং চেষ্টাজনিত মানসিক অভ্যাসে চিত্তসংযমের ক্ষমতা জন্মে। এরূপে যাহার চিত্তসংযমের ক্ষমতা জন্মে নাই, নৈতিক বিচ্যুতি তাহার পক্ষে সম্ভবপর, আবার সে বিচ্যুতি হেতু দুঃখভোগ, দুঃখভোগ হইতে শিক্ষা, শিক্ষা হইতে নৈতিক শক্তির আধান। সর্ব্বতোভাবে কিছুরই পরিহার সম্ভবপর নহে, চক্রের আবর্ত্তনের ন্যায় নিম্নোচ্চাবস্থাপ্রাপ্তিমাত্র, তবে একের নিম্নগমন অন্যকে সতর্ক করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সুখের স্থায়িত্ব ঘটাইতে পারে। নগেন্দ্রের জীবনে এ সকলই দৃষ্টান্তগত হইয়াছে। তবে চিত্তসংযমের অভাব যে

পূর্ণতাকে নষ্ট করে, তাহারও তিনি জলন্ত দৃষ্টান্ত। কবি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার চরিত্রালোচনা শেষ করিলাম।—"—অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

"নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্তরূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, নীরোগ শরীর, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী, এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই প্রায় ঘটিয়াছিল। প্রধান পক্ষে নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ, কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাস্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত—অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই, কেননা, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এইজন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।"

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিলাতের কথা

(৩)

খাদ্যাখাদ্য

বিলাতের লোকে কি খায়, আর সে দেশে কি কি খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এ দেশের সাহেবেরা যা খান, বিলাতি ইংরেজেরা তাহাই খাইয়া থাকেন। আমাদের খাদ্যাখাদ্যের সঙ্গে একটা ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে সেরূপ কোনও খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই। সুতরাং মানুষের ভক্ষ্য যা কিছু বিলাতে পাওয়া যায়, সাহেবেরা সে সবই স্বচ্ছন্দে "সাবাড়" করিয়া থাকেন। আর

আমরা, আমাদের সংকীর্ণ সংস্কারবশতঃ যে সকল বস্তুকে মানুষের খাদ্য বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না, এমনও কোনও কোনও দ্রব্য ইংরেজ অতি আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকেন, এ কথাটাও অস্বীকার করিতে পারি না। সে কথা পরে বলিব।

মাছ-মাংস

য়ুরোপীয়ের প্রধান খাদ্য মাংস—এ কথাটা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের যেমন ভাত, ইংরেজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতির লোকের সেইরূপ মাংসই প্রধান খাদ্য। ইহাই তাহাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। আর মাংসের মধ্যে গোমাংসই প্রধান। তবে মেষের মাংসও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছাগমাংসের সন্ধান সে দেশে কখনও পাই নাই। মৃগমাংস কখনও কখনও বাজারে উঠে। এ ছাড়া হাঁস, পায়রা, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পাখী এবং ফেজেন্ট্, বালিহাঁস, পারট্রিজ্ প্রভৃতি বনচর পাখীও সর্ব্বদাই মিলে। পাখীর মাংসের দাম বেশী। আর আমাদের পক্ষে বিলাতী পাখীর মাংস খাওয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে।

ইহার কারণ এই যে, নিতান্ত পল্লীগ্রামে না গেলে, সে দেশে টাট্‌কা পাখীর মাংস পাওয়া যায় না। পাখীগুলোকে মারিয়া, ছাল ছাড়াইয়া, নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া, প্রথমে কিছুদিন গুদামজাত করিয়া রাখা হয়, এরূপ শুনিয়াছি। তার পর যখন এগুলি সহরে আসে, তখনও মাংসবিক্রেতার দোকানের জানালায় কত দিন যে ঝুলিয়া থাকে, তাও ঠিক করা সর্ব্বদা সহজ হয় না। শীতপ্রধান দেশে কোনও বস্তুই সহজে পচিয়া উঠে না। সুতরাং এগুলো অনেকদিন এই ভাবে থাকিলেও, একেবারে অখাদ্য হইয়া যায় না। কিন্তু কেমন একটা ভেপ্‌সো গন্ধ জন্মিয়া থাকে অনেক মস্‌লাতেও এই গন্ধটাকে ঢাকা কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্য অন্ততঃ আমাদের বর্ব্বর রসনায় বিলাতী পাখীর মাংস সহজে রোচে না।

কিন্তু কেবল পাখীর মাংস কেন, বিলাতে প্রায় কোনও মাংসই টাট্‌কা পাওয়া যায় না। তবে পাখীর মাংসে যে গন্ধটা পাইয়াছি, অন্য মাংসে সে গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু মাংস সবই সেখানে বাসি। ইংরেজ যতই কেন আপনার স্বাধীনতার স্পর্দ্ধা করুন না, ফলতঃ তাঁর মত এমন পরমুখাপেক্ষী লোক জগতে অতি বিরল। প্রতিদিনের আহারের জন্য ইংরেজকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যে মাংস না হইলে ইংরেজের দিন চলে না, সে মাংস জর্ম্মাণী, ফরাসীস্, হল্যাণ্ড্, মার্কিণ প্রভৃতি স্থান হইতে বিলাতে আমদানী হয়। বিলাতে গো-মেষাদি যে একেবারে নাই, তাহা নয়। কিন্তু স্বদেশী গরু, শূকর, মেষ প্রভৃতি পশুর দাম সেখানে বিদেশী পশুর দাম অপেক্ষা বেশী। সুতরাং গরিব লোকের তো কথাই নাই, অনেক মধ্যবিত্ত লোকেও দিশি গো-শূকরাদির মাংস সর্ব্বদা খাইতে পান না। দেশের অধিকাংশ লোকেই আমদানী মাংস খাইয়া জীবনধারণ করেন। আর আমদানী মাংসের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে মাংস যায়, তাহাই লোকে বেশী পছন্দ করেন। বিশেষজ্ঞ না হইলে সকল সময়ে বিলাতী গো-মেষাদির

মাংসের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার আমদানী মাংসের পার্থক্য বোঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

বিলাতি মাছ।

বিলাতে নানা প্রকারের মাছও পাওয়া যায়। তবে এগুলির অধিকাংশই সমুদ্রে জন্মায়। মিঠা জলের মাছও আছে বটে, কিন্তু সে মাছের সঙ্গে আমাদের দেশের মিঠা জলের মাছের কোনই সাদৃশ্য নাই। আমাদের রুই কাত্‌লা, কই মাগুর, শোল বোয়াল, এ সকল মাছের মত কোনও মাছই বিলাতে পাওয়া যায় না। বিলাতের মিঠা জলের মাছের মধ্যে স্যামনই প্রধান। আমাদের দেশে এমন কোনও মাছ নাই, যার তুলনায় স্যামনের কোনও জ্ঞান বাঙালী পাঠককে দিতে পারি। স্যামনের ছোট ছোট আঁস আছে, এ আঁস কতকটা আমাদের কুচ্চিবাটার আঁসের মত, আকারও সেইরূপ, রংও তাহারই মতন। কুচ্চিবাটা গুলো যদি আর একটু লম্বা ধরণের হইত, ও তার মাথাটা যদি কতকটা ইলিশ মাছের মাথার মতন হইত, তবে হয় ত হঠাৎ একটা মাঝারি রকমের আস্ত স্যামন দেখিয়া কুচ্চিবাটা বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। কিন্তু আমরা যাকে কুচ্চিবাটা বলিয়া জানি, তাহা দেখিয়া স্যামনের রূপ মনে আনিতে হইলে, অনেকটা কষ্টকল্পনা করিতে হয়। স্যামনের বাহিরের রূপের সঙ্গে আমাদের দেশের কোনও মাছের যেমন সাদৃশ্য নাই, তার ভিতরকার রংএর সঙ্গেও সেইরূপ আমাদের কোনও মাছের মিল্ আছে বলিয়া জানি না। স্যামনের ভিতরের রং লাল। ইংরেজি ভাষায় এইজন্য এক জাতীয় লাল রংকে স্যামন্ পিঙ্ক্ (Salmon Pink) বলে। বিলাতে এই মাছের আদর বড় বেশী। তার দামও তার জন্য খুবই বেশী। এ মাছ সর্ব্বদা মিলে না। বোধ হয় মে হইতে জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্তই এ মাছটা পাওয়া যায়। ইংরেজ বড়লোকেরা এই স্যামন্ সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শশার সঙ্গে খাইতে বড়ই ভালবাসেন। স্যামনের দাম অন্যান্য মাছের চাইতে ঢের বেশী। এক পাউণ্ড বা আধ সের স্যামনের জন্য দেড় হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

বিলাতের মৎস্যসমাজে আভিজাত্য-মর্য্যাদায় বোধ হয় স্যামনের পরেই টার্‌বটের (Turbot) স্থান হইয়া থাকে। সুস্বাদুতা হিসাবে টার্‌বট্ স্যামনের চাইতে শ্রেষ্ঠ বই নিকৃষ্ট নয়। অন্ততঃ আমাদের রুচিতে টার্‌বট্ স্যামনের চাইতে বেশী উপাদেয় বলিয়াই লাগে। আমার মনে হয় যে, টার্‌বট্ আমাদের শিলিন্ধ জাতীয় মাছ। চলিত কথায় এই শিলিন্ধকে শিলৈন বা শিলোন বলে। টার্‌বট্ স্যামনের অপেক্ষা অনেক বড় হয়। টার্‌বটের দামও প্রায় স্যামনেরই মত; তবে স্যামন্ সারা বছর মিলে না, টার্‌বট্ প্রায় সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। টার্‌বটের পরেই বিলাতী মাছের মধ্যে হালিবটের স্থান। টার্‌বটের ন্যায় হালিবট্‌ও খুব বড় হয়। হালিবট্ দেখিতে কতকটা আমাদের চিতল মাছের মত। কিন্তু চিতলের আঁস আছে, হালিবটের আঁস নাই। আর চিতলের মত হালিবটের এমন ঘন ছোট ছোট কাঁটাও নাই। টার্‌বট্ ও হালিবট্ দুই খুব তেলাল মাছ। সাহেবেরা এ সকল নানাভাবে

কেবল সিদ্ধ করিয়াই খান। আমাদের মত কাঁচা লঙ্কা ও শর্ষে দিয়া এ সকলের "তেল ঝোল" করিলে, অতিশয় উপাদেয় হইয়া থাকে। স্যামন্, টার্বট্, হালিবট্, এ সকল মহার্ঘ মাছ। গরিব লোকেরা, এমন কি মধ্যবিত্ত লোকেরাও এ মাছ প্রায়ই খাইতে পান না। বিশেষতঃ বিলাতে মাছটা প্রায়ই একটা সৌখিন খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। লাঞ্চে বা ডিনারেই এ সকল ভাল মাছ ব্যবহৃত হয়। গরিব লোকেরা এ সকল আহারে মাছ ব্যবহার করেন না। তাঁরা যা' কিছু মাছ খান, সে কেবল প্রাতরাশের বা ব্রেক্‌ফাষ্টের সময়। আর সে সময়ে কেহই এ সকল ভাল মাছ খান না। গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকে কড্ (Cod) মাছটাই সচরাচর খাইয়া থাকেন। এই কড্ মাছ সমুদ্রে জন্মে। ইহারই যকৃৎ হইতে কডলিভার অয়েল (Cod-liver Oil) প্রস্তুত হয়। কডলিভার অয়েলের গন্ধ মনে করিয়া, হঠাৎ অনেকেই কড্ মাছটাকেও একরূপ অখাদ্য বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু মাছের তেলে যে গন্ধ পাওয়া যায়, টাট্‌কা মাছে কোথাও সে গন্ধ তো থাকে না। আমাদের এমন সুস্বাদু যে ইলিশ মাছ, তার তেলের গন্ধ কি ওক্কারজনক আমরা তো জানি। কিন্তু তাই বলিয়া ইলিশ মাছ তো আর মন্দ নয়। সেইরূপ কড্ মাছের যকৃতের তেলের দুর্গন্ধ দিয়া মাছ বেচারীর বিচার করিলে চলিবে কেন? ফলতঃ কড্ মাছটা বেশ মিষ্টি। টার্বট্ বা হালিবটের মত অমন তেলাল নয় বটে; কিন্তু কতকটা আমাদের ভেটকি মাছের মত সুস্বাদু। কড্ মাছ আকারে ভেট্‌কির মতন নয়, বরং কতকটা আমাদের রুই মাছেরই মতন। কিন্তু তার ভিতরটা ভেট্‌কিরই মত। ভেট্‌কি মাছ রান্না করিলে যেমন পরতে পরতে আলাদা হইয়া যায়, কড্ মাছও সেইরূপ হয়। কডের দামও খুব বেশী নয়। এক পাউণ্ডের দাম সাড়ে চার আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কখনও কখনও আট আনা পর্য্যন্তও হয়। মধ্যবিত্ত ইংরেজেরা এই কড্ মাছটাই বেশী খাইয়া থাকেন। মাংসের যেমন কাট্‌লেট্ হয়, এই কড্ মাছেরও সেইরূপ কাট্‌লেট রান্না হইয়া থাকে। কডেরই মত আর এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরেজেরা হেক (Hake) বলেন। এ মাছও সমুদ্রে জন্মায়। এ মাছটা কডের চাইতে নরম। এ মাছের দামও প্রায় কডেরই মতন। আমাদের আইড় মাছের মত বিলাতে এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়, ইংরেজিতে তাহাকে হ্যাডক্ (Hadock বলে। আইড় মাছে যেমন আঁস থাকে না, হ্যাডকেও সেইরূপ আঁস নাই, তবে আইড় মাছ যতটা বড় হয় হ্যাডক্ তত বড় হয় না। কড্, হেক, হ্যাডক্ এ সকল মাছই সাধারণ লোকে বেশী খাইয়া থাকেন। পুরী প্রভৃতি স্থানে এক প্রকারের পায়রা চাঁদা মিলে, এ দেশের ইংরেজি বুলিতে এগুলিকে পমফ্রেড্ (Pomfred) বলে। পমফ্রেড্ কথাটা বিলাতে শুনি নাই। এই পায়রা চাঁদা মাছকে ইংরেজিতে আমার বোধ হয় প্লেইস্ (Plaice) বলে। এই মাছটা ইংরেজের খুব প্রিয়। এই জাতীয় আর এক শ্রেণীর চাঁদা মাছ আছে,

ইংরেজেরা তাহাকে সোল (Sole) বলেন। প্লেইস্‌গুলো কাল; সোলগুলো সাদা; দু'এর মধ্যে বেশ কম এই। নতুবা দুটাই পায়রা চাঁদা জাতীয়। এই দুই জাতীয় মাছ বড় মিষ্টি। সাহেবেরা প্রায়ই মাঝ-খানের কাঁটাটা ফেলিয়া দিয়া, এ মাছের পোরের ভাজা খাইয়া থাকেন। এইরূপ কাঁটা-ছাড়ান মাছকে ইংরেজিতে ফিলেটেড্ (Filleted) বলে। ফিলেটেড প্লেইস্ ও সোল ভাজা সকল খাবার যায়গায়ই প্রায় পাওয়া যায়। দামও বড় বেশী নয়। সচরাচর একটা প্লেইসের দাম বার আনা কি এক টাকা। সোলের দাম আর একটু বেশী। সোল সাদা আর প্লেইস কাল—তারই জন্য দামের এই বেশ কম হয় কি না, জানি না। ইংরেজের সবর্ণপক্ষপাতিত্বের কথা মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হউক বা না হউক, অসম্ভব নহে। তবে সোল প্লেইস খেতেও যে একটু বেশী ভাল, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না।

আমাদের ইলিশ মাছের মত কোনও মাছ বিলাতে কখনও দেখি নাই। আমেরিকায় এক প্রকারের ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। নিউইয়র্কে সে মাছ খাইয়াছি। মার্কিনীয়েরা তাহাকে শ্যাড্ (Shad) বলেন। বিলাতে ইলিশ মাছ না মিলিলেও, স্বাদে না হউক, অন্ততঃ কাঁটার বাহুল্যে ও আহারান্তে যে ঢকার উঠে, তাহার গন্ধে, ইলিশ মাছকে মনে করাইয়া দেয়, এমন একটা মাছ আছে। ইংরেজিতে ইহাকে হেরিং বলে। হেরিং-গুলো দেখ্‌তে কতকটা আমাদের বাটা মাছেরই মতন, তবে বাটা মাছের চাইতে কতকটা বড় হয়। হেরিং খাইতে বড় মিষ্টি। কিন্তু অত্যন্ত বেশী কাঁটা আছে বলিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া এ মাছটা খাওয়া কেবল যে সহজ নয়, তাহা নহে, একেবারে নিরাপদও হয় ত নয়। তাই বলিয়া নিতান্ত গরিব লোক ছাড়া আর কেউ প্রায় এ মাছটা খান না। ইহার দামও সস্তা। সচরাচর এক আনায় একটা বেশ বড় হেরিং পাওয়া যায়। কখনও আধ আনায়ও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের চুন মাছের মতন কোনও মাছ বিলাতে দেখি নাই। কেবল হুয়াইট্ বেইট (White bait) নামে এক জাতীয় ছোট মাছ আছে, যাহাকে চুন পুটীর শ্রেণীভুক্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। এ মাছটা কতকটা আমাদের মউরলা (পূর্ব্ববঙ্গে ইহাকে মকা বলে) মাছেরই মতন। সাহেবি সমাজে এ মাছটা একটা সৌখীন খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। ভাসন্ত তেলে, অর্থাৎ শূকরবসাতে,—ভাজিয়া, একটু লেবুর রস, নুন ও লঙ্কার গুঁড়ো মিশাইয়া, ব্রাউন্ ব্রেড বা চুকলের রুটী দিয়া, ইংরেজেরা এ মাছটা খাইয়া থাকেন। হুয়াইট বেইটের নামে হুয়াইটিং-এর কথা মনে পড়িল। হুয়াইটিং (Whiting) কতকটা আমাদের বে'লে মাছের মত। আকারে ও স্বাদে উভয় দিক্ দিয়াই বে'লে মাছের সঙ্গে এর কতকটা সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু জলচরের মধ্যে ইংরেজেরা কেবল মাছটাই যে খাইয়া থাকেন, তাহা মনে করিবেন না। সমুদ্রের জীবন্ত ঝিনুক ইংরেজের অতি প্রিয় খাদ্য। ইংরেজিতে এগুলিকে ওয়েষ্টার (Oyster) বলে। সকল য়ুরোপীয়েরাই এই জীবটীর অত্যন্ত ভক্ত। জীবন্ত

ঝিনুকগুলোকে খোলা ভাঙ্গিয়া, সেই খোলার উপরেই প্লেটে সাজাইয়া দেওয়া হয়। আর কি ছোট কি বড়, সকলেই এই নড়ন্ত জীবের উপরে একটু নুন ও এক ফোঁটা লেবুর রস ফেলিয়া তাহাকে সশরীরে উদরস্থ করিয়া থাকেন। এগুলিকে চিবাইয়া কি গিলিয়া কি চুষিয়া খাইতে হয়,—এ সম্বন্ধে সভ্যতার রীতিটা যে কি, তাহা আমি এখনও জানি নাই। গল্দা চিংড়ী এবং কাঁকড়াও বিলাতে প্রচুর পাওয়া যায়। কুচো চিংড়ীও মিলে। কুচো চিংড়ীকে ইংরেজীতে শ্রিম্পস্(Shrimps) বলে। গলদা চিংড়ী ও কাঁকড়া সমুদ্রেই ধরা হয়। আর ধরা মাত্রই, শুনিয়াছি, ফুটন্ত জলে ফেলিয়া এগুলিকে মারিয়া ফেলা হয়। তার পর এই সিদ্ধ মাছই বাজারে বিক্রী হইয়া থাকে। কুচো চিংড়ীগুলোকে শুকাইয়া বাজারে পাঠান হয়। গলদা চিংড়ী ও কাঁকড়ার দামও খুব বেশী। দেড় টাকার কমে একটা মাঝারি রকমের চিংড়ী পাওয়া যায় না। কাঁকড়ারও দাম প্রায় চিংড়ীরই মতন। স্যালাড (Salad) বলিয়া নানাবিধ কাঁচা শাক সব্জি ও তরি-তরকারির যে এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ য়ুরোপীয়েরা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, চিংড়ী মাছটা তারই সঙ্গে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইতালীয় বা ফরাসীস্ প্রণালীতে এই চিংড়ীর স্যালাড বা সল্লাদ প্রস্তুত হইলে তাহা অতিশয় উপাদেয় হয় ;—স্বাদেশিকতার খাতিরে এ সত্য কথাটা অস্বীকার করিতে পারি না।

বিলাত ফেরত।

বঙ্গসাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ

বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতালোকে ও শিক্ষাফলে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, সকল বিষয়ই ক্রমবিবর্ত্তনশীল এবং এই বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশমান। কিন্তু এই ক্রমবিবর্ত্তন সময়-সাপেক্ষ। সেদিন বেয়ার্গসঁ (Bergson) সাধারণ লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধ-স্থাপন কেবল গণিতশাস্ত্রানুমোদিত বাঁধা নিয়মে হয় না ; যখন প্রত্যেক মনন নানা ভঙ্গিমায় কালের বাহ্য জগতের স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করে, তখনই বাহিরের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি সকলেরই বিশেষত্ব আছে ; তাহারা বিশেষ বিশেষ ভাবে অন্তর-বাহিরের সম্বন্ধ স্থাপন করে। নানান্ দেশের নানান্ ভাষা যেমন সেই সেই দেশ-কালোপযোগী, তেমনি নানান্ সুর ও নানান্ ভঙ্গী সাহিত্যে কালবিশেষে বিশেষভাবে উপযোগী। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় যে সুর যে ভঙ্গী ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছিল, এখন সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদায় দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর সামাজিক অবস্থা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই, কলাবিদ্যার সম্যক্ রসবোধ উপভোগ-ক্ষমতা কেমনভাবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে,

তাহা বেশ বুঝা যায়। আজকালকার ইউরোপীয় সমালোচকগণ দেখাইতেছেন, জন্মান্ধ যেমন হঠাৎ দৃষ্টিলাভ করিয়া সকল বস্তুই ঠিক দৃষ্টিমানের মত দেখিতে পায় না, সেইরূপ যাহারা অসভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্য তাহারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে স্বভাবতঃই বঞ্চিত। সভ্যজগতের ইতিহাসে সাহিত্যের আদর বা অনাদর কেমন সাময়িক মনোবৃত্তিবিকাশের উপর নির্ভর করে, তাহা লেগুই (Legouis) তাঁহার ফরাসী কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজেরা তাঁহাদের সমসাময়িক ফরাসী কবিতা কিরূপ ভাবে বুঝিতেন, তাহা ডিকুইন্সির প্রবন্ধপাঠে জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ সেই ফরাসী কবিতাকে আবার অন্য চক্ষে দেখিতেছেন। ডিকুইন্সির কাছে মধ্যযুগের ফরাসী কবিতা কবিতা-নামেরই যোগ্য নহে, ম্যাথু আর্ণল্ড কিন্তু সেই কবিতাকে অন্য চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং আজকাল ইংরাজের কাছে ফরাসী কবিতার সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল এই যে, মনোবৃত্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসবোধশক্তি-উপভোগক্ষমতাও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে এখনও ইউরোপীয়দের মত সাহিত্য চিত্র সঙ্গীতের যথার্থ রসবোধশক্তি বড় একটা দেখা যায় না; তাহার প্রমাণ এই যে, যাহা প্রকৃত সাহিত্য-নামের উপযুক্ত, তাহাই সমালোচকগণ প্রায়ই অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। সমালোচকেরা বেশীর ভাগই, প্রকৃত সমালোচনা কি, তাহা বুঝেন না। লেখক অন্তর-বাহিরের চিরন্তন সত্য ভাব-সৌন্দর্য্য কিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সমালোচক যদি নিরপেক্ষভাবে তাহাই দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তবেই তিনি যথার্থ এই পদের উপযুক্ত; নতুবা এটা ভাল এটা মন্দ—এই বলিলেই সমালোচনা হয় না। সাহিত্য কলাবিদ্যার একটি অঙ্গ মাত্র, কলাবিদ্যার প্রভাববিস্তার যে কারণে হয়, সাহিত্যেরও ঠিক সেই কারণেই হইয়া থাকে। পেটার (Pater) তাঁহার রচনাতে দেখাইয়াছেন, মধ্যযুগের 'পুনর্জ্জন্মে'র সহিত সাহিত্য ও কলাবিদ্যার আভ্যন্তরীণ যোগ না থাকিলে দুইয়ের কেহই সার্থকনাম হইত না। আজ আর সেদিন নাই যে, সমালোচক সমালোচনা করেন বলিয়াই তাঁহার মত শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। এমন এক সময় ছিল বটে, যখন অনুপযুক্ত সমালোচকদিগের হাতে লেখকদিগকে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হইত। এখন য়্যাথিনিয়মের (Atheneum) মত সমালোচককেও সাবধানে কথা বলিতে হয়; কেননা, সমালোচককে দেখাইতে হইবে যে, তিনি উপযুক্ত পাত্র, তাঁহার কথা কহিবার যথেষ্ট অধিকার আছে।

অক্ষম সমালোচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ গত মাসের "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র-নাথ ঠাকুর রচিত 'প্রসঙ্গে'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমালোচকের মতে 'প্রসঙ্গ' প্রকাশে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে আলোচ্য গ্রন্থখানি যদি কেহ

আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তাহা হইলে, তিনি গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু সমালোচক এ ক্ষেত্রে অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন বলিয়াই 'প্রসঙ্গে'র রসগ্রহণে তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছেন।

আজকালকার অনেক মাসিক পত্রিকাতেই এইরূপ অনধিকারচর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র বেত্রাঘাত বন্ধ হইবার পর হইতেই বিপরীত সমালোচনার সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রকৃত সদ্‌গ্রন্থের প্রতি অনাদর ও কটূক্তি এবং অনেক কদর্য্য গ্রন্থেরও ভূয়সী প্রশংসাই অক্ষম সমালোচক মহাশয়গণের নিত্য অপকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রবাসীতে 'প্রসঙ্গে'র সমালোচকও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যাহা সুন্দর এবং সত্য, যাহা মানবের চিরন্তন সম্পত্তি, যাহার অধ্যয়নে আমাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মলতর আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, এইরূপ প্রসঙ্গই আলোচ্য গ্রন্থে সরল সংযত ভাষায়, সুধীন্দ্রবাবুর মধুর লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বারান্তরে সুধীন্দ্রবাবুর রচনাসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি,
বি, এ (ক্যাণ্টাব্), এল, এল, ডি (ডাব্লিন)

চরিত-চিত্র।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

ও

ব্রাহ্মসমাজ

আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাধনা ব্রাহ্মসমাজের নিকটে অশেষপ্রকারে ঋণী। আমরা এ ঋণ অস্বীকার করিলেও, ইতিহাস কখনও তাহা ভুলিয়া থাকিবে না।

আমরা আজ যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া জানি, দেশের লোকে তাহা এপর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই; কখনও যে করিবে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই ধর্ম্মের হাওয়াটা দেশের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই স্বল্পবিস্তর পড়িয়াছে এবং ইহার সাধারণ ভাবগুলি যে অনেকেই অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ কথাই কি অস্বীকার করা সম্ভব? ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের উপরে আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত দেশের ধর্ম্মচিন্তায় এখনও কোনও স্থান পায় নাই; কখনও যে পাইবে, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই। এ দেশে এবং অন্য

দেশে এক সময়ে যাঁরা এই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্রমে সে সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দেখিয়া, তাহাকে বর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে যুক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহার প্রভাবে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধন যে বহুল পরিমাণে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও অর্থসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও সত্য। ব্রাহ্মসমাজ যে আদর্শে ও যে ভাবে আমাদের প্রাচীন সমাজের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন, দেশের লোকে সর্ব্বতোভাবে তাহা অঙ্গীকার করা দূরে থাকুক, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সমাজ-সংস্কারচেষ্টার পরোক্ষ প্রভাবেই যে আজ ভারতের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের, হিন্দুসমাজ নানা দিকে উদার ও উন্নতিমুখী হইয়া উঠিতেছে, ইহাই বা অস্বীকার করা যায় কি ?

আর ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্ত্তমান সমাজবিবর্ত্তনে একটা শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়াই, আপাততঃ এরূপ নিষ্ফলতা লাভ করিয়াও ফলতঃ দেশের ধর্ম্মকর্ম্মের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই কেন বিদেশীয় ভাবাপন্ন হউক না, ইহা যে ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দু-সমাজের উপরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারাটীকে আশ্রয় করিয়া ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে।

সমাজ-বিবর্ত্তনের ক্রম

এই সামাজিক বিবর্ত্তনের গতিটা সোজা নয়, কিন্তু বাঁকা। সে বাঁকাও একটু অদ্ভুত রকমের। ইংরেজিতে ইহাকে স্পাইর‍্যাল (spiral) বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব্দ আছে বলিয়া মনে পড়ে না। কোনও সোজা খুঁটির গায়ে গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত, খানিকটা করিয়া ব্যবধান রাখিয়া, যদি একখানা কাপড় বা একটা রজ্জু জড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে এই কাপড়ের বা রজ্জুর গতি যেরূপ হইবে, সমাজ-বিবর্ত্তনের গতিও সেইরূপ। এইরূপ বক্রগতিকেই ইংরেজিতে স্পাইর‍্যাল-গতি বলে। এ গতি একটানা কেবল উপরের দিকে চলে না। একটু উপরে উঠিয়া আবার একটু নীচে নামিয়া আইসে। কিন্তু এইরূপে নিম্নাভি-মুখী হইয়াও, আগে যতটা নীচে ছিল, কদাপি ততটা নীচে আর যায় না। বরং নীচে নামিতে যাইয়াও সর্ব্বদাই আগে যতটা উচ্চে ছিল, প্রত্যেক স্থানেই তার চাইতে উপরে থাকে। আর এরই জন্য মোটের উপরে এই গতি সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখী হইয়া পরিণামে চরম উন্নতি লাভ করে। সমাজবিবর্ত্তনের ধারাও ঠিক এইরূপ।

সমাজ এই বক্রগতিতে চলিয়া, এক একবার নামিয়া আসিয়া আবার উপরে উঠিতে তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়া যায়। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ইহার প্রথম অবস্থাকে ইংরেজিতে homogeneityর বা নির্ব্বিশেষ-একাকারত্বের অবস্থা বলেন। দ্বিতীয় অবস্থাকে differentiationএর বা বিশিষ্ট বহুত্বের ও পার্থক্যের অবস্থা বলেন।

তৃতীয় অবস্থাকে integrationএর বা মিলনের, সামঞ্জস্যের, একত্বের অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই কথা তিনটী জীবজগতের বিবর্ত্তনের ইতিহাস হইতেই মূলে গৃহীত হইয়াছে। সামাজিক বিবর্ত্তনে এই অবস্থাগুলির অনুরূপ নাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষা ব্যবহার করিলে, বিবর্ত্তনের প্রথম পাদ বা প্রথম অবস্থাকে তামসিক, মধ্যমপাদ বা মধ্যের অবস্থাকে রাজসিক এবং শেষের পাদকে বা অবস্থাকে সাত্বিক বলাই সঙ্গত হইবে। আমাদের পৌরাণিকী কাহিনীর সৃষ্টিপ্রকরণে এই বিবর্ত্তন-ক্রমটীই ব্যক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি অবস্থা নির্ব্বিশেষ-একাকারত্বেরই অবস্থা। ইংরেজিতে ইহাকে স্বচ্ছন্দেই homogeneityর অবস্থা বলা যাইতে পারে। আমাদের পৌরাণিকী কাহিনী নিখিল বিশ্বের বীজরূপী, অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মক অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তন-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অণ্ড-বস্তুর লক্ষণ নির্ব্বিশেষত্ব ও একাকারত্ব। কারণাব্ধি-মধ্যে, এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতাত্মক অণ্ডের ভিতরে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, হিরণ্যগর্ভ বা মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া থাকেন। সাংখ্য-দর্শন এই তত্ত্বকেই অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই তত্ত্বে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থাই বিশ্ববিবর্ত্তনে, সৃষ্টিপ্রকরণে, homogeneityর অবস্থা। এই সাম্য ভাঙ্গিবা মাত্রই মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যায় এবং নির্ব্বিশেষ-একাকারত্ব হইতে ক্রমে, রজঃপ্রাধান্যহেতু, সবিশেষ ও বহু-আকারসম্পন্ন বিশালি ও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহাই differentiation এর বা ভেদ-প্রতিষ্ঠার অবস্থা। ভেদ-মাত্রেই বিরোধাত্মক, আর বিরোধমাত্রেই উপায়পর্য্যায়ভুক্ত; তাহার নিজস্ব কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই। বিরোধ আপনাকে বিনাশ করিয়াই আপনার সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং এই বিরোধের বা differentiationএর অবস্থা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে না। ভেদের ভিতর দিয়া অভেদের প্রতিষ্ঠা হইলেই তবে সে ভেদ আপনার সার্থকতা লাভ করে। এইজন্য differentiationএর পরে integration হইবেই হইবে। এই integration একত্বের, অভেদের, কিম্বা অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক মহান্ একের প্রতিষ্ঠা করে; এবং এই একত্বে বা integrationএ বিবর্ত্তন-প্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। Homogeneity, differentiation, integration—বিবর্ত্তনক্রিয়ার এই তিন পাদের প্রথম পাদে তমোগুণের, দ্বিতীয় পাদে রজোগুণের, তৃতীয় পাদে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে।

এই ত্রিপাদকে আশ্রয় করিয়াই জনসমাজ নিয়ত বিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সমাজ-বিবর্ত্তনের এই ত্রিপাদচক্র যে সমাজ-জীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কেবল একবার মাত্র ঘুরিয়া আইসে, তাহা নয়। সমাজবিবর্ত্তনের গতি কখনও কোথাও থামিয়া যায় না। সমাজ নিয়তই বিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং এই ত্রিপাদচক্রও নিয়ত ঘুরিতেছে। তমঃ রজঃ সত্ত্ব এই তিনগুণ, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, একের পর অন্যে, বারম্বার প্রবল

হইয়া, এই ত্রিপাদ চক্রের গতিবেগ রক্ষা করিতেছে। যুগে যুগে একবার করিয়া এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিপাদচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের আদিতে সমাজ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম সাত্বিকতা, কালবশে, শাস্ত্রে ও সংস্কারে, আচারে ও অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয়। সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই তখন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হইয়া প্রাণহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সমাজ তখন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, জড়গতিমাত্র লাভ করে। এই জড়ত্ব—তমেরই ধর্ম্ম। এ অবস্থা তামসিক homogeneityরই অবস্থা। ক্রমে তখন আবার সমাজমধ্যে রজোগুণ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই রজঃপ্রাবল্য নিবন্ধন অসাড় সমাজদেহে ভেদবিরোধের সৃষ্টি হইয়া, নূতন শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাই রাজসিক defferentiationএর অবস্থা। সর্ব্বশেষে সত্বগুণ প্রবল হইয়া এই ভেদবিরোধের উপশম ও শান্তি হইতে আরম্ভ করে। সমাজ তখন অভিনব সামঞ্জস্যের ও সঙ্গতির সাহায্যে পূর্ব্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া আরো উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে বক্রভাবে, স্পাইর‍্যাল (spiral) গতিতে সমাজ ক্রমে উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়।

আধুনিক ভারতের সামাজিক বিবর্ত্তনে ব্রাহ্মসমাজের স্থান

বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে, সমগ্র ভারত-সমাজ অগাধ অবসাদে নিমগ্ন ছিল। ধর্ম্ম প্রাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, প্রকৃতিপুঞ্জ জ্ঞান-হীন, সমাজ আত্মচৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোরতর তামসিকতা শ্রেষ্ঠতম সাত্বিকতার ভাণ করিয়া, ভীতিকে শম, নির্ব্বীর্য্যতাকে দম, নিদ্রালস্যসম্ভূত নিশ্চেষ্টতাকে নির্ভর বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছিল। ভারত-সমাজের এই ঘোরতর তামসিকতাচ্ছন্ন অবস্থায় ইংরেজের শাসন, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্ম, য়ুরোপের সাধনা এক অভিনব আদর্শের প্রেরণা লইয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নূতন শক্তি-সংঘর্ষে এই তামসিকতা অল্পে অল্পে নষ্ট হইয়া অভিনব রাজসিকতা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই বিচিত্র যুগসন্ধিকালে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। য়ুরোপীয় সাধনার এই প্রবল রাজসিকতাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী সমাজ যে ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবাদী ধর্ম্মের প্রবল আঘাতে তাহাকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক ভারতের বিবর্ত্তনগতিকে homogeneity বা thesisএর অবস্থা হইতে differentiation বা antethesisএর অবস্থায় লইয়া যান। আর তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে ঘোরতর তামসিকতা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার মধ্যে অভিনব রাজসিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। প্রথম—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিতীয়—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন; তৃতীয়—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রাজা রামমোহন রায়কেই লোকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করে সত্য;

কিন্তু তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মসমাজে তাঁর পরবর্ত্তী নেতৃবর্গ যে ভাবে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজা একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্যমর্য্যাদাভ্রষ্ট করিয়া শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরেই ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্ম্ম-সাধনে যে গুরুরও একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা কখনও অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যেমন শাস্ত্র সেইরূপ গুরুকেও বর্জ্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মকৃপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য সিদ্ধি-লাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কি তত্ত্বাঙ্গে, কি সাধনাঙ্গে, ধর্ম্মের কোনও অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্ম্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন নাই। মহর্ষি একপ্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগী হইয়াও, প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই এবং করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশখৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার আপনার আত্মপ্রত্যয়-বা-স্বানুভূতি-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বৈদান্তিক হইলেও তাঁর পূর্ব্বতন কোনও বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকেই একান্তভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে যে সকল যুক্তি প্রমাণাদিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বতন ঋষি ও মনীষিগণ আপন আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন ঋষি-পন্থার অনুসরণ করিয়াই, আধুনিক সময়ের উপযোগী এক সমীচিন বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বদেশের ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়, অথচ পুরাতনের উপরেই, পুরাতনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, পুরাতনের শিক্ষা ও সাধনাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াই—দেশ-কালের উপযোগী নূতন সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষিও পুরাতনকে কতকটা রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁর অভিজাত প্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতার অনুরোধে। তিনি যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সঙ্গে তাঁর এই চেষ্টার কোনই অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ছিল না। মহর্ষির ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্যমর্য্যাদা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র। উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহর্ষির নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকেই বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করেন;—ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। কোনও শ্রুতির বা উত্তরার্দ্ধ, কোনওটীর বা অপরার্দ্ধ, যার যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম-

গ্রন্থে গাঁথিয়া দিয়াছেন। অতএব মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁর নিজের। ইহার মতামত তাঁর, প্রাচীন ঋষিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না করিয়া কেবল বাংলা ভাষায় এ সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলেও, তার যতটুকু মর্য্যাদা থাকিত, উপনিষদের বুক্‌নী দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্য্যাদা লাভ করে নাই। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদিগণের অন্যতম উপদেষ্টা মন্‌কিওর ডি কন্‌ওয়ের (Moncure D. Conway) সংকলিত শাস্ত্র-সংগ্রহের বা Sacred Anthologyর যে পরিমাণ ও যে জাতীয় শাস্ত্রপ্রামাণ্য ও শাস্ত্রমর্য্যাদা থাকা সম্ভব, মহর্ষির সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের সে পরিমাণও সেই জাতীয় শাস্ত্রপ্রামাণ্য এবং শাস্ত্রমর্য্যাদাই আছে বা থাকিতে পারে। তার বেশী নাই।

কিন্তু রাজা রামমোহন যে সমীচিন মীমাংসার সাহায্যে স্বদেশের পুরাতন সাধনার উপরেই নূতন যুগের নূতন সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে মীমাংসা-প্রতিষ্ঠার অনুকূল কাল তখনও উপস্থিত হয় নাই। লোকের মন তখনও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। ফলতঃ যে বিবেক জাগ্রত হইলে লোকের মনে পুরাতন ও প্রচলিতের প্রাণহীনতার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এদেশে তখনও সে বিবেক জাগে নাই। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সমন্বয়, সঙ্গতি—ইহাই মীমাংসার ক্রম। যতক্ষণ না শাস্ত্রে সন্দেহ জন্মে, ততক্ষণ বিচারের অবসর ও মীমাংসার প্রয়োজনই উপস্থিত হয় না। রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভা প্রাচীন ও প্রচলিতের অসারতা ও ভ্রান্তি দেখিয়া তাহার প্রতি সন্দিহান হইয়াছিল। তাই সেই সন্দেহ হইতে বিচার, সেই বিচারের ফলে তিনি নূতন মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু দেশের লোকের মনে তখনও এরূপ গভীর সন্দেহের উদয় হয় নাই; তাঁহাদের বিবেকও জাগে নাই। প্রাচীনকে লইয়াই তাঁরা তখনও সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র ও স্বাভিমতের মধ্যে তখনও কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। দেশের লোকে শাস্ত্র কি, তাহা জানিতেন না। জানিবার প্রয়োজন-বোধ পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্মায় নাই। সুতরাং রাজা যে মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা বুঝিবার ও ধরিবার বাসনা এবং শক্তি দু'য়েরই তখন একান্ত অভাব ছিল।

রাজার সময়ে যে সন্দেহ জাগে নাই, মহর্ষির সময়ে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজার জীবদ্দশায় অষ্টাদশখৃষ্টশতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অভিভূত করিতে আরম্ভ করে নাই। প্রাচীন ও প্রচলিতের প্রতি রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা মোহম্মদীয় যুক্তিবাদেরই ফল, খৃষ্টীয় যুক্তিবাদের ফল নহে। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কগণের সঙ্গে রাজার তখনও কোনই পরিচয় হয় নাই। পাটনায় যাইয়া, পারসী ও আরবী পড়িয়া, মোহম্মদীয় তন্ত্রের মোতাজোলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াই, রাজা সর্ব্বপ্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহর্ষি যে এই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন,

তাহা ইংরেজি শিক্ষারই ফল। তাঁহার সময়ে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবেই, আমাদের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।

আর যে বিচার বা criticismকে অবলম্বন করিয়া দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই সন্দেহের উৎপত্তি হয়, সেই বিচার বা criticismকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষির ধর্ম্মমীমাংসার এবং তত্ত্ব-সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়! এই বিচার বা criticism এর উপরেই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই যুক্তিবাদ আগমের বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এই যুক্তিবাদের বিচার-পদ্ধতি প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয়ে, লৌকিক ন্যায়ের বা formal logic এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে, আমাদের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার বা criticismও শাস্ত্রাশ্রয় বর্জ্জন এবং সদ্‌গুরুর শিক্ষা ও সাহায্যকে উপেক্ষা করিয়া, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই বিচার একান্তই প্রত্যক্ষবাদী। আর প্রত্যক্ষ বলিতে ইহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝিয়া থাকে। এই যুক্তিবাদের বা Rationalismএর সঙ্গে জড়বাদের বা Materialismএর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এইজন্য য়ুরোপে যখনই যেখানে যুক্তিবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে, এই জড়বাদ বা Materialismও প্রবল হইয়াছে। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদ উভয়ই "নান্যদস্তীতিবাদী।" এই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণাদির ন্যায়, অপ্রত্যক্ষ অথচ বুদ্ধিগম্য, একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় আস্তিক-মতাবলম্বী ধর্ম্মসংস্কারকেরা তাহাই করিয়াছেন। তাঁরা মানুষের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়া একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহারই উপরে ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense সভ্য অসভ্য সকল মানুষেরই মধ্যে আছে। ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। সুতরাং কোনও বাহ্য কারণের বা অবস্থার যোগাযোগে ইহার উৎপত্তি হয় না বলিয়া, এই ধর্ম্মবুদ্ধিটা সত্য। আর ইহার একটা স্বতঃপ্রামাণ্যও আছে। এই ভাবেই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। মহর্ষিও ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে যাইয়া কতকটা এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদী আস্তিক-সম্প্রদায় যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়াছেন, মহর্ষি আপনার ধর্ম্মমীমাংসায় তাহাকেই আত্মপ্রত্যয় নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আত্মপ্রত্যয় বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত স্বানুভূতিরই নামান্তর মাত্র। বেদান্ত যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়াছেন, মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় ঠিক সেই বস্তু নয়। অন্ততঃ তাঁহার প্রথম জীবনের ধর্ম্মমীমাংসা যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা যে বেদান্তোক্ত আত্মপ্রত্যয়, এমন সিদ্ধান্ত

করা যায় না। আর শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে এই তথা-কথিত আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই সত্যের ও প্রামাণ্যের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। মহর্ষিও এই স্বানুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই, ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনরায় জাগাইয়া তুলেন।

এদেশে তখন এরূপভাবে লোকের স্বানু-ভূতিকে জাগাইয়া তোলা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কেবল শাস্ত্রাবলম্বনে ধর্ম্মসাধন করিবে না, শাস্ত্রযুক্তি মিলাইয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবে,—লোকে এই প্রাচীন ও সমীচিন উপদেশ তখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞানও একরূপ লোপ পাইয়াছিল। তাহা না হইলে মহর্ষি যেভাবে চারিজন ব্রাহ্মণকে কাশীতে বেদ পড়িবার জন্য পাঠাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষ্যে বেদের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করেন, তাহা আদৌ সম্ভব হইত না। ইঁহারা কেবল ব্যাকরণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রাচীন মীমাংসার পথ অব-লম্বন করেন নাই। রাজা এই মীমাংসার পথ ধরিয়া শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, মহর্ষির ন্যায় তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রাচীন শ্রুতিপ্রামাণ্য পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে চক্ষে বেদকে দেখে, লোকসংগ্রহার্থে পণ্ডিতেরাও যে ভাবে বেদের অতিপ্রাকৃত মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন,—ভারতের প্রাচীন মীমাংসকগণ সেরূপ করেন নাই। রাজা এ সকল কথা জানিতেন। সুতরাং তাঁহাকে মহর্ষির ন্যায় শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করিতে হয় নাই। কিন্তু তখনও এ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের পুনরুদ্ধারের ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। দেশের লোক তখনও এ সমীচিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় নাই। সে সময়ে এ সকল সিদ্ধান্তের কথা বলিলেও, লোকে ভাল করিয়া তাহা বুঝিত না, অথচ না বুঝিয়াও তাহারই মধ্যে নিজেদের নিশ্চেষ্টতা ও তামসিকতার সমর্থন করিবার যুক্ত্যাভাস পাইয়া,সেই নির্জীব অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। তখনকার প্রধান কর্ম্ম ছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু সংস্কার নাশ করা। সাধুমীমাংসা মাত্রেই সম্যগ্‌দর্শী। আর সম্যগ্‌দর্শন নিম্নাধিকারী লোকের পক্ষে কর্ম্ম চেষ্টার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একান্ত অন্তরায় হইয়া থাকে। যে 'গোঁ'এর ভিতর দিয়া রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল তমোগুণকে অভিভূত করিয়া থাকে, অসময়ে সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভ করিলে সে 'গোঁ' জন্মাইতে পারে না; সুতরাং তামসিকতাও নষ্ট হয় না। আধুনিক ভারতের নূতন সাধনার প্রয়োজনেই রাজার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে যে সম্যগ্‌দর্শনের পরিচয় পাই, মহর্ষির প্রথম জীবনের ধর্ম্মমীমাংসায় সে সম্যগ্‌দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নাই; উঠিলে তাঁহার দ্বারা বিধাতা যে কাজ করাইয়াছেন, তাহার গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

রাজা রামমোহন প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াও, প্রকৃতপক্ষে একটা নূতন ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই "ব্রহ্মসভার" ভজন-সাধনকে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে গড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণ যতটা পরিস্ফুট

হয় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে তদপেক্ষা অনেক বেশী ফুটিয়া উঠে।

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই আপনার ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু এই স্বানুভূতিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকেই তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে স্থাপন করিতে যাইয়া, এক প্রকারের শাস্ত্র-প্রামাণ্যও প্রদান করেন। এইজন্য তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মবস্তুটী যে একান্তই অভিনব ও স্বরচিত, ইহার যে, কোনই প্রাচীন ভিত্তি বা প্রামাণ্যমর্য্যাদা নাই, লোকে ইহা সহজে ধরিতে পারে নাই। সে সময়ে দেশে শাস্ত্রজ্ঞান একরূপ লোপ পাইয়াছিল। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও বেদবেদান্তাদির কোনওই ধার ধারিতেন না। সুতরাং আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিসম্ভূত সিদ্ধান্তকে মহর্ষি যে অদ্ভুত শ্রুতিমর্য্যাদা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, তাহার কৃত্রিমতা ও অশাস্ত্রীয়তা, দেশের লোকে একেবারেই বুঝিতে ও ধরিতে পারেন নাই। ফলতঃ প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ড পরিহার করিয়াই, দেবেন্দ্রনাথ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন; নতুবা তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম একান্তই অশাস্ত্রীয় ও অপ্রামাণ্য বলিয়া তাঁহার উপরে কোনওই নির্য্যাতন হয় নাই। বরঞ্চ তাঁর সিদ্ধান্ত ও সাধনকে উচ্চতর অধিকারের হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বাভিমানী য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর সাধনা ও চরিত্রগুণে, তাঁর উপদিষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের প্রভাব ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। দেবেন্দ্র-নাথের প্রকৃতির মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রভুত্বাভিমান বিদ্যমান ছিল। তিনি যে সমাজে, যে পরিবারে, যেরূপ বিভবগৌরবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন ও যে সৌভাগ্যের অঙ্কে লালিত পালিত হ'ন, তাহাতে এরূপ প্রবল প্রভুত্বাভিমান যে তাঁর মধ্যে জন্মিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তার পর তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, তার মুমূর্ষু দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন এবং এক দিকে আপনার সাধনের ও অন্যদিকে আপনার অর্থের দ্বারা যেরূপে ইহাকে লোক-সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে এই ব্রাহ্মসমাজে যে তাঁর একটা একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আর এই কারণে মহর্ষি আদিব্রাহ্ম-সমাজে যে ধর্ম্মের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা যে একান্তই শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত, এ ভাবটা বহুদিন পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ আপনার সঙ্কলিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থকেই প্রামাণ্য শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন গুরু-আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া, দেবেন্দ্র-নাথের ব্রাহ্ম শিষ্যমণ্ডলী, তাঁহাকেই নূতন ধর্ম্মের গুরুরূপে বরণ করেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত, শুদ্ধ স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে বাহ্যতঃ ও লোকতঃ গুরু ও শাস্ত্র উভয়েরই প্রতিষ্ঠা হয়। আর এই জন্য স্বদেশের ধর্ম্মের সঙ্গে সাধন ও সংস্কারাদি বিষয়ে ইহার বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইলেও, ভাবগত কোনও প্রবল

বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ সর্ব্বদা আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্ম-সাধনকে উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। দেশের লোকেও তাঁহাদের এই দাবীর একান্ত প্রতিবাদ করেন নাই।

কিন্তু এইরূপে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যে পথ ধরিয়া আপনাদের ধর্ম্মসাধনে গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে, এদেশে, কখনও এ বস্তু মিলে নাই। আমাদের সাধনায় শাস্ত্রগুরু-আনুগত্যের একটা নিগূঢ় সঙ্কেত আছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সে সঙ্কেতটী লাভ করেন নাই। গুরু স্বয়ং গুরু-আনুগত্য স্বীকার ও শাস্ত্র আপনি পুরাতন শাস্ত্রে আবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের গুরু ও শাস্ত্র কিম্বা গুরূপদেশ, দু'এর কেহই স্বয়ং-বৃত ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন। পূর্ব্বতন গুরুপরম্পরা ও সনাতন শাস্ত্র-ধারার সঙ্গে ইহাদের একটা গভীর ও অঙ্গাঙ্গী যোগ সর্ব্বদাই রক্ষিত হয়। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে এ যোগ থাকে নাই। আর এইরূপ স্বয়ং-বৃত গুরুর বা মনগড়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা কদাপি কোথাও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যেখানেই এরূপ গুরু-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই থানেই ক্রমে বিদ্রোহীদলের উৎপত্তি হইয়া, সম্প্রদায়কে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। রোমক-খৃষ্টীয় সঙ্ঘের প্রামাণ্য একদিকে পুরাতন শাস্ত্রধারার ও অন্যদিকে পুরাগত গুরুপারম্পর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, সেখানে ধর্ম্মমত লইয়া দলাদলির প্রকোপও অত্যন্ত কম। প্রোটেষ্টান্ট্ খৃষ্টীয় সঙ্ঘে শাস্ত্র আছে, কিন্তু গুরুপরম্পরার ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রধারার সৃষ্টি হয় নাই; এখানে প্রত্যেকে আপনার বিচার ও বুদ্ধি, খুসি ও খেয়াল মত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অন্যদিকে, প্রোটেষ্টান্ট্ খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে গুরুপরম্পরারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর এই দুই কারণে প্রোটেষ্টান্ট্ সঙ্ঘ এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া, ইহাকে আরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, মূলতঃ এই একই কারণে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই, পঞ্চাশৎ বৎসর যাইতে না যাইতে তিনটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া প্রাচীন শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া, আপনার ব্রাহ্মসমাজে নূতন গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে এ বস্তু পাওয়া যায় না। তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত আত্ম-প্রত্যয়কে যতটা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের বিচার-বুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। পারিলে, তাঁর নিজের গুরু-পদ-গৌরব ও তাঁর সঙ্কলিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের" শাস্ত্রপ্রামাণ্য, তিনি দু'এর কিছুরই দাবী করিতে পারিতেন না। কিন্তু মহর্ষি যে ব্যক্তি-স্বাভিমানী যুক্তিবাদের (Individualistic Rationalism) উপরে আপনার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অপরিহার্য্য পরিণামকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিতে

পারেন নাই বলিয়াই, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে তিনি আপনার অসঙ্গত একতন্ত্রপ্রভুত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া আপনার শিষ্যগণের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিলেন। যে ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞান বা Conscienceকে আশ্রয় করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও পুরাগত শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিলেন, সেই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবকদল, তাঁহার একতন্ত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বিদ্রোহীদলের সৃষ্টি করেন। এ জগতে প্রত্যেক বস্তু তার অনুরূপ বস্তুকেই উৎপাদন করিয়া থাকে। স্বদেশের শাস্ত্রগুরুর বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের দ্রোহিতা, আপনার কর্ম্মবশেই, তাঁহার নিজের সমাজে, আপনার শিষ্যগণের ভিতরে, এই নূতন দ্রোহীদলের সৃষ্টি করিল। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে, এমন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল, যাহাতে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে বিরোধ জাগাইয়াছিলেন, সেই বিরোধই আরো বেশী বিশদ ও তীব্র হইয়া উঠিল।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। উভয়েই প্রকৃতপক্ষে সারসংগ্রহবাদী ছিলেন। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগকে ইংরেজিতে Eclectic বলে। কিন্তু মহর্ষির যুক্তিবাদ যতটা সংযত ও সারসংগ্রহবাদ যে পরিমাণ স্বাদেশিক ছিল, কেশবচন্দ্রের যুক্তিবাদ ততটা সংযত ও তাঁর সারসংগ্রহবাদ বা Eclecticism সে পরিমাণ স্বাদেশিক রহে নাই। মহর্ষি আপনার বিচারবুদ্ধিকে সত্যের একমাত্র ও অনন্যপ্রতিযোগী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বদেশের প্রাচীন শ্রুতি হইতে আপনার মনোমত সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি উদ্ধার করিয়া, তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র এই পথে যাইয়াই, জগতের সমুদায় ধর্ম্মসাহিত্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, এই শ্লোকসংগ্রহকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ঐতিহাসিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যে একটা উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে। মহর্ষির ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে বা ব্রহ্মসাধনে এই বিশ্বজনীনতা রক্ষিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় ইহা খুবই ফুটিয়া উঠে। এইজন্য যুক্তিবাদের নিক্তিতে ওজন করিলে, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মত, সিদ্ধান্ত, সাধনাদি, সকলই মহর্ষির মত, সিদ্ধান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির ঐকতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। এইজন্য এই নূতন সমাজকে প্রথমে গণতন্ত্রতার আদর্শে গড়িয়া তুলিবার কতকটা চেষ্টাও হইয়াছিল। ইহার ফলে মহর্ষির সমাজে ব্রাহ্মসাধারণের ব্যক্তিত্বাভিমানী 'সহজবুদ্ধি'র বা Intuitionএর যতটা প্রভাব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, প্রথম প্রথম তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহর্ষির উপদেশে ও সাধনে একটা হিন্দুভাব সর্ব্বদাই জাগিয়া ছিল। এই কারণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

ব্রাহ্মগণমধ্যে একটা, বিনয়, একটা শ্রদ্ধা ও একটা সংযমের প্রভাবও সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। এই বিনয়, শ্রদ্ধা ও সংযম হিন্দুর প্রকৃতি-গত বস্তু। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যান্ট্ খৃষ্টীয় সাধনা ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscienceকে বাড়াইতে যাইয়া, ধর্ম্মের এই প্রাণগত বস্তুগুলিকে অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে এই খৃষ্টীয় ভাবের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscience এর ভাবটা নিরতিশয় প্রবল হইয়া, এই বিনয়, সংযম ও শ্রদ্ধা বস্তুকে এক প্রকার নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের প্রাধান্য আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তি-বাদী ধর্ম্মসকলের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া, আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে যুক্তিবাদী ধর্ম্মের স্বরূপটী যতটা ফুটিয়া উঠে, মহর্ষির অধীনে, তাঁর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের শিষ্যগণ জীবনের সকল বিভাগে, তত্ত্বসিদ্ধান্তে, ধর্ম্ম-সাধনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, সর্ব্বত্র, এই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের অনন্যপ্রতিযোগী প্রাধান্য প্রতিফলিত করিতে যাইয়া, আধুনিক ভারত-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ধর্ম্মমীমাংসায় ও ধর্ম্মসাধনে যে রাজসিক ভাব জাগাইয়াছিলেন, তাহাকে আরো প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তনে যে anti-thesis এর প্রতিষ্ঠা করেন, কেশবচন্দ্র তাহাকেই আরো বিশদ ও তীব্র করিয়া তুলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের যে স্থান ছিল; তার পরে, ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যে স্থান অধিকার করেন; তৎপরবর্ত্তী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই স্থানই প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহারা তিন জনেই, একের পর অন্যে, ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া দেশের ইংরেজিশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিন্তা ও ভাবকে স্বল্প বিস্তর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিপ্রতিভা-গুণে তাঁহার প্রথম জীবনের উদার শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়াই, ব্রাহ্ম-সমাজের এ ভাব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকাশ সাধনে কেশবচন্দ্র যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ বা শিবনাথ ইঁহাদের কেহই সে পরিমাণে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যেমন মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শিব-নাথ শাস্ত্রী কিছুতেই মহর্ষির সাধননিষ্ঠা এবং কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভার দাবী করিতে পারেন না, সত্য। কিন্তু অন্য দিকে যে সকল বাহিরের অবস্থার ও ঘটনার শুভযোগাযোগ ব্যতীত কি মহর্ষি কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া স্বদেশের বৃহত্তর কর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মজীবনে কখনই কোনও প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না, শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে সে সকল যোগাযোগও ঘটে নাই।

দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পুত্র। পিতৃবিয়োগের পরে কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ভিতরে পড়িয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সংযম ও সততাগুণে কালক্রমে পৈতৃক জমিদারী ঋণমুক্ত হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনিসমাজের অগ্রণীদলভুক্ত হইয়া উঠেন এবং তখন হইতে তাঁহার অর্থেই ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন মত ও আদর্শ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এবং আধুনিক বাঙালী সমাজের সাধনার ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী মহর্ষির অর্থেই স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হয়। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকগণ, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ও কর্ম্মচারিগণ সকলেই তখন মহর্ষির অর্থানুকূল্যে ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী বা বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। আর এই ধনবল না থাকিলে, শুদ্ধ আপনার চরিত্রের বা সাধনার বলে সে সময়ে মহর্ষি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে এতটা বাড়াইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর ব্রাহ্মসমাজে কালক্রমে মহর্ষির যে একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার অর্থবলই ইহারও একটা প্রধান কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র মহর্ষির মত ধনী ছিলেন না বটে; কিন্তু রামকমল সেনের পৌত্র বলিয়া কলিকাতা-সমাজে তাঁহারও একটা বিশেষ আভিজাত্যমর্য্যাদা ছিল। ফলতঃ সামাজিক হিসাবে, কলুটোলার সেনেরা, বৈদ্য হইয়াও, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে না করিতেই, কেশবচন্দ্রের দৈবীশক্তিশালিনী বাগ্মীপ্রতিভা দেশের উর্দ্ধতন ইংরাজ রাজপুরুষদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করে। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপই, ইংরেজ রাজপুরুষগণ যাঁহাদিগকে বাড়াইয়া তুলিতেন, স্বদেশী সমাজেও. আপনা হইতেই, তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইত। এই সকল বাহ্য যোগাযোগ ব্যতীত কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভাও এত সহজে ও এত অল্পকাল মধ্যে দেশের শিক্ষিত সমাজে এমন অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কেবল যে মহর্ষির সাধননিষ্ঠা বা কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভাই নাই তাহা নহে। যে সকল বাহ্যঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগের সাহায্যে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আপনাদিগের কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাগ্যে সেইরূপ কোনো যোগাযোগও ঘটে নাই। শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান। একরূপ পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। মহর্ষির ধন, কেশবচন্দ্রের বংশমর্য্যাদা—এ সকলের কিছুই তাঁর ছিল না। আর এ সকল ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ সাধনে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র যে কাজটী করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা করিয়াছেন।

ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের শাসন, আধুনিক

সাধনার প্রেরণা,—এ সকলে মিলিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে যে অভিনব অনধীনতা বা Independence এর ভাব জাগাইয়া তুলে, তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর ব্রাহ্মসমাজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস দুই এক বস্তু। এই অভিনব অনধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজকে যতটা অধিকার করে, দেশের অপর কোন সম্প্রদায়কে ততটা অধিকার করিতে পারে নাই। অপরে আংশিকভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মসমাজই ইহাকেই সম্পূর্ণভাবে জীবনের সকল বিভাগে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে। আর ব্রাহ্মসমাজও যে প্রথমাবধিই এই আদর্শকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল, এমনও নহে। মহর্ষি ইহাকে যতটা অবলম্বন করেন, কেশবচন্দ্র তদপেক্ষা বেশী করিয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই অনধীনতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠে, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে তদপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অনধীনতা-মন্ত্রের সাধক এবং এই অনধীনতা-ধর্ম্মের—বা 'Religion of Freedom এর পুরোহিতরূপেই, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, এ দেশের আধুনিক ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে, প্রথমে মহর্ষির, তার পরে কেশবচন্দ্রের এবং সর্ব্বশেষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর শিক্ষার ও চরিত্রের যাহা কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধানতঃ তত্ত্বমীমাংসায় ও ধর্ম্মসাধনেই এই অনধীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র ইহাকে আরও একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে,—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই অনধীনতা-প্রবৃত্তি ক্রমে যতটা বলবতী ও বহুমুখী হইয়া উঠে, কেশবচন্দ্র বেশিদিন তাহার সঙ্গে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তাহারই জন্য দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায়ই বস্তুতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই অনধীনতা আদর্শের সাধক ও প্রচারকরূপে নূতন সমাজের নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাই তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতার অন্তরালে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, একটা সমাজানুগত্যের ভাব বিদ্যমান ছিল। আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তে মহর্ষি কতকটা য়ুরোপীয় আদর্শের যুক্তিবাদী ছিলেন, হয় ত এমনও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সামাজিক ব্যাপারে মহর্ষি সর্ব্বদাই স্বদেশের সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য মহর্ষি অনেক সময় মর্য্যাদা হানির ভয়েই অনেক অযৌক্তিক সমাজবিধানও মানিয়া চলিতেন। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার আভিজাত্যের আর কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাদেশিকতার ফল ছিল।

কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার মূলে হিন্দুর সমাজানুগত্য নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় Non-

conformist Conscienceএর নৈতিক প্রভাবই বিদ্যমান ছিল। এই Non-conformist Conscience একটা অদ্ভুত বস্তু। আপনার ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের প্রতিষ্ঠায় ইহা সর্ব্বদাই অত্যুদার হইয়া উঠে। কিন্তু অপরের ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই বস্তুই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। ইহা ধর্ম্মের ও সত্যের দোহাই দিয়া একদিকে আপনাকে অপরের আনুগত্য হইতে মুক্ত করিতে চাহে। অন্যদিকে আপনার মতামতকে অপরের উপরে চাপাইয়া তাহাদের মুক্তিবিধানের জন্যই তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণও করে। এই জন্য এই Non-conformist Conscience যুগপৎ উদার ও রক্ষণশীল হয়। কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতা এই ধাতেরই ছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্ম্ম-সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু মহর্ষির ভিতরকার ভাব ও আদর্শ সর্ব্বদাই হিন্দু ছিল। কেশবচন্দ্রের ভিতরকার ভাব, বিশেষতঃ প্রথমজীবনে, বহুল পরিমাণে পিউরিট্যান খৃষ্টীয়ান (Puritran Christian) আদর্শের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকেও তিনি এইভাবেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে এক সময়ে মহর্ষির হিন্দুভাবাপন্ন কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিট্যানভাবাপন্ন রক্ষণশীলতা একেবারেই ছিল না বলিলেও চলে। খৃষ্টীয় জগতে পিউরিট্যান্‌গণ সংসারের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধে একটা তীব্র পবিত্রতার আদর্শের অনুসরণ করেন। কেশবচন্দ্রও যৌবনাবধিই এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মে ও সাধনায় যাহাকে শুদ্ধতা বলে, এই খৃষ্টীয়ানী পবিত্রতা ঠিক সে বস্তু নয়। আমাদের দেহশুদ্ধি বা ভূত-শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির কথা আধুনিক খৃষ্টীয় সাধনায় পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্র যে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা ইংরেজি পিউরিটি, সংস্কৃত শুদ্ধতা নহে। এই পিউরিটি রক্ষা করিবার আত্যন্তিক আগ্রহ হইতেই কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার উৎপত্তি হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে ও চরিত্রে অতি কঠোর সংযমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে মহর্ষির স্বাভাবিক সমাজানুগত্য কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিটি-প্রবণতা কখনই ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধিও ছিল। আর নিজেদের প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম-প্রবণতার বা বিশ্বাস-প্রবণতার গুণেই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়াও ইঁহারা সংশয়বাদী হইয়া উঠেন নাই। ইঁহাদিগের অটল ঈশ্বর-বিশ্বাস আপন আপন প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যুক্তি-তর্কের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। ফলতঃ এই প্রকৃতিগত ঈশ্বর-বিশ্বাসকেই মহর্ষি আত্ম-প্রত্যয় বলিয়াছেন। আপনার ধর্ম্মসিদ্ধান্তে কেশবচন্দ্র এই প্রকৃতিগত 'আস্তিক্য-বুদ্ধিকেই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর খৃষ্টীয়ান দর্শনের পরিভাষায় ইনটুইসন্ (intution) নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহর্ষির আত্ম-

প্রত্যয়ই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের ইন্‌টুইসন্। আর এ দু'ই মূলতঃ ও বস্তুতঃ তাঁহাদের নিজেদের প্রকৃতিগত ব্যবসায়াত্মিকা আস্তিক্য-বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। এই প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আত্ম-প্রত্যয় বা ইন্‌টুইসনরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপরেও আপনাদিগের এমন অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন

কিন্তু সংশয়-প্রবণ য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন, তাঁহাদের অনেকেরই এই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাধনসম্পদ ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ এবং অঘোরনাথ প্রভৃতি দুই চারিজন ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং উপাসকগণের মধ্যে প্রায় কাহারই প্রকৃতির ভিতরে মহর্ষির বা কেশবচন্দ্রের ন্যায় কোনও বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল না। সুতরাং ইঁহারা অতর্ক-প্রতিষ্ঠ পরমতত্ত্বকে লৌকিক তর্কযুক্তির উপরেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্রের বাগ্মীপ্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য মনিষীত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র প্রত্যক্ষ গুরুরূপে বরণ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। অতি-সংশয়বাদ সর্ব্বত্রই এই ভাবে অনেক সময় অতি-বিশ্বাসে যাইয়া পড়ে। এই অতি-সংশয়বাদেরই ইংরেজি নাম Scepticism এবং ইংরেজিতে যাহাকে Credulity বলে বাংলায় তাহাকেই অতি-বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কোনও প্রকারের অতীন্দ্রিয় ও অপ্রত্যক্ষতত্ত্বে যাঁহারা কোন মতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারাই Sceptic বা অতি-সংশয়বাদী। আর এই অতি-সংশয়বাদের তাড়নাতেই এই সকল লোকে অনেক সময় এমন সকল বিষয়েও আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যাহা কখনও কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না ও হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতির অদ্ভুত জটিলতা নিবন্ধন অনেক সময় এইরূপে অতি-সংশয়বাদ বা Scepticism হইতেই অতি-বিশ্বাসের বা credulityর উৎপত্তি হয়। কেশবচন্দ্রের অনুচরগণের মধ্যে মূলে যাঁহারা অতি-সংশয়বাদী ছিলেন তাঁহাদেরই একদল কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অতি-বিশ্বাসভরে তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ রূপে বরণ করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক আনুগত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত ও উপদেশানুসারে আপনাদিগের ধর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আর একদল লোক এই এই অতি-বিশ্বাসকে বর্জ্জন এবং কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষত্বের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদিগের স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ তর্ক-যুক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বকে ও ধর্ম্ম-সাধনাকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। এইরূপে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পর হইতেই তাহার ভিতরে দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

প্রথমে মহর্ষি এবং তারপরে কেশবচন্দ্রও আপনার প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজকে যে পথে পরিচালিত করেন, তাহাতে এরূপ বিরোধ একরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মহর্ষির সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই গড়িয়া উঠে। আর বস্তুতঃ সেই জন্যই কেশবচন্দ্রকে শেষজীবনে "নববিধানের" প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কারণ এই যুক্তিবাদ বা Rationalism, প্রাকৃত বুদ্ধির প্রেরণায়, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে Deism বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Theism বলা যায় কি না সন্দেহ। Deism আর Theism এ পার্থক্য এই যে, একেতে ঈশ্বরতত্ত্বকে বিশ্ব-শক্তি বা বিশ্ববিধানরূপে এবং অপরে শক্তিমান পরমপুরুষ বা বিশ্ববিধাতা ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শিবনাথ বাবুর কথায়, Deism এর ঈশ্বর শক্তি, Theism এর ঈশ্বর ব্যক্তি। আর প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ঈশ্বরকে শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তি বা বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মহর্ষির ঈশ্বর কেবল শক্তি মাত্র ছিলেন না, সত্য। কিন্তু মহর্ষির ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপরে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা তাঁর ভাবাঙ্গ-সাধনেরই ফল। এই ভাবাঙ্গসাধনে মহর্ষি হাফেজ প্রভৃতি মোহম্মদীয় ভক্তগণেরই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, লৌকিক ন্যায়-ও-য়ুরোপীয়-যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত মামুলী ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পন্থার অনুসরণ করেন নাই। এই গভীর ভাবাঙ্গসাধনের গুণেই মহর্ষির ব্রাহ্ম ধর্ম্ম Deism হয় নাই, কিন্তু অতি উচ্চদরের Theism রূপেই তাঁর জীবনে ও চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরও শক্তিমাত্র ছিলেন না। কারণ কেশবচন্দ্রের প্রখর সংজ্ঞানের বা conscience এর প্রেরণায় প্রথম হইতেই তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বে একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি ভাবাঙ্গ-সাধনের ভিতর দিয়া, মোহম্মদীয় ভক্তগণের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে, তাঁহার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে, তাঁর গভীর পাপ-বোধের বা Ethical Consciousness এর ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান সাধক-গণের দৃষ্টান্তে, ও শিক্ষায় আপনার প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজে ইঁহারা উভয়েই যে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার উপরে Deism এরই প্রতিষ্ঠা হয়; Theism এর প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের নিজেদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্ব যে Theism হইয়া উঠে, ইহাঁদের প্রকৃতির ও সাধনার বিশেষত্বই ইহার প্রধান ও একমাত্র কারণ।

ফলতঃ শুদ্ধ যুক্তিবাদের উপরে কোনও প্রকারের গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলা যে অসম্ভব, মহর্ষি এবং কেশব-চন্দ্র উভয়েই ইহা ক্রমে অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ইঁহারা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই যুক্তিবাদকে ধরিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া সাধক অনুকূল অবস্থাধীনে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মবস্তু প্রকৃতপক্ষে

মানুষের প্রাকৃত-বিচার বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু এই সকল ঈশ্বরানুপ্রাণিত সাধু মহাজনের সাক্ষ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে,—মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র উভয়েই জীবনের শেষভাগে এই মত প্রচার করেন। কিন্তু যে ঈশ্বরানুপ্রাণনের উপরে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র দুজনেই পরে আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্যমর্য্যাদা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসিদ্ধান্তের মূলগত যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বাভিমান কিছুতেই সে ঈশ্বরানুপ্রাণনের মতকে সমর্থন করে না।

ফলতঃ যে আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে ব্রাহ্মসাধারণের তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে কোনও প্রকারের অনন্যসাধারণত্বের বা অপ্রাকৃতত্বের দাবী কখনই গ্রাহ্য হয় না। এই যুক্তিবাদ ধর্ম্মসাধনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে; কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারে না। সমাজগঠনে ও রাষ্ট্রীয়জীবনে এই যুক্তিবাদ কেবল গণতন্ত্রব্যবস্থাকেই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কিন্তু সমাজ-পতি বা রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের আধিপত্য গ্রাহ্য করে না। ফরাসীবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার আদর্শ এই যুক্তিবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত প্রথমে এই যুক্তবাদকেই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁর ধর্ম্মপ্রবণ বুদ্ধি প্রথমাবধিই এই সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার আদর্শকে স্বল্প-বিস্তর ভীতির চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করে। এই সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার নামে য়ুরোপের ইতিহাসে যে পাশবলীলার অভিনয় হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া, যাহাতে এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে একান্ত প্রতিষ্ঠালাভ না করে, কেশবচন্দ্র সর্ব্বদাই প্রাণপণে তার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইতে না হইতেই য়ুরোপীয় মনীষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসীবিপ্লব যে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, তাহাতে সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জাগাইয়া তুলে, কিন্তু এ সকলের চিরন্তন বিরোধ নিষ্পত্তির কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ফরাসীবিপ্লব স্বাধীনতার নামে একটা ঐকান্তিক অনধীনতার ভাবকে জাগাইয়া জনসমাজকে বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্নই করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজের ও সেই সমাজান্তর্গত অপরাপর ব্যক্তির যে নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া সমাজের ঘননিবিষ্টতা সাধনের কোনও পন্থার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। আধুনিক যুগে প্রাচীনকে ভাঙ্গাই ফরাসীবিপ্লবের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল, এই বিপ্লব সেই কর্ম্মই সাধন করিয়া যায়; কিন্তু নবযুগের নব আদর্শের উপযোগী করিয়া জনসমাজকে নূতন প্রেমের ও বিশ্বজনীনতার উপরে গড়িয়া তোলা তার কাজও ছিল না, সে কাজ ফরাসীবিপ্লব করিতেও পারে নাই। ফরাসী-বিপ্লবের নিকটে আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা যে অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও, এইজন্য ইতালীয় মনীষী ম্যাৎসিনী (১৮৭৫) ফরাসীবিপ্লবের অধি-

নায়কগণের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্যভাবে সংশোধন করিয়া লইয়া, বিশুদ্ধতর আস্তিক্যবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত হিউম্যানিটীর (Humanity) উপরে, আপনার স্বদেশচর্য্যা বা Nationalismকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই উন্নত আদর্শের উপরেই ম্যাজিনী মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে যুন ইতালীয় সমাজের বা Young Italy Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছুকাল পরে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল (Carlyle) Hero Worship নামক প্রবন্ধে এক নূতন মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফরাসীবিপ্লবের সাম্যবাদের মূল ভিত্তিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মসমাজকে এই বিপ্লবাত্মক যুক্তিবাদ ও সাম্যবাদের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র আগ্রহাতিশয় সহকারে কার্লাইলের মহাপুরুষবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্লাইলের মহাপুরুষবাদেও প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, তিনি ইহার সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ঈশ্বরতন্ত্রের বা Theocracyর মতকে যুক্ত করিয়া দিয়া, এক নূতন প্রেরিত-মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হ'ন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ বা Great Men সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করেন। এই খানেই, প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজের কৃতবিদ্য যুক্তিবাদী যুবকদলের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ও তাঁর অনুগত প্রচারকগণের বিরোধ আরম্ভ হয়।

শিবনাথের চরিত্র

এই বিরোধের সূত্রপাত অবধিই শিবনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষীয় দলের মুখপাত্র ও অগ্রণী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ না করিয়া, শিক্ষার্থী অবস্থাতেই, তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কৃতবিদ্য যুবকগণ যেরূপভাবে কেশবচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া আত্যন্তিক শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, শিবনাথ সেরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। ফলতঃ যৌবনাবধিই শিবনাথের মধ্যে এই আত্যন্তিক শ্রদ্ধার ভাব অত্যন্তই অল্প ছিল। শিবনাথের পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়াও, অতিশয় বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার যোগ এ জগতে অত্যন্ত বিরল। বিশেষতঃ যেখানে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে সুরসিকতাও বিদ্যমান থাকে, সেখানে শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিবার অবসর মাত্রই প্রায় পায় না। যেমন তাঁর পিতৃচরিত্রে, সেইরূপ শিবনাথের নিজের প্রকৃতিতেও একদিকে প্রখর ধীশক্তি ও অন্যদিকে উচ্ছ্বসিত রসিকতা এই দুইই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম যৌবনে তাঁর বিচারশক্তি ও বিদ্রূপ-প্রবৃত্তি যতটা ফুটিয়াছিল, শ্রদ্ধাশীলতা যে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁর সে কালের প্রবন্ধাদি ইহারই সাক্ষ্য দান করে। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিবনাথের মাতুল ছিলেন। এই সূত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোমপ্রকাশের সঙ্গে তাঁরও কতকটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

আর সে সময়ে সোমপ্রকাশে শিবনাথের যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে তাঁর এই যুক্তিপ্রবণতার ও বিদ্রূপাসক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে"—

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ,"

প্রকাশিত হইলে, সোমপ্রকাশে শিবনাথ তাঁহার অনুকরণে যে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন, তাহাতেই তাঁহার উজ্জ্বল কবি-প্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্রূপাসক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণও তাহা পড়িয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁর আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ভগবদ্-ভক্তও নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিকও নহেন, মুমুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পত্তিশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। এক সময়ে শব্দযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্ম্মচিন্তায় ও কর্ম্ম-জীবনে তিনি যা' কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবিপ্রতিভার সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙ্গলার আধুনিক সাহিত্যের ও সমাজজীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্মসমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাগ্মিতাশক্তি ও সাহিত্য-সম্পদের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনও প্রকারের অনন্যসাধারণ সাধন-সম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, কুচবিহার বিবাহোপলক্ষে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহাদের অনেকে তখনও পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে য়ুরোপীয় যুক্তি-বাদের উপরেই বিশেষভাবে আপনাদিগের নূতন ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও এই দলের সঙ্গে যোগদান করেন সত্য; কিন্তু একদিকে কেশবচন্দ্রের আপনার শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার এই কার্য্যের একান্ত অসঙ্গতি এবং অন্যদিকে এই বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অপর প্রচারকগণ কেশবচন্দ্রের পক্ষসমর্থনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহার অন্তর্নিহিত ওকালতী-বুদ্ধি-সুলভ সত্যগোপনের এবং অসত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এই দুই মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণের ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠাতে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই, তিনি কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন। আর ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান্ ও রক্ষণশীল সভ্য-দিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ বিজয়কৃষ্ণকে আচার্য্যপদে বরণ করেন, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই ইঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনের বা কর্ম্মজীবনের অধি-

নেতৃত্বলাভ করেন নাই। ফলতঃ নূতন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিজয়কৃষ্ণের ভক্তযশের সাহায্যে আপনাদিগের বিদ্রোহিদলের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যতটা উৎসুক ছিলেন তাঁহার সাধু চরিত্রের এবং অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্ম্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ততটা উৎসুক ছিলেন না। এই কারণেই বিজয়কৃষ্ণের সাধু চরিত্রের প্রভাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধমূল হইবার অবসর পায় নাই এবং তাহারই জন্য সমাজের নেতৃবর্গ কিছুদিন পরে অত্যন্ত সরাসরিভাবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের সমাজের সর্ব্বপ্রকারের যোগ ছেদন করিতে পারিয়াছিলেন। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই বিশেষ সাধনসম্পদের অধিকারী না হইয়াও কেবল আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতাগুণে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার অধিনায়কত্ব লাভ করেন।

য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়াও অনেকে ক্রমে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, আপনাদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্তে ও ধর্ম্ম-সাধনে এই যুক্তিবাদকে স্বল্প-বিস্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনিও তাহা করেন। তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলীও এই যুক্তিমার্গ বর্জ্জন করিয়া এক প্রকারের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শিবনাথ প্রথম যৌবনে যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজও পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা যুক্তিপ্রবণতা আছে, যাহাকে যতই ছাড়াইতে ইচ্ছা করুন না কেন, এ পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই যুক্তিপ্রবণতা মূলতঃ ইংরেজিতে যাহাকে Scepticism বা অতিসন্দেহবাদ বলে, তাহারই রূপান্তর মাত্র। আর শিবনাথ বাবুর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে সর্ব্বদাই যেন এই বস্তুটী লুকাইয়া থাকে। তিনি অনেক সময় আস্তিক্যবিরোধী সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, আর তখন প্রথমে যথারীতি সে সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁর এই সকল বক্তৃতায় ও উপদেশে এ সকল বিরোধী সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যতটা বিশদ ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হয়, তিনি যে ভাবে এ সকলের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান, তাহা সেরূপ বিশদ এবং সদ্‌যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া উঠে না। এই কারণে তাঁর ধর্ম্মোপদেশে যুক্তিবাদী শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণে ধর্ম্মের মূল ভিত্তিগুলিকে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেয়, সে পরিমাণে আবার কিছুতেই তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। আর এই সাংঘাতিক অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে যে কতকটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া তুলে, ইহা তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা শক্তি এবং মায়াময়ী কবিকল্পনারই ফল।

কিন্তু ইহাতে শিবনাথ বাবুর কোনই গৌরবের হানি হয় না। তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কিম্বা ভক্তিপন্থা প্রদর্শন করিবার জন্ত বিধাতা-পুরুষ তাঁহার সৃষ্টি করেন নাই; করিলে

তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি অন্য ছাঁচেই গঠিত হইত। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কতকগুলি পূর্ব্ববৃত্ত সাধন আছে। আর মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সংস্কার-চেষ্টা কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, শিবনাথ বাবুই এই সকল পূর্ব্ববৃত্ত সাধনে ব্রাহ্মসমাজের এবং কিয়ৎ-পরিমাণে দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকদলের গুরু হইয়া, তাহাদের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে, সেই শুদ্ধচিত্তেই কেবল পরমতত্ত্বের সার্থক অনুশীলন সম্ভব হয়। প্রথমে সন্দেহ, পরে বিচারযুক্তি, তার পরে, সর্ব্বশেষে, এই বিচার-যুক্তির ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে, সন্দেহের একান্ত নিরসন হইয়া, প্রকৃত শ্রদ্ধা বা আস্তিক্যবুদ্ধির সঞ্চার,—এই ভাবেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধাই, এজন্য, ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান ও মূল ভিত্তি। আর এ কালের অনেক বাঙ্গালী ও ভারতবাসী শিবনাথ বাবুর শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণায় নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, সন্দেহ, বিচার, প্রভৃতির সাহায্যে ক্রমে গভীর আস্তিক্য-বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেকে তাঁর নায়কত্বে "না"এর পথ বাহিয়া গিয়া, পরে "হাঁ"এর রাজ্যে যাইয়া পৌছিয়াছেন আর ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া বা তাহার বাহিরে যাইয়া, নিজ নিজ সাধনশক্তির দ্বারা যে দিকে ও যে পরিমাণে দেশের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বা তুলিতে-ছেন, তার জন্য এদেশের বর্ত্তমান সাধনা কিয়ৎপরিমাণে শিবনাথ বাবুর নিকটে ঋণী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

বেহার-চিত্র *

রায় সাহেব

(বেহারের মহাজন)

১২৮৭ সালে রাজপুতানার মাড়বারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গোধূম ও তণ্ডুলাভাবে লোকে "বজরা" "জোয়ারি" এবং শাক-পাত খাইয়া কোনপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছিল, কিন্তু অবশেষে ভীষণ জলকষ্টে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল।

বণিক গুরমুখ রায় পথে পথে সামান্য সামান্য জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টে তাহার দরিদ্রের সংসার

* এই পর্য্যায়ের তিনটি চিত্র ইতিপূর্ব্বে "রাজ প্রসাদ", "আমেলার" ও "হুজুর" নামে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অচল হইয়া উঠিল। গুরমুখের স্ত্রী এবং বৃদ্ধা জননী সপ্তাহকাল ভীষণ অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট সহ্য করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। গুরমুখ দেখিল, দেশে থাকিলে আর প্রাণরক্ষা হয় না। তখন সে বন্ধুবান্ধবের নিকট ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া, দুইখানি বস্ত্র, একটা লোটা, এক কম্বল এবং এক "থারিয়া" লইয়া স্বদেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল। দুই মাস ভিক্ষা করিয়া, পদব্রজে চলিয়া, অবশেষে গুরমুখ একদিন সন্ধ্যাকালে, ছিন্নবস্ত্রে, নগ্নপদে, অস্থিসার দেহে পাটনায় আসিয়া পৌঁছিল।

গুরমুখের এক দূরসম্পর্কীয় কুটুম্ব ব্যবসায় উপলক্ষে বহুদিন হইতে পাটনায় বাস করিতেছিলেন। গুরমুখ সন্ধান করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিল।

গুরমুখের কুটুম্ব তনসুখ রায় একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন। গুরমুখের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি তাহাকে আশ্রয়দান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তনসুখের মহাজনীর সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের ব্যবসায় ছিল। প্রথম প্রথম তনসুখ গুরমুখকে বস্ত্রবিভাগেই নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল যে, গুরমুখ বস্ত্র লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়াইবে, এবং তাহা হইতে যে লাভ হইবে, তাহার চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক পাইবে। গুরমুখ সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। গুরমুখের মুখ বড় মিষ্ট ছিল। তাহারই গুণে অল্পদিনের মধ্যেই সে সরল পল্লীবাসিগণের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া লইল। মধ্যাহ্নে গুরুভার বস্ত্রের মোট পৃষ্ঠে বহিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর গুরমুখ গ্রামের অশ্বত্থতলে দেখা দিলেই, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। গুরমুখ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যতদিন না সে একহাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবে, ততদিন সে নিজের জন্য প্রত্যহ কোনমতেই চারি পয়সার অধিক ব্যয় করিবে না।

সুতরাং প্রথম হইতেই স্বল্প লভ্যাংশ হইতেও গুরমুখের কিছু কিছু সঞ্চয় হইতে লাগিল। সে টাকা সে তনসুখের দোকানেই জমা রাখিয়া সুদে খাটাইতে লাগিল।

এইরূপে ধীরে ধীরে গুরমুখের ভাগ্যপথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

গুরমুখের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তনসুখ কিছুকাল পরেই গুরমুখকে দোকানের কাজে নিযুক্ত করিলেন। গুরমুখের পরিশ্রমে ও দক্ষতায় দিন দিন তনসুখের দোকানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তনসুখ পরম প্রীত হইয়া দোকানের সমস্ত আয় ব্যয় ও হিসাবের ভার গুরমুখের উপর সমর্পণ করিলেন। গুরমুখ অবহিতচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিল।

এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পরে সহসা একদিন বিসূচিকা রোগে তনসুখের মৃত্যু হইল। তনসুখের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা দোকানের ভার লইতে আসিল। হিসাব নিকাশ গৃহীত হইল। গুরমুখ সমস্ত খাতাপত্র তাহাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল।

হিসাবে দেখা গেল তনসুখের দোকানে গুরমুখের ২৫,০০০ টাকা জমা আছে! দেখিয়া পুত্রেরা কিছু বিস্মিত হইল আট

টাকা বেতন এবং এক পাই মাত্র লভ্যাংশের অধিকারী গুরমুখ পাঁচ বৎসরের মধ্যে কিরূপে এত টাকা জমাইল, তাহা তাহারা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু খাতাপত্র সমস্তই গুরমুখের হাতে, কিছুই বলিবার উপায় ছিল না।

পুত্রদের অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া গুরমুখ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। বলিল, "আমি এত দিন 'জান' দিয়া দোকানের উন্নতি করিয়াছি। এক্ষণে যদি আপনাদের আমার প্রতি সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আর এস্থানে না থাকাই ভাল। আমার টাকা আমায় দিয়া দিন্, আমি অন্যত্র চলিয়া যাই।"

তনসুখের পুত্রগণের দোকানের কার্য্যে তাদৃশ অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং তাহারা কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আরও দিনকতক গুরমুখকে দোকানে থাকিতে বলিল।

কিন্তু "ইমানদার" গুরমুখ তাহার "ইমানে" আঘাত লাগায় নিতান্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। সে কিছুতেই আর থাকিতে স্বীকৃত হইল না। সপ্তাহের মধ্যে সে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়া ৺তনসুখ রায়ের দোকানের পার্শ্বেই নিজের পৃথক্ এক দোকান খুলিল।

২

তনসুখের পুত্রগণের অনভিজ্ঞতার সুযোগ পাইয়া চতুর গুরমুখ অল্পদিনের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে তনসুখের সমস্ত গ্রাহক "ভাঙ্গাইয়া" লইল। দিন দিন যে অনুপাতে তনসুখের দোকানের অবনতি হইতে লাগিল, ঠিক সেই অনুপাতে তাহার দোকানের উন্নতি হইতে লাগিল। প্রথমটা গুরমুখ তনসুখের অনুকরণে কেবল কাপড়ের দোকানই খুলিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে দেখিল যে, সহরে বস্ত্রবিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা অসম্ভব। পল্লীগ্রামে নির্ব্বোধ পল্লীবাসীকে ঠকাইয়া সময়ে সময়ে টাকায় টাকা লাভ করাও নিতান্ত কঠিন নহে, কিন্তু সহরে টাকায় চারি আনা লাভ করাও অসম্ভব। কারণ সহরে দোকান অনেক এবং "গাহ্‌কি"রা পাঁচ দোকান না দেখিয়া "সওদা" করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং গুরমুখ কেবল বস্ত্রব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। সে বস্ত্র-বিভাগের সঙ্গে মহাজনী বিভাগ খুলিল। এ বিভাগেও তাহার যথেষ্ট গ্রাহক জুটিতে লাগিল।

গুরমুখের সুদ অতি অল্প। শতকরা মাসিক দুই টাকা মাত্র। তাহার উপর। তাহার কথা অতি মিষ্ট। কোন সময়েই তাহার মুখে বিরক্তি নাই, কার্য্যে আলস্য নাই লেখক উপস্থিত নাই বলিয়া "হাতচিঠা" লেখা হইল না, তাহাতেও গুরমুখের আপত্তি নাই। সরল গুরমুখ কেবল সাদা কাগজে "অঙ্গুষ্ঠের ছাপ" লইয়াই টাকা দিতে প্রস্তুত। কেহ সন্ধ্যার সময়ে টাকা পরিশোধ করিতে আসিলে "হাতচিঠা" খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিলম্ব না করিয়া, গুরমুখ হিসাব না দেখিয়া, কেবল গ্রাহকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই, খাতায় "বেবাক্ ওসুল" লিখিয়া টাকা লইতে সম্মত! এরূপ উদার মহাজনের গ্রাহক না জুটিবে কেন?

দেখিতে দেখিতে গুরমুখের দোকানের

খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এক বৎসরের মধ্যেই তনসুখ রায়ের পুত্রগণকে দোকানে "লালবাতি জ্বালিতে" হইল।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে গুরমুখ "রেভিনিউ সেলে" বিষয় খরিদ করিতে লাগিল। খিড়কিতে সে'করার দোকান বসাইল (কু-লোকে বলিত, রাত্রে চোরেদের নিকট হইতে চোরাই মাল লইয়া গালাইয়া ফেলিবার জন্য এ দোকানের প্রতিষ্ঠা!)। সুবিধা মত কিছু কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ আবাদ করিতে লাগিল। বিলাতী চিনি খরিদ করিয়া তাহাতে গুড় ও ধূলি মিশাইয়া দেশী চিনি প্রস্তুত করিবার এবং 'দেহাত" হইতে বিশুদ্ধ ঘৃত কিনিয়া তাহার সঙ্গে চর্ব্বি মিশাইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার কারখানা খুলিল।—বাণিজ্যলক্ষ্মী শতমুখে গুরমুখের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

দশ বৎসরের মধ্যে গুরমুখ দুই লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহার যশোরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুপ্রতিষ্ঠিত গুরমুখ দেখিল যে, এক্ষণে লাভের মাত্রা আরও কিছু বাড়াইয়া দিলেও কোন অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

পরদিন প্রত্যুষে বিদেশ হইতে একজন গ্রাহক গুরমুখের নিকট ১০,০০০ টাকা কর্জ্জ লইতে আসিল। লেখাপড়া শেষ হইলে গুরমুখ টাকা বাহির করিয়া আনিয়া স্তরে স্তরে গ্রাহকের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। গ্রাহক সমস্ত টাকা পুনরায় ভাল করিয়া গণিয়া লইল।

সমস্ত কার্য্য শেষ হইল, গ্রাহকের মনে হইল, যখন সদরে গঙ্গাতীরে আসিয়াছে, তখন একবার গঙ্গাস্নানটা করিয়া যাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এত টাকা লইয়া গঙ্গাস্নান নিরাপদ নহে। সুতরাং সে গুরমুখকে বলিল, "টাকা এক্ষণে আপনার নিকটেই থাকুক, আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া টাকা লইয়া যাইব।" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গুরমুখ বলিল, "আমি যখন একবার টাকা বাহির করিয়া সমস্ত গণিয়া গাঁথিয়া দিয়াছি, তখন আর ও টাকা স্পর্শ করিব না আবার কে বসিয়া বসিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া টাকা গণিবে? তবে যদি তোমার নিতান্তই টাকা রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐখানে লোহার সিন্ধুক আছে, এই চাবি লও, লইয়া, তোমার টাকা সিন্ধুকে রাখিয়া চাবি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। তাহা হইলে, আমার সঙ্গে টাকার আর কোন সংস্রব থাকিবে না।"

গ্রাহক সম্মত হইল। গুরমুখ দোকানে উপস্থিত দশজনকে দেখাইয়া গ্রাহকের হস্তে চাবি দিল। গ্রাহক চাবি লইয়া সিন্ধুকের মধ্যে টাকা রাখিয়া, সকলের সাক্ষাতে চাবি লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া সিন্ধুক খুলিয়া সে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। সিন্ধুকে এক কপর্দ্দকও নাই!

গুরমুখ তখন গভীর মনঃসংযোগ সহকারে খাতা লিখিতেছিল। গ্রাহক গুরমুখের নিকট আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আপনি কি টাকা সরাইয়াছেন?"

গুরুমুখ আকাশ হইতে পড়িল। সে সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি নিজের হাতে টাকা রাখিয়া চাবি দিয়া চাবি লইয়া গেলে।

এখনো চাবি তোমার হাতে। আমি টাকা সরাইব কিরূপে?" উপস্থিত দশজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা ত সব দেখিয়াছেন, এখন দেখুন একবার ব্যাপার!"

তাহারা সকলে একবাক্যে বলিল— "বাস্তবিক আমরা ত বরাবর এইখানেই বসিয়া আছি; তুমি এ কি কথা বলিতেছ? রায়জি তোমাকেই চাবি দিলেন। তুমি নিজে টাকা রাখিয়া চাবি লইয়া গেলে। এ সকল ত ভাল কথা নয়!" গুরমুখ আবেগভরে বলিল, "দেখুন, ভাগ্যে আপনাদের সাক্ষী রাখিয়াছিলাম। নহিলে আজ আমার কি 'বদনামি'ই হইত! গুরমুখ রায় সে প্রকৃতির লোক নয়। সে কাহারও নিকট 'এক কৌড়ি' 'বে-ইমানি' করিয়া লইয়াছে এমন কথা কেহ কখনো বলিতে পারিবে না। তোমার ত দশ হাজার "রোপেয়া" দশ লাখ 'রোপেয়ার' জন্যও গুরমুখ রায় কখনো 'ইমান' খোয়াইবে না!" সকলেই এ কথার সমর্থন করিল। হতভাগ্য গ্রাহক অবসন্ন দেহে মাটির উপর বসিয়া পড়িল— বেচারা চারিদিক শূন্য দেখিতেছিল! বহুক্ষণ হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া অভাগা কপালে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল। অন্তর্নিহিত আনন্দের ক্ষীণরশ্মিরেখা যেন ক্ষণেকের জন্য গুরমুখের লোভব্যঞ্জক ক্ষুদ্রচক্ষে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল!

৩

সফলকাম গুরমুখের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে অর্থাগমের নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। যাহারা সাদা কাগজে 'আঙ্গুঠার ছাপ' মাত্র দিয়া গুরমুখের সরলতার প্রশংসা করিতে করিতে টাকা লইয়া গিয়াছিল, তাহারা সভয়ে দেখিল যে, তাহাদের নামে গৃহীত টাকার দশগুণ টাকার জন্য নালিশ 'দায়ের' হইয়াছে! যাহারা টাকা দিতে আসিয়া হাতচিঠা ফেরত না লইয়া খাতায় 'উসুলি' লিখাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সবিস্ময়ে জানিল যে, তাহাদের উপর পুনরায় পুরাতন হাতচিঠার উপর নালিশ রুজু হইয়াছে! এবং খাতায় 'ওসুলির' নামগন্ধও নাই! বুদ্ধিমান গুরমুখ সর্ব্বদা তিন 'সেট' খাতা রাখিতেন—এক সেট নিজের জন্য, এক সেট গ্রাহকদের জন্য এবং এক সেট ইন্‌কমট্যাক্সের এসেসারের জন্য! মূঢ় গ্রাহকদিগের এ রহস্য বুঝিবার উপায় ছিল না।

এতদ্ভিন্ন যে সকল হতভাগ্য গ্রাহক কোন কারণে গুরমুখের দোকান ছাড়িয়া অন্যত্র 'কারবার' করিতে গিয়াছিল, তাহারা এক দিন সবিস্ময়ে জানিল যে, তাহাদের জমিজমা সমস্তই আদালতের সাহায্যে গুরমুখের হইয়া গিয়াছে। নালিশ, ডিক্রী, নিলাম, 'দখল দেহানি" সমস্তই গোপনে সম্পাদিত হইয়াছে! জানিয়া ব্যাকুল হইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়া আদালতে আপত্তি জানাইল— কিন্তু তাহারা 'সমন' হইতে 'দখল দেহানি' পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারে নাই—আদালত এ কথা বিশ্বাস করিলেন না।

দেখিতে দেখিতে গুরমুখের ধনভাণ্ডার জলোচ্ছ্বাসের মত স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু লোভের সীমা নাই। একদিন একজন পশ্চিম দেশীয় লালা সাহেব গোপনে

গুরমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। লালা সাহেবের জাল করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাহার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লোভে তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় সর্পচক্ষুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল !

সেই দিন হইতে সুবুদ্ধি গুরমুখ রায় আর এক নূতন কারবার আরম্ভ করিলেন। অনেক বিলাসী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত জমিদার ও জমিদার-পুত্র গুরমুখের নিকট টাকা লইতেন। এ কারবারে লাভ যথেষ্ট ছিল। সাধারণতঃ বিশেষ প্রয়োজনের সময়েই মোসাহেবেরা আসিয়া টাকা লইয়া যাইত। এক হাজার টাকার হাতচিঠা লইয়া আসিলে ৭৫০ টাকা দিলেই চলিত এবং সুদ শতকরা ৭৫ টাকা চাহিলেও আপত্তি হইত না। গুরমুখ সর্ব্ব প্রথমে এই সকল মূঢ়মতি কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবু সাহেবদের উপরেই লালা সাহেবের লিপিনৈপুণ্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

পরীক্ষা আশাতীত সফলতা লাভ করিল। অনায়াসে জাল হাতচিঠার উপর ডিক্রী হইয়া গেল। পুলকিত গুরমুখ দেখিলেন যে, ইতি-পূর্ব্বে তিনি অর্থোপার্জ্জনের যতগুলি পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোনটী ইহার মত লাভজনক নহে। কিন্তু অবশেষে একটা হাতচিঠা লইয়া গুরমুখকে কিছু বিপদে পড়িতে হইল।

গুরমুখ একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের নামে এক লক্ষ টাকার এক জাল হাতচিঠা প্রস্তুত করাইলেন। যথাকালে নালিশ 'দায়ের' হইল। কিন্তু এবার নির্ব্বিবাদে মোকদ্দমার ডিক্রী হইল না। রাজা হাত-চিঠা জাল বলিয়া জবাব দিলেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

গুরমুখও চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। অর্থব্যয় করিয়া যথেষ্ট সাক্ষী সংগ্রহ করিলেন। দুই চারিজন সত্যনিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত সাক্ষি-শ্রেণীভুক্ত হইল। কিন্তু তাহাতেও সুফল ফলিল না। দক্ষ ব্যবহারাজীবের শাণিত 'জেরায়' স্তূপাকার মিথ্যাসাক্ষ্য অচিরে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বিচারক হাতচিঠা জাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

বিবাদী বাদীর উপর জালের অভিযোগ আনিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—গুরমুখ প্রমাদ গণিল !

অচিরে হাইকোর্টে আপীল দায়ের হইল ; কিন্তু তাঁহার উকীলেরা বলিলেন যে, আপীল জিতিবার সম্ভাবনা অল্প। নিরুপায় গুরুমুখ অবশেষে রাজা সাহেবের হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ২৫,০০০৲ টাকা দিয়া এ যাত্রা কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইলেন। আপীল 'একতরফা' ডিক্রী হইয়া গেল

কিন্তু আপীল জিতিয়াও গুরমুখ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা আর ফিরিয়া পাইলেন না। এই মোকদ্দমা লইয়া সহরে গুরুতর হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ভয়ে গ্রাহকেরা গুরমুখের সঙ্গে কারবার বন্ধ করিয়া দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গুরমুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দিলেন। পুলিশ সাহেব গোপনে তাঁহার সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইতে লাগিলেন।

৪

মহাজনি আর চলে না দেখিয়া, গুরমুখ জমিদারি ক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু

জমিদারি খরিদ করিয়া আরও বিপদ ঘটিল।

জমিদারি থাকিলে মধ্যে মধ্যে দুই একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়েই গুরমুখের প্রতি বিরূপ থাকায়, মোকদ্দমায় গুরমুখের পক্ষ পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইতে লাগিল। প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুরমুখ বুঝিলেন, কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। কিছুদিন চিন্তা করিয়া গুরমুখ ক্রমে ক্রমে সাহেবদের বাসোপযোগী অনেকগুলি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন এবং উৎকৃষ্ট গাড়ী ঘোড়া আনাইলেন। গুরমুখের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং বাটীর তুলনায় ভাড়া নাম মাত্র দেখিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের অধিকাংশই দয়া করিয়া একে একে গুরমুখের বাটীতে উঠিয়া গেলেন। গাড়ী ঘোড়া তাঁহাদেরই সেবায় নিয়োজিত হইল। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিমুখ চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে গুরমুখের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

কিন্তু বুদ্ধিমান্ গুরমুখ ইহাতেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

একজন শ্বেতাঙ্গ যুবাপুরুষ বহুদিন হইতে কর্ম্মহীন অবস্থায় সহরে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্থানীয় শ্বেতাঙ্গসমাজ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার বিশেষ কোন উপকার করিতে পারেন নাই। মাসিক দুইশত টাকা বেতন দিয়া গুরমুখ এই শ্বেতাঙ্গ-রত্নকে নামে জমিদারির ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই সকল অপব্যয়ে চিরসঞ্চয়শীল গুরমুখের প্রাণান্তকর কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু উপায় ছিল না।

ম্যানেজার কেরি সাহেব সুশ্রী যুবাপুরুষ। সুতরাং দরিদ্র হইলেও, শ্বেতাঙ্গ-মহিলা-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ফিরিঙ্গি সব্‌ডেপুটি সাহেবের গৃহিনী হইতে জজসাহেব ও কালেক্টর সাহেবের মহিষী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সুতরাং রাজনীতিজ্ঞ গুরমুখ কেরি সাহেবের সাহায্যে প্রথমে শ্বেতাঙ্গ-মহিলা-সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গুরমুখের বদান্যতায় এবং কেরি সাহেবের আন্তরিক যত্নে সাহেবদের "ক্লাব ঘরে" সপ্তাহে সপ্তাহে মহিলাবৃন্দের ভোজন ও নৃত্যোৎসব চলিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া, গুরমুখ কেরি সাহেবের সাহায্যে মহিলা-সমাজে কিছু কিছু উপহারও বিতরণ করিলেন। জজ, কালেক্টর ও পুলিশ সাহেবের মহিষী মূল্যবান্ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন। গুরমুখের অদৃষ্টগগন হইতে দুর্ভাগ্যের ঘনমেঘ অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল।

কালেক্টর একদিন গুরমুখকে বাটীতে ডাকাইয়া তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া কহিলেন, "সহরে বৎসর বৎসর যেরূপ কলেরা হইতেছে, তাহাতে সহরে জলের কলের আবশ্যকতা আর অস্বীকার করা যায় না। আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেই অতি সহজেই সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

শুনিয়া গুরমুখের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে জলের কলের জন্য ১০,০০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়া, গুরমুখ

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের করস্পর্শসুখ ভোগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই দিন হইতে বাবু গুরমুখ রায়ের প্রতি কালেক্টর সাহেবের শ্রদ্ধা সহসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

হাঁসপাতালের উন্নতি, কালেজের প্রতিষ্ঠা, টাউনহল নির্ম্মাণ, বস্তি সংস্কার প্রভৃতি প্রত্যেক সৎকার্য্যেই তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিতে লাগিলেন।

চাঁদার টাকা বাহির করিবার সময় সদাশয় গুরমুখ নিজের বিদীর্য্যমাণ হৃদয়কে কেবল এই বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে, একবার কালেক্টর সাহেবের কৃপালাভ করিতে পারিলে, সমস্ত টাকা প্রজাদের নিকট হইতে মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

৫

পাঁচবৎসরের অবিরাম সৎকার্য্য ও বদান্যতায় গুরমুখ রায়ের কলঙ্ককালিমা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল। কালেক্টর সাহেব বাবু গুরমুখ রায়কে রায় বাহাদুর উপাধি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠাইলেন।

নিশ্চিন্ত হইয়া গুরমুখ বহুদিনের উপবাসী শার্দ্দূলের মত প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইলেন। একবৎসরের মধ্যে কেবল 'নজর' ও 'সেলামি'তেই প্রজাদের নিকট হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইল। খাজনা শতকরা ৫০৲ টাকা হারে বাড়িয়া গেল। বিপন্ন প্রজাবৃন্দ কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিল। এবার কালেক্টর তাহাদের অভিযোগ 'ছেড়াচিঠির ঝুড়িতে' নিক্ষেপ করিলেন। বহুকালের পর ক্ষতিগ্রস্ত গুরমুখ পুনরায় চঞ্চলা কমলার কৃপালাভ করিয়া সুস্থ হইলেন।

কালেক্টর সাহেবের চেষ্টা সফল হইল। নববর্ষে বাবু গুরমুখ রায় 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। কমিশনার সাহেব রায় সাহেবকে "খেলাত" দিবার সময়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রায় সাহেবের দেশপ্রসিদ্ধ সাধুতা, বদান্যতা, লোকহিতৈষণা, প্রজাপ্রীতি এবং রাজভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আজ গভর্ণমেণ্ট নিতান্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে এইরূপে সম্মানিত করিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলেন। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস রায়সাহেব নিজের অবলম্বিত সুপথে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাকে সত্বরে উচ্চতর উপাধিলাভের উপযোগী করিয়া গভর্ণমেণ্টের সন্তোষ বিধান করিবেন।"

বলা বাহুল্য, রায়সাহেব কমিশনার সাহেবের বহুমূল্য উপদেশ একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত "অর্থনীতি" অনুসারে "অপত্যনির্ব্বিশেষে" প্রজাপালন ও "রাজ্যশাসন" করিতে লাগিলেন। নিরুপায় প্রজাবৃন্দ, "রায়সাহেব" তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রজাপ্রীতির গুণে কবে "রাজাসাহেবে" রূপান্তরিত হইয়া যান, সাশ্রুনেত্রে কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীজগন্নাথ

হিন্দুর ধর্ম্ম বস্তুটী যে কি, ইহা বুঝিতে হইলে, একবার কিছুদিন যাইয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস করা আবশ্যক। এখানে এই ধর্ম্মের এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা আর কোনও হিন্দুতীর্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দুভূমির আর সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের জাতি-বর্ণের অশেষ বৈষম্য ও আচার-বিচারের কঠিন বাঁধাবাঁধিই দেখিতে পাই। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে আসিয়াই এক অদ্ভুত সাম্য ও আশ্চর্য্য মুক্তভাব দেখিয়া থাকি।

হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি প্রতিষ্ঠা করিয়া, মনে হয় যেন, হিন্দুর সনাতন সাধনা এই পুরীধামে আপনার চিরন্তন লক্ষ্য যে একান্ত অভেদ-সাধন, তাহারই একটা চাক্ষুষ ছবি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

সচরাচর হিন্দুর বদ্ধভাবটাই আমাদের চক্ষে পড়ে। হিন্দুর আচার-বিচারের বাঁধা-বাঁধি দেখিয়া মনে হয় যেন, তার মত এমন বদ্ধজীব জগতে আর নাই। মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে আর কোনও ধর্ম্মে এমন কঠিন করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখে নাই। কোন্ দিন্ কি খাইবে কি না খাইবে, কার সঙ্গে সে যে বসিবে দাঁড়াইবে,—এ সকল অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও হিন্দুর কোনও স্বাধীনতা নাই। কিন্তু এ সকল বন্ধন যে হিন্দুর ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু অবান্তর উপায় মাত্র, এ সত্যটা প্রচার করিবার জন্যই যেন শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

স্বল্পবিস্তর বিধিনিষেধের বন্ধন জগতের সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে এক দিকে যেমন এই সকল বিধিনিষেধের একটা আত্যন্তিক আতিশয্য দেখিতে পাই, অন্য দিকে সেইরূপ এ সকল কিছুই যে ধর্ম্ম-জীবনের স্থায়ী বিধান নহে, ইহাও দেখিয়া থাকি। একদিকে, ধর্ম্মজীবনের নিম্নতর অধিকারে, এ সকল বিধিনিষেধের অত্যন্ত প্রভাব, অন্যদিকে, উচ্চতর অবস্থায়, আবার সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের একান্ত অভাবও দেখিতে পাই। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব।

কখনও কোনও খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান সাধক তাঁহাদের ধর্ম্মের বিধিনিষেধ সকল অতিক্রম করিতে পারেন না। এক জন খৃষ্টীয়ানের বা মুসলমানের পক্ষে যাহা অবৈধ, সকলেরই পক্ষে তাহা অবৈধ। এক অবস্থায় যাহা প্রতিপাল্য বা বর্জ্জনীয়, সকল অবস্থাতেই তাহা প্রতিপাল্য বা বর্জ্জনীয়। প্রবর্ত্তাবস্থায় যাহা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, সিদ্ধা-বস্থাতেও তার ব্যতিক্রম সম্ভবে না।

হিন্দুর ধর্ম্মে এমন অদ্ভুত সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, হিন্দুর ধর্ম্ম যে জাতীয়, খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান্ ধর্ম্ম সে জাতীয় নহে। খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম বৈধী ধর্ম্ম; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ গুলিকে Legalistic Religion বলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম এরূপ বৈধী ধর্ম্ম নহে। ইহার প্রধান প্রমাণ এই যে, মুক্তি বলিতে হিন্দু যে বস্তুকে বুঝেন, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান ঠিক সে বস্তুকে বুঝেন না।

পাপ, আর পাপের অপরিহার্য্য পরিণাম যে নরকভোগ, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করাকেই খৃষ্টীয়ানেরা এবং মুসলমানেরা সচরাচর মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। হিন্দুর মুক্তির আদর্শ ইহা অপেক্ষা একটু উদার। পাপ ও পুণ্য উভয়ের অতীত অবস্থাকেই হিন্দু মুক্তি কহেন। মুক্তাবস্থায় হিন্দুর যে কেবল পাপই থাকে না, তাহা নহে, পুণ্যও থাকে না। ছায়াতপের ন্যায় পাপ-পুণ্য যুগ্মবস্তু; একের সঙ্গে অপরে অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ; একের উপস্থিতিতে স্ফুটাকারেই হউক বা বীজাকারেই হউক, অপরের উপস্থিতি অনিবার্য্য। পাপ থাকিলেই পুণ্যও থাকিবে; পুণ্য থাকিলেই পাপও থাকিবে। সুখ ও দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্ম, মান ও অপমান, স্তুতি ও নিন্দা, এ সকল যেমন নিত্যযুক্ত হইয়া আছে, পাপ এবং পুণ্যও সেইরূপ। এ সকলকে হিন্দুর শাস্ত্রে দ্বন্দ্ব কহে। আর মুক্তির অবস্থা এ সকল দ্বন্দ্বের অতীত অবস্থা। দ্বন্দ্বাতীত জীবই হিন্দুর চক্ষে একমাত্র মুক্ত জীব। আর যিনি এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁর পক্ষে কোনও বিধিও নাই নিষেধও নাই। তাঁর জাতি-বর্ণের, আচার-বিচারের, ব্রত-নিয়মের, যাগযজ্ঞের, কোনও কিছুরই অপেক্ষা আর নাই। তিনি এ সকলের অতীত, তিনি স্বাধীন, স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই যে স্বাধীনতা—এই যে স্বারাজ্যলাভ, ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মের ও হিন্দুর সাধনার চরম লক্ষ্য। গার্হস্থ্যজীবনের, সমাজ-জীবনের, ধর্ম্মের ক্রিয়া কর্ম্মের অশেষবিধ বিধিনিষেধ ও ভেদবিচার এই চরম লক্ষ্য লাভেরই সাধন ও সোপান-রূপে হিন্দু সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। এ গুলি সাময়িক বিধান, নিত্যকালের নিয়ম নহে। আর এ সকল বিধিনিষেধ যে অবান্তর, আকস্মিক, সাময়িক উপায় মাত্র, ধর্ম্মের সনাতন উদ্দেশ্য ও আদর্শ নয়, ইহা দেখাইবার জন্যই যেন এই পুরীতীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

এই তীর্থের দেবতাকে হিন্দু জগন্নাথ বলিয়া ডাকেন। তাঁর এই নামকরণ যে একটা অর্থহীন আকস্মিক ব্যাপার এমনও মনে হয় না। শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে তাঁর শ্রীক্ষেত্রের রীতিনীতির ও আচার-বিচারের একটা নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরীর দেবতা যেমন জগন্নাথ, কাশীর দেবতা সেইরূপ বিশ্বেশ্বর; বৃন্দাবনের দেবতা সেইরূপ শ্রীগোবিন্দজ। যিনি গোবিন্দ, তিনিই বিশ্বেশ্বর; তিনিই আবার জগন্নাথ,—ইহা সত্য। হিন্দু আপনার ইষ্টদেবতাকে বহু নামে ডাকেন বলিয়া, তিনি যে এক ন'ন, কিন্তু বহু, এমন অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করে না। অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু এ সকল অসংখ্য নামের অন্তরালে যে একই অখণ্ড অদ্বৈত বস্তু বিরাজ করিতেছেন, ইহা জানিয়াছিল। আপনার সাধনার অতি শৈশবেই তিনি এটী ধরিয়াছিলেন—

"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"

এক সত্যকেই পণ্ডিতেরা বহু নামে ডাকিয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই গরুৎ। যিনি তিনিই শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বিশ্বেশ্বর, এ বিষয়ে হিন্দুর কখনওই কোনও দ্বিধা ছিল না ও নাই। কিন্তু স্বরূপতঃ

ইঁহারা সকলেই এক হইলেও, রূপতঃ ইঁহারা বিভিন্ন। সত্তার সমতা থাকিলেও, প্রকাশের বৈষম্য আছে। একই পরমতত্ত্বের যে দিক্‌টা বিশ্বেশ্বর প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগোবিন্দ ঠিক সে দিকটা প্রকাশ করেন নাই। আবার জগন্নাথ যে দিকটা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বেশ্বর বা গোবিন্দ ইঁহাদের কেহই তাহা প্রকাশ করেন নাই ও করেন না। বিশ্বেশ্বরে ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবের ঐকান্তিক প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর, কর্ত্তা, নিয়ন্তা, যাঁর মহত্ত্বে আমাদিগকে একান্ত অভিভূত করিয়া, ভয়বিহ্বল চিত্তে আমাদিগকে তাঁহা হইতে দুরাৎ সুদূরে লইয়া যায়, তিনিই বিশ্বেশ্বর।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাঽসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥”

বিশ্বেশ্বরকে এই ভাবেই আমরা বন্দনা করিয়া থাকি। আর বিশ্বেশ্বরে যেমন এই বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সেইরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীগোবিন্দে অসাধারণ মাধুর্য্যের প্রকাশ। গোপীভাবে যাঁরা সাধন ভজন করিতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে “নাথ” বলিয়া সম্বোধন করা সাজে না। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে কেবল রাধানাথই, পরোক্ষভাবেই তাঁহাকে লোকনাথ বলিতে পারি, কিন্তু শ্রীজগন্নাথে এ ছু'য়ের কোনও ভাবই প্রকাশিত হয় নাই। জগন্নাথে বিশ্বেশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাব নাই; অথচ শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজভাবের অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য, তাহাও নাই। এখানে একটা মাঝামাঝি—একটা মিত্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বেশ্বর বিশ্বের ঈশ্বর—অগণ্য কোটী লোকের প্রভু ও নিয়ন্তা। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে তাঁর অধীন জনগণের সম্বন্ধটা সকল সময়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ ও নিতান্ত ব্যক্তিগত নাও হইতে পারে। ভগবান্‌কে প্রভুরূপে দেখিলেই যে দাসাভিমান জন্মে ও দাস্যরসের সঞ্চার হয়, এমনও নহে। এ সংসারে এমন অনেক প্রভু ত দেখিতে পাই, যাঁহাদের অগণ্য দাসদাসী আছে, কিন্তু ইহাদের কাহারো সঙ্গেই হয় ত তাঁর কোনও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই। আর এই যে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ইহাই দাস্যরসের আশ্রয়। বিশ্বেশ্বরের প্রভুত্বও এই জাতীয়। কিন্তু “নাথ” যাহাকে বলি, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তিনি আমার আপনার জন, আমিও তাঁর আপনার জন। তিনি আমার সাক্ষাৎ আশ্রয় ও অবলম্বন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সাধারণ নহে, কিন্তু বিশেষ। আর 'জগন্নাথে' এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষত্বই বুঝাইয়া থাকে। প্রভুর পরিচারকদিগের মধ্যে, কেহ বা তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য, কেহ বা তাঁহার দূরস্থ ভৃত্য, এমন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। রাজ্যের সকল প্রজার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ সমান ঘনিষ্ঠ হয় না। ভৃত্য ও পরিচারক-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকিতে পারে ও সর্ব্বদাই দেখিতেও পাওয়া যায়। রাজার রাজ্যেও প্রজাবর্গের মধ্যে এরূপ ভেদবিরোধে রাজার সম্মান বা প্রজার সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ তার কোনও ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় না।

জগন্নাথের জগতে এ সকল ভেদ-বিরোধের স্থান হয় না। তিনি সকলের নাথ, তাঁর নিকটে সকলেই সমান, সকলের সঙ্গে তাঁর একই সম্বন্ধ, সুতরাং কেহ আর কাহাকেও হীন বা হেয় ভাবিতে পারে না। খৃষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া, মানবসমাজে যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু ভগবানকে শ্রীজগন্নাথ বলিয়া, এই পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে তদপেক্ষা গভীরতর, উন্নততর, উদারতর, বিশালতর, সাম্য সাধনের আয়োজন করিয়াছেন।

এইজন্যই শ্রীক্ষেত্রে জাতি-বর্ণের কোনও বিচার নাই। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। আর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া একে অন্যের হাত ও মুখ হইতে লইয়া অবাধে গ্রহণ করিতে পারে।

জগন্নাথের ভোগের প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন যেখানে বিক্রী হয়, সে স্থানকে "আনন্দবাজার" কহে। এই "আনন্দ-বাজারে" ব্রাহ্মণেরা সকল প্রকারের কুণ্ঠা পরিহার করিয়া, সমাজে যাহাদিগকে নীচ, অন্ত্যজজাতি বলেন, তাহাদের হাত হইতেই এ সকল অন্নব্যঞ্জন কিনিয়া আহার করেন। এ বাজারে জাতিবর্ণের বিচারের গন্ধও নাই। এমন কি, এখানে উচ্ছিষ্ট-বিচার পর্য্যন্ত নাই। একজন যে হাঁড়ী হইতেই নিজের হাতে ব্যঞ্জনাদি তুলিয়া, তাহা চাকিয়া অবশিষ্ট ভাগ আবার সেই হাঁড়ীতেই ফেলিয়া যাইতেছে, অপরে, ভিন্ন ও উচ্চ বর্ণের লোক হইয়াও, আবার সেই হাঁড়ী হইতেই সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে চাকিয়া দেখিতেছেন। হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর সাধনায়, হিন্দুর চক্ষে যাহা অকথ্য অনাচার, এই "আনন্দ বাজারে", তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগণিত। এ কেবল জগন্নাথেরই মহিমা!

জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের এই বাজারকে কে কবে আনন্দবাজার বলিয়া ডাকিয়াছিল, জানি না। এ স্থানকে আনন্দ-বাজার যে কেন বলা হইয়াছে, ইহা অনুমান করা একান্ত কঠিন কথা নহে। হিন্দুসমাজে যে জাতিবর্ণের ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যে বস্তুতঃ মানুষের পরস্পরের সঙ্গে সহজ সখ্যের সম্বন্ধের আনন্দের স্বল্পবিস্তর ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে, ইহা অনুভব করিয়া, এখানে এ সকল ভেদাভেদ নাই বলিয়াই যেন, জগন্নাথের কোনও বিশ্বপ্রেমিক ভক্ত শ্রীক্ষেত্রের এই বাজারকে আনন্দবাজার নাম দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ বাজার সহজ মানুষের সহজ প্রেমের বাজার। এ প্রেমের সংস্পর্শলাভ যে করে নাই, তার এ পুণ্যতীর্থে যাইবার অধিকার আছে কি?

এইজন্য বস্তুতঃ মনে হয়, শ্রীক্ষেত্রে যাইবার অধিকারী সকলে নয়। যে ব্রাহ্মণ আভিজাত্যের অভিমান এখনও প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছেন, তাঁর শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে চণ্ডাল আপনার জাতিবর্ণগত হীনতার ভারে পীড়িত ও সেই হীনতাবোধে সর্ব্বদাই যার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়া থাকে, তারও এখানে যাইবার প্রকৃত অধিকার নাই। ভগবৎ-কৃপায়, ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে যার—

> সর্ব্বজীবে হয়, ব্রহ্মভাবোদয়,
> চিদানন্দ জেগে উঠে

সেই জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার প্রকৃত অধিকারী। সে'ই শ্রীমন্দিরের এই "আনন্দ-বাজারের" প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া থাকে। আর এইজন্যই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুসাধকেরা, জীবনের শেষ দশায়, সাধনার চরমাবস্থায়, সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বাতীত হইয়া, জীবন্মুক্তিলাভ করিয়া বা লাভ করিবার প্রকালে এই পুরীধামে আসিয়া, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে লোকচক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ইহাই শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত্ব। এখানেই এই পুণ্যতীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী, মেট্‌কাফ্ প্রেস্, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

দুর্গোৎসবের স্মৃতি

আমাদের বাড়ীতে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা হইত। ধনীর ঘরের পূজা নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর পূজা। বড় বড় সহরের সাহেব খাওয়ান, বাই নাচান, বাজি-পুড়ান, বিলাস-বৈভব-ছড়ান পূজা নয়; গ্রামের সাদা মাটা পূজা। সে পূজায় শৈশবে ও বাল্যে, এবং তার পরেও, প্রথমযৌবনে প্রতিবৎসরই যোগ দিয়া আসিয়াছি। ক্রমে সে যোগ কাটিয়া গেল। আজ আট-ত্রিশ বৎসর দুর্গার সঙ্গে ও দুর্গাপূজার সঙ্গে সকল প্রকারের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘুচিয়াছে।

এই সুদীর্ঘ অনভ্যাসেও দুর্গোৎসবের আনন্দ-স্মৃতিটুকুর এক কণাও এ প্রাণ হইতে মুছিয়া যায় নাই।

আজিও শরৎকালের প্রখর সূর্য্যকিরণে এমন একটা স্নিগ্ধতা জড়াইয়া থাকে, ষড়-ঋতুর আর কোনও ঋতুতে সূর্য্যালোকের ভিতরে কখনও যার সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাই নাই। পূজার শঙ্খ-কাঁশর এবং ঢাকঢোলের রোলে প্রাণের ভিতরে সর্ব্বদাই কি যেন একটা ভাব নাচিয়া উঠে, দুনিয়ার কোনও বাজনায় কখনও যাহা জাগিয়া উঠে নাই। দুর্গোৎসবের ক'টা দিন যে বছরের আর সকল দিনের মতন নয়, দীর্ঘজীবনসঞ্চিত যুক্তিবাদের প্রভাবেও এ ভাবটা নষ্ট করিতে পারে নাই।

আমি তো আর দুর্গার কেউ নই! দুর্গাও তো আমার আজ কেউ নন! আপদে বিপদে আর তো দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া কাঁদি না। প্রত্যূষে আর তো দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করি না। আমার গৃহে আর তো বোধনের ঘটস্থাপনা হয় না। পুরোহিত আসিয়া আর তো শান্তি-স্বস্ত্যয়নে চণ্ডীপাঠ করেন না দৈবজ্ঞ আসিয়া তো আর বছর বছর প্রতিমা রচন করেন না। তন্ত্রধারক তো আর "ঘণ্টাম্বা পরশুশ্চাপি বামতোপি নিবোধতঃ" বলিয়া পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেন না। "ছিন্দিঃ ছিন্দিঃ পট পট স্বাহা" ব'লিয়া তো আর ছাগাদি পশুর উৎসর্গ হয় না। "মা!" "মা!"-মুখরিত প্রাঙ্গণে আর তো বলির বাদ্য বাজিয়া উঠে না। সন্ধ্যায় তো আর আরতির সঙ্গীত ধ্বনিত হয় না। প্রত্যূষে তো আর

"জাগো মা! কুলকুণ্ডলিনী!
শতদল মাঝে শম্ভু সহিতে
কত আর নিদ্রা যাবে জননী!"

বলিয়া কীর্ত্তনীয়াগণ আসিয়া তো দুর্গার বন্দনা করেন না। বহু, বহু দিন এ সকল তো বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু, বহু দিন তো দুর্গাকে ছাড়িয়াছি। কিন্তু কি স্বদেশে কি বিদেশে, কি বন্ধনে কি মুক্তিতে, দুর্গাপূজার আনন্দস্মৃতিটুকু তো আমায় এক দিনের জন্যও ছাড়ে নাই। এ কি কেবল বাল্য-সংস্কারেরই ফল ?

আরো হাজার রকমের সংস্কারের ভিতরে তো জন্মিয়াছি ও বাড়িয়া উঠিয়াছি ; কিন্তু তার একটাও তো এমন করিয়া আমায় দখল করিয়া বসে নাই। জাতি-বর্ণের, আচার-বিচারের অসংখ্য সংস্কারকে তো অবলীলাক্রমে, ভাঙিয়া চূড়িয়া, ধূলিসাৎ করিয়া, উড়াইয়া দিয়াছি। কেবল এই বড় বড় ক'টা পূজা পার্ব্বণের প্রভাবটাই একেবারে এড়াইতে পারিলাম না কেন ? ইহার কি কোনও নিগূঢ় অর্থ নাই ?

দুর্গাকে যখন ছাড়িলাম, পূজা যখন বন্ধ করিলাম, তখনও পূজার কটা দিন যে বছরের আর সকল দিনের চাইতে বড়, এ ভাবটা তো কিছুতেই কাটাইতে পারিলাম না। সকল দেশটা যখন এক অপূর্ব্ব ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যায় তখন মাথা উঁচু করিয়া শুষ্ক তর্ক-যুক্তির ব্রহ্মডাঙ্গায় যে বসিয়া থাকিতে পারে, পারুক ; আমি কখনও পারি নাই। আর পারি নাই যে এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেও লজ্জিত নই।

দুর্গাপূজা ছাড়িয়াও, সর্ব্বদাই পূজার ক'টা দিন একটু বিশেষভাবে কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কখনও বা বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছি। কখনও বা ভজন-কীর্ত্তনাদি করিয়া শারদীয় উৎসব করিয়াছি। দেশশুদ্ধ লোক যখন এক অপূর্ব্ব অনুপম আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠে, তখন তাদের সঙ্গে মতামতের মিল নাই বলিয়া, এই মহোৎসবের আনন্দস্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকাটা যে একটুকুও আবশ্যক বা সুখকর, এমনটা কখনও ভাবি নাই। আর দেশের লোকের এই "ভূতপরস্তি" ছাড়াইবার জন্যও কখনও একান্ত ব্যস্ত হই নাই।

ইহার একটা কারণ হয় ত এই যে, আমি নিজে দেশপ্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জন করিলেও এ সকল পূজা-পার্ব্বণে যে কোনও পাপ হয়, এমনটা কখনও কল্পনা করি নাই। প্রতিমার পূজা হইতেই কেবল বিরত হইয়াছি, জীবনে কখনও ফেরাজি হই নাই। আমার পিতৃপিতামহ সকলে এমন অকপট ভক্তি ও আত্যন্তিক শ্রদ্ধা সহকারে, আজন্মকাল এমন কঠোর তপস্যা করিয়া, কেবল পাপই অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, এতটা বেয়াদবী ভাব এ দুর্ব্বিনীত প্রাণেও কখন স্থান পায় নাই। আমি এ সকল ছাড়িলাম, আমার ভাল লাগে নাই বলিয়া। আমার শ্রদ্ধা এ সকলে আর রহিল না বলিয়াই, অপরাধ ভাবিয়া, এ সকল পূজা-পার্ব্বণ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু যাঁদের ভাল লাগে, যাঁদের শ্রদ্ধা চটিয়া যায় নাই, যাঁরা এ সকলে আনন্দ, আরাম, শান্তি পাইয়া থাকেন, তাঁদের পক্ষেও এ সকল পাপকর্ম্ম ; এ কথা কখনও ভাবি নাই। ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর প্রচণ্ড

আলোকেও আমাকে এতটা সর্ব্বজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারে নাই।

দুর্গা-পূজা ছাড়িয়া আমি নিজে যে কোনও প্রকারের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, এমনও ভাবি না। দুর্গা আমায় যা' দিতে পারিতেন, তা' বাল্যেই দেওয়া হইয়াছে। দুর্গোৎসবে আমার যতটুকু বিকাশ ও কল্যাণ করিতে পারিত; সে টুকু শৈশবেই পাইয়াছি। দুর্গাকে যখন, ভগবৎকৃপায়, আমি ছাড়াইয়া উঠিলাম, তখন দুর্গাও আমায় ছাড়িলেন। এ ছাড়াছাড়িতে দুর্গারও অবমাননা আর আমারও কোনও অকল্যাণ হয় নাই। কিন্তু দুর্গোৎসবের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্পর্কশূন্য হইয়া আমার সন্তান-সন্ততিরা যে একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

শৈশবে যখন দুর্গাপূজায় যোগদান করিতাম, তখন দুর্গা যে কে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতাম, এমন কথা বলি না। আজও দুর্গা যে কে, ইহা বুঝিয়াছি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। দুর্গা যে আছেন, তার কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ কখনও পাই নাই। দুর্গা যে নাই, তারও কোনও অকাট্য যুক্তিও কোন দিন দেখাইতে পারি নাই। হিন্দুর দেবদেবীগণ সাধক-কল্পনা-প্রসূত রূপক না সমাধিলভ্য সত্য বস্তু, জানি না। তবে দেবদেবী থাকিলেই যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয়, বা দেবদেবীতে বিশ্বাস করিলেই বহু-ঈশ্বরবাদ স্বীকার করা হয়, এমন অদ্ভুত অযৌক্তিক কথা মানি না। এ সংসারে অগণ্যকোটী জীব রহিয়াছে, কেহ বা বিবর্ত্তনসোপানের নিম্ন-তর, কেহ বা উচ্চতর স্তরে রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল আছে বলিয়া ঈশ্বরের একত্ব তো নষ্ট হয় না। তবে মানুষের উপরে, মানুষের চাইতে সূক্ষ্মতর বলিয়া মানব-ইন্দ্রিয়ের অতীত, কোনও শ্রেষ্ঠতর জীব যদি থাকে, তাহা হইলেই ঈশ্বরের অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশিত্ব বা অখণ্ড একতা নষ্ট হইবে কেন?—কোনও যুক্তিতর্কের দ্বারা এ তত্ত্বের নাগাল কখনও পাই নাই। দুর্গা প্রভৃতি দেবতা যে সত্য সত্যই আছেন, ইহা জানি না। এঁরা যে বাস্তবিকই নাই এমন কথাও বলিতে পারি না। শৈশবে এঁরা আছেন, বিশ্বাস করিতাম, আর তখন আমার ধর্ম্মজীবনের পক্ষে এ বিশ্বাসই যথেষ্ট ছিল।

"ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ" অতি শৈশবে যে এ উপদেশ পাই নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা মনে করি। "ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ" ইহা ধর্ম্মের মাঝখানের কথা, আদির কথাও নয়, শেষের কথাও নয়। ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই আদিতে ঈশ্বরতত্ত্ব সাকার, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য থাকে, বেদ বাইবেল, এ সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ তার সাক্ষী। বেদের প্রাচীনতম ঈশ্বর-তত্ত্ব সাকার, নিরাকার নহে। অগ্নি, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র, প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ চাক্ষুষ বস্তু। এই প্রাকৃত অগ্নি, এই প্রত্যক্ষ আকাশ, এই বায়ু, এই বজ্রধারী মেঘ, ইহাঁরাই বেদের আদিতম দেবতা। ইহাঁরা কেহই "নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ" নহেন। পুরাতন বাইবেলের

জিহোভা বা এল এলোহিম (The Lord Almighty)ও ঠিক নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহেন। আদি মানব আদম গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল বলিয়া তিনি তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াছিলেন। তিনি এব্রাহেমের সম্মুখে আসিয়া তাহার সঙ্গে সর্ত্তবদ্ধ হইয়াছিলেন। জেকবের সঙ্গে আঁধার ঘরে তিনি সারারাত কুস্তি করিয়াছিলেন। জগতের সকল ধর্ম্মের আদিম বিবরণ হইতে মানুষ যে কোথাও প্রথমে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব ধরিতে পারে নাই—সর্ব্বত্রই যে আদিম ঈশ্বরতত্ত্ব সাকার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল, ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রত্যেক মানব-শিশুতে সমগ্র মানবজাতির বিবর্ত্তনক্রমটী পুনরাবর্ত্তিত হয় বলিয়া, আমাদের শৈশবের ঈশ্বরতত্ত্বও কখনওই "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" হয় না। নিতান্ত শিশুদিগকে এ দুরূহ তত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে কখনওই কোন সুফল ফলে বলিয়াও বোধ হয় না।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এ কথা তো জন্মাবধিই আমার সন্তানসন্ততিরা শুনিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বস্তুটী যে কি, ইহা একজনেও কখনও ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহার বিপরীত প্রমাণই মাঝে মাঝে পাইয়াছি। একদিন আমার একটী অপগণ্ড বালিকা সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া আপনার মনে বলিতেছিল "হে জগদীশ্বর, তুমি আমায় ভাল কর! আমাকে হাতে পায়ে ধরিয়া তোমার কাছে লইয়া যাও।" শিশুরা সকল বিষয়ই অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করে, এ অদ্ভুত উপাসনাও এই বালিকা অনুকরণ করিয়া শিখিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে, তার "উপাসনা" শেষ হইলে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুই যে এই জগদীশ্বর বলে, প্রার্থনা কল্লি, জগদীশ্বর কে জানিস?" সে জোর করিয়া বলিল—"জানি বৈ কি?" "তিনি কে, কোথায় থাকেন? তা বল তো?" বালিকা উত্তর করিল, "তাঁকে আমি চিনি, তিনি ভবানীপুরে থাকেন।" বালিকার উত্তর শুনিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু সে কাহাকে যে নির্দ্দেশ করিয়া এ অদ্ভুত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিল, বুঝিলাম না। বুঝিলাম কেবল যে আমাদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও এই শিশুর বুদ্ধি ঈশ্বরকে কিছুতেই "শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" বলিয়া ধরিতে পারে নাই। ইহার কিছুদিন পরে, তাহাকে লইয়া ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিলাম। পথে সে জাহাজে উঠিয়া, হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"বাবা, জগদীশ্বর এই জাহাজে আছেন। সত্যি বলৃছি, আমি তাঁকে দেখেছি।" কথাটার মর্ম্ম কিছুই তখন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দুপ্রহরের সময় আহার করিতে যাইয়া দেখি, সেখানে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তখন জানিলাম আমার কোমলমতি বালিকা কাহাকে আমাদের সকলের উপাস্য জগদীশ্বর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সে দিন হইতেই বুঝিলাম ছোট ছোট শিশুদিগকে নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টাটা কত উদ্ভট ও অযৌক্তিক।

আর এই জন্যই, অতি শৈশবে এই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ শিক্ষা দেয় নাই বলিয়া, নিজেকে আজ পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। আর অকালে, অপক্কবয়সে, অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে, আমার সন্তানসন্ততিরা এই শ্রেষ্ঠতর তত্ত্বের মৌখিক উপদেশ শুনিতেছে বলিয়া বাস্তবিকই অনেক সময় তাহাদিগকে একান্ত হতভাগ্য বলিয়াও যে ভাবি না, তাহা নয়। শৈশবে কালীদুর্গার পূজায় যোগ দিতাম বলিয়া, আপনাকে এক রত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি না। কালী দুর্গা প্রভৃতি সত্য বা মিথ্যা, বস্তু বা কল্পনা যাই হউন না কেন, তাহাতে আমার শৈশবের ধর্ম্মজীবনের কোনওই হানি হয় নাই; মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করি। কালীদুর্গার পূজা পরিত্যাগ করিয়াও এই সত্য কথাটা কখনওই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হই নাই।

ফলতঃ মানবজাতির ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের আদিতে কোথাও আজি পর্য্যন্ত এই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যে কোথাও পাইয়াছেন, এমন কথাও শুনি নাই। পণ্ডিতেরা কেহ বা প্রেত-পূজায় আর কেহ বা প্রকৃতি-পূজায়, এ দু'এর কোনও একটীর মধ্যে মানবীয় ধর্ম্মের আদি বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু কেহই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্বে ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। মানবসমাজের ধর্ম্মের আদিতে যাহা পাওয়া যায় না, মানব-শিশুর ধর্ম্মজীবনের প্রথমে একেবারে তাহাকে ফুটাইয়া তুলা কখনওই সম্ভব নহে। মানবীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থানে, আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে, কেবলমাত্র দুইটী বস্তু দেখিতে পাই — এক অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি, অপর একটা পবিত্রতার ভাব। এই অতি-প্রাকৃতের অনুভূতিকে ইংরাজিতে Sense of the Supernatural বলা হয়। আর এই পবিত্রতার ভাবকে Idea of Holiness বলা হয়। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, দেবদেবাতে বিশ্বাস, এ সকলই অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ অপ্রাণীতে প্রাণধর্ম্ম আরোপ করিয়া, অপ্রত্যক্ষ উপায়ে ইহারা যে অদ্ভুতভাবে আপনাদের শক্তি-সাধ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করাই, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করা বলা যায়। শৈশবে কালীদুর্গা প্রভৃতি দেবতায় আমাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ঠিক এই জাতীয়। এ বিশ্বাস তর্কযুক্তির দ্বারা শোধিত বা সমর্থিত হয় নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা সুসংস্কৃত হইয়া উঠে নাই। কালীদুর্গা প্রভৃতিকে প্রভূতশক্তিশালী, অতিমানুষিক-ক্রিয়াক্ষম অথচ মানুষেরই মতন সমধর্ম্মাপন্ন বলিয়া মনে করিতাম। রোগ হইতে তাঁরা ভাল করিতে পারেন, কি করিয়া যে করেন তাহা জানিতাম না ও বুঝিতাম না, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ভাল করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস করিতাম। সুতরাং পিতা মাতা প্রভৃতি ভালবাসার জন যাঁহারা, তাঁদের অসুখে বিসুখে, করযোড়ে, কাতরকণ্ঠে, অশ্রু-পূর্ণনয়নে এই সকল দেবদেবীর প্রসাদভিক্ষা করিতাম ও তাঁহাদের নিকটে নানা প্রকারে "মানত" করিতাম। এইরূপে এই

সকল দেবদেবীকে আশ্রয় করিয়াই শৈশবে আমার অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়াছিল। ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কারণ সে বয়সে, নিরাকার-চৈতন্যস্বরূপ-ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিবার শক্তি তো ছিল না। সেরূপ উপদেশ পাইলে, হয় সেই নিরাকারতত্ত্বকেই শৈশবের সহজ বুদ্ধি কোনও না কোনও রূপে একটা সাকার বস্তু করিয়া তুলিত, আর না হয়, অদৃশ্যে ভাবনা সম্ভবে না বলিয়া, সে ঈশ্বরতত্ত্বকে একেবারেই শূন্যে উড়াইয়া দিয়া পরজীবনের নাস্তিক্য-বুদ্ধির ভিত্তিটাকে গড়িয়া তুলিত। কিন্তু শৈশব-স্বভাবসুলভ সহজ কল্পনার সাহায্যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের যথাযোগ্য অনুশীলনের কোনওই সুচারু ব্যবস্থা করিতে পারিত না।

খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্মে বা মুসলমান্ ধর্ম্মে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মতন দেবদেবীর স্থান নাই বলিয়া, সেখানে নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের উপরেই শিশুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে;—হঠাৎ এমন কল্পনাও করা যায় না। কারণ, খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব যতই নিরাকার হউক না কেন, যিশুখৃষ্ট যে নিতান্ত "নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ" নহেন, ইহা সকলেই জানেন। আর যিশুর ছবি, যিশুর মূর্ত্তি, ধূপদীপাদি দ্বারা যিশু ও তাঁহার মাতা মেরীর আরতি—রোমান ক্যাথালিক্ খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং রোমান্ ক্যাথালিক্ খৃষ্টীয়ান্মণ্ডলীর যিশুবাদের সঙ্গে হিন্দুর দেববাদের বড় বেশী পার্থক্য নাই। আর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায় মূর্ত্তি রচনা করিয়া যিশুর পূজা করেন না বটে; কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মবিদ্যালয়েই (ইংরেজিতে এগুলিকে Sunday School বলে) যিশুর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও ঘটনার বহুবিধ চিত্রপট সাজান থাকে। আর এগুলিকে আশ্রয় করিয়াই, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ান্সমাজের শিশুদিগের অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়া থাকে। তা' ছাড়া খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ মুখে মুখে ঈশ্বর ও শয়তান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াও, খৃষ্টীয়ান্ শিশুগণ অতি সহজেই আপনাদের শৈশব-স্বভাব-সুলভ সহজ কল্পনার সাহায্যে একপ্রকারের দেববাদ গড়িয়া তুলিতে পারে ও সর্ব্বত্রই প্রায় গড়িয়া তুলে। মুসলমানেরা প্রায়ই কোনও মূর্ত্তি রচনা বা ঈশ্বরের কোনও প্রকারের শারীর ধর্ম্ম কল্পনাও করিতে চান না সত্য। কিন্তু এখানেও পীর, পয়গম্বর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়া, শৈশবের ধর্ম্মের একটা প্রত্যক্ষ আশ্রয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এগুলিকে অবলম্বন করিয়াই মুসলমান্ শিশুগণ সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মূল যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস তাহার কতকটা অনুশীলন করিয়া থাকে। অতএব একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, জগতের কোথাও মানুষের শৈশব-ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে না। এরূপ চেষ্টাতে কেবল বিপরীত ফলই উৎপন্ন হয়।

এই জন্যই অতি শৈশবে যে এই

নিরাকার-তত্ত্বের উপদেশ পাই নাই, কিন্তু কালী দুর্গা লক্ষ্মী স্বরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবী-গণের আশ্রয়েই যে কোমল বয়সের সরল ও সহজ ধর্ম্মজীবন বাড়িয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথাই মনে করি। ফলতঃ শৈশবের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের মতন এমন সুন্দর ও সমীচিন ব্যবস্থা আর কোনও ধর্ম্মে আছে কি না সন্দেহ। আর হিন্দুধর্ম্মের বহুমুখীনতাই ইহার প্রধান কারণ।

জগতের অপরাপর ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতির এক একটা বিশেষ অঙ্গকেই বিশেষভাবে অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তার সকল দিককে একান্তভাবে জুড়িয়া বসিতে চাহিয়াছে কি না জানি না। খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্ম্ম একদিকে মানুষের মনকে, তার মত ও বিশ্বাস, ভাব ও সিদ্ধান্তকে অধিকার করিতে চাহে; অন্যদিকে, তাহার বাহিরের সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ ও সেই সকল সম্বন্ধের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যগুলিকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করে। মুসলমান ধর্ম্মেও অনুরূপ প্রয়াসই দেখিতে পাই। এ সকল ধর্ম্ম মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি, ভোগ ও বৈরাগ্য, আচার ও ব্যবহার অন্তর-বাহিরের সকল বিষয়কে পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ করিবার বিচিত্র চেষ্টা করে না। এ সকল ধর্ম্ম সংসার ও পরমার্থের 'মধ্যে একটা আত্যন্তিক' ভেদ-বিরোধের সৃষ্টি করিয়া মানুষের কতকগুলি প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের বহিরে ফেলিয়া রাখে। আর অপর কতকগুলি বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের অধিকারে আনিয়া, তাহাদিগকে বিবিধ ভাবে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে চাহে। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মে এই জন্য খাওয়া-দাওয়া, নাচগান, আমোদ-প্রমোদ, এ সকলের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সাক্ষাৎ ও আত্যন্তিক যোগা-যোগ নাই। এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা মোটি বিধি-নিষেধ আছে মাত্র; কিন্তু এ সকলের ভিতর দিয়াই যে ধর্ম্মকে সাধন করিতে হয়, এ সকল যে ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গ, এমন ভাবটা খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মে নাই। হিন্দুর ধর্ম্মে এই ভাবটী খুবই ফুটিয়াছে। আর হিন্দুর দেববাদই ইহার মূল কারণ। এই সকল দেবদেবীর পূজা-অর্চ্চনায়, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ মানুষের সম্বর্দ্ধনার যে সকল আয়োজন করিতে হয়, সেইরূপ আয়োজন না করিলে, পূজা পূর্ণাঙ্গ হয় না। সুতরাং এ সকল ক্রিয়া-কর্ম্মে এমন একটা সহজ, শোভন, স্বাভাবিক মানুষী ভাব আছে, যাহা খৃষ্টীয়ানী বা মুসলমানী ভজন-সাধনে পাওয়া যায় না। এই মানুষী ভাবটীর জন্যই হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড জ্ঞানবৃদ্ধের ও বয়োবৃদ্ধের চক্ষে যতই কেন অকিঞ্চিৎকর ও বালকত্বসূচক হউক না, শিশুদিগের পক্ষে অতিশয় উপযোগী হইয়া থাকে।

দুর্গা কে, জানিতাম না। তিনি কৈলাস হইতে বৎসরে একবার করিয়া পৃথিবীতে আসেন, শুনিয়াছিলাম; কিন্তু কৈলাস যে কোথায়, তাহাও জানিতাম না। কিন্তু এ সকল অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা আমার শৈশবের দুর্গাপূজার কোনওই বাধা উৎপাদন করিত না। চক্ষের উপরে, কাঠ খড় মাটি দিয়া দুর্গার কাঠাম নির্ম্মিত হইত,

দেখিতাম। কিন্তু এই হাতে গড়া কাট খড়ের মূর্ত্তিটাই যখন সুসজ্জিত হইয়া, মহাসপ্তমীর প্রত্যুষে ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদির দ্বারা অর্চ্চিত হইত, তখন যে তাহা অচেতন পুত্তলিকা মাত্র, এমন ভাবটা মনে স্থান পাইত না। সন্ধ্যাকালে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বড় বড় ধুনচী হাতে লইয়া, আমরা বালকের দল যখন দেবী-প্রতিমাকে ধূপ-ধুমে ছাইয়া ফেলিতাম, তখন সেই দীপালোক-সমুজ্জ্বল ধূপগন্ধমোদিত, কাঁশরঘণ্টা-প্রভৃতির-আরত্রিক-বাদ্য-মুখরিত চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে সেই দেবীপ্রতিমা যেন ভক্তের বন্দনায় তুষ্ট হইয়া হাসিতেছেন, এমনই বোধ হইত। আর মহানবমীর রাত্রিশেষে যখন আবার ধূপদীপ জ্বালাইয়া দিতাম, তখন সেই প্রসন্ন মুখই যেন আসন্ন বিরহ ভাবিয়া ক্রমে বিষণ্ন হইয়া যাইতেছে, এমনটাই অনুভব করিতাম। বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জন, করিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম, তখন আর চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিতে সাহস হইত না। এমনও কখনও ঘটিয়াছে যে বিজয়ার পরের দিন প্রাতঃকালে চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারে আসিয়া, দেবীশূন্য দেবতার ঘর দেখিয়া চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। এ সকলই কেবল কল্পনার খেলা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মজীবনে বিশেষ ধর্ম্মের ভাবাঙ্গ-সাধনে, আমাদের পরিণত বয়সের জ্ঞানদৃপ্ত সাধন-ভজনেই সত্যের প্রতিষ্ঠা কতটা আর কল্পনার প্রভাবই বা কতটা, কে বলিতে পারে? কল্পনাই ধর্ম্মের প্রাণ। আর যে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া এই দুর্গোৎসবের আনন্দটুকু জাগিয়া উঠিত, শৈশবের ধর্ম্মজীবন গঠনে, তাহা যে কতটা সাহায্য করিয়াছে, তার পরিমাণ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

ফলতঃ দুর্গোৎসব আমার শিশুজীবনের সকল দিকটা এমনভাবে জড়াইয়া থাকিত, যে, বলিতে কি, পরিণত বয়সের সুসংস্কৃত ব্রহ্মোৎসবও তেমন করিয়া আমাকে কখনও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। ব্রহ্মোৎসবে যে আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহা মানসিক; ভিতরকার বস্তু। অন্তরের আদর্শের প্রকাশে তার উৎপত্তি। এ আনন্দ নিরাকার; মানসকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ইহার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সুমধুর সঙ্গীত, সুললিত বাক্যযোজনা, চিত্তহারিণী কবিকল্পনার সঙ্গে, একটু আধটু ভক্তিরস মিশ্রিত হইয়া, এই উৎসবানন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কলাসাহিত্যের অনুশীলনে মানুষ যে গভীর আনন্দ উপভোগ করে, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সেই জাতীয়। ক্বচিৎ কোনও সাধুভক্ত জনে ইহা আরও গভীরতা লাভ করে বটে, তখন স্বেদকম্পপুলকাশ্রু প্রভৃতি ভাবের লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে ফুটিয়াও উঠে। কিন্তু সাধারণ উপাসক ও শ্রোতাগণ ব্রহ্মোৎসবের যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, তাহা কেবল সাহিত্যরস হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সদ্বক্তাগণই সর্ব্বদা এই উৎসবের আনন্দকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন; সাধকের আধ আধ কথায় এ ফোয়ারা ছুটিয়া উঠে না। কিন্তু শৈশবে দুর্গোৎসবে যে আনন্দ পাইতাম

তাহা কেবল মানসিক বস্তু ছিল না। শরীর, মন প্রাণ, ক্ষুদ্রজীবনের সকল অঙ্গকে পূর্ণ করিয়াই তাহা ফুটিয়া উঠিত; আর সেই জন্যই বুঝি সে পুরাতন আনন্দের স্মৃতির এককণাও আজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই।

আমার বালকবালিকারা আজ ব্রহ্মোৎসবের সময় ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণ-ভূমিকে কোলাহল পূর্ণ করিয়া, উপাসকগণের উপাসনার কেবল ব্যাঘাতই উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু সে উৎসবে কোনও প্রকারেই সাক্ষাৎভাবে সামিল হইতে পারে না। একটু বড় হইলে, কেহ কেহ বা মন্দির সাজাইতে যায় বটে; কিন্তু মার্কেট হইতে ফুলপাতা কিনিয়া আনিয়া মন্দির সাজান আর দেবতার পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করা এক কথা নহে। একে আমাদের ললিতকলার অনুশীলন হয় মাত্র! কিন্তু ভক্তি বা শ্রদ্ধার বা আস্তিক্যভাবের অনুশীলন হয় না। সাজাবার জন্য যে ফুল বা পাতা সংগৃহীত হয়, তাহাকে পায়ে দলিলেও প্রাণে লাগে না। সে পাতা ও ফুল ছুঁইতে ও ধরিতে কোনও সংযম ও সঙ্কোচের ভাব প্রাণে জাগে না। তাহার সঙ্গে অন্তরের শ্রদ্ধা মাখিয়া থাকে না। শৈশবে যখন পূজার দিনে নিশা যোগে উঠিয়া, হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, শুদ্ধ হইয়া বাগানে বাগানে ফুল তুলিতে যাইতাম, তখন প্রাণের ভিতরে যে আনন্দ, যে শঙ্কা, যে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত, সে ভাবটী জীবনে আর কখনও পাইলাম না তো। আমরা বুট পায়ে দিয়া পান্টলুন কোট পরিয়া, চেয়ার বেঞ্চে বসিয়া, দেবতার পূজা করি। শুচি বা অশুচি, স্নাত বা অস্নাত, এ সকল বিচারের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের কোনও সম্পর্ক নাই, সুতরাং শৈশবের সে সশঙ্ক, সে সনম্র, সে সশ্রদ্ধ, সে কি জানি অপরাধ হইতেছে, ভাব, এখন আর নাই। কিন্তু সে ভাবটী একদিন ছিল বলিয়া আজো যা একটু আধটু ধর্ম্ম যে প্রাণে আছে, ইহা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। ফুল তুলিয়া, বেলপাতা ধুইয়া, ধূপধুনো জ্বালাইয়া শৈশবে আমিও দুর্গাপূজায় সামিল হইতাম। সুতরাং সে পূজা কেবল পুরোহিতের পূজা ছিল না। আমার নিজেরও তার সঙ্গে যোগ ছিল। ব্রহ্মোৎসবে তো আমার সন্তানসন্ততিদের এমন কোনও যোগ থাকে না। তাদের তো কথাই নাই, এ উৎসবে আমরা সকলেই শ্রোতাও দ্রষ্টা মাত্র, কর্ম্মকর্ত্তা কেবল একজন, বেদিতে বসিয়া আপনার মনোমত স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন, সে-ই আচার্য্য। দুর্গোৎসবে যেমন তন্ত্রধারক মন্ত্র-উচ্চারণ করিতেন, ব্রহ্মোৎসবেও আচার্য্য সেইরূপই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, উপাসকমণ্ডলী তাহা শুনিয়া, যথাসাধ্য তার অনুরূপ ভাব আপনার প্রাণে জাগাইতে চেষ্টা করেন মাত্র। কখনও বা এ চেষ্টা সফল হয়। কখনও বা হয় না। কিন্তু দুর্গোৎসবের কেবল মন্ত্র-উচ্চারণই এক মাত্র কর্ম্ম নয়। কেহ বা ধূপদীপ জ্বালাইয়া দেয়, কেহ বা ফুল তুলিয়া আনে, কেহ বা বেলপাতা ধুইয়া দেয়, কেহ বা নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয়, কেহ বা বলির আয়োজন করে, কেহ বা ভোগের জোগাড় করে

বহুমান্যাস্পদ বা অতিশয় প্রীতিভাজন অতিথি-অভ্যাগত বাড়ীতে আসিলে, বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেমন তাঁর সেবার আয়োজনে নিযুক্ত হয়; হিন্দুর দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে, বড় বড় পূজার সময়, যজমানের বাড়ীর ও আত্মীয়কুটুম্বদিগের সকল লোকে সেইরূপ কোনও না কোনও বিষয়ে, দেবতার অর্চ্চনার আয়োজন করিয়া থাকেন। আর এই যে সকলে মিলিয়া পূজার ব্যবস্থা করিতে হয়, ইহাতে পূজার ফলাফলের ভাগীও সকলেই হইয়া থাকে। এই পূজার ভিতর দিয়া যতটা ধর্ম্মানুশীলন হইতে পারে, তাহা স্বল্পবিস্তর পরিমাণে, সকলেই লাভ করিয়া থাকেন।

তার পর দুর্গোৎসবের আর একটী অতি বড় দিক্ আছে—সেটা সামাজিক লোক-লৌকিকতার দিক্! আধুনিক সভ্যতার চাপে এদিকটা ক্রমে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু আমি যে দুর্গা-পূজার কথা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানি, তাহাতে এদিকটা খুবই ফুটিয়াছিল। একদিকে প্রাতঃকালে দেবতার পূজার যেমন ঘটা; অন্যদিকে অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর' পর্য্যন্ত সেইরূপ লোকজনকে খাওয়াইবার ভিড়। আর সে কি খাওয়ান! পূজার আয়োজনে যেমন শ্রদ্ধা, বিনয়, ভক্তি জাগিয়া থাকিত, অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনাতেও তেমনি ছিল। সেখানেও গৃহস্বামী গলবস্ত্র হইয়া, আমন্ত্রিতদিগের সম্মুখে নগ্নপদে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এ ক্ষেত্রে জাত-বর্ণের বিচার ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির অতিথিরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, আপন আপন পংক্তিতে ভোজন করিতেন বটে; কিন্তু গৃহকর্ত্তা ও তাঁর প্রতিনিধিগণ সকলেরই নিকট সমভাবে গললগ্নীকৃতবস্ত্রে দাঁড়াইয়া সকলের সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। বরং যাঁরা গরিব, যারা নীচ জাতের, যাঁরা ভিন্ন ধর্ম্মের, তাঁদের নিকটে এই বিনয় সৌজন্য যেন বেশি করিয়াই ফুটিয়া উঠিত। ইহাও পূজার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। একটু বড় হইলে, পূজার আমন্ত্রিত-দিগের পরিচর্য্যার ভার আমার উপরেই অনেকটা আসিয়া পড়ে। আর এইরূপ লোকলৌকিকতার যে উন্নত উদার শিক্ষা দুর্গোৎসবের সময় পাইতাম, পরজীবনে আর কোথাও তাহা পাই নাই।

এইরূপে দুর্গাপূজা শৈশবে ও বাল্যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের এতটা স্থান এমনভাবে অধিকার করিয়া বসিত বলিয়া, আজও পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব ও পুণ্যস্মৃতি এ প্রাণ হইতে বিন্দু পরিমাণেও মুছিয়া যায় নাই। তাই আজও পূজার বাদ্যে প্রাণের ভিতরের শত প্রাচীন তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং দুর্গাকে মানি আর না মানি, তাঁর এই পূজার আনন্দস্রোতের বাহিরে থাকিতে বাস্তবিকই প্রাণে ক্লেশ পাইয়া থাকি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নিমাই-চরিত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও শৈশব

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন্ধ্যাকাল, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত। নবদ্বীপের যাবতীয় নরনারী হরিধ্বনি করিতে করিতে ভাগীরথীতীরে সমাগত। এমন সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী এক অপূর্ব্ব কুমার প্রসব করিলেন। হরিধ্বনির মধ্যে এই বালকের জন্ম, হরিনাম-কীর্ত্তনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত এবং হরির বিরহশোকে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছিল।

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালকের শরীরে মহারাজলক্ষণসমূহ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। গৌড়ে বিপ্র রাজা হইবে এমন প্রবাদ ছিল। চক্রবর্ত্তী ভাবিতে লাগিলেন এই বালকদ্বারাই কি সেই প্রবাদ সফল হইবে? যথাবিধি বালকের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত হইল। জন্ম-পত্রিকাকার বলিলেন "এই বালক সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইনি ধর্ম্মসংস্থাপন ও ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা জগতের উদ্ধারসাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবন পর্য্যন্ত এই শিশুর চরণ ভজনা করিবে।"

পুত্রের ভাগ্যফল শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী প্রভৃতির বাদ্যের সহিত বালকের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। পুরস্ত্রীগণ নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। চারিমাস বয়সে শিশু গৃহস্থিত দ্রব্যজাত ছড়াইয়া ফেলিত এবং গৃহদ্বারে জননীর পদশব্দ শুনিবামাত্র বিছানায় যাইয়া সুশীল বালকের মত শয়ন করিয়া থাকিত। গৃহস্থিত দ্রব্যাদি কে স্থানচ্যুত করিল, তাহা লইয়া তখন জনকজননীর মধ্যে গভীর গবেষণা আরম্ভ হইত। শিশু যখন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিত, তখন কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যাইত না। অবশেষে ক্রন্দন নিবারণের এক অসাধারণ উপায় আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল বিষম ক্রন্দনের মধ্যেও হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলেই শিশু শান্তভাব ধারণ করিত। তদবধি শিশু ক্রন্দন আরম্ভ করিলেই সকলে হরিধ্বনি করিতেন।

ষষ্ঠমাসে যথাবিধি নামকরণ-সংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। মিশ্র-দম্পতীর অনেক পুত্রকন্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া পুরস্ত্রীগণ শিশুর নিমাই নাম রাখিলেন। শিশুর জন্মের পরে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহার নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর।" সম্মুখে স্থাপিত ধান্য, শ্রীমদ্‌ভাগবত, খড়ি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত পুস্তক গ্রহণ করিয়া শিশু ভাবী জীবনের ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন।

জানু-গতি শিখিবার পর একদিন এক

সর্প দেখিতে পাইয়া শিশু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। শিশুর স্পর্শে সর্প কুণ্ডলী করিয়া পড়িয়া রহিল—শিশু তাহার উপর শুইয়া থাকিল। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া পিতা-মাতা দৌড়িয়া আসিলেন। সর্প পলাইয়া গেল।

ক্রমে নিমাই হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলেন সুগোল-মস্তক, চাঁচর-কেশ, কমললোচন, আজানুলম্বিত-বাহু, অরুণাধর, পরিসরবক্ষ, গৌরকান্তি শিশু যখন হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইত, তখন তাহার কন্দর্পবিনিন্দী রূপ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকিত এবং নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য দিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিত। স্ত্রীলোকগণ নিমাইকে দেখিলেই হরিধ্বনি করিত—নিমাই তখন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিতেন। হরিনাম শুনিয়া নিমাই এত সন্তুষ্ট হইতেন যে প্রাপ্য মিষ্টান্নাদি তিনি এই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে আনিয়া দিতেন।

কিন্তু বালকের দুরন্তপনা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেক সময় তাহার দৌরাত্ম্য মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত। অন্য শিশু দেখিলেই, নিমাই তাহাকে নানা রূপে উত্যক্ত করিতেন এবং সে কাঁদিয়া না উঠা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইতেন না। কখনও প্রতিবেশী-গৃহে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ ভোজ্য দ্রব্য সমস্ত খাইয়া আসিতেন, আবার যাহার গৃহে খাবার কিছু মিলিত না, তাহার হাঁড়ী কুড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, যদি কখনও ধরা পড়িতেন তখন পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেন। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার প্রতিবেশিগণ নীরবে সহ্য করিত।

একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপনীত হইলেন। মিশ্রবর পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাপনান্তে যেমন ইষ্টদেবতাকে অন্ন নিবেদন করিবার জন্য উপবেশন করিয়াছেন, অমনি দিগম্বর, ধূলিধূসরিত-কলেবর বালক নিমাই কোথা হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণের পাত্র হইতে একগ্রাস অন্ন লইয়া খাইয়া ফেলিল। বালকের কাণ্ড দেখিয়া মিশ্র মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুরোধ নিরস্ত হইলেন। জগন্নাথ তখন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকার করাইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারও পাক শেষ হইলেই নিমাই অলক্ষিতে আসিয়া ব্রাহ্মণের পাত্রস্থিত অন্ন হইতে এক গ্রাস লইয়া খাইয়া ফেলিলেন। পিতামাতার ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। জগন্নাথের মনস্তাপ দেখিয়া এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারবিরাগী বিশ্বরূপের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ তৃতীয় বার পাক করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন নিমাইকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া সকলে রুদ্ধ গৃহের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। বালক ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। গভীর রাত্রিতে ব্রাহ্মণের রন্ধন সমাপ্ত না হইতেই সকলে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাপনান্তে অন্ন নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে

যেমন উপবেশন করিয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন সম্মুখে নিমাই সমাগত। পুনরায় বালককে দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ "হায়, হায়" করিয়া উঠিলেন, কিন্তু নিদ্রাভিভবশতঃ কেহই ব্রাহ্মণের ডাক শুনিতে পাইল না। তখন হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন "হে বিপ্র, তুমি আমায় আহ্বান করিয়াছ, তাই আমি আসিয়াছি।" দেখিতে দেখিতে সেই বালক-মূর্ত্তি অষ্টভূজ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন।

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়,
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মনি হার,
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার।
নব গুঞ্জা বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে,
চন্দ্র মুখে অরুণ অধর শোভা করে।
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল।
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নুপুর,
নখমণি কিরণে তিমির গেল দূর।
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেই খানে
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে ॥
গোপ গোপী গাভীগন চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তাই দেখে পরত্যেকে ॥

চিরবাঞ্ছিত আপনার ধন সম্মুখে পাইয়া ব্রাহ্মণ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিমাই ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া রুদ্ধ গৃহে গমন করতঃ শয়ন করিয়া থাকিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে এক একাদশী-তিথিতে নিমাই ভয়ানক ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। শত হরিধ্বনিতেও সেদিন সে ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না। ক্রন্দনের কারণ জানিতে না পারিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই বলিয়া উঠিলেন "জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করিয়া আজি বিষ্ণু-পূজার্থ যে নৈবেদ্য আহরণ করিয়াছেন, আমাকে তাহাই আনিয়া দেও।" বালকের এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া জননী ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু নিমাই কিছুতেই নিজের আবদার ত্যাগ করিলেন না। জগদীশ ও হিরণ্য জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ও বান্ধব ছিলেন। বালকের অদ্ভুত খেয়ালের কথা তাঁহাদের কর্ণগত হইলে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। সেদিন যে একাদশী তিথি এবং তাঁহারা যে বিষ্ণু পূজার্থ নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, নিমাইর মত ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে তাহা জানিতে পারা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। "শিশুর দেহে অধিষ্ঠিত গোপালই শিশুকে এই সমস্ত কথা বলাইয়াছিল," মনে করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার যাবতীয় উপহার শিশুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া নিমাই শান্তভাব অবলম্বন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যারম্ভ ও বাল্য ক্রীড়া

ক্রমে হাতে খড়ির সময় আগত হইল। জগন্নাথ শুভদিন দেখিয়া নিমাইর হাতে খড়ি দিলেন। কিছুদিন পরে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ-সংস্কারও অনুষ্ঠিত হইল। নিমাইর অসাধারণ বিদ্যাভ্যাস-পটুতা দেখিয়া

সকলে বিস্মিত হইলেন। একবার মাত্র দেখিয়াই নিমাই বর্ণমালা আয়ত্ত করিলেন, এবং দুই দিনে সমস্ত ফলা অভ্যাস করিয়া অনবরত শ্রীকৃষ্ণনামাবলী লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকের দুরন্তপণা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পল্লীর যাবতীয় বালক লইয়া নিমাই এক দল গঠন করিলেন। স্বীয় দল-বহির্ভূত কোনও বালকের সহিত দেখা হইলেই, নিমাই তাহার সহিত কলহ করিতেন। সদলে গঙ্গাস্নানে যাইয়া বহুক্ষণ যাবত জল-ক্রীড়া করিতেন, স্নানার্থী অন্য লোকের গায়ে জল ছিটাইয়া পড়িত, তাহারা বারণ করিলেও গ্রাহ্য করিতেন না, পরন্তু কাহাকেও ছুঁইয়া দিয়া, কাহারও গাত্রে কুল্লোল দিয়া বারবার তাহাদিগকে স্নান করিতে বাধ্য করিতেন। ধ্যানস্থ পূজকদিগের গাত্রে জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাদিগের ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিয়া বলিতেন "কাহার ধ্যান করিতেছ, আমিই কলিযুগে প্রত্যক্ষ নারায়ণ। আমাকে দেখ।" কাহারও পূজার্থ গঠিত শিব-লিঙ্গ, কাহারও বা উত্তরীয় বসন লইয়া পলায়ন করিতেন। কখনও বা কোনও পূজকের সজ্জিত বিষ্ণুর আসনে উপবেশন করিয়া, তাহার আহৃত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন এবং ক্রুদ্ধ পূজককে সম্বোধন করিয়া বলিতেন "দুঃখিত হইও না, যাহার জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিয়াছিলে, সে-ই খাইয়াছে।" শিশুগণের কর্ণে জল দিয়া তাহাদিগকে কাঁদাইতেন, যুবকগণের স্কন্ধে আরোহণ করতঃ "মুইরে মহেশ" বসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন; স্ত্রীলোকগণের বসন লইয়া পুরুষের বসনের সহিত বদল করিয়া দিতেন, বালিকাগণের পরিধেয় বস্ত্র লুকাইয়া রাখিতেন, বালিকাগণ কিছু বলিলে, তাহাদের সহিত কলহ করিতেন, তাহাদের ব্রতের ফলফুল ছড়াইয়া ফেলিতেন, কাহারও মুখে কুল্লোল দিতেন, কাহারও চুলে ওকড়ার ফল গুঁজিয়া দিতেন, কাহাকেও বা বিবাহ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেন।

নিমাইর দৌরাত্ম্য ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল, একদিন পল্লীস্থ অনেকে জগন্নাথ মিশ্রের নিকট গমন করিয়া তাহার অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকাগণও সেই সময়ে শচীদেবীর নিকট যাইয়া তাহার দৌরাত্ম্যের কথা বলিলেন। পুত্রবৎসলা শচী বালিকাগণকে মিষ্ট বচনে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের শাস্তিবিধানের জন্য গঙ্গার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বালিকাগণ জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া নিমাইর জন্য ভীত হইয়া ত্বরিতে ঘাটে যাইয়া নিমাইকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল। নিমাই পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ ঘাটে গিয়া নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না। নিমাইর সঙ্গিগণ তাহাকে বলিল নিমাই তখনও স্নানার্থ আসেন নাই। মিশ্র গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন—গৌরদেহে কালিবিন্দুশোভিত নিমাই পুঁথি হস্তে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। নিমাই তৈল লইয়া গঙ্গার ঘাটে সঙ্গী-দিগের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। পিতা-মাতা তখন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

পুত্রের চপলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া জগন্নাথ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা পিতামাতা কাহারও ছিল না। নিমাই ভয় করিতেন কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে বিশ্বরূপের শাসনও অচিরে অপসারিত হইল। বিশ্বরূপ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পিতামাতা তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একদিন বিশ্বরূপ পিতামাতাকে না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং শ্রীশঙ্করারাণ্য নাম গ্রহণ করিয়া অনন্ত পথের পথিক হইলেন।

বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ পিতামাতাকে শেলের মত বিদ্ধ করিল। বালক নিমাইও ভ্রাতার বিরহ-শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগের কতিপয় দিবস পরে, একদিন নিমাই নৈবেদ্যের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিতামাতার শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহাতে সদ্যপুত্রবিচ্ছেদবিধুর জনকজননীর মন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিমাই বলিলেন "আমার মনে হইল বিশ্বরূপ আমাকে এক অপরিচিত স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম 'আমি বালক, সন্ন্যাসের আমি কিছুই জানি না! ঘরে অনাথ পিতামাতা রহিয়াছেন আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কে তাঁহাদের সেবা করিবে? আমি যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পিতামাতার সেবা করি—তাহাতেই লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন।' আমার এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ পুনরায় এখানে আনিয়া রাখিয়া গেলেন।"

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নিমাইর চপলতা অনেকটা সংযত হইল। পিতামাতার সন্তোষ বিধানার্থ তিনি খেলা ছাড়িয়া নিরবধি তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় যত্নের সহিত পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর বুদ্ধিও স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু পুত্রের এই কৃতিত্বে পিতামাতার মনে সন্তোষের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। একদিন জগন্নাথ শচীদেবীকে কহিলেন "সর্ব্বশাস্ত্র অধিগত করিয়া বিশ্বরূপ বুঝিয়াছিল —সংসার অনিত্য ও অসত্য" এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছে। বিশ্বম্ভরও যদি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে-ও সংসার ত্যাগ করিবে। অতএব তাহার পড়াশুনা করিয়া কাজ নাই সে মূর্খ হইয়া গৃহে থাকুক।" অতঃপর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন "তোমার পড়া শুনা করিয়া কাজ নাই, তুমি যাহা চাহিবে সকলই পাইবে; পড়া ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে অবস্থান কর।" নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না, কিন্তু পড়া শুনা বন্ধ হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

নিমাইর লেখাপড়া বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চাপল্য ও ঔদ্ধত্য পূর্ব্বেরই মত অসংযত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি গৃহের বাহিরে সঙ্গিগণের সহিত ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কখনও নিমাই কম্বলে গাত্র আবৃত করতঃ বৃষ সাজিয়া প্রতিবেশীর কলাবন ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিতেন, কখনও বা তাহাদিগের গৃহদ্বার রাত্রি কালে বাহির হইতে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত উৎপাতের কথা জগন্নাথের কর্ণগত হইত—কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেন না। অবশেষে একদিন নিমাই গৃহসমাপস্থ গর্ত্তে স্থিত এক উচ্ছিষ্ট হাঁড়ীস্তূপের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। শচীদেবী নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন এবং এত দিনেও নিমাইর-উচ্ছিষ্টজ্ঞান হইল না বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। চতুর বালক তখন উত্তর করিল "উচ্ছিষ্ট-জ্ঞান ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান হইবে কোথা হইতে? তোমরা যে আমার পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছ। আমাকে যদি পড়িতেই না দেও তাহা হইলে আমি আর গৃহে যাইব না।" শচী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইলেন। জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলে প্রতিবেশিগণ সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া নিমাইর পুনরায় পাঠারম্ভ করাইয়া দিলেন।

নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে নিমাইর উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। তাহার সুন্দর সুগঠিত শরীরে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র পরম সুন্দর দেখাইত। উপনয়নান্তে নিমাই নবদ্বীপের অধ্যাপক শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি হইলেন। অল্পদিনেই গঙ্গাদাস তাঁহার নূতন ছাত্রের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছাত্রগণের কেহই ফাঁকিতে নিমাইকে আঁটিতে পারিত না। ক্রমে নিমাই যাবতীয় ছাত্রের নায়করূপে পরিগণিত হইলেন মুরারী গুপ্ত কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রতিদিন সতীর্থগণের সহিত নিমাই স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিতেন। অসংখ্য ছাত্র গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইত। নিমাই ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত অন্যান্য টোলের ছাত্রগণের বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হইত। নিমাইর তর্ক প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল যে, এক ঘাটে তর্ক শেষ হইলে, তিনি সন্তরণ পূর্ব্বক অন্যঘাটে গমন করতঃ তত্রস্থ ছাত্রগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন। এই তর্ক অনেক সময় গালাগালি ও মারামারিতে পরিণত হইত।

স্নানান্তে গৃহে আসিয়া বিষ্ণু-পূজা ও তুলসী বৃক্ষে জলদান করতঃ নিমাই ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে নির্জ্জনে বসিয়া সূত্রের টীপ্পনী রচনা করিতেন। পুত্রের বিদ্যাচর্চ্চায় আগ্রহ দেখিয়া মিশ্রদম্পতি আনন্দিত হইতেন এবং অনবরতঃ পুত্রের মঙ্গলের জন্য ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ-সম্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া, জগন্নাথ মিশ্রকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এক

দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই শিখামুণ্ডন করতঃ অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, নিমাই থাকিয়া থাকিয়া বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করতঃ সকলের মস্তকে চরণ প্রদান করিতেছেন এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব "জয় শচীনন্দন" বলিয়া তাঁহার স্তবগান করিতেছেন। অতঃপর লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে নিমাই নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কোটীকণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনি গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বিশাল জনসংখ্যা লইয়া নিমাই নীলাচলে গমন করিলেন। স্বপ্নদর্শনে আতঙ্কিত হইয়া জগন্নাথ পত্নীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শচী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন—বিশ্বারূপই আজকাল নিমাইর ধর্ম্মে পরিগণিত হইয়াছে। বিদ্যা ছাড়িয়া নিমাই যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে—ইহা সম্ভবপর নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

পিতৃবিয়োগ ও বিদ্যাশিক্ষা

এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে নিমাইএর একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পুত্র ও পত্নীকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃশোকে নিমাই নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, পতিপ্রাণা শচী কেবল নিমাইর মুখ দেখিয়াই স্বামীবিরহ সহ্য করিলেন। এখন পিতৃহীন বালকের সেবা ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য রহিল না। পলকের জন্য নিমাই তাঁহার দৃষ্টিপথের বাহির হইলে শচী আকুল হইয়া পড়িতেন। নিমাইও এখন হইতে অত্যধিক যত্নের সহিত পতিবিরহকাতরা জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং নানা আশার কথা শুনাইয়া তাঁহার ক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পিতৃশোকের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিমাইর স্বাভাবিক ক্রোধপ্রবণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। স্বামীহীনা শচীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু নিমাই যখন যাহা চাহিতেন, তাহা না পাইলে আর রক্ষা থাকিত না। নিমাই ক্রুদ্ধ হইলে আপনার উপর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিতেন, তখন ঘরদ্বার সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাইতেন। একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় নিমাই গঙ্গাপূজার্থ জননীর নিকট মালা ও চন্দন চাহিলেন। গৃহে মালা ছিল না। জননী কহিলেন "ক্ষণেক অপেক্ষা কর। মালাকরের বাটী হইতে মালা আনিয়া দিতেছি।" "এখন মালা আনিয়া তারপর আমাকে দিবে" বলিয়া ক্রুদ্ধ নিমাই গৃহে প্রবেশ করতঃ গৃহস্থিত যাবতীয় ভাণ্ড লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। গৃহ মধ্যে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, চাউল, কার্পাস প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে যত বস্ত্র ছিল, নিমাই সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। অবশেষে

এক ঠেঙ্গা লইয়া চালের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন, জীর্ণ চাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন নিমাই হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা এক গাছের উপর ও তৎপরে ভূমিতলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ার্ত্ত শচী পুত্রের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া শত অত্যাচার করিলেও নিমাই জননীর গাত্রে হস্তস্পর্শ করিতেন না। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিমাই অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মালা আনিয়া শচী পুত্রকে জাগরিত করিলেন এবং মালা প্রদান করতঃ নানারূপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ততক্ষণে ক্রোধ শান্ত হইয়াছে। নিমাই জননীর প্রদত্ত মালা লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। ভোজনের সময় শচী মিষ্ট বচনে নিমাইকৃত অপচয়ের উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "তুমি ত এখনি পড়িতে যাইবে, কিন্তু ঘরের সম্বল যে সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, কালি খাইবার যে কিছুই নাই। "কৃষ্ণ সব মিলাইয়া দিবেন" বলিয়া পুস্তক হস্তে নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যাকালে যখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন দুই তোলা স্বর্ণ বাহির করিয়া নিমাই কহিলেন "এই দেখ মা, কৃষ্ণ ইহা মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহাদ্বারা যাহা যাহা দরকার কিনিয়া লও।"

বিদ্যালয়ে নিমাইর প্রতিভা ক্রমশঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে লাগিল। তৎকৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক নিতান্ত হৃষ্ট হইতেন। নিমাইর প্রশ্নের উত্তর কোন ছাত্রই দিতে পারিত না। তিনি নিজেই সূত্রের স্থাপনা করিতেন, এবং আপনার ব্যাখ্যা আপনিই খণ্ডন করিতেন, আর কাহারও ক্ষমতা হইত না যে তাহার খণ্ডন করে। স্নান, ভোজন, পর্য্যটন সর্ব্বদা নিমাই শাস্ত্র-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন কালে নিমাই একখানি টিপ্পনি রচনা করেন, তাহা "বিদ্যাসাগরী টীকা" নামে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। নিমাইর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক গঙ্গাদাস স্বীয় ছাত্রদের পড়াইবার ভার তাহার উপর দিলেন। মুরারী গুপ্ত নিমাই অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন, তজ্জন্য নিমাই তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিতেন "বৈদ্যরাজ, ব্যাকরণ শাস্ত্র বড় বিষম, ইহাতে কফ্-পিত্ত-অজীর্ণের ব্যবস্থা নাই, তুমি ইহা ছাড়িয়া লতা-পাতা লইয়া রোগীর চিকিৎসা কর গিয়া।" কিছুদিন পরে নিমাইর প্রতিভার নিকট অবনতমস্তক হইয়া মুরারী তাঁহার নিকট পাঠ-স্বীকার করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণের পাঠ শেষ হইলে বিশ্বম্ভর ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে "ভট্টদীধিতি" প্রণেতা সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণিও ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। রঘুনাথ অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে তাঁহার যশ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া

পড়িয়াছিল। কিন্তু অধ্যয়ন কালে নিমাইএর অমানুষী প্রতিভার নিকট রঘুনাথের প্রতিভা মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে—একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ এক জটীল প্রশ্নের সমাধানে নিবিষ্ট চিত্তে ব্যাপৃত ছিলেন। বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষিগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করিয়াছিল, রঘুনাথ তাহা জানিতে পারেন নাই। এমন সময় নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পক্ষিমলাচ্ছন্নদেহ রঘুনাথকে দেখিয়া নিমাই তৎসমীপে গমন করতঃ স্বীয় আদ্রবস্ত্রের দুই চারি ফোঁটা জল তাঁহার পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথের চৈতন্য হইল। তখন নিমাই তাহার চিন্তার বিষয়টী কি জানিতে চাহিলেন। রঘুনাথ প্রথমে অবজ্ঞার সহিত তাঁহার প্রশ্ন উড়াইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু অবশেষে প্রশ্নটী শুনিয়া নিমাই যখন অবলীলাক্রমে তাহার যথাযথ মীমাংসা করিয়া দিলেন, তখন তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তদবধি চিরকালই রঘুনাথ নিমাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

ন্যায়শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া নিমাই ন্যায়ের একখানি টীপ্পনি লিখিলেন। রঘুনাথ শিরোমণিও ঠিক এই সময়েই ন্যায়ের টীকা রচনা করিতেছিলেন। কথিত আছে—রঘুনাথ ও নিমাই একদিন গঙ্গাপার হইতেছিলেন। কথোপকথনকালে নিমাই-কৃত টীকার বিষয় অবগত হইয়া রঘুনাথ বুঝিতে পারিলেন,, নিমাইর টীকার পরে তাঁহার টীকার প্রচার পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। রঘুনাথের কাতর মুখচ্ছবি ও হতাশ-উক্তি শুনিয়া নিমাইর করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল এবং স্বকীয় টীকা তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি নিষ্ফল বলিয়া নিমাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ, অধ্যাপনা, বায়ুরোগ, দিগ্বিজয়ী-বিজয়

বল্লভাচার্য্য নামে নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। লক্ষ্মীনাম্নী তাঁহার এক লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা ছিল। একদিন স্নানকালে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীকে দেখিয়া নিমাই মনে মনে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ইহার কিছুকাল পরে বনমালী নামক এক ঘটক শচীদেবীর নিকট গমন করতঃ লক্ষ্মীর সহিত নিমাইএর বিবাহ-সম্বন্ধ উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু তখনও পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য শচী উৎসুক হয়েন নাই। ঘটকের কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন "আমার বালক পিতৃহীন ; এখনও তাহার পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, আগে তাহার পাঠ সমাপ্ত হউক, পরে বিবাহ হইবে।" বনমালী বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, পথে নিমাইএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বনমালীর নিকট জননীকর্ত্তৃক তাহার প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অবগত হইয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং হাসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘটকের সহিত ভালরূপ সম্ভাষণ কর নাই কেন ?" পুত্রবৎসলা শচী নিমাইর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে বনমালীকে ডাকিয়া প্রস্তাবিত

বিবাহে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ঘটক আনন্দিত মনে বল্লভাচার্য্যের নিকট যাইয়া বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সম্বন্ধ স্থির হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে শাস্ত্রবিধি মতে নিমাই লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অধ্যাপক গঙ্গাদাস স্বকীয় টোলের ছাত্রগণের অধ্যাপনার ভার নিমাইর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে নিমাই নিজে একটী স্বতন্ত্র টোল স্থাপিত করিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইর টোল স্থাপিত হইল। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নিমাই অধ্যাপনার্থ টোলে গমন করিতেন; মধ্যাহ্নে সশিষ্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন; মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ পুনরায় টোলে গমন করিয়া অপরাহ্নে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকবিধৌত জাহ্নবীতটে কত শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্রব্যাখ্যান হইত; জ্ঞানদর্পিত নিমাই পণ্ডিত অর্জ্জিত বিদ্যার কতই গর্ব্ব করিতেন; প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ঠকাইয়া দিতেন। তাহার যশ দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; দলে দলে ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। সহস্র ছাত্রের পাঠ-কোলাহলে তাঁহার টোল-গৃহ শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

একদিন অকস্মাৎ বায়ুরোগগ্রস্ত রোগীর মত নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক অস্বাভাবিক শব্দ নির্গত হইতে লাগিল, এবং মৃত্তিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়া তিনি কখনও বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন, কখনও বা সম্পূর্ণ উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হইয়া উঠিতে লাগিল, পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধবগণ নিমাইর অবস্থাকে বায়ু-বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু এই অবস্থাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেমভক্তির বাহ্যিক লক্ষণ স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক বন্ধুগণের পরামর্শ অনুসারে বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি নানাবিধ ভৈষজ্য তৈল দ্বারা নিমাইর মস্তক প্রলিপ্ত করা হইল—কিন্তু তাহাতে কোনও ফল পরিলক্ষিত হইল না। নিমাই মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি সর্ব্বলোকের প্রভু; আমি বিশ্বধারণ করিয়া আছি—তাই আমার নাম বিশ্বম্ভর; আমি সেই—অথচ কেহই আমাকে চেনে না।" নিমাইএর উক্তি শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল "ইহার শরীরে দানবের অধিষ্ঠান হইয়াছে।" কেহ বলিল "ইহা ডাকিনীর কার্য্য।" অন্য উপায়ে ব্যাধির উপশম না হওয়ায় অবশেষে এক তৈলপূর্ণ দ্রোণে নিমাইকে শোয়াইয়া রাখা হইল। এইরূপে কিছুদিন পরে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং পুনরায় পূর্ব্বেরই মত শিষ্যগণের সহিত নগরভ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের সকলেই তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন

সকলে মুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। নগরের তন্তুবায়, গন্ধবণিক ও গোপদিগের গৃহে নিমাই গমন করিলে তাহারা কৃতার্থ হইয়া যাইত, এবং মূল্যের নাম মাত্র না করিয়াই তাহাকে বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য ও দধিদুগ্ধাদি প্রদান করিত। গোপদিগকে নিমাই মামা সম্বোধন করিতেন তাহারাও তাঁহার সহিত নানা হাস্য পরিহাস করিত। মালাকরগণ বিনা-মূল্যে তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিত, তাম্বুলী তাম্বুল প্রদান করিত, শঙ্খবণিক দিব্য শঙ্খ উপহার দিত।

একদিন এক সর্ব্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া নিমাই স্বীয় পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস গণনা করিয়া বলিতে সর্ব্বজ্ঞকে আদেশ করিলেন। গণক গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল—

"শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষ মহা জ্যোতির্ধাম॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দীঘরে।
পিতামাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে।
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লাই কোলে।
সেই রাত্রে থুইবেন আসিয়া গোকুলে॥
পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই করে॥
পুন দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ॥
* * * * * *
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদল শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজন॥
পুন দেখে প্রভুরে প্রলয়-জল মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বি সাজে॥
পুন দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার।
মহা উগ্ররূপ ভক্তবৎসল অপার॥
পুন দেখে প্রভুরে বামন রূপ ধরি।
বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুন দেখে মৎস রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতুহলে॥

মানস চক্ষুতে এই সমস্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিল "কোনও দেবতা আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন।" পরক্ষণেই ভাবিল "এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রবিৎ, আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছে;" কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সর্ব্বজ্ঞ নিমাইকে বলিল "আমি এখন কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। তুমি এখন যাও, ভাল রূপ গণিয়া বিকালে তোমাকে বলিব।"

দৈবজ্ঞের গৃহ হইতে নিমাই তখন শ্রীধর নামক এক দরিদ্রের কুটীরে গমন করিলেন। দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু সংসারের দুঃখ কষ্ট তাহাকে কাতর করিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীধরের অচলা ভক্তি ছিল—তাঁহারই প্রেমে শ্রীধরের হৃদয় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। নিমাই শ্রীধরের সহিত নানারূপ কৌতুক করিতেন। আজি তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শ্রীধর, 'হরি, হরি' ত অনুক্ষণ বলিতেছ। কিন্তু দুঃখ তোমাকে ছাড়ে কই? লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়া তোমার অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ত গেল না!" বিশ্বাসী শ্রীধর উত্তর করিলেন "উপবাস ত করি না—তবে আর দুঃখ কিসের? ছোট হউক বড় হউক কাপড়ও পরিয়া থাকি।" নিমাই কহিলেন

বিষহরি ও চণ্ডীর সেবকদিগের কাহারও ত অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখি না। আর তোমার চালে খড় নাই।" শ্রীধর কহিলেন "রত্নময় প্রাসাদে রাজা যেরূপ কালাতিপাত করেন, বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণও সেইরূপেই সময়াতিবাহিত করিয়া থাকে। কাল সকলের পক্ষেই সমান। সকলেই ভগবানের ইচ্ছায় নিজকর্ম্মফল ভোগ করে।" নিমাই তখন কহিলেন "শ্রীধর, কে বলে তুমি দরিদ্র, তুমি অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিকারী, লুকাইয়া ধন ভোগ কর। একদিন আমি সব প্রকাশ করিয়া দিব।" শ্রীধর উত্তর করিলেন "পণ্ডিত, তোমার সহিত আমার দ্বন্দ সাজে না, তুমি ঘরে যাও।" নিমাই কহিলেন "সহজে তোমাকে ছাড়িব? আগে কি দিবে বল?' তখন—

শ্রীধর বলেন, আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব, তাহা বলহ গোসাঞি॥

প্রভু বোলেন—

যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কোন্দল না করি তোমা সনে

শ্রীধর তখন ভাবিলেন "উদ্ধত ব্রাহ্মণ যদি আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারি না। ছলেই হউক বলেই হউক তবু যে ব্রাহ্মণে লইতেছে ইহা আমার ভাগ্য, ইহা ভাবিয়া নিমাইকে থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিয়া শ্রীধর কহিলেন "লও ঠাকুর আর আমার সহিত কোন্দল করিও না।" তখন নিমাই কহিলেন "শ্রীধর আমাকে কি মনে কর?" শ্রীধর উত্তর করিলেন "তুমি ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুর অংশ।" নিমাই কহিলেন "তুমি কিছুই জান না—আমি গোয়ালার ছেলে। তোমার গঙ্গার মহত্ত্ব আমা হইতেই।" শ্রীধর হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন "নিমাই পণ্ডিত, গঙ্গাকেও কি তুমি ভয় কর না। বয়োবৃদ্ধির সহিত কোথায় লোক স্থির গম্ভীর হয়, আর তোমার চপলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।"

শ্রীধরের সহিত কৌতুক করিয়া নিমাই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকপ্লাবিত আকাশতলে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন এক অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিল। সেই ত্রিভুবনমোহন বংশীরবে শচীদেবী আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যলাভ করিয়া শচী বুঝিতে পারিলেন,যথায় নিমাই উপবিষ্ট তথা হইতে মুরলীরব উত্থিত হইতেছে; গৃহবাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পুত্র বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট, কিন্তু বংশীনাদ আর শোনা গেল না। শচী বিস্মিত হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ইহার পরেও কত দিন নিশাভাগে নৃত্যগীতধ্বনি শুনিয়া শচী চমকিত হইয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পান নাই; কত দিন দেখিয়াছেন, হঠাৎ সমগ্র গৃহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

এই সময়ে কেশব কাশ্মিরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে সমাগত হইলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া

নবদ্বীপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিলাষে বহুশিষ্য সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ হেন নবদ্বীপের সম্মান কি দিগ্বিজয়ীর নিকট পরাভবে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে? আশঙ্কায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ম্রিয়মাণ হইলেন। এইবার বুঝি নবদ্বীপের যশঃসূর্য্য অস্তমিত হইল—এই চিন্তায় সকলেই বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গর্ব্বোদ্ধত আগন্তুক পণ্ডিত ঘোষণা করিয়া দিলেন "যদি কাহারও সাহস হয়, আমার সহিত বিচারে অগ্রসর হউন। অন্যথা নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ পরাজয় স্বীকার করতঃ আমাকে জয়-পত্র লিখিয়া দিউন।" কেহই দিগ্বিজয়ীর আহ্বানে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন না। দিগ্বিজয়ীর আগমনবার্ত্তা নিমাইএর কর্ণগত হইল। তাহার গর্ব্বোদ্ধত আহ্বানের কথা শুনিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে নিমাই সশিষ্য গঙ্গাতীরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা হইতেছে, এমন সময় দিগ্বিজয়ী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিমাইর লাবণ্যময় বদন-শ্রী দর্শন করিয়া অনিমেষলোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিমাই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আসন পরিগ্রহ করিয়া দিগ্বিজয়ী অবজ্ঞাভরে কহিলেন "তোমার নাম নিমাই পণ্ডিত? তুমি ব্যাকরণ অধ্যাপনা করিয়া থাক। এই বাল্যশাস্ত্রে তোমার পটুতার কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি।" নিমাই বিনীতভাবে কহিলেন "ব্যাকরণ অধ্যাপনা করি বলিয়া অভিমান আছে বটে, কিন্তু ব্যাকরণের তাৎপর্য্য যে বুঝি, তাহা বলিতে পারি না। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও প্রবীণ কবি, আমি ত আপনার নিকট নবপাঠার্থী সদৃশ। আপনার কবিত্ব শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য কিছু বর্ণনা করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।"

তখন দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকাবলী রচনা ও পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মেঘগর্জ্জনসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী দ্রুতোচ্চারিত একশত শ্লোক শুনিয়া, শিষ্যগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। নিমাই অশেষ সাধুবাদ করিয়া কহিলেন "আপনার পবিত্র শ্লোকের অর্থ করিতে পারে, এমন পণ্ডিত আর কে আছে? পঠিত কবিতার অর্থ যদি আপনি নিজমুখে করেন, তাহা হইলে পরম সন্তোষলাভ করিব।" দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসিলেন "কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিব।" তখন নিমাই পণ্ডিত শত শ্লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা॥
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তুর্য়া শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

গঙ্গার এই মহিমা নিয়ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে তিনি বিষ্ণুর চরণকমল হইতে সঞ্জাত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কি সুর কি নর সকলেই দ্বিতীয় কমলার ন্যায় ইহাঁর চরণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি

ভবানীপতির শীর্ষভাগে অদ্ভুতগুণ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছেন।

নিমাই কহিলেন "আপনার পঠিত এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন।" দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন "ঝঞ্ঝাবাতের মত আমি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছি। কি প্রকারে তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিলে?" নিমাই কহিলেন "দেবতার বরে আপনি কবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, দেবতার বরে শ্রুতিধরও হওয়া যায়।" দিগ্বিজয়ী সন্তুষ্ট হইয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। তখন নিমাই কহিলেন "এখন শ্লোকের মধ্যে কি কি দোষ ও কি কি গুণ আছে, তাহা বলুন।" দোষের উল্লেখ শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর অভিমান আহত হইল। তিনি অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন "তুমি ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী, অলঙ্কার ও কবিত্বের তুমি কি জান?" অতি বিনীতভাবে নিমাই উত্তর করিলেন "বুঝি না বলিয়াই আপনাকে বুঝাইয়া দিতে বলিতেছি। অলঙ্কার-শাস্ত্র না পড়িলেও, তাহার কিছু কিছু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, এই শ্লোকে বহু দোষ ও বহু গুণ আছে।" অহঙ্কৃতস্বরে তখন দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি তুমি, কি দোষ-গুণ ইহাতে আছে?" "আমার উপর রুষ্ট হইবেন না" বলিয়া নিমাই তখন শ্লোকের দুই স্থানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি ও অন্য দুই স্থানে যথাক্রমে বিরুদ্ধমতি ও ভগ্নক্রম-দোষের উল্লেখ করিলেন এবং কোথায় কোন্ কোন্ দোষ আছে তাহা প্রদর্শন করিলেন। ব্যাকরণীয়ার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইলেন, তাহার প্রতিভা স্তম্ভিত হইল, মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। দিগ্বিজয়ীর পরাভবে নিমাইয়ের শিষ্যগণ হাসিয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া নিমাই দিগ্বিজয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি কবিশিরোমণি; আপনার মত কবি আজি পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেবের কবিতাতেও দোষাভাষ আছে। সুতরাং আপনি বিমর্ষ হইবেন না। আমি আপনার শিষ্যেরও সমান নহি। আমার শৈশবচাপল্যে রুষ্ট হইবেন না।" এইরূপ মিষ্টকথায় দিগ্বিজয়ীকে প্রবোধ দিয়া নিমাই গৃহে গমন করিলেন। রাত্রিকালে দেবী সরস্বতী স্বপ্নে দিগ্বিজয়ীকে জানাইলেন নিমাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। পরদিন প্রাতঃকালে দিগ্বিজয়ী আসিয়া নিমাইর চরণে প্রণত হইলেন।

নিমাইকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ীর পরাভববৃত্তান্ত সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং নিমাইর যশঃসৌরভে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বড় বড় বিষয়ী লোক পথে নিমাইকে দেখিতে পাইলে, দোলা হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে যে বাড়ীতেই ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, তথা হইতে নিমাইর জন্য উপঢৌকন প্রেরিত হইতে লাগিল। নিমাই এই সমস্ত দ্রব্য দরিদ্র ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বিলাতী বাড়ীওয়ালী

বিলাতের বাড়ীওয়ালী এক অতি অদ্ভুত বস্তু। দুনিয়ার আর কোথাও এ বস্তু মিলে কি না, জানি না। এ বস্তু আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি। কিন্তু এই সভ্যতারও সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। আমেরিকায় এ বস্তুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সেখানে বড় বড় হোটেলের প্রভাবে ছোট ছোট বোর্ডিং লোপ পাইয়াছে। আর বাসাবাড়ী আমেরিকায় এখনো ছিল কি না, তাও জানি না। বোর্ডিং এবং ছোট ছোট বাসাবাড়ী বা ইংরেজিতে যাকে appartments বলে, তাহাই বাড়ীওয়ালীদের রাজত্ব। আমেরিকায় এ রাজত্ব এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেখানে অনেক লোক সপরিবারে হোটেলেই সর্ব্বদা বসবাস করে। হোটেল-বাসের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ গৃহিণীদিগকে আর চব্বিশ ঘণ্টা ঘরকন্না লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় না। চাকরবাকরের জঞ্জালও আর পোহাইতে হয় না। হোটেলের বন্দোবস্তমত ঘরের সকল কাজ আপনা হইতেই চলিয়া যায়। সপ্তাহান্তে বিল্‌টা চুকাইয়া দিলেই হয়। নিউইয়র্ক সহরের কোন কোন হোটেলে, দশ পনের বছর ধরিয়া একক্রমে বাস করিতেছেন, এমন মার্কিন পরিবার দেখিয়াছি। হোটেলে থাকিলে গৃহকার্য্যের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইয়া গৃহস্বামী আপনার সমগ্র সময় ও শক্তি নির্ব্বিঘ্নে অর্থোপার্জ্জনে নিয়োগ করিতে পারেন, গৃহিণীও রান্নাবান্নার হেঙ্গাম হইতে একান্ত অবসর লাভ করিয়া যথেচ্ছভাবে আপনার শিক্ষায় বা সৌখিনতায় দিনক্ষয় করিতে পারেন। আমেরিকার আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ-জীবন এ পথেই ফুটিয়া উঠিতেছে। পারিবারিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হইয়া, এক প্রকারের 'বিশ্ব-জীবনে'র আকার ধারণ করিতেছে। আর হোটেলগুলোই এই অতুল 'বিশ্ব-জীবনে'র আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সেখানে, বড় বড় সহরে, হোটেল-কর্ত্তাগণ পুরাতন বাড়ীওয়ালীর ব্যবসায়টী একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছেন। ফরাসীতে বা জর্ম্মাণীতে বিলাতের বাড়ীওয়ালীর মত কোনো বস্তু আছে কি না, জানি না। এ সকল দেশের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় অতি সামান্য, ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। তবে সাহিত্যেও ইহাদের কোনো বিশেষ খবরাখবর পাই নাই।

আর বিলাতেও, লণ্ডন সহরেই বাড়ীওয়ালীর প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। লণ্ডন একটা "বিশ্ব-সহর" ইংরেজিতে ইহাকে cosmopolitan city বলে। ভৌগোলিক সম্পর্কে লণ্ডন ইংলণ্ডের, সত্য; কিন্তু জাতি-বর্ণের হিসাবে, লণ্ডন ইংরেজের নহে, সমগ্র বিশ্বের। এখানে সকল দেশের লোকের বাস। আর যেখানে নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা লোকে আসিয়া বাস করে, সেখানেই সরাই, মুছাফেরখানা,

ছত্র, বোর্ডিং, হোটেল প্রভৃতির প্রয়োজন উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে যাকে সরাই, বা ছত্র, বা মুছাফেরখানা বলে, কিয়ৎপরিমাণে আমাদের দেবালয় সকলেও প্রবাসীকে আশ্রয় দিয়া যে অভাব পূরণ করেন, বিলাতের হোটেল, বোর্ডিং হাউস্ বা অ্যাপার্টমেণ্টস্ (appartments) গুলো সেই কাজ করে। তবে আমাদের অতিথিসৎকার ধর্ম্ম; বিলাতে ইহা একটা অতি বড় ও লাভবান ব্যবসায়। সাহেবেরাও একদিন ধর্ম্মভাবেই অতিথি সৎকার করিতেন, তাঁহাদের ভাষা তার সাক্ষী। অতিথি কথাটার মত কথা ইংরেজিতেও আছে। তবে ইংরেজ অতিথি আমন্ত্রিত, অনাহুত নহেন। গৃহস্বামীর সুপরিচিত, একেবারে অপরিচিত নহেন। ইংরেজ-সমাজ বিষ্ণুশর্ম্মার একটা উপদেশ খুবই শক্ত করিয়া ধরিয়াছেন—"অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ" এটী তাঁরা খুবই জানেন। সুতরাং আশ্রয়-আলয়-হীন লোকের সেখানে আশ্রয় মিলে না। বিনা টাকায় মিলে না—টাকা দিলে হোটেল, বোর্ডিং হাউস, অ্যাপার্টমেণ্টস্ এ সকলে স্বচ্ছন্দ স্থান পাওয়া যায়। আর গৃহস্থেরাও কখনো কখনো বিশেষ পরিচয় পাইলে, ভাল লোকের সুপারিশে, অভ্যাগতকে আপনার বাড়ীতে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে অতিথি বা guestই বলে বটে, কিন্তু খরচ-পত্র দেন বলিয়া এঁদের paying guest বলে। এই paying guest কথাটী আমাদের ভাষায় নাই, কারণ বস্তুটী এখনো আমাদের সমাজে গজায় নাই। Paying guestদের গৃহকর্ত্রীদিগকে বাড়ীওয়ালী বলে না।

বাড়ীওয়ালীরা হয় বোর্ডিং হাউসের না হয় অ্যাপার্টমেণ্টের কর্ত্রী। বয়স এবং বৈবাহিক অবস্থার হিসাবে, ইহাঁরা তিন শ্রেণীর। বয়সভেদে যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা; বৈবাহিক অবস্থাভেদে অনূঢ়া সধবা এবং বিধবা। বয়সের ত্রিবিধ ক্রমের সঙ্গে বৈবাহিক অবস্থাত্রয় মিলিয়া বিলাতের বাড়ীওয়ালীদিগকে অনেক শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে। কেহ বা অনূঢ়া ও যুবতী, কেহ বা অনূঢ়া ও প্রৌঢ়া, কাহারো মধ্যে বা পতিপুত্রহীন জীবনের শুষ্কপ্রাণতার সঙ্গে বার্দ্ধক্যের কর্কশতা মিলিয়াছে। তেমনি সধব্যের সঙ্গেও যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য মিলিত হইয়াছে। কোথাও বা বৈধব্যের সঙ্গেও এ মিলন হইয়াছে। এইরূপে বিবিধ অবস্থার ও রূপের ও বয়সের মিলনে বিলাতী বাড়ীওয়ালীর অসংখ্য রূপের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু রূপ অনেক হইলেও বাড়ীওয়ালীর মূল স্বরূপটী একই, বহু নহে। আর এই বহুরূপিণী বিলাতী বাড়ীওয়ালীর সেই স্বরূপটী যে ধরিতে না পারিল, লণ্ডনের মায়াপুরীতে, পদে পদেই তার বিপদ ভারি।

যুবতী ও অনূঢ়া, এরূপ বাড়ীওয়ালীর সংখ্যা বড়ই কম। পায় দেখা যায় না, বলিলেই হয়। যেখানে এই দুই অবস্থার সমাবেশ থাকে, সেখানে যৌবন প্রায়ই আপনার সহজ শ্রীসম্পদ হইতে নির্ম্মম-ভাবেই বঞ্চিত হইয়াছে। রূপযৌবন-

সম্পন্না অনূঢ়া বাড়ীওয়ালী প্রায় দেখা যায় না। কদাচিৎ দেখা গেলেও, ভদ্রলোকে সে সকল বাড়ীতে প্রায়ই আশ্রয় গ্রহণ করেন না। এ শ্রেণীর বাড়ী লণ্ডনে নাই, এমন নয়। কিন্তু বিলাসের লীলাভূমি, পিকিডিলির আশেপাশেই এঁরা থাকেন। এই সকল বাড়ীতে স্বল্প ভাড়ায় আতিথ্যলাভ করা যায় না। এ অঞ্চলে, একখানি বসিবার ও একটী শোবার ঘরের ভাড়া, সপ্তাহে ন্যূনকল্পে ৫০।৬০ টাকা পড়ে। যারা স্বদেশ হইতে বিদেশে কেবল টাকা উড়াইতে যায়, তারাই কেবল এ সকল স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে। সচরাচর যুবতী বাড়ীওয়ালীরা বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গেই থাকেন, স্বামীর সামান্য আয়ের সঙ্গে আপনাদের এই ব্যবসায়ের আয় মিলাইয়া নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করেন। স্বামীর আর্থিক উন্নতিতে ও ক্রমে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধনের অধিকারিণী হইলে, বিশেষ যখন বৎসর বৎসর পরিবারে নূতন জীবের আমদানি হইতে আরম্ভ করে, তখন এই সকল বিবাহিতা যুবতী বাড়ীওয়ালী অনেক সময় এই ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া, উপনগরীতে "ভদ্রলোকের" মত বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভদ্রলোকের মত কথাটা নিরর্থক নয়। ইংরেজসমাজে এ সকল বাড়ীওয়ালী বা তাঁদের স্বামীপুত্রকে ভদ্রলোক বা gentleman বলে না। তাঁরা সজ্জন হইতে পারেন, কিন্তু সজ্জন আর জেণ্টল্‌ম্যান্ এক কথা নয়। যাদের টাকা নাই, কিংবা বংশমর্য্যাদা নাই, তারা বিলাতী সমাজে জেণ্টল্‌ম্যান্ হয় না। যারা আজ ব্যবসা করিয়া খায়, তারাই যদি কাল ভাগ্যগুণে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠে, অমনি ছোটলোক হইতে একটানে ভদ্রলোক হইতে পারে। আর সকলেরই ভদ্রলোক হইবার আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাঁরা, যাঁরা দারিদ্র্য হইতে ক্রমে স্বচ্ছলতায় যাইতেছেন, একেবারে লক্ষপতি এখনো হন নাই, কখনও হবারও কোনো দুরাশা নাই, তাঁরাই প্রায় লণ্ডনের উপনগরে যাইয়া ভদ্রপল্লি রচনা করেন। বাড়াওয়ালীরাও কিছু টাকা কড় জমাইতে পারিলে, অনেক সময়েই আপনার ব্যবসা ছাড়িয়া এই সকল ভদ্রপল্লিতে যাইয়া ভদ্রলোকশ্রেণী-গণ্য হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

যৌবনসম্পন্না বাড়ীওয়ালী প্রায়ই বিধবা হন। তবে বিধবা বলিয়া পরিচিত বলিয়াই এক সময়ে তিনি সধবা ছিলেন, এমন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। অনূঢ়া যুবতীর পক্ষে অনেকগুলি নিত্য নবাগত অতিথি-অভ্যাগতের ভার গ্রহণ করা ভালো দেখায় না বলিয়া, যুবতী বাড়ীওয়ালীরা, আপনাদের ব্যবসার খাতিরে, বাড়ী ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, একেবারে সটান অনূঢ়াবস্থা হইতে বৈধব্যে গিয়া উপস্থিত হন, মাঝখানকার সধবার অবস্থাটা না ছুঁইয়াই একলাফে ডিঙ্গাইয়া পার হইয়া থাকেন। এতে সুবিধা অনেক আছে, অসুবিধা কিছুই নাই। ইংরেজবিধবাকে হিন্দু বিধবার মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয় না। বিলাতী বৈধব্যে আমরণ

নিরামিষেরও ব্যবস্থা নাই, একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাসও করিতে হয় না। আহার-বিহারে সধবায় বিধবায় কোন পার্থক্য নাই। সাজসজ্জা সম্বন্ধেও, বৈধব্যের আদিকার বৎসরকালের পরে, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ নাই। বিলাতী বৈধব্যে সমাজ-শাসননিবন্ধন, ভোগবিলাসের কোনো প্রকারের সঙ্কোচ একান্তই অনাবশ্যক। বৈধব্যের আদিতে কতকটা সংযমের ব্যবস্থা আছে সত্য; কিন্তু বিধাতাপুরুষ আপনি যেথানে এ বৈধব্যের বিধান করেন কেবল সেখানেই এ সকল সংযম অবলম্বন আবশ্যক হয়। চক্ষের উপরে যাঁরা বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন, কেবল তাহাদিগকেই সমাজের মুখ চাহিয়া এ সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। যাদের পূর্ব্ব পরিচয় নাই, যাদেরে সধবা রূপে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, সে সকল অপরিচিতাদের বৈধব্য-গ্রহণে এ সকল সংযমাদি অবলম্বন অনাবশ্যক। এরূপ স্থলে একদিকে, স্বামীর ঐকান্তিক অনুপস্থিতি, আর অন্যদিকে স্ত্রীর অনামিকাতে বিবাহাঙ্গুরীয় ধারণ, এই দুটীই বৈধব্যের সন্তোষকর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এই এক আংটীর বলেই অনেক সময় অনূঢ়া বিবাহিতা বলিয়া, এবং অবিবাহিতা বিধবা বলিয়া সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারেন। বিধবা বাড়ীওয়ালীদের বিবাহের চিহ্নস্বরূপ অনামিকাধৃত অঙ্গুরীয়টীই বৈধব্যের প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়াই তাঁরা একেবারে, "মিস্" হইতে "মিসেস্" হইয়া উঠিতে পারেন। অবশ্য ক্ষুদ্র পল্লিজীবনে এরূপ ভাবে অনূঢ়ার পক্ষে স্বেচ্ছাবৈধব্যলাভ সম্ভব হয় না। যেখানে সকলেই সকলকে জানে, সেস্থলে এরূপ অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটাইতে হইলে, বছর দুবছরের জন্য দেশত্যাগী হইয়া থাকা আবশ্যক হয়। কিন্তু লণ্ডন তো সহর নহে, এক বিশাল সাহারা। এ মরুভূমে কে কাকে চেনে? কে কার খবর রাখে? এক পল্লিতে যে সুপরিচিত, অন্য পল্লিতে সে একান্তই অপরিচিত। এক পল্লিতে যে অনূঢ়া, অপর পল্লিতে যাইয়া সে বিবাহ না করিয়াও বিবাহিতা কিম্বা বিবাহিতা না হইয়াও বিধবা সাজিয়া বসিতে পারে। এই জন্যই অনেক রূপযৌবনবতী বিধবা বাড়ীওয়ালীর বৈধব্যটা সত্য না স্বরচিত, ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বিলাতে সকল প্রকারের ব্যবসাতেই রূপ জিনিষটা বড় কাজে লাগে। যে আপনার দোকান জাঁকাইয়া তুলিতে চায়, সে বাছিয়া গুছিয়া রূপসী চাকরাণী জুটাইয়া আনে, এঁরা মোহিনী সাজে সাজিয়া, গ্রাহকদিগকে আকর্ষণ করেন। এঁরা সকলেই বা অধিকাংশই যে অসচ্চরিত্র এমন মনে করা অসঙ্গত। অনেক সতী লক্ষ্মী এঁদের মধ্যে থাকেন, যাঁরা দরিদ্র পরিজনের ভরণপোষণের জন্য এই দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হ'ন। এ সকল লোককে দেখিলেই চেনা যায়। এঁদের নিজের রূপের জ্ঞান আছে—কোন্ রমণীর তাহা নাই?—কিন্তু রূপের অহঙ্কার নাই। প্রসাধনের পটুতা আছে—কোন্ রমণীই বা প্রসাধনে উদাসীন?—

কিন্তু বিলাতের অসংযম নাই। বিধাতা তাঁদের রূপ দিয়াছেন, তাই তাঁরা সহজেই চাকুরী পান; কিন্তু নিজেরা কদাপি লোক ভুলাইবার জন্য আপনাদের মোহিনী মায়া বিস্তার করেন না। কেবল রূপের জোরে চাকুরী জুটিল এ কথা ভাবিতেও এঁদের লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ;"—দেশের এই রীতি। দোকান-পসার খুলিয়া বসিলে, ব্যবসার খাতিরে, গ্রাহক জুটাইবার জন্য যেমন ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজ-সজ্জা সুন্দর ও সুচারু করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ রূপলাবণ্যবতী সুসজ্জিত চাকরাণীও রাখা প্রয়োজন হইয়া থাকে। বাড়ীওয়ালীর ব্যবসাতেও এ নিয়মের অতিক্রম করিলে চলে না। বোর্ডিংটাকে জাঁকাইতে হইলে, আসবাবে ও চাকরচাকরাণীতে উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্য সাধন আবশ্যক হয়। বাড়ীওয়ালী যেখানে আপনি রূপ-যৌবন-সম্পন্না সেখানে তো কথাই নাই। কিন্তু ব্যবসায়ে মূলধনের যতটা প্রয়োজন, রূপের প্রয়োজন ত ততটা নয়। যার টাকা আছে, তার রূপও থাকিবে, এমনো ত কোন কথা নাই। বিশেষ অনেক সময় রূপ, যৌবন, ও সঞ্চিত ধন যেখানে মিলিয়া যায়, সে স্থলে রমণী প্রায়ই আপনার ইচ্ছায় না হইলে, অনূঢ়া থাকে না। তাঁদের আর বাড়ীওয়ালী হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয় না অনেক সময় প্রকৃত বাড়ীওয়ালী যিনি, অর্থাৎ যাঁর টাকাতে ব্যবসা চলে, তিনি রূপসী নহেন। এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম তিনি নূতন অভ্যাগতের চক্ষুর অন্তরালে থাকেন। যে বাড়ীওয়ালীর আপনার তেমন রূপ নাই, তিনি চাকরাণী নিয়োগে অসাধারণ রূপলাবণ্য খুঁজিয়া থাকেন। এ সকল চাকরাণীই প্রথমে ঘরদোর দেখাইয়া, অতিথির সঙ্গে সকল বন্দোবস্ত করে; ক্রমে ক্রমে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়।

বিলাতের বাড়ীওয়ালীর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক, এ কথা বলিয়াছি। রূপতঃ কেহ অনূঢ়া, কেহ সধবা, কেহ বিধবা। কেহ সুন্দরী, কেহ সাধারণী, কেহ একান্তই কুৎসিৎ। কেহ বা যুবতী, কেহ বা প্রৌঢ়া, কেহ বা বৃদ্ধা। এ সকল রূপভেদ অনেক আছে। কিন্তু স্বরূপে প্রায় সকল বাড়ীওয়ালীই এক। সে স্বরূপে বিলাতের বাড়ীওয়ালী নারী নহেন, কিন্তু রাক্ষসী; মানবী নহেন, কিন্তু শকুনী। শোষণই রাক্ষসের ধর্ম্ম; ভক্ষণই শকুনীর একমাত্র কর্ম্ম। রাক্ষসী মোহিনী মায়া জানে, বিলাতের বাড়ীওয়ালীও মায়াবিনী কম নহেন। শকুনী জীবের মাংস টানিয়া খায়, শেষে অস্থিমাত্র পড়িয়া থাকে। বাড়ীওয়ালীও, যতটা সাধ্য, আপনার আশ্রিত অতিথিদিগের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট রাখিয়া তাঁর আর যা কিছু আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। দিবার সময় ইঁহারা মায়াবিনী, নিবার বেলা রাক্ষসী। খাটি বিলাতী বাড়ীওয়ালীর খপ্পরে একবার পড়িলে, জীবের আর মুক্তির আশা থাকে না।

শ্রীঃ—

পশুশালায় একটী বানরের দাঁত সবল ছিল না, সে পাথরের আঘাত দিয়া সুপারি ভাঙ্গিত; পশুশালার রক্ষকগণ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ বানর পাথর খণ্ড দ্বারা কার্য্য করিয়া খড়ের নীচে লুকাইয়া রাখিত, উহাকে অন্য বানরকে হাত দিতেও দিত না। এই খানেই সম্পত্তির বোধ জন্মা লক্ষিত হয়; কিন্তু প্রত্যেক কুকুর যখন অস্থিখণ্ড লইয়া অপরের সহিত ঝগড়া করে, অথবা পক্ষিগণ যখন নিজ বাসা দখল করে তখন তাহারাও সম্পত্তির বোধ থাকা দেখায়।

ডিউক অব আর্গাইল বলেন যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যবশতঃ তদনুরূপ ভাবে যন্ত্র নির্ম্মাণ করা মানুষের একটা বিশেষত্ব; সুতরাং তিনি বিবেচনা করেন যে, এই হেতু বশতঃ মানুষের সহিত পশুর অলঙ্ঘ্য প্রভেদ। এই প্রভেদ অবশ্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সার জে, লাবক যাহা বলেন তাহার মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে। তিনি বলেন মনুষ্য প্রথম যখন কোন কারণে পাথরের যন্ত্র ব্যবহার করে, তখন হঠাৎ উহা ভাঙ্গিয়া গেলে উহার তীক্ষ্ণধার খণ্ডগুলি ব্যবহার করিয়াছিল। এই অবস্থার পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ব্যবহার করা সহজ কথা, এবং তৎপরে প্রস্তর হইতে কোন মতে যন্ত্র গঠন করাও খুব কঠিন কথা নহে।

প্রস্তর-যুগের* মানুষ কত দীর্ঘকাল পরে প্রস্তরের যন্ত্রাদি ঘষিতে ও পালিস্ করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে প্রস্তরের যন্ত্র গঠন করিতেও দীর্ঘ সময় আবশ্যক হইয়া থাকিবে। সার জে, লাবক ইহাও বলেন যে প্রস্তর ভাঙ্গিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত, এবং পালিস্ করিতেও তাপ উৎপন্ন হইত। সুতরাং "যে দুই উপায়ে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা এইরূপে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে।" যে সকল প্রদেশে আগ্নেয়-গিরি হইতে ধাতুস্রাব নির্গত হইয়া অরণ্য মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত সে সকল স্থানে অগ্নি কি পদার্থ তাহা ঐ ঘটনা হইতেই জ্ঞাত হইত। উচ্চশ্রেণীর বানরগণ সম্ভবতঃ সহজ বৃত্তির উত্তেজনায় অস্থায়ী মাচাং* প্রস্তুত করে; কিন্তু অনেক সহজ বৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হয়, সুতরাং ঐ কর্ম্মও অনায়াসেই ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ওরাং ওটাং রাত্রিকালে পাণ্ডেনাস্ পত্রে দেহাচ্ছাদন করে, ইহা জানা গিয়াছে। ব্রেস বলিয়াছেন যে তাঁহাদের একটী বানর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত খড়ের মাদুর মাথার উপর দিয়াছিল। এই সকল নানাপ্রকারের আচরণ হইতে আমরা সম্ভবতঃ কতিপয় সরল শিল্প-কৌশলের প্রথম সূচনা বুঝিতে পারি। যাহা হইতে মানব জাত হইয়াছে, সেই আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে স্থাপত্য ও পরিচ্ছদ-রচনা কিরূপে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ ঐ সকল আচরণেই দেখা যায়।

* যে যুগে মানুষ পাথরের যন্ত্র ও অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

* Platform.

সামান্য গুণানুভূতি,* সাধারণ সংস্কার, অহংজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব, এই সকল উন্নত মনোবৃত্তি জন্তুগণের আছে কি না তাহা নির্ণয় করা, আমা অপেক্ষা যিনি অধিক জানেন তাঁহারও দুঃসাধ্য। কারণ উহাদিগের মনোমধ্যে কি হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন; এবং গ্রন্থকারগণ মধ্যে ঐ শব্দগুলির অর্থসম্বন্ধেও গুরুতর অনৈক্য। সম্প্রতি যে সকল নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সামান্য গুণানুভূতি অথবা সাধারণধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবার শক্তি জন্তুগণের নাই—ইত্যাকার মতই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু যখন একটী কুকুর দূরে অন্য কুকুরকে দর্শন করে, তখন নিশ্চয়ই সে এই মাত্র বুঝিতে পারে যে ঐ দূরস্থ পদার্থ কুকুর (জাতীয়); কারণ ঐ দূরস্থ কুকুরটী যদি উহার পূর্ব্বপরিচিত সুহৃদ হয়, তবে সে নিকটে আসিলে উহার ভাব তদ্দণ্ডেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সম্প্রতি একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে এইরূপ স্থলে জন্তুগণের মানসিক অবস্থা মানবের ন্যায় নহে, এ কথা বলা অনর্থক বলা মাত্র। এ ক্ষেত্রে মানব যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে মানসিক সংস্কারবশতঃ অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তবে জন্তুগণও হয়। আমি অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যখনই আমার টেরিয়ার কুকুরকে বলি, "হিঃ হিঃ ও-টা কোথায়?" তখনই সে বুঝিতে পারে, কিছু অনুসন্ধান করিতে হইবে; তৎপরে প্রায়ই সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে এবং দ্রুতগতি নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে দৌড়াইয়া গিয়া শিকারের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ঘ্রাণ লইতে আরম্ভ করে; যখন কিছুই পায় না তখন কাঠ বিড়াল পাইবার আশায় নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের উপরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একটা কোন জন্তু অনুসন্ধান ও শিকার কবিতে হইবে, এরূপ এক সাধারণ সংস্কার উহার মনে উদয় হইয়াছিল, ইহা কি ঐ সকল কর্ম্ম দেখিয়া বুঝা যাইতেছে না?

কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, জীবন কি, মৃত্যু কি? ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করাকেই যদি অহংজ্ঞান (=অহঙ্কার) বলা যায় তবে ইহা অবাধে স্বীকার করিতে হয় যে ইতর জন্তুগণের অহংজ্ঞান নাই। কিন্তু বৃদ্ধ শিকারী কুকুরগণ অতীত কালের শিকার বিষয়ক সুখ দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে কেমন করিয়া বলা যায়? কারণ উহাদিগের উত্তম স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি আছে, তাহা উহাদিগের স্বপ্ন-দর্শন হইতেই বুঝা যাইতেছে। ঐরূপ চিন্তাই ত এক প্রকারের অহংজ্ঞান। পক্ষান্তরে অতি অসভ্য নীচ অষ্ট্রেলিয়ানের কর্ম্মক্লান্তা স্ত্রী যে গুণবাচক শব্দই জানে না, চারি সংখ্যার অধিক বলিতে পারে না, সে অহংজ্ঞান পরিচালনা অতি কমই করে, এবং নিজের অস্তিত্বসম্বন্ধে চিন্তাও করে না বলিলেই হয়, ইহা বুক্‌নার দেখাইয়াছেন। প্রায় সকলে স্বীকার করেন যে উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুগণের স্মৃতি, মনোযোগ, ভাব-

*বহু পদার্থের সাধারণ ধর্ম্মকে সামান্য গুণবলিলাম, তদ্বোধকে সামান্য গুণানুভূতি বলা হইল। ইহাকে জাতিত্ব-বোধও বলা যাইতে পারে।

সংযোগ, কিঞ্চিৎ কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধি আছে। এই সকল বৃত্তি বিভিন্ন জন্তুর বিভিন্ন পরিমাণ; তথাপি যদি এ সকল উন্নতিশীল হয়, তবে সরল বৃত্তি সকলের সংমিশ্রণে ও বিকাশে সামান্য গুণানুভূতি ও অহংজ্ঞান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জটিল মনোবৃত্তি সকল সঞ্জাত হওয়া বেশি অসম্ভব গণ্য হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ তর্ক করেন যে জীবের উন্নতি সোপানের কোন্ স্তরে ঐ সকল বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; কিন্তু আমাদিগের শিশুগণের মনে ঐ সকল বৃত্তি কখন উদয় হয় তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমরা কেবল শেষে এই দেখিতে পাই যে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত ভাবে ঐ সকল বৃত্তি শিশুদিগের মনে বিকশিত হইল। (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

খোদা মালিক হায়

জানি না কি এক খেয়ালের বশে আমি প্রস্তাব করিয়া বসিলাম, এবার গ্রীষ্মাবকাশে দিল্লী বেড়াইতে যাওয়া যাক্ বন্ধুবর কিশোরীমোহন অমনি মহা উৎসাহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, উৎসাহ জিনিষটায় কিশোরীর কখন অভাব দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে দুজনে একসঙ্গে পড়িতেছি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, কি সভা-সাজান, কি চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, সকল বিষয়েই কিশোরীর সমান উৎসাহ। ফুটবল, ক্রিকেট টেনিস্ খেলায় সে সকলের আগে। মোট কথা নিজের কাজ ছাড়া আর সকল বিষয়েই সে উৎসাহান্বিত

তখনি স্থির হইয়া গেল আগামী রবিবার সন্ধ্যার এক্সপ্রেসে আমরা দিল্লী রওনা হইব। এদিকে কিশোরীর উৎসাহ যত বাড়িতে লাগিল আমার উৎসাহ সেই অনুপাতে কমিতেছিল, আমি পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম এবার গ্রীষ্মটা বাংলার এক নিভৃত কোণে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে কাটাইব। তাই যতই সেই ছায়াশীতল চিরশান্তিময় গ্রামের বাড়ীটি মনে পড়িতে লাগিল ততই কোলাহলময় রৌদ্রতপ্ত দুর্গন্ধ দিল্লী সহরের উপর রাগ হইতে লাগিল। শনিবারের সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিশোরী কোর্ট হইতে আমার মেসে আসিয়া উপস্থিত এবং তখনও আমার কিছুই গোছ গাছ হয় নাই দেখিয়া নিজেই আমার পেঁটরা গোছাইতে বসিয়া গেল আমি চিরকাল ঢিলা স্বভাবের মানুষ—কিশোরী ঠিক তার বিপরীত। সে আধঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করিয়া ফেলিল, যাবার সময় বলিয়া গেল "আমি কাল ঠিক পাঁচটার সময় গাড়ী লইয়া আসিব আজ তুমি তোমার বন্ধু প্রফেসর য -কে একটা তার করিয়া দিও। দেখো ভুলো না, জান্ ত খবর না দিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলেও কি বিপদ হয়, এটা নেহাত কবিকল্পনা নয়।

শেষে কিশোরীর উৎসাহের প্রবল বন্যার স্রোতে আমরা দিল্লী আসিয়া

পৌঁছাইলাম। ট্রেণের কষ্টে যখন আমার উৎসাহের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না, তখনও কিশোরীর হাতে আমার নিস্তার নাই। আমি অন্তত এক সপ্তাহ কাল বিশ্রামের প্রস্তাব করিবা মাত্র কিশোরী কুতব-মিনার দেখিতে যাইবার গাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া স্থিতি ও গতির সংঘাতে গতিই জয়লাভ করিল। আমরা একে একে দিল্লীর যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও অদ্রষ্টব্য সমস্তই দেখিয়া শেষ করিলাম। তারপর আমি যখন ভারী বিশ্রাম-সুখের কল্পনায় মগ্ন, তখন কিশোরীমোহন বলিয়া বসিল "চল এখন আমরা দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই। এতদিন আমরা যাহা দেখলাম তাহা বিদেশী 'টুরিষ্টে'র মত দেখা কিন্তু ইহা ত বাস্তবিক দেখা নয়। কোন সহর দেখিতে হইলে সেখানকার লোকের সঙ্গে মিশিয়া তার হাট-বাজার তার রাস্তা-গলি, তার ভাল-মন্দ, সেখানকার আনন্দ-উৎসব সবই দেখিতে হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বন্ধুর এ তত্ত্বের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া লইয়া শারীরিক অসুস্থতার ক্ষীণ আপত্তি করিলাম মাত্র। কিন্তু তাহা টিকিল না, বাহির হইতে হইল।

(২)

এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন প্রাতে আমরা চাঁদনীচকের রাস্তায় সুবিখ্যাত "সোনেরী মসজিদের" সামনে ফোয়ারার ধারে বসিয়া আছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে কয়েদী ভরা, উপরে, পাশে, পিছনে 'হাতিয়ার-বন্দ' সিপাহী। গাড়ীটা যখন মোড়ের কাছে আসিল, তখন কোথা হইতে একটি বৃদ্ধা ও একটি যুবতী দৌড়িয়া আসিয়া একজন কয়েদীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল। তাহাদের কি কথা হইল শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু গাড়াখানা যখন কুইন্স গার্ডেনের দরজায় তখন বৃদ্ধা ও যুবতী নামিয়া গেল এবং কয়েদী চিৎকার করিয়া বলিল "তোমরা ভয় করো না, বাড়ী ফিরিয়া যাও, রামজী অবশ্যই দয়া করিবেন।"

কথাটা শুনিয়া আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল। কিশোরী বলিল, "ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে।" তারপর দু তিন দিন আমরা ঠিক সময়ে ফোয়ারার ধারে বসিয়া থাকিতাম এবং দেখিতাম বৃদ্ধা যুবতীর হাত ধরিয়া মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীখানি আসিলে আবার তাদের সেই কয়েদীর সঙ্গে কথা হইত। চতুর্থ দিনে কিশোরী বলিল, "আজ যেমন করিয়া হউক, ইহাদের বৃত্তান্ত জানিতে হইবে।"

বৃদ্ধা ও যুবতী তখন 'পরেটাওয়ালী'র দোকানে গিয়া বসিয়াছে, কিছুক্ষণ পরে তাহারা কয়েকখান মোটা রুটি লইয়া বাগানের মধ্যে গেল। তাহাদের আহারাদি হইয়া গেলে কিশোরী ধীরে ধীরে তাদের কাছে গেল—আমিও তাহার অনুগমন করিলাম। বৃদ্ধার সহিত কিশোরী যখন কথা কহিতে গেল, তখন প্রথমে সে

অত্যন্ত সন্দেহের সহিত আমাদের দু'জনকে দেখিয়া লইল—কিন্তু কিশোরীর একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল সে সহজেই লোকের সহিত আত্মীয়তা করিয়া লইতে পারে। বৃদ্ধাও ক্রমে এই বিদেশী, মিষ্টভাষী সুদর্শন যুবার উপর প্রসন্ন হইল। কিশোরী ক্রমে ক্রমে তাহাদের সমস্ত কাহিনী জানিয়া লইল। বৃদ্ধা বলিল,—"বাবুজী সহর হইতে ক্রোশখানেক দূরে একটি ছোট গ্রামে আমাদের বাড়ী. আমরা জাতে জাঠ। যত দিন আমার স্বামী জীবিত ছিল, ততদিন আমাদের বড় সুখের সংসারই ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বিঘের চাষ, দুজোড়া 'বয়েল', তা' ছাড়া গাই-মোষও ছিল। আজ তিন বছর হ'ল আমি 'বেওয়া' হইয়াছি—তারপর বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে এ পড়কির কপাল পুড়িল। এর 'শ্বশুরালে' বড় কষ্ট. শাশুড়ী বড় যন্ত্রণা দেয়, বিধবা হওয়ার পর ইহার উপর অত্যাচার বাড়িয়া গেল। তাই ভাবিলাম ছেলে "হুসিয়ার" হয়েছে ঘরে খাওয়ার কষ্ট নাই, ইহাকে আমার কাছে আনিয়া রাখি কিন্তু তখন জানিতাম না যে ইহাই আমাদের কাল হইবে। আজ ছ'মাস হো'ল যমুনা আমার কাছে এসেছে তা' এক দিনও আমাদের সুখে গেল না। যমুনা আসার পর হ'তে আমাদের গাঁয়ের 'লম্বরদারে'র বড় ছেলে কিছু ঘন ঘন আমাদের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল; তা আমি ভাবিতাম—আমাদের এ দুঃখ দুর্দ্দিনে সে আমাদের খবর লইতে আসে; তারপর এক দিন যমুনা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কাছে সব কথা বলিল। আমি তাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলাম—আর সেদিন হ'তে লম্বরদারের ছেলের বাড়ী ঢোকা বন্ধ করিয়া দিলাম। শিউরতনকে কিছু বলিলাম না, কি জানি 'যোয়ান' মানুষ রাগের মাথায় কি বলে! যতদিন বুড়া লম্বরদার বাঁচিয়া ছিল ততদিন একরকমে গেল, তারপর সেই বড় ছেলে হইল গাঁয়ের লম্বরদার, আমাদেরও বিপদের সূত্রপাত হইল। সে পথে ঘাটে যমুনাকে দেখিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল, তার পর যমুনার নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। একদিন শিউরতন কোথা হ'তে সেই সব কথা জানিয়া আমাদের খুব ভৎর্সনা করিল এবং নূতন লম্বরদারকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তার ভগিনীকে অপমান করিলে সে সহজে ছাড়িবে না—জান দিয়াও সে ইজ্জৎ রক্ষা করিবে।

"ইহার পর যমুনার উপর প্রকাশ্য অপমান বন্ধ হইল বটে, কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচার সুরু হইল। এখন প্রায়ই আমাদের গাই-মোষ খোঁয়াড়ে চালান যাইতে লাগিল, জমীজমা লইয়াও গোল বাধিল। আমাদের একখান ক্ষেত অন্যে দখল করিয়া লইল, তার কোন প্রতিকার হইল না। একদিন কি এক সামান্য অপরাধে লম্বরদার শিউরতনের এক টাকা জরিমানা করিল, শিউরতন টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে সমস্ত দিন কাছারীতে বসাইয়া রাখিল, সন্ধ্যার সময়

খবর পাইয়া আমি টাকা দিয়া তাকে ছাড়াইয়া আনি।

"তারপর আজ পনের দিন হইল সন্ধ্যার পর যমুনা কুয়া হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল, পথে লম্বরদার তাকে আটকায়, সে ভয়ে চাৎকার করিয়া উঠে, শিউরতনও সেই সময় ক্ষেতের কাজ করিয়া ফিরিতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া লম্বরদারকে বেশ ঘা কতক দিয়া যমুনাকে বাড়ী লইয়া আসে। লম্বরদার ছুটিয়া না পালাইলে একটা খুনখারাপি হওয়া অসম্ভব ছিল না। পরদিনই শুনিলাম রাত্রে লম্বরদারের বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে, 'থানেদার' সাহেব তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, —দেখিতে দেখিতে চোকীদার গাঁ ভরিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় থানেদার সাহেব শিউরতনকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—সে না কি লম্বরদারের বাড়ী হইতে ক'খানা বাসন চুরি করিয়া দিল্লীতে বেচিয়া আসিয়াছে। সব কথা শুনিয়া আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম, আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া যমুনা বলিল, 'মা-জি, এমন করে কেঁদে কি কোন উপায় হবে। এরা ত দাদাকে সরাইয়া দিল, এর পর আমাদের কে রক্ষা করিবে, এ গাঁয়ে থাকতে পারব না তার চেয়ে চল দিল্লীতে যদি কোন উপায় হয়, দাদার যদি জেল হয় তবে আর গাঁয়ে ফিরব না, দিল্লীতে খেটে খুটে খাব।' তাই হাতে যা পয়সাকড়ি ছিল লইয়া দিল্লী আসিয়াছিলাম। কিন্তু এ সহর 'সমুন্দর' কোথায় আমার বাছার সন্ধান পাইব! শেষে রামজী দয়া করলেন, পরশু আমরা ঐ পরেটাওয়ালীর দোকানে বসে আছি, এমন সময় দেখি একখানা গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া ফোয়ারার সামনে দাঁড়াইল, কত লোক ছুটিল আমরাও গেলাম, দেখি সেই গাড়ীর মধ্যে শিউরতন, বেটার হাতে পায়ে শিকল, তবু তার মুখ খানি দেখিয়া প্রাণ বাঁচিল। সে আমাকে কত 'দিলজমি' করিল, আমি ছুটিয়া তার কাছে যাইতেছিলাম, কিন্তু একটা সেপাই 'সঙ্গনের' খোঁচা দিয়া আমাকে সরাইয়া দিল—তারপর গাড়ী মেরামত হইলে তারা আমার বাছাকে লইয়া গেল। শিউরতনের মুখ খানি দেখিব বলিয়া তার পরদিনও আসিলাম, আবার দেখা হইল, আজো দেখিলাম তার বিচার না কি এখনও হয় নি, শীঘ্র হ'বে, তবু একবার করে তাকে কাছারী নিয়ে যায়।"

অশ্রুপাত করিতে করিতে বৃদ্ধা তাহার কাহিনী শেষ করিল, যমুনার দিকে চাহিলাম, তারও দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে একটা স্থির প্রতিজ্ঞা একটা দৃঢ়তার ভাব। জানি না সে কি ভাবিতেছিল। বৃদ্ধা বলিল—"বাবুজী, তোমরা বাঙ্গালী, শুনেছি তোমরা না কি সাহেবদের সঙ্গে খুব বাৎ চীত্ করতে পার, তা বলে কয়ে আমার শিউরতনকে খালাস করে দিতে পার না?" যমুনাও সেই সময়ে একদৃষ্টে আমাদের পানে চাহিল—অত্যাচারপীড়িতা অভাগিনী বিধবার সে দৃষ্টিতে কি গভীর বিষাদ, কি করুণ মিনতি!

কিশোরী বলিল—"মা-জি, তুমি কাল ঠিক এই সময়ে এখানে এস—আজ যদি তোমার ছেলের বিচার না হইয়া যায় তবে কাল আমরা এর ব্যবস্থা করব!"

(৩)

কিশোরী বাড়ী ফিরিয়াই বন্ধুবর প্রফেসর য—কে ধরিয়া বসিল, এখানে তাঁর কোন পরিচিত উকিল আছে কি না, থাকিলে এখনি তাঁর কাছে যাইতে হইবে। বন্ধুবর একটু 'স্থাবর' গোছের লোক, কিন্তু কিশোরী তাঁহাকে কিছুতেই স্থির হইতে দিল না, তখনই গাড়ী ডাকাইয়া য—বাবুর বন্ধু একটি নব্য উকীলের বাড়ী গেল। সমব্যবসায়ী কাজেই কিশোরী অতি সত্বরেই উকীল সাহেবের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইল এবং শিউরতনের মোকর্দ্দমার সমস্ত বিবরণ বলিয়া, তাঁহাকে মোকর্দ্দমা চালাইবার ভার দিল এবং তৎসঙ্গে ফিস্ দিতেও ভুলিল না উকীল সাহেব ফিস্ লইতে আপত্তি করিলে—কিশোরী অম্লানবদনে বলিল—"এ টাকা সেই বুড়ীর।"

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল—পর দিন শিউরতনের বিচার। উকীল সাহেব অভিযোগের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কাগজাতের নকল লইয়াছেন। রাত্রে কিশোরী আবার উকীলের বাড়ী গেল এবং কাগজাদি দেখিয়া তাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া আসিল তাঁদের উভয়ের মত হইল—যমুনাকে সাক্ষী মানিয়া আসল ঘটনা প্রমাণ করা। কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই রাজী হইল না, বলিল—"বাবুজি, যমুনা কেমন করিয়া অত লোকের মাঝে গিয়া এ সব কথা বলিবে! এ ছাড়া আর যদি কোন উপায় থাকে ত দেখ। আমার ত এই মত—তবে আমি বুড়ো সুড়ো মানুষ, একবার শিউরতনকেও জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে কি বলে।" উকীল সাহেব জেলে শিউরতনের সঙ্গে দেখা করিলেন —তারও ঐ কথা, "জান কবুল সেও ভাল, কিন্তু আবরু খোয়াইতে পারিব না।"

পরদিন শিউরতনের মোকর্দ্দমা উঠিল, তাহার দোষ প্রমাণ করিবার সাক্ষীর অভাব হইল না, গ্রামের তিন চার জন সাক্ষী উপস্থিত হইল, পুলিশের 'তদ্বিরে' একজন বেণিয়া আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে এই ব্যক্তিই তার কাছে ক'খানা থালা ও লোটা ইত্যাদি বেচিতে আসিয়াছিল—সে বেশ দক্ষতার সহিত শিউরতন ও চোরাই মাল সনাক্ত করিল, জেরায় তাহাকে কিছুতেই টলাইতে পারা গেল না। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শিউরতন দোষী প্রমাণিত হইল—তার তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হইল।

* * * * *

কাছারী হইতে ফিরিয়া কিশোরী ম্লানমুখে একটা আরাম কুর্চ্চিতে শুইয়া পড়িল, আজ আর তার কোন উৎসাহ নাই, তার রকম দেখিয়া আমি একটু চিন্তিত হইলাম। পাঁচটার সময় আমি বলিলাম—"দেখ, এমন করে শুয়ে থাকলে ত হবে না, বুড়ী ও যমুনা মোকর্দ্দমার খবরের জন্যে কত উৎসুক হয়ে রয়েছে, তাদের ত একটা সংবাদ দেওয়া চাই, চল, উঠ।"

একখান গাড়ী ডাকাইয়া আমরা চাঁদনীচকে "সোনেরী মসজিদের" সামনে পৌঁছিলাম। দেখি বৃদ্ধা ও অভাগিনী যমুনা শুষ্কমুখে ফোয়ারার ধারে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আমরা কাছে যাইবা মাত্র বুড়ী বলিল,—"বাবুজী—কি হ'ল?"—সে প্রশ্নে কি উদ্বেগ, কি ব্যাকুলতা! বাক্‌পটু কিশোরীর মুখে আজ আর কথা নাই—তার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমাকে দুর্ম্মুখের কাজ করিতে হইল! সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা রাস্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যমুনা বলিল "বাবুজী, তবে আমাদের কি উপায় হবে?" কি উত্তর দিব ভাবিতেছি—এমন সময় কে বলিয়া উঠিল—"খোদা মালিক হ্যায়!'—চাহিয়া দেখি একজন অন্ধ ভিখারী!

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

সারদোৎসব

নব নির্ম্মল গগণের তল
শুভ্র নীরদপুঞ্জ,
শ্বেত কাশ-ফুলে শোভে প্রান্তর,
শেফালি-রাশিতে কুঞ্জ।
বহিছে সুধীর শীতল সমীর
আকুল কুসুম-গন্ধে,
গাহে বিহঙ্গ মঙ্গল-গীতি
হরষে ললিত-ছন্দে।
ছুটিছে তটিনী সাগর-গামিনী
মুছি লয়ে ধূলি পঙ্ক,
দুলায় ধরণী শ্যামল আঁচল
—উজ্জ্বল অকলঙ্ক।
সরসে অমল কুমুদ কমল
ফুটিয়া উঠেছে রঙ্গে,
দিকে দিকে একি পুলক-বিকাশ
আজি প্রকৃতির অঙ্গে!

বিশ্বজননী আসিছে, অবনী
রচিছে পূজার অর্ঘ্য;
চরণ-পরশ লভিতে, ভূতলে
নামিয়া আসিছে স্বর্গ।
গগনে পবনে নিখিল ভুবনে
উছলে মিলনানন্দ,—
উৎসবে আজি এস ত্বরা সবে
ছাড়ি যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব!
জননী! জননী! —ওই উঠে ধ্বনি—
শারদা! বিশ্বধাত্রী!
এস মা, এস মা, সুষমারূপিণী,
চিরমঙ্গল-দাত্রী।
এস এস অয়ি আনন্দময়ি,
বিষাদ-মলিন বঙ্গে,
বিদ্যা ঋদ্ধি শক্তি সিদ্ধি
লয়ে পুন তব সঙ্গে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মুদ্রা মন্বন্তর

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময় হইতেই কোম্পানী বাহাদুর মুদ্রা-বিভ্রাটে পতিত হইয়াছিলেন। তখন কোম্পানীর মান্দ্রাজের টঙ্কশালা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। সেই মান্দ্রাজী মুদ্রা ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই চলিত। দক্ষিণাপথের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্যও উহা প্রেরিত হইত।

বাদশাহের আমলে সিক্কা টাকার প্রচলন ছিল। কোম্পানী বাহাদুর যে টাকা প্রস্তুত করিতেন সিক্কা টাকার মূল্য তাহা অপেক্ষা শতকরা ১২৷৷০ টাকা অধিক ছিল। কোম্পানী বাহাদুর সে জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন। তাই নবাব-দরবারে যথাবিধি উৎকোচ প্রদান করিয়াও তাঁহারা মুর্শিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। বাদশাহ শেষে তাঁহাদিগকে সে আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুর্শীদ কুলিখাঁ বাদশাহের ফর্ম্মান অগ্রাহ্য করিলেন এবং কোম্পানী বাহাদুরকে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার প্রদানে সম্মত হইলেন না। ইতিহাসবিশ্রুত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালায় যেমন ধান্য ও তণ্ডুল মহার্ঘ এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। মুদ্রার অবস্থাও তাহাই ঘটিয়াছিল!

বাঙ্গালা হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ইংলণ্ড প্রভৃতি নানাস্থানে চলিয়া যাইত। সেকালে বাঙ্গালার অর্থে বোম্বাই জীবিত ছিল, মান্দ্রাজের ইংরাজ-সম্প্রদায় প্রতিদিন সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছিলেন। শেষে একদিন এমন অবস্থাও আসিয়াছিল, যে দিন কোম্পানী বাহাদুর বিলাতে জানাইয়াছিলেন বাঙ্গালার কল্পবৃক্ষে আর অমৃত ফল নাই, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজে পাঠাইতে পাঠাইতেই সমুদায় নিঃশেষে ফুরাইয়াছে! *

কোম্পানী বাহাদুর তখন কেবল বাঙ্গালার নবাব ছিলেন না, তাঁহারা তখনো বাঙ্গালার বৈদেশিক বণিক। সুতরাং বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁহারাও প্রতিবৎসর বাঙ্গালার ৩০ লক্ষ মুদ্রা চীন দেশে লইয়া যাইতেন। † বাঙ্গালার মুদ্রা এইরূপে প্রতিদিন যেন মন্ত্রকুহকে উড়িয়া যাইতেছিল!

মুসলমানগণ যখন বাঙ্গালার কর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহারা শুধু রৌপ্যমুদ্রাই বুঝিতেন। সুবর্ণমুদ্রাও প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু উহা আপনার মূল্য আপনিই অনুসন্ধান করিয়া লইত—উহার কোনো নির্দ্দিষ্ট দাম ছিল না! স্বর্ণ সেকালে শুধু ভূষণাদির জন্যই অধিক ব্যবহৃত হইত; সুবর্ণমুদ্রা তাই সুবর্ণের চিরপরিবর্ত্তনশীল বাজার দরে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল না।

* Letters from the President and council of Bengal to the Court of Directors, dated 25th Aug, 1770. paras 26 and 30; the 9th march, 1772, para 22; Hickey's Bengal Gazette, 29th April, 1780; Marshman's History of India, vol. I.

† The East India Company itself, in its mercantile capacity, carried a quarter of a million sterling per annum out of Bengal to China—Rural Bengal: Hunter.

দিল্লীর মোহর, সকলগুলিই ওজনে সমান হইত বটে, কিন্তু দাম স্থির ছিল না। কখনো বা একটী মোহর ১২৲ টাকায় বিক্রী হইত, কোন দিন বা উহার দাম হইত ১৫৲ টাকা, কখনো বা ১৩।১৪ টাকাতেও মোহর পাওয়া যাইত। পয়সাও সেই রূপে বিক্রীত হইতেছিল। উহারও মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল না। প্রয়োজন অনুসারে এবং স্থানভেদে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার মূল্য নিরূপিত হইত। অনেক সময়েই রৌপ্য বা তাম্র-মুদ্রা উহার আসল মূল্য অপেক্ষা কমে চলিত! মুসলমান বাদশাহগণ তাই রৌপ্যমুদ্রার মূল্য চিরস্থির করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। কাগজে পত্রে স্থির ছিল যে একটী রৌপ্য মুদ্রা ওজনে এক সিক্কা হইবে এবং তাহার শতঅংশে ৯৮ ভাগ রূপা থাকিবে। ইহাই সেকালে আদর্শ রৌপ্যমুদ্রার রূপ ছিল।

টঙ্কশালা সংস্থাপন সেকালে রাজশক্তি-প্রতিষ্ঠার অতি আবশ্যক চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজগণ সর্ব্ববিষয়ে দিল্লীসিংহাসনের শাসন অবহিত চিত্তে মানিয়া লইতেন, তাঁহারাও স্বরাজ্য মধ্যে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। যে রাজবংশের গৌরব-সূর্য্য প্রায় অস্তমিত হইয়াছিল, সে বংশও যেমন মুদ্রা প্রস্তুত করিবার স্বাধীনতা রক্ষায় যত্নবান হইতেন, নবরাজ্য লাভ করিয়া যাঁহারা কেবল প্রতিষ্ঠা ও শক্তির প্রথম পাদপীঠ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তেমনি সর্ব্বাগ্রে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে চাহিতেন। মহারাষ্ট্রীয়-গণ যখন মাত্র দুই একটী গিরিদুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা টঙ্কশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে আসিয়া যখন বাঙ্গালার কেবল দুই চারি খানি উদ্যান ও দুই একটী গৃহ অধিকার করিয়াছিলেন, তখনই নিজের মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন বলিয়া পরামর্শ করিতে-ছিলেন।

ভারতবর্ষে তখন অনেক টঙ্কশালা ছিল। কিন্তু কোনো স্থানেই একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হইত না। তখন কোনো দুই টঙ্কশালের মুদ্রা ওজনে এবং রূপার পরিমাণে এক ছিল না; এমন কি কোনো কোনো স্থানে একই টাকশালে দুই তিন প্রকারের টাকা প্রস্তুত হইত! এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অসংখ্য মুদ্রা ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং কোনো একটী বিশুদ্ধ মুদ্রাকে অশুদ্ধ করিতে কাহাকেও অধিক বেগ পাইতে হইত না।

কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে আসিয়া যে ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার জন্য সুদ কিছু অধিক দিতেন। নগদ টাকা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে এক খণ্ড করিয়া কাগজ দিতে লাগিলেন। উহাই কোম্পানীর "নোট" নামে সুপরিচিত। সেই "নোট" যাহাতে খুব প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নের অভাব ছিল না। ইহার ফলে ভারতবর্ষের নানাস্থানে "নোট" চলিতে লাগিল। কিন্তু নোট বাজারে ভাঙ্গাইতে গেলেই অনেক সময় শতকরা ১৪ টাকা করিয়া বাটা দিতে হইত। *

* Calcutta Gazette—6th sept. 1787।

তাহার কমে নোট চলিত না! কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ নোটে বেতন পাইতেন—মুদ্রার অভাব হইয়াছিল। যদি কোনো সময়ে কোম্পানী বাহাদুর নগদ টাকায় বেতন দিতে চাহিতেন, তখন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আনন্দের রোল পড়িয়া যাইত। সেই শুভ সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই সেকালের সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। (ক্রমশ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

শরতে মা

এসেছে শরত আজি মনোরথ
পূরিবে আমার জানি;
দিকে দিকে হাস— ভরা-ফুল-রাশি
ধরায় আঁচল খানি।
নীল-নির্ম্মল— নভ উজ্জ্বল
চন্দ্র-সনাথ তারা;
পুলকে অধীর ভাসাইয়া তীর
বহে নদ-নদী-ধারা!

(২)

আজি প্রাণ চায়— আছে কে কোথায়
কাছে চাহি, যেবা দূরে,
স্নেহ-মুখ গুলি সাধ হয় তুলি'
দেখি আজি প্রাণ-পূরে!
নয়নের জল কেন উজ্জ্বল
কার কথা মনে হয়!—
যে গিয়েছে আগে, তার স্মৃতি জাগে,—
সে কোথা গো—এ সময়?

(৩)

এ সুখ-শরতে— মা আজি মরতে,
হরষে ভাসিছে ধরা;
লয়ে দুখ-রাশি— আঁখি-জলে ভাসি,
কোথা মা গো, দুখহরা!
ভরি' হেমঝারি নয়নের বারি
এনেছি মা, সযতনে;
ও যুগল-পদ— জিনি কোকনদ,
ধুয়ে দিব—সাধ মনে!

(৪)

শূন্য জীবন, শূন্য ভুবন—
এস, মা, পূর্ণ করি'!
দেবী দশভুজা জননীর পূজা—
হেরিব নয়ন ভরি'।
রবে না ক আর— প্রাণে হাহাকার,
ঘুচে যাবে সব ব্যথা;
গত জীবনের, তাপিত মনের
আছে যত মলিনতা!

(৫)

উঠে 'মা—মা' রব— জননীর স্তব
মুখরিত করি দিশি;
ধূপের সুবাস বহিছে বাতাস
সুরভিত করি নিশি।
অই মা আমার— করুণা আধার
চরণে দলিয়া অরি;—
বিশ্বজননী দানব-দলনী
হের দশায়ুধ ধরি'।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র-চিত্র।

শিবনাথ শাস্ত্রী।

মহর্ষির সময়াবধি ব্রাহ্মসমাজ যে ব্যক্তিত্বা-ভিমানী অনধীনতার বা 'Freedom'-এর আদর্শকে ধরিয়া, আমাদিগের আধুনিক আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক-জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিয়া, দেশের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনস্রোতের মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মহর্ষি কিংবা তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্র কিংবা তাঁর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, ইহাঁদের কেহই শেষ পর্য্যন্ত সেই সংকল্পের উপরে দৃঢ়ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই ; পারিলে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মমীমাংসায় ও কর্ম্মজীবনে, শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনই স্থান হইত না। কিন্তু মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই, প্রথমে যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মকে বর্জ্জন করেন, সেই যুক্তি ও বিচারের উপরে, সর্ব্ববিধ ফলাফল-ভাবনা-বিরহিত হইয়া, বিশ্বাস বা সাহস ভরে, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা দুইজনেই স্বদেশের ধর্ম্মের ও সমাজের সনাতন ভিত্তিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই, তাহার ফলে নিজেদের নূতন সমাজে ধর্ম্মের, নামে নাস্তিক্যবুদ্ধি ও স্বাধীনতার অজুহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র অরাজকতার অভ্যুদয় দেখিয়া, একান্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া, নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষির ভাঙার ভিতরেও, তাঁর প্রকৃতিতে হিন্দু-আস্তিক্যবুদ্ধি ও রক্ষণশীলতার গুণে, কতকটা সংযম বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইনি যে উপায়ে আপনার কর্ম্মের মন্দফলকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তার মধ্যেও কতকটা সংযতভাব ছিল। কেশবচন্দ্রের ভাঙার অন্তরালে হিন্দুর আস্তিক্যবুদ্ধি বা রক্ষণশীলতা ছিল না, কিন্তু খৃষ্টীয়ান্ কনফর্ম্মিষ্ট-স্বভাব-সুলভ উদ্ধত অহংবুদ্ধি ও উদ্দাম সংস্কার চেষ্টাই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাঁর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে সেরূপ কোনও সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব আদৌ ছিল না বলিয়া, তিনি যে উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাও অত্যন্ত উদ্দাম ও অসংযত হইয়া উঠে। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করিয়া, আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা বিশেষ ও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহর্ষির এই দাবীর অন্তরালে একটা সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগত শিষ্যগণের নিকটেই প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে, কেবল এদেশে নয়, সমগ্র জগতের

সমক্ষে তাঁর অনন্যসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী জাহির করিয়াছেন এবং মানবেতিহাসের প্রথমাবধি যুগে যুগে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাজনেরা এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে যেমন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার "প্রেরিত-মণ্ডলী" সেইরূপই বর্ত্তমান যুগের "নববিধানকে" প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন, নানাদিকে ও নানাভাবে, এই এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাগত গুরুপরম্পরাশ্রিত সাধনমার্গ সকলকে অভ্রান্ত নয় বলিয়া সর্ব্বপ্রকারের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা ভ্রষ্ট করিয়া, নিজেদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের জন্য সেই মর্য্যাদার দাবী করিলে, লোকে তাহা শুনিবে কেন? মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের এই অনন্যসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও সভ্য স্বীকার করিলেও, আধুনিক ভারতসমাজে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই; কখনও যে হইবে, তারও কোনওই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশের ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজ যে জটিল সমস্যাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ তার কোনও মীমাংসার পথ দেখাইতে পারেন নাই।

তবে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে এই সমস্যাকে মীমাংসার দিকে লইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি কিংবা কেশবচন্দ্র যে তাহাও পারেন নাই,—জনসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রাচীন অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, একথাও অস্বীকার করা অসম্ভব হইবে। ফল যেমন পরিপূর্ণ পকতা প্রাপ্ত হইলে, আপনিই গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া, আবার নূতন ফসলের সূত্রপাত করে; সেইরূপ যে সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজমধ্যে কোনও জটিল যুগসমস্যার উৎপত্তি হয়, সেই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ নিঃশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া আপনারাই নিজেদের ভিতরকার সত্য ও অসত্য, যুক্তি ও যুক্ত্যাভাস, কল্যাণ ও অকল্যাণকে বিশদ করিয়া তুলে এবং তখনই প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে নূতন ও অপ্রচলিতের একটা উচ্চতর সামঞ্জস্যের ভূমি প্রকাশিত হইয়া, সেই যুগ-সমস্যার প্রকৃত মীমাংসার পথটী দেখাইয়া দেয়। এই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ আপনাদের যথাযথ পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বে, কোনও কোনও দিকে তাহাদের অসঙ্গতি বা অমঙ্গল ফল দেখিয়া, যিনিই অকালে কোনও যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে যাইবেন, তাঁহার সে মীমাংসা যে অপূর্ণ ও অযৌক্তিক, উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্ভট হইবে, ইহা অনিবার্য্য। প্রশ্নটা পরিস্কাররূপে অভিব্যক্ত হইলেই তো তার সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। ইংরেজি শিক্ষা ইংরেজের শাসন, য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শ, এই সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মজীবনে ও সমাজজীবনে যে সকল প্রশ্ন জাগাইয়া তুলে, মহর্ষির কর্ম্মচেষ্টা বা কেশবচন্দ্রের জীবনযাত্রা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, তার সম্যক্ ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। সুতরাং মহর্ষি বা কেশবচন্দ্র যে এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ফলতঃ কেবল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণই যে ইহার সদুত্তর দিবার

নিষ্ফল চেষ্টা করেন', তাহাও নহে। একদিকে যেমন কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে সেরূপ দয়ানন্দ স্বামীর আর্য্যসমাজ, অল্‌কট্—ব্লাভ্যাটস্কীর থিওসফী সমাজ এবং পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি-প্রমুখ তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থান-কারিগণ, ইঁহারা সকলেই আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত "সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার" আদর্শে আমাদের নব্যশিক্ষিত সমাজে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষায় ও আচার আচরণে কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ জনগণের ভিতরেও যে যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলিতেছিল, তাহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আপন আপন সিদ্ধান্ত ও শক্তি অনুসারে এই অভিনব বিপ্লবস্রোতের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন।' আর বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস এই সমুদায় চেষ্টারই নিষ্ফলতার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

আর এই নিষ্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, একদিকে 'আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার এবং অন্যদিকে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের ও প্রাচীন সমাজের মূল' প্রকৃতি যে কি, এ জ্ঞান ইঁহাদের কাহারই ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় নাই। কি কেশবচন্দ্র, কি অলকট্ ব্লাভ্যাট্স্কী, কি শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি,—ইঁহাদের কেহই দেশের লোক-প্রকৃতি, সমাজপ্রকৃতি কিংবা পুরাগত সভ্যতা ও সাধনার প্রকৃতির উপরে,' অথবা আমা-দের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া, নিজেদের মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহারা যে পথে আমাদের বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে মীমাংসা বলা যায় কি না, সন্দেহ। মীমাংসার প্রথমে কতকগুলি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মত, সিদ্ধান্ত বা সংস্কার বা প্রতিষ্ঠান বিদ্য-মান থাকে। কোনও কারণে এ সকলে সত্য বা কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হয়। কোনও নূতন মত বা সিদ্ধান্ত, ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া, তারই প্রেরণায় এ সন্দেহের উৎপত্তি হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচারের বা যথাযোগ্য-প্রমাণপ্রতিষ্ঠা-সমালোচনার বা criticism এর আবশ্যক হয়। এই বিচার ক্রমে নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ-নিষ্পত্তির পথ দেখাইয়া দেয়। এই পথে যাইয়াই পরিণামে চূড়ান্ত মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হয়। এরূপ মীমাংসার জন্য বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই সম্যক জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র, কি থিওসফী সমাজের নেতৃবর্গ, কি তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানকারিগণ, ইঁহাদের কেহই এ জ্ঞানলাভ করেন নাই। কেশবচন্দ্রের স্বদেশের মূল প্রকৃতির এবং বিশেষতঃ স্বজাতির ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের কোনও বিশেষ জ্ঞান ছিল না। থাকিলে তিনি খৃষ্টীয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীয়ান্ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া, বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে যাইতেন না। হিন্দু যুগে যুগে, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির নিত্য বিরোধকে মিটাইয়াছেন এবং এইরূপে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও দেববাদ হইতে ক্রমে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মতত্ত্ব; উপ-নিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আধ্যাত্মিক

কল্পনাভূষিত পৌরাণিকী ভক্তিপন্থার ভিতর দিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, পন্থাবিভাগ ও অধিকারি-ভেদের সাহায্যে, আপনার ধর্ম্মের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের মধ্যেই সনাতন বিশ্ব-ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছেন,—কেশবচন্দ্র স্বদেশের সাধনার এই অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্বটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। তাঁর অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক কল্পনাবলে তিনি যে ত্রিবিধ যোগ-প্রণালীর বর্ণনা করেন, * তাহাতে মানব-সমাজের ধর্ম্মের ও সাধনার ইতিহাসের সাধারণ বিবর্ত্তন-তত্ত্বটী অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু স্বদেশের সাধনার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনপ্রণালীর বিচার করিবার সময়, কেশবচন্দ্র সম্যগ্‌রূপে এই তত্ত্বটী প্রয়োগ করেন নাই বা অকালে দেহত্যাগ করিয়া, করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফলতঃ একরূপ অন্তিমদশায় আসিয়াই তিনি এই যোগ-তত্ত্বটী লাভ করেন। তাঁর "নব-বিধান" ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমাদের বর্ত্তমান যুগসমস্যার একটা উদ্ভট মীমাংসা করিয়া বসিয়াছিল। আর সে মীমাংসার প্রতিষ্ঠায়, কেশবচন্দ্র স্বদেশের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-পন্থাকে উপেক্ষা করিয়া, খৃষ্টীয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীয়ানী অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেন। তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষবাদ, ঈশ্বরানু-প্রাণতা-বাদ ও শ্রীদরবার, এ সকলই ইহুদীয় ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে এ সকলের কোনওই সম্পর্ক নাই। আর ইহাই কেশবচন্দ্রের মীমাংসা-চেষ্টার নিষ্ফলতার কারণ। কেশবচন্দ্রের মীমাংসার চেষ্টা যেমন খৃষ্টীয়শাস্ত্রে ও খৃষ্টীয়ান্ ইতিহাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাকে যেমন প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়বাদ বলা যাইতে পারে; * সেইরূপ দয়ানন্দের আর্য্যসমাজের, অল্‌কট্ ব্লাভ্যাট্‌স্কীর থিওসফীর এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নব্য হিন্দুগণের মীমাংসাও বস্তুতঃ য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবেই একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্‌কট্ ব্লাভ্যাট্‌স্কীর তো কথাই নাই, দয়ানন্দ স্বামী বা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও স্বদেশের ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগসমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল মীমাংসাই প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও লৌকিক ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সকল অকাল-চেষ্টিত মীমাংসার নিষ্ফলতার প্রধান কারণই এই যে, এ সকলে যে সমস্যা-ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পর্য্যন্ত সে সমস্যাটীই নিঃশেষভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যাটীকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াই, তার মীমাংসার পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

* Yoga: Objective, Subjective, and Universal.

* কেশবচন্দ্রের "নববিধানের" একটা হিন্দু দিক্‌ও আছে, এখানে তার কথা বলিতেছি না।

রাজা দেবীদাস।*

(সমালোচনা)

প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে সত্যরঞ্জন বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত উপন্যাস "চক্ষুদানে"র সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে "সত্যরঞ্জন বাবুর পরিণত লেখনী বঙ্গ সাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা তাঁহার সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।" কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে সত্যবাবু আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিতে পারিবেন, তাহা আমরা তখন অনুমান করিতে পারি নাই। সত্যবাবুর নবপ্রকাশিত উপন্যাস "দেবীদাসে" অল্পদিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই উপন্যাস সত্যবাবুকে বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

যখন "সোণার বাঙ্‌লা" কলঙ্কের কালিমায় ম্লান হয় নাই, হতাশা ও অবসাদে জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই, যখন "বাঙালীর ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, বাটিভরা দুধ, আশাভরা হৃদয়, মনভরা উৎসাহ" বাঙলার সেই সময়ের জীবন্তচিত্র—"দেবীদাসে" উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। যখন ধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙালী ব্রাহ্মণ, পুত্রের প্রাণবধ পর্য্যন্ত অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া নিজের ধর্ম্মের জন্য অটলভাবে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতেন, যখন নিম্নশ্রেণীস্থ সামান্য ভৃত্য প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ পুত্রের প্রাণবলি দিতেও ইতস্ততঃ করিত না, যখন পতিব্রতার আদর্শস্থানীয়া বাঙালী রমণী যবনীপ্রণয়মুগ্ধ বিধর্ম্মী স্বামীর কল্যাণের জন্যও সকল দুঃখ, সকল বিপদ, সকল নির্য্যাতন অকাতরে সহ্য করিতেন, যখন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া মানের জন্য বাঙালী বীর জলে স্থলে অসিহস্তে অনন্তশয্যায় শয়ন করিতে ভীত হইত না, যখন অনশনক্লিষ্ট প্রজার জন্য জমিদার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, অভিভাবকের কর্ত্তব্যপালন করিতেন, যখন বুদ্ধিকৌশলে, চতুরতায় রাজনীতির জ্ঞানে বাঙালী কর্ম্মচারী জগতের বিস্ময় স্থল ছিল, যখন বাঙালীর হস্তে সুদৃঢ় শত্রুবিমর্দ্দন "লাঠি", মনে ক্ষুরধার বুদ্ধি, হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের পুণ্যপ্রস্রবণ, সেই সময়ের পুণ্য কাহিনীতে "দেবীদাস" পরিপূর্ণ!

"দেবীদাসে"—"দেবীদাসের" মত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ প্রজাপালক আদর্শ জমিদারের, "উমার" মত পতিগতপ্রাণা প্রেমপীযূষময়ী দেবীপ্রতিমার, "নারায়ণীর" মত ভগবৎ-পরায়ণা মাতৃমূর্ত্তির, "তারার" মত বুদ্ধিমতী প্রেমময়ী—তেজোময়ী প্রকৃত "সহধর্ম্মিণীর", "মাধব দত্তের" মত বিচিত্র বুদ্ধিশালী

* শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় এম্, এ, প্রণীত। মূল্য ১।০

অক্লান্তকর্ম্মা কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর, "ভোলানাথের" মত প্রভুগতপ্রাণ ত্যাগশীল আদর্শ ভৃত্যের, "স্বামী দয়ানন্দের" মত ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরোপকারী, কর্ম্মনিষ্ঠ লোক শিক্ষকের, "করিম" ও "সদানন্দ গোস্বামী"র মত প্রেমবিহ্বল ভগবদ্ভক্তের সুমহান্ চিত্র দেখিতে দেখিতে বারবার অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিতে ইচ্ছা করে, হায় কি পাপে বাঙালী মহত্ত্বের এমন অতুলস্বর্গ হইতে নীচতা, স্বার্থপরতা, ভীরুতার এমন অন্ধ নরকে অধঃপতিত হইল! অবশ্য গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে দেশে "দেবীদাস" জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশেই স্বদেশদ্রোহী, স্বধর্ম্মবিদ্বেষী, আত্মসুখসর্ব্বস্ব—"ইস্‌মাইলখাঁ" ও জন্মিয়াছিল, যে দেশে নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি "ভোলা নাপিত" জন্মিয়াছিল, সেই দেশেই স্বজাতিদ্রোহী স্বার্থপর পাপাত্মা "অম্বিকাচরণে"ও অভাব হয় নাই। দেখিয়া "দেবীদাসের" মত কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে "যদি আজ ঐকতান বাদনের সমবেত ঝঙ্কারের ন্যায় সকল হৃদয়-তন্ত্রী একযোগে বাজিয়া উঠিত—!" কিন্তু সে যে হইবার নহে। তথাপি গ্রন্থকারের সাধনা সফল হইয়াছে। "দেবীদাস" পড়িতে পড়িতে বাঙালীর হতাশামগ্ন অবসন্ন হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য বাঙালীর প্রাচীনগৌরব, মহিমা, বীর্য্য, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে দেখিতে আশায় ও আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। মনে হয়, বাঙালী চিরদিন হীন ছিল না—হীনতা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি নহে।

"দেবীদাস" সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার সহিত ঐতিহাসিক সত্য বিজড়িত। পশ্চিম বঙ্গ ম্লেচ্ছ পদানত হইবার পরেও বরেন্দ্রভূমি বহুদিন আপনার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়াছিল। "এক টাকিয়ার" জমিদারেরা, রাজা সীতারাম, রাজা কেদার রায়, রাজা দেবীদাস তাহার উদাহরণ। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সুন্দর, ভাষা বিশুদ্ধ সুমিষ্ট আবেগময়ী, বর্ণনা মনোহর। গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রবাহিত স্বদেশ প্রীতির অমৃতধারাস্পর্শে সমস্ত গ্রন্থ পবিত্রীকৃত। নানা বিচিত্র ঘটনার নিপুণ সমাবেশে গ্রন্থখানি এমন চিত্তকর্ষক যে একবার ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পুস্তক সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ক্ষান্ত হওয়া দুরূহ। পুস্তকের কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি নাই একথা বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়; কিন্তু সে ত্রুটি এত সামান্য যে তাহার আলোচনা করিয়া, আমরা "মক্ষিকা"—বৃত্তির অপবাদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

পরিশেষে আমাদের আন্তরিক বাসনা, বাঙালীর আগতপ্রায় বাৎসরিক মহাশক্তির উদ্বোধনের, দিনে তাহার ঘরে ঘরে বাঙালী-জীবনের এই শক্তি, জ্ঞান, বীরত্ব ও প্রেমের পুণ্যচিত্র বিরাজিত হইয়া যেন তাহাকে আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল করে।

শ্রীসমালোচক

সমালোচনা।

বনতুলসী—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা। কতকগুলি ধর্ম্মমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। শুভক্ষণে কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহার পর হইতেই বাঙলা-ভাষায় এই ধরণের কবিতা সমাদর লাভ করিয়াছে। তার পর 'কান্ত কবি' স্বর্গীয় রজনীকান্তের 'অমৃত' আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে। বন-তুলসীর গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-বিরচিত শতদলের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম—তাহাতে মধুও মিশিয়াছিল—সম্প্রতি তিনি 'বনতুলসী' চয়ন করিয়া ভারতীর পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজা সার্থক হউক! আমরা এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি মহাপুরুষ-গণের যে বাণী ছন্দোবদ্ধ করিয়া, নিজ ভক্ত-হৃদয়ের সুরভি মিশাইয়া এ পূজার ডালি সাজাইয়াছেন, আশা করি, তাহা মানব-হৃদয়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ আনয়ন করিবে

রেখাক্ষর বর্ণমালা—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত।

যে দিন বঙ্গদর্শনে পূজ্যপাদ প্রবীণ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' পাঠ করিলাম, সে দিন আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি নাই। সমালোচ্য পুস্তক খানি তাহারই পুনর্ম্মুদ্রণ। মনে পড়ে বাল্য-কালে পুরাতন ভারতীতে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই রেখাক্ষর বর্ণমালা পড়িয়াছিলাম। বর্ত্তমান রেখাক্ষর তাহারই পরিণত সংস্করণ—দ্বিজেন্দ্র বাবুর বহুবর্ষের একাগ্র সাধনার ফল। সাধারণ পুস্তকের মত ইহার সমালোচনা চলে না। ইংরাজীতে বলে—"The taste of the pudding lies in the eating" আজকালকার দিনে বাঙলা ভাষার রেখাক্ষরের বিশেষ প্রয়োজন—যদি উপযুক্ত শিষ্যের হাতে পড়িয়া এই রেখাক্ষর কাজে লাগিয়া যায়, তবেই দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই কঠোর সাধনা সার্থক হইবে। এই পুস্তক সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারতীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'বাল্যকথায়' যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কত রকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখিলে তার মর্য্যাদা বোঝা যায় না।" বাস্তবিকই ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। কবির বহুদিনের পরিত্যক্তা কাব্যলক্ষ্মী এই কঠোর বিষয়কেও তাঁর কলা সৌন্দর্য্যে সাজাইতে ছাড়েন নাই—অভিমানিনী নিজের মান রাখিতে পারেন নাই—কবির আদরের আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনিই আসিয়াছেন। তবে আমাদের দুঃখ, কবি কি আমাদের তাঁর কেবল রেখাতেই সন্তুষ্ট রাখিতে চা'ন? তিনি যে অসাধারণ চিত্র-কর! সে চিত্র সৌন্দর্য্য হইতে আমরা চিরদিনই কি বঞ্চিত থাকিব?

অচলায়তন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বার আনা।

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের চেষ্টা হইয়াছিল—সমাজ-গঠন

মানবধর্ম্ম শাস্ত্র সেই চেষ্টার ফল। সমাজে যতদিন প্রাণ ছিল, গতি ছিল—অর্থাৎ যত দিন আমরা অচল জীবন্ত ছিলাম, ততদিন আমাদের সমাজ বেশ ভাল ভাবেই তাহার আদর্শের পথে চলিয়াছিল। কিন্তু নিয়মের দোষই এই যে, সে মানুষকে খর্ব্ব করিয়া আপনাকে প্রধান করে। তাহার ফলে মানুষের মনকে সে ছাঁচে ঢালিয়া কঠিন, জমাট করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের ঋষিগণ ইহা জানিতেন—তাই তাঁহারা সমাজের মধ্যে একদলকে সর্ব্ব সংস্কার হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, কিন্তু কালধর্ম্মে যখন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধোগতি হইল—তখন তাঁহারা এই মানসিক স্বাধীনতা হারাইলেন,—তখন উপায় উদ্দেশ্যের আসন পাইল—তখন নিয়ম পালনই হইল আদর্শ এবং আচার, ব্রত, তাহাদের সহস্র শিকড় দিয়া সমাজ-মন্দির বেষ্টন করিয়া ধরিল—সেই পুণ্য আশ্রম নিয়ম-প্রাচীরে বদ্ধ 'অচলায়তনে' পরিণত হইল। কবিবর রবীন্দ্রনাথ আজ সেই অচলায়তনের চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, আজ আমরা আমাদের চারিদিকে যে আচার, নিয়ম, ব্রত মন্ত্র তন্ত্রের উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ বিযুক্ত করিয়া, বাহিরের মুক্ত বায়ুর পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছি, কবিবর তাঁহার এই অভিনব নাটকে তাহারই ফলাফল অঙ্কিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতন ও গুরুদেবের আগমনের সংবাদও আনিয়াছেন। ভারতবর্ষ যতদিন তাহার পাহাড় ও সমুদ্রের দুর্লঙ্ঘ্য বেষ্টনের মধ্যে কেবল মাত্র আপনাকে লইয়াই ছিল—তত দিন কিছু আসিয়া যায় নাই—কিন্তু যখন পাহাড়ের বাধা না মানিয়া, সমুদ্রের বক্ষেরই উপর দিয়া নব নব জাতি তাহাদের নবীন তেজ লইয়া এই প্রবীণের গৃহে প্রবেশ করিল, এখনই তাহার বিপদ। গত কয়েক শতাব্দী হইতে এই বাহিরের আঘাতেই ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। যে সত্যকে সে এত দিন নিয়মের কঠিন শ্রীঘরে আবদ্ধ করিয়া অপমান করিয়াছিল—আজ তাহার হিসাব নিকাসের দিন—অচলায়তনের প্রাচীর আর টেঁকে না। কবিবর তাহারই সংবাদ আনিয়াছেন।

আমাদের মনে কিন্তু এই নাটক পড়িতে পড়িতে একটা প্রশ্ন বার বার উঠিতে ছিল। আশা করি, কবি আমাদের এ প্রশ্নের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। জগতের মধ্যে ভারতের সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—এমন কি মিসরীর সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর। গ্রীক্, রোমান জাতি সকল তাহার অনেক পরে সভ্যতার আলোক লাভ করে। কিন্তু আজ কোথায় মিসর, কোথায় গ্রীক, কোথায় বা রোমান? হিন্দুজাতি যেমন অবস্থাতেই হউক, টিকিয়া আছে। যে বিজয়িনী শক্তি স্পেন হইতে সমরকন্দ পর্য্যন্ত এক শতাব্দীর মধ্যে জয় করিয়া প্রাচীন জাতি সকলকে লোপের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল—সেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও ইসলাম সভ্যতা, কত কষ্টে কয়েক শতাব্দীর অশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এবং কয়েক শতাব্দী ব্যাপী একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও ত কই হিন্দুসমাজের উপর স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই? ইহার কারণ কি আমাদের এই অচলায়তনের সুদৃঢ় প্রাচীর নয়? ইহাকে অন্যভাবে না দেখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা বলিলে কি অন্যায় হয়?

—

৪৪৭ পৃষ্ঠা হইতে, ৪৫৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসে

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

পঞ্চম অধ্যায়

নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজের অবস্থা,
ঈশ্বর পুরীর নবদ্বীপে আগমন।
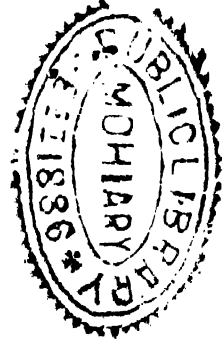
নিমাইর যশঃপ্রভা যখন দেশদেশান্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, তখন নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসমাজ মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তখন জ্ঞানালোচনায় উন্মত্ত, সাধারণ লোক "ধনপুত্র-রসে" মত্ত; ভক্তি তখন নবদ্বীপ হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক বৈষ্ণবমাত্র নবদ্বীপে ভক্তির আলো প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানদর্পিত নবদ্বীপ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

বৈষ্ণবগণ সংখ্যায় অতি সামান্য ছিলেন। সাধারণের নিকট তাঁহাদের মান-প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। তাহাতেও তাঁহারা তত ক্ষুণ্ণ হইতেন না, যদি স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ সাধনভজন করিয়া তাঁহারা সাধারণের নিকট গণনার ভাগী না হইতেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া, সকলে তাঁহাদিগকে পরিহাস করিত। কেহ বলিত, "জ্ঞানমার্গ ছাড়িয়া আবার সাধনা কি আছে? উন্মত্তের মত এ বেটারা নাচে কেন?" কেহ বলিত, "ভাগবত ত কতই পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে ত নৃত্যগীতের ব্যবস্থা নাই?" কেহ বলিত, "ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য হয় না? তবে এ বেটারা নাচিয়া কাঁদিয়া ডাক্ ছাড়ে কেন? এদের অত্যাচারে যে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া দায় হইল!" এই সমস্ত কথা বৈষ্ণব-দ্বেষিগণ পথে ঘাটে বলিয়া বেড়াইত;—শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহারা আপনাদিগের আরাধ্য দেবতার নিকট মনোকষ্ট জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করিতেন "হে ভগবান, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছ। আজি ধর্ম্ম ম্লান, আজি তোমার নামকীর্ত্তন শুনিলে লোকে বিরক্ত হয় এবং নাসিকা কুঞ্চিত করে। আজি মিথ্যা-জ্ঞান ও বিষয়-লালসা তোমার প্রীতিভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত। হে প্রভু, তুমি আবার আবির্ভূত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম স্থাপন কর।"

অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন। সাধারণের অবজ্ঞা ও

পরিহাসের কথা সকল বৈষ্ণবেই তাঁহাকে আসিয়া বলিত। প্রতিবিধানে অক্ষম আচার্য্য অহর্নিশ ভগবানের অবতার-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিতেন। দুই এক সময়ে আচার্য্যের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। একদিন সকল বৈষ্ণব মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করতঃ বিদ্বেষীগণের তীব্র পরিহাস ও অবজ্ঞার কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। সেদিন আচার্য্যের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সব সংহার করিব। ঐ দেখ, ঐ চক্রপাণি এদিকে আসিতেছেন; এবার নবদ্বীপে কি ব্যাপার হয়, সকলে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আমি যদি কৃষ্ণের দাস হই, যদি আমার নাম অদ্বৈত হয়, তবে কৃষ্ণকে তোমাদের সকলেরই নয়নগোচর করাইব। ভাই সব, দিন কয়েক মাত্র আর অপেক্ষা কর, এই নবদ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে।"

ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবসমাজের দুঃখ দূর করিবেন—ক্ষুদ্রসমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত ধর্ম্মকে দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত করিবেন—প্রতি বৈষ্ণবের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। প্রত্যেকেই সোৎসুক-মনে ভগবানের অবতার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আচার্য্যের কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল, ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইল।

নিমাইর বাহ্যিক ব্যবহারে ভক্তিপ্রবণতার লেশমাত্র লক্ষিত হইত না। নিমাইর পাণ্ডিত্যগর্ব্ব বৈষ্ণবদিগকে ব্যথিত করিত। নিমাইর সহিত যাহার দেখা হইত, তাহারই সহিত তাঁহার তর্ক বাধিয়া যাইত। কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল সংসার-বিরাগী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেই নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাঁহারা জবাব করিতে না পারিলে, উপহাস করিতেন। এইজন্য বৈষ্ণবগণ দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। তবু তাঁহারা সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপকান্তি দূর হইতে দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। কোন্ এক অদৃশ্য সূত্রদ্বারা নিমাই তাঁহাদের আশা ও প্রীতির সহিত আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। নিমাইর কৃষ্ণভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইতেন, কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখে যাইয়াই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "হায়, হায়! বিদ্যামোহে অন্ধ হইয়া বৃথাই জীবন অতিবাহিত করিলে!" নির্জ্জনে সকলে প্রার্থনা করিতেন, "হে কৃষ্ণ, জগন্নাথ-পুত্রকে তোমার প্রেমে উন্মত্ত কর; তোমার রসে সে নিরবধি নিমগ্ন হইয়া থাকুক; তাহার দুর্লভ সঙ্গ আমাদিগকে দান কর।"

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোনও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। বৈষ্ণবসঙ্গলাভের জন্য নিমাইর বিন্দুমাত্র স্পৃহাও পরিলক্ষিত হয় নাই।

এই সময়ে নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠের জন্য নবদ্বীপে আগমন করিতেন। অনেকে গঙ্গাবাসের জন্যও তথায় আসিতেন। চট্টগ্রামের অনেকগুলি লোক তখন নবদ্বীপে বাস করিতেন; তাঁহারা সকলেই সংসারবিরত ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে

বৈষ্ণবগণের প্রিয় মুকুন্দদত্ত নামক একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। মুকুন্দ নবদ্বীপে এক টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই মুকুন্দকে দেখিয়াছিলেন এবং প্রথম দর্শন অবধিই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন। মুকুন্দ দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। নিমাই মুকুন্দের পলায়ন লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেন। একদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় নিমাই অলক্ষিতে আসিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। নিমাই বলিলেন, "প্রত্যহ আমাকে দেখিয়াই তুমি পলায়ন কর, আজি আমার সহিত শাস্ত্রালোচনা না করিয়া কেমন যাও দেখিব।" মুকুন্দ পাণ্ডিত্যেও হীন ছিলেন না। নিরুপায় হইয়া ভাবিলেন, "নিমাই ত ব্যাকরণের পণ্ডিত, অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আজি ইঁহাকে এমনি ঠকাইব যে, আর কখনও তর্ক করিতে না আইসেন।" তখন দুই পণ্ডিতে ঘোর রণ বাধিয়া গেল। নিমাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মুকুন্দকে পরাস্ত করিলেন। মুকুন্দ নিমাইর চরণধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, "এই অমানুষী প্রতিভার অধিকারী যদি কখনও কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গ কখনও ছাড়িব না।"

একদিন বৈষ্ণব গদাধর পণ্ডিতকে পথে দেখিতে পাইয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, মুক্তি কাহাকে বলে, বল দেখি?" গদাধর কহিলেন "আত্যন্তিক দুঃখনাশের নাম

নিমাই তর্কের তূণীর উন্মুক্ত করিয়া গদাধরের সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। গদাধর মনে মনে পলাইবার সংকল্প করিতেছিলেন দেখিয়া, নিমাই তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরে এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইর তর্কপ্রবৃত্তি স্বতঃই আত্মসঙ্কোচ লাভ করিল। এই মহাপুরুষের নাম ঈশ্বরপুরী। তিনি যখন অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন, তখন ভক্তচূড়ামণি আচার্য্য তাঁহার সামান্য বেশ সত্বেও তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। আচার্য্য পরম সমাদরে মহাপুরুষের সংকার করিলেন। সুকণ্ঠ মুকুন্দ তখনই কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সুধাবর্ষী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নজলে মৃত্তিকা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন পথিমধ্যে নিমাইর সিদ্ধপুরুষো-চিত কলেবর দেখিতে পাইয়া ঈশ্বরপুরী অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতঃ নিমাইর পরিচয় পাইয়া পুরী কহিলেন, "তুমিই সেই!" নিমাই তাঁহাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন, এবং নিরতিশয় যত্নের সহিত অতিথিসৎকার করিলেন। পুরী কতিপয় মাস গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিমাই তথায় প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন পুরী নিমাইকে কহিলেন, "তুমি পরম পণ্ডিত। আমি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক

একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছি। তুমি তাহা শুনিয়া, তাহাতে যে যে দোষ আছে, আমাকে বল।” নিমাই কহিলেন “ভক্ত-রচিত কৃষ্ণ-চরিত্রে যে দোষ দর্শন করে, সে পাপী;

ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেন নয়,
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি, তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বলে ‘বিষ্ণায়,’ ‘বিষ্ণবে’ বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥

“মূর্খো বদতি বিষ্ণায়, ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥”

পুরীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিমাই তাঁহার সহিত পুস্তকের দোষগুণের আলোচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গদেশ গমন; পত্নী-বিয়োগ ও দ্বিতীয়বার বিবাহ

নিমাইর পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান দেখিবার অভিলাষেই হউক, অথবা অন্য কারণবশতঃই হউক, নিমাই বঙ্গদেশভ্রমণে অভিলাষ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে জননীর অনুমতি গ্রহণ করতঃ কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া নিমাই প্রথমে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে লোকনাথ গোস্বামীর গৃহে উপনীত হইলেন। তথা হইতে পদ্মা-তীরে উপনীত হইয়া পদ্মার তরঙ্গ-শোভা দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। পদ্মাতীরে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া—নিমাই বঙ্গ-দেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন। বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার যশ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কৃত টীপ্পনি বঙ্গদেশের অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপে যাইবার আয়োজন করিতেছিল—এমন সময় তিনি স্বয়ং বঙ্গদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, দলে দলে বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। গৃহস্থগণ নানাবিধ উপায়ন সহ দলে দলে তাঁহার দর্শনার্থ উপস্থিত হইল। তাঁহার বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। নিমাইর অধ্যাপনার এমনি সুন্দর রীতি ছিল যে, দুই মাসের মধ্যেই এই সমস্ত শিষ্যের অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিল। অনেকে তাঁহার নিকট উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। নিমাই স্বদেশে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে-ছেন, এমন সময় তপন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া বড়ই অশান্তিতে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদিন স্বপ্নে নিমাই পণ্ডিতের শরণ গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়া, তিনি আসিয়া নিমাইর শরণাপন্ন হইলেন। নিমাই নামযজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে কৃষ্ণের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন এবং বারাণসী গমন করতঃ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। তপন মিশ্র প্রেমপুলকিত শরীরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অচিরেই নিমাইও শিষ্য ও অনুরক্ত জনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাগমনকালে শিষ্যগণ তাঁহাকে নানাবিধ ধন সামগ্রী উপহার দিয়াছিলেন।

নিমাইর অনুপস্থিতিকালে পতিবিরহ-

বিধুরা লক্ষ্মী দেবী, এক দিন সর্পদষ্টা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এ সংবাদ নিমাই জানিতে পারেন নাই। গৃহে প্রত্যাগত হইবা-মাত্র জননীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া নিমাই বুঝিতে পারিলেন, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সমস্ত অবগত হইয়া জননীকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন—

"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা, মোহ এব হি কারণম্।"

পুত্রের সান্ত্বনায় শচী দেবী শোক সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

পুনরায় নিমাই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন—পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহ তাঁহার ছাত্রগণের অধ্যয়নে মুখরিত হইয়া উঠিল। তথায় দলে দলে নূতন ছাত্রের সমাগম হইতে লাগিল। নিমাই শিষ্যগণকে শাস্ত্রবিধি পালন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন এবং কেহ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন। তিলক ধারণ না করিয়া যদি কেহ বিদ্যালয়ে আসিত, তাহা হইলে তাহাকে এমন লজ্জা দিতেন যে, আর কখনও সে সেরূপ করিতে সাহসী হইত না।

বালসুলভ চপলতা তখনও নিমাইকে পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তিনি তদ্দেশ-প্রচলিত কথনভঙ্গী শিখিয়া আসিয়া-ছিলেন। নবদ্বীপে পূর্ব্ববঙ্গবাসী কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেই, তদ্দেশীয় কথা বলিয়া নিমাই তাঁহাকে উপহাস করিতেন। শ্রীহট্ট-বাসী দেখিলে তাঁহার পরিহাসের আর সীমা থাকিত না। ক্রুদ্ধ শ্রীহট্টবাসিগণ তখন নিমাইর পৈতৃক বাসস্থানের উল্লেখ করিয়া বলিতেন "তুমি কোন্ দেশী, কও তো? তোমার বাপ মা কার জন্ম শ্রীহট্টে নয়? তোমার চৌদ্দ পুরুষ শ্রীহট্টবাসী।" নিমাই তাহাদিগকে না চটাইয়া ক্ষান্ত হইতেন না। অবশেষে যখন তাহারা গালি দিতে দিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত, তখন তিনি নিরস্ত হইতেন। এহেন চপল নিমাই স্ত্রী লোকের সহিত কখনও পরিহাস করেন নাই।

এদিকে পুত্রবৎসলা শচীদেবী পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক হইলেন। নবদ্বীপে সনাতন পণ্ডিত নামক একজন সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ছিলেন। তাঁহার পদবী ছিল রাজ-পণ্ডিত। তিনি সচ্চরিত্র, কুটুম্ব-পরিপোষক, সরলস্বভাব, উদার, বিষ্ণুভক্ত ও আতিথেয় ছিলেন। তাঁহার বংশগৌরব প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া নামে তাঁহার একটী কন্যা ছিলেন। কন্যাটি পরমা সুন্দরী, বিনীতা ও মধুর-প্রকৃতি ছিল। গঙ্গার ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া, শচী তাঁহার সহিত নিমাইর বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেন। কাশীনাথ মিশ্র ঘটক হইয়া সনাতন মিশ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। সনাতন সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান নামে নিমাইর হিতৈষী একব্যক্তি একাকীই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে পরম সমারোহের সহিত নিমাইর দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হইল। নবপরিণীতা ভার্য্যাসহ নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

গয়া-গমন ও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিকট

প্রার্থনা করিতেন, নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হন। এতদিনে তাঁহাদের প্রার্থনা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণের পর দুই বৎসর যাবৎ নিমাই নিজের টোলে অধ্যাপনা করিলেন দুই বৎসর পরে একবিংশ বর্ষ বয়সে জননীর অনুমতি লইয়া পিতৃকার্য্য সম্পাদনার্থে নিমাই গয়া গমন করিলেন। এই গয়াগমনে নিমাইএর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; জ্ঞানদর্পিত যুবক তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভক্তির যাজনা আরম্ভ করেন।

কতিপয় শিষ্যের সহিত নিমাই গয়াগমনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন। মন্দারপর্ব্বতে যখন তাঁহারা উপনীত হইলেন, তখন নিমাইর সুস্থ সবল শরীরে জ্বর প্রকাশ পাইল। সঙ্গিগণ জ্বরের প্রাবল্য দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু নিমাই এক বিপ্রের চরণোদক পান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। ব্যাধির উপশম হইবার পর নিমাই সশিষ্য পুনরায় গয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গয়ায় প্রবিষ্ট হইয়া নিমাই প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলেন, তৎপরে গদাধরের পাদপদ্ম দেখিবার জন্য চক্রবেড়ের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তথায় যে দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। নিমাই দেখিলেন, বিপ্রগণবেষ্টিত পাদপদ্মের উপরিভাগে ভক্তদত্ত মালারাশি পর্ব্বতপ্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তদুপরি কত গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ, বস্ত্রালঙ্কার শোভা পাইতেছে। দিব্যপরিচ্ছদধারী বিপ্রগণ পাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উচ্চরবে গান করিতেছেন—

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিল যে চরণ
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন।
বলিশিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ,
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥

নিমাইর ভাবস্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যুগযুগান্তর হইতে, সহস্র সহস্র যোজন দূর হইতে আগত কোটী কোটী লোক যে চরণ দেখিয়া ও অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে তাহা দেখিতে পাইয়া নিমাই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা ছুটিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমাইর এই ভক্তিবিহ্বল অবস্থায়, বিধাতার ইচ্ছায় ভক্তচূড়ামণি ঈশ্বরপুরী তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াই নিমাই ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। পুরী প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার দেহমন আজি হইতে সমস্তই আপনার পদে সমর্পণ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত করিয়া দিন।" পুরী কহিলেন, "তোমাকে দেখিয়া কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের সুখ লাভ হয়। নবদ্বীপে সেই দেখা অবধি আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই।" বহুক্ষণ পুরীর সহিত প্রেমালাপের পর, নিমাই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধাদি করিতে প্রস্থান করিলেন। ফল্গুতীর্থে বালুকাপিণ্ড দান করিয়া, গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর শ্রীরাম-গয়া, যুধিষ্ঠির-গয়া, ভীম-গয়া, প্রভৃতি ষোড়শ গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পুনরায় স্নান করত

গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলেন এবং দিব্য মাল্য চন্দন দ্বারা বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজা করিলেন।

পিতৃকার্য্য সম্পন্ন হইল; কিন্তু নিমাইর মন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন ঈশ্বরপুরী তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলে, তিনি মন্ত্রদীক্ষা যাচ্ঞা করিলেন। পুরী আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিমাই কহিলেন, "আমার দেহমন সমস্তই আপনাকে উৎসর্গ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমরসে অভিষিক্ত করুন।" পুরী প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের শরীর উভয়ের অশ্রুতে সিক্ত হইল।

দীক্ষার পর নিমাই কিছুদিন গয়াধামে অবস্থিতি করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর, ও দিবানিশি ইষ্টদেবতার ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিদ্যাগৌরব বিলুপ্ত হইল, চপলতা অন্তর্হিত হইল। নিমাই ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিয়া উঠিতেন, এবং কখনও "কৃষ্ণরে, বাপরে" বলিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেন। শিষ্যগণ শঙ্কিত হইয়া নানাবিধ প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া নিমাই কহিলেন, "তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর; আমি আর সংসারে ফিরিব না, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণের অন্বেষণে আমি মথুরা যাইব।" শিষ্যগণ অতি কষ্টে তখন তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিমাই মথুরার পথে প্রস্থান করিলেন। "কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়" বলিয়া সকরুণ রবে রোদন করিতে করিতে নিমাই মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে এক দৈববাণী তাঁহাকে মথুরা যাইতে নিষেধ করিল এবং নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল। নিমাই আবাসে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত

ব্রহ্ম-জ্ঞান

ধর্ম্মের স্তরভেদ

সভ্যাসভ্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীর মানব-সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম সকল তুলনা করিয়া বিচার করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, একেশ্বরের অনুভূতি লাভ করিবার পূর্ব্বে, মানব-মণ্ডলীকে সোপানের পর সোপান এইরূপ বহু সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যদিও নিম্নতর সোপানের মানবসমাজে উন্নততর সোপানের লোক সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়, এমন কি, দেশ-বিশেষে সোপান সকলের পরস্পর সংমিশ্রণও দৃষ্ট হয়, তথাপি সাধারণভাবে এ কথা সত্য যে, ভূবিদ্যার স্তরের ন্যায় মানব-জগতে ধর্ম্ম বিকাশের মোটামুটি চারিটি সোপান বা স্তর নির্দ্দেশ করা যায়। নিম্নতম সোপানের মানব-

সমাজ শিশুর তুল্য। শিশুগণ যেমন আপনাদিগের খেলার পুতুল প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ কল্পনা করিয়া, কখনও বা তাহাদিগকে সাদরে চুম্বন করে, কখনও বা ক্রোধভরে তাহাদিগকে প্রহারও করে, সেইরূপ ধর্ম্মের নিম্নতম সোপানের অসভ্য মানব-মণ্ডলীও ইতর প্রাণী, অথবা বৃক্ষ এবং কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদিকে মানুষের ন্যায়, অথবা ততোধিক শক্তিশালী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া তাহাদের পূজা করে, যুদ্ধ বা বিপদ-সময়ে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশায় আহারাদি ভোগ্যবস্তু দ্বারা তাহাদিগের সৎকার করে, এবং সে আশায় বঞ্চিত হইলে, রোষভরে তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। এই স্তরের মানবগণ পরলোকগত আপনাদিগের পিতৃপুরুষাদিরও পূজা করিয়া থাকে। এই স্তরকে প্রাণবাদ (Animism) বলা যায়। সুসভ্য জাতির মধ্যেও এই স্তরের নিদর্শন দৃষ্ট হয়,—যেমন রোমীয়দিগের মেনিজ (Manes), অথবা আমাদিগের অগ্নিষ্বাত্ত, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত পিতৃগণ। জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকে জড়বস্তুর জড়ত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় হয়, তখন তাহারা জড়পূজা হইতে বিরত হইয়া, জড়বস্তু হইতে পৃথক্ অথচ প্রত্যেক জড়বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতা, অথবা জড়-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা করিয়া থাকে। এই স্তরকে বহুদেববাদ (Polytheism) বলা যায়। আবার জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকে যখন দেখিতে পায় যে, জড়বস্তু সকল অথবা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সকল কার্য্যকারণাদি বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, তখন তাহারা সেই অধিষ্ঠাতৃদেবগণেরও পরস্পর মিলন কল্পনা করিয়া, একেশ্বরবাদের দিকে আরও অগ্রসর হয়; যথা,—বৈদিক বিশ্বদেব, এবং হিরণ্যগর্ভের কল্পনা। সেই সঙ্গেই লোকে যখন যে দেবতাতে বিশেষ আসক্ত হয়, সেই দেবতাকেই দেবগণের প্রধান বা দেবরাজ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে (Henotheism)। পরিশেষে জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা লোক যখন প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়, তখন দেখিতে পায় যে, বিশ্বসংসার একই জ্ঞান, একই ইচ্ছা, একই শক্তি দ্বারা নিয়মিত। এই শেষ সোপানের নাম একেশ্বরবাদ (Monotheism)। একেশ্বরবাদের ক্রমবিকাশেই আরও একটি উন্নততর স্তরের আভাস লাভ হয়। তাহাকে সর্ব্বাত্মবাদ, অথবা ব্রহ্মবাদ বলা যায়। প্রাচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যে স্পিনোজা (Spinoza), হেগেল্ (Hegel), প্রভৃতি তাহার আভাস লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে সুফিগণ তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বেদান্তেই সেই সর্ব্বাত্মবাদের বিশেষ বিকাশ।

ঋগ্বেদে ধর্ম্মস্তরের নিদর্শন

আমাদের ঋগ্বেদ ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন বিষয়ে জগতের বিশেষ সহায় হইয়াছে। ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশের পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি স্তর এবং তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ ঋগ্বেদে অতি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা পাঠকের নিকটে প্রদর্শন করিতেছি। (১) জড়ের জীবত্ব কল্পনার দৃষ্টান্ত :—লাঙ্গলকৃত খনিত রেখা বা সীতার স্তব—"অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বংদা

মহেত্বা যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি"। ৬। 'হে সুভগে সীতে, আমাদের অভিমুখী হও। আমরা তোমার বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদের ইষ্টধন এবং সুফল প্রদান কর'। ৪।৫৭।৬।

জল ও নদীর স্তব :—"অপোদেবীরূপঃ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ"। ১৮। 'দেবীরূপ জলকে আহ্বান করি, আমাদের গাভী সকল যাহা পান করে। যে জল সিন্ধুরূপে প্রবাহিত, তাহার জন্য হবিঃ প্রদান কর্ত্তব্য'। ১-২৩-১৮। ঘৃতের স্তব :—"বয়ং নাম প্রব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্‌যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ"। ২। 'আমরা ঘৃতের নাম কীর্ত্তন করিব। এ যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা তাহাকে ধারণ করিব'। ৪-৫৮-২ এতদ্ভিন্ন মণ্ডুক বা ভেকের স্তব সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে দ্রষ্টব্য। পিতৃপুরুষদিগের স্তবেরও দৃষ্টান্ত আমরা ঋগ্বেদে পাইতেছি। "ইমং যম প্রস্তরমাহি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সর বিদানঃ"। 'হে যম, এই যজ্ঞারম্ভে আসিয়া উপবেশন কর। অঙ্গিরা নামক পিতৃগণকে সঙ্গে আন'। ৪। "অঙ্গিরসো নঃ পিতরোনবগ্ব। অথর্বাণোভৃগবঃ সোম্যাসঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।" 'অঙ্গিরা অথর্ব্বন্ এবং ভৃগু আমাদের পিতৃগণ আসিয়াছেন। তাঁহারা সোমপানেরা অধিকারী। সেই যজ্ঞভোক্তাগণ আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিয়া, আমরাও কল্যাণযুক্ত হই'। ১০-১৪-৪,৬। এই সকলই প্রাণবাদের (Animism) দৃষ্টান্ত।

(২) ঋগ্বেদে বহু দেববাদের (Polytheism) নিদর্শনেরও অভাব নাই। কোথাও তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ (৮-৩৫-৩) "বিশ্বদেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈঃ" (৩×১১=৩৩), কোথাও বা তিন হাজার তিন শত উনচল্লিশ জন দেবতার উল্লেখ—"ত্রীণিশতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যান্"—'তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয়জন দেবগণ অগ্নির পূজা করিলেন'। কোথাও বা সমস্ত দেবগণ একযোগে বিশ্বদেব নামে পূজিত হইয়াছেন :—"আমাসশ্চর্ষনীধৃতো বিশ্বে দেবাস আগত"। 'হে কৃষকদিগের পালক বিশ্বদেবগণ, আগমন কর'। ১-৩-৭। আবার কোথাও বা বরুণ (৫-৮৫ সূক্ত), কোথাও বা ইন্দ্র (২-১২-১), কোথাও বা অগ্নি (৩-৫৫-৪) সমস্ত দেবগণের রাজা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন (Henotheism); পরিশেষে আমরা দেখিতে পাই, দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বৈদিক ঋষির মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। "অস্তি স্বিন্নু বীর্য্যং তত্র ইন্দ্র ন স্বিদস্তি"—'হে ইন্দ্র তোমার সে প্রকার শক্তি কি আছে, না নাই' (৬-১৮-৩), "যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহসেতি ঘোরমুতে মাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনং,"—'সেই ভয়ঙ্কর (দেব) যাঁহার সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়, এবং কেহ বা বলে তিনি নাই, সেই ইন্দ্রে বিশ্বাস কর' (২ ১২-৫)। "নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উত্ব আহ কইং দদর্শকমভীষ্টবাম্,"—'নেম (ঋষি) বলেন ইন্দ্র নাই, কে তাহাকে দেখিয়াছে আমরা কাহার স্তব করিব?'

(৩) আমরা ঋগ্বেদে ঈশ্বরের একত্বের (Monotheism) অনুভূতিরও বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। "মহৎ দেবানাম-

সুরত্বমেকং" 'দেবগণের মহাশক্তি একই' (৩-৫৫-১)। আবার অগ্নিকেই বরুণমিত্র এবং সমস্ত দেবগণরূপে সম্বোধন করা হইতেছে। "ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধঃ। ত্বে বিশ্বে সংসাপুত্র দেবাস্তমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্ত্যায়॥" ৫-৩-১। 'হে অগ্নি, তুমিই জন্মিয়া বরুণ হও, প্রজ্বলিত হইয়া মিত্র হও; হে বলের পুত্র, তুমিই বিশ্বদেবগণ তুমিই হব্যদায়ী লোকের নিকটে ইন্দ্র।' আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, বৈদিক ঋষি ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার অজ্ঞানতা অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বর যে এক, জন্ম-রহিত, এবং দুর্বিজ্ঞেয়, তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন:—"প্রথম জায়মানকে (যিনি প্রথমে বিশ্বরূপে আবির্ভূত) কে দেখিয়াছে? যিনি স্বয়ং অস্থি-শূন্য হইয়া অস্থিযুক্তকে ধারণ করেন। প্রাণ ও শোণিত ভূমি হইতে, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? বিদ্বানের নিকটে কে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল? আমি অজ্ঞানী, মনদ্বারা ধারণ করিতে পারি না, এই সকল প্রশ্ন দেবগণের নিকটেও নিগূঢ়। আমি অজ্ঞানী, জানি না, তাই জানিবার জন্য বিদ্বান্ কবি-দিগকে জিজ্ঞাসা করি—যিনি এই ছয় লোককে স্তম্ভিত করিয়া আছেন, সেই জন্মরহিতের রূপ কি এক? (১-১৬৪-৪,৫,৬)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই ঈশ্বরের একত্ব বৈদিক ঋষিদিগের নিকট বিশেষভাবে প্রকাশিত। ৮১ সূক্তের দেবতা বিশ্বকর্ম্মা, ঋষিরও নাম বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মা নামে ঈশ্বরকে আমাদিগের পিতা বলা হইতেছে, ঋষি বলা হইতেছে, এবং বিশ্বভুবনকে এক মহাযজ্ঞ কল্পনা করিয়া তাহার হোতা বা হোমকর্ত্তা বলা হইতেছে। 'য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ"। সেই বিশ্বকর্ম্মাকে "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ" বলা হইতেছে। "সেই এক দেব দ্যাবাভূমির জনয়িতা"—"দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ" (৮১-১,৩)। ৮২ সূক্তেরও দেবতা এবং ঋষি বিশ্বকর্ম্মা। তাহাতে সৃষ্টির সম্বন্ধে যে আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম। "বিশ্বকর্ম্মার মন বৃহৎ, আত্মা বৃহৎ, তিনি ধাতা, বিধাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্ঞ। কেহ বলে তিনি সপ্তঋষির পরবর্ত্তী স্থানে একাকী আছেন।" এ স্থলে আমরা পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকদিগের তটস্থ (Extramundane) ঈশ্বরবাদের কতক আভাস পাইতেছি। "বিশ্বকর্ম্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্"। "যত্রা সপ্তঋষিন্পর একমাহু"। আবার বিশ্বকর্ম্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা-রূপে বিশ্বভুবনের সকল স্থান অবগত আছেন, যিনি এক হইয়াও দেবগণের নামধারণ করেন, অপর সকল ভুবনের লোক তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।" "যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সম্প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।" ৩। যাহা দ্যুলোকের অতীত, পৃথিবীরও অতীত, অসুর দেবগণেরও অতীত, জল সকল এমন কি প্রথম গর্ভধারণ করিয়াছিল, যাহার মধ্যে সমস্ত দেবগণ আপনাদিগকে মিলিত দেখিয়াছিলেন। জল সকল সেই প্রথম গর্ভধারণ করিয়াছিল,

যাহার মধ্যে দেবগণ সকলে মিলিত, যাহা সেই জন্মরহিতের নাভিদেশে এক হইয়া অবস্থিত, তাহাতেই বিশ্বভুবনও অবস্থিত। তাহাকে তোমরা জান না, যাহা হইতে এ সকলের জন্ম। তোমাদের অন্তর অন্যপ্রকার হইয়াছে। লোক সকল কুজ্ঝাটিকাচ্ছন্ন-দৃষ্টি হইয়া নানাপ্রকার কল্পনা করে, তাহারা আহারাদি দ্বারা আপন প্রাণের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়া স্তবস্তুতি উচ্চারণকরতঃ বিচরণ করে। "পরো দিবাপর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি। কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে"। ৪। "তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ"। ৬। ন তং বিদাথ য ইমা জজানা ন্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি"। ৭-৮২-১০। আবার দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্ত যাহার ঋষি হিরণ্যগর্ভ, এবং দেবতা ক (কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম) নামক প্রজাপতি, তাহাতে উক্ত হইতেছে, 'পূর্ব্বে এক হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। তিনি জাত মাত্র ভূত সকলের একাধিপতি হইলেন। তিনিই দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। হবি দ্বারা কোন্ দেবতার পূজা করিব? যিনি আত্মা দান করিয়াছেন, বল দান করিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সমস্ত দেবগণ পালন করেন, অমৃত যাহার ছায়াস্বরূপ, মৃত্যু যাহার অধীন, কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? যিনি স্বীয় শক্তিবলে ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত প্রাণিজগতের একমাত্র রাজা, যিনি এই দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলের নিয়ন্তা, হবি দ্বারা কোন্ দেবতার পূজা করিব? হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন অন্য কেহ এই সৃষ্ট বিশ্ব নিয়মিত করিতে পারে না'' ।*

আবার বলা হইতেছে—সুপর্ণ বা পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছেন। জ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাঁহার একত্ব সত্ত্বেও বাক্য (বা কল্পনা) দ্বারা তাঁহাকে নানারূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। "সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি"। (১০-১১৪-৫)। "সেই গমনশীল আকাশস্থ সুপর্ণ বা পক্ষী অর্থাৎ সূর্য্যকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এবং অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। তিনি এক হইলেও পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহুনামে অভিহিত করেন।" "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"। গরুড় যে বিষ্ণুর (সূর্য্যের) বাহন, এই গল্পের মূল এখানে দৃষ্ট হয়। পরিশেষে আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের অনুবাদ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। এই সূক্তের দেবতা পরমেষ্ঠী বা পরমাত্মা, ঋষি প্রজাপতি। ইহাতে পাঠক দেখিবেন, বৈদিক ঋষিগণ সর্ব্বাত্মবাদেরও সোপানে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন—

---

* "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ১। য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ২। যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ৩। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব"। ১০-১২১-১০

১। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ (বা যাহা নাই) ও ছিল না, সৎ (বা যাহা আছে) ও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, বহু বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণকারী কি ছিল ? কোথায় কাহার স্থান ছিল ? দুর্গম গম্ভীর মেঘ কি তখন ছিল ?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না। অহোরাত্রের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ু ব্যতিরেকে আপনার মধ্যে আপনি জীবিত ছিলেন। তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না।

৩। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এই সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্ব্বব্যাপী আবৃত ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্ম গ্রহণ করিল।

৪। প্রথমে মন হইতে কামের উদ্ভব। তাহা হইতেই প্রথম সৃষ্টিবীজ জন্মিল। জ্ঞানিগণ বুদ্ধিবলে হৃদয়ে আলোচনা করিয়া অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন।

রেতোধা (জন্মদাতা পুরুষ) উৎপন্ন হইল। মহিমা সকল উৎপন্ন হইল। তাহাদের রশ্মি উভয় পার্শ্বে অধোঃ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত হইল। স্বধা (অন্ন) নিম্নদিকে এবং প্রয়তি (জীব) উর্দ্ধদিকে রহিল।

৬। কেই বা তত্ত্ব জানে ? কেই বা বলিবে ? কোথা হইতে এ সকল জন্মিল ? কোথা হইতে এই বিবিধ সৃষ্টি হইল ? এই বিবিধ সৃষ্টির পরে দেবতারা হইয়াছেন। যাহা হইতে এ সকল হইয়াছে, কে তাহা জানে ? (পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সৃষ্টির পরে দেবগণের উৎপত্তি বলা হইতেছে)।

৭। এই বিবিধ সৃষ্টি যাহা হইতে হইল, অথবা কেহ ইহার বিধান করিয়াছেন কি করেন নাই, যিনি ইহার অধ্যক্ষরূপে পরমধামে আছেন, হয় ত তিনিই জানেন। কি জানি তিনিও যদি না জানেন! এ স্থলে আমরা সাঙ্খ্য প্রকৃতি-পুরুষ-কল্পনারও আভাস পাইতেছি।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, তিন হাজার তিন শত উনচল্লিশ সংখ্যক দেবতা পরিণামে ঋগ্বেদেই এক অধ্যক্ষে পরিণত হইয়াছে। বলা হইতেছে "অজায়তৈকং"

---

* নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। রেতোধা আসন্মহিমান আসন্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥ (১২৯)

"সেই একই (সৃষ্টিরূপে) জন্ম গ্রহণ করিলেন।" "অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন" এই বিবিধ সৃষ্টির পরে দেবগণ উৎপন্ন (অর্থাৎ দেবগণ কল্পিতমাত্র)।

বৃহদারণ্যকে দেবগণের বিস্তার এবং সঙ্কোচ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাকল্য ব্রাহ্মণে বিদগ্ধ শাকল্য প্রশ্ন করিতেছেন, "দেবগণ কত সংখ্যক" ? তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বৈশ্বদেব শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বলিতেছেন, "ত্রয়শ্চ ত্রীচশতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা। (৩৩০০+ ৩৩০০০=৩৬৩০০)। আবার বিদগ্ধ প্রশ্ন করিলেন, "দেবগণ কত সংখ্যক ?" যাজ্ঞবাল্ক্য বলিলেন "ত্রয়স্ত্রিংশৎ" (৩৩)। সেই প্রশ্ন পুনরায় করিলে পর, তিনি বলিলেন, "ষট্" পুনরায় করিলে পর তিনি বলিলেন "ত্রয়ঃ" (৩)। আবার প্রশ্ন করিলে পর বলিলেন, "দুই"।শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "এক"। বিদগ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন সেই তেত্রিশ হাজার তেত্রিশ শত দেবতা কে কে? যাজ্ঞবাল্ক্য উত্তর করিলেন এ সকল দেবগণের মহিমা (বা বিভূতি) মাত্র। বস্তুতঃ দেবগণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ বা তেত্রিশ। আবার প্রশ্ন হইল, "সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ কে কে ?" তাহার উত্তরে বলিলেন, "আটটি বসু, এগারটি রুদ্র, বারটি আদিত্য এই একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি। (প্রশ্ন) আটটি বসু কে ? (উত্তর) অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা, এবং নক্ষত্রগণ। (প্রশ্ন) একাদশ রুদ্র কে ? (উত্তর) মনুষ্যের মধ্যে দশটি প্রাণ অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, এবং আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের একাদশ। যখন ইহারা এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন লোককে রোদন করায়, এ জন্য ইহাদের নাম রুদ্র। (প্রশ্ন) ইন্দ্র কে এবং প্রজাপতি কে ? (উত্তর) স্তনয়িত্নু (মেঘগর্জ্জন)ই ইন্দ্র, যজ্ঞ—প্রজাপতি। স্তনয়িত্নু কে? অশনি বা বিদ্যুৎ। যজ্ঞ কে? পশুগণই যজ্ঞ অর্থাৎ পশুবধ দ্বারাই যজ্ঞ সাধিত হয়। যজ্ঞের অন্য কোন রূপ নাই। (প্রশ্ন) ছয় জন কে ? (উত্তর) অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং দ্যুলোক (প্রশ্ন) তিনজন দেব কে ? (উত্তর লোকত্রয় অর্থাৎ পৃথিবী এবং অগ্নি একত্রে এক লোক, অন্তরীক্ষ এবং বায়ু একত্রে দ্বিতীয় লোক, এবং দ্যুলোক ও আদিত্য একত্রে তৃতীয় লোক। (প্রশ্ন) দুইজন দেব কে ? (উত্তর) অন্ন এবং প্রাণ (প্রশ্ন) একজন দেব কে ? প্রাণ অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ ব্রহ্ম। সর্ব্বাত্মকত্বহেতু যাহাকে মহৎ বা ব্রহ্ম বলা হয়। ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, শাকল্য ব্রাহ্মণে দেবতাগণের সঙ্কোচ এবং বিস্তার-বিষয়ক সংখ্যা, এবং তাঁহাদের স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে। প্রাণ বা ব্রহ্মরূপেই দেবগণের একত্ব। ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রভৃতি ক্রমে দেবগণ এক প্রাণের অন্তর্ভুক্ত। আবার সেই এক প্রাণই অনন্ত সংখ্যাতে সর্ব্বরূপে বিস্তৃত। এইরূপে প্রাণই এক এবং অনন্ত, প্রাণই তেত্রিশ প্রভৃতি অবান্তর সংখ্যাযুক্ত। পৃ—৬৭৭। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, বহু দেববাদের সহিত একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের চেষ্টা বৈদিক কাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত। ইহার ফলে আমাদের দেশে বহুদেববাদের সহিত একেশ্বরবাদের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ সংঘটিত

হইয়াছে, যাহার সূত্রপাত ঋগ্বেদে আমরা প্রথম দেখিতে পাই। তাহাই পরিবর্ত্তিত আকারে অদ্যাপি আমাদের দেশে প্রচলিত। আমাদের শাস্ত্র সকল সর্ব্বত্রই এই মিশ্রণেরই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বেহার-চিত্র

ভিখারী মণ্ডর

(বেহারের কৃষক)

পিতৃমাতৃহীন ভিখারী বাল্যকাল হইতে দেশ বিদেশে জরিপের কাজে শিকল টানিয়া টানিয়া বহুকাল পরে পূর্ণ যৌবনে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। ক্রমাগত জরিপ-বিভাগের অস্থির জীবনযাপনে উত্ত্যক্ত হইয়া, শান্তি ও বিশ্রামের জন্য সে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

রহিমপুরে যেখানে তাহার পৈতৃক বাসস্থানের ভগ্ন স্তূপ পতিত ছিল, জমিদারকে কিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া প্রথমতঃ ভিখারী সেইখানে তাহার গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিল। অল্প দিনেই ভিখারীর ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইল।

ভিখারী যে দিন অসহায় অবস্থায় কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্য না পাইয়া সজলনেত্রে তাহার পৈতৃক বাসভবন ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে দিন কেহ তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও কর্ত্তব্য মনে করে নাই। কিন্তু এক্ষণে ভিখারী "বেশ দুপয়সা" উপার্জ্জন করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তাহার বন্ধুবান্ধবের অভাব রহিল না। প্রতিদিন সায়াহ্নে হাস্যে, আলাপে, সঙ্গীতে, তাম্রকূটধূমে তাহার ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূরিত হইতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বের কথা যাহাই হউক, এবার ভিখারীর বন্ধুবর্গকে অকৃতজ্ঞতার অপবাদ দিবার কোনই উপায় ছিল না। ভিখারীর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অভিভাবকবর্গ তাহাকে স্বল্পমূল্য তাম্রকূটের পরিবর্ত্তে প্রতিদিন এত প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য উপদেশ দান করিয়া যাইতেন যে, অভিভূত ভিখারী সময়ে সময়ে এই গুরুভার স্নেহঋণ পরিশোধের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

তাঁহাদেরই পরামর্শ ও প্ররোচনায় নবাগত ভিখারী অচিরেই নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটী পিতৃহীনা সুন্দরী বালিকার পাণিগ্রহণ করিল।

কিন্তু উপার্জ্জনের উপায় না করিয়া, অধিক দিন পরিবার লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা যায় না। বন্ধুবর্গ পরামর্শ দিলেন, এ স্থলে তহসিলদার সাহেবকে ধরিয়া কিছু জমি সংগ্রহ করাই সুযুক্তি। বলা বাহুল্য, ভিখারীর পৈতৃক জমি খাজানা না দেওয়ায়, ইতিপূর্ব্বেই 'সরকারে' বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে

ভিখারী গ্রামের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্ হোরিল সাহু, বাউলী সিংহ এবং মুন্সী দাম্‌ড়িলালকে সঙ্গে লইয়া জমিদারের 'ভাণ্ডারায়' তহসিলদার সাহেবের 'হুজুরে' হাজির হইল।

তহসিলদার সাহেব তখন 'বিস্তারার' উপর খাতাপত্র সাজাইয়া কার্য্যারম্ভের অভিপ্রায়ে মনোযোগ দিয়া নিজের বস্ত্রপ্রান্তের সাহায্যে তাঁহার ভগ্নদণ্ড চশমা খানির স্বচ্ছতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। মুন্সী দাম্‌ড়ি-লালকে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেয়া খবর মুন্সীজি ?" মুন্সীজি করজোড়ে বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "হুজুরকে মুলাকাত; আউর কেয়া ?" বলিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুন্সীজি ধীরে ধীরে তহসিলদার সাহেবের মসী-মলিন 'বিস্তারার' একপ্রান্তে নিজের স্বল্পভার 'তশরিফা' স্থাপন করিলেন। ভিখারী অন্যান্য সঙ্গীদের সহিত সম্মুখে মাটির উপর বসিল।

মুন্সীজি একে একে সকলের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বাউলী সিংকে কহিলেন, "আজ এৎনা ভোরে কেয়া খবর বাবু বাউলী সিং ?" বাউলী ভিখারীকে ঠেলা দিয়া কহিল, "আরে কঁহো না তহসিলদার সাহেবকো ভিখারী।" কিন্তু ভিখারী বেচারা কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

তখন হোরিল সাহু করজোড় করিয়া তহসিলদারকে কহিল, "হুজুরকো খেয়াল হোগা, রহিমপুরমে এক বুড্‌ঢা রাইয়ৎ থা—জোরাবর মণ্ডর—।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া তহসিলদার কহিলেন, "হাঁ হাঁ জোরাবর। বহুত জমানে কি বাত হুয়ি" হোরিল তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, এই ভিখারী জোরাবরেরই পুত্র। বহুকাল দেশে ছিল না। এক্ষণে 'সার্ভেতে' কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেশে আসিয়াছে। যাহাতে তাহার 'পরবরিস্' হয়, সে উপায় হুজুরকে করিয়া দিতে হইবে। তহসিলদার সাহেব তাঁহার সুবিন্যস্ত গুল্ফশ্রেণীর অন্তরাল হইতে নির্ম্মল দন্তরাজির ঈষৎ আভা প্রকাশিত করিয়া কহিলেন, "সার্ভেমে ? ওঃ তব্ তো বহুত্ কামাইস হোগা ! কয় বিঘা খেত লেওগে ভিখারী ?" ভিখারী বিনীতভাবে বলিল, "দশ বিঘা হইলেই কোন প্রকারে তাহার চলিয়া যাইবে।"

"দশ বিঘা ?" বলিয়া তহসিলদার সাহেব কিঞ্চিৎ চিন্তামগ্নের ভাব দেখাইলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, দশ বিঘা বন্দোবস্ত কর্ দেঙ্গে। মালগুজারি তো জান্‌তে হোওগে ?" ভিখারী অজ্ঞতাসূচক ঘাড় নাড়িল।

মুন্সী দাম্‌ড়িলালের দিকে চাহিয়া তহসিল-দার বলিলেন, "আপ্‌কো তো কুল্‌হাল্ মালুম হৈ। ইস্‌কো আচ্ছা কর্‌কে সমঝা তো দিজিয়ে মুন্সীজি, জমিনকে মালগুজারি নগদ পাঁচ রোপেয়া বিঘা আর পান্‌সের ঘিউ। সেওয়ায় ইস্‌কে পাটোয়ারিকে 'মাঙ্গন', 'হুজ্‌তানা' 'ফরচানা' 'রসিদানা', 'হোলি-খেলাই', 'দোয়াত পুজাই', 'দুরগা পুজাই' 'কয়ালকে তৌলাই', 'চৌকিদারী', 'হুকু-মত্', 'মদত', 'বিয়াহ-দানি', 'ভোজনি', 'নজরানা', 'চৌঠ', ইসব তো হইয়ে হৈ। সেওয়া ইস্‌কে জব জৈসা সরকারসে হুকুম হোয়।" মুন্সীজি ভিখারীকে সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া তহসিলদার

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আউর সেলামি?" তহসিলদার হাস্য করিয়া বলিলেন "সো তো আপ্‌কো বাথুবি মালুম হোগা। সেলামি সম্‌ঝিয়ে কুছ্‌ভি নহি। মালিক কো সেলামি ১০৲ রোপেয়া বিঘা, আউর হামারা তো জান্‌তেই হোঙ্গে উসিকো আধা।"

সেলামি ও খাজানার বিপুল তালিকা শুনিয়া ভিখারী শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে গোপনে হোরিলকে এ কথা জানাইল। হোরিল অপাঙ্গে একটু চতুর হাসি হাসিয়া ইসারায় তাহাকে জানাইল যে, এ জন্য তাহার কোন চিন্তা নাই, সে সমস্তই ঠিক করিয়া দিবে।

হোরিল তহসিলদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ জমিন তহসিলদার সাহেব?" হাসিয়া তহসিলদার বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই। জমি সকলের সেরা। আসল জমি যার নাম। তোমাদের গ্রামের সেই ভাত্তু কাহারের জমি। বেটা গত বৎসর হইতে ফেরার। অনেকে সে জমির জন্য উমেদার হইয়াছিল। কিন্তু কাহাকেও দিই নাই। জেরাবর অনেক দিনের পুরাতন প্রজা ছিল বলিয়াই, তাহার পুত্রের উপর এতটা অনুগ্রহ করিতেছি।"

মুন্সী দাম্‌ড়িলাল গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ আলবৎ। জমিন্ তো নেহাইত্ উমদা!" ভিখারী আবার গোপনে হোরিলকে বলিল, "খাজানা আর কিছু কমাইয়া দিলে তাহার জমি লইতে কোনই আপত্তি নাই।" হোরিল বিনীতভাবে এ কথা তহসিলদার সাহেবকে জানাইল।

হাসিয়া তহসিলদার বলিলেন, "জমি ত আমার নিজের নহে। মালিক যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে ত আর আমার কমাইবার সাধ্য নাই। তবে এক কাজ কর না কেন? "বাটাইয়া" লও না কেন? যে বৎসর যেমন ফসল হইবে, সে বৎসর তেমনি খাজানা। অর্দ্ধেক ফসল তোমার, অর্দ্ধেক জমিদারের। ইহাতে ত আর লোকসান নাই।" কথাটা ভিখারীর মন্দ লাগিল না। ভিখারী "বাটাইয়া" লইতেই সম্মত হইল।

মুন্সী দাম্‌ড়িলাল কাগজপত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তখনি কবুলিয়ৎ লিখিত হইল এবং কবুলিয়তের উপর ভিখারীর 'আঙ্গুঠায় ছাপ' লওয়া লইল। অপরাহ্ণে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টারি করিয়া দিয়া এবং মালিক ও তহসিলদার সাহেবের সেলামি, মুন্সী দাম্‌ড়িলালের তহরির, হিতৈষী বন্ধুবর্গের পানভোজনব্যয়, রেজিষ্টারী আফিসের খরচা প্রভৃতিতে বহুদিনের কষ্টসঞ্চিত থলিয়াটীর ভার যথেষ্ট লঘু করিয়া সফল-মনোরথ ভিখারী পাট্টা লইয়া হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিল।

২

ভিখারীর হৃদয়ে রোম্যাণ্টিক কাব্যরস না থাকিলেও, সে তাহার সুন্দরী যুবতী পত্নীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার মুখ চাহিয়া ভিখারী কৃষিকার্য্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিল। পরিশ্রমের ফলে ভিখারীর সুদীর্ঘ পরিপুষ্ট শস্যগুচ্ছ তাহার প্রতিবেশিগণের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিল। সুমধুর প্রভাতবায়ু-তাড়িত সেই হরিৎশস্য-সিন্ধুর আন্দোলিত তরঙ্গরাজি দেখিতে দেখিতে নিরক্ষর ভিখারীর সরল হৃদয় আশায় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিত।

এক এক দিন আহারান্তে জ্যোৎস্নালোকিত অঙ্গনতলে বসিয়া গল্প করিতে করিতে সে বুধিয়াকেও এই আনন্দের অংশভাগী না করিয়া থাকিতে পারিত না। এবারকার ফসল বেচিয়া সে কিরূপ সাড়ী ও অলঙ্কারে সুন্দরী বুধিয়াকে সাজাইবে, এ কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ-স্বর আনন্দে গদগদ্ হইয়া উঠিত। শুনিতে শুনিতে বুধিয়ারও বিশাল নয়নে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না থাকিয়া থাকিয়া হীরকের মত জ্বলিয়া উঠিত।

এমনি করিয়া আশায় ও আনন্দে ছয় মাস কাটিয়া গেল। শস্যরাজি সুপক হইল। ভিখারী সমস্ত দিন শস্য কাটিতে এবং সমস্ত রাত্রি শস্যক্ষেত্রে মঞ্চের উপর জাগিয়া শস্য রক্ষা করিতে লাগিল। ৭।৮ দিনে সমস্ত শস্য কাটা হইয়া গেল। বুধিয়ার সাহায্যে ভিখারী সুন্দর করিয়া 'খলিহান' প্রস্তুত করিয়াছিল। সুপরিচ্ছন্ন, সুশোভিত আঙ্গন-তলে স্তূপাকার শস্যরাশি কল্পনার স্বর্ণমন্দিরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

কিন্তু জমিদারের অংশ জমিদারকে 'বাঁটিয়া' দিবার পূর্ব্বে খলিহান হইতে শস্য উঠাইয়া আনিবার উপায় ছিল না। কেহ কিছু সরাইতেছে কি না, দেখিবার জন্য জমিদারের পক্ষ হইতে চৌকিদার নিযুক্ত ছিল।

কিছু দিন পরে জমিদারের অংশ বুঝিয়া লইবার জন্য খাতাপত্র, পেয়াদা, তুলাদণ্ড, আমীন, 'কয়াল' প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া তহসিলদার সাহেব মহাসমারোহে গ্রামে শুভাগমন করিলেন। একে একে সকল বাটাইদারের শস্য ওজন হইতে লাগিল। তৃতীয় দিনে তহসিলদার সাহেব সপারিষদ ভিখারীর খলিহানে দর্শন দিলেন। ভিখারীর সমুন্নত শস্য-স্তূপ দেখিয়া তহসিলদার সাহেব যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কেয়ারে বোলানা? কেইসা উম্‌দা জমিন।" ভিখারী করজোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। কয়াল দেখিতে দেখিতে সমস্ত শস্য ওজন করিয়া ফেলিল। ওজনে সমস্ত শস্য ২০০মণ হইল। ওজন শেষ হইলে, কয়াল জমিদারের অংশ তৌল করিতে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু এবারকার ওজনে এক এক মণে এত অধিক শস্য উঠিতে লাগিল যে দেখিয়া প্রথমটা ভিখারী নিতান্ত বিস্মিত হইল। ব্যাপার কি বুঝিবার চেষ্টায় অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সে দেখিল যে, পূর্ব্বে যে মণ দিয়া শস্য ওজন করা হইতেছিল এক্ষণে তাহা দিয়া ওজন করা হইতেছে না। অনেকক্ষণ নূতন লৌহ-পরিমাপকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সসঙ্কোচে ভিখারী বলিল "ই কেয়া একমণ হায়্ কয়াল সাহেব?" দাঁত মুখ খিচাইয়া কয়াল বলিল "তব্ কেয়া চার্ মণ হায়?"

নিকটবর্ত্তী 'খাটিয়া'য় বসিয়া তহসিলদার সাহেব খাতায় ওজন লিখিতেছিলেন। ভিখারী তাঁহার নিকট গিয়া বিনীতভাবে বলিল "হুজুর, পহিলে জিস্‌সে ওজন হুয়া, উসিসে ওজন কিয়া যায়।" শুনিয়া তহসিলদার সাহেব উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কেয়ারে পাগল্ হুয়া কেয়া? দেখ্‌তা নেহি পাক্কা ছাপা হুয়া মণ হায়্? ই কভি কমবেশ হো সক্‌তা?"

কিন্তু নির্ব্বোধ ভিখারীর ইহাতেও সন্দেহ দূর হইল না। সুতরাং এবার ওজন করিয়া

শস্ত নামাইবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি কাঁটার উপর হইতে নূতন মণ ফেলিয়া পুরাতন মণ বসাইয়া দিল। পুরাতন মণ বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। ভিখারী উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ই কেয়া হায়্? হাম্ ইস্ মণসে তৌল করনে নেহি দেঙ্গে।" বলিয়া সে পূর্ব্বের তুলিত শস্য-রাশি আবার টানিয়া সাধারণ স্তূপে মিশাইয়া দিল। তহসিলদার সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কয়াল গর্জ্জিতে লাগিল। তহসিলদার সাহেব যে কেবল বিশুদ্ধ-প্রভুভক্তি-প্রণোদিত হইয়াই এই প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রভু যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন মাত্র। "সিংহাংশ" তহসিলদার সাহেবের উদরেই যাইত, কয়াল কিছু অংশ পাইত।

সুতরাং তহসিলদার সাহেব খাতাপত্র ফেলিয়া জরাজীর্ণ চশমাখানিকে সযত্নে কোষ-রুদ্ধ করিয়া ভীষণ হুঙ্কার করিয়া কহিলেন, "কেয়া তুম্ ফসিল তউল্‌মে নেহি দেওগে?" ভিখারী বলিল,"পূর্ব্বের ওজনে তৌল করাইতে তাহার কোনই আপত্তি নাই।" ক্রুদ্ধ তহসিলদার কয়ালকে বলিলেন, "আচ্ছা আভি ছোড় দেও ইস্‌কো ফসিল। পিছে দেখা যায়গা।" বলিয়া, খাতাপত্র উঠাইয়া বিদ্রোহী ভিখারীর প্রতি কয়েকবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে দলবল লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

প্রত্যুষেই জমিদার-বাড়ীর দুইজন পেয়াদা আসিয়া ভিখারীর দ্বারে উপস্থিত। তাহারা জমিদার-বাড়ীর কাজের জন্য বেগার ধরিতে আসিয়াছিল। তহসিলদার সাহেব তাহাদের প্রথমেই ভিখারীকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পেয়াদারা বলিল "মালিকের জরুরি হুকুম, এখনি যাইতে হইবে।" ভিখারী সবিনয়ে বলিল যে, তাহার ধানের 'বাঁট' এখনো হয় নাই। ধান উঠাইয়া তবে সে যাইতে পারিবে, নহিলে তাহার সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে।

পেয়াদারা রুক্ষকণ্ঠে বলিল "ও সকল ঘরের কথা আমরা শুনিতে চাহি না। মালিকের হুকুম, এখনি যাইতে হইবে। না যাও ত সাফ বলিয়া দাও, আমরা ফিরিয়া যাই।"

ভিখারী তহসিলদার মহাশয়ের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াই বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার উপর মালিকের আদেশ লঙ্ঘন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্নচিত্তে সে পেয়াদার অনুসরণ করিল।

৩

মালিকের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ বিবাহের এখনো তিন চারি দিন বিলম্ব, আপাততঃ কেবল উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছে। ভিখারী উপস্থিত হইবামাত্র হুকুম হইল, "যাও আউর তিন আদমীকে সাথ হাসনপুর; উহাঁসে সামিয়ানা লে আও। সামিয়ানা লানেকো বাদ ধানেকো দিয়া জায়গা।" গোমস্তা হাসনপুরের বাবু জগদ্ধর নারায়ণের নামে পত্র লিখিয়া দিল। ভিখারী সঙ্গীদের সহিত পত্র লইয়া সামিয়ানা আনিতে চলিল। হাসনপুর মালিকের বাটী হইতে তিন ক্রোশ দূরে গঙ্গাপারে অবস্থিত। সুতরাং সেখানে পৌছিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। ভিখারী যখন বাবু সাহেবের দেউড়িতে পৌছিল তখন বাবু সাহেব মধ্যাহ্ন নিদ্রার সুখভোগে ব্যাপৃত, ভৃত্য অকালে প্রভুর নিদ্রা-

ভঙ্গ করিতে সাহস করিল না। অপরাহ্নে যথা-কালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাবু সাহেব দেওয়ান-জিকে ডাকাইয়া সামিয়ানা বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

সামিয়ানা বাহির করিতে, তাহার পরীক্ষা করিতে, খাতায় লিখিতে, সামিয়ানার উপর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সমস্তদিন উপবাস করিয়া এক প্রহর রাত্রে বেগারেরা সামিয়ানা লইয়া প্রভুগৃহে উপস্থিত হইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কিন্তু কে কাহার সংবাদ লয়? সকলের কাছে দুঃখ জানাইয়া কাহারো নিকট গালি এবং কাহারো নিকট তাড়না লাভ করিয়া অবশেষে বহুসাধ্য-সাধনার পর তাহারা এক 'ভাণ্ডারী'র অনুগ্রহে রাত্রি ১০টার সময় অর্দ্ধসের করিয়া শুষ্ক 'চুড়া' সংগ্রহ করিল এবং তাহাই চিবাইয়া সেদিনের মত কোন প্রকারে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিল।

আহারান্তে গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভিখারী অবগত হইল যে, সম্মুখবর্ত্তী বটবৃক্ষ-তলে মুক্ত মৃত্তিকার উপর তাহাদের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অগত্যা পরিহিত বস্ত্রের একপ্রান্ত ভূমিতলে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের কঠিন ভূমিতলে শয্যা রচনা করিতে হইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে অচিরেই তাহারা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু সহসা মধ্যরাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিল। অনন্যোপায় হইয়া হতভাগাদের সমস্ত রাত্রি সিক্তবস্ত্রে সিক্ত মৃত্তিকার উপর এক প্রকার জাগিয়া কাটাইতে হইল।

পরদিন প্রত্যূষে—'দরবারে' বিদায় প্রার্থনা করিতে গিয়া সকলে আদেশ পাইল যে, 'বরিয়াত' আসিয়া চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কোথাও যাইতে পাইবে না। যে যাইবে তাহাকে 'পচাশ জুতি' ও দশ টাকা জরিমানার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

ভিখারী বিনীতভাবে বলিল, তাহাদের যদি ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহাদের বাটী হইতে কাপড় ও বিছানা লইয়া আসিতে দেওয়া হউক। কারণ, বৃষ্টিতে তাহাদের কাপড়-চোপড় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া দেওয়ানজি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"ইয়ে সালে তো বড়া সওখিন দেখতে হেঁ। এক হাথকা কাকড়ি নৌ হাথকা বীয়া"! সালেকো কাপড়া চাহিয়ে! বিছৌনা চাহিয়ে! পালং চাহিয়ে! সালে 'দেশী মুরগী, বিলায়তি বোলি' সালেকো মুহমে বিশ জুতি লাগাকে সালেকো দুরুস্ত কর দেও তো গিরবর সিং।"

অতঃপর আর দ্বিরুক্তি করা চলে না। সুতরাং সিক্তবস্ত্র শূন্যজঠর ভিখারী অদৃষ্টের বিধান নীরবে শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই সমীচিন বিবেচনা করিল।

পরদিন 'বরিয়াত' আসিল। অন্যান্য বেগারদের সহিত ভিখারীকেও তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করা হইল। বরযাত্রীরা আসিয়াই মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিলেন। কেহ বলিলেন "গোড় ধোলাও", কেহ বলিলেন "পাঙ্খা করো", কেহ বলিলেন "তামাকু চঢ়াও", কেহ বলিলেন "শরবৎ বানাও", কেহ বলিলেন "গোড় দাঁতো!"

চারিদিক্ হইতে যুগপৎ এত হুকুম বেচারা ভিখারীর উপর অবিরল ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল যে, সে যে কোন্‌টা প্রতিপালন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ফলে কেহ বা তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিলেন, কেহ 'লাত্' মারিলেন, কেহ তাহার শিখা ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠের উপর কেহ বা পাদুকা কেহ বা খড়মের সদ্ব্যবহার করিলেন। সমস্ত নির্য্যাতন বেচারাকে নীরবে সহিতে হইল।

প্রায় সপ্তাহকাল পরে সর্ব্বাঙ্গে প্রহার ও পরিশ্রম-জনিত বেদনা বহিয়া, অনশনক্লিষ্ট ভিখারী ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই শুনিল, পূর্ব্ব রাত্রে তাহার 'খলিহানে'র সমস্ত ফসল লুট হইয়া গিয়াছে! প্রতি-বেশীদের নিকট সন্ধান লইয়া ভিখারী যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার স্পষ্টই মনে হইল যে, ইহা তহসিলদার সাহেবেরই কাজ, কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত তহসিলদারের বিরুদ্ধে কেহই সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল না। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ভিখারী থানায় গিয়া দারোগা সাহেবকে লুঠের সংবাদ দিল। তহসিলদার সাহেব পূর্ব্বেই থানায় উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে যথোচিত 'কারোয়াই' করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ভিখারীর মুখে লুঠের সংবাদ শুনিয়াই প্রবলপ্রতাপ দারোগা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কোন্ লিয়া বোল্‌নে সক্তা?" ভিখারী করজোড়ে বলিল সে 'ওকু'র রাত্রে ঘরেই ছিল না, সুতরাং চোরের সন্ধান সে কিরূপে দিবে?

দারোগা হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "সালে থানামে খেল্ কর্‌নে আয়া? দেওয়ান জি, সালে পর ২১১ দফা তো চাপা দিজিয়ে।"

সমস্তদিন থানায় আটক থাকিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিয়া দারোগা সাহেবকে ১০ টাকা 'পান' খাইতে দিয়া, বেচারা বহুকষ্টে সন্ধ্যার সময় চুরির সংবাদ দেওয়ার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

পরদিন প্রভাতে তহসিলদার সাহেব পুনরায় সদলে ভিখারীর 'খলিহানে' উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কাঁহারে ফসিল তউল্ করাও।"

সকরুণ ভাবে ভিখারী বলিল, "সমস্ত ফসলই চোরে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাগ আর সে কোথায় পাইবে?" তহসিলদার বলিলেন, "আচ্ছা সো .আদালতমে দেখা জায় গা। ফেকু সিং ইয়াদ রাখ্‌না ৩০০ মণ ধান পৈদা হুয়া থা।"

ভিখারী বলিল "সে কি? সেদিনকার ওজনে ধান মোটে ২০০ মণ হইয়াছিল।" ঘৃণাভরে তহসিলদার বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আদালত মে উস্‌কা কবুদ দিয়া জায়গা!"

৪

যথাসময়ে আদালত হইতে সমন পাইয়া ভিখারী জানিল যে, তাহার নামে ১৫০ মণ ধান্যের মূল্য এবং 'খেসারা'র জন্য নালিশ হইয়াছে।

ভিখারীর ক্ষেত্রে ২০০ শত মণের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং ন্যায্য হিসাবে জমিদারের পাওনা ১০০ শত মণের অধিক হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন তাহার ধান্য যে তহসিলদার সাহেবেরই আদেশ অনুসারে

লুণ্ঠিত হইয়াছিল ইতিমধ্যে ভিখারী সে বিষয়েও কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। সুতরাং সে মোকদ্দমা লড়িয়া দেখিতে মনস্থ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে "জবাব" দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইল।

ভিখারী ইতিপূর্ব্বে আর কখনো আদালত দেখে নাই। সুতরাং সেই জনসঙ্কুল, কোলাহলমুখরিত বিচারপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। লক্ষ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ান' ছাড়া সে আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ অধিকক্ষণ তাহাকে এ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল না। অতি অল্পক্ষণ পরেই সে এক পক্কশ্মশ্রু সম্ভ্রান্ত-মূর্ত্তি মুসলমানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

মৌলভি সাহেব সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ভিখারীর সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং এ মোকদ্দমা যে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে 'ফুট্‌কি'তে উড়াইয়া দিতে পারিবেন, সে বিষয়েও তাহাকে গভীর আশ্বাস প্রদান করিলেন। অবশেষে তাহাকে সমস্ত দিন এদিক ওদিক ঘুড়াইয়া দুই তিন খানা সাদা কাগজে তাহার 'আঙ্গুঠার নিশান' লইয়া, এবং উকীলের 'সগুন্', নিজের 'তহরি'র ও 'সেহা', সেরিস্তার 'দাখিলা', সাক্ষীর 'বুতাত্' ও তলবানা ইত্যাদিতে তাহার নিকট হইতে ১০ টাকা আদায় করিয়া লইয়া মোকদ্দমার তারিখ বলিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

ভিখারী হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

তারিখের দিন ভিখারী দুই এক জন সাক্ষী লইয়া আবার আদালতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপরিচিত মৌলভি সাহেবের শরণাপন্ন হইল।

বন্ধুবর তাহার নিকট হইতে আরো কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিলেন "তুমি এইখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।" ভিখারী সারাদিন বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল। অপরাহ্নে বন্ধুবর মসীকৃষ্ণদন্ত রাজি আমূল বিকশিত করিয়া ভিখারীকে কহিলেন "যাও মোকদ্দমা ডিসমিস হো গিয়া।" বিস্মিত ভিখারী বলিল "সে কি? আমার এজাহার না লইয়াই আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন?" মৌলভি হাসিয়া বলিলেন যে 'ওকীল সাহেবে'র জেরায় তহসিলদার নিজেই সব কথা কবুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার এজাহারের আর প্রয়োজনই হয় নাই! শুনিয়া ভিখারী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল।

মৌলভি সাহেব আনন্দিত ভিখারীর নিকট হইতে নিজের ও উকীল সাহেবের 'ইনাম বাবত' আরও ১০ টাকা সংগ্রহ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। বিজয় গর্ব্বিত ভিখারী আনন্দে বাটী ফিরিল।

কিন্তু দুইমাস না হইতেই ভিখারী একদিন সবিস্ময়ে শুনিল যে তাহার জমির উপর নিলামের ঢোল ঘোররবে নিনাদিত হইতেছে এবং আদালতের পেয়াদা চীৎকার করিয়া হাঁকিতেছে—"ভিখারী মণ্ডলকা জোত ১০ সিতম্বর আদালতমে নিলাম হোগা" ইত্যাদি। শুনিয়া ভিখারী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয় পেয়াদাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পেয়াদা বলিল তাহার নামে ডিক্রি হইয়াছে, ডিক্রির টাকা না দিলে নিলাম হইবে না?

বিস্মিত ভিখারী বলিল "কত টাকার ডিক্রি ?" পেয়াদা বলিল "২৩৯৶৫"। ভিখারী বলিল "সে কি ? আমায় যে মৌলভি বলিল মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।"

পেয়াদা বলিল "কোন্ মৌলভি ?" ভিখারী মৌলভি সাহেবের সবিস্তার বর্ণনা দিল। শুনিয়া পেয়াদা হাসিয়া বলিল "আরে দূর বেকুব ! দালাল কে পটিয়ে পড় গেয়ো ?"

এতক্ষণে ভিখারী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, সজলনেত্রে বলিল, "এক্ষণে, উপায় ?"

পেয়াদা বলিল "তুমি সত্বর আদালতে গিয়া 'সানি তজবিজে'র দরখাস্ত দাও। যদি 'সানি তজবিজ' নিতান্ত মঞ্জুর না হয়, তাহা হইলে একমাসের মধ্যে আদালতে টাকা জমা করিয়া দিলে নিলাম 'রদ্' হইবে।" বলা বাহুল্য, পিয়াদা সাহেবকে এই আইনের উপদেশ নিতান্ত বিনামূল্যে দিতে হইল না। এই উপদেশের পরিবর্ত্তে ভিখারীর একটি বহুদিনের যত্ন-পালিত '.ধর' খাসি বিনামূল্যে পেয়াদা সাহেবের অনুগমন করিল। পরদিনই ভিখারী হাতে পায়ে ধরিয়া হোরিল সাহুকে সঙ্গে লইয়া আদালতে গিয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল করিল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত শুনানির দিন ভিখারী সবিস্ময়ে শুনিল যে, সে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার 'কবুল দাবি' দিয়াছে !

দরখাস্তে তাহার 'আঙ্গুঠার ছাপ' ওকালতনামাতেও তাই। উকীলও আদালতের সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন যে, ওকালতনামা লইবার সময় তিনি মক্কেলের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াই ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়া, বেচারা ভিখারী সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং বহু কষ্টে গ্রামের মহাজন তুলসী সাহুর নিকটে বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কোন প্রকারে মাসিক শতকরা ২৲ টাকা সুদে ১০৲ টাকা ঋণ করিয়া ডিক্রির টাকা উসুল করিল।

৫

এইরূপে তিনবৎসর কাটিয়া গেল। যথাসময়ে বেগার খাটিয়া, জমিদারের 'আব্-ওয়াব' যোগাইয়া, তহসিলদার সাহেবের ওজনে আপত্তি না করিয়া, পেয়াদা ও পাটোয়ারিদের 'কোমর খোলাই' ও 'মাঙ্গন' নিয়মিতভাবে দান করিয়া, মাসে মাসে মহাজনের সুদ মিটাইয়া, ছিন্নবস্ত্রে অর্দ্ধাশনে কোন প্রকারে ভিখারী সস্ত্রীক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখও তাহার অদৃষ্টে অধিক দিন সহিল না।

শ্রাবণ মাস। ধান্যের রোপা ফলিতেছিল। গ্রামের কৃষকপত্নীগণ কলকণ্ঠে 'রোপাণি'র গীত গাহিতে গাহিতে জলমগ্ন ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিতেছিল। কৃষকেরা দূরে হল-সাহায্যে অন্যান্য 'ক্ষেত্রকে' রোপার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছিল। পশ্চিমের সূক্ষ্ম মেঘ হইতে প্রতিফলিত মধুর আলোক কৃষক-রমণীদের সুস্থ ও সবল দেহে নিপতিত হইয়া তাহাদের সরল সৌন্দর্য্যকে উদ্ভাসিত করিতেছিল। এই সময়ে এক ক্ষুদ্র ঘোটকা-রোহী বাবু সাহেব মাঠের সংকীর্ণ পথে দেখা

দিলেন। যেখানে 'ধান রোপা' হইতেছিল, তাহারই সম্মুখ দিয়াই পথ। বাবু সাহেব রোপণ-নিরতা কৃষক-যুবতীগণের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাবু সাহেব ভিখারীর মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। বাবু সাহেবের দুশ্চরিত্রের কথা তাঁহার জমিদারির মধ্যে সর্ব্বজনবিদিত। দেখিতে দেখিতে একজনের সৌন্দর্য্য যেন বাবু সাহেবকে মুগ্ধ করিল—তাঁহার কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষে বিস্ময় ও লালসার তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল। বাবু সাহেব ঘোড়াকে আরও নিকটে সরাইয়া আনিলেন।

ক্ষণমধ্যেই কৃষক-যুবতীদের দৃষ্টিও বাবু সাহেবের উপরে পড়িল। তাহারা দেখিল, বাবু সাহেব একদৃষ্টে বুধিয়ার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! যাহারা দেখিল, তাহাদের অধিকাংশই যুবতী? দেখিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি আপনাদের বস্ত্র সংবৃত করিয়া লইয়া বুধিয়ার দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে পরস্পরের 'গা-টেপাটিপি' করিয়া ঈষৎ মধুর হাসিল। বাবু সাহেবের চরিত্রের কথা তাহাদের অবিদিত ছিল না। যাহারা স্বয়ং এক সময়ে বাবু সাহেবের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল।

বুধিয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, তাহার প্রতি বাবু সাহেবের খরদৃষ্টি নিবদ্ধ দেখিয়া, তাড়াতাড়ি মস্তক ও বক্ষ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিল—তাহার স্বাভাবিক অরুণ গণ্ড লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

বাবু সাহেব তাহার সপ্তদশবর্ষের 'নিটোল' যৌবনের উপর লজ্জার অরুণাভা দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কিন্তু প্রেমালাপের পক্ষে ইহা উপযুক্ত স্থান বা অবসর নহে। সুতরাং বাবু সাহেব তাঁহার অনুগামী ভৃত্যকে অস্ফুটস্বরে কি উপদেশ দিয়া, সহসা ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

দেখিয়া অন্যান্য যুবতীরা হাসিয়া বুধিয়াকে বলিল "বুধিয়া গো? এইবার তোর কপাল খুলিল। আর তোকে কাদা ঘাঁটিয়া ধান রোপিতে হইবে না। এখন খাটীয়ায় বসিয়া 'লালকি সাড়ী' পরিয়া 'হালুয়াপুরী' খাইবি।" শুনিয়া, বুধিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পর ভিখারী আহারান্তে রামাচরণ সাহুর দোকানে নিয়মিত ধূমপান করিতে গেলে, গ্রামের এক বৃদ্ধা স্ত্রীলো ধীরে ধীরে আসিয়া বুধিয়ার নিকট উপবেশন করিল। বুধিয়া তখন প্রদীপের নিকটে বসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে আপনার কুর্ত্তা সেলাই করিতেছিল। এ কথা সে কথার পর বৃদ্ধা বুধিয়ার আর্থিক অবস্থা এবং তাহার অতুলনীয় রূপের কথা তুলিল। উভয়ের তুলনা করিতে গিয়া সমবেদনায় বৃদ্ধার লোল চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

আহা! এই অতুল সৌন্দর্য্য, এ কি মাঠে মাঠে রৌদ্রে ও কর্দ্দমে কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল? কাঁসার চুড়ি আর পিতলের নাকছাবি কি এই দেহের যোগ্য অলঙ্কার? নবীন যৌবনে বুধিয়ার কোন আশাই সফল হয় নাই। বুধিয়াও সময়ে সময়ে আপন মনে এই কথাই ভাবিত। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া

বুধিয়া অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া তাহার সুন্দর মুখখানি ভাল করিয়া মুছিয়া প্রদীপের আলোটা বাড়াইয়া দিল।

বৃদ্ধা তখন ক্রমে ক্রমে বাবু সাহেবের ধন, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের কথা পাড়িল এবং একবার তাহার নজরে পড়িলে যে, তাহার হতাশা-পীড়িত জীবনের কোন সাধই অপূর্ণ থাকিবে না, এ কথাও তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করিল না। বুধিয়া কম্পিতবক্ষে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বুধিয়ার নিকটে কথাটা তীক্ষ্ণধার অসির উপর নিক্ষিপ্ত মধুর মত মনে হইতেছিল। মিষ্টতার লোভ সম্বরণ করাও কঠিন, আবার লেহন করিতে গেলেও জিহ্বা কাটিয়া যাইবার আশঙ্কা!

অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুধিয়া সলজ্জ ইঙ্গিতে জানাইল যে গৃহস্থ-বধূর পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শুনিয়া বৃদ্ধা মৃদুহাস্য করিয়া বুধিয়ার কাণে কাণে বলিল "এ ঘটনা কি গ্রামে নূতন? রহিমপুরের যুবতীদের মধ্যে এমন কোন্ সুন্দরী আছে, যে একদিন না একদিন বাবুসাহেবের অনুগ্রহ লাভ করে নাই? কিন্তু এ কথা কি প্রকাশ হইয়াছে? সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তা নাই।"

কিন্তু বুধিয়ার কিছুতেই ইহাতে সাহস হইল না। বৃদ্ধা পরদিন আবার আসিল এবং যাইবার সময়ে গোপনে বুধিয়ার হাতে দশটী টাকা দিয়া গেল। বুধিয়া সুমতি ও কুমতির দারুণ যুদ্ধে নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

তিন দিনের আলোচনার পর বৃদ্ধা স্থির বুঝিল যে, ভিখারীকে কোথাও সরাইয়া দিতে না পারিলে, বুধিয়া কিছুতেই সম্মত হইবে না। বাবু সাহেব যথাসময়ে এ সংবাদ পাইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়া গ্রামের লোক সভয়ে দেখিল যে, পুলিশ আসিয়া ভিখারীর গৃহের চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। দেখিয়া, সকলেই ভয়ে ভয়ে আপন আপন গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল।

একটু বেলা হইলে, ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগা সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে বাবু সাহেব স্বয়ং। দারোগা আসিয়াই গ্রামের সমস্ত 'মাতব্বর' ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, কনষ্টেবলদের হুকুম দিলেন "খানাতালাসি সুরু করো।" দুইজন কনষ্টেবল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিখারীকে গ্রেপ্তার করিল। অন্যান্য সকলে চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে এক চাউলের হাঁড়ি হইতে একখানি সাড়ী এবং কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বাহির হইল! বাবু সাহেব সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই বটে। এই আমার স্ত্রীর সাড়ী ও অলঙ্কার!" দারোগা সাড়ী ও অলঙ্কার ভিখারীর সম্মুখে আনিয়া বলিলেন "কেয়া রে ইয়ে সাড়ী আউর জেবর কাঁহা মিলা?" ভিখারী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দারোগা সাহেবের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিল না। দারোগা আবিষ্কৃত দ্রব্যের তালিকায় সাক্ষীদের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া ভিখারীকে চালান দিলেন। বিস্ময়ে দুঃখে অপমানে ভিখারী কাঁদিয়া ফেলিল।

বুধিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্তই

দেখিতেছিল। ভিখারীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এই সাড়ী এবং অলঙ্কার বৃদ্ধা পূর্ব্বরাত্রে বাবু সাহেবের উপহার বলিয়া গোপনে তাহাকে দিয়া গিয়াছিল! সকল কথা দারোগাকে বলিলে, হয় ত ভিখারী মুক্তি পাইতে পারে; কিন্তু এ কথা সে কেমন করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করে? মোকদ্দমার বিচারের ভার বাবু সাহেবের এক বন্ধু 'অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের' উপর পড়িল। বাবু সাহেব বন্ধুর বাড়ী গিয়া ভিখারীকে কিছু কালের জন্য কারাবাসের দণ্ড দিতে অনুরোধ করিয়া আসিলেন। বন্ধুবর অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বন্ধুর কথায় সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হইল। বিচারক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সরলভাবে ভিখারী বলিল সে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তোমার উপর এ মিথ্যা মোকদ্দমা হইল কেন?" ভিখারী বলিল, ধর্ম্মতঃ সে তাহার কিছুই জানে না। হাকিম হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সাধে সাধে লোকে—বিশেষতঃ বাবু সাহেবদের মত লোকে তাহার বিরুদ্ধে অকারণে মিথ্যা মোকদ্দমা আনিবে কেন?

ভিখারীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়া গেল। বিচারক ভিখারীর তিন মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। রায় দিয়া হাকিম সাহেব বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বন্ধুর কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, তিন মাসে সাধ মিটিবে ত?"

ভিখারী কাঁদিতে কাঁদিতে কারাগৃহে চলিল। গৃহে তাহার অরক্ষিতা, নিঃসম্বলা, যুবতী স্ত্রী। কে তাহাকে দেখিবে? হতভাগ্য ভিখারী জানিত না, বুধিয়াকে দেখিবার লোকের অভাব ছিল না।

* * * * * *

সেই দিনেই গভীর রাত্রে বাবু সাহেবের প্রেরিত লাটিয়ালগণ শিবিকা সহ আসিয়া বুধিয়াকে তাঁহার উদ্যানবাটীতে লইয়া গেল। ভিখারীর জীবনের সুখের প্রদীপ চিরদিনের মত নিবিয়া গেল!

* * * * * *

তিন মাস পরে ভিখারী বাটী ফিরিয়া দেখিল,—গৃহ নির্জ্জন, অঙ্গন তৃণকণ্টকাকীর্ণ, বুধিয়া নিরুদ্দিষ্ট। কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত ব্যাপার ভিখারীর কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া, ভিখারী, অনাহারে, পরিত্যক্ত গৃহে ভগ্ন খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল।

রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইলে, ভিখারী ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল। তাহার মস্তকের মধ্যে একটা দারুণ বিপ্লব চলিতেছিল। কোমরে হাত দিয়া দেখিল, কোমরে একটা দেশালাই রহিয়াছে। সহসা কি যেন উৎকট আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কিছু শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া, সে গৃহের চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে বহ্নিরাশি হু হু করিয়া চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল। গ্রামে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই কোলাহলের মধ্যে নিঃশব্দে ভিখারী রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * * * *

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

চরিত-চিত্র

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্মসমাজ

(শেষাংশ)

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াও, নিজেদের পূর্ব্ববর্জ্জিত সাধন-সম্পৎ-প্রভাবে, আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্বে বা ধর্ম্মসাধনে শুদ্ধ-স্বানুভূতি-ও-যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্মস্থাপন অসম্ভব দেখিয়া, পরে নিজেরাই শাস্ত্র-প্রণেতার ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত গুরুর অধিকার গ্রহণ করেন। মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ সকল বিষয়েই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। কেশব-চন্দ্রের লোকান্তর গমনের পরেও নববিধান-সমাজ তাঁরই বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। এই সমাজে গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকৃত না হইলেও, একটা প্রবল পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সমাজের ধর্ম্মকে ব্যক্তিস্বা-ভিমানী অনধীনতার আতিশয্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের শিক্ষার গুণে এই দলের ব্রাহ্মগণ এক প্রকারের শাস্ত্রানুগত্য এবং সাধুভক্তির অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে এমন একটী সংযম ও শ্রদ্ধাশীলতার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন, যাহা শিবনাথ বাবুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কচিৎ কোনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেলেও, সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে দেখা যায় না। একদিকে শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি নাই। অন্যদিকে নববিধান-সমাজের 'প্রেরিত-মণ্ডলী'র ও 'শ্রী দরবারে'র মত কোনও পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠাও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই। নববিধান-মণ্ডলীর শাস্ত্রানুগত্য ও সাধুভক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর ভীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এ সমাজের কোনও কোনও আচার্য্য ও প্রচারক 'মৃত সাধুদে'র চরিত্রের অনুশীলনের উপদেশ দিয়া, ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে নিরাপদ নয় বলিয়া, জীবিত সাধুদের সঙ্গ করা নিষেধ করিয়াছেন,—এমনও শোনা যায়। সুতরাং শিবনাথ বাবু তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে যুক্তিবাদী ধর্ম্মের নিজস্ব স্বরূপটী যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজে, বা কেশব-চন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আজি পর্য্যন্তও ততটা ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ

কিন্তু শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোনও স্বাভাবিকী ও বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি না থাকিলেও, সর্ব্বদাই একপ্রকারের ধর্ম্মানুরাগ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে মুমুক্ষুত্ব হইতেই ধর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি হয়। শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ এই জাতীয় কি না, সন্দেহ। ইহাকে বিলাতী ছাঁচের ধর্ম্মানুরাগ বলিয়াই মনে হয়। ইংরাজিতে ইহাকে Religious Enthusiasm বলে। এই ধর্ম্মানুরাগ দুই দিক্ দিয়া প্রকাশিত হয়। একদিকে ইহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য একটা গভীর আগ্রহ থাকে, এবং এই কারণে মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, পরদ্রব্যহরণ, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার বাসনার ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া ইহা ফুটিয়া উঠে। অন্যদিকে লোকহিতেচ্ছা এবং লোকসেবার চেষ্টাতেও ইহা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বা ভগবদ্ভক্তির কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই। শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ অনেকটা এই জাতীয়। তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি যে কি, বলা সহজ নয়। প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি তাঁর নাই। শিক্ষার প্রভাবে গভীর তত্ত্বালোচনার দ্বারাও যে তিনি তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া, গুরু-শক্তিসঞ্চারেও তাঁর ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আলোচনায় লৌকিক ন্যায় যে কারণ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করে, কেবল সেই ব্রহ্মের জ্ঞানই কতকটা তাঁর আছে মাত্র। আর কবি-প্রকৃতি-সুলভ ভাবাবেগ হইতে এই লৌকিক-ন্যায়-প্রতিষ্ঠিত কারণ-ব্রহ্মতে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি মহদ্‌গুণের অধ্যাস হইয়া, শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মে একপ্রকারের ঈশ্বর-কল্পনাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে স্বদেশের এবং সমগ্র মানবজাতির সুখ ও উন্নতি-কামনা-প্রসূত একটা প্রবল কর্ম্মানুরাগও তাঁর জীবনে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র, এই সকল উপকরণেই যুক্তিবাদী ধর্ম্ম বা Rational Religion গড়িয়া উঠে।

ফলতঃ যে ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শে আমাদের সেকালের ইংরাজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর চিত্ত একেবারে মাতিয়া উঠে, তাহারই উপরে শিবনাথ বাবুর এই ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম যৌবনাবধিই, কতকটা বৈজিক-নিয়মাধীনে, আর কতকটা ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, শিবনাথ বাবুর ভিতরে একটা অদম্য অনধীনতার ভাব জাগিয়াছিল। ইহার সঙ্গে য়ুরোপীয় ঝাঁঝের একটা বলবতী মানবহিতৈষাও মিশিয়াছিল। তাঁর প্রকৃতির ভিতরেই বাল্যাবধি এমন একটা নিঃস্বার্থতা এবং মহাপ্রাণতাও ছিল, যাহাতে এই মানবহিতৈষাকে বাড়াইয়া তুলে। এই অনধীনতার ও মানবহিতৈষার প্রেরণাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন বলিয়া মনে হয়। লোকসেবাই তাঁর ধর্ম্মের মূল মন্ত্র ছিল। অনধীনতার ভাব হইতেই দেশ-প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের কর্ম্মবহুল অনুষ্ঠানাদি ও প্রাচীন শাস্ত্রগুরুর শাসনকে তিনি বর্জ্জন করেন। মানবহিতৈষা হইতেই স্বদেশের জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। য়ুরোপীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়ই, স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্ম্মের

ও সমাজের সর্ব্বপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া, তার মনুষ্যত্ব বস্তুকে অবাধে ফুটিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার জন্য, শিবনাথ বাবুর যে আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, মহর্ষির কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই। তথাকথিত সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার উপরে পরিবারের ও সমাজের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজাস্বত্বের সম্প্রসারণে, এক সময়ে শিবনাথ বাবু ফরাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার প্রভাব, ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি ফরাসীস চিন্তানায়কগণের শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়া সাক্ষাৎভাবে শিবনাথ বাবু বা তাঁর সহযোগী ব্রাহ্মগণের উপরে আসিয়া পড়ে নাই। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তিবাদী খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের শিক্ষাদীক্ষা হইতেই আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যুরোপীয় 'সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতা'র উদ্দীপনা লাভ করেন। আর ইঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের ফ্রান্সেস নিউম্যান্ এবং আমেরিকার থিওডোর পার্কারের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শিবনাথ বাবুর প্রথম যৌবনকালে পার্কারই ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী যুবকদলের প্রধান শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দার্শনিক ভিত্তির উপরে পার্কারের ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁর ভারতবাসী শিষ্যগণ সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন কি না, সন্দেহের কথা। শিবনাথ বাবু প্রভৃতি পার্কারের দুর্দ্দমনীয় অনধীনতা প্রবৃত্তি এবং উদার ও বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের উদ্দীপনাই কতকটা লাভ করেন, কিন্তু পার্কারের তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তিভাব লাভ করিয়াছিলেন কি না, বলা সহজ নয়।

ফলতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত হইবার পূর্ব্বে শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা কর্ম্মোৎসাহই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উপাসনাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর যতটা উৎসাহ ও নিষ্ঠা ছিল, সমাজ-সংস্কারে তখন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহ ছিল, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ সময়ে তিনি উপাসনা-প্রার্থনাদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনকেও যে লৌকিক ন্যায়ের বিশুদ্ধ তর্কযুক্তির কষ্টিপাথরে কসিতেছিলেন, তাঁর সম্পাদিত "সমদর্শী"ই ইহার সাক্ষী। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগত প্রচারকগণ যে শিবনাথ বাবুর সে সময়ের ধর্ম্মভাবকে বড় বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, ইহাও জানা কথা। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য-সাধন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াসী হইলে, শিবনাথ বাবু তাঁর এ সকল মত ও আদর্শকে লোকচক্ষে কতটা হীন করিবার চেষ্টা করেন, তখনকার "সোমপ্রকাশে" এবং "সমদর্শী"তে তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ও অতিলৌকিক দিক্‌টা যে শিবনাথ বাবুর নিকট প্রকাশিত হয় নাই, এ সকলে ইহাই প্রমাণ করে। ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে, শিবনাথ বাবু 'বিবেক' 'বৈরাগ্য'দি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু এ সকল কতটা যে তাঁর ভিতরকার সাধনাভিজ্ঞতা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর কতটা যে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের অবস্থার

পরিবর্ত্তনের ফল, ইহাও বলা সহজ নয়। আর এ সকল সত্ত্বেও শিবনাথ বাবুর জীবনে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়াস অপেক্ষা, বাহিরের সমাজ-সংস্কারাদি সাধনের প্রয়াস যে সর্ব্বদাই বলবত্তর হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

ফলতঃ শিবনাথ বাবুর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বস্তুগুলি তাঁর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের ভিতর দিয়া আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শিবনাথ বাবু কবি। রসানুভূতি কবি-প্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। রসগ্রাহিতা ও ভোগলিপ্সা শিবনাথ বাবুর মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই দুই বস্তুই তাঁর প্রচারক-জীবনের বন্ধনে পড়িয়া বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে শিবনাথের চরিত্রের যে দিক্‌টা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার পাইয়া, তাহা ক্রমে শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। সত্য-সন্ধিৎসাই সে সময়ে শিবনাথ বাবুর চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই সত্য-সন্ধিৎসা যুক্তিবাদের সাধারণ লক্ষণ। প্রাচীন কি নূতন কোনও প্রকারের বন্ধন যুক্তিবাদ সহ্য করিতে পারে না। যুক্তিবাদ সত্যের সন্ধানে যাইয়া ভুল ভ্রান্তি যাই করুক না কেন, কখনও লোকানুবর্ত্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। গার্য়্ডিণো ক্রুণো প্রভৃতি য়ুরোপীয় যুক্তবাদিগণ সত্যের সন্ধানে বা প্রচারে প্রাচীন শাস্ত্র বা প্রচলিত পৌরোহিত্য কোনও কিছুরই মুখাপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই, সেখানে যুক্তিবাদ এতটা প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শিবনাথও এক সময় সত্যের সন্ধানে যাইয়া আপনার বিচার-বুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া চলিতেন, প্রাচীন সমাজের আনুগত্য পরিহার করিয়া তিনি কিছুতেই তখন নূতন সমাজের প্রচারকমণ্ডলীর বা আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। আর এইজন্য নূতন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের হাতে শিবনাথকে অশেষপ্রকারের নির্য্যাতন এবং লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কেশব-চন্দ্রের প্রচারকগণ শিবনাথের যে সকল দুর্নাম রটনা করিয়াছিলেন, কোনও কোনও ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আজি পর্য্যন্ত তাঁর স্মৃতি জাগিয়া আছে। এই নিগ্রহ-নির্য্যাতনে শিবনাথ বাবুর চরিত্রের শক্তি ও সৌরভ যতটা ফুটিয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত হইয়া তাহা হয় নাই। বরং এই অভিনব দায়িত্বভার তাঁহার আপনার অন্তঃ-প্রকৃতির প্রেরণাকে নানা দিকে চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহার মূল চরিত্রের সম্যগ্‌রূপে ফুটিয়া উঠিবার বিশেষ ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে।

যোগ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের শক্তি ও সরঞ্জাম শিবনাথ বাবুর মধ্যে কখনই বেশী ছিল না; এখনও নাই। ফলা-ফল-বিচার-বিরহিত সত্যসন্ধিৎসা, দুর্দ্দমনীয় অনধীনতা-প্রবৃত্তি, অকৃত্রিম লোক-হিতৈষা এবং প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ,—এ সকলই শিব-নাথ বাবুর প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই সকলের জন্যই তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদারমতি যুবকদলের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়া-

ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনাকে সর্ব্বপ্রকারের অতিপ্রাকৃতত্ব ও অতিলৌকিকত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত "সমদর্শী" যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। কেশবচন্দ্র যখন ক্রমে একটা কল্পিত যোগবৈরাগ্যের আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল ও সোজা ভাবগুলিকে স্বল্পবিস্তর জটিল ও কৃত্রিম করিয়া তুলিতেছেন, তাঁর নূতন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যখন সংসারধর্ম্মের সহজ ভাবগুলি একটা কৃত্রিম পারলৌকিকতার উৎপাতে ম্রিয়মাণ হইতে আরম্ভ করে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসারবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, কেশবচন্দ্র যখন কেবল আপনিই সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন না, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাকে হীন বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শিবনাথই ব্রাহ্মসমাজের সে আদিকার অনধীনতা ধর্ম্মের পুরোহিত ও রক্ষক হইয়া, তাহাকে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজে অবরোধপ্রথা তুলিবার চেষ্টায় রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল, ব্রাহ্মগণের মধ্যে যখন বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তখন শিবনাথই এই উন্নতিশীলদলের অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এ সকল বিষয়ে শিবনাথই তখন বাংলার সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী যুবকদলের নেতা হইয়া উঠিতেছিলেন। আর সর্ব্বোপরি তিনিই, রাজা রামমোহন রায়ের পরে, ব্রাহ্মধর্ম্মেতে একটা উদার ও প্রবল স্বদেশপ্রেমেরও সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজ একরূপ প্রথমাবধিই যে সার্ব্বজনীন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, শিবনাথ বাবু যে ভাবে ও যে পরিমাণে সেই আদর্শটাকে এক সময়ে ধরিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই তাহা করেন নাই বা পারেন নাই।

শিবনাথ বাবুর স্বদেশহিতৈষা

দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসাধনে এবং কেশবচন্দ্র পারিবারিক জীবনেই মুখ্যভাবে এই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথ বাবুই সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হন। এই জন্য শিবনাথ বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এ বস্তু এতটা পরিস্ফুটভাবে কখনও প্রকাশ পায় নাই। এই জন্যই শিবনাথ বাবুর প্রথম জীবনে তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের মধ্যে একটা সুন্দর সঙ্গতি ও শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিপ্রতিভার ফলে, তাঁর ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে, এমন কি তাঁর দৈনন্দিন চালচলনেও একটা নটস্বভাবসুলভ কৃত্রিমতা বিদ্যমান ছিল। এই 'নাটুকে' ভাবটা শিবনাথ বাবুর মধ্যে এক সময় একেবারেই ছিল না বলিয়া, গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবনলাভ না করিয়াও, তিনি অনেক সরল ধর্ম্মপিপাসু লোকেরও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই অ্যারিষ্টক্রেট

(aristocrat) ছিলেন। জীবনব্যাপী ধর্ম্মসাধন এবং ধর্ম্মচর্চ্চাও ইহাঁদের এই আভিজাত্য-অভিমান নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু শিবনাথ বাবুর কোনও আভিজাত্যের দাবীও ছিল না; আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরেই এক সময়ে একটা ঐকান্তিক নিরহঙ্কারের ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া, তিনি বাংলা সমাজে নানাদিকে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেও, কখনও কোনও রূপ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া উঠেন নাই। আযৌবন তাঁহাকে ডিমোক্র্যাট (Democrat) রূপেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আর এই ডিমোক্র্যাসীর বা গণতন্ত্রতার আদর্শ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ও কর্ম্মজীবনের সকল বিভাগকেও অধিকার করিয়াছিল বলিয়া, যে স্বদেশপ্রীতি মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মজীবনে প্রকাশিত হয় নাই,—শিবনাথ বাবুর মধ্যে তাহা অতি বিশদরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মোপসনা-কালে সমুদায় জগতের কল্যাণের জন্যই প্রার্থনা করিতেন। আর এই রীতিটী তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় সঙ্ঘের (Church of England) উপাসনা পদ্ধতি হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবনাথ বাবুই সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবার রীতি ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবর্ত্তিত করেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের কিম্বা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতপুস্তকে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কোন সঙ্গীত কখনও দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। শিবনাথ বাবুই প্রথমে—

তব পদে লই শরণ।
আর্য্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি,
অবসন্ন আছে, অচেতন হে।
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা আঁধার্ তার কর মোচন।
কোটী কোটী নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,
অন্তর্য্যামি জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন।—

—এই স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক গান ব্রহ্মসঙ্গীতভুক্ত করিয়া দেন।

কুচবিহার বিবাহের কিছুকাল পূর্ব্বে শিবনাথ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া একটী নূতন কর্ম্মিদল গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলটীকে তিনি যে আদর্শে গঠন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে শিবনাথ বাবুর অন্তরের সত্যভাব ও আদর্শ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। স্বদেশপ্রীতিই এই দলগঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই, শিবনাথ বাবুর সে সময়ের ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা পারিবারিক স্বাধীনতা—জীবনের সর্ব্ববিভাগে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদিধর্ম্মের অনধীনতার আদর্শটীকে ফুটাইয়া তোলাই, শিবনাথ বাবুর এই কর্ম্মিদল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি দেবেন্দ্রনাথের আদিব্রাহ্মসমাজে, কি কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, কোথাও

এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে এই অনধীনতার আদর্শটীকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। ফলতঃ শিবনাথ বাবু ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও লোকপ্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক বা কর্ম্মনায়ক ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নিজস্ব আদর্শটীকে এমনভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অতএব এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, শিবনাথ বাবুর মধ্যে এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভাব ও আদর্শগুলি যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, মহর্ষি কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা করে নাই। মহর্ষি এই ধর্ম্মের বীজমাত্র বপন করেন। কেশবচন্দ্র এই বীজকে কতকটা ফুটাইয়া তুলিয়া, আবার আপনার হাতেই তাহাকে চাপিয়া নষ্ট করেন। শিবনাথ বাবুই এক সময়ে ইহাকে পরিস্ফুট ও পরিপকভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, ইহাই তাঁর জীবনের ও কর্ম্মের বিশেষত্ব।

কিন্তু আত্যন্তিকভাবে এই আদর্শটীকে লোকচরিত্রে ও সমাজ-জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একান্তরূপে তার নিজের প্রকৃতির উপরে ছাড়িয়া দিতে হয়। অনধীনতার আদর্শের চরম পরিণতি দার্শনিক রাজকতায়। য়ুরোপে এই ব্যক্তিভিমানী অনধীনতার বা Individualistic Freedom এর আদর্শ ক্রমে এইরূপে এই দার্শনিক অরাজকতাতে বা Philosphical Anarchismএতে যাইয়া পৌঁছাইয়াছে। আপনার যুক্তির সূত্রটী ধরিয়া চলিলে, শিবনাথ বাবুকে এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও পরিণামে এইখানেই যাইয়া উপস্থিত হইতে হইত। আর ইঁহারা যে এতটা দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, তাহাতে ইঁহাদের কাহারই যে একান্ত কল্যাণ হইয়াছে, এমনও বলা যায় না।

কারণ, এ জগতে মানুষ বিশ্বাসভরে, অনন্যচিত্ত হইয়া, ফলাফল-বিচার পরিহারপূর্ব্বক, যে কোনও সিদ্ধান্ত বা পন্থাকে ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করুক না কেন, সেই সিদ্ধান্ত বা সেই পন্থাকে আশ্রয় করিয়াই, ক্রমে পরমতত্ত্বে ও চরম গতিতে যাইয়া পৌঁছাইতে পারে। যুক্তিবাদী ধর্ম্মও এইজন্য, আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে, পরিণামে যাইয়া পরমবস্তু লাভ করিয়া থাকে। আর সাধনের মধ্যপথের আকস্মিক ও মায়িক ভয়বিভীষিকার দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ একান্ত নির্ভর ও নিষ্ঠা সহকারে, নিজের সিদ্ধান্তকে আঁকড়িয়া ধরিতে পারে নাই বলিয়াই, এমন ভাবে নিষ্ফলতা লাভ করিতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্বে শিবনাথ বাবু যে বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, এই নূতন সমাজের নেতৃপদের গুরুতর দায়িত্ব-ভার-গ্রস্ত হইয়া, ক্রমে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর এই জন্যই, ভয়াবহ পরধর্ম্মের চাপে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতিকে অযথা নিষ্পীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া, শিবনাথ বাবু নিজের জীবনেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, আর তাঁর সমাজকেও আত্মচরিতার্থতা লাভে সাহায্য করিতে পারেন নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

জতুগৃহ-দাহ

(মহা ১।১৪৩)

১। হস্তিনাপুরবাসিগণ পাণ্ডুরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনারাজ্যের যথার্থ অধিকারী জানিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিল।

২। এই সংবাদ পাইয়া মন্যুময় দুর্য্যোধন ভীত হইয়া, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের নীতিপ্রয়োগের প্রার্থনা করিল।

(মহা ১।১৪৪)

৩। মোহময় ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণে শোকে নিমগ্ন হইলেন। মন্যুময় দুর্য্যোধন উগ্র কর্ণ, কিতব শকুনি এবং ক্রূর দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, আপনি কৌশলক্রমে পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্ব্বাসিত করুন।

৪। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করিলেন, আমি তাহাই মনে মনে আন্দোলন করিয়া থাকি।

(মহা ১।১৪৫)

৫। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে কহিলেন, তোমরা পশুপতি মহোৎসব উপলক্ষে বারণাবতে গমন কর।

(মহা ১।১৪৬)

৬। দুর্য্যোধন অমাত্য পুরোচনকে সবিনয়ে বলিলেন, তুমি অশ্বতরযুক্ত রথে শীঘ্র বারণাবতে গিয়া, তথায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ কর এবং অতি সমাদরে পাণ্ডবগণকে তথায় বাস করাও। যখন পাণ্ডবগণ নিঃশঙ্কচিত্ত হইবে, তখন জতুগৃহের দ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে।

(মহা ১।১৪৭)

৭। ফাল্গুন মাসের অষ্টম দিনে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবতে যাত্রাকালে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে,—যিনি শত্রুদিগের অলোহজাত অস্ত্রের দ্বারা আহত হন, তিনি শল্লকীগৃহের ন্যায় দুইদিকে পথবিশিষ্ট বিবর দ্বারা অগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পান। অপর, বিচরণ করিলেই পথ চিনিতে পারিবে এবং নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নির্ণয় করিবে।

৮। পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপনীত হইলে, দশদিন পরে পুরোচন তাহাদিগকে "শিব" নামক সেই অশিব গৃহের কথা নিবেদন করিল এবং পাণ্ডবগণ পৃথার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

৯। অনন্তর বিদুরের বন্ধু একজন নিপুণ খনক পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রিতে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিবে।

১০। দুর্য্যোধনের পরিখা-বেষ্টিত দুরাক্রম্য আয়ুধাগার আশ্রয় করিয়া জতুগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পুরোচন সর্ব্বদা ঐ গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিত।

১১। খনক ঐ গৃহের মধ্যে এক বৃহৎ গর্ত্ত করিল এবং তাহার মুখ কপাট দ্বারা বদ্ধ রাখিল।

(মহা ১।১৪৮)

১২। পাণ্ডবগণ জতুগৃহে একবৎসর কাল বাস করিলে পর, জতুগৃহে অগ্নি প্রদানের কাল সমুপস্থিত হইল।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমরা এই আয়ুধাগারে ছয় জন মনুষ্য রাখিয়া, পুরোচনের সহিত ইহাকে দগ্ধ করিব এবং কাহাকেও না জানাইয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করিব।

(মহা ১।১৪৭)

১৩। তখন পৃথা ব্রাহ্মণ ও মহিলাগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে নিমন্ত্রিত সকলেই চলিয়া গেল, কেবল এক নিষাদী পঞ্চপুত্রসহ মদ্যপানে মত্ত হইয়া জতুগৃহে শয়ন রহিল।

১৪। ভীমসেন অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। পুরোচন ও পঞ্চপুত্রসহ নিষাদী অগ্নিতে দগ্ধ হইল।

পৃথার সহিত পাণ্ডবগণ সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবর দ্বারা নির্গত হইলেন এবং পলায়ন জন্য বনে বনে চলিতে লাগিলেন।

(মহা ১।১৪৯)

১৫। এক বনে তাঁহারা পৃথার সহিত নদীর জল মাপিতেছিলেন। এমন সময়ে বিদুরের প্রেরিত এক বিচক্ষণ পুরুষ উপস্থিত হইয়া, পাণ্ডবগণকে যন্ত্রবিশিষ্ট পতাকা-শোভী এক সুখগামিনী তরণি দেখাইয়া দিলেন এবং পাণ্ডবগণকে ও পৃথাকে কাতর দেখিয়া সকলকে নৌকায় উঠাইয়া স্বয়ং তাহাদিগের সহিত চলিলেন; এবং বাহকগণের ভুজবলে তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(মহা ১।১৫৪)

১৬। পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে আর সকলে নিদ্রিত আছেন, কেবল ভীমসেন জাগ্রত আছেন। এমত সময়ে হিড়িম্ব রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীমসেন হিড়িম্বের বধ সাধন করিলে, হিড়িম্বা রাক্ষসীসহ তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(মহা ১।১৫৫)

১৭। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে—গর্ভধারণ মাত্রেই—ঘটোৎকচ জন্মগ্রহণ করিল; এবং হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচ উত্তর দিকে প্রস্থান করিল।

(মহা ১।১৫৬)

১৮। পাণ্ডবগণ তপস্বীর বেশে বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। একদা মহর্ষি ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া গেলেন।

(মহা ১।১৬৪)

১৯। ভীমসেন বক অসুর সংহার পূর্ব্বক তাহার কটিদেশ ভগ্ন করিয়া তাহার ভগ্ন দেহ এক চক্রা নগরীর দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিলেন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহাস।

বৈমানিক জতুগৃহদাহ কাণ্ড বুঝিতে হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে—

১। পনর শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমান পঞ্জিকার প্রকটন হয়, তৎকালে মহাবিষুব ক্রান্তিপাত (Vernal eqninoctial point) মেষ রাশির প্রথমে এবং জলবিষুব ক্রান্তি-পাত (autumnal equinoctial point) তুলা রাশির প্রথমে অবস্থিত ছিল; এবং বিষুবতী রেখার (Celestial equator) উত্তরে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা এই ছয় রাশি অবস্থিত ছিল! অবশিষ্ট ছয় রাশি বিষুবতী রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

২। বিমানে যে তিনটী স্বর্গদ্বার আছে (ঋঃ বেঃ ১০।৬৭।৪) ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্ব দ্বারটী (মহাবিষুব বিন্দু) মিথুন রাশির প্রথমে ইনবকা নক্ষত্রের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এবং পশ্চিম দ্বার—জল বিষুববিন্দু—ধনুরাশির প্রথমে পঞ্চতারাময় মূলা নক্ষত্রের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। তৎ-কালে মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক এই ছয় রাশি বিষুবতী রেখার উত্তরে ছিল এবং অবশিষ্ট ছয় রাশি বিষুবতীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

৩। তৎকালে আকাশগঙ্গার কপিল ধারা মিথুন রাশি ও স্বর্গের পূর্ব্বদ্বার প্লাবিত করিত; এবং ভাগীরথী ধারা বৃশ্চিক রাশি ও স্বর্গের পশ্চিম দ্বার প্লাবিত করিত।

৪। তৎকালে বিমানের পশ্চিম দ্বারের দূর দক্ষিণে আকাশগঙ্গামধ্যে যন্ত্রযুক্ত পতাকা-শোভী তারা (নৌ অর্ণবযান মণ্ডল= Argo Navis) ভাসমান ছিল। মহর্ষি অগস্ত্য (Canopus) এই তারানৌকার কর্ণধার (মাঝি) রূপে এই দিব্য নৌকার সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং এই দিব্য নৌকার কর্ণধার বলিয়া ভারতের নাবিক ঋষি মান্য নাম উপহার পাইয়াছেন। (ঋঃ বেঃ ১।১৬৫।১৫।) যথা

এষঃ বঃ স্তোমঃ মরুতঃ ইয়ম্ গীঃ মান্দার্য্যস্য মানস্য কারোঃ।

অস্যার্থঃ

হে মরুৎগণ! তোমাদিগের এই স্রোত ও গীত মান্য মান্দার্য্য বিরচিত। মান (হাল বা নৌ-নিগড়ের ভার) যুক্ত বলিয়া মহর্ষির মান্য নাম হইয়াছে। যথা—

মানেন সম্মিতঃ যস্মাৎ তস্মাৎ মান্যঃ ইতি উচ্যতে।—বৃহৎ সংহিতা।

সিন্ধুরাজ (সোম পবমান=the Milky way) বস্ত্র পরিধান করিয়া এই দিব্য দীপ্তিমন্ত নৌকার উপর আরোহণ করিয়াছেন। যথা—

রাজা সিন্ধুনাম অবশিষ্ট বাসঃ
ঋতস্য নাবম্ আ অরুহৎ রজিষ্টাম।
ঋঃ বেঃ ৯।৮৯।২

বিমানে হিরণ্য-নির্ম্মিত হিরণ্য-বন্ধন নৌকা বিচরণ করিতেছে।

ঐ নৌকার পথ হিরণ্ময় এবং উহার অরিত্র (দাঁড়) হিরণ্ময় আছে। যথা—

হিরণ্ময়ী নৌঃ অচরৎ হিরণ্য বন্ধনা দিবি।
হিরণ্যয়াঃ পন্থানঃ আসন্ অরিত্রাণি হিরণ্যয়া।
(অঃ বেঃ ৫।৪।৪-৫)

৫। মাহিষ্মতী-পতি কৃতবীর্য্যের বংশধর-গণ ধনলোভে ধনাঢ্য ভৃগুবংশীয় ঋষিগণকে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। এক ভৃগুপত্নী

হিমাচলের গিরিদুর্গে গর্ভ উরুদেশে গোপন করিয়া পলাইতেছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া দেখে, ব্রাহ্মণী আপন তেজে জ্বলিতেছেন। শিশু মাতৃ-উরু ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে, তাহার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হইল। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্ধত্ব দূর করিলেন; কিন্তু তাঁহার ক্রোধাগ্নি ত্রিভুবন উত্তাপিত করিল। ঔর্ব তাঁহার ক্রোধাগ্নি বরুণালয়ে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অগ্নির নাম বাড়বানল।

(মহা ১।১৭৮—১৮১)

৬। সন্ধ্যাকালে বিমানের পশ্চিম দ্বারে বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। অস্তোন্মুখ গ্রহগণ অস্তকালে সেই অগ্নিময় বিবরে প্রবেশ করে। এবং সুমেরুবাসী তারাদর্শকের দৃষ্টিতে গ্রহগণ বহুকাল পরে আবার পূর্ব্ব দ্বারে উদিত হয়। বেদে এই পশ্চিমদ্বারস্থিত বৈমানিক বিবর ঋবীস ও ধর্ম্ম আদি উপাধি লাভ করিয়াছে। এই বিবর বেদভাষ্যকারগণের 'ভূগর্ত্ত'। রেভ বন্দন অত্রি আদি জ্যোতিষ্কগণ এই অগ্নিময় বিবরে পতিত হইলে, অশ্বিদ্বয় তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

৭। প্রকাণ্ড তারা বৃশ্চিকের ধড় সমগ্র বৃশ্চিকরাশি অধিকার করিয়া আছে এবং তারা বৃশ্চিকের সূর্পাকৃতি বাহু-চতুষ্টয় তুলা রাশির পূর্ব্ব ভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে; এবং তারা বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশ অর্থাৎ পঞ্চ তারাময় মূলা নক্ষত্র ধনু রাশির পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে।

এই সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড তারা বৃশ্চিক ইতিহে চতুর্দ্দন্ত "বারণ" (হস্তী) নাম এবং "কম্বোজ অশ্ব" নাম উপহার পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভৌম মঙ্গল নরক বধ করিয়া এই চতুর্দ্দন্ত গজ ও কম্বোজ অশ্ব দ্বারকা (the western door of heaven) নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩০)

বেদব্যাস এই চতুর্দ্দন্ত গজকে নরক মঙ্গলের বাহন কল্পনা করেন নাই। নরকসুত ভগদত্তকে এই চতুর্দ্দন্ত গজের উপরে বসান হইয়াছে।

৮। নরক মঙ্গল এই বৃশ্চিক রাশির অধিপতি এবং মূলা নক্ষত্রের অধিপতি।

মঙ্গল গ্রহের রুচি বিবিধরূপ। মঙ্গলগ্রহ কখন দীপ্তিহীনপ্রায় হয়। কখন বা প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ জ্যোতি ধারণ করে। দীপ্তিহীন মঙ্গল গ্রহ বিরোচন উপাধি এবং জ্বলন্ত মঙ্গল পুরোচন উপাধি ধারণ করে।

অঙ্গারক" গ্রহ মঙ্গল (শিব) নাম ধারণ করিলেও, এই মৃত্যুদেব রাক্ষসগ্রহ মানবের অমঙ্গলময় বা অশিবময় এবং ঐ রাক্ষসের গৃহ বৃশ্চিকরাশি ও মূলা নক্ষত্র মানবের অশিবময়।

আবার মঙ্গল গ্রহ ত্রিগুণময় বলিয়া ত্রিত নাম ধারণ করেন এবং মঙ্গলগৃহ বৃশ্চিক রাশি ত্রিত-দেব হইতে ত্রৈতন নাম উপাধি পাইয়াছেন। এই ত্রৈতন বেদে (ঋঃ বেঃ) ত্রৈতন দস্যু নামে খ্যাত হইয়াছে; এবং বেদ মতে (ঋঃ বেঃ) ত্রিত দেব মদকর সোম পান করেন বলিয়া, পুরাণে ত্রৈতন দস্যুরাজ মদ্যপায়ী ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণিত আছে। এই মদ্যপায়ী দস্যুবনিতা পঞ্চতারাময় মূলা-নক্ষত্র পুরাণে মদ্যপায়ী নিষাদী বলিয়া বর্ণিত হয় এবং নিষাদী পঞ্চ তারাত্মক পঞ্চপুত্রবতী বলিয়া বর্ণিত হয় এবং এই মদ্যপায়ী দস্যুর

রাজ্য পুরাণের মন্ত্রভূমি। (কর্ণপর্ব্ব ৪০।৪৪ অধ্যায় দেখ)

৯। তারা বৃশ্চিক সোমধারায় সমাপ্লুত আছে। তারা বৃশ্চিকের ঊর্দ্ধে ও উত্তরে সোমধারা মধ্যে বাণমণ্ডলে (Sagatta, a constellation) তারা তর বিদ্যমান আছে। ঐ তারাশর আদি হইতে সোমধারা শরস্তম্ব নাম উপহার পাইয়াছে। এই শরস্তম্ভ সুসংবৃত শ্বেত পর্ব্বতে কুমার দেবের জন্ম হয় বলিয়া কুমারদেব শরজন্মা উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই শরস্তম্ভ ভগ্ন করিয়া হনুমান্ রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করিয়াছিলেন। এই শরস্তম্ভ হইতে বৃশ্চিকরাশিস্থ সোমধারা দুর্য্যোধনের অস্ত্রাগার বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।

১০। ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে সুমেরুবাসী তারাদর্শক আরও দেখিতেন যে, বিমানের অগ্নিময় পশ্চিম দ্বারে সূর্য্যাদি গ্রহগণ প্রবেশ করিলে, সূর্য্যদেব ছয় মাস পরে পূর্ব্বদ্বারে তাঁহার একচক্র রথে পুনরাগত হইতেন। এই একচক্র রথ হইতে বিমানের পূর্ব্বদ্বার-সন্নিহিত প্রদেশ "একচক্রা নগরী" নাম গ্রহণ করিয়াছে। মিথুন রাশির প্রথমে ইন্বক নক্ষত্রের পার্শ্বে এই একচক্রা নগরী রাশিচক্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপপত্তি

বিমানের পশ্চিম দ্বারে মূলানক্ষত্রে পুরোচন অধিষ্ঠিত আছেন। মানিয়া লইলাম যে, জতুগৃহ দাহ প্রকৃত ঘটনা। জতুগৃহমধ্যে নিপুণ খনক বসিয়া গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গর্ত্ত খনন করিতেছেন পুরোচন দ্বারদেশে সতত উপবিষ্ট থাকিয়াও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। এই গল্পের রচয়িতার বুদ্ধিকৌশলকে অথবা ইতিবৃত্তবাদীর বিশ্বাস-গভীরতাকে বাহাদুরী দিতে হয়; তাহা নির্ণয়ে আমরা নিতান্ত অক্ষম হইলাম।

তবে এই উপলক্ষে "শ্বশুর-জামাতা-সংবাদের" মূল প্রশ্নটী আপনা হইতে আসিয়াই মনে পড়ে। "এই প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িতে যে মাটি উঠিল, সে মাটি কি হইল?"

দ্বিতীয় কথা এই যে, যুধিষ্ঠির মতলব বাহির করিলেন যে, "আয়ুধাগারে ছয় জন মনুষ্য রাখিয়া পুরোচনের সহিত ইহাকে দগ্ধ করিব" এবং কার্য্যতঃ তাহাই করা হইল। যুধিষ্ঠিরের মতলবে নিরীহ পঞ্চ কুমার সহ নিষাদপত্নীকে দগ্ধ করা হইল। স্তব্যকব্যে পঠিত হয়—"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" ইতিবৃত্ত-বাদীর কাণে শুনিতে বেশ সুমিষ্ট শুনায়। নয় কি?

ঐতিহিক রহস্যে দেবচরিত্রে পাপ স্পর্শ হয় না। এইজন্যই শূদ্রক বা বালিবধে, সীতার বনবাসে বা লক্ষ্মণবর্জ্জনে নিষ্কলঙ্ক শ্রীরামচরিত্রে পাপস্পর্শ হয় নাই। এইজন্যই গুরুপত্নী অহল্যার (হলচালন-নিষেধক অমা চন্দ্র) হরণে দেবরাজ শতক্রতুর চরিত্রে পাপ স্পর্শ হয় নাই। এইজন্যই সরস্বতী হরণে বিধাতার বিমল চরিত্রে কলঙ্ক লগ্ন হয় নাই। এইজন্যই তুলসী হরণে পরমদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পাপ স্পর্শ ঘটে নাই; এবং পঞ্চকুমার সহ নারী হত্যায় যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে পাপস্পর্শ হয় নাই

কারণ এ সব ভোজবাজী বৈ ত নয়। সুতরাং ঐতিহিক রহস্যে ধর্ম্মরাজ পঞ্চকুমার হত্যা হইলে, এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, সন্ধ্যা-কালীন বাড়বাগ্নিতে পঞ্চ তারকাসহ মূলা নক্ষত্র দগ্ধ হইয়া থাকে। সেও ছায়া বাজী। বাড়বাগ্নিতে (Zodiacal Light) দহনশীলতার লেশমাত্র নাই খালি কবি-কল্পনা মাত্র।

এখন জতুগৃহদাহ আর একটু পড়িলেই ঐতিহাসিকের রচনা-চাতুর্য্য হৃদ্‌বোধ হইবে।

বিশাখা হইতে মূলা পর্য্যন্ত বারণাবত নগর বিস্তৃত। নগর সমীপে পশুপতি রুদ্র দৈবত স্বাতি নক্ষত্র বিরাজমান রহিয়াছে; এবং বারণাবতে শরস্তম্ভ সোমধারা সুরা রূপে সতত বিরাজমান রহিয়াছে। এই আয়ুধাগার আশ্রয় করিয়া জতুগৃহ রচিত হইল।

নিপুণ খনক বিশ্বকর্ম্মা বিমানের পশ্চিম দ্বারে বিবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহগণ সন্ধ্যাকালে বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, সেই বিবরে অস্ত গমন করেন।

সেই বিবরে প্রবেশ করিলে, গ্রহগণ দেখেন যে, সম্মুখে মহর্ষি অগস্ত্য তারা নৌ সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহগণ নৌকাযোগে আকাশগঙ্গা পার হইলেন। বৈমানিক বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রহগণ বৈমানিক পূর্ব্বদ্বারে উদিত হইলেন। সম্মুখে একচক্রা নগরী এবং তারা-বক আকাশগঙ্গায় বিহার করিতেছেন। উদয়-কালে উদন্ত যম কাল হরণ করেন, সুতরাং একচক্রা নগরীতে পঞ্চ পাণ্ডবের কিছু-দিনের জন্য বসবাস কল্পিত হইল এবং বর্জ্জিত ইন্-বক নক্ষত্র বক অসুর নামে নিহত ও পুরদ্বারে ভগ্নকটি ভাবে নিক্ষিপ্ত হইল। সত্য মিথ্যা তারাচিত্র বা আকাশ দেখিলেই মালুম হইবে।

তারাদর্শক।

নারী-ধর্ম্ম

সূচনা

আজ কাল নর-নারীর অধিকার লইয়া জগতে নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু যে অধিকার প্রকৃতিগত বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তর্ক করিয়া, রাগ করিয়া, আন্দোলন করিয়া, সে অধিকারের পরি-বর্ত্তন অসম্ভব। সেই জন্য প্রকৃতিগত বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-আদর্শ অনুসারেই আমরা নারী-জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

কর্ত্তব্যের কথা উঠিলেই জীবনের চরম লক্ষ্যের কথা মনে করিতে হয়। কারণ, আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয়। সেইজন্য নারী-জীবনের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে সর্ব্বাগ্রে নারী-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান ও ভগবৎপ্রাপ্তি। জন্ম-জন্মান্তরের কদভ্যাসের ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা অধর্ম্মের

দিকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে অধর্ম্মের আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া আনার প্রয়োজন। তাই ভগবৎপ্রাপ্তি-সাধনার প্রথম সোপান সংযমের সাধনা এবং তাহার পরে প্রীতির সাধনা, ভক্তির সাধনা, ত্যাগের সাধনা। ইহাই হিন্দুর বিখ্যাত আশ্রমধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর বিমলধারা যখন জীবনের প্রভাতে আপনার ক্ষুদ্র শিলাগৃহ ছাড়িয়া সংসার-পথে প্রথম বাহির হয়, তখন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অধিক আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন চতুর্দ্দিকের বারিধারা শোষণ করিয়া তাহার আবিল জলোচ্ছ্বাস যৌবনের মত্ততায় গভীর গর্জ্জনে হুঙ্কার করিয়া উঠে, তখন তাহার সেই দুর্ব্বার গতিবেগকে সংযত করার জন্য নানা কৌশলের প্রয়োজন হয়।

জীবনের অরুণালোকে যখন সকলই স্নিগ্ধ, সকলই মধুর, যখন প্রবৃত্তির ক্ষীণ কুশাঙ্কুর কণ্টকের মত কঠিন হইয়া উঠে নাই, যখন দুর্দ্দমনীয় বাসনার ধূসর ধূলিঝঞ্ঝা জীবনকে অন্ধকার করিয়া ফেলে নাই, যখন জ্ঞানের সূর্য্য ভোগলিপ্সার ঘন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই, তখন সাধনার পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে নিজের শক্তিই যথেষ্ট, গুরুর উপদেশ ও আদর্শই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রচুর।

কিন্তু যখন প্রভাতের সূর্য্য মধ্য গগনে উঠিয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতে থাকে, ধূসর ঝঞ্ঝার প্রবল প্রতাপে জল স্থল কাঁপিয়া উঠে, বাসনার মেঘ-গর্জ্জনে হৃদয়াকাশ মুহুর্মুহুঃ নিনাদিত হয়, তখন আর কেবল নিজের সামর্থ্যে নির্ভর করা যায় না। পদে পদে পদস্খলনের আশঙ্কা ঘটে। তখন জীবন-পথে অবিচলিত থাকিবার জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবাহ। পরস্পরকে কর্ত্তব্য পালনে সাহায্য করিবার জন্য নর-নারীর এই পুণ্য মিলন। তাই কৈশোরের ব্রহ্মচর্য্যের পরে যৌবনের গার্হস্থ্য-আশ্রমের আরম্ভ।

"তথা নিত্যং যতেয়াতাং
স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ
যথা নাভিচরেতাং তৌ
বিযুক্তা বিতরেতরম্।"
—মনু।

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বদা এমত যত্ন করিবে, যাহাতে ধর্ম্মার্থকাম বিষয়ে পরস্পরের ব্যভিচার, না হয়। ভগবান্ নর-নারীর প্রকৃতি এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে একের অভাব অন্যের দ্বারা সম্যক্ পরিপূর্ণ হইতে পারে এবং পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে সহজে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারে।

যাঁহারা নরনারীকে সমপ্রকৃতি ও সমশক্তিসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া, উভয়কে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে জীবনের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, ভগবানের শুভ উদ্দেশ্য এবং সুন্দর ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চান।

সুতরাং পুরুষজাতিকে ধর্ম্মলাভে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই নারীজীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

"ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ।
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্॥"
—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

ধর্ম্মের জন্যই ভার্য্যা, ধর্ম্মের জন্যই পুত্র, ধর্ম্মের জন্যই গৃহ এবং ধর্ম্মের জন্যই ধন।

হিন্দুশাস্ত্রকার গার্হস্থ্য-আশ্রমে রমণীর জন্য যে সকল কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, পুরুষকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তদধিক কর্ত্তব্য পালনের আবশ্যকতা নাই।

হিন্দুশাস্ত্রমতে রমণী গার্হস্থ্য-আশ্রমের প্রাণস্বরূপ।

"যথা রথশ্চ রথিনাং গৃহিণাঞ্চ তথা গৃহম্।
সারথিস্তু যথা তেষাং গৃহস্থানাং তথা প্রিয়া॥"
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

রথীর যেমন রথ, গৃহীর তেমনি গৃহ, এবং রথের যেমন সারথি, গৃহস্থের তেমনি স্ত্রী।

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥"

সন্তানের উৎপাদন, জাত সন্তানের পরিপালন, এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মূলে প্রত্যক্ষ ভাবে রমণী। রমণী কেবল সহধর্ম্মিণীরূপে নহেন, জননীরূপে ও গৃহিণীরূপে মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্য অবতীর্ণা।

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"
—মনু।

সন্তান-জননী বলিয়া স্ত্রীলোক পরম-কল্যাণভাজন; তাঁহারা গৃহের দীপ্তিস্বরূপা ও পূজনীয়া; তাঁহারাই গৃহের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীতে ও রমণীতে কোন প্রভেদ নাই।

স্বামীর উপর স্ত্রীর ও সন্তানের উপর মাতার অসীম প্রভাবের কথা সর্ব্বজনবিদিত। গর্ভাবস্থায় পর্য্যন্ত জননীর মনোভাব সন্তানের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হিন্দুসংসারে স্বামী পুত্র ভিন্ন আরও অনেকের স্থান আছে। তাহাদেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি-অবনতি বহুল পরিমাণে গৃহিণীর উপর নির্ভর করে।

সুতরাং সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর, জননীরূপে সন্তানের, এবং গৃহিণীরূপে সমস্ত পরিজনের কল্যাণবিধানের ভার রমণীর উপর।

আত্মার সঙ্গে শরীরের দৃঢ় সম্বন্ধ।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

আত্মার উন্নতির জন্য শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের উদারতা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং সমস্ত পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া, ব্যাধি ও দুশ্চিন্তা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া, শান্তি ও পবিত্রতার মধ্যে সকলকে "মানুষ" করিয়া তোলাই রমণীর কাজ। গৃহের অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনারাশি দক্ষহস্তে দূর করিয়া, 'পুঞ্জিত আয়োজনকে' শোভায় ও সৌন্দর্য্যে মনোহর করিয়া তোলা; জীবন-সংগ্রামের বিকট ভীষণতাকে স্নেহ ও প্রীতির জ্যোৎস্নাপাতে সহনীয় করিয়া তোলা; পথভ্রান্ত হতভাগ্যের পথভ্রম দূর করিয়া, স্নেহভরে তাহাকে সুপথে পৌছাইয়া দেওয়া কল্যাণময়ী রমণীর জীবন-ব্রত। কবিবর রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে রমণীর এই

কল্যাণময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রদ্ধাভরে গাহিয়াছেন।

"সাঙ্গ হ'য়েছে রণ
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হ'ল আয়োজন।
তুমি এস এস নারি,
আন তব হেম ঝারি,
ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন—
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন—
সুন্দর কর—সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন।

এস সুন্দরি নারি—
শিরে ল'য়ে হেম ঝারি
হাটে আর নাই কেহ
শেষ ক'রে খেলা ছেড়ে এনু মেলা
গ্রামে গড়িলাম গেহ ;
তুমি এস এস নারি
আন গো তীর্থবারি
স্নিগ্ধ হসিত বদন-ইন্দু—
সিঁথায় আঁকিয়া সিন্দূর-বিন্দু—
মঙ্গল কর—সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ।

এস কল্যাণি নারি
বহিয়া তীর্থবারি
বেলা কত যায় ব'হে—
কেহ নাহি চাহে খর রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এস এস নারি
আন তব সুধাবারি
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শতচাঁদে গড়া শোভন শঙ্খ
বরণ করিয়া সার্থক কর
পরবাসী পথিকেরে।

আনন্দময়ি নারি
আন তব সুধা-বারি
স্রোতে যে ভাসিল ভেলা ;
এবারের মত দিন হ'ল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস এস নারি
আন গো অশ্রুবারি
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে ক'রে দিক্ করুণা বৃষ্টি
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক বিদায়ের বেলা।

অয়ি বিষাদিনি নারি
আন গো অশ্রুবারি
আঁধার নিশীথ রাতি ;
গৃহ নির্জ্জন শূন্য শয়ন
জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এস এস নারি
আন তর্পণবারি
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ
এলো কেশপাশে শুভ্রবসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এস তাপসিনি নারি,
আন তর্পণবারি।

সুকবি নবীনচন্দ্র রমণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদ-
রমণী 'সুভদ্রা'র মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ
রোগে শান্তি দুঃখে দয়া
শোকেতে সান্ত্বনাছায়া
দিদি এই ধরাতলে রমণীর বুক,
ততোধিক রমণীর আছে কি বা সুখ।
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ
সৃজি সেইরূপ দিদি! রোগ শোক দুখ
সৃজিলা অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারীবুক।
আছে আর কিবা সুখ হায়! এইরূপে যদি
ঢালিয়া অমৃত মৃতে শান্তি যন্ত্রণায়
রমণী-জীবনগঙ্গা বহিয়া না যায়!"

এই কল্যাণময় রমণীজীবনকে (১) কুমারী (২) সহধর্ম্মিণী (৩) জননী ও (৪) গৃহিণী এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আমরা রমণী-জীবনের এই বিপুল কর্ত্তব্যরাশির বিস্তারিত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক লিখিয়াছেন—The condition of its women is the truest test of a people's civilization. Her status is her country's barometer. কোন জাতির স্ত্রীলোকের অবস্থা সে জাতির সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা দেশের বায়ুমান যন্ত্রের মত।

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। দেশের স্ত্রীজাতি উন্নত না হইলে, দেশের উন্নতি সম্ভব হয় না। কারণ, স্ত্রীলোকই জননীরূপে, সহধর্ম্মিণীরূপে, অভিভাবিকারূপে বহুলপরিমাণে পুরুষের চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুলে। মহৎ-চরিত্রের মহত্ত্বের বীজ তাঁহার জননীর চরিত্রে নিহিত, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

যখন কুন্তীর মত পরদুঃখকাতরা, গান্ধারীর মত ধর্ম্মপরায়ণা, সীতার মত পতিব্রতা, সুভদ্রার মত জননী, বিদুলার মত তেজস্বিনী, জনার মত স্বদেশপ্রিয়া, মৈত্রেয়ীর মত ব্রহ্ম-বাদিনী বিদ্যমান ছিলেন, তখনই যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মপ্রাণের, অর্জ্জুনের মত বীরের, রাম-চন্দ্রের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠের, অভিমন্যুর মত সুপুত্রের, প্রবীরের মত তেজস্বীর, বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যের মত জ্ঞানীর, কর্ণের মত দাতার, ভীষ্মের মত ত্যাগশীলের, ধ্রুবের মত ভক্তের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। *

মাতৃজাতি যেদিন হইতে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, সন্তানেরও সেদিন হইতে অবনতি। আবার যদি জাতীয় উন্নতিসাধন প্রার্থনীয় মনে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে রমণীজাতিকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সমুন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। রমণীজাতির উন্নতি না হইলে, দেশের উন্নতি কোন মতেই সম্ভব হইবে না। (ক্রমশ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ।

* তাই, না ভীষ্মাদির মত পুরুষ জন্মিতেন বলিয়াই এই সকল মহিলার উদ্ভব হইয়াছিল?—বঃ সঃ

বিষবৃক্ষ

দেবেন্দ্র দত্ত ও হৈমবতী

স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন সুখসৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার আধার; নরক নিরবচ্ছিন্ন কদর্য্যতা'র স্থান। এ সংসার উভয়ের মিশ্রণ বিষবৃক্ষে সংসারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার স্বর্গীয় ভাগ আমরা দেখিলাম। তাহার নারকীয় ভাগও শিক্ষার জন্য, স্বর্গীয় ভাগের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য, দেখা কর্ত্তব্য। দেবেন্দ্র দত্ত এ ভাগের প্রধান চিত্র, এককালে সৌন্দর্য্যবিহীন নহে, আমূল ঘৃণার্হও নহে; গুণ থাকিয়াও, ভালবাসিবার জিনিষ থাকিয়াও, সংযমশিক্ষার অভাবে, আত্মশাসনশক্তির অভাবে, ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে, নরকের সংস্পৃষ্ট হইয়া মানুষ কিরূপ দয়ার পাত্র হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত। দেবেন্দ্রের জীবনে দুর্ব্বিষহ দুঃখের কারণ বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সে দুঃখ নিমর্জ্জিত করিবার চেষ্টায়, তাহা ভুলিবার চেষ্টায়, তিনি ভ্রমের পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ফলে শান্তির অনুসন্ধানে জ্বালা, রোগ, ভোগ, গৌরবহীনতা, একরূপে আত্মহত্যা। সুখ নিবৃত্তিমূলক, প্রবৃত্তিমূলক নহে—দেবেন্দ্র দত্ত তাঁহার নিজ জীবনে তাহাই প্রমাণিত করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা কেবল সমাজের সুখের বিঘ্নকর নহে, নিজের সুখেরও বিনাশ সাধন করে। তাঁহার দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত যুবকের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাস্থল, অপরিহার্য্য কর্ম্মফল দেখিয়া সতর্ক হইবার জন্য। এ চরিত্রের আলোচনা আমরা প্রসঙ্গক্রমে অন্যস্থলেও করিয়াছি, সুতরাং লিপিবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুবুদ্ধি, সুচরিত্র, শীতলস্বভাব সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রের ব্যবহারে আন্তরিক বিরক্ত হইয়াও, দেবেন্দ্রের মঙ্গলকামনা পরিত্যাগ করেন নাই, দেবেন্দ্রকে ঘৃণিতবৎ বর্জ্জন করিয়া সহৃদয়তার অভাব দেখান নাই। এ চরিত্রের আলোচনা করিয়া, পাঠকেরও মনোভাব সেইরূপই হইবে, মনে করি। অর্থাৎ দেবেন্দ্রের কার্য্য ঘৃণিত ও বিরক্তিকর হইলেও, পাঠক তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষালাভ করিয়া, তাঁহার জীবনের পথ পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় অবিকৃত থাকিয়া, এরূপ চরিত্র যে দয়ার পাত্র, তাহা অনুভূত করিবেন, কবির ইহাই উদ্দেশ্য আমাদের ধারণা। কবি তাঁহার এ চিত্র তাঁহার হৈমবতী-চিত্রের কদর্য্যতা-প্রস্ফুরণের উপায় বা কৌশলস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। হৈমবতীই দেবেন্দ্র দত্তের চরিত্রচ্যুতির মূল কারণ এবং উভয়ের এ সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য কবিকে অধিক কথা বলিতে হয় নাই। চিত্রকর সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়া তাহার উপর মসী নিক্ষিপ্ত করিলে যেমন সম্ভাবিত সুন্দর চিত্রের সে বহিরঙ্কন বিনষ্ট হয়, এবং সে

মূলরেখার ধ্বংসাবশেষ ঐ মসীরাশিকে অধিকতর নয়নবিরক্তিকর ব'লয়া প্রতীয়মান করে, সেইরূপ কবি দেবেন্দ্রকে মূলে বিধাতার সুন্দর সৃষ্টির ভাবে পরিচিত করিয়া, তাঁহার জীবনে হৈমবতী সংযোগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সে জীবনের গৌরব নষ্ট করিয়াছেন, এবং সে উপায়ে হৈমবতীর কদর্য্যতা সহজে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। কবিকে হৈমবতী-চিত্র আঁকিতে হয় নাই, অন্য চিত্রের সৌন্দর্য্যবিনাশী মসীরাশিবৎ তাহা আপনিই বিরক্তির সামগ্রীরূপে পাঠকের মনশ্চক্ষুসমক্ষে মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে।

হীরাদাসী, মালতী গোয়ালিনী

সংসারে সাধারণ ইন্দ্রিয়-লালসাকেও প্রেমানুরাগ নাম দিয়া, মানুষে প্রেমানুরাগকে ভেঙ্গাইয়া থাকে। হীরার দেবেন্দ্র দত্তে অনুরাগ স্বার্থময় হইলেও, ঠিক সেই শ্রেণীর নহে। হীরা বালবিধবা, দাসীবৃত্তিচারিণী, তাহার চরিত্র ইন্দ্রিয়লালসা-কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হীরার চিত্তসংযমে ক্ষমতা ছিল, এবং ভদ্রপরিবারস্থা থাকিয়া, সে দেবেন্দ্রকে অনুরাগের চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে বরাবর সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। দেবেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়াও, সে কেবল ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তির আশায় তাহাতে উপগতা হয় নাই। হীরার হৃদয়ে রূপপ্রভাবে রূপজ প্রণয়েরই উদ্ভব হইয়াছিল। সঙ্গীত-রসাস্বাদও তৎসঙ্গে মিলিত হইয়া, সে আকর্ষণের সহায়তা করিয়াছিল। সে দেবেন্দ্রকে প্রণয়িভাবে লাভ করিত পারিলে, অনুরাগানুগতা দাসীর ন্যায় তাঁহার চরণ-সেবারই প্রার্থিণী ভাবে ছিল, সাধারণ লালসাকৃষ্ট হইয়া সাময়িক মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয় নাই। এইটুকুই হীরার চরিত্রের সৌন্দর্য্য। দেবেন্দ্র দত্ত মালতী গোয়ালিনী দ্বারা হীরাকে ডাকাইয়া লইয়া, বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া, ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিয়া, হীরা কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া, এরূপ কথা বলিলেন: ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।" ঈর্ষা-প্রণোদিত না হইলে, ইহাও হীরাচরিত্রে প্রশংসার কথা। আমরা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক নহি যে, হীরা তাহার প্রভু-সেবায় বিশ্বস্ততার চরিত্রবলেই দেবেন্দ্রের কথার এরূপ উত্তর করিয়াছিল, যদিও পরে ঈর্ষাবুদ্ধি-চালিত হইয়া, তাহার কুটীরস্থিত কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিবে, সে কথার বিবেচনা করিতে বসিয়া, মনে মনে দেবেন্দ্র-প্রদর্শিত প্রলোভনের কথারও আলোচনা করিয়াছিল। স্থূল কথা, হীরা দাসী হইলেও এবং এ শ্রেণীর লোকে ঐশ্বর্য্যশালী প্রভুর আশ্রয়ে অর্থাদি পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষা যে করে, সেরূপ স্বার্থসাধনে তাহার বিশেষ তৎপরতা থাকিলেও, সে তাহার কার্য্যে চিত্তের দৃঢ়তামূলক গুণ প্রদর্শনে অসমর্থা ছিল না। ঈর্ষাই তাহার চরিত্রের ক্ষতস্থল এবং তাহাই তাহাকে নারকীয় চরিত্ররূপে প্রতিফলিত করিয়াছে। ঈর্ষার বশীভূত হইয়া, হীরা যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত। এই কলুষিত মনের বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়াই, সে সর্ব্বজনশ্রদ্ধাভাজন সূর্য্যমুখীরও অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এই নারকীয় ভাবই

তাহাকে সরলা অবলা সর্ব্বপ্রকারে দোষবিহীনা কুন্দনন্দিনীর প্রাণহন্ত্রী করিয়াছিল। ঈর্ষা এ চিত্রের স্থূল কালিমাময় রেখা। এ চিত্রের দিকে দৃষ্টি করিলেই, সেই কাল রেখায় চক্ষু ভরিয়া যায়। চতুরতা, স্বার্থসাধনপটুতা, হীরা-চিত্রের একটী প্রকৃষ্ট রেখা, এবং হীরা অতি চতুরা ছিল বলিয়াই, সে তাহার ঈর্ষাবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে অতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

সাধ্বী এবং ভদ্রপরিবারস্থা থাকিলেও, হীরার রসের অভাব ছিল না, এবং সে তাহার 'গঙ্গাজল' মালতী গোয়ালিনীর সহিত গলা মিলাইয়া রসের গান গাইতে গাইতে পথে যাইতে, অন্ততঃ রাত্রিকালে এরূপ করিতে, কোনরূপ দ্বিধার কারণ মনে ভাবিত না। কিন্তু মালতী গোয়ালিনীর সহিত তাহার কেবল এই থানেই প্রকৃতি-সাদৃশ্য ছিল, অন্য কিছুতে মালতীর সহিত হীরার বা তাহার সহিত মালতীর তুলনা হয় না। মালতীকে কবি বিশেষরূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করেন নাই, পার্শ্ববর্ত্তী চিত্ররূপেই প্রদর্শিত করিয়াছেন; তথাপি যে এক রেখা টানিয়াছেন তাহাতেই পাঠক তাহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। কবির কথায় "মালতী গোয়ালিনীর মত রসিক স্ত্রীলোক—

* * * *

দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ করে।" কেবল কি রসের খাতিরেই মালতী পাপের সেবা করিত? মনুষ্যচরিত্রে বিচিত্র কি?

আখ্যায়িকায় উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর কথা এই সমালোচন প্রবন্ধে স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশচন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের সম্বন্ধে আমরা বিশেষরূপে উল্লেখ কিছু করি নাই। শ্রীশচন্দ্রও অতি প্রীতিকর চিত্র, সুশিক্ষিত ও সুন্দরস্বভাব, সদ্বন্ধু ও স্নেহশীল। নগেন্দ্রের ন্যায় তিনিও অতি ভার্য্যাবৎসল, যদিও কাব্যের প্রধান চিত্র নয় বলিয়া, কবি তাঁহার সে প্রকৃতির অঙ্কনে অধিকতর বর্ণ প্রয়োগ করেন নাই। হরদেব ঘোষালের ন্যায় সুহৃদ্ লোকের ভাগ্যে কমই মিলে,—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ধীরপ্রকৃতি; বিচারক্ষম, সৎপরামর্শদাতা, শ্রদ্ধার পাত্র; নগেন্দ্রের আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী এবং অকৃত্রিম বন্ধু।

হীরার আয়ী বুড়ী নূতন চিত্র নহে, পল্লীগ্রামে এবং সহরের রাস্তাতেও অনেক স্থলে, অনেক সময়ে বালকবৃদ্ধের এবং বালকস্বভাব বয়োবৃদ্ধের কৌতুকোদ্দীপক এরূপ বুড়ী অনেকের নয়নগোচর হইয়া থাকিবে। তবে কবির লেখনী সংযোগে হীরার আয়ী অমরত্ব লাভ করিয়াছে, নির্জ্জীব স্ফূর্ত্তিহীন বঙ্গে, পরিবর্ত্তনশীল বঙ্গে, অন্ততঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এ আমোদের অভাব হইবে না *

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

* অনিয়মিত ভাবে, ১৩১৭ সনের মাঘ সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৩১৯ সনের এই সংখ্যায় আমার কৃত বিষবৃক্ষ সমালোচনা শেষ হইল। ১৩১৭ সনের মাঘ-সংখ্যায় সমগ্র কাব্যের সাধরণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তৎপর প্রকাশিত প্রবন্ধকয়েকটিতে আমি বিষবৃক্ষের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার সাহিত্যসেবার অভিলাষ কিয়ৎ পরিমাণেও

আবির্ভূতা

মোর স্বপ্নলোক হ'তে কোন পথ ধরি'
কেমনে আসিলে হেথা ওগো মায়াবিনী,
হে মোর যৌবন-স্বপ্ন-স্বর্গ-বিলাসিনী,
মনসিজা চিত্তলক্ষ্মী, হে সুরসুন্দরী,
চক্ষে আসি দিলে দেখা? ধ্যান-নিমীলিত
আঁখি মোর বিশ্ব'পরি ঝেলি যবনিকা,
নিভৃত আঁধার রচি' একান্তে হেরিত
শুভ্রস্নিগ্ধদীপ্তি তব,—জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা
স্বর্গ দীপ মুখে যথা মন্দির তিমিরে।
মর্ম্মের মুকুর মাঝে মৌনমূর্ত্তি খানি
ছিল ছায়া মায়া শুধু, আজি স্বশরীরে
চক্ষে বক্ষে দিলে ধরা! সোহাগের বাণী
শুনি কাণে, ঘ্রাণে পাই সৌরভ দেহের,
অঙ্গের অঙ্গিনী হ'লে দেবী অন্তরের।

শ্রী :—

সফল হইয়াছে কি না, তাহার বিচার অন্যের হাতে। ১৩১৭ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় সূর্য্যমুখীচরিত সমালোচিত হয়, ১৩১৮ সনের সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সুপণ্ডিত, সুবিজ্ঞ, ও সুদক্ষ সম্পাদক আমার ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী 'সূর্য্যমুখী' প্রবন্ধে সংক্ষেপে 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে এমন কোন নূতন কথা দেখিলাম না, যাহা গিরিজা বাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্রে' ও মাসিকের চর্ব্বিতচর্ব্বণে দেখি নাই। কোন বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নূতন লেখকগণ তাহা পড়িয়া লইলে ভাষা ও সাহিত্যে পুনরুক্তির অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়।"

এই মন্তব্য অনেক বিলম্বে আমার চোখে পড়ে। তদবধি প্রকৃতই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দকে বিরক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট অপরাধী হইলাম কি না, ইহা বুঝিবার জন্য আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। বিষবৃক্ষ সম্পূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে, তৎকালিক অন্য বাঙ্গলা মাসিক পত্র আর্য্যদর্শনে ইহার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। যত দূর মনে আছে, সে সমালোচনায় চরিত্র বিশ্লেষণ বা কাব্যের গূঢ় সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের চেষ্টা হয় না। তৎপর অন্য কোন মাসিক পত্রিকায় বিষবৃক্ষের বিশেষ সমালোচনা কিছু বাহির হইয়াছে, এরূপ আমি অবগত নহি, বিশেষ অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই। স্বর্গীয় গিরিজাবাবুর বই একখানি আমার নিকট ছিল, এবং সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয় হইতে তাঁহারকৃত সমালোচনার পুস্তকগুলি আনাইয়া দেখিয়াছি। আমার একটি সাহিত্যপ্রিয় ছাত্র দ্বারা অন্যান্য স্থানেও গিরিজাবাবুর বই দেখাইয়াছি। তাঁহার পুস্তকে বিষবৃক্ষের সমালোচনা নাই। তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের ভুমিকায় লেখা আছে, তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধে বিষবৃক্ষ, রজনী প্রভৃতি সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পুস্তকাংশ তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করিতে পারেন নাই। যাহা হোক তাহার পর গিরিজা বাবু বিষ-বৃক্ষের সমালোচনা 'বঙ্কিম বাবুর' কোন খণ্ডে বাহির হইয়াছে—সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহা উল্লেখ করিলে বাধিত হইব। প্রঃ লেঃ

চীনে প্রজাতন্ত্র *

মাঞ্চু জাতীয় তা-চিং রাজবংশ রাজপাট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং চীনদেশে রিপাবলিক গবর্ণমেন্ট বা প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু চীনে যে কখন কি ঘটে তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলিতে পারেন না।

নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া চীনের রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল নীতি সকল এমন ভাবে গঠিত হইয়া আসিয়াছে যে, চীনকে তাহা পরিত্যাগ করা কঠিন। চীনে যদিও আদিম কাল হইতে রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জাপানের মত নহে। জাপানে যেমন গোড়া হইতে এক রাজবংশের শাসনাধীন হইয়া সেই বংশ প্রজাবলের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়া আসিয়াছে চীনে তাদৃশ নহে। চীনে এক রাজবংশের পতনে অপর নূতন এক রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

চীনে চাউ রাজবংশ ৮৬০ বৎসর, হান্ রাজবংশ ৪০০ বৎসর, ঠাং বংশ ৩০০ বৎসর, ছুং বংশ ৩০০ বৎসর, ইউয়ান বংশ ৮০ বৎসর, মিং বংশ ৩০০ বৎসর, বর্ত্তমান মাঞ্চু তা চিং বংশ ২৬৮ বৎসর রাজত্ব করার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

চীন-সম্রাটকে লোকে ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত, সুতরাং সেই পবিত্র স্বর্গ-পুত্র-সম্রাট আপন দয়া, দাক্ষিণ্য, সুবিচার, ন্যায় ও সদ্‌জ্ঞানের দ্বারা প্রজা শাসন করিতে বাধ্য, এবং এই কারণে তিনি উপরে পরমেশ্বর এবং নিম্নে প্রজাবর্গের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

যখন কোন সম্রাট অন্য কোনবংশীয় লোক কর্ত্তৃক বিতাড়িত বা সিংহাসনচ্যুত হইতেন, লোকে, তখন বিশ্বাস করিত যে এই ঘটনা ঈশ্বরাদেশে হইয়াছে। কারণ পরমেশ্বর নিশ্চয়ই বর্ত্তমান সম্রাটের কুশাসন ও পাপের শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, উপযুক্ত ধার্ম্মিক শাসনকর্ত্তার হস্তে এই রাজ্য-শাসনের ভার দিয়াছেন।

চীনে সর্ব্বপ্রথম তিনজন বিজ্ঞ দার্শনিক রাজা ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে ইয়াও, চোয়েন এবং ইউ। এই প্রকার কথিত আছে যে কনফুসিয়ান এই তিন ঋষি-তুল্য দার্শনিক সম্রাটের দর্শনতত্ত্বানুসারে চীনের রাষ্ট্রনীতি গঠন করেন। চীন দেশের পরবর্ত্তী সমস্ত রাষ্ট্রনীতিক লোক কনফুসিয়ানের নীতির আদর্শ লইয়া এ যাবৎ রাজ্য শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের অন্যতম নেতা উঃ-টিং-ফাংর মন বিদেশী ভাবে যতই পরিপ্লুত হউক না কেন তিনি যখন বালক সম্রাট পু-ই-কে সিংহাসন ত্যাগ করিবার জন্য জেদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে যে সেই তিন দার্শনিক সম্রাটের আদর্শ আসিয়া উপদ্রব করিতেছিল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

---

* টোকিওর ইতিহাসের অধ্যাপক টিঃ আইয়েনাগো (Professor T. Iyenago) কর্ত্তৃক লিখিত ওয়ার্লড ওয়ার্কস নামক মাসিকপত্রে লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের মন্তব্য।

সম্রাট ইয়াওর রাজত্বকাল যখন শেষ হয় তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া চোয়েন নামক এক ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে সম্রাট মনোনীত করেন। চোয়েন প্রথম এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু যখন রাজ্যের অভিজাতবর্গ ও প্রজাসাধারণ সম্রাট ইউয়ানের পুত্রকে মনোনীত না করিয়া তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে জেদ করিতে লাগিল, তখন অগত্যা তিনি এই ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া কহিলেন যে "ঈশ্বরাদেশে আমি সাম্রাজ্যের এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলাম।"

আবার সম্রাট চোয়েনের রাজত্বকাল যখন শেষ হইল তখন তিনি নিজের বংশধরকে নিযুক্ত না করিয়া বিজ্ঞ দার্শনিক ইউকে নিযুক্ত করিলেন। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কোন সম্রাটকে মনোনীত করা এবং একজন প্রেসিডেন্টকে ভোট দ্বারা মনোনীত করার মধ্যে পার্থক্য কত অল্প। পরবর্ত্তীকালের সম্রাটগণ যদিও বংশানুক্রমে সিংহাসনারোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তবুও প্রজাবর্গ ও জনসাধারণ এ কথা ভুলে নাই যে সম্রাট ঈশ্বরাদেশে ন্যায় ও ধর্ম্মের দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে ও প্রজাপালন করিতে বাধ্য। যিনি প্রজাপীড়ক হইবেন তিনি হয় ত হত হইবেন, না হয় সিংহাসনচ্যুত হইতে বাধ্য হইবেন। এই হিসাবে চীনে Democracy living under theocracy বা পবিত্র রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের অবস্থান মনে করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে একজন সম্রাট নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে একজন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা একটা অসম্ভব ঘটনা বলিয়া বোধ হইবে না।

সম্রাটবংশের কতিপয় রাজকুমার (Prince), কর্ণ ফুসিয়ানের কতিপয় বংশধর এবং টাই পেইং বিদ্রোহদমনকারী কতিপয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া চীনদেশে ইংলণ্ড বা জাপানের ন্যায় বংশানুক্রমিক অভিজাত নাই। * রাজ্যশাসনকারী তথাকথিত মন্তারিনগণও Democratic, কেননা তাহাদের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে এক হিসাবে ধরিলে চীন রাষ্ট্রনীতি আমেরিকার শাসননীতির সদৃশ 'স্বর্গপুত্রের' অধীনে এমন কোন পদ নাই যাহা একজন সামান্য বংশের লোক পাইতে অক্ষম। মূলকথা ক্ষমতা দ্বারা অতি নীচ-বংশীয় কোন ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চপদে উন্নীত হইতে পারে। এবং সময় সময় এইরূপ পদ ও মর্য্যাদা অনেকে পাইয়া থাকে। এই প্রকারের ডিমক্রেটিক শাসনের তন্ত্র (Structure) কিন্তু ইংলণ্ড বা জাপানের সঙ্গে তুলনা হয় না।

শ্রীরামলাল সরকার।

* কেন ভারতবর্ষে কি অভিজাতের অভাব আছে।

প্রিণ্টার :—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী, মেট্‌কাফ প্রেস্‌, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা

ছেলেবেলা অনেকবার রথ দেখিয়াছি। আর সে একটা বেশ আনন্দের ব্যাপারই ছিল। রথের দিনে স্কুলে যাইতে হইত না। বিকল বেলা বাড়ীর সম্মুখে, সদর রাস্তার দু'ধারে মেলা বসিত। সে মেলায় আর কি কি বেচাকেনা হইত মনে নাই। মনে আছে এই মেলার বাজারে যাইয়া ভেঁপু কিনিয়া আনিতাম, আর সমবয়স্ক বালক বালিকারা মিলিয়া এই সকল ভেঁপু বাজাইয়া গুরুজনদিগের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতাম। রথের সঙ্গে কলা-বেচার সম্বন্ধটা সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু কলার চাইতে আর একটা ফলের কথা বেশি মনে আছে। সুসভ্য পশ্চিম বঙ্গে এ ফল পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। ইহার নাম লটকান্। শ্রীহট্ট কুমিল্লা, প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অম্ল-মধুর বলিয়া এ ফলটা স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের বড়ই প্রিয়। রথের কথা মনে হইলেই ঐ ভেঁপুর কথা, আর থলো থলো লটকানের কথা মনে পড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বালক হইয়া সে রস-আস্বাদনের জন্য রসনাটা যে একটুও লালায়িত হয় না, এমনও বলিতে পারি না। আর মনে পড়ে, সম্মুখের রাজপথ দিয়া যখন লোকে কীর্ত্তন করিতে করিতে এক এক করিয়া আপনাদের রথ টানিয়া লইয়া যাইত, তখন আমরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে

হরি বোল, বোল হরি বোল,

অর্জ্জুনের রথের সারথী নারায়ণ

বলিয়া চীৎকার করিতাম। এ-ও এক আনন্দের ব্যাপার ছিল।

এইরূপ ছেলেবেলা যে রথযাত্রা দেখিতাম, তার ছবি এখনও স্মৃতিপটে জাগিয়া আছে। ফলতঃ সেরূপ রথ বড় হইয়া আর কোথাও দেখি নাই। ললিত-কলার হিসাবে শ্রীহট্ট কাছাড় প্রভৃতি বাংলার পূর্ব্বতম অঞ্চলের রথের মতন এমন সুন্দর রথ আর কোথাও হয় না। শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে বিস্তর মণিপুরী বাস করে। আর মণিপুরীদের রথ একটী অপূর্ব্ব বস্তু। অনেকেই মণিপুরের লোককে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম কলাকুশলতা যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, তবে মণিপুরীদের মতন সুসভ্য জাতি আর একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। এ জাতটা স্বভাব-কবি। ইহাদের ঘরবাড়ী এমন পরিষ্কার ও পরিপাটী যে দেখিলে ঠাকুরবাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের বাড়ীগুলো এক এক খানি ছবির মতন যেন সর্ব্বদা চারিদিকের লতাপাতাফুলের বাগানের ফ্রেমের মাঝখানে ফুটিয়া থাকে। ইহাদের পূজাপার্ব্বণে, এই সহজসিদ্ধ ললিতকলাকুশলতা, সামান্য লতাপাতাফুল দিয়া, চারিদিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া দেয়। মণিপুরীগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের গুরুপাট

নবদ্বীপ ও শান্তিপুর। গোস্বামীগণই ইহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহারা রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবগুলি অতিশয় সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মণিপুরীদিগের রথ একটী অতি অপূর্ব্ব বস্তু। যাঁহারা হিন্দুভূমের অন্যান্য স্থানের রথই কেবল দেখিয়াছেন, রথ যে এত সুন্দর হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনাতেও আসিবে না। মণিপুরী রথের চাকা ক'খানা ছাড়া আর কোথাও কাঠের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। রথের ঠাটটা আদ্যোপান্ত সুন্দর, সরল, চিক্কণ বাঁশ দিয়া প্রস্তুত। আর এ রথের সাজসজ্জাও অদ্ভুত। ইহাতে সাটিন, কিংখাব, জড়ি-জরওয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু হরিত পত্রের, বিকচ পল্লবের ও বিবিধ বর্ণের ও বিবিধ গন্ধের বনফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশে, মণিপুরী রথ বিপুলবিভব-ছড়ান জড়ি-জরওয়ার সাজসজ্জাকেও লজ্জিত করিয়া তুলে। মণিপুরীদের এই অপূর্ব্ব রথ দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের বিচিত্র রসলীলার স্মৃতিই প্রাণে জাগিয়া উঠে। ছেলেবেলাকার রথের স্মৃতিতে মণিপুরী রথের এই মধুর ছবিটী অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া আছে।

বড় হইয়া, কলিকাতায় পড়াশুনা করিতে আসিয়া, একবার কয়জন সতীর্থের সঙ্গে মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু লোকের হুড়োহুড়ি ও গ্রাম্য রসের ছড়াছড়ি দেখিয়া,প্রাণে কোনও আনন্দ লাভ করা দূরে থাকুক,বরং সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই একটা গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। মাঝে মাঝে কলিকাতার পথে, রথের দিনে বেড়াইতে যাইয়া, রাণী রাসমণির ছোট্ট খাট্ট রুপার রথখানি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অন্তরে ভালমন্দ কোনও ভাবের প্রেরণা কখনও জাগে নাই। কিন্তু এবারে ঘটনাবশে রথ-যাত্রার দিনে পুরিধামে থাকিয়া যে রথ দেখিয়াছি এমনটী জীবনে পূর্ব্বে আর কখনও কোথাও দেখি নাই।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত না কি বলেন যে এই রথযাত্রাটা আদিতে হিন্দুর পর্ব্ব ছিল না। বৌদ্ধেরাই প্রথমে ভগবান বুদ্ধদেবের দন্তাদি দেহাবশেষকে রথে চড়াইয়া, জনগণের কল্যাণার্থে চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতেন। সিংহলে আজিও এই বৌদ্ধপর্ব্বটী জাগিয়া আছে। ফলতঃ জপমালা, গঙ্গাজল, এমন কি প্রচলিত প্রতিমা-পূজাদি পর্য্যন্তও, ইহাঁদের মতে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছেন। এ সকল প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা, আমার বিদ্যাসাধ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন। যদি সত্যসত্যই হিন্দুরা রথযাত্রাটা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াও থাকে, তথাপি হিন্দুর সাধনা ইহাকে আপনার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও ভক্তিরসের দ্বারা গড়িয়া পিটিয়া, সাজাইয়া, গুজাইয়া এতটা পরিমাণেই নিজের করিয়া লইয়াছে যে, এখন এই রথযাত্রার ভিতরে কোনও প্রকারের বৌদ্ধগন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ মাত্রও উপস্থিত হয় না।

বাংলা দেশের যেখানেই রথ হউক না কেন, অধিকাংশ স্থলেই তাহা জগন্নাথের রথ। কখনও কখনও যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে রথারূঢ় করাইয়া রথযাত্রা করা হয় না, তাহা নয়। কিন্তু এখানে জগন্নাথবিগ্রহের অভাবেই এরূপ হয়। ফলতঃ মনে হয় যে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে না বসাইলে রথযাত্রার প্রকৃত মর্ম্মটা ব্যক্ত হয় না। শাস্ত্রের উক্তি,—রথারূঢ় বামনকেই দেখিবে।

"রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"

কিন্তু তথাপি রথারূঢ় বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ বা বামন নহেন।

কারণ এই রথ, হিন্দুর চক্ষে বিশাল বিশ্বের বিবর্ত্তন-বিধানের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীজগন্নাথের রথচক্র নিখিল জগতের বিবর্ত্তনচক্রেরই প্রতিকৃতি। শ্রীজগন্নাথের রথচক্র এই নিখিল কর্ম্মচক্রকেই মনে করাইয়া দেয়। এই কর্ম্মবাদ, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই স্বীকার করেন, সত্য। কিন্তু নাস্তিক্য বৌদ্ধসিদ্ধান্তের কর্ম্মবাদ আর আস্তিক্য হিন্দুসিদ্ধান্তের কর্ম্মবাদ এক নহে। নাস্তিক্য বৌদ্ধসিদ্ধান্তমতে বীজ হইতে যেমন বৃক্ষের, বৃক্ষ হইতে সেইরূপ আবার বীজের উৎপত্তি হয়; সেইরূপ অনাদি অবিদ্যাকৃত কর্ম্মই কর্ম্মের সৃষ্টি করে। এই কর্ম্মশৃঙ্খল স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র স্বয়ং; এই নিখিল কর্ম্মপ্রবাহের অতীতে থাকিয়া কোনও কর্ম্মাধীপ এই কর্ম্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেন না। আস্তিক্য হিন্দু-সিদ্ধান্তে, অনাদি-অবিদ্যাকৃত কর্ম্মপ্রবাহ স্বীকৃত হইয়াও, তাহাতে এই কর্ম্মাধীপেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর নিখিল সৃষ্টির এই অনাদি-অবিদ্যাকৃত কর্ম্ম-প্রবাহের নিয়ন্তা যিনি, জীবের সকল কর্ম্মের পরিণতি যাঁহার ভক্তিতে ও নিবৃত্তি যাঁহার চরণে, হিন্দু তাঁহাকেই শ্রীজগন্নাথ বলিয়া জানেন।

এই জগন্নাথই, বস্তুতঃ, বিশ্বরূপ। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যে অপরূপ রূপ দেখিয়া গতমোহ ও বীতশোক হইয়াছিলেন, সেই রূপই এই জগন্নাথের স্বরূপ। সে রূপ সদ্‌গুরু-দত্ত দিব্যচক্ষু লাভ করিলে দেখা যায়, কিন্তু ভাষায় তার বর্ণনা হয় না। ভাস্কর্য্যে বা চিত্রে তাহাকে প্রকাশিত করে, সাধ্য কার? যাহাকে

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

—বলিয়া প্রণাম করিতে হয়;

নম পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

—বলিয়া যাঁহার স্তুতি করিয়াও কিছুই বলা হইল না, এমনই মনে হয়; সেই বিশ্বরূপের প্রতিরূপকে কোন্ হাতেগড়া মূর্ত্তিতে ব্যক্ত করিতে পারে? এই জন্যই শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তিরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা আপনি হার মানিয়াছেন বলিয়া হিন্দুর প্রবাদে বলে। শ্রীক্ষেত্রের ন্যাড়া-নূলো দারুমূর্ত্তিটী সেই নিষ্ফল প্রয়াসের প্রত্যক্ষ পূতচিহ্ন স্বরূপ যুগযুগান্ত বাহিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

এই যে রথখানি প্রতিবৎসর আষাঢ়ের

শুক্লা দ্বিতীয়ার মধ্যাহ্নে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথকে গুণ্ডাবাড়ী লইয়া যায়, আর সপ্তাহান্তে আবার তাঁহাকে সেখান হইতে শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া লইয়া আইসে, প্রকৃত পক্ষে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা যে এই ক্ষুদ্র দেশটুকুকে ও এই সামান্য কালটুকুকে জুড়িয়াই আপনার সত্যিকার গতাগতি শেষ করে, এ অদ্ভুত কল্পনা যে করে, তার রথযাত্রা দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। বহুবৎসর ব্যাপিয়া দেশদেশান্তরে, কোনও নায়কনায়িকার জীবনে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটে, অলৌকিক কবি-প্রতিভা-সম্পন্ন নাট্যকার যেমন ক্ষুদ্রায়তন রঙ্গমঞ্চে দুই-চারি দণ্ড-কালের অভিনয়েই তাহাকে অতি সুন্দর করিয়া দেখাইয়া থাকেন; সেইরূপ এই সামান্য দারুনির্ম্মিত রথখানিকে এই অতি সামান্য সময়ের ভিতরে গোটাকয়েক রশীর রাস্তা ঘুরাইয়া আনিয়া, হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পৌনঃপুনিক গতাগতিকে, প্রাকৃতজনের চক্ষুর উপরে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাই এই রথযাত্রার নিগূঢ়

রথযাত্রার দিন কল্পারম্ভের দিন। এই দিন যোগনিদ্রাভিভূত নারায়ণ যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, সৃষ্টিলীলায় বহির্গত হন। প্রত্যেক কল্পের সূচনায় এই অদৃশ্য জগন্নাথের এই অদৃশ্য রথখানি চলিতে আরম্ভ করে। আর কল্পান্তে, মহাপ্রলয়কালে, আবার যেখান হইতে প্রথম যাত্রা করিয়াছিল, সেইখানেই ফিরিয়া যায়। এইরূপে অসীম দেশ ও অনন্তকালকে জুড়িয়া এই জগন্নাথের রথ কল্পে কল্পে সমগ্র সৃষ্টিলীলাকে পরিক্রমণ করিয়া আইসে। এ যাত্রার আরম্ভও জীব দেখে না; ইহার শেষও জীব জানে না। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার সময় এই অদৃষ্ট অজানা বিশ্বসৃষ্টিলীলাটি বিশ্বাস চক্ষে যে দেখিতে পায়, তারই রথ দেখা সত্য ও সার্থক হয়। ইহা যে দেখিল, তার যে সকল বন্ধন দগ্ধসূত্রের ন্যায় আপনি খসিয়া পড়ে, ইহা বিচিত্র কি?

শ্রুতি এই শরীরকে রথ বলিয়াছেন; আর এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গ্রামকে এ রথের অশ্ব এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপরসাদিকে এই রথের পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই রথে রথী নিখিল জীবান্তর্যামী শ্রীনারায়ণ। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে প্রতিদিন এই রথ যাতায়াত করিতেছে। এ-ও এক রথযাত্রা! এই শরীর-রথে যে শ্রীনারায়ণকে আরূঢ় দেখে, সে ভাগ্যবান পুরুষের বন্ধন তো আর থাকে না। তিনি দেহী হইয়াও বিদেহী। প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি যে পরমপুরুষ জীবের দেহপুরে পুরস্বামীরূপে সতত বিদ্যমান থাকিয়া, প্রাণাপান-বায়ু-সংযোগে, চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াদি তার চতুর্ব্বিধ অন্নকে পাক করিতেছেন, তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করেন। এ দেহে আর তখন তাঁর আত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি থাকে না। দেহ সম্বন্ধে আমি, আমার, এ সকল প্রত্যয় তাঁর নষ্ট হইয়া যায়।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত
তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্
শ্বসন্॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া দেখুন, শুনুন, চলুন, ফিরুন, বকুন, ঘুমোন,—যাহা কিছু করুন না কেন,—এই সকল কেবল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগেই ঘটিতেছে জানিয়া, আপনি যে কিছু করিতেছেন এমন মনে করেন না।

এই শরীরটা যেমন রথ, সেইরূপ এই বিশাল সংসারও একটা বিরাট রথ-স্বরূপ। এই সংসার-রথেও রথী সেই শ্রীনারায়ণ। এখানে তিনি মহাবিষ্ণুরূপে অধিষ্ঠিত। জীবের দেহ-রথে নারায়ণ ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীবের অন্তর্য্যামী সাক্ষীস্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। এই সংসার-রথে তিনিই সমষ্টিভাবে লিখিল মানবমণ্ডলীর অন্তর্য্যামী, তাহাদের সমষ্টিভূত সামাজিক জীবনের নিয়ন্তা, মানবেতিহাসের সাক্ষী, মানব-সমাজের বিচিত্র রসলীলার অভিনয়ের নটেশ হইয়া আছেন। কেবল দেহ-রথে তাঁহাকে রথী বলিয়া দেখিলেই হইল না। এই নিখিল সংসার-রথেও তিনিই রথী। তিনিই ধর্ম্মাবহ। তিনিই পাপনুদ। এই সাসার-রথে তাঁহাকে যে রথীরূপে দেখিল, তার সংসার আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া যায়।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
তদা পুণ্যে পাপে বিধূয় নিরঞ্জনম্
শান্তমুপৈতি॥

জীব যখন শুভ্রবর্ণ জগন্নিয়ন্তাকে জগতের সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে দর্শন করে, তখন পুণ্য ও পাপ উভয়ের অতীত হইয়া সে নিরঞ্জন শান্ত-স্বরূপ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়

যুগে যুগে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ধারার অনুসরণ করিয়া এই মানবসমাজ-রূপ রথখানি চলিতেছে। এই বিশাল সমাজবক্ষে যে বিশ্বরূপের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়, তার যে কোনও সমাজ-বন্ধন থাকে না, ইহাই আর বিচিত্র কি?

এই যে অবিরাম গতিতে, প্রত্যেক জীবের নিজের জীবনে ও তাঁর সমাজ-জীবনে এবং এই নিখিল বিশ্বের অনাদ্যনন্ত বিবর্ত্তনের মধ্যে, শ্রীজগন্নাথের রথ চলিতেছে, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই, বৎসর বৎসর, আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে হিন্দুর এই রথযাত্রা পর্ব্ব হইয়া থাকে। এই রথযাত্রা সেই মহাযাত্রাকে স্মরণ করাইয়াই আপনার সার্থকতা লাভ করে।

নারায়ণের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া, সেই অসীম নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারই মুখ দেখিতে দেখিতে, তাঁহারই রসে ভোর হইয়া, তাঁহার নাম লইতে লইতে, জীবনের কর্ম্ম পথে যে তাঁর রথের রজ্জু ধরিয়া তাঁর রথখানি টানিতে টানিতে চলিতে পারে, তার জীবন ধন্য, সংসার সার্থক হয়। সে-ই জগতের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, জগন্নাথের রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাঁর বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া পৌঁছিতে পারে।

এই জন্য সত্যভাবে শ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রা দেখিতে হইলে, দুতালা, তেতালা বাড়ীর ছাদে সতরঞ্চ গালিচা পাতিয়া বসিলে চলে না। পথের ধারে, লোক-সংঘট্টের বাহিরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে রথযাত্রা দেখিলেও, সত্য দেখা হয় না। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দেখিতে হইলে,

জগতের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। বাহুতে বাহু ঠেকুক, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিশুক, ঘামে ঘামে মাখামাখি হউক;—মানুষের বাহু অপেক্ষা কোমল কিছু যে আর দুনিয়ায় নাই, মানুষের নিঃশ্বাসের মতন এমন শীতল মলয় যে আর বিশ্বে নাই, মানুষের স্বেদের মতন এমন মধুর রস যে আর জগতে মিলে না,—এই ঠেকাঠেকি, মেশামিশি, মাখামাখিতে এই দিব্যজ্ঞান জন্মুক, তবে বুঝিব জগন্নাথের রথযাত্রা দেখা সার্থক হইল। ঐ রথারূঢ় দারুমূর্ত্তি তো তাঁর চিহ্নমাত্র। জগন্নাথের নিজস্ব রূপ এই বিশাল জনসংঘট্টের মধ্যেই ফুটিয়া আছে। রথযাত্রার দিনে, রথারূঢ় শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিতে চাহিতে যাঁদের প্রাণের অন্তস্তল হইতে এই ভগবদ্বাণী ধ্বনিত হইতে থাকে:—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি সতশোহথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।

এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুটো একবার রথারূঢ় দেব-মূর্ত্তিকে দেখিয়া আবার রথের সম্মুখস্থ লোকসংঘট্টের উপরে আসিয়া পড়ে এবং এই আকুল ভক্তমণ্ডলীর জনতা হইতে পুনরায় শ্রীজগন্নাথের দিকে ধাবিত হয়, আর এইরূপে রথে যিনি তাঁকেও পথে, পথে যাঁরা তাঁহাদিগকেই রথে দেখিয়া যাঁরা আত্মহারা হইয়া যায়, তাঁহাদেরই রথ দেখা সফল হয়। আর পুরিধামে যাইয়া, একবার শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, সে কখনও এ ভাবটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা

রবীন্দ্রনাথ

চৈত্রের "বঙ্গদর্শনে" রবীন্দ্রনাথের চরিতালেখ্য লিখিয়াছিলাম। ইহাতে কোনও কোনও দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিতে বস্তুতন্ত্রতার বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এই কথা বলি। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের আসন্ন ভক্তগণের কেহ কেহ বড় ক্ষুন্ন হইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত হইয়াছি।

কারণ রবীন্দ্রনাথকে কোনও দিকে খাট করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য কবিপ্রতিভার দ্বারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্য কোনও কোনও দিকে বিশ্ব-সাহিত্যের সমাজে অতি উচ্চ স্থানে যাইয়া বসিবার অধিকার পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে খাট করিলে, ভারতীয় সাধনা ও বাঙালী জাতিকে খাট করা হয়।

কিন্তু সত্যের দ্বারা কেহ যে কখনও খাট হয়, বা হইতে পারে, অপরে যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনওই এমন কথা বলিবেন না। আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি সর্ব্বদা যদি বস্তুতন্ত্র না-ই হইয়া থাকে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের

কোনও দোষের কথাও হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইতেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে বস্তুতন্ত্রহীনতার উৎপত্তি হয়। কোনও কোনও দিকে যদি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইয়া থাকে, তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কেহ কোনও মতে দায়ী করিবে না। তিনি যে স্থানে, যে কালে, যে পরিবারে জন্মিয়াছেন, যে সকল বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন, সে সকলই তার জন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া এ সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। আর এ জগতে সর্ব্বত্রই ছায়াতপের ন্যায় ভাল ও মন্দ, পূর্ণ ও অপূর্ণ, মিশিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাহ্য-ঘটনাপাতেও এ ভালমন্দের মিশ্রণ রহিয়াছে। এ সকল ঘটনা ও অবস্থাতে কোনও কোনও দিক দিয়া তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভাকে যেমন কতকটা সংকুচিত করিয়াছে, আবার অন্য-দিকে সে ক্ষতিপূরণ করিয়াই যেন, তাহাকে বাড়াইয়া এবং ফুটাইয়াও তুলিয়াছে। এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষগুণেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির বস্তুতন্ত্র-হীনতা এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থারই ফল। ইহাতে রবীন্দ্র প্রতিভাকে যে খাট করিয়াছে বা করিতে পারে, এমন কথা বলা যায় না। বস্তুতন্ত্রহীনতা সৃষ্ট বস্তুকেই খাট করে, সৃষ্টিশক্তিকে খাট করে না, বরং কোনও কোনও দিক্ দিয়া বিচার করিলে, বাড়াইয়াই দেয় বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বস্তুতন্ত্রহীনতা তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়, তার শক্তিহীনতার প্রমাণ প্রদান করে না। বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া কবি-প্রতিভার কখনও যে কোনও অগৌরব হয়, এমন মনে করি নাই।

ফলতঃ বস্তুতন্ত্র কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার অঙ্কিত রবীন্দ্র-চরিত-চিত্র পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে বস্তুতন্ত্র কথাটা সংস্কৃত। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে ইহার বহুল ব্যবহার রহিয়াছে। ভগবান ভাষ্যকার শারীরক ভাষ্যে যখন-তখন এই কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। আর আমাদের শাস্ত্রে বস্তুতন্ত্রবিহীনতার একটা অতি মামুলী দৃষ্টান্ত "বন্ধ্যাপুত্রবৎ।" মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা এমন নিগূঢ়, এমন জটিল, এত বহুমুখী যে, যে রমণী কখনও সন্তান ধারণ করেন নাই, তাঁর পক্ষে প্রকৃত মাতৃস্নেহ বস্তুটী যে কি তার জ্ঞানলাভ একেবারেই অসম্ভব। ক্বচিৎ কোনও বন্ধ্যা অপরের সন্তানকে আপনার প্রাণের সমুদায় স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারেন, মায়ের চাইতে বেশি সন্তর্পণে ও একাগ্রতা সহকারে তার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন, কিন্তু সে স্নেহ যতই উদ্বেলিত ও অনাবিল, সে সেবা যতই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত হউক না, তাহা সন্তান-বতীর আপনার সন্তানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধকে কিছুতেই অধিকার বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বাৎসল্য হিসাবে ইহা বস্তুতন্ত্র নয়। কিন্তু বস্তুতন্ত্র নয় বলিয়া ইহা যে কপট স্নেহ এমন কখনওই বলা যায় না।

আপন অধিকারে, নিজের স্বরূপে, এ বস্তু অতি সত্য ও খাঁটি। বস্তুতন্ত্র আর অকপট এক কথা নয়।

অতএব রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-বিষয়ক বা স্বাদেশিকতা-সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা ঠিক বস্তুতন্ত্র নয়, এ কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথ অধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্মের ভান করিয়াছেন, বা স্বদেশভক্তি না থাকিলেও তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কিছুই বোঝায় না।

এমন কি ঠিক বস্তুতন্ত্র নয় বলিয়া কোনও ভাব বা রস যে একেবারে মিথ্যা হয়, এমনও নয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে প্রাণে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাহা বস্তুতন্ত্র নয়। কিন্তু সর্পজ্ঞানটা মিথ্যা বলিয়া, এই ভ্রান্ত-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাও মিথ্যা, এমন কথা কেহ বলে না। তবে সত্য সর্পদর্শনে যে ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহা যেরূপ স্থায়িত্ব লাভ করে, রজ্জুতে সর্পভ্রমে যে ভয় জাগিয়া উঠে, তাহা সে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। বস্তুতন্ত্র রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া থাকে, বস্তুতন্ত্রতাহীন রস বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ মানস-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। যথাযোগ্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যখন আমাদের চিত্তে কোনও রসের সঞ্চার হয়, তখন সে রসের বিকাশের ও পরিণতির একটা স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ক্রমও প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উঠে না, কেবল মানস-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া জাগিয়া উঠে, তাহাতে এই সকল স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক বিকাশক্রমটী দেখা যায় না। এই জন্য বস্তুতন্ত্রতাবিহীন রসকে ব্যভিচারী রস বলে। ব্যভিচারী রসের স্থায়িত্ব থাকে না। একটা রস ফুটিতে না ফুটিতেই তার মধ্যে অপর বিপরীত রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর এই রসভঙ্গের দ্বারাই কোন্ রস ব্যভিচারী ও বস্তুতন্ত্রতাহীন এবং কোন্ রস অব্যভিচারী ও বস্তুতন্ত্র, ইহা অতি সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়।

সাহিত্যের বিষয় দুই শ্রেণীর। এক বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থাদি, দ্বিতীয় অন্তরের অনুভূতি ও রসাদি। আর এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টিই সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। যে কখনও সমুদ্র দেখে নাই সে অপরের রচনায় সমুদ্রের যে সকল বর্ণনা পড়িয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, আপনার কল্পনার সাহায্যে একটা সমুদ্রের ছবি যে আঁকিয়া তুলিতে পারে না, তাহা নয়। সেই অপার নীলাম্বুরাশি দেখিয়া মানুষের প্রাণে যে সকল ভাব আপনি জাগিয়া উঠে, কল্পনাবলে যে সে ব্যক্তি সে সকল ভাবকেও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে না, এমনও নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার সমুদ্রের ছবি যে কল্পিত, সত্য নয়, অধ্যাস-প্রতিষ্ঠিত, বস্তুতন্ত্র নয়, এ কথা মানিতেই হইবে। সকলে ইহার এই মায়িকতা ও বস্তুতন্ত্রহীনতা লক্ষ্য নাও বা করিতে পারে। যারা কখনও সমুদ্র দেখে নাই, তাঁদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা অনেক সময় অসম্ভবও হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যারা সমুদ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের নিকটে এ ছবিটী যে আসল নহে ইহা ধরা পড়িবেই পড়িবে।

সেইরূপ যে সকল আন্তরিক রসের উপাদানে কোনও কাব্যসৃষ্টি রচিত হয়, তাহার বস্তুতন্ত্রতাও কবির অপরোক্ষ রসানুভূতির অপেক্ষা রাখে। এ অনুভূতি ব্যতীত যে এরূপ কাব্যসৃষ্টি হয় না, তাহা নয়। অনেক অবিবাহিত যুবকই আপনার যৌবন-সুলভ-রস-প্রাচুর্য্যনিবন্ধন, মাধুর্য্যের একটা মনগড়া ছবি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপভাবে মাধুর্য্যরসের কল্পিত-সম্ভোগ সর্ব্বত্রই পূর্ব্বরাগের একটা অতি সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু এ সম্ভোগ যতই গভীর ও প্রাণোন্মাদকারী হউক না কেন, বস্তুতন্ত্র যে নয়, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। আর বাসর-ঘরে যুবদম্পতীর প্রথম মিলনে তাহাদের পরস্পরের দেহযষ্টিকে আশ্রয় করিয়া যে অশরীরী রস উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তার সঙ্গে পূর্ব্বরাগের এই কল্পিত সম্ভোগের প্রভেদ কোথায় এবং কি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেই কেবল তাহা ধরা পড়ে। অনভিজ্ঞের পক্ষে ইহা বোঝা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি সাহিত্যের এই দুই রাজ্যকেই অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি বহিঃপ্রকৃতির ও স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির, সাহিত্যের বহিরঙ্গের এই উভয় প্রকৃতিরই বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আর মানব-অন্তরের বহুবিধ রসাদির মনোহারিণী প্রতিমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কোনও কোনও বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতি আছে; কোনও কোনও বিষয়ে নাই। যেখানে তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেখানে এগুলি যেমন সুন্দর সেইরূপ সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্রও হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অপরোক্ষ অনুভূতি নাই, কিন্তু তিনি আপনার অলোকসামান্য কবিপ্রতিভার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার সাহায্যে যে-গুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেগুলি কোনও কোনও স্থলে অতিশয় প্রাণোন্মাদকর হইলেও, সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্র হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতে যাইয়া, "বঙ্গদর্শনে" আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম। এমন সোজা কথাটাও যে রবিবাবুর আসন্ন ভক্ত-সাহিত্যিকেরা বুঝিতে পারিবেন না, ইহা কল্পনাও করি নাই।

সাহিত্যের সৃষ্টি সাহিত্যিকের অপরোক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, একেবারে শূন্যের উপরে গড়িয়া উঠে না। এই জন্য প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির একটা অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকিবেই থাকিবে। সাহিত্যিকের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া কোথাও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মর্ম্ম ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির আলোচনা করিতে যাইয়া, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার অভিধানের সাহায্যেই এগুলির অর্থ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এসত্ত্বেও বিগত আষাঢ় মাসের

"প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী আমার রবীন্দ্র-চরিত-চিত্রের সমালোচনা করিতে যাইয়া, "আমি-সাহিত্য সমালোচনার বিশুদ্ধ রীত্যনুসারে" এই চরিত-চিত্র লিখি নাই, এ অভিযোগ কেন করিয়াছেন, বুঝিলাম না। সাহিত্য যে জীবন ছাড়া নয়, এ কথা লেখক নিজেও স্বীকার করেন। তবে "সাহিত্য-রচয়িতার জীবনের ভাল-মন্দের সহিত তাহার সাহিত্য-সৃষ্টির একান্ত সম্বন্ধ নাই" ইহাই অজিত বাবু মনে করেন। অতএব কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টির সমালোচনাকালে এ ভাল-মন্দকে উপেক্ষা করিয়াই চলা আবশ্যক, নতুবা সে সমালোচনা ঠিক সাহিত্য-আলোচনার বিশুদ্ধ রীতি-সম্মত হয় না।

অজিত বাবু সাহিত্য সমালোচনার যে বিধান (canon) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখানে অসম্ভব এবং অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। মাসিকের ক্ষুদ্র কলেবরে এ আলোচনার স্থান এবং আমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে ইহার সময় করিয়া উঠা সম্ভব নহে। এ আলোচনার পক্ষে যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, সে পাণ্ডিত্যও যে আমার নাই, অপরে জানুন বা না জানুন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবেরা ইহা জানেন। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের চরিত-চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি দশ-আজ্ঞার ফুট-ফিতা লইয়া যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ভাল-মন্দের মাপ করিতে যাই নাই, ইহা তো অস্বীকার করা সম্ভব নয়! আমার নিকটে ভাল-মন্দটা বাহিরের বস্তু, নয়, ভিতরের বিধান। প্রকৃতিভেদে, অবস্থাভেদে, অধিকারভেদে ভাল-মন্দের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ও একই ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধরিয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে রমণীমুখদর্শন কেন, স্ত্রীলোকের ছায়াস্পর্শ পর্য্যন্ত অপরাধের কথা। যে চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্ম্মরখণ্ডে রমণী-রূপের অশরীরী মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া মনুজ-মণ্ডলী মধ্যে "সুন্দরের" সংবাদ প্রচার করিবেন, তাঁর পক্ষে জীবন্ত রূপসীকে সম্মুখে করিয়া, তাঁর মুখ ধ্যান করিতে করিতে, সেরূপে তন্ময় হইবার জন্য সর্ব্বপ্রকারের সাধন অবলম্বন না করাই অধর্ম্ম। খৃষ্টীয় জগতের ধর্ম্মনীতিও এখন প্রাচীন ইহুদার দশাজ্ঞার মাপকাটিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক য়ুরোপের ধর্ম্মনীতি বা এথিকস্‌ও (Ethics) এখন আত্মচরিতার্থতা (Self-realisation) লাভকেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ভালমন্দ বিচারের একমাত্র কষ্টি-পাথর বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভারতের সনাতন সাধনা "ধর্ম্ম" বলিতে চিরদিনই একরূপ এই বস্তুকে বুঝিয়া আসিয়াছে। এই জন্যই ধর্ম্মকে "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" বলা হইয়াছে। আমাদের সাধনায় প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সেই প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থতা-লাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া চিরদিন প্রচার করিয়াছে। সুতরাং কবির পক্ষে আপনার কবি-প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থতালাভই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। কোনও

কাব্যসৃষ্টি এই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কি না করিয়াছে, ইহারই দ্বারা তাহার ভালমন্দের বিচার হইবে। এই কষ্টি-পাথরেই আমিও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দশ-আজ্ঞার ফুট-ফিতা ফেলিয়া তাঁর "জীবনের ভাল-মন্দের" কালি কষিতে যাই নাই।

কিন্তু বাহিরের ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাটি দিয়া কবির জীবনের বা কাব্য-সৃষ্টির বিচার করা অসঙ্গত বলিয়া তিনি জটিল মানব-জীবনের কোন্ বিভাগের কতটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি কোথায় কি পরিমাণে এই সকল অপরোক্ষ অনুভূতির ফল, এবং কোথায় কি পরিমাণে কেবল আপনার মানস-কল্পনারই সৃষ্টি, তারও বিচার করা কি "সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ-রীতি"-সম্মত নহে? অজিত বাবু শেলির যে দুইটী চরণ উদ্ধার করিয়াছেন—

In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought.

এই idol of my thought এই মানস-প্রতিমা কি শেলির অন্তরে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, না যে সকল মর্ত্ত্যদেহের সঙ্গে তিনি বিবিধভাবে, বিবিধ রসের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বরাঙ্গিণী-দের বরবপুকে আশ্রয় করিয়াই তাঁর চিত্তে এই মানস-প্রতিমার আবির্ভাব হইয়াছিল? যে ভাবে শেলি এই সকল মর্ত্ত্যদেহে তাঁর অমূর্ত্ত মানস-প্রতিমাকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা হয় ত খৃষ্টীয় সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম-নীতির অনুমোদিত ছিল না। সুতরাং এই নীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে, শেলির চরিত্র নিন্দনীয় হইতেও বা পারে। কিন্তু শেলির কাব্যের আলোচনায় সমাজ-নীতির এই সিদ্ধান্তের কোনও স্থান নাই। এখানে শেলি যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, রসের ওজনে তাহা সত্য ও সুন্দর কি না, ইহাই বিচার করিতে হইবে। আজন্ম ব্রহ্মচারী কার্ডিন্যাল্ নিউম্যান (Cardinal Newman) যদি এই কবিতাটী লিখিতেন, আর শেলি যদি কার্ডিন্যাল নিউম্যানের—

"Lead kindly Light"

এই বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতটী রচনা করিতেন, তবে এ দুটীকেই কি বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলা যাইত না? ভগবান শঙ্করাচার্য্য যদি অলৌকিক কল্পনাবলে কালিদাসের উমার রূপবর্ণনাটী লিখিতেন, আর কালিদাস যদি শঙ্করের 'মোহমুদ্গর' রচনা করিতেন, তবে এ সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ রসানু-ভূতির কষ্টিপাথর দিয়া বিচার করিয়া, ইহাদের সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ নির্দ্ধারণ করা কি "সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ রীতি"-সম্মত হইত না? দাঁতের বিয়েট্রিস্, চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী, বিদ্যাপতির লক্ষ্মীবাই,—না থাকিলে কি কখনও ইঁহারা আপনাদের কাব্যসৃষ্টিতে এমন অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন? সে অবস্থায় তাঁহাদের এই সকল অনুপম কাব্যসৃষ্টিও, যে বন্ধ্যাপুত্রবৎ বস্তুতন্ত্রতাবিহীন হইয়া পড়িত, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব ওয়াল্ট

হুইটম্যান্ খৃষ্টীয়ান্ সমাজে জন্মিয়া, তাহারই অঙ্কে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে তিনি যে অদ্ভুত রসের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয়ানী সাধনার সঙ্গতি নাই। এই আদর্শ পুরা-মাত্রায় প্যাগান (Pagan), খৃষ্টীয়ান্ নহে। রক্তমাংসের ভিতর দিয়া বিধাতা যে অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তুলেন, প্রাচীন গ্রীশ ও রোমই কেবল তাহাতে কোনও প্রকারের অতিলৌকিক অরূপকতা বা আধ্যাত্মিকতা আরোপ না করিয়া, রক্তমাংসের বলিয়া, রক্তমাংসরূপেই, এই মানুষী সৌন্দর্য্যের সাধনা করিয়াছিল। ইহাই প্যাগান-রূপ-সাধনা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ওয়াল্ট হুইটম্যান এই সাধনাকেই বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অদ্ভুত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে হুইটম্যানের প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-ভোগ-চেষ্টার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, এই অতি মোটা কথাটা না বুঝিলে, হুইটম্যানকে কেহ বুঝিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হুইটম্যান্ প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচারী বা পরজীবনে ব্রাহ্ম হইলে যে তাঁর অপূর্ব্ব কাব্য সকল রচনা করিতে পারিতেন না, ইহা বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

বাহিরের বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অপরোক্ষ রসানুভূতির সঙ্গে কবির কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যেখানেই এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে আপনার কবি-কল্পনাকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন, সে-খানেই তাঁর কাব্যসৃষ্টি অলৌকিক উৎকর্ষ ও সত্য লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁর "পতিতা" শীর্ষক কবিতাটীর উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই কবিতাটীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, এমন কবিতা জগতের কোনও সাহিত্যে আছে কি না, জানি না। শুনিয়াছি ব্রাউনিংএর কোনও কোনও স্থলে না কি ইহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়। আর রবিবাবু যে এমন অনুপম বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, ইহার দুইটী কারণ। এক তিনি কলিকাতায় জন্মিয়া, আশৈশব একরূপ কলিকাতাতেই বাড়িয়া উঠিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ তিনি হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান নহেন। রবিবাবুর মনগড়া তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত যাই হউক না কেন, জীবের ভিতরেই যে অক্ষয় শিবস্বরূপ বাস করিতেছেন, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এই ধারণা সর্ব্বদাই জাগিয়া আছে। "পতিতা" লোকচক্ষে পতিতা, সমাজে পরিত্যক্তা, অনার্য্যসেবিতা হইলেও ভাগবতী প্রকৃতিরই বিগ্রহ বলিয়া, প্রকৃত-পক্ষে সে দেবতা, তার এই দেবভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত, পাতিত্য-কর্ম্মের পাপকলুষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র,—শুভযোগাযোগে যে সে অন্তর্নিহিত দেবতা সেই পতিতার মধ্যেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন,—এ বিশ্বাস কেবল হিন্দুরই আছে। * হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, হিন্দুর পুরাণ,

* "ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই!

হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর তন্ত্র, এমন কি হিন্দুর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্ম * পর্য্যন্ত—সকলে মিলিয়া অলক্ষিতে এই ভাবটা জাগাইয়া রাখিয়াছে। রবিবাবু হিন্দু না হইলে, "পতিতার" অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রূপরাশিকে এমন ভাবে, ভক্ত্যবনতপ্রাণে, কখনই ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর "পতিতার" ভিতরকার অনুপম শ্রীসম্পদ যেমন কবির জাতীয় সাধনা ও জাতীয় প্রকৃতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ এই অপূর্ব্ব ছবির চারিপাশের অবস্থার ও ব্যবস্থার সমাবেশও তাঁর ভদ্রাসনের আশে-পাশের দৃশ্য হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং "পতিতার" চিত্রটী এমন অলোক-সামান্য উৎকর্ষ ও সত্যতা লাভ করিয়াছে। কলিকাতা সহরে, ধনীপরিবারে ভোগ-বিলাসের মধ্যে, যে স্থানে—

নাহিক করম,　　লজ্জা সরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা বলে নারীর　　নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা।'

কেবল হিন্দুপতিতার পক্ষেই এই ভাবটী অনুভব করা সম্ভব। পতিতা হইয়াও তাহারা ধর্ম্মকর্ম্মকে একেবারে পরিত্যাগ করে না। গঙ্গাস্নান ও বিবিধ ব্রতপূজা তাদেরও আছে। আর এ সকল বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়া মানুষের প্রাণের অন্তর্নিহিত দেবভাবের সঙ্গে কতটা পরিমাণে যে অতিশয় ধর্ম্মকর্ম্ম-হীন লোকেরও একটা সম্পর্ক জাগিয়া থাকে, বহির্ম্মুখীন খৃষ্টীয়ান সাধনা এ কথা বোঝে না।

* দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা
সদ্যমাংসং ঘৃতং বা দধিমধুরজতম্‌
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা
পঠিত্বা বা ফলমিহ লভতে মানবঃ গন্তুকামঃ।
হিন্দুকে যাত্রাকালে এই মন্ত্র পড়িতে হয়।

* রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের পীত আলোক জ্বালা
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হতাশ-ঢালা।
রতন নিকরে, কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,
মদির-শীকরে সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে।—

তারি অনতিদূরে অধিকাংশকাল অতিবাহিত না করিতেন, বোলপুরের প্রান্তরে "শান্তি নিকেতনের" বিজনতার মধ্যে জন্মিয়া, আজন্ম সেইখানেই যদি বাস করিতেন, তবে তাঁর পক্ষে "পতিতা" লেখা যে অসম্ভব হইত, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

কিন্তু কেবল "পতিতার" চিত্রাঙ্কনেই যে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অপূর্ব্ব বস্তুতন্ত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। স্বর্গীয় মোহিত-চন্দ্র সেন সম্পাদিত রবিবাবুর "কাব্যগ্রন্থে" 'নারী' শীর্ষক প্রায় সকল কবিতাতেই সত্য ও সৌন্দর্য্যের এই মধুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'উর্ব্বশী' রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। জগতের আর কোনো সাহিত্যে 'উর্ব্বশী'র মত কোন কিছু আছে কি না সন্দেহ। থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ 'উর্ব্বশী' হিন্দুর নিজস্ব বস্তু। ভিনাসের মত রূপসী হইয়াও 'উর্ব্বশী' ভিনাস নহেন। আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'তে (She) আমাদের 'উর্ব্বশী'র ছায়ার ছায়া একটু ফুটিয়াছে মাত্র বলিয়া মনে হয়। হ্যাগার্ড

'শী'কেই পরবর্ত্তী-উপন্যাসে *World's Desire*—'বিশ্ববাসনা' রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু

.........বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে.........

রবীন্দ্রনাথ যে ''উর্ব্বশী'কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তার সঙ্গে হ্যাগার্ডের "শী"র কোনোই তুলনা হয় না। ফলতঃ রবিবাবুর অলৌকিক কবি-প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকুশলতা 'উর্ব্বশী'তে যেমন ফুটিয়াছে, তাঁর আর কোনো কবিতায় তেমন ফোটে নাই। এই সৃষ্টিকুশলতা জগতের অমর-কবিসমাজেও বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রবিবাবুর অনেক কবিতার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, কেবল তাঁর অদ্ভুত শব্দসম্পদকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে,—এগুলির সৌন্দর্য্য একান্তই ধ্বন্যাত্মক, অশরীরী, স্বপ্নদৃষ্টির ন্যায় এগুলি ছায়াময়ী। এই সকল কবিতায় অতৃপ্ত বাসনার জ্বলন্ত পিপাসা মাত্রই বাড়াইয়া দেয়, কোনও বিষয়ে সত্য ও পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে পারে না। 'উর্ব্বশী'র মাধুর্য্য এ জাতীয় নহে। অথচ 'উর্ব্বশী' সত্য সত্যই—

"অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী"

'স্বপ্ন-সঙ্গিনী' ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু 'বিশ্ববাসনা'র এই স্বপ্নই যে সত্য, বাস্তবজীবনের সকল সত্য অপেক্ষা কম সত্য নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বেশী সত্য, রবীন্দ্রনাথ আপনার সৃষ্টিকুশলতা গুণে, 'উর্ব্বশী'র চিত্রে এই তত্ত্বটীই বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতন্ত্র কাব্য কাহাকে বলে, 'উর্ব্বশী'তে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই তাহা দেখাইয়াছেন। বিশিষ্টের মধ্যেই যে নির্ব্বিশেষ বস্তু আত্মগোপন করিতে যাইয়াই, নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; সান্তের মধ্যেই যে অনন্ত আপনাকে হারাইবার চেষ্টা করিয়াই পূর্ণতর, ফুটতররূপে আপনাকে ফিরিয়া পাইতেছেন; অনিত্যের চাঞ্চল্যের মধ্যেই যে নিত্যত্বের নিত্যস্বরূপটী স্থির হইয়া "নির্ব্বাতনিষ্কম্পপ্রদীপমিব" জ্বলিতেছে,—রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত মানব-হৃদয়ের অতৃপ্ত-অনন্ত-রূপপিয়াসার চিরন্তন-বিষয়রূপিণী 'উর্ব্বশী'র চিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। এখানে অন্য কামনা-শূন্য কাম, সর্ব্বসম্পর্কবিহীনা কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যান করিতেছে। এখানে রমণী—শুদ্ধ রমণীরূপে—আপনার নিত্য ও নিজস্ব স্বরূপটীতে পুরুষের—শুদ্ধ পুরুষের—সম্মুখে উপস্থিত। এখানে পতঙ্গ অগ্নির নিজস্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়া আত্মহারা। জগতের সকল কবিই কোনও না কোনও ভাবে, রমণীরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'উর্ব্বশী'র চিত্রে এ রূপটী যেমন করিয়া ধরিয়াছেন, সেক্ষপীয়র কি শেলী, বায়রণ কি ব্রাউনিং, হাফেজ কি কি সাদি,—অথবা আমাদের কালিদাস বা ভবভূতি, জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস বা আর কেহ তেমন করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও ও গভীরতম দর্শন।

'উর্ব্বশী'তে যাহা কবি অপূর্ব্বকলা-কুশলতা-সহকারে সূত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'নারী' শীর্ষক ভিন্ন ভিন্ন

কবিতাগুলিতে তাহাকেই যেন মূর্ত্তির আকারে বিশদ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে আপনার চারি পাশের নিসর্গের ও মানবসমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে আপনার অন্তরের নিগূঢ়তম অপরোক্ষ রসানুভূতি—এই দ্বিবিধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন কবি তাঁর অপূর্ব্ব 'উর্ব্বশী'কে সেইরূপ এই 'নারী' শীর্ষক অনেক চিত্র ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন; এবং এইজন্য তাঁর 'উর্ব্বশী' যেমন গভীর বস্তুতন্ত্রতালাভ করিয়াছে, সেইরূপ তাঁর 'তোমরা ও আমরা', 'ব্যক্ত প্রেম', 'লজ্জিতা' এই সকলগুলিই অনুপম সৌন্দর্য্য ও বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। ফলতঃ নারী-হৃদয়ের গভীরতা ও রমণী-চরিত্রের দুর্ভেদ্য বিচিত্র রহস্য রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া নানাদিক্ দিয়া, নানাভাবে, ও বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, আর কোনও বাঙ্গালী কবি তাহা করিতে পারেন নাই। আর রবীন্দ্রনাথ যে কালে, যে দেশে, যে পরিবারে যে সমাজে অসাধারণ রূপগুণে বিভূষিত হইয়া জন্মিয়াছেন, এবং যে সকল বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবনের সমুদায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁর নারীচরিত্রগুলি এমন অপূর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সত্যলাভ করিয়াছে।

আবার রবিবাবু অনেক সময় সুকোমল গোলাপদলে শয়ন করিয়া, বসন্তের মৃদু মলয় নিঃশ্বন পান ও শরতের ফুল্ল জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ হইয়া কবি-কল্পনার এই সকল মামুলী উপকরণের সাহায্যেই অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্যসৃষ্টি যতই সুন্দর হউক না কেন, বস্তুতন্ত্র যে হয় নাই, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই সকল কবিতার ঝঙ্কারের মিষ্টত্ব বিমানচারিণী ভাবুকতাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের রসপিপাসাকে কিছুতেই যে স্নিগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না—ইহাও কি অস্বীকার করিতে পারা যায় কি? *

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

* রবীন্দ্রবাবুর চরিত-চিত্র বাহির হওয়ার পর উহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাদপ্রতিবাদ "বঙ্গদর্শনে" দেওয়া অনাবশ্যক স্থির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটী সেইজন্য অগ্রহায়ণের "বিজয়া"র জন্যই বিশেষ ভাবে লিখিত হয়, কিন্তু এই প্রবন্ধটি লেখা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ইহা বাদ-প্রতিবাদ নহে এবং ইহাতে অনেক নূতন কথাও আছে, সেইজন্য লেখক মহাশয়ের সম্মতি-ক্রমে "বঙ্গদর্শনে"ও ইহা প্রকাশিত হইল। বঃ সঃ

সতী

তুমি জান কত ত্রুটি, কত অপরাধ
ভরিয়াছে এ জীবন—সব জেনে শুনে
তবু মোরে ভালবাস শুধু নিজগুণে।
হে প্রেমবারিধি মোর অসীম অগাধ,
আমার জীবন-তট বেড়িয়া ঘেরিয়া
আমারে বেঁধেছ তুমি চির-আলিঙ্গনে।
শত উপচারে তুমি দেহমন দিয়া
নিত্য মোর কর পূজা—আমি জানি মনে
সে নৈবেদ্য মোর নয়; আমি মাটি খড়,
শুধু ভক্ত-হৃদয়ের মানসী প্রতিমা
প্রেমমন্ত্রে বাঁধা হেথা—আমি মৃত জড়।
যে প্রাণ আমাতে হেরি তুমি ধ্যানরতা
তোমার সাধনা বলে হে সতি আমার,
সে প্রাণ এ মৃত প্রাণে হবে কি সঞ্চার?

অনুতাপ

তুমি জান কত তুমি দিয়েছিলে মোরে
তুমি জান কি তাচ্ছিল্য অবহেলা ভরে
ব্যর্থ করিয়াছি আমি আজীবন ধরে
তোমার স্নেহের দান। কি মোহের ঘোরে
কাটালাম এত বর্ষ নিশ্চেষ্ট অসার,
ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, আলস্যমন্থর
শম্বুকের মত শুধু ভারে আপনার।
দিয়াছিলে বজ্র দেহ—আজি থরথর
অকাল বার্দ্ধক্য ভরে, বিমল প্রতিভা
নষ্ট আরসীর মত ম্লান বিম্বহীন।
কি না তুমি দিয়াছিলে, আজি আছে কি বা।
শুধু ধ্বংস-অবশেষ, সর্ব্বস্বান্ত দীন
আপনার কর্ম্মবশে। ওগো মহারাজ,
হের আজি কুপুত্রের ভিখারীর সাজ!

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

অভিসারিকা

এতদিনে দিলে ধরা মোর বাহুপাশে,
মোর বক্ষে আত্মহারা হে অনুরাগিণী
হে মোর প্রণয়বেণুবিমুগ্ধা হরিণী
ত্রাস্ত ভীত মৃদুপদে কম্পিত নিশ্বাসে
বনবনান্তর হ'তে মোর কাছে আসি
আপনারে অবহেলে করিলে বন্দিনী।
লজ্জা দ্বিধা শঙ্কাকুলা হে অভিসারিণী,
প্রতিকূল পবনের বাধারাশি নাশি'
কূল হ'তে স্রোতমুখে অকূলের পানে
তরীখানি লীলাভরে দিলে ভাসাইয়া
অপূর্ব্ব তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
দূর পর পার হ'তে আসিলে এখানে
উদাসীর দীপহীন ক্ষুদ্র এ কুটীরে
প্রেমের সন্ন্যাস লয়ে পশিলে সুধীরে!

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

পুনঃ সংসারী

বহুদিন পরে পুন পল্লীপ্রান্ত পথে
ফিরিতেছি সেবি' স্নিগ্ধপ্রভাতসমীর,
হেনকালে সবিস্ময়ে হেরি সে কুটীর,
জীর্ণ, ভগ্ন, পরিত্যক্ত, জঙ্গলে অশথে
সমাচ্ছন্ন ধ্বংসস্তূপ, নব-সংস্কারে
লভিয়াছে পুনর্জন্ম।—কুটস্থ নবীন
ঘনপর্ণ বিরচিত, প্রাঙ্গণ মাঝারে
তুলসী বেদিকা দিব্য, সুখে সমাসীন
রোমন্থ করিছে গাভী, মালঞ্চ ভরিয়া
রাশি রাশি গন্ধ শোভাবর্ণের বিকাশ।
আবেশে ভরিল চিত্ত, মুগ্ধ মোর হিয়া
পল্লীর আলেখ্যপটে নিজ ইতিহাস
আপন জীবনচ্ছবি হেরিল মধুর,
নূতন মন্দিরখানি নূতন বধূর।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

প্রথম হইতে ষষ্ঠ ফর্ম্মা মেটকাফ প্রেসে এবং ৭ম ... ফর্ম্মা ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

অষ্টম অধ্যায়

টোলভঙ্গ ও কীর্ত্তনারম্ভ

নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলে সকলেই তাঁহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব-স্ফীত যুবকের সে বিদ্যার অভিমান আর নাই। তাঁহার বিনীত ব্যবহারে বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল, নিমাই সকলেরই সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। আর সকলে প্রস্থান করিলে কতিপয় বিষ্ণুভক্ত গয়ার বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিতে চাহিলেন। গয়াধামের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরাম ধারা বহিতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল ও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সময়ান্তরে সবিশেষ বর্ণনা করিবেন বলিয়া নিমাই বন্ধুগণকে বিদায় দিলেন। শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অমঙ্গলাশঙ্কায় গৃহদেবতা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন।

দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবগণের মধ্যে নিমাইর ভাবাবেশের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল—শুনিয়া সকলেই পরমহৃষ্ট হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গোত্রবৃদ্ধি করুন।" পরদিন বৈষ্ণবগণ শুক্লাম্বরব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত হইলে, নিমাই তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব দর্শনে তাঁহার ভক্তি উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং তিনি "হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণের মধ্যে তখন প্রেমের বন্যা ছুটিল—সকলে নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইর ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে চেতনা হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "নন্দগোপনন্দনকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

এইভাবে কিছুদিন গেলে নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন করিলেন। কিন্তু

অধ্যাপনা করিবে কে? অধ্যাপক নিমাই গয়াধামেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এ যে ভক্তিপাগল নিমাই—ইহার মুখে যে কৃষ্ণ ভিন্ন কথা নাই, মনে যে কৃষ্ণ ভিন্ন চিন্তা নাই। শিষ্যগণ পুঁথি খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পাঠ লইবার সময় অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন 'হরি'নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই নিমাইর সংজ্ঞালোপ হইল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া পাঠ ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিমাই হরিগুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, আবার ক্ষণকাল পরেই লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন কি না। দিবসান্তে নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিন তিনি কিরূপ পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিষ্যগণ উত্তর করিলেন "আজি আপনার মুখে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন আর কিছুই স্ফূরিত হয় নাই।" পরদিন টোলে গিয়া নিমাই পূর্ব্বেরই মত কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অধ্যাপনা হইল না। এক দিন "সিদ্ধবর্ণ-সমাম্নায়"সূত্রের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া নিমাই উত্তর করিলেন "নারায়ণ সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ।" শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "বর্ণ কিরূপে সিদ্ধ হইল?" নিমাই উত্তর করিলেন "কৃষ্ণ দৃষ্টিপাত বশতঃ।" তখন

শিষ্যবলে "পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর"।
প্রভু বলে "সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর॥
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥

শিষ্যগণ ভাবিলেন, নিমাইর বায়ুরোগ হইয়াছে; তাহারা পুস্তক বন্ধ করতঃ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ মত নিমাইকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। অধ্যাপকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিমাই ভাল রূপ পড়াইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

নিমাই টোলে যাইয়া পূর্ব্বেরই মত গর্ব্বের সহিত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণ আশান্বিত হইল এবং নবোৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। পাঠ দেওয়া শেষ হইলে, বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য-দিগকে লক্ষ্য করিয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন "যাহাদের সন্ধিজ্ঞান নাই, কলিযুগে তাহারাই ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত, যাহাদের শব্দ জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক করে। আমার খণ্ডন ও স্থাপনের অন্যথা করিতে পারে, নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত কে আছে?" এই গর্ব্বিত বচন সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইতে না হইতেই নিমাই শুনিতে পাইলেন দূরে রত্নগর্ভ আচার্য্য পাঠ করিতেছেন—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতু-প্রবাল নটবেশমনুব্রতাংশে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোল মুখাব্জহাসং॥"

অমনি দেখিতে পাইলেন, বনমালা শিখিপুচ্ছ ধাতু প্রবাল শোভিত নটবেশধারী উৎপলশোভিত শ্রবণযুগল, কুঞ্চিতালক-কপোল, পীতাম্বর, শ্যামসুন্দর এক হস্ত সহচর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে লীলাকমল

সঞ্চালন করিতেছেন; তাঁহার বদনকমল সুমধুর হাস্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ভুবনমনোহর মূর্ত্তি মানসচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়া নিমাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করতঃ নিমাই "বোল বোল" বলিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নজলে ভূমিতল প্লাবিত হইল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রত্নগর্ভ আচার্য্য এই দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়া ভাগবতের আরও শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিমাই ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন

প্রভু বোলে "বোল, বোল," বোলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণসুখ মনোহর।
লোচনের জলে হইল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক সকল সুবিদিত॥

ক্ষণেক পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই শিষ্যগণকে কহিলেন "আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" তখন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণার্থ গঙ্গা-তীরে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই পুনরায় পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না।

পড়ুয়া সকল বোলে "ধাতু" সংজ্ঞা কার?
প্রভু বোলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার।"
ধাতুসূত্র বাখানি শুনহ ভাই গণ।
দেখি কার শক্তি আছে, করুক খণ্ডন॥
যত দেখ রাজা—দিব্য দিব্য কলেবর।
কণক ভূষিত—গন্ধ চন্দনে সুন্দর॥
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোক কহে।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়ে॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্মাকার, কারে এড়েন পুড়িয়া॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ, তা হ'লে সে ভক্তি॥
এবে যারে নমস্কার করি মান্যজ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিয়া করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে।
ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণ শক্তি বল্লভ সভায়।
দেখি ইহা দূষুক, আছয়ে শক্তি কায়॥
এই মত পবিত্র পুজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি
হেন কৃষ্ণে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বোলো "কৃষ্ণে দেহ মন।"

এইরূপ কৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, শিষ্য-গণ মুগ্ধ হইয়া একমনে শুনিতে লাগিল অবশেষে বিশ্বকর্ত্তা প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কিরূপে ধাতুসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি?" শিষ্যগণ উত্তর করিলেন "যাহা বলিলেন সবই সত্য। তবে আমাদের যে উদ্দেশ্যে পড়া তদনুরূপ অর্থ হয় নাই।" তখন নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কি মনে হয় আমাকে বায়ুরোগে ধরিয়াছে।" শিষ্যগণ উত্তর করিলেন "এক হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আর কিছুই উচ্চারিত হইতেছে না। সূত্র, বৃত্তি, টীকা সর্ব্বত্রই

কেবল কৃষ্ণনামই আপনি ব্যাখ্যা করিতেছেন, আমরা ত আপনার বাখ্যার কিছুই বুঝিয়া উঠিতেছি না। এই দশদিন আমাদের পড়াশুনা কিছুই হয় না।" তখন

প্রভু বোলে ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য।
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখো তাই ভাই বোলো সবাকায়॥
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখো গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি থেকে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঁই পড় আমি দিলাম নির্ভয়॥

সাশ্রুনয়নে এই বলিয়া নিমাই পুঁথিতে ডোর বাঁধিলেন। শিষ্যগণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন "আপনার কাছে যাহা পড়িয়াছি তাহা আর কোথায় পাইব। আর কাহাকেও আমরা গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।" এই বলিয়া শিষ্যগণও পুঁথিতে ডোর দিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিমাই সকলকে কোলে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর। তোমাদের বদন হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম স্ফূরিত হউক। কৃষ্ণ তোমাদের সকলের ধনপ্রাণ স্বরূপ হউন।" নিমাই আবার কহিলেন "ভাই সব, তোমরা আমার জন্মজন্মান্তরের বান্ধব! আমরা সকলে এক ঠাঞি মিলিয়া কৃষ্ণনাম করিব।" গুরুর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণের নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। নিমাই পুনরায় বলিতে লাগিলেন "আমরা এতদিনে কেবল পাঠই করিয়াছি। এস এখন শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন আরম্ভ করি।" শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "সংকীর্ত্তন কিরূপ?" তখন সুমধুর কণ্ঠে

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এই পদ গাহিতে গাহিতে নিমাই হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই মত নাচিতে লাগিল। ভাবাতিশয্য বশতঃ নিমাই ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে কেবল "বোল, বোল" ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের রোল নবদ্বীপের জনকোলাহল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। দলে দলে লোক ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সমাগত হইল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিতে পাইল—উদ্ধতের শিরোমণি পরম চঞ্চল দাম্ভিক নিমাই পণ্ডিত অতি দীন ও কাতর ভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

ভক্তি-বিকার ও অদ্বৈত-মিলন

বৈষ্ণবগণ নিমাইর ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। গঙ্গার ঘাটে অনেক বৈষ্ণবের সহিত নিমাইর

দেখা হইত—নিমাই সকলকেই ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেন। "কৃষ্ণের প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হউক" বলিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া নিমাইর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ করিয়া বলিতেন

"এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহো না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে।
তৃণজ্ঞান কেহো আমা সভারে না করে॥
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ সব দেহ ভার।
কোথা হো না শুনি কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রচার॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হইতে হইবেক পাসণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয়॥
চিরজীবী হও তুমি বলি কৃষ্ণ নাম।
তোমা হইতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণ গ্রাম॥"

ভক্তগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নিমাইর মন বিষাদে আকুল হইয়া উঠিত। এবং তিনি নির্জ্জনে বসিয়া এই দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতেন।

একদিন গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। শচী দেবী দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন নিমাই একবার হাস্য করিতেছেন, পরক্ষণেই ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন। কখনও বা "সব সংহার করিব" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, কখনও বা "মুঁই সেই, মুঁই সেই" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহা ব্যাকুল হইয়া শচী প্রতিবেশিগণকে পুত্রের আচরণের কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন

বিধাতায় স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
তাহারও কিরূপমতি বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাসণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মাল সাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফূরে॥

প্রতিবেশিগণের কেহ কেহ নিমাইর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বায়ুব্যাধি হইয়াছে বলিলেন, এবং তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিলেন। কেহ কেহ শিবাঘৃত, কেহ বা নানাবিধ পাকতৈলের ব্যবস্থা করিলেন। স্নেহময়ী জননী কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন।

প্রতিবেশিগণের উপদেশ ও জননীর মলিনমুখ দেখিয়া নিমাই বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার গৃহে আগমন করিলে নিমাই কহিলেন "শ্রীবাস সকলেই কহিতেছে, আমার বায়ু-ব্যাধি হইয়াছে, তুমি কি মনে কর?" শ্রীবাস হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমার যদি বায়ু-রোগ হইয়া থাকে, তবে ভগবান করুন

আমারও যেন এই রোগ হয়। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিপুল কৃপা দেখিতে পাইতেছি। তোমার শরীর মহাভক্তিযোগ লক্ষিত হইতেছে।" নিমাই আনন্দাপ্লুত হইয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "তুমি যদি আমার বায়ুরোগ বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।" শ্রীবাস কহিলেন "পাষণ্ডীগণ যাহাই বলুক না কেন, আমরা সকলে মিশিয়া একত্র কীর্ত্তন করিব।" অতঃপর শচীদেবীকে পুত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত করিয়া শ্রীবাস গৃহে গমন করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে পরমভক্ত গদাধরকে সঙ্গে লইয়া নিমাই অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন তুলসী-বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বাহু তুলিয়া হরি বলিতেছিলেন।

সাত আট বৎসর বয়সে অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য নিমাই মাঝে মাঝে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিতেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য বালকের অলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিবার পরে নিমাইর পরিবারের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। অদ্বৈতের সহিত নিমাইর ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইবার কোনও কারণ এতদিন হয় নাই। গয়া হইতে নিমাই প্রত্যাগত হইবার পরে তাঁহার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন-সংবাদ অদ্বৈতাচার্য্য শ্রুত হইয়াছিলেন। নিমাইর কৃষ্ণোন্মাদ-সংবাদে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতে করিতে স্থান বিশেষে অর্থ ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া আচার্য্য এক দিন মনোদুঃখে উপবাস করিয়াছিলেন। রাত্রি কালে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে সেই স্থানের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছে "আচার্য্য শীঘ্র উঠিয়া ভোজন কর। তুমি যাঁহার জন্য এত দিন অপেক্ষা করিয়া আছ, যাঁহাকে জানিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন দেশে দেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্ত্তন শ্রুত হইবে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে বৈষ্ণবগণ দেবদুর্ল্লভ দৃশ্য দর্শন করিবে। এখন আমি চলিলাম, আবার আসিব।" নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র নিমাইর গৌরমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সমীপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অচিরেই সে মূর্ত্তি বাতাসে মিলাইয়া গেল। আচার্য্য বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

স্বপ্নের কথা অদ্বৈতাচার্য্য যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন নিমাইর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তবে কি তাঁহার প্রার্থনা এত দিনে ভগবৎচরণে স্থান পাইয়াছে, ভক্তের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া ভক্তবৎসলের আসন কি টলিয়াছে, ধর্ম্ম ম্লান দেখিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনেচ্ছা কি এতদিন পরে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে—ইত্যাদি কত চিন্তাই তাঁহার মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। আশা ও সংশয়ে তাঁহার মন অনবরত আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র—শৈশবেই যে তাঁহাকে দেখিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাঁহার মন পরিপূরিত হইয়াছিল—সেই

কি তাঁহার প্রাণেশ্বর? কিন্তু অদ্বৈত যে অতি ক্ষুদ্র—অতি হীন। অদ্বৈতের প্রার্থনায় তিনি অবতার গ্রহণ করিবেন, এত কি সম্ভবপর? কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অদ্বৈত যে তাঁহারই কিঙ্কর--তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনার্থই ত অদ্বৈত তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া ডাকিয়াছে। ভক্তবৎসল তিনি—ভক্তের নিঃস্বার্থ প্রার্থনা তিনি ত যুগে যুগেই সফল করিয়াছেন। তবে অদ্বৈতের প্রার্থনা কেন সফল হইবে না? এবম্বিধ চিন্তায় অদ্বৈত সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু স্বীয় মানসিক অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। নানা জনে আসিয়া তাঁহাকে নিমাইর অদ্ভুত কাহিনী শুনাইত। তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিয়া বলিতেন "নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের ত ভক্তিমান্ হওয়াই উচিত।"

আজ নিমাই স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্যকে দেখিয়াই নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আচার্য্য পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি লইয়া নিমাইর পূজা করিলেন এবং

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার নয়নজলে নিমাইর চরণ সিক্ত হইয়া গেল। গদাধর সশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আচার্য্য বালকের প্রতি এতাদৃশ আচরণ যুক্তিযুক্ত নহে"; অদ্বৈত ভক্তিগদগদস্বরে উত্তর করিলেন "এ কেমন বালক, দিন কতক পরে জানিতে পারিবে।" নিমাই চৈতন্যলাভ করিয়া আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করতঃ নানাভাবে তাঁহার স্তুতি করিলেন। বহুক্ষণ আনন্দে কাটিয়া গেল। অবশেষে সর্ব্বদা তাঁহার দর্শনলাভেচ্ছা ব্যক্ত করিয়া এবং তদর্থে তাঁহার প্রতিশ্রুতি লইয়া আচার্য্য নিমাইকে বিদায় দিলেন।

নিমাই প্রস্থান করিলে অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "সত্যই যদি ইনি আমার প্রভু হন, তাহা হইলে আমি যেখানেই থাকি, ইনি আমাকে নিশ্চয়ই আপনার পাশে লইয়া আসিবেন।" এবং নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরস্থ স্বকীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর নিমাই প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন কালে তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, ক্ষণে স্তম্ভাকৃতি শরীর, ক্ষণে নবনীত কোমল দেহ দেখিয়া ভাগবতগণ নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন "ইনি অংশাবতার", কেহ বলিলেন "ইহার শরীর শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল," আবার কেহ কেহ তাহাকে শুক, প্রহ্লাদ অথবা নারদের অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভাগবত গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।" কীর্ত্তনকালে মূর্চ্ছান্তে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই সকলের গলা ধরিয়া অতি করুণভাবে রোদন করিতেন। একদিন বন্ধুগণ এই কাতর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই কহিলেন

"কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রাম।

গয়া হইতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান ॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর ॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লক্ষিতে না পারি ॥
হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর।
চরণে নুপুর শোভে অতি মনোহর ॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥
কি কহিব সে পীতধটির পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন্ ভিতে ॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নিমাই যখন রোদন করিতেন, তখন তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। একদিন "গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা, কোথা কৃষ্ণ আমার শ্যামল পীতবাসা।" গদাধর কহিলেন "কৃষ্ণ ত নিরবধি তোমার হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া নিমাই নখ দ্বারা স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। গদাধর অতি কষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপের সকল ভক্ত নিমাইর গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ দত্ত ভক্তিরসাল শ্লোক পাঠ করিয়া তখন নিমাইর চিত্তবিনোদন করিতেন। মুকুন্দের কণ্ঠধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কীর্ত্তন ও নৃত্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নারীধর্ম্ম

কুমারী

জীবনের কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী শিক্ষা-লাভের সময় বাল্যকাল, সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবনে রমণীকে যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে বহন করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সংসারের সমস্ত পরিজনের ধর্ম্মোন্নতিসাধন সকলকে ধর্ম্ম-সাধনে অবসর দিবার জন্য জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা দূর করিয়া সংসারে শান্তি সংস্থাপন এবং গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা দ্বারা সকলের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পাদন--ইহাই রমণী-জীবনের প্রধান ব্রত।

এই মহান ব্রত পালনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক—সংযম ধৈর্য্য এবং প্রীতি।

যাঁহাকে উন্মার্গগামী পরিজনকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে, তাঁহার নিজেকে অটল রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আকর্ষণকেন্দ্র নিজে চঞ্চল হইলে আকৃষ্ট বস্তু কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না।

গৃহের যিনি অধিষ্ঠাত্রী তিনি অসংযত

বা অধীর হইলে সে গৃহে শান্তি কখনই সম্ভব হয় না।

আকর্ষণের অন্যনাম প্রীতি। প্রীতির বলেই মানুষ মানুষকে আপনার করিয়া লইতে পারে। সুতরাং সকলকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পরিপূর্ণ প্রীতির প্রয়োজন। ভালবাসার গুণেই মানুষ মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সুপথে চালনা করিতে পারে, সমুন্নত করিতে পারে।

কিন্তু এই উদার প্রীতি, অটল ধৈর্য্য, অবিচলিত সংযম ধর্ম্মসাধন ব্যতীত লব্ধ হইবার নহে। ধর্ম্মই মানুষকে ত্যাগশীল করে, স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেয়, বাসনাকে সংযত করে। সুতরাং ধর্ম্ম-শিক্ষাই নারীজীবনের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত।

ধর্ম্মশিক্ষা

স্ত্রীলোকের চিত্ত স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ। সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই বালিকার চিত্তে ধর্ম্মভাব জাগরিত করা যায়।

অতি শৈশব হইতেই ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা কথাচ্ছলে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারতের সুললিত এবং উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান এ বিষয়ের বিশেষ উপযোগী। পূর্ব্বে আমাদের দেশের প্রাচীনা মাতামহী ও পিতামহীগণ আপনাদের সুকুমারী দৌহিত্রী ও পৌত্রীগণকে মুখে মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের সুললিত কাহিনী শিখাইতেন। "যাত্রা" মহোৎসবে, গানে পাঁচালীতে, কথকের কথকতায় এই শিক্ষা আরও সম্পূর্ণতা লাভ করিত। সুতরাং অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুণ্যশ্লোক জনকদুহিতা, সতীশিরোমণি সাবিত্রী, ধর্ম্ম-শীলা গান্ধারী, পতিব্রতা দময়ন্তী, মনস্বিনী দ্রৌপদী, পরহিতব্রতা কুন্তীর পূত চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইত এবং সেই মহান্ ও সমুজ্জ্বল আদর্শের আলোকে নিজ নিজ চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। বালিকাদের চিত্তে সহজে ধর্ম্মভাবের বিকাশের জন্য সে ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

সে কালে ধর্ম্মলাভের আর এক সুব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। অল্প বয়সেই বালিকারা ব্রত গ্রহণ করিত এবং দেবপূজা শিখিত। ইহাতে অতি অল্প বয়স হইতেই একজন অপার্থিব মঙ্গলময় দেবতার সঙ্গে তাহাদের সহজে পরিচয় ঘটিত এবং শৈশবের এই পরিচয় উত্তর জীবনে তাহাদিগকে আত্মসর্ব্বস্বতা এবং ঐহিকতার হাত হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিত।

আমরা নিজেরা অধার্ম্মিক এবং অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া আর আমরা আমাদের কন্যা ও ভগিনীদের এ সকল ব্রত গ্রহণে উৎসাহ দিই না। তাই আজ হিন্দুর অন্তঃপুর দিনে দিনে স্বার্থ-পরতা, বিলাসিতা এবং ধর্ম্মহীনতার কৃষ্ণমেঘে ঘনান্ধকার হইয়া উঠিতেছে।

এই সকল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের যথেষ্ট পরিমাণে নীতি ও ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করান কর্ত্তব্য।

আমার মনে হয় বালিকারা কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাদের কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া তাহাদের মূল শাস্ত্র-গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশ অধ্যয়ন করান উচিত। সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই এমন একটা পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য আছে যে মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে কেবল ভাষার গুণে লিখিত বিষয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। অনুবাদে সে শক্তি কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। অ. বয়স হইতে বালিকাদের সংস্কৃত স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেও মনে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়।

সংযম এবং প্রীতির সাধনা ধর্ম্মশিক্ষারই অন্তর্গত। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সংযম-শিক্ষা

ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোক-
মাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥"

অতি সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ হইতেও স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহারা অরক্ষিত হইলে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলের শোকের কারণ হয়। যেহেতু—

"স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।"

স্ত্রীকে রক্ষা করিলে সন্তান, চরিত্র, কুল, আত্মা, ধর্ম্ম সকলই রক্ষিত হয়।

সুতরাং বালিকার চিত্তে যাহাতে বিন্দুমাত্র মলিনতা না আসিতে পারে সে বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

আর্য্যঋষি এই আশঙ্কাবশতঃ অতি সুকুমার বয়সে বালিকার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামীর কল্যাণ, সন্তানের কল্যাণ, পরিজনের কল্যাণ—সকলই নারী-চরিত্রের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। কারণ সমস্ত পরিজনের ধর্ম্মরক্ষার ভার রমণীর উপর।

আজকাল ক্রমশঃ বালিকাদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এ সময়ে এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বালকদের চরিত্ররক্ষার জন্য শাস্ত্রে যে সকল বিধিব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, অবস্থানুসারে সেই সকল ব্যবস্থা যথাসম্ভব বালিকাদেরও চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য।

বালিকারা যাহাতে কোন কুৎসিৎ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়, কুৎসিৎ আমোদ-প্রমোদে যোগদান না করে, কোন প্রকার প্রলোভনের মধ্যে না যায়, সেজন্য সর্ব্বদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

থিয়েটারে অশ্লীল হাবভাবপূর্ণ অভিনয়-দর্শন, মেলা দেখিতে যাওয়া, অল্পবয়স্কা চরিত্রহীনা দাসীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, কুপুস্তক-পাঠ, কুচিত্র-দর্শন, অসংযত-চরিত্র 'জামাই বাবু'দের সঙ্গে রহস্যালাপ, 'বাসর-ঘরে'র রসিকতায় যোগদান, বরকন্যার শয়নকক্ষে 'আড়ি-পাতা'; অসংযতরসনা প্রাচীনা রসিকা-

গণের অশ্লীল রসিকতা শ্রবণ, আসন্নযৌবন বালকগণের সঙ্গে খেলায় ও আমোদ প্রমোদে যোগদান—চরিত্র-বিশুদ্ধির প্রবল অন্তরায়, সুতরাং সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

বিলাসিতা পরিহার সংযম-শিক্ষার অঙ্গীভূত। বিলাসিতার সঙ্গে সংযম ও ধর্ম্ম-প্রাণতার অহি-নকুল সম্বন্ধ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল আমাদের অন্তঃপুরে বিলাসের স্রোত যেন অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। বেশে ভূষায়, ভাবে ভঙ্গীতে আমাদের সংযত-চরিত্রা গৃহলক্ষ্মীগণ দ্রুতবেগে পাশ্চাত্য বিলাসিনীতে পরিণত হইতে চাহিতেছেন। আমাদের সুকুমারী বালিকাগণকেও শৈশব হইতে সিল্কে, লেসে, পোষাকে, পাউডারে আমরা দিন দিন বিলাসপ্রিয় করিয়া তুলিতেছি। বিলাসিতা ও স্বার্থ-পরতা নিত্যসহচর এবং চরিত্রের দুর্ব্বলতা, পরিশ্রমবিমুখতা, ধর্ম্মভাবের হীনতা বিলাসতার অপরিহার্য্য কুফল।

সুতরাং বালিকাদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে বিলাসের ভাব তাহাদের মনোমধ্যে আদৌ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে।

পরিচ্ছন্নতা অতি প্রয়োজনীয় গুণ। স্বাস্থ্যের জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য, মনের প্রফুল্লতার জন্য, পরিচ্ছন্ন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু কিসে আমাকে সুন্দর দেখাইবে, কিসে আমি লোককে মুগ্ধ করিতে পারিব এরূপ চিন্তা নিতান্ত অবনতিকর এবং সংযম-শিক্ষার প্রবল অন্তরায়।

যে দেশের সম্রাটের কন্যা, সম্রাটের মহিষী পতি-সত্য-পালনের জন্য বল্কল পরিধান করিয়া কণ্টক-ক্ষত চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের সর্ব্বপ্রধানা মহিষী বনবাস-ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া স্বহস্তে সহস্র অতিথির সেবা ও সৎকার-নিরত, সে দেশে এই অবনতিকর ধর্ম্মবিরোধী বিলাসিতা কেন প্রশ্রয় লাভ করিবে? হিন্দুর চক্ষু চিরদিন ধর্ম্মের দিকে অর্পিত, পরলোকের দিকে স্থাপিত, অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী দুর্ব্বলতা কেন তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবে?

আমাদের দেশ—দরিদ্রের দেশ, অনাথ-আতুরের দেশ, আমাদের দেশে বিলাসিতার অবসর কোথায়?

আমাদের মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মীরা যদি আপনাদের সমস্ত অপব্যয় সংযত করিয়া, সমস্ত বাহুল্য পরিবর্জ্জন করিয়া স্থূল শুভ্র বস্ত্রখণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া অন্নপূর্ণার মত অকাতরে ক্ষুধিত পিপাসিতকে অন্নপানে পরিতৃপ্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই সরল শোভন বিরল বেশই কি তাঁহাদের রাজরাজেশ্বরীর অপূর্ব্ব মহিমায় বিমণ্ডিত করে না? ভিখারীর ঘরণী, দরিদ্রের গৃহিণী মুক্তহস্তে জগতের দৈন্য নিবারণে নিযুক্তা, ইহাই আমাদের অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি! আমরা জাতীয় জীবনের এই মহান্ আদর্শ কেন বিস্মৃত হইব?

সুতরাং শৈশব হইতে আমাদের বালিকাদের এই চিরপুরাতন মঙ্গলমন্ত্রে দীক্ষিত করা কর্ত্তব্য।

প্রীতির সাধনা

সাধনার দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা সকল বৃত্তিরই পরিণতি সাধিত হইতে পারে।

প্রীতি-বৃত্তিও সাধনা দ্বারা বিকশিত হয়। রমণীজীবনের কর্ত্তব্যপালনের জন্য ত্যাগশীলতা ও সংযমের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রীতি সকল ত্যাগ, সকল সংযম, সকল সহিষ্ণুতাকে সহজ ও আনন্দময় করে। সুতরাং প্রীতি-বিকাশের সাধনাও বালিকার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। রমণীর প্রীতি বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত হইলে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। কবি নবীনচন্দ্র সুভদ্রার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"না দিদি! আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই!
জনক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
শিশু কিছু নাহি জানে আর।
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে
ভ্রাতাভগ্নী পূর্ণ এ সংসার।
পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে, যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অ ন্ত সুখ,—
পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম!
প্রেম ধর্ম্ম এই, দিদি। কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
হেরিতাম সকল সংসার
মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার!"

রমণী-হৃদয়ের এই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনা সাপেক্ষ। বালিকা যাহাতে বাল্যকাল হইতে ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিতে শিখে, অনাথ আতুরকে দয়া করিতে শিখে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কোন নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিয়া বালিকা যেন হর্ষ প্রকাশ না করে, কলহ-বিবাদে যোগ না দেয়, রূঢ় বাক্যে কাহারও মনে কষ্ট না দেয়, প্রতিবেশীদের আপদে বিপদে তাহাদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করে, তাহাকে সযত্নে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই, রাণী ভবাণী, মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি প্রীতিময়ী, ত্যাগশীলা, পরদুঃখকাতরা মহিলাগণের জীবন-চরিত-পাঠেও বালিকার হৃদয়ে প্রীতিবৃত্তি উন্মেষিত হইতে পারে। সুতরাং তাহাকে যত্ন করিয়া এই সকল লোকহিতব্রতা আদর্শ রমণীকুলের জীবন-চরিত পাঠ করান কর্ত্তব্য।

আর্ত্তের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, প্রাচীনের পরিচর্য্যার ভারও অল্পে অল্পে বালিকার হস্তে দেওয়া উচিত। পীড়া, দুঃখ ও অসমর্থতার সঙ্গে পরিচয়ে হৃদয়ে দয়া ও প্রীতির সমধিক বিকাশ হয়। কেবল তাহাই নহে, ভবিষ্যৎ জীবনে এই সেবা-শুশ্রূষার ভার রমণীর উপরেই পড়ে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কিছু জ্ঞান না থাকিলে, কার্য্যকালে ইচ্ছাসত্বেও সেবা ও শুশ্রূষা ভাল হয় না।

এই জন্য বালিকাদের অল্প বয়স হইতে রোগীপরিচর্য্যা এবং আর্ত্ত-সেবায় নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেবার নিয়ম, ঔষধ-সেবন, পথ্য-রন্ধন এবং শুশ্রূষার প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা দান করা উচিত।

এ সম্বন্ধে আজ কাল উপযুক্ত পুস্তকের অভাব নাই। বালিকাদের সেই সকল পুস্তক যত্নপূর্ব্বক পড়াইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা

উপদেশগুলিকে তাহাদের হৃদয়গ্রাহী করাইয়া দেওয়া উচিত এবং যাহাতে তাহারা বিরক্ত না হইয়া, অধীর না হইয়া প্রফুল্ল মনে প্রীতির সহিত সেবা করিতে পারে, তাহাদের এরূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং কুমারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা—ধর্ম্মশিক্ষা, সংযম-শিক্ষা, প্রীতি-শিক্ষা, সমবেদনা-শিক্ষা। (ক্রমশ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ

উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর উপর মানুষ যে কত অত্যাচার করে তাহার সীমা নাই। গো মেষ মহিষ, ছাগ ও শূকরাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ঘোটক এবং উষ্ট্রও মনুষ্যের খাদ্য। পক্ষীদের ত কথাই নাই। তা'র পর ইন্দুর, সাপ, গো-সাপ, কাঠবিড়াল এবং ফড়িং প্রভৃতি পতঙ্গজাতিও মানুষের কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। উদ্ভিদের উপর মানুষ এতটা অত্যাচার করিতে পারে না, সকল গাছ-পাতা বা ফলমূল স্বাদু নয়, কাজেই উদ্ভিদ্গুলির মধ্য হইতে অনেক দেখিয়া শুনিয়া মানুষ খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করে। কিন্তু আমিষ-খাদ্য-নির্ণয়ে এক প্রকার বিচার করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, সভ্য মানুষ আম-মাংস ভোজন করে না ; যদি কোন প্রাণীর মাংসে কোন প্রকার অস্বাদুকর জিনিষ থাকে সিদ্ধ করিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলমূল ও অনেক শাকসব্জি অপক্কাবস্থাতেই মানুষ আহার করে; কাজেই অগ্রে স্বাদুতা স্থির করিয়া পরে আহার্য্য বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। আবার অধিকাংশ উদ্ভিদেরই দেহে যে বিস্বাদজনক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহা সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয় না,—কাজেই সিদ্ধ করিলে যেমন সকল প্রাণীর মাংসই খাদ্য হইয়া দাঁড়ায় উদ্ভিদ্ তেমনটি হয় না। নচেৎ মানুষের অত্যাচারে হয় ত, ভূমণ্ডলের গাছপালাও বিরল হইয়া আসিত।

শাস্ত্রে বলে "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা"। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য পরীক্ষা করিলে শাস্ত্রের উক্তির সহিত ঘোর অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের যজ্ঞের আহুতির জন্যই দুর্ব্বল ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঘ ভালুকের তীক্ষ্ণ নখদন্ত, সজারুর গায়ের কাঁটা, কচ্ছপ ও শম্বুকজাতীয় প্রাণীর কঠিন দেহাবরণ, গো মেষ-ছাগাদির শৃঙ্গ, বোল্‌তা ও মধুমক্ষিকার হুল, এবং সাপের বিষদন্ত সকলই আত্মত্রাণের মহা অস্ত্র। কীট পতঙ্গ অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী, ইহাদের ধারালো হুল নাই, কিন্তু কেহ কেহ দেহ হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত রস নিসৃত করে যে, তাহাতে কোন শত্রু উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় পায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার রাত্রিতে আলো জ্বালিয়া বসিলে, এই প্রকার দুর্গন্ধ-যুক্ত বহু কীট-পতঙ্গ দেখা গিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ অতি নিরীহ প্রাণী, ইহাদের শিং নাই, ধারালো দাঁত বা হুল নাই, কিন্তু ইহারা লম্বা লম্বা লাফ দিতে পারে, তাহাই আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়। গেছো এবং সেপো ব্যাঙের লাফ ও খুব বড় এবং সঙ্গে আবার ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার বিষও বাহির হয়, এই বিষের একটু পরিচয় পাইলেই কোন শত্রু ইহাদের নিকটবর্ত্তী হয় না। কয়েক জাতীয় গিরগিটিও এই প্রকারে দেহ হইতে বিষ নির্গত করিয়া আত্মরক্ষা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃতি দেবী তাঁর এই অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বল সন্তান-গুলিকে এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ভূতলে ছাড়িয়া দিয়াছেন, অপর বলবান্ প্রাণীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখুক্ ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উদ্ভিদ্‌গণ ইতরপ্রাণী অপেক্ষা আরো দুর্বল ও নিঃসহায়, ব্যাঙ্ বা হরিণের মত লম্বা লম্বা লাফ দিয়া যে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবে তাহার সাধ্য ইহাদের নাই। কাজেই একস্থানে দাঁড়াইয়া যাহাতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ইহাদের দেহে রাখিতে হইয়াছে। এই জন্যই কাহারো গায়ে কাঁটা, কাহারো পাতায় সুঁয়ো, কাহারো ফলে, ফুলে, মূলে ও পাতায় বিষ। প্রবল ইতর প্রাণীরা এই সকলের ভয়ে উদ্ভিদের অনিষ্ট করিতে পারে না, অতি বুদ্ধিমান মানুষও ইহাদের নিকট হার মানিয়া যায়। নিম, নিসিন্দা, মাখাল ফল তাহাদের দেহকে অতি বিস্বাদ রসে পূর্ণ রাখিয়া কেমন আত্মরক্ষা করে! মানুষ কোন দিন যে এগুলির দ্বারা রসনাতৃপ্তি-কর ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা যাইতেছে না।

যাহা হউক, দুর্ব্বল জীব কি প্রকারে আত্মরক্ষা করে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন্ প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে যে বিষ সঞ্চিত থাকে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

প্রথমে উদ্ভিদের বিষের কথাই আলোচনা করা যাউক। খেজুর বা কুলের কাঁটা গায়ে লাগিলে আমরা বেদনা পাই, কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী হয় না। বিছুটি বা আল্‌কুশীর সুঁয়ো গায়ে ঠেকিলে যে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তাহা সত্যই বিষের জ্বালা। উদ্ভিদের বিষের ইহা একটি সুপরিচিত উদাহরণ। ছোটখাটো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে বিছুটির সুঁয়োকে নিরেট দেখায় না। এগুলির আগাগোড়া নলের মত ফাঁপা। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এই শূন্যস্থানে একপ্রকার জলবৎ স্বচ্ছ রসও দেখা যায়। এই রসই বিছুটির বিষ। নলাকার সুঁয়োগুলি প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে, আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং নলের ভিতরকার রস শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষের কার্য্য দেখাইতে আরম্ভ করে। বিছুটির বিষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিতেছেন। পিপীলিকার বিষে যে ফরমিক্ এসিড্ (Formic Acid) নামক দ্রাবক মিশানো থাকে, বিছুটির রসের অধিকাংশই সেই দ্রাবকে গঠিত। তা ছাড়া সাপের বিষের মত এক প্রকার রসও অল্পমাত্রায় উহাতে মিশ্রিত

দেখা যায়। বিছুটির জ্বালা-পোড়ার কারণ এই বিষ। সুতরাং অচল উদ্ভিদ্‌কে যদি সচল সাপের সহিত তুলনা করা যায়, তাহাতে অন্যায় হয় না।

আলকুশীর সুঁয়োর বিষ আরো ভয়ানক। বিষের পরিমাণ ইহাতে বিছুটির তুলনায় অধিক। মানুষ বা গোরু প্রভৃতি প্রাণীর দেহে আলকুশী লাগিলে আর নিস্তার নাই। অধিক পরিমাণে সুঁয়ো গায়ে লাগিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

ফুলের উগ্র গন্ধ নির্গত করিয়াও কতকগুলি উদ্ভিদকে আত্মরক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃতি যে সকল বেশভূষায় সাজাইয়া প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে পৃথিবীতে ছাড়িয়া দেন, কেবল স্বভাবের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাই তাহার উদ্দেশ্য নয়, পত্রপুষ্পের বিচিত্র বর্ণ এবং তাহাদের বিচিত্র গঠনের মূলে এক একটা শুভ উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকে। যে সুগন্ধ লইয়া পুষ্প জন্মগ্রহণ করে, তাহা কখনই মানুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য নয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফল প্রসব করিয়া নিজের, বংশ অক্ষুণ্ণ রাখাই উদ্ভিদ্-জীবনের সার্থকতা। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ বলেন, ফুলের গন্ধ এই কার্য্যেরই সহায়তা করে। উদ্ভিদ্ পুষ্প-পুটে মধুভাণ্ড সজ্জিত রাখিয়া গন্ধের দ্বারা দূরের প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গকে আমন্ত্রণ করে। প্রজাপতি পুষ্পের মধুপান করিতে বসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পরাগ গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিয়া ফলের গঠন সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু আমরা উদ্ভিদের যে তীব্র দুর্গন্ধের কথা বলিতেছি, তাহা পতঙ্গের আমন্ত্রণের জন্য নহে। যাহাতে অনিষ্টকর প্রাণী কাছে আসিতে না পারে তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা লিলি জাতীয় কতকগুলি ফুলের গন্ধ যে মানুষ সহ্য করিতে পারে না, এবং এই গন্ধে যে নানা প্রকার পীড়া দেখা দেয়, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে আমাদের চাঁপা ফুলের গন্ধে মাথা ধরার কথাটাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ্ ছাড়িয়া এখন প্রাণীর কথা আলোচনা করা যাউক। আত্ম-রক্ষার জন্য এবং কখনো কখনো আহার্য্য সংগ্রহের জন্য যে কত প্রাণীর দেহে কত রকম বিষ আছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। ইহারা সাধারণ উদ্ভিদের মত দেহকে বিস্বাদ করিয়া আত্মরক্ষা করে না. কাজেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী করাইবার জন্য প্রকৃতি ইহাদের দেহেই নানা বিষদিগ্ধ অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক প্রাণীর বিষগুলি পরীক্ষা করিলে, দেহে উহাদের দুইপ্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বিষ রক্তের সহিত যুক্ত না হইলে দেহের কোন কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সাপের বিষ, বিচ্ছুর বিষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর কতকগুলি, রক্তের সহিত মিশিবার জন্য প্রতীক্ষা করে না, খাদ্যপানের সহিত উদরস্থ হইলেই ইহারা বিষের কার্য্য দেখাইতে সুরু করে। মাকড়সা প্রভৃতির বিষ বোধ হয় এই শ্রেণীভুক্ত। কেবল সাপ ও বিচ্ছুর বিষই যে দেহপ্রবিষ্ট হইলে অনিষ্ট করে তাহা নয়। ভেকের গাত্র হইতে যে ঘর্ম্মবৎ রস নির্গত হয়, তাহা মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া

দেখা গিয়াছে, ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইল্ অর্থাৎ বাইন্ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের (Eel) রক্ত যে কোন প্রাণিদেহে প্রবেশ লাভ করিলেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ করে। কয়েক জাতীয় মৎস্য এবং গিরিগিটির মুখের লালাও রক্তের সহিত যুক্ত হইলেই বিষের কার্য্য দেখাইতে আরম্ভ করে। শিশুর মুখের লালায় যে বিষ আছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর সাহেব দেখাইয়াছেন, এক মাস দেড় মাস বয়সের শিশুর লালা সংগ্রহ করিয়া খরগোস ইত্যাদি প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট করাইলেই, বিষের লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই সকল বিষ খাওয়াইলেই কোন প্রাণীতে অসুস্থতার চিহ্ন দেখা যায় না।

বিষদাঁতযুক্ত প্রাণীর দেহে কোথায় বিষের উৎপত্তি হয় তাহার অনুসন্ধান হইয়াছে। ইহার ফলে জানা গিয়াছে, যাহাদের বিষ-দাঁত আছে, তাহাদের দাঁতের মূলে এক একটি ক্ষুদ্র কোষ থাকে। এই কোষই বিষভাণ্ড। সাপের বিষদন্তে যেমন এক একটা খাঁজ কাটা থাকে, বিষদন্তযুক্ত অপর প্রাণীর দাঁতেও ঠিক তাহাই দেখা যায় ইচ্ছা করিলেই দন্তমূলের কোষস্থ বিষ ইহারা দাঁতের খাঁজের ভিতর দিয়া আনিয়া শত্রুকে দংশন করিতে পারে। মাগুর বা শিঙ্গি মৎস্যের কাঁটায় বিষ আছে, ইহারা হাতে পায়ে কাঁটা ফুটাইলে বেশ যাতনা হয়। এই শ্রেণীর অনেক মাছের কাঁটার মূলে এই প্রকার বিষকোষ ধরা পড়িয়াছে, এবং ইহাদের কাঁটাগুলিতে সাপের বিষদন্তের মত খাঁজ কাটাও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁটা হানিয়া বা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া প্রাণীরা যে বিষ শত্রুর দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বিছুটি প্রভৃতি উদ্ভিদের বিষে যে ফর্‌মিক্ (Formic Acid) দেখা গিয়াছে, ইহাতেও তাহাই ধরা পড়িয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলীকে অসাড় করিয়া দেওয়া ফর্‌মিক্ এসিডের একটা প্রধান কার্য্য। বিষের সহিত এই জিনিষটা মিশ্রিত থাকায় দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে শীকার করার কার্য্যে ইহা খুবই সাহায্য করে। ক্ষুদ্র কাঁচপোকা যখনি বৃহৎ আরস্থলাকে শীকার করিতে যায়, তখন কোন গতিকে আরস্থলার গায়ে একবার হুল ফুটাইতে পারিলেই সেটি ঐ ফর্‌মিক্ এসিড দ্বারা পক্ষাঘাতের রোগীর মত অবশাঙ্গ হইয়া পড়ে। তা'র পর কাঁচপোকা উহার শুঁয়ো ধরিয়া অনায়াসে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে পারে।

মৌমাছি ও ভীমরুলের ন্যায় বিছুর বিষও তাহাদের পুচ্ছে থাকে। ইহাদের সম্মুখের দুটা দাঁড়া এবং দাঁত একেবারে নির্বিষ। পুচ্ছের প্রান্তস্থিত ধারালো হুল এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষকোষই ইহাদের আত্মত্রাণের মহা অস্ত্র। সূক্ষ্মাগ্র হুলটিকে ইহারা অতি সাবধানে কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠাইয়া রাখে, তা'র পর শত্রুপক্ষ সম্মুখে আসিলেই সেই তাহার দেহে বিদ্ধ করিয়া দেয়।

জেলি মৎস্য (Jelly fish) নামক এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর দেহেও বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের হুল, বিষ-

দন্ত বা সিঙ্গি মাছের মত বিষময় কাঁটা কিছুই নাই। দেহ হইতে মাকড়সার সূত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বিষপূর্ণ সুঁয়ো বাহির করিয়া ইহারা শত্রুকে আঁকড়াইয়া ধরে। সুঁয়োর বিষে শত্রুর দেহে বিছুটির মত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই জন্য জেলি-মৎস্যকে সামুদ্রিক বিছুটি (sea nettles) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গ জাতির দেহে যত বিষ দেখা যায়, বোধ হয় অপর কোন জাতির মধ্যে সে প্রকার দেখা যায় না। মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, পিপীলিকা সকলেই বিষাক্ত এবং ইহাদের সকলেরই বিষ পুচ্ছদেশে রক্ষিত দেখা যায়। কেবল সুঁয়ো পোকা ও মশক তাহাদের বিষ পুচ্ছে রাখে না। সুঁয়ো পোকার বিষ তাদের চুলে এবং মশকের বিষ তাহাদের মুখে থাকে। মাকড়সা-জাতীয় পতঙ্গ তাহাদের পায়ের নখে রাখে। নখের মূলেই ইহাদের বিষ-স্থালী। আমাদের তেঁতুলে বিছের বিষ তাহাদের দাঁতে থাকে, দন্তমূলে যে বিষস্থালী থাকে তাহা হইতে ইচ্ছামত বিষ নির্গত করিয়া শত্রুকে দংশন করিতে পারে। পতঙ্গের সংখ্যা যেমন অধিক, ইহাদের শত্রুও তেমন অনেক। অনেক পক্ষীর পতঙ্গই প্রধান আহার। তা ছাড়া টিক্‌টিকি, গিরগিট, এমন কি আমাদের সেই অতি নিরীহ ভেকগুলি সম্মুখে পতঙ্গ পাইলে, সিংহের মত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পতঙ্গের গায়ে, মুখে, লেজে, দাঁতে, নখে, বিষ রাখিতে হইয়াছে।

বড় আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের কাঁকড়াগুলির বড় বড় দাঁড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিষ নাই। চিংড়িমাছেরও সেই দশা। খুব লম্বা লম্বা দাঁড়া আছে, কিন্তু সেগুলি একবারে নির্ব্বিষ। পক্ষীদের পায়ের নখ ও ঠোঁট খুব ধারালো, কিন্তু সেগুলিতেও বিষের চিহ্ন দেখা যায় নাই।

যে সকল প্রাণীর দেহে কোন প্রকার বিষযুক্ত অঙ্গ নাই, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলির মাংসে বিষের লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব (Sir Ray Lankester) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অন্ততঃ শতকরা দশজন লোক ইচ্ছা করিলেও মৎস্য মাংস আহার করিতে পারে না,—জোর করিয়া খাওয়াইলে নানাপ্রকার পীড়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ইহা দেখিয়া ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব বলিতেছেন,—মৎস্য-মাংসাহারে এই অসুস্থতার লক্ষণ বিষেরই পরিচায়ক। বিষ খাইলেই সকলে অসুস্থ হয় না,—এমন বিষ অনেক আছে যাহা একজনের শরীরে যে ফল দেখায় অপরে তাহা দেখায় না। একই খাদ্য আহার করিয়া এবং একই জল পান করিয়া এক ব্যক্তি পীড়িত হইল এবং অপর ব্যক্তি খাদ্যস্থ বিষ হজম করিয়া সুস্থ থাকিল, এ প্রকার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এই সকল কথা মনে করিয়া ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব বলিতেছেন যে, নিরামিষাহারিগণ মৎস্য-মাংস খাইলেই অসুস্থ বোধ করেন, তাঁহাদের এই অসুস্থতার কারণ মৎস্য-মাংসের বিষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া

যায়, যাঁহারা যথেষ্ট মাংস আহার করিতে পারেন, কিন্তু মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারেন না। চিংড়ি মৎস্য বা কাঁকড়া খাইলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন, এ প্রকারও অনেক লোক দেখা গিয়াছে। রন্ধন করিলেও মৎস্য-মাংসে মৃদু বিষ থাকিয়া যায়, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব নিরামিষাহারীর রুচি-অরুচির ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সাপ প্রভৃতির যে তীব্র বিষের বিন্দুমাত্র রক্ত স্পর্শ করিলে বৃহৎ প্রাণীরও মৃত্যু হয়, তাহা উহাদের নিজের দেহে প্রবেশলাভ করিলে কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। একটি সর্প আর একটিকে দংশন করিলে আহত সর্পের যে, কোন অনিষ্টই হয় না, তাহা একাধিক পরীক্ষায় সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কয়েক জাতীয় সর্পকে রাগাইলে তাহারা নিজেদের গায়ে নিজেরাই কামড় দিতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নিজের বিষে ইহাদের কেহই নিজে মরে না। সম্প্রতি এই ব্যাপার লইয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা গবেষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বসন্তের বা ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজ অল্পমাত্রায় দেহস্থ করিলে যেমন এই সকল রোগের তাজা বিষ আর মানুষকে পীড়িত করিতে পারে না, সেইপ্রকার সর্প প্রভৃতির দেহেই বিষ-কোষ আছে বলিয়া সেই বিষে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের শান্তির জন্য যেমন আমরা ক্ষিপ্ত কুকুরের মৃদু বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকি, সাপগুলিও ঠিক সেই প্রকার যেন নিজের বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। তাই পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিলে বা নিজের দেহে নিজের বিষ ঢালিয়া দিলে ইহাদের কোনই অনিষ্ট হয় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

লোকশিক্ষা ও সমাজপ্রকৃতি

লোকশিক্ষার সঙ্গে সমাজ-বিবর্ত্তনের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। যে সকল শক্তির, সংঘর্ষণে বা সমবায়ে সমাজ-জীবন বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, লোকচরিত্রের শক্তি তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। আর লোকশিক্ষা এই লোকচরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়া, সমাজ কোন্ দিকে, কতটা বেগে, বিবর্ত্তিত হইবে, ইহা ঠিক করিয়া দেয়। এই জন্য কোনও সমাজে কোনও অভিনব লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে এই নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সেই সমাজের পুরাতন প্রকৃতির কতটা সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন সম্ভব, ইহা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কেননা, এ সঙ্গতিসাধন যদি একান্তই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থাতে সাংঘাতিক সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে এবং সে বিপ্লবমুখে সমাজের নিজস্ব প্রকৃতি এবং সনাতন সভ্যতা ও সাধনাকে রক্ষা করা নিতান্তই কঠিন হইয়া পড়িবে। এইরূপ

বিপ্লবের আশঙ্কাতেই ইংরেজের আইনের সাহায্যে, ইংরেজের রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া, এদেশে ইংরেজি ঝাঁঝের ও বিদেশীয় ছাঁচের লোকশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক, কিছুতেই ইহা ইচ্ছা করি না।

আমাদের মধ্যে অনেকে এই সামাজিক বিপ্লবকে একরূপ অনিবার্য্য বলিয়া মনে করেন। আধুনিক অবস্থাধীনে আমরা যে কোনও প্রকারে আমাদের নিজস্ব সামাজিক জীবনটীকে তার নিজের স্বরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব, এ বিশ্বাস অনেকেরই নাই। প্রাচীন রীতি নীতিসকল চারিদিকে, চক্ষের উপরে, একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছে, কেহ কিছুতেই এ ভাঙ্গাটাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না ও পারিবার কোনও সম্ভাবনাও কোথাও দেখা যায় না। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরেই এই বিপ্লব যে অনিবার্য্য, অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁরা এ বিপ্লবের পক্ষপাতী নহেন। তাঁরা বরং যেটা যেমন ছিল সেটীকে ঠিক তেমনি রাখিতে চাহেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য বলিয়া সমাজের মূল প্রকৃতিটীকেও বাঁচাইয়া রাখা অসাধ্য, এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। হিন্দুসমাজে যুগের পর যুগ, অশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শাসন-সংস্কার, ক্রিয়াকর্ম্ম, যুগে যুগে এ সকলের বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রেই বিপ্লবাত্মক নহে। বরং অধিকাংশ স্থলে এই সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই সমাজের নিত্য প্রকৃতিটী আরো উত্তরোত্তর ফুটিয়াই উঠে। আমাদের সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসেও তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ একালেই যে কেবল সমাজ নূতন পথ ধরিয়া, অভিনব আদর্শের প্রেরণায়, উচ্চতর সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে, অভূতপূর্ব্ব আকারে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা নহে। চিরদিনই এরূপ হইয়াছে, চিরদিনই এরূপ হইবে। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তার নিজের স্বরূপটী এ পর্য্যন্ত হারাইয়া যায় নাই। এই স্বরূপটী হারাইয়া গেলেই সামাজিক পরিবর্ত্তন সমাজ-বিপ্লবে পরিণত হয়। এই বিপ্লব যাহাতে না আসে, সর্ব্বপ্রযত্নে তারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর এই কর্ত্তব্যের প্রেরণাতেই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের প্রস্তাবিত লোকশিক্ষা-বিধানের প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি।

আমাদের সমাজের গঠনটী আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজের গঠন হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। কোনও দিন তাহাদের সমাজের গঠনও ঠিক আমাদের সমাজের গঠনেরই মত ছিল কি না, জানি না। আজ যে তাদের সমাজ-গঠন আমাদের সমাজ-গঠন হইতে একান্তই ভিন্ন, ইহা জানি। আর আমাদের সভ্যতা, সাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম, মনুষ্যত্বলাভের যাবতীয় উপায় ও উপকরণ সকলই আমাদের এই বিশেষ সমাজ-গঠনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমাজের এ গঠনটী যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে আমাদের সভ্যতা সাধনা সকলই লোপ পাইবে। তাহা হইলে আফ্রিকার কাফ্রি বা প্রশান্ত সাগরকূলের জাপানীরা যেমন সকল বিষয়ে

একরূপ য়ুরোপীয় বনিয়া যাইতেছে,আমরাও সেইরূপ আচার-বিচারে, ভাবে-স্বভাবে, স্বল্পবিস্তর য়ুরোপীয় বনিয়াই যাইব, সন্দেহ নাই। ইহাতে আমাদের নিজেদের সর্ব্বনাশ ও দুনিয়ার সমূহ ক্ষতি হইবে। এই অমঙ্গল নিবারণের জন্য আমাদের সমাজ-গঠনটীকে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক। আর এইটী করিতে গেলে, গোখেলে মহাশয় যে ভাবে, যে আদর্শের লোকশিক্ষা এদেশে প্রচলিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, সে ভাবের ও সে আদর্শের লোকশিক্ষা যাহাতে প্রচলিত না হয়, তারই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও প্রকারের জোরজবরদস্তির সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষা প্রচলন করিবার চেষ্টার একটা বিষম বিপদ এই যে, এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই বিদেশীয় রাজ-পুরুষদিগের শরণাপন্ন হইতে হইবে। আর তাঁহাদের সাহায্যে যে লোকশিক্ষা দেশে প্রচলিত হইবে, তার তত্ত্বাবধানভার, সে শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য-নির্ণয়ের অধিকার, এ সকলি এই বিদেশীয় রাজ-পুরুষদিগের হাতেই অর্পণ করিতে হইবে। সুতরাং এরূপ লোকশিক্ষা যে বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীয় আদর্শে যদি দেশের জনসাধারণেরা শিক্ষিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, দেশের লোকচরিত্র এমন একটা আকার ধরিবেই ধরিবে, যাহাতে এই লোক-চরিত্রের আশ্রয়ে আমাদের সমাজের নিজস্ব গঠন ও স্বরূপটীকে রক্ষা করা আর কিছুতেই সম্ভব হইবে না। গোখেলে মহাশয়ের চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে আমরা অল্পকাল মধ্যে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার গৌরব ভুলিয়া গিয়া, কাফ্রি বা জাপানীর মত য়ুরোপীয়ানের অপবর্ণস্বরূপ হইয়া উঠিব। ইহা যাঁরা অপরিহার্য্য বা বাঞ্ছনীয় মনে করেন,তাঁদের পক্ষে গোখেলে মহাশয়ের এই বিলের পোষকতা করাই স্বাভাবিক। যাঁরা এইরূপে স্বজাতীয়ের আত্মহত্যার সম্ভাবনার প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে প্রাণপণে এই আত্মঘাতী সংস্কারের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করাও সেইরূপই স্বাভাবিক।

য়ুরোপীয় সমাজগঠনের মূলে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া আছে। আমাদের সমাজগঠনের মূলে এরূপ কোনও ভাব কখনওই ছিল না। আমাদের সমাজেও ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ মর্য্যাদা ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সাধনা সামাজিক জীবনের বিবিধ সম্বন্ধের সঙ্গে প্রকৃত ও পূর্ণতম ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব জানিয়া এই জীবনের বাহিরে, ধর্ম্মজীবনের অতি উচ্চতম সোপানে, এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যেখানে কোনও সম্বন্ধ সেখানেই একের উপরে অন্যের একটা দাওয়াদাবী জন্মিয়া যায়; সেখানেই পরস্পরকে পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলিতে হয়। আর যখন এইরূপ সম্বন্ধের সমষ্টি লইয়াই আমাদের সামাজিক জীবন গঠিত হয়, তখন এখানে কোনও প্রকারের ব্যক্তিত্বের দাবী করা যে নিতান্ত বেয়াদবী মাত্র, হিন্দু ইহা অতি প্রাচীন

কালেই বুঝিয়াছিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিত্বাভিমানকে নষ্ট করিবার জন্যই শত অভিসন্ধি আঁটিয়াছে, তাহাকে বাড়াইয়া তুলিবার কোনও অবসরের সৃষ্টি করে নাই। অথচ মানুষের ব্যক্তিত্ব যে একটা অতি খাঁটি ও অতি উচ্চ বস্তু, হিন্দু ইহাও কখনও ভুলিয়া যায় নাই। বরঞ্চ এই ব্যক্তিত্বই যে প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনুষ্যত্ব, এ জ্ঞান তার খুবই ছিল। সুতরাং সামাজিক জীবনে এই ব্যক্তিত্বাভিমানকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে সংকুচিত ও সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া, হিন্দু অতি-সামাজিক সন্ন্যাসাশ্রমে মানুষের এই ব্যক্তিত্ব-বস্তুর অবাধ প্রসারণেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজ যে ব্যক্তিত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতেছে, আর হিন্দু যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলিয়া ধরিয়াছে, এই দুই বস্তু ঠিক এক নহে। সমাজ-জীবনে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই সর্ব্ববিধ সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে যে একে-অন্যের বশ্যতার ভাবটী রহিয়াছে, তাহাকে ক্ষীণ করিতেই হইবে। এই জন্য য়ুরোপীয় সমাজে এই বশ্যতার বিধানটী বড়ই দুর্ব্বল হইয়া, সকলকে স্ব স্ব প্রধান করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজে একটা সংগ্রামের ভাব যেন দিবানিশি জাগিয়া রহিয়াছে। এই সামাজিক সমরসজ্জার নামই প্রতি-যোগিতা বা competition. য়ুরোপীয় সমাজ বহুকাল হইতে এই প্রতিযোগিতার পথ ধরিয়াই চলিয়াছে। ইহার ফলে যেমন য়ুরোপে কতকগুলি লোকের ভিতরে উচ্চাঙ্গের রাজসিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ আবার অধিকাংশ লোককেই এই নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামের নিষ্পেষণে একেবারে পশুর মতন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাত্ত্বিকতা বিকাশের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেছে না। ফলতঃ এই প্রতিযোগিতার তীব্রতায় য়ুরোপীয় সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যে পড়িতেছে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

আমাদের সমাজ এ পর্য্যন্ত এ পথ ধরিয়া চলে নাই। আমাদের সমাজ অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাহচর্য্যের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। য়ুরোপের সমাজগঠনের ও সামাজিক বিবর্ত্তনের মূলে যেমন প্রতি-যোগিতা বা competetion, সেইরূপ ভারতের সমাজগঠনের ও সামাজিক বিবর্ত্তনের মূলে এই সাহচর্য্য বা co-operation বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সাহচর্য্য-প্রতিষ্ঠিত সমাজগঠনের গুণেই আমরা এত আঘাত সহিয়াও আজি পর্য্যন্ত নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্বটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছি। আমাদের দারিদ্র্য ইংলণ্ড প্রভৃতির দারিদ্র্যের তুলনায় বেশি বই কম নহে। কিন্তু এমন নিঃস্ব হইয়াও, এ জাতিটা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, এই সাহচর্য্য-প্রতিষ্ঠিত সমাজগঠনই তার মুখ্য কারণ।

আমাদের একান্নবর্ত্তীপরিবার-প্রথা এই সাহচর্য্য-নীতির ভিত্তি ও প্রমাণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া দেখিলে, আমাদের এক একটী পরিবার এক একটী যৌথ-কারবারী-সম্প্রদায়েরই মতন। বিলাতি

যৌথ-কারবারের মূলধন কেবল টাকাকড়ি। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের যৌথ-কারবারের মূলধন কেবল টাকাকড়ি নয়, কিন্তু মানুষের দেহ-মনের শক্তি। পণ্য-উৎপাদনের দিক দিয়া দেখিলে আমাদের এ পরিবারগুলিকে এক একটী ফ্যাক্টরী বলিলেও চলে। কিন্তু এ ফ্যাক্টরীর কর্ম্মকর্ত্তা ও তত্ত্বাবধায়ক মুনাফা-লোলুপ ধনী নহেন, কিন্তু স্নেহপ্রবণ পিতা কিম্বা ভ্রাতা। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর সাধনা, হিন্দুর নিজস্ব শিল্পাদি এ সকলই বাঁচিয়া থাকিবে। আর এই একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি যদি বিলাতি সভ্যতার চাপে নষ্ট হইয়া যায়, তবে আর হিন্দুর বিশেষত্বকে বাঁচাইয়া রাখা কোনও মতেই সম্ভব হইবে না। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি যেখানে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সেখানে সেই পরিমাণে আমাদের সভ্যতার সব ভাল ভাল বস্তুগুলি একে একে নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। যুগযুগান্ত ধরিয়া হিন্দু যে দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে বসিয়া অশেষ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আপনার সভ্যতা ও সাধনা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, চিত্তের ঔদার্য্য ও চরিত্রের শক্তিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এক একটী একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিচ্ছিন্নতায় ও বিলোপে, সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের এক এক খানি খিলান যেন খসিয়া পড়িতেছে, এমনই মনে হয়।

কিন্তু যাঁহারা সমাজের উচ্চতর শ্রেণী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষও বেশি ফুটিয়া উঠে, এবং সেখানে এই পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়া যতই ক্ষোভের বিষয় হউক না কেন, বর্ত্তমান অবস্থাধীনে কতকটা যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর এ সকল স্থলে এই একান্নবর্ত্তীপরিবার-প্রথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশের যে-জাতীয় ও যতটা পরিমাণে ক্ষতি হয় না, জনসাধারণের মধ্যে যদি তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে যে তদপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক ক্ষতি হইবে, তাহারও কোনও সন্দেহ নাই। এই একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার কল্যাণেই আমাদের দেশের কৃষকেরা বা অপর শ্রমজীবিগণ য়ুরোপের বা আমেরিকার শ্রমজীবিগণের মতন এতটা অসহায় হইয়া পড়ে নাই। যতদিন এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের আশ্রয়ে ইহারা বাস করিবে, ততদিন তাহারা কিছুতেই য়ুরোপীয়ান্ বা আমেরিকান্ শ্রমজীবিগণের মতন এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে না ইহাও স্থির নিশ্চয়। এইজন্যই সর্ব্বপ্রযত্নে, অন্য দিকে সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, আমাদিগকে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। গোখেলে মহাশয় যে সার্ব্বজনীন সাধারণ-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা যদি দেশে এখনি প্রচলিত হয়, তবে তার ফলে আমাদের সমাজের নিম্নস্তরেও যে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি অতি দ্রুতগতিতে ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। আর

সে অবস্থায়, য়ুরোপের সমাজ আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরাও যে ক্রমে সেই স্থানে যাইয়াই উপস্থিত হইব, ইহাও স্থিরনিশ্চিত।

গোখেলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিল্ পাশ হইলে দেশে যে সার্ব্বজনীন সাধারণ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে য়ুরোপীয় ঝাঁঝের ব্যক্তিত্বাভিমানকে যে জাগাইয়া তুলিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। এটী যদি না জাগে তবে গোখেলে মহাশয় যে উদ্দেশ্যে এই বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাহাই পণ্ড হইয়া যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের যথাসঙ্গত স্বত্ব-স্বার্থের জ্ঞান জন্মানই তাঁর এই সংস্কার-চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। তারা নিজেরটী বুঝিতে পারিবে, প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, জমিদার ও মহাজনের অবৈধ উৎপীড়ন হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে, এই নূতন শিক্ষাবিধানের সম্ভাবিত উপকারিতার প্রমাণস্বরূপ গোখেলে মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকেরা এগুলিরই বিশেষ উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু "নিজেরটী" বোঝার যে আর একটা দিকও আছে, "প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা" করিবার শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানব-চরিত্রে যে আরো কতকগুলি বস্তু ফুটিয়া উঠে, এ সকলের প্রতি ইহারা দৃক্‌পাতও করেন না। বেশি করিয়া যে যুবক কৃষক "নিজেরটী" বুঝিতে যাইবে, সেই ক্রমে আপনার সবল পেশির সক্ষম কর্ম্ম-চেষ্টার দ্বারা জরাজীর্ণ পিতামাতার ভরণ পোষণ করা যে জীবন-সংগ্রামে যথাযোগ্য জয়লাভের সহায় নহে, কিন্তু কতকটা অন্তরায়ই হইয়া পড়ে, এটীও বুঝিয়া উঠিবে এবং এইজন্য সে বিবাহ করিয়াই নিজের স্বতন্ত্র ঘর বাঁধিবার জন্যও ক্রমে ক্রমে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। আর এইরূপ ভাবে এই সার্ব্বজনীন সাধারণশিক্ষার কল্যাণে আমাদের যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমাদের সমাজের ও সভ্যতার পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা, সেই একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। ইহাতে আমাদের কি যে সর্ব্বনাশ হইবে, ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আর এই বিষম বিপৎপাতের আশঙ্কাতেই শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের এই সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ হওয়া দেশের এক প্রকারের জীবন-মরণের কথা বলিয়া মনে করি।*

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের লোকশিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তখন বিপিন বাবুর বক্তব্য শেষ হয় নাই বলিয়া আমরা সে প্রতিবাদ পত্রস্থ করি নাই। এক্ষণে বিপিন বাবুর প্রবন্ধগুলি পাঠান্তে কেহ উপযুক্ত আলোচনা বা প্রতিবাদ পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। বঃ সঃ।

তারার কাহিনী

অগ্নিদৈবত—কৃত্তিকা-নক্ষত্র (Pleiades)

তড়িৎবর্ণ ঘন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারানিচয়ে এই তারাপুঞ্জ গঠিত। এই তারাপুঞ্জ সোম-ধারার (১) মধ্যে অবস্থিত। (২) এবং ইহা সোমধারার কেন্দ্রস্থানীয়। (৩)

অতি পুরাকালে কৃত্তিকাগণ স্বতন্ত্র তারা-মণ্ডল বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং মাতৃ-মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। ৪) মাতৃগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্থিত পিতৃগণের পত্নী। (৫)

মহাভারতে (৩।২২৯) সপ্ত কৃত্তিকা-গণের নক্ষত্রচক্রে অভি-উন্নতির ইতিহ দৃষ্ট হয়। (৬) বোধ হয় যে এই অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিকাগণ বৃষরাশি-ভুক্ত হইয়াছিল। কৃত্তিকাগণ তারা-বৃষের ককুৎ গঠন করে।

কালক্রমে কৃত্তিকাগণের একটী তারা হইলে কৃত্তিকাগণ ষট্-কৃত্তিকা খ্যাতি গ্রহণ করিলেন। (৭) এই নক্ষত্র ক্ষুর ও অগ্নিশিখা-আকৃতি সম্ভূতি, অনুসূয়া, ক্ষমা প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতী ও লজ্জা এই সপ্তমাতার মধ্যে অরুন্ধতী সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিত আছে।

আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।২।৪) পাই—আদিতে কৃত্তিকাগণ ঋক্ষগণের পত্নী ছিলেন। পুরাকালে সপ্তর্ষিগণকে ঋক্ষ (ভল্লুক) বলিত। কিন্তু কৃত্তিকাগণ স্বামীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। সপ্তর্ষি-গ উত্তরে এবং কৃত্তিকাগণ পূর্ব্বদিকে থাকেন। (৮)

অগ্নিদেব কৃত্তিকাগণের সখা এবং তাঁহারা অগ্নিদেবের সহবাস করেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত এই ইতিহটী বহু বিস্তৃত ভাবে মহাভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার সার অংশ এই —

মহাভারত মতে (৩।২২৩-২২৯) "একদা বশিষ্ঠপ্রমুখ বিপ্রেন্দ্রগণের যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞানুষ্ঠান কালে হুতবহ অগ্নিদেব উপ-নীত হইয়াছিলেন। তিনি পাপচক্ষে মুনিপত্নীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া আত্মগ্লানি

---

(১) The Milky Way.

(২) ইন্দুভিঃ ষট্ যুক্তান্‌…। ঋঃ ১।২৩।১৫

(৩) "They are regarded by Madler as the central group of the system of the Milky Way."

(৪) আসন্নমৃত্যুঃ ন পশ্যেৎ চতুর্থন্ মাতৃমণ্ডলম্ (স্কন্দ পুরাণ)

তু। On the Globe of Eudoxos (B. C. 403) the clusterers are distinct from the Bull. In the Hippercho-Ptolemy List the Pleiades are included in the Bull.

(৫) যে মরীচি-আদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ স্মৃতাঃ তৎপত্ন্যঃ লোকমাতরঃ। পদ্মপুরাণ।

(৬) এবং উক্তেন শক্রেন ত্রিদিবম্ কৃত্তিকাঃ গতাঃ নক্ষত্রম্ সপ্ত শীর্ষাভম্ ভাতি তৎ ব্রহ্মদৈবত। Note ব্রহ্মা = অগ্নি ব্রহ্মা।

(৭) গ্রীস দেশীয় ইতিহাস মতে এটলাস দেবের সপ্ত কন্যা মধ্যে মিরোপি (Merope) মর্ত্ত্য সিসিফস্ রাজকে আত্মসমর্পণ করিয়া লজ্জায় কষ্টদৃশ্য হইলেন। মতান্তরে ট্রয় নগরের ধ্বংস দর্শনে সপ্তকন্যা দুঃখে ম্লান হইলেন। Brown—146-7

(৮) এতাঃ (কৃত্তিকাঃ) হ বৈ প্রাচ্যৈঃ দিশঃ ন চ্যবন্তে। (শঃ ব্রাঃ ২।১।২।৩) এই সময়ে মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু এই নক্ষত্রের সন্নিহিত ছিল

বশে আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প হইলেন। এজন্য তিনি বনে প্রস্থান করিলেন। দক্ষদুহিতা স্বাহা দেবী অগ্নিদেবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নিদেবের মন স্বাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। স্বাহা অগ্নিদেবের মন জানিয়া প্রতিপদ তিথিতে একে একে ছয় মুনিপত্নীর রূপ ধারণ করিয়া অগ্নিদেবকে মোহিত করিলেন। এবং গরুড়ী রূপ ধারণ করিয়া বন হইতে বহির্গত হইয়া শরস্তম্বসংবৃত শ্বেতপর্ব্বতে স্থিত কাঞ্চন কুণ্ডে ছয়টী গর্ভ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তপঃপ্রভাব-শালিনী অরুন্ধতীর দিব্যরূপ স্বাহা অনুকরণ করিতে পারিলেন না।

এই ষট্ গর্ভ হইতে স্কন্দ ওরফে কুমার দেবের জন্ম হইল। চৈত্ররথবাসী জন-গণ বলিতে লাগিল অগ্নিদেব সপ্তর্ষি গণের ছয় পত্নীর সহিত সমাগমে মহান্ অনর্থ ঘটনা করিয়াছেন।

সপ্তর্ষিগণ কুমারের জন্ম শ্রবণে দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে (৯) আর ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন।

কুমার দেব দেবসেনাপতির পদ গ্রহণ করিলে সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নী স্ব স্ব স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন "হে পুত্র স্বামিগণ অকারণে রোষপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে পুণ্যস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছেন। তুমি আমাদিকে অক্ষয় স্বর্গ দান কর।"

তখন ইন্দ্র দেব কুমারদেবকে কহিলেন —রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠতা লাভে সমুৎসুক হইয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিয়াছেন। আমি এই নক্ষত্র পরিচ্যুতি নিবন্ধন ব্যাকুল হইয়াছি। আপনি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া নক্ষত্র-সংখ্যা পরিপূরণ করুন। ইন্দ্র এইরূপ কহিলে কৃত্তিকাগণ স্বর্গে গমন করিলেন। সেই অগ্নিদৈবত নক্ষত্র সপ্তশীর্ষরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।২।৪) আমরা আরও পাই—

"বিশেষতঃ অন্যান্য নক্ষত্র এক দুই তিন বা চারি তারাতে গঠিত। সুতরাং ষট্তারাত্মিকা কৃত্তিকা বহু তারকময় বলিয়া উহার বহুলা নাম। (১০) বহুলা নক্ষত্র সমন্বিত পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের অপর নাম বাহুল। এবং কুমার কার্ত্তিকেয় দেবের নাম বহুলাসুত "বাহুলেয়।" (১১)

এই বহুলা নক্ষত্র বা বহুলা দেবী "বেহুলার" ভাসানের নায়িকা।

উপাখ্যানটী এই—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা নিশিতে লখিন্দর (লক্ষ্মীন্দ্র) বেহুলা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। ঐ রজনী যোগে বাসরঘরে সূত্র-সঞ্চার সর্প (১২) অলক্ষিত

(৯) অক্ষমালা অরুন্ধতীর নামান্তর। অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা অধমযোনিজা। (মনু)

(১০) তু। গ্রীসদেশীয় নাম Pleiades=many. হিব্রু নাম Kimah=the cluster. বেবিলন নগরে নাম Kimtu=the family. আরবদেশীয় নাম অস্-থুরয়=the little ones.

(১১) বাহুলেয়ঃ তারকজিৎ। অমরকোষ।

(১২) চন্দ্র-সূর্য্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া সমসূত্র পাইলেই রাহু সর্প উভয়কে গ্রাস করে। এই জন্য রাহুর নাম সূর্য্য-সঞ্চার সর্প।

রূপে লখিন্দরকে দংশন করে এবং লখিন্দর জীবন ত্যাগ করে। সদ্যোঢ়া বেহুলা সুন্দরী লখিন্দরের শব লইয়া গঙ্গা নদীতে (আকাশ গঙ্গা) ভেলায় চড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। দেব-বরে লখিন্দর পুনর্জীবিত হয়। (১৩)

পুরাকালে তারা বৃষের ককুৎস্থিত কৃত্তিকানক্ষত্র(১৪)নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র ছিল। সুমেরুবাসী তারাদর্শক দেখিতেন যে তারা বৃষের ককুৎস্থিত এই নক্ষত্রে উদিত হইয়া সূর্য্যদেব ষট্‌মাসব্যাপী দিবার উদ্বোধন করিতেন। ইনিহে এই কাকুৎস্থ সূর্য্য ইক্ষাকু নাম গ্রহণে সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ হইলেন

কৃত্তিকানক্ষত্র-সংযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে কার্ত্তিক মাসের নামকরণ হইয়াছে। পুরাকালে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কৌমুদী (Harvest Moon) নাম ধারণ করিতেন। কৌমুদী তিথিতে প্রাচীন জগতে মহোৎসব হইত। (১৫)

কারণ ঐ দিন হইতে কার্ত্তিকাদি বর্ষ গণনা হইত। এবং ঐ দিনে নব হল চালন আরম্ভ হইত। অদ্যাপি বোম্বাই দেশের কৃষকগণ হল স্কন্ধে লইয়া কৌমুদীনিশিতে সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরে "মাঙ্গন" (১৬) চাহে।

বিলাতেও সেই রীতি আছে বা অন্ততঃ ছিল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা কৌমুদী হইতে বর্ষ গণনা হইত বলিয়া চন্দ্র "কৃত্তিকা ভব" নাম ধারণ করেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা নিশিতে পূর্ব্বে কৌমুদী উৎসব হইত। আবার এই নিশিতে রাসলীলার উৎসব ইহ জগতে হইতেছে। এবং দেবগণ ও মর্ত্ত্যগণ এই নিশিতে রাধা ওরফে বিশাখা (১৭) নক্ষত্রে স্থিত কৃষ্ণসূর্য্য এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে স্থিত পূর্ণিমার চন্দ্র সন্দর্শনে আধিদৈবিক রাসোৎসব বিলোকন করেন।

তড়িৎবর্ণ বা চম্পকবর্ণ কৃত্তিকাগণ এবং লোহিতবর্ণ রোহিৎতারা বা "হলন্দীবরন" তারা (Aldebaran) ধাত্রীশালার "সাত ভাই চাম্পা" এবং "করবী বা পারুল" যথা—

"সাত ভাই চাম্পা জাগো রে
কেন বোন্ পারুল ডাকো রে॥
(সহর)

"সাত ভাই চাম্পা জাগো রে
কেন বোন্ করবী ডাকো রে॥
(পল্লীগ্রাম)

সোমধারার কেন্দ্রে অবস্থিত ষট্‌কৃত্তিকা বা ষট্‌মাতৃকাগণ দুগ্ধবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ মহাভারত মতে (৩।২২৫) সোমধারা

(১৩) তু। সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান "সবিতা সত্যধর্ম্মা।" (অঃ বেঃ ৭।২৪।১)=সবিতা সত্যবান্।

(১৪) কৃত্তিকাঃ প্রথমম্। তৈঃ ব্রাঃ, ১।৫।১। তু। বেবিলন নগরে এই নক্ষত্রের নাম টি (Te) অর্থাৎ ভিত্তি ছিল এবং চীনদেশে ইহার নাম "ম-আ-ও" অর্থাৎ সূর্য্য বিমুক্ত দ্বার ("Sun-open-door") ছিল।

(১৫) চাণক্য। বৃষল! কৌমুদী মহোৎসবস্থ কিম্ কারণম্। মুদ্রারাক্ষস।

(১৬) "Plough Money".

* পল্লীগ্রামে পৌষমাসে হল বোল্ল গীত হয় এবং মাঙ্গন হয়।

(১৭) রাধা বিশাখা—পুণ্যোতু (অমরকোষম্)

(দুগ্ধধারা) এই মাতৃমণ্ডল হইতে বিনিস্থত হইয়াছিল। (১৮) এবং দেবগণ কুমার দেবকে স্তন্যদানার্থে কৃত্তিকাগণকে নিয়োজিত করিলেন। (১৯)

(১৮) বিশাখায়াম্ যদা সূর্য্যঃ চরতি অংশম্ তৃতীয়কম্
তদা চন্দ্রম্ বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা শিরসি স্থিতম্।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৭২

(১৯) ক্ষীরসম্ভবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ৎ
(রাম ২ ৩৮।২৩)

আবার মাতৃগণ শিববিবাহে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। আমরা বেদে (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫) পাই "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি" অর্থাৎ দেবগণ নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। যথা—মাতৃগণ মাতৃমণ্ডলে।

তারাদর্শক।

বেদে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব

পাশ্চাত্য মনীষিগণ গবেষণা ও পরীক্ষা-দ্বারা যে বিজ্ঞান-যুগ পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার প্রধান-লক্ষ্য ও কৃত-কার্য্যতা এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি-রহস্যোদ্ভেদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-চূড়ামণি বিজ্ঞানাচার্য্য হক্‌স্লি (Huxley) এক কথায় আবার এই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, মুখ হইতে ধূমপানের ধূম (whiff of smoke) নির্গত হয়, তাহাতেই সৃষ্টিরহস্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বাষ্পই সৃষ্টির আরম্ভ। ভূমণ্ডলের বিচিত্র গঠন-প্রণালীর মূলানুসন্ধানে এই তত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য জগতের গঠন উপাদান বিশ্লেষণে ইহারই আভাস পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিভিন্ন পরিণাম পর্য্যবেক্ষণে বাষ্পময়-নীহারিকাতে(Nebula) সৃষ্টির প্রথমক্রিয়া প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ আর্য্যমনীষিগণের উজ্জ্বল প্রতিভাতে সেই স্মরণাতীত বৈদিক কালেই যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ব্বোক্ত অভিনব তত্ত্ব কেবল প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা যে বহুল রূপে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপাদন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

ঋগ্বেদ, বেদ সকলের মধ্যে প্রাচীনতম; তাহার কয়েকটী মন্ত্রে জলেতেই সৃষ্টির প্রথম বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে কবিকল্পনা নহে, অবৈজ্ঞানিকের স্বপ্নদৃষ্ট প্রচ্ছন্ন সত্য নহে, পরন্তু বৈজ্ঞানিকের চিন্তা-প্রসূত, যুক্তিসমর্থিত, প্রত্যক্ষলব্ধ, সুস্পষ্ট তত্ত্ব, তাহা এ কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিলেই পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হইবে। সেই মন্ত্র কয়েকটীই সৃষ্টি-বিষয়ক। অতি সুন্দররূপে সেই গুলিতে সৃষ্টিচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

"আপোহ যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"১০।১২১।৭

"যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং
দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।

যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥”১০।১২১।৮

‘ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?’

‘যখন জলগণ বলধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সেই জলের উপর সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?’

“তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽ
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তেকং ॥”১০।১২৯।১
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি-
মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥”১০।১২৯।৪

‘সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।’

‘সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।’

এস্থলে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিবর্ণনায় জল ও অগ্নির এত অধিক সন্নিকট ভাব প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই দুইটীকে নিত্যসাপেক্ষ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাই সৃষ্টির মূলোপাদান স্থলে উভয়কেই ধরিয়া ‘তেজোযুক্ত বাষ্প’ সৃষ্টির আদি, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সৃষ্টির আদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ‘Heated mass of Vapour’ (উত্তপ্ত বাষ্পরাশির) মতের সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

উপরি-উদ্ধৃত তৃতীয় ঋক্‌টীর সহিত বাইবেল-উক্ত সৃষ্টি-বিবরণ তুলনা করিলে উভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—

“And darkness was on the face of the deep, and the spirit of God was moving (or brooding) on the face of the water.”—Genesis, I., 2.

“জলরাশির উপরিভাগে অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং পরমাত্মা এই অর্ণবরাশির উপরে বিচরণ করিতেছিলেন।”

এই তুলনা দ্বারা বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বই যে পূর্ণ মৌলিক তাহা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েকটী ঋকের সহিত আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য একটী অতি প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র মিলাইয়া বুঝিলে, সৃষ্টিরহস্যের সুপ্রণালীবদ্ধ দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত একটী সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উল্লিখিত মন্ত্রটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—“ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম্ বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চনঃ।”

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রার্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"

'হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী, অতএব আমাদিগের ইহকালে সুখ ও অন্ন বিধান কর; এবং পরকালে (চিত্তশুদ্ধি দ্বারা) আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও। হে জল! তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ন্যায় ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী স্বীয় রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে লাভ করি।'

'মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ একমাত্র পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, তৎকালে কেবল রাত্রি ছিল অর্থাৎ জগৎ অন্ধকারময় ছিল। পরে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূল-স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়, সেই প্রলয়পয়োধিজল হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন, তিনি দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনীপ্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন, তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি স্বর্লোকাদি কল্পিত হইতে লাগিল।'

এখানে বিশ্বোৎপত্তি ও তৎকালীন অবস্থা অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, তখন একমাত্র পরব্রহ্মের সত্বাই বিরাজিত ছিল, কিন্তু তাহা জড়সত্বা নহে, চৈতন্যময় সত্বা। চিন্তাতেই (তপস্যাতে) আবার এই চৈতন্যের বিকাশ (কার্য্য) হইতেছিল—তখন অন্ধকার ব্যাপ্ত থাকিয়া রাত্রির মত দেখাইতেছিল। সৃষ্টির ইচ্ছা হইতে প্রথম ঋত (নিয়ম=laws) ও সত্ব (সত্য, নিত্যোপাদান Substance) উদ্ভূত হইল। এই নিত্যোপাদানের প্রথম পরিণামেই বাষ্পময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে কাল প্রবর্ত্তিত হইল। এক্ষণে পর-ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্ভূত শক্তি আবির্ভূত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্ট করিয়া কালের অহোরাত্র বিভাগ এবং আকাশ, পৃথিবী, শূন্য ও স্বর্গাদিলোক রচিত করিলেন। এই শক্তিই ধাতা (বিধাতা অর্থাৎ স্রষ্টা) নামে অভিহিত হইয়াছেন। চিদ্রূপী পর-ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে সৃষ্টি প্রসূত হয়, সৃষ্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উপাদান এই ইচ্ছারই ফল। এই দুইটীকে অবলম্বন করিয়া বিধাতাকর্তৃক সৃষ্টকার্য্য পরিনিষ্পন্ন হয়। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় পর-ব্রহ্মের নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ভাব সংরক্ষিত করিয়া কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে সৃষ্টিবৈচিত্র্য-ব্যাখ্যার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে! এইরূপে সৃষ্টিব্যাখ্যার মূলপত্তন বেদেই হইয়াছে এবং বাষ্পভূত জলই সৃষ্টির মূলপদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রটীকে মার্জ্জনমন্ত্র বলে। দৈনিক সন্ধ্যার সময় এই মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ মাথায় জলসেক করিয়া নিজেকে মার্জ্জিত (পরিষ্কৃত) অর্থাৎ পবিত্র করিতে হয়। দৈনিক ত্রিসন্ধ্যাতে তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিবার

যে ব্যবস্থা শাস্ত্রে করা হইয়াছে, তাহাতে মন্ত্রের মাহাত্ম্য যেমন বর্দ্ধিত হয় উপাসনার গাম্ভীর্য্যও তেমনি হৃদয়ঙ্গম হয় এবং উপাসকের আত্মাও পরমাত্মাভিমুখী হইবার প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

শ্রুতির পর স্মৃতিসংহিতার আলোচনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা পাওয়া যায়। প্রধান স্মৃতি-সংহিতাকার মনু বেদেরই অনুবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন "অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥" প্রথমে জল (বাষ্প) সৃষ্ট করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চালিত করিলেন অর্থাৎ প্রথমসৃষ্ট বাষ্পে সমস্ত সৃষ্টির বীজ নিহিত করিলেন।

পুরাণের মধ্যেও এই তত্ত্বেরই অনুপ্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টি-ব্যাখায় যে "কারণ-জলের" উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত বৈদিক তত্ত্বেরই সম্পূর্ণ অনুগত, অথচ অতি স্পষ্টভাবে সৃষ্টিসম্বন্ধে জলের কারণত্বনির্দ্দেশক। পুরাণে "প্রলয়-পয়োধির" যে উল্লেখ আছে, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের লয়াবস্থার সহিত জলের সম্বন্ধ অতিশয় পরিষ্কাররূপে প্রকটিত হইয়াছে—বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ সেই বাষ্পসমুদ্রেই নিমজ্জিত হইবে। তাহা হইলে বাষ্পাবস্থা হইতেই সৃষ্টির পুনঃ প্রবর্ত্তন হইতে থাকিবে। এইরূপে যেখানে বিশ্বের অন্ত, সেইখানেই আবার বিশ্বের আরম্ভ, কারণে কার্য্যের উপসংহারে বিশ্বের লয়, কারণ হইতে কার্য্যের প্রসৃতিতে বিশ্বের উৎপত্তি। ইহাতেই সৃষ্টি-প্রবাহের অনন্ত আবর্ত্তন চলিতেছে। আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বাষ্প হইতে যেমন সৃষ্টির আরম্ভ প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনই তাহাতে সৃষ্টির শেষও প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের 'নারায়ণ' ও 'কেশব' নামেও এই তত্ত্বেরই ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে। 'নারা' ও 'ক' উভয় শব্দেই জল বুঝায়। ভগবান্ প্রলয়পয়োধিজলে যে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছে।

অতএব বাষ্পতেই যে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য-কারণের সম্মিলনক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত ও আর্য্যমনীষিগণের অন্তস্তল দর্শনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অভ্যাস যোগ। *

(সমালোচনা)

ভারতবর্ষের মুক্তি কোন্ পথে এ সম্বন্ধে এখনো দেশে মতভেদ থাকিলেও, ভারত-বর্ষের প্রকৃত উন্নতি যে তাহার চিরন্তন সাধনার পথ ধরিয়াই সম্ভব, এ সম্বন্ধে দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও মনীষীবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই আর সন্দেহ নাই।

সুতরাং এ সময়ে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সুযুক্তি ও দৃঢ়তার সহিত হিন্দুর চিত্তে হিন্দু আদর্শ ও সাধনার একটা

* শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

উজ্জ্বল আদর্শ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া যে হিন্দুসাধারণের কৃতজ্ঞতা-লাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থ ভূপেন্দ্রনাথের "ধর্ম্মপ্রচার-গ্রন্থাবলীর" তৃতীয় গ্রন্থ। তিনি ইতিপূর্ব্বে "দিনচর্য্যা'য় হিন্দুর দৈনিক জীবনযাপন প্রণালীর এবং "আশ্রমচতুষ্টয়ে" হিন্দুর আশ্রমধর্ম্মের বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি হিন্দুর ঐকান্তিক সাধনার পরিচয় দিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বলেন "হিন্দুশাস্ত্রমতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণু ভগবানের অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন স্থান কোথাও নাই যেখানে তাঁহার অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের মধ্যেও তাঁহার এই পূর্ণশক্তি বিরাজিত, কিন্তু মোহের প্রভাবে, অজ্ঞানের প্রভাবে, কদভ্যাসের প্রভাবে, এই বিপুল শক্তি জড়ীভূত, ক্ষীণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মৃদু, বীজনিহিত বৃক্ষশক্তির ন্যায় সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, অদৃশ্য। উপযুক্ত সাধন দ্বারা যদি এই শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে।" হিন্দু এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়াই ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা এমন অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথের মতে আমাদের বর্ত্তমান দেশব্যাপী দুরবস্থার সর্ব্বপ্রধান কারণ—"অন্ধ, ভ্রান্ত, অবসাদকর অদৃষ্টবাদ।" যেদিন হইতে জড়ভাবাপন্ন ভারতবাসী কর্ম্মের শক্তির প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার দুরবস্থার আরম্ভ।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ভূপেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, আমরা যে দৈবের উপর অন্ধ নির্ভরের ভাব দেখাই তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। "যোগবাশিষ্ঠে"র মুমুক্ষু প্রকরণে পরম প্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ দেব ত্রিলোকপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন "দৈবই বল প্রদান করে, ইহা মূঢ়ের কল্পনা। কেননা পুরুষকার ভিন্ন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। * * দুর্ব্বল ও বলবানে যুদ্ধ ঘটিলে যেরূপ দুর্ব্বলের পরাজয় হয়, দৈব ও পৌরুষ এই উভয়ের মধ্যে তেমনি দৈবেরই পরাজয় হইয়া থাকে।" সুতরাং বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় কর্ম্মের সাধনা।

কিন্তু কর্ম্মের সাধনা করিবার পূর্ব্বে কর্ম্ম কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। সুতরাং গ্রন্থকার "অভ্যাসযোগ ও কর্ম্মযোগ" নামক অধ্যায়ে বহুল শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তি সহকারে কর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

একদিন মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ধর্ম্মতত্ত্বে" তাঁহার স্বদেশবাসীকে কর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "সকল বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্যের" সাধনাই কর্ম্ম। ভূপেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রমতে ভগবৎলাভের সাধনা এবং ভগবৎ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই—প্রকৃত কর্ম্ম।

কারণ "যিনি সকল শক্তির মূল, সকল জ্ঞানের আধার, সকল আনন্দের অমৃত-নিকেতন, তাঁহাকে লাভ করিলে সকল বৃত্তি আপনিই যথাযথ বিকশিত হইয়া উঠে,

কুপ্রবৃত্তি আপনি সঙ্কুচিত হয়, সুপ্রবৃত্তি আপনি অনন্ত বিকাশলাভ করে ;—

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোঽপি শাখাঃ।"

কর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অভ্যাস ও সাধনা দ্বারা কিরূপে চিত্তশুদ্ধি ও প্রকৃত উন্নতিলাভ ঘটিতে পারে, বহু সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রবান ব্যক্তির চরিত্র হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ আবদ্ধ, মোহমুগ্ধ, দুর্ব্বল—আবার অভ্যাসই তাহাকে সবল, জ্ঞানী ও বিমুক্ত করিতে সমর্থ। কদভ্যাসের ফলেই আমাদের এই অধোগতি আবার সদভ্যাসই (কর্ম্ম বা চেষ্টা) আমাদের সমুন্নত করিবে। অভ্যাস অপেক্ষা বলবত্তর আর কিছুই নাই। ভূমিকাতেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন "এই তমসাচ্ছন্ন অবসাদবিজড়িত কর্ম্মবিমুখ দেশে কর্ম্মের শক্তির এবং অভ্যাসের ক্ষমতার কথা বজ্র কণ্ঠে শুনাইবার দিন আসিয়াছে। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মকে অতিক্রম করা যায়, সদভ্যাসের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়, আলস্যপরায়ণ, মোহাভিভূত ভারতবাসীকে এ কথা না বুঝাইতে পারিলে আর তাঁহার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

"আমার ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষুদ্র শক্তি, আমি যতটুকু পারিলাম আমার স্বদেশবাসীকে এই অভয় বাণী শুনাইবার চেষ্টা করিলাম।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি গ্রন্থকারের সাধু ইচ্ছা সফল হউক।

গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, আবেগময়ী এবং গ্রন্থখানি নানা বহুমূল্য উপদেশ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

ছাপা, কাগজ ও আলোচ্য বিষয়ের তুলনায় পুস্তকের মূল্য অতি যৎসামান্য।

আশা করি, প্রত্যেক হিন্দু এই মূল্যবান গ্রন্থের এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া হিন্দুর ভগবৎ প্রীতি, জ্ঞান ও সাধনার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবেন।

শ্রী :—

আত্মপ্রকাশ

এ বক্ষে গুঞ্জরি উঠে যত ছন্দ সুর,
কিছু মোর নয়, শুধু পরশ তোমার
মোর তন্ত্রীরাজি মাঝে ফিরি বার বার
রণিয়া রণিয়া উঠে সঙ্গীত মধুর।
উপল আঘাতে যথা ফেনিল উচ্ছ্বাসে
আকুল প্রবাহ ভরা নির্ঝরের গান
কল্লোলে কাঁপিয়া উঠে, অধীর উল্লাসে।
অথবা সমীরস্পর্শে মৃদু কম্পমান্
তরুর মর্ম্মর তান পাতায় পাতায়,
অপূর্ব্ব পুলকে যথা উঠে শিহরিয়া
মৃদুল মঞ্জুলগুঞ্জে। বাজালে আমায়
বাঁশরীর মত, দিলে বক্ষে ফুকারিয়া
মোর প্রাণবায়ু তব সুরভিনিশ্বাস,
ছন্দে গীতে আপনারে করিলে প্রকাশ।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

মুদ্রা-মন্বন্তর

কোম্পানী বাহাদুর কিন্তু সময়ে সময়ে নিজের প্রবর্তিত নোটে নিজ প্রাপ্য বুঝিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইতেন। তখন চাহিতেন টাকা! * ইহাতেই নোটের উপর দেশের লোকের আস্থা ক্রমেই কমিতে লাগিল। মুদ্রার অভাবে বাঙ্গালার লোক ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া দস্যুতা করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং কোম্পানী বাহাদুর রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। ধনবান গৃহস্থগণ লাঠিয়াল রাখিল। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা পাঠাইতে হইলে কখনো কখনো সৈন্য-সামন্ত পর্য্যন্ত আবশ্যক হইতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর দেখিলেন একশত টাকা প্রেরণ করিতে শুধু রক্ষীর জন্যই পাঁচ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল! তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন।

দেশে যে মুদ্রা ছিল তাহা বহু পুরাতন। লোকে উহার সহিত যদৃচ্ছা খাইদ মিশাইল,—রূপা কাটিয়া লইল এবং নানাবিধ উপায়ে প্রচলিত মুদ্রার অঙ্গহানি করিয়া উহা বাজারে চালাইতে লাগিল। সুতরাং হাতে পাইলেই লোকে শুদ্ধ মুদ্রার আনুমানিক মূল্য ধরিয়া প্রচলিত মুদ্রার মূল্য নিরূপণ করিতে লাগিল। সরকারী খাজনাখানার কর্ত্তাগণ এই সুযোগে জমীদারদিগের নিকট হইতে বেশ অধিক মাত্রায় বাটা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। যে মুদ্রার বয়স এক বৎসর মাত্র হইয়াছিল তাহার বাটা শতকরা তিন টাকা ধরা হইল—যাহার বয়স দুই বৎসর তাহার বাটা লাগিত শতকরা পাঁচ টাকা! সেই সকল মুদ্রা প্রকৃতই অশুদ্ধ কি না সে বিষয়ে কেহ অনুসন্ধান করিত না!

জমীদারগণ এই ক্ষতি বহন করিলেন না। সমস্ত টাকা গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া দরিদ্র প্রজার শিরে নিপতিত হইল! সরকারের সেরেস্তায় জমীদার যে পরিমাণ বাটা দিলেন দরিদ্র প্রজা জমীদারকে তাহার চতুর্গুণ দিতে বাধ্য হইল। তাহারা রোদন করিল—হায় হায় করিল—শেষে গৃহাদি বিক্রয় করিয়া জমীদারের প্রাপ্য পরিশোধ করিল!

সিক্কা হইতে আরম্ভ করিয়া তখন ৩২ প্রকারের টাকা, নানা মূল্যের মোহর প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। কোম্পানীর সেরেস্তায় কোথাও বা 'কড়ি' চলিত, কোথাও বা চলিত না—কোন কালেক্টর স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিতেন, কেহ বা করিতেন না। কেহ বা তখন স্থির করিতেই পারিয়াছিলেন না যে কোন্ মুদ্রা গ্রহণ করিবেন! নিরক্ষর বঙ্গীয় কৃষক অত কথা বুঝিল না। বাঙ্গালার বাজারে তাহারা এতকাল ধরিয়া যে সকল মুদ্রা দেখিয়া আসিতেছিল, তাহার যে কোনো একটী লইয়াই তাহারা অবাধে গোলার ধান্য বা চাউল বিক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে যখন রাজস্ব

* Letter from the Collector to the Board of Rev., April 1789.

দিবার জন্য সেই সঞ্চিত অর্থ লইয়া কোম্পানীর দ্বারে বা জমীদারের নিকট উপস্থিত হইল তখন শুনিল "এ টাকা চলিবে না!" তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।

মুদ্রা সম্বন্ধে এত সতর্ক হইয়াও কোম্পানী বাহাদুর দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অর্থাগারে অনেক অশুদ্ধ টাকা জমিয়া গিয়াছে! তাঁহারা মনে করিলেন ইহা কেবল দুষ্ট লোকের বাটা-লাভের প্রত্যাশাতেই ঘটিতেছে। কোম্পানী বাহাদুর অবিলম্বে নানাবিধ বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। দুঃখ গেল না।

সুবর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য স্থির ছিল না। যখন যেরূপ ইচ্ছা কোম্পানী বাহাদুর তখন তাহাই সোণা-রূপার বাজার দর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার দুঃখ তাহাতেও ঘুচিল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলিকাতা গেজেটে তখন একটা নাতিদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। * সে মন্তব্যের মানে এই যে সুবর্ণ মোহর বিক্রয় করিতে এখনো এত অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহাতে দরিদ্রের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। বর্দ্ধমান হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য কলিকাতায় আসিয়াছে। তবুও যে মুদ্রা-বিভ্রাট বৃদ্ধিই পাইতেছে ইহা দেখিয়া মনে হয় এ কেবল ধনশালী অর্থগৃধ্নুদিগের ষড়যন্ত্র মাত্র! আর কিছু কাল এ ভাবে চলিলে দুষ্কৃতকারী-দিগকে বিশেষ দণ্ডিত হইতে হইবে! কিছু দিন পর গেজেটে আবার দেখা গেল—দেশের এই দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যদি কোনো উপায় নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে কুসীদজীবীদিগের চরণতলে আত্মবলি দিতে হইবে—দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!

কোম্পানী বাহাদুর স্থির করিলেন মুদ্রা-বিভ্রাট বিদূরিত করিতে হইলে সমুদয় পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্থির মূল্যের নূতন টাকা প্রচলিত করাই একমাত্র উপায়। তাঁহারা অবিলম্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, যে উপায়টীকে তাঁহারা নিতান্ত সহজ ও সরল মনে করিয়াছিলেন তাহা একান্ত জটিল ও কঠিন। লোকে পুরাতন টাকা বহিয়া আনিয়া কোম্পানী বাহাদুরকে দিয়া প্রতি টাকার পাঁচভাগের তিনভাগ মাত্র লইয়া গৃহে ফিরিতে চাহিল না! কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর ছাড়িলেন না—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এ দিকে যতই সময় যাইতে লাগিল ততই দেশে যাহা কিছু সামান্য মুদ্রা ছিল তাহাও নিঃশেষিত হইল। অর্থের অভাবে বাণিজ্য পূর্ব্বেই অল্লাধিক সঙ্কুচিত হইয়া-ছিল, এখন অচল হইয়া উঠিল! প্রবীণ বণিকগণ মুদ্রার অভাবে পণ্য ক্রয় করিতে পারিলেন না! তখন কেহই ধারে পণ্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল না। সকলেই বুঝিয়াছিল, একবার ধারে বিক্রয় করিলে আর মূল্য পাওয়া যাইবে না। দেশে মুদ্রা নাই—লোকে মূল্য দিবে কিসে? কোম্পানী বাহাদুর তখন স্বর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করিতে

* Calcutta Gazette—1788.

লাগিলেন। বাঙ্গালার বাজারে তখন যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহারই হিসাবে সুবর্ণ-মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল।

কোম্পানীর স্বর্ণ ছিল না; তাঁহারা কাঞ্চনের জন্য কাঙ্গালের মুখাপেক্ষী হইলেন! বঙ্গবাসিগণ দেখিল যে, কোম্পানীর মোহর বাজারের রৌপ্যমুদ্রার হিসাবে যে মূল্যে বিক্রীত হওয়া উচিত ছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৭৷৷০ টাকা অধিক মূল্যে চলিতেছে। বঙ্গবাসী দলে দলে সেই কাঞ্চন-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। যাহার যে টুকু সোনা ছিল সে তাহাই লইয়া কোম্পানী বাহাদুরের টঙ্কশালার সিংহদ্বারে হত্যা দিয়া পড়িল! কেহ কেহ হয় ত দুহিতা-বনিতার অঙ্গাভরণ পর্য্যন্তও গলাইতে ক্রুটী করিয়াছিল না! কোম্পানী বাহাদুর বহুতর সুবর্ণমুদ্রা প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু দেশের দুর্দ্দশা গেল না

আবার বিচার ও বিতর্ক উপস্থিত হইল। অনেক চিন্তার পর কোম্পানী বাহাদুর বুঝিলেন যে, তাঁহারা সুবর্ণের আদর যতই বৃদ্ধি করিয়াছেন, হতাদরে রৌপ্য ততই ম্রিয়মান ও মূল্যহীন হইয়াছে! তখন স্বর্ণমুদ্রায় নিজেদের অংশ প্রদান করিয়া লোকে শতকরা ১৭৷৷০ টাকা অধিক লাভ করিতেছিল বটে, কিন্তু যাহাদিগের উহা ছিল না তাহারা রৌপ্যমুদ্রায় আপন দেয় পরিশোধ করিয়া তুল্যরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। সর্ব্বদা সুবর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে এ দেশে এমন লোকের সংখ্যা এখনো যেমন অল্প তখনো তেমনিই ছিল। কাজেই দুঃখ যাহার চিরসঙ্গী তাহার দুঃখ রহিয়াই গেল। কৃষকগণ দেখিল তাহাদিগের ক্ষেত্রপূর্ণ ধান্য আছে। জমীদার জমাও বৃদ্ধি করেন নাই, অথচ রাজস্ব দিতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে! তাহারা ইহার কারণ বুঝিল না বটে, কিন্তু রোদন করিতে লাগিল—ক্ষুধায় মরিতে লাগিল। আগে ধান্য বিক্রয় করিয়া রাজস্ব পরিশোধ করিয়াও তাহারা কিছু সঞ্চয় করিত। সেই সঞ্চিত অর্থে তেল-নুন-লকড়ি জুটিত, খোকার মার বাউটী পৈঁছা হইত, খোকার পায়ে খাড়ুয়া উঠিত। কিন্তু এখন রাজস্ব দিতেই সব ফুরাইতে লাগিল—কখনো বা কুলাইলও না! মাঠের ধান্য ফুরাইল, গোশালার গরু ফুরাইল। কেবল ফুরাইল না ক্ষুধা, আর ফুরাইল না তপ্ত আঁখি জল।

কোম্পানী বাহাদুর কাঞ্চনমুদ্রা প্রসব করিয়াও বাঙ্গালার বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কলিকাতার বণিকসম্প্রদায় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কবে বা মুদ্রার অভাবে ষোল বাতি জ্বালিয়া নিশাযোগে পলায়ন করিতে হয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ যাহারা মূলধন ধার করিয়া ব্যবসায় চালাইত এবং পণ্য বিক্রয় হইলেই মহাজনের পূর্ব্ব দেনা শোধ করিয়া নূতন ঋণ গ্রহণ করিত, তাহারা দলে দলে কারাগারে যাইতে লাগিল—মহাজনের দেনা শোধ দিতে পারিল না। যাহারা কোটী টাকার পণ্যে মালগুদাম পূর্ণ করিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ বণিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন মুদ্রার অভাবে তাঁহারা পর্য্যন্ত দৈনন্দিন আবশ্যক দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন!

এই মুদ্রা-মন্বন্তর যে তখন কেবল

কলিকাতাতেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত উহা সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ বলিতে লাগিলেন যে যাহাদিগের রৌপ্যমুদ্রা আছে তাহারা যদি কোম্পানীর নিরূপিত মূল্যে সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে উহা না দেয় তাহা হইলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হউক। আরমেনিয়ানগণ কহিলেন দেশে যেখানে যতটুকু সুবর্ণ আছে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা হউক —তাহা হইলেও ত দেশে মুদ্রা থাকিবে!

কোম্পানী বাহাদুর যে কি করিবেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পুনরায় সুবর্ণমুদ্রাই প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এবার রৌপ্যমুদ্রার তুলনায় সুবর্ণমুদ্রার মূল্য শতকরা ৫৸০ টাকা হইল। যাহাদিগের নিকট সুবর্ণ ছিল এবারও তাহারা তাহা কোম্পানী বাহাদুরকে দিয়া মোহর লইল। কলিকাতার কৌন্সিল মনে করিলেন, এতদিনে ঠিক হইয়াছে— ঔষধ জানা গিয়াছে। এইবার ব্যাধি সারিবে। ব্যাধি সারিল না!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মানবের জন্মকথা

জন্তুগণের ব্যক্তিত্ববোধ আছে, ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বকথিত কুকুরের মনে আমার কণ্ঠস্বর যখন কতকগুলি ভাবের উদয় করিয়া দিয়াছিল, তখন তাহার মনোমধ্যে ব্যক্তিত্বের বোধ অবশ্যই সঞ্চিত ছিল; কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসর কালে * তাহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণুই একাধিক বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! বিবর্ত্তনবাদিগণকে চূর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি একজন † যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন ঐ কুকুরও সেইরূপ তর্ক করিয়া বলিতে পারিত— "সর্ব্বপ্রকার মানসিক অবস্থা এবং পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আমি যে-ছিলাম সেই আছি। এক পরমাণু যায়, অপর পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করে, কিন্তু যে যায় সে যাইবার সময় তাহার স্থলবর্ত্তী স্বীয় ভাব সকল দিয়া যায়, এই মত অহং-জ্ঞানের বিপরীত, অহংবোধের অপরিজ্ঞাত, সুতরাং মিথ্যা; কিন্তু এ মত বিবর্ত্তনবাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, সুতরাং বিবর্ত্তনবাদ মিথ্যা।"

ভাষা। এই বৃত্তি সঙ্গীতরূপেই মানবের এবং ইতর জন্তুগণের মধ্যে এক প্রধান প্রভেদ বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আর্কবিসপ হোএট্‌লি একজন অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি বলেন "কেবল যে মানুষই মনের ভাব ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে অথবা অন্যের মনের ভাব ভাষা দ্বারা অল্পাধিক বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে।" প্যারাগোয়ে দেশের সিবাস্ একারি নামক বানরগণ উত্তেজিত হইলে ছয় প্রকার শব্দ

* ডারউইন পাঁচ বৎসর কাল এই কুকুরের সহিত দেখা করেন নাই।

† ডাক্তার জে, ক্যাক্‌ক্যান্।

উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া অন্য বানরও অনুরূপ ভাবে উত্তেজিত হয়। আমরা বানরের মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী বুঝি, এবং তাহারাও আমাদিগের ঐ সকল বুঝে, ইহা রেঙ্গার এবং অন্যান্যে বলিয়াছেন। কুকুর গৃহপালিত হইবার পর চারি পাঁচ প্রকার বিভিন্ন স্বরে ডাকিতে শিখিয়াছে, ইহা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। যদিও এই ডাক অভিনব তথাপি কুকুরের আরণ্য পূর্ব্ব-পুরুষগণও বিবিধ ধ্বনি করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিত। গৃহপালিত কুকুর একাগ্র মন হইলে এক প্রকার ডাকে, যেমন শিকার কালে; ক্রোধে অন্য প্রকার ডাকে; ঘেউ ঘেউ আর এক প্রকার; হুতাশের প্লুত স্বর ও চিৎকার, যেমন অবরুদ্ধ হইলে ডাকে, উহা ভিন্নরূপ; রাত্রিকালের ডাক; আহ্লাদের ডাক, যেমন প্রভুর সহিত বেড়াইতে যাইবার সময় ডাকে; এবং কোন জানালা কিম্বা দ্বার খুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে কুকুরগণ আদেশ অথবা অনুনয়সূচক স্বরে স্পষ্টরূপে ডাকে, সে অন্য প্রকার। হোঝো কণ্ঠস্বরের বিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন; তিনি বলেন গৃহপালিত পক্ষী ন্যূনকল্পে দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন ধ্বনি করে।

যাহা হউক স্পষ্টভাবে উচ্চারিত (বর্ণাত্মক) ভাষা নিয়ত ব্যবহার করা মানবের বিশেষত্ব; অঙ্গভঙ্গী ও মুখমণ্ডলের পেশী সঞ্চালনসহ অব্যক্ত ধ্বনি করতঃ অর্থ-প্রকাশ, মানুষেও করে, ইতর জন্তুতেও করে। সরল এবং স্পষ্টানুভূত ভাব সকল সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে সত্য, ও সকলের সহিত উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সংস্রব কম। শারীরিক ক্লেশ, ভয়, আশ্চর্য্য, ক্রোধ ও তত্তৎ ভাবমূলক কর্ম্ম; এবং স্নেহময় প্রিয় পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া মাতা যে সকল নিরর্থক ধ্বনি উচ্চারণ করেন তাহা, অর্থপূর্ণ শব্দ অপেক্ষাও অধিকতর সার্থক। বর্ণাত্মক শব্দ বুঝিতে পারা সম্বন্ধে মানুষে এবং ইতর জন্তুতে অলঙ্ঘ্য প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই জানেন কুকুরগণ ঐরূপ অনেক শব্দ ও পদ বুঝিতে পারে। উহারা এই বিষয়ে যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দশ বার মাস বয়সের শিশুদিগের ন্যায়; কারণ ঐ শিশুগণও অনেক শব্দ ও পদ বুঝিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারে না। কেবলমাত্র উচ্চারণও আমাদিগের অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব নহে, কারণ টিয়া এবং অন্যান্য [কোন কোন] পক্ষীও উচ্চারণক্ষম। নির্দ্দিষ্ট স্বরের সহিত নির্দ্দিষ্ট ভাব সংযুক্ত করিবার ক্ষমতাও আমাদিগের ঐরূপ বিশেষত্ব নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে কোন কোন টিয়া পাখী যাহাদিগকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহারা অভ্রান্ত-রূপে শব্দের সহিত বস্তুর এবং ঘটনার সহিত ব্যক্তির সংযোগ করিতে সমর্থ হয়। মানুষে এবং ইতরজন্তুতে একমাত্র প্রভেদ এই যে, সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ধ্বনি ও ভাব একত্র সংযোগ করিবার শক্তি উহাদিগের অপেক্ষা মানুষের অধিক; কিন্তু ইহা তাহার মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নত বিকাশের উপর স্পষ্টই নির্ভর করিতেছে।

ভাষাতত্ত্বশাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হর্ণটুক্ বলিয়াছেন সুরা প্রস্তুত অথবা রুটি

প্রস্তুত করার ন্যায় ভাষাও একটী শিল্প; কিন্তু ভাষা না বলিয়া লেখা বলিলেই উদাহরণটী আরও ভাল হইত। ভাষা প্রকৃতপক্ষে সহজাত বৃত্তি নহে, কারণ প্রত্যেক ভাষাই শিক্ষা করিতে হয়। উহা প্রচলিত শিল্পগুলি হইতে অনেক বিভিন্ন, কারণ মনুষ্যের কথা বলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তাহা শিশুদিগের অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ হইতেই বুঝা যায়; কিন্তু কোন শিশুরই সুরা অথবা রুটি প্রস্তুত করিবার কিম্বা লিখিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই। কোন ভাষাবিৎই এখন বিবেচনা করেন না যে ভাষা মানুষে গড়িয়াছে; উহা ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে [আমাদিগের] অজ্ঞাতসারে গঠিত অথবা বিকশিত হইয়াছে। সকল প্রকার ধ্বনি অপেক্ষা পক্ষীর ধ্বনি অনেকাংশে ভাষার সহিত অধিক তুলনীয়। কারণ, একজাতীয় সমস্ত পক্ষীই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত একই প্রকার স্বাভাবিক ধ্বনি করে; এবং যে সকল পক্ষী গান করে তাহারা স্বভাবতঃই ঐ শক্তিপরিচালনার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু উহার স্বজাতীয় প্রকৃত গান কিম্বা পরস্পরকে ডাকিবার স্বর পিতামাতার অথবা পালকের নিকট শিক্ষা করে। "এই ধ্বনিগুলি যেমন সহজাত নহে, তদ্রূপ মানবীয় ভাষাও সহজাত নহে." এ কথা ডেনস্ ব্যারিংটন প্রমাণ করিয়াছেন। "উহাদিগের গান করিবার প্রথম চেষ্টার সহিত মানব-শিশুর প্রথম অস্ফুট কথা কহিবার চেষ্টার তুলনা করা যায়।" অল্প-বয়স্ক পুং-পক্ষীগুলি দশ এগার মাস পর্য্যন্ত গানের চেষ্টা করে; পাখীধরারা তাহাকে "আলাপ" করা * বলে। ঐ পক্ষীগুলির প্রথম চেষ্টা শুনিলে গানের একটু আভাসও পাওয়া যায় না, পরে উহাদিগের যতই বয়স বাড়ে ততই বুঝা যায় যে গানের চেষ্টা করিতেছে, অবশেষে উহাদিগের স্বজাতীয় গানের সুর স্পষ্ট হইয়া উঠে। একজাতীয় পাখীর ছানাগুলি অন্যজাতীয় পক্ষীর গান শিক্ষা করিলে নিজের ছানাগুলিকেও ঐ নূতন সুর শিক্ষা দেয়, তাহাতেই উহা বংশানুগত হইয়া যায়; কতিপয় কেনারী পক্ষীর এইরূপ হইয়াছিল। ব্যারিংটন্ বলেন, একজাতীয় পক্ষীর গানেই যে বিভিন্ন প্রদেশে কিছু-কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় তাহা মানবীয় ভাষার প্রদেশগত পার্থক্যের সহিত ঠিক্ তুলনীয়। আর, বিভিন্নজাতীয় অথচ সমশ্রেণীর † পক্ষিগণের যে পার্থক্য আছে তাহা বিভিন্নবর্গীয় ‡ মানবের ভাষা-প্রভেদের সহিত তুলনীয়। কোন একটা শিল্পকৌশল প্রাপ্ত হইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কেবল যে মানুষেরই আছে তাহা নহে, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত উদাহরণগুলি প্রদর্শন করিলাম।

একদিকে মিঃ হেন্স্লে ওয়েজউড, রেভেরেণ্ড ফ্যারার এবং অধ্যাপক শ্লিকারের উত্তম কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ

* Recording.

† আমাদিগের পরিভাষা অনুসারে "বিভিন্ন প্রকার অথচ সমজাতীয়" লেখা উচিত ছিল, কারণ মানবের বিভিন্ন' Raceকে বিভিন্ন জাতীয় বলা যায় না, কিন্তু ডারুইন্ মূলে কেবল speciesশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ বর্গ = Race.

সকল, অপরদিকে অধ্যাপক ম্যাক্স মুলারের বিখ্যাত লেক্চারগুলি পাঠ করিয়া স্পষ্ট উচ্চারিত (বর্ণাত্মক) ভাষার মূল সম্বন্ধে আমার বিবেচনা হয় যে নানাবিধ প্রাকৃতিক ধ্বনির ও অপরাপর জন্তুগণের ধ্বনির এবং মানবের সহজাত ধ্বনির অনুকরণে ও পরিবর্ত্তনে, ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীর সহায়তায় ভাষা গঠিত হইয়াছে। * ইহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। "দাম্পত্য নির্ব্বাচন" আলোচনা করা কালে আমরা দেখিব যে প্রাথমিক মানব অথবা মানবের আদিম পূর্ব্বপুরুষ সম্ভবতঃ সঙ্গীতের স্বর উৎপাদন করিতে গিয়াই প্রথমে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিয়াছিল; এখনও কতিপয় জিবন্ বানর যেমন করিয়া থাকে, তেমনই গান করিতেই প্রথমে কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের বহু স্থলের দৃষ্টান্ত অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে স্ত্রীপুরুষের মিলন চেষ্টাতেই প্রথমে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং তদ্দারা প্রণয়, ঈর্ষা, বিজয়-গৌরব, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে যুদ্ধে আহ্বান করা প্রভৃতি নানাবিধ ভাব প্রকাশ করা হইত। সুতরাং সঙ্গীতের স্বর অনুকরণ করিয়াই বর্ণাত্মক শব্দ হইয়াছে ও তদ্দারা বিবিধ জটিল ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, ইহাই সম্ভব বোধ হয়। অনুকরণে সম্বন্ধে উল্লেখ যোগ্য কথা এই যে, আমাদিগের নিকট কুটুম্ব বানরগণ, আজন্মজড়ভাবাপন্ন অবোধগণ এবং অসভ্য মানবগণ যাহা শুনে তাহাই অনুকরণ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকে। মানুষ যাহা বলে বানর তাহার অনেক ভাগ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে; বন্য বানর বিপদকালে ইঙ্গিতসূচক ধ্বনি করিয়া অপর বানরকে বিপদের কথা জানাইয়া দেয়; পক্ষিগণ মাটীতে বাজের আক্রমণ আশঙ্কা করিলে একরূপ এবং আকাশে ঐ আশঙ্কা করিলে অন্যরূপ ধ্বনি করত অপর পক্ষীদিগকে বিপদবার্ত্তা জানাইয়া দেয়—(শুধু তাহাই নহে, আর এক তৃতীয় প্রকার ধ্বনিও উহারা করিয়া থাকে, তাহা কুকুরে বুঝে); এমত অবস্থায় ইহা কি সম্ভব নহে যে, কোন বুদ্ধিমান বানর-তুল্য প্রাণী * শিকারী হিংস্র জন্তু হইতে বিপদ্ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে তাহার ধ্বনি অনুকরণ করতঃ ঐরূপ অপরাপর প্রাণিগণকে বিপদের কারণ জানাইয়া দিত? যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে ইহাই ত ভাষা-গঠনের প্রথম সূত্রপাত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কণ্ঠস্বর যতই ব্যবহৃত হইতে লাগিল ততই শব্দ-উৎপাদক যন্ত্রগুলি পুষ্ট ও পূর্ণ গঠিত হইল। এই ফল বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছিল। † এই পুষ্টি ও পূর্ণতা বাক্ শক্তিকেও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের উন্নতির সহিত ভাষার উন্নতি যেরূপ ভাবে সংসৃষ্ট তাহাই অধিক গুরুতর কথা। ভাষার অতিশয় অনুন্নত অবস্থার

* মৎপ্রণীত "ভাষা ও আদিরস এবং পরবশতা" নামক গ্রন্থে ভাষার মূল আদিরস অর্থৎ কালভাব, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমস্ত জীব-রাজ্য পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বোধ হয়। অনুবাদক।

* অর্থাৎ মানবের আদি-পুরুষ।

† এক্ষণে ইহা স্বীকৃত হয় না।

পূর্ব্বেও বর্ত্তমান বানরগণের মনোবৃত্তি অপেক্ষা মানবের আদিম পূর্ব্বপুরুষের মনোবৃত্তি অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইহা নিশ্চিত বিশ্বাস করা যায় যে নিয়ত ভাষার ব্যবহার এবং বাক্‌শক্তির উন্নতি বশতঃ [মানবের] মনও উন্নত হইয়াছিল; কারণ ভাষার ব্যবহার হেতু দীর্ঘ বিচার বিতর্ক করিবার শক্তিও বাড়িয়াছিল। অঙ্ক অথবা বীজগণিত ব্যবহার ব্যতীত যেমন দীর্ঘ গণনা করা যায় না, তদ্রূপ উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত শব্দের সাহায্য ভিন্ন দীর্ঘ জটিল বিষয়ের চিন্তা করাও সম্ভব নহে। ইহাও বোধ হয় যে সামান্য বিষয়ের চিন্তা করিতেও কোন প্রকার ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, অথবা ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়, কারণ মূক, বধির এবং অন্ধ বালিকারা ব্রিজ-ম্যান স্বপ্নদর্শন কালে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিত। কিন্তু কুকুরের স্বপ্নদর্শন বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, কোন প্রকার ভাষা ব্যবহার ব্যতীতও স্পষ্ট, পরস্পর সংসৃষ্ট দীর্ঘ ভাবপরম্পরা মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ইতর জন্তুগণ কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই ভাষা ব্যবহার করে না। বর্ত্তমান কালে আমাদিগের মস্তিষ্কের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার সহিত বাক্‌শক্তির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে ইহা কোন কোন অদ্ভুত মস্তিষ্কপীড়ায় বাক্‌শক্তি বিশেষ আক্রান্ত হওয়া দেখিলেই উত্তমরূপ বুঝা যায়। ঐ সকল পীড়ায় কখন বিশেষ্য শব্দ স্মরণ হয় না, অথচ অন্য শব্দ শুদ্ধরূপে ব্যবহার করা যায়; কখন বা কোন শ্রেণীর কর্ত্তৃপদ, অথবা তাহার আদ্য অক্ষর কিংবা সংজ্ঞা শব্দ মনে পড়ে না। মনের যন্ত্র এবং শব্দ-যন্ত্র নিয়ত ব্যবহার করিলে ঐ সকল যন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া বংশানুক্রমে পরিবর্ত্তিত হওয়া যদি অসম্ভব হয়, তবে হস্তাক্ষর, যাহা হস্তের গঠন এবং মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাও বংশানুগত হওয়া সম্ভব, কিন্তু হস্তাক্ষর ত নিশ্চয়ই বংশানুগত।

অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার সম্প্রতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে ভাষা ব্যবহার করিতে সাধারণ জাতিবাচক ও গুণবাচক সংস্কার থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোন জন্তুরই এই সংস্কার না থাকা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, এই খানেই মানুষে এবং ইতর জন্তুতে অসংখ্য প্রভেদ। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইতর জন্তুগণের ঐ সংস্কার আছে; অনুন্নত এবং অস্ফুট হইলেও আছে। দশ এগার মাস বয়সের শিশুগণ মূক-বধিরগণ যত সত্বর কতিপয় শব্দের সহিত সাধারণ ভাব সংযোগ করিয়া থাকে,* তাহা কখনই সম্ভব হইত না, যদি উহাদিগের মনে পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ ভাব বিদ্যমান না থাকিত। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট জন্তুগণের সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে। মিঃ লেস্‌লি ষ্টিফেন বলেন "কুকুর, মেষের অথবা বিড়ালের একটা সাধারণ সংস্কার রাখে। এবং তাহার অনুরূপ শব্দও জানে;

* অর্থাৎ অর্থ বোধ করে।

একজন দার্শনিক যেমন জানেন কুকুরও তেমনই জানে। উহা জানিবার ও বুঝিবার শক্তি থাকিলে শব্দ-বোধ যেমন উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়, বাক্‌শক্তি থাকিলেও তেমনই প্রকাশিত হয়; তবে ঐ বোধের পরিমাণ ন্যূন হইতে পারে।

শ্রীশশধর রায়।

বেদের কথা

১

মনু ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতে যাইয়া, সর্ব্বাদৌ বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহা বেদবিহিত হওয়া চাই। এখন প্রশ্ন এই, বেদ বলিতে এখানে আমরা কি বুঝিব?

আর এ প্রশ্নের উত্তরটা আপাততঃ যত সহজ বলিয়া মনে হইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তত সহজও নহে। কারণ মনু এখানে সাধারণ মানব-ধর্ম্মের লক্ষণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোনও দেশবিশেষের বা সমাজবিশেষের বিশেষ ধর্ম্মের কথা বলেন নাই। মনু এখানে যে ধর্ম্মের কথা কহিয়াছেন, তাহা কেবল হিন্দুরই ধর্ম্ম নহে, তাহা সকলেরই ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম-বস্তু সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। সুতরাং এস্থলে বেদ বলিতেও একটা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক বস্তুকেই বুঝিতে হইবে। না হইলে ঋষিবাক্য মিথ্যা হইয়া যায়।

ফলতঃ একটু তলাইয়া দেখিলেই মনু ধর্ম্মের যে কয়টা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তার সকল গুলিরই মধ্যে একটা সার্ব্বজনীনতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ যেমন তাহা বেদবিহিত হওয়া চাই; সেইরূপ তার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, তাহা স্মৃতিসম্মত ও হওয়া আবশ্যক আর এই স্মৃতি-বস্তুও প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বভৌমিক। সকল সমাজেই স্মৃতি বলিয়া একটা বস্তু আছে। ইংরেজিতে এই স্মৃতিকে ট্র্যাডিষণ (tradition) বলে। এই ট্র্যাডিষণ বা স্মৃতি যেমন হিন্দুর ধর্ম্মে, সেইরূপ ইহুদির ধর্ম্মে, সেইরূপ খৃষ্টীয়ানের এবং মুসলমানের ধর্ম্মেও আছে। মনু, পরাশর, প্রভৃতি আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। লৌকিক আচার-বিচার, ক্রিয়াকর্ম্ম, পারিবারিক সংস্কারাদি, সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতি এ সকলই আমাদের এই সকল স্মৃতির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অন্যান্য সমাজে এবং অপরাপর ধর্ম্মেও আচার-বিচার, ক্রিয়াকর্ম্ম, পারিবারিক সংস্কার ও সামাজিক শাসন, এ সকলই স্মৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল আচারানুষ্ঠানাদি প্রত্যেক সমাজে লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই নাম স্মৃতি। তাহাই ট্র্যাডিষণ (tradition)। আর এই স্মৃতি বা ট্র্যাডিষণকে আশ্রয় করিয়াই, জগতের বিবিধ ধর্ম্মের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম সকল

জনমণ্ডলী মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমাদের বার মাসের তের পার্ব্বণ; ইহুদীর পাছোভার (Passover; খৃষ্টীয়ানের খৃষ্টমাস (Christmas) এবং ইষ্টার (Easter); মুসলমানের ইদ ও মহরম, এই সকলের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্রই স্মৃতির উপরে। এই সকল নিত্যনৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক সংস্কার, এই সকলের দ্বারাই সর্ব্বত্র ধর্ম্মের বহিরঙ্গগুলি রচিত হয়। এই সকল ধর্ম্মের দেহ-স্বরূপ। এই সকল ব্রতানুষ্ঠানাদিকে বর্জ্জন করিলে, ধর্ম্ম-বস্তু ক্রিয়াহীন হইয়া, বাহ্য আশ্রয়ের অভাবে, ক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে এবং পরিণামে তাহার ধর্ম্মত্ব অর্থাৎ লোকস্থিতিরক্ষার শক্তিসাধ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কোনও ধর্ম্মের তত্ত্ব যতই বিশুদ্ধ ও অন্তর্মুখীন হউক না কেন, তার ঈশ্বরতত্ত্ব যতই নির্গুণ ও নিরাকার হউক না কেন, এ সকল স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত ব্রতনিয়মাদি ব্যতীত তাহা কখনওই যথাযথভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে না; আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহের কথা। সুতরাং সর্ব্বত্রই যে ধর্ম্মের একটা স্মৃতিপ্রামাণ্যও আছে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। যুগে যুগে, জগতে যে সকল নূতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারাও এইজন্য প্রাচীন স্মৃতিকে বর্জ্জন করিয়াও, অল্পকাল মধ্যেই নিজেদের এক একটা স্মৃতি বা ট্র্যাডিষণ গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন, নতুবা নিজ নিজ মণ্ডলীর ঘননিবিষ্টতা-সাধন তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিত। আমাদের চক্ষের উপরেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ উভয়েই স্বল্পবিস্তর পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের পুরাতন স্মৃতির প্রামাণ্য মর্য্যাদা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। দয়ানন্দস্বামী তবুও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে মনু-স্মৃতিকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-আচার্য্যগণ তাহাও করেন নাই। কিন্তু এই অতি সামান্য কালের মধ্যেই আর্য্যসমাজে এবং ব্রাহ্ম-সমাজে, উভয় সম্প্রদায়েই একটা নূতন স্মৃতির বা ট্র্যাডিষণেরও (Tradition) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এক সময়ে যাঁরা সর্ব্ববিধ শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন পূর্ব্বক, শুদ্ধ স্বানুভূতিকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন; যাঁরা "সত্যকেই" একমাত্র শাস্ত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন এবং সকল বিষয়েই "ইহা সত্য অর্থাৎ স্বাভিমত-সম্মত এবং যুক্তিযুক্ত কি না?" এই প্রশ্ন তুলিয়াই তাহা গ্রহণযোগ্য না বর্জ্জনীয় ইহার বিচার করিতেন;—এখন তাঁহারাই "ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বা আর্য্যধর্ম্ম কি না?" এই প্রশ্ন তুলিয়া সরাসরি ভাবে সে সকল বিষয়ের সর্ব্বপ্রকারের দাবীদাওয়ার মীমাংসা করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মধর্ম্ম বা আর্য্যধর্ম্ম বলিতে ইহারা নিজেদের সমাজের স্মৃতি বা ট্র্যাডিষণকেই বুঝেন; এবং এই সকল স্মৃতি বা ট্র্যাডিষণকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ আর এখন ব্রাহ্ম বা আর্য্য থাকিতে পারেন না। এইরূপে, এই অতি সামান্য সময়ের মধ্যে, একরূপ আমাদের চক্ষুর উপরেই, ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্য্যসমাজ প্রভৃতি নূতন ও সংস্কৃত ধর্ম্মেও, নিজ নিজ

সম্প্রদায়ের স্মৃতি বা ট্র্যাডিষণই ক্রমে ক্রমে সত্যের অন্যতম এবং কার্য্যতঃ শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ করিয়া স্মৃতিপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব মনু-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণও একান্তই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। এস্থলেও মনু কোনও ধর্ম্ম-বিশেষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই, সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মানব-ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন।

তারপর "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ"—মনু ধর্ম্মের এই তৃতীয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবস্তু আত্মার প্রীতিকর হওয়া আবশ্যক। মনু এখানে শ্রেয়স্কর কথা ব্যবহার করেন নাই। ধর্ম্ম আত্মার শ্রেয়-সাধক হইবে, এমন বলেন নাই। কারণ শ্রেয়সাধকত্ব যে ধর্ম্মের লক্ষণ ইহা বলাই প্রথমে নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ কোনও বস্তু প্রীতিকর হইল কি না, ইহা সকলেই সহজভাবে বুঝিতে পারে; শ্রেয়স্কর হইল কি না, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে, অনেকের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত কি না, ইহাই সন্দেহের কথা। ধর্ম্ম আত্মার প্রীতিকর হইবে—মনু এখানে 'আত্ম'শব্দও কোনও গভীর দার্শনিক বা তত্ত্ববিদ্যাসম্মত অর্থে ব্যবহার করেন নাই। মোটামুটি সকল লোকেই যাকে "আমি" ও "আমার" বলিয়া থাকে এবং "আমি" ও "আমার" বলিয়া যাহাকে বোঝে, এখানে তাহাকেই আত্মা বলা হইয়াছে। আর ধর্ম্মবস্তু এই মামুলী আত্মারই প্রীতিসাধন করিবে ধর্ম্মের অনুসরণে যে যেমন লোকই হউক না কেন তারও আত্মপ্রসাদ জন্মিবে. ইহাও ধর্ম্মের একটা সাধারণ, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন লক্ষণ। ধর্ম্মের শাসন-সংযম সকলই আছে, সকলই থাকিবে। তার অশেষবিধ বিধি-নিষেধ আছে, এ সকলও সর্ব্বদাই থাকিবে। ধর্ম্মপথে চলিতে গেলেই আপনার লোভাদিকে কোনও না কোনও দিকে, কোনও না কোনও আকারে, সংযত করিতে হইবেই হইবে। কোনও না কোনও আকারের ত্যাগস্বীকার, ক্লেশস্বীকার ধর্ম্মমাত্রেই আছে। কিন্তু এই সকল ত্যাগ-ও-ক্লেশস্বীকারের ফলে সকল ধর্ম্মেই যজমানেরা একটা না একটা, আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই আত্মপ্রসাদও ধর্ম্মের সাধারণ ও সার্ব্বজনীন লক্ষণ—কোনও ধর্ম্মে ইহা আছে, কোনও ধর্ম্মে ইহা নাই, এমন বলা অসম্ভব। এইরূপে এক এক করিয়া মনুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের লক্ষণগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই, মনু এখানে যে কোনও ধর্ম্মবিশেষের কথা কহেন নাই, যাহা সকলের ধর্ম্ম, সকল দেশে, সকল কালে যাহা ধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বজনীন, তাহারই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হইবে।

আর তাহাই যদি হয়, তবে মনু ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া যে "বেদের" কথা কহিয়াছেন, তাহাও সার্ব্বকালিক, সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনীন হওয়া একান্তই আবশ্যক। এই "বেদের" কোনও সঙ্কীর্ণতর অর্থ করিলে, ঋষিবাক্যে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ আরোপ করা হয়।

ফলতঃ ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, মনু যে বেদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে, আমরা আজ যাহাকে বেদ বলিয়া জানি, ঠিক সেই বস্তু নয়, ইহা অস্বীকার করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ লোকে যাহাকে সচরাচর বেদ বলিয়া জানে, সেই বেদই আপনাকে ধর্ম্মের পরম বস্তু, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের একমাত্র সোপান বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকুচিত হইয়াছে। উপনিষদ সকল বেদান্তর্গত বলিয়া, বেদের মতনই প্রামাণ্য। আর এই উপনিষদই ঋগ্বেদাদিকে অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপপন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।
তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্
ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা যায়?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন। ব্রহ্মবিদেরা ইহা বলেন যে দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য; এক পরাবিদ্যা অন্য অপরা-বিদ্যা।

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ (অর্থাৎ ষড়ঙ্গ সমুদায় বেদ) অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা; পক্ষান্তরে যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

সুতরাং মোক্ষসাধনই যদি ধর্ম্মের লক্ষণ হয়, এবং সেই অক্ষয় পুরুষকে না জানিলে যদি মোক্ষলাভ অসাধ্য হয়, আর শ্রুতি স্মৃতি সকলেরই এই শেষ সিদ্ধান্ত—তাহা হইলে ঋগ্বেদাদিকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

এ কথা যে আমরাই আজ বলিতেছি তাহা নহে। যেমন শ্রুতি, সেইরূপ স্মৃতিও এই কথাই বলিয়াছেন। শর-শয্যাশায়ী মহাশূর ও মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট মনুর ন্যায় "সূক্ষ্ম বেদবোধিত-ধর্ম্মে"র লক্ষণই বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর মনুর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের লক্ষণে বেদকে যেমন প্রচলিত ঋগ্বেদাদির অর্থেই লোকে সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন, যুধিষ্ঠিরও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে ধর্ম্মের নিত্যত্ব রক্ষা করা যে অসাধ্য হইয়া উঠে, যুধিষ্ঠির ইহা স্পষ্টই লক্ষ্য করেন। তাই তিনি ভীষ্মকে পুনরায় এই প্রশ্ন করেন—(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষধর্ম্ম ৬০ অধ্যায়)

যে ধর্ম্মপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কখনওই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না; অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম যেরূপ, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সেই রূপ নহে। আপদ্, অসংখ্য, সুতরাং আপদ্ধর্ম্মও বিবিধ প্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমুদায় আপদ্ধর্ম্ম কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে। শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও সাধু ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন শূদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়া ধর্ম্ম-বৃদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে তাঁহাদের অধর্ম্ম হইতেছে এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞার্থ বিবিধ হিংসাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতেও তাঁহাদের ধর্ম্ম সঞ্চয় হইতেছে।

সুতরাং ধর্ম্ম কিরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর দেখুন, বেদ সমুদায়ের প্রতি যুগের হ্রাস হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে যখন কালভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্নভাব হইল তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল; তবে তৎসম্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রকে অপ্রমাণ করিতে হইবে। আবার অনেক সময় এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, ধার্ম্মিকেরা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে বলবান, দুরাত্মারা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে সেই অংশ সেই অবধি একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়।

সুতরাং ধর্ম্ম-তত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি ধর্ম্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম প্রথমত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা, গোনমুহের জল পানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদায় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়; তদ্রূপ বেদসেবিত ধর্ম্ম যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তিরা লোকের অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সমাধান, বেতন গ্রহণ সহকারে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য্য সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধুব্যক্তিরা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহা প্রলাপ বোধ করিয়া সাধুদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেখুন, দ্রোণাদি মহাত্মারাও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব সর্ব্বজনহিতকারী আচার কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-আচার অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মাচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোনও কোনও ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকারের আচারেরই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে।"

আর এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, মহামতি যুধিষ্ঠির এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—

"শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে।"

অতএব আমরাই যে আজি কালি বেদাদির প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িতেছি, তাহা নহে। এরূপ সন্দেহ সর্ব্বদাই চিন্তাশীল সুধীগণের চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে। আমরাই যে কেবল বিদেশীয় বিদ্যা শিখিয়া, বিজাতীয় সাধনার প্রভাবে, এই সকলের প্রাচীন প্রামাণ্য অস্বীকার করিতেছি তাহা নহে। পুরাকালেও এ প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহারা যেমন এরূপ সন্দেহে আন্দোলিত হইয়াও, বেদাদির প্রামাণ্যের একটা সমীচন মীমাংসা করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপই করিতে হইবে, নতুবা ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই জন্যই বেদাদির সত্য অর্থ কি, তার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের প্রাচীনমীমাংসকগণ আপনাদের অসাধারণ প্রতিভা ও অলোকসামান্য সাধন-অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই মীমাংসার পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া চলিলে, আমরাও ক্রমে এই সকল বিষম যুগসমস্যার একটা সমীচিন মীমাংসা যে করিতে পারিব না, এমনও মনে হয় না।

শ্রুতি বলিতে যদি আমরা ঋগ্বেদাদি গ্রন্থকে, আর স্মৃতি বলিতে যদি কেবল মনু পরাশর প্রভৃতিকেই বুঝি, তবে মহামতি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমাদিগকেও, "শ্রুতি বা স্মৃতি যে ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে"—একবাক্যে এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু মনু যে বেদ ও যে স্মৃতির উপরে বিশ্বধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি বেদব্যাসের সঙ্কলিত বেদচতুষ্টয় অথবা মন্বাদি স্মৃতি নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

প্রথমে বেদের কথা। মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ যে বেদের উপরে ধর্ম্মবস্তুকে স্থাপন করিয়াছেন সে বেদ কাহাকে বলে? ঋগ্বেদাদি যে সে বেদ নহে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই তার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। অতএব এই বেদের যদি অন্য কোনও অর্থ না থাকে, তবে মন্বাদি স্মৃতির সার্থকতা আর থাকে না। মনুর কথা সত্য হইলে, বেদের আর একটা কোনও অর্থ অবশ্যই আছে। সে অর্থটী কি?

মনু বলিতেছেন—যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম। এস্থলে মনু যে মানবধর্ম্মেরই কথা বলিতেছেন, ইহাও সত্য। কিন্তু সংস্কৃত ধর্ম্মশব্দের একটা ব্যাপকতর অর্থও আছে। ধর্ম্ম বলিতে, সংস্কৃতে কেবল মানুষের ধর্ম্মই বোঝায় না। সৃষ্টপদার্থমাত্রেরই একটা না একটা ধর্ম্ম আছে। আর এই ধর্ম্মের দুইটা দিক্। একটা তাহার স্থিতির দিক্, একটা তাহার গতির দিক্। স্থিতির দিক্ দিয়া ধর্ম্ম প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব গুণমাত্র প্রকাশিত করে। যেমন জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ ইত্যাদি। গতির দিক্ দিয়া ধর্ম্ম পদার্থের পরিণতির বা ক্রম-বিকাশের বিধানও প্রকাশিত করে। সুতরাং পদার্থের গুণ এবং সেই গুণের বিকাশের ও পরিণতির বিধান, ধর্ম্ম বলিতে আমরা এই দুই বস্তুই বুঝিয়া থাকি। এই দ্বিবিধ আকারে ধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। আর এই উভয় ভাবে ধর্ম্ম প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছেন এবং সেই প্রকৃতি হইতেই নিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছেন।

হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, তাহা প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব প্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কোনও বাহিরের বিধি-নিষেধাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। এ ধর্ম্মে বিধিও আছে, নিষেধও আছে। কিন্তু ইহার বিধি এবং নিষেধ উভয়ই জীবের আত্ম-চরিতার্থতা লাভের জন্য, তাহার নিজস্ব প্রকৃতির আদেশে এবং প্রয়োজনেই প্রচারিত হইয়াছে। জীবের আত্মচরিতার্থতা লাভই তার ধর্ম্ম। আর জীব যে আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই আদর্শটী তার মধ্যে পূর্ণ-মাত্রায় ফুটিয়া উঠিলেই সে আপনার প্রকৃত চরিতার্থতা লাভ করে। হিন্দু চিরদিনই এই অর্থে ধর্ম্ম-শব্দকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মই যদি আবার বেদ-বিহিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব আদর্শ যে তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও অভিব্যক্ত হয়, বেদ বলিতে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। বেদের অন্য কোনও অর্থ করিলে, ধর্ম্মের সর্ব্বজন-

বিদিত মর্ম্মের সঙ্গে, "যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম"—মনুর এই উক্তির সঙ্গতিসাধন সম্ভব হয় না।

অতএব স্রষ্টার অন্তরের যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে স্থিতি করিতেছে, এই নিখিল জগতের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া, যাহার মধ্যে আপনার চরম পরিণতি অন্বেষণ করিতেছে,—তাহারই নাম বেদ।

অন্যদিকে যাহা হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে স্থিতি করিতেছে, এই নিখিল জগতের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া, যাহার মধ্যে আপনার চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম ব্রহ্ম।

"যতো বা ইমানি ভূতানি"—ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রহ্মবস্তুরই এই একই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে; জন্মিয়া যাঁহাতে এই ভূতসকল জীবিত রহিতেছে; প্রলয়কালে যাহার প্রতি এই ভূতসকল গমন করে ও যাহাতে প্রবেশ করে"—তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। তাহাই ব্রহ্ম।

অতএব বেদ আর ব্রহ্ম একই বস্তু। গীতাদি শাস্ত্রও নানাস্থলে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বেদকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"কর্ম্ম ব্রহ্মসমুদ্ভবং।"

এখন প্রশ্ন এই—বেদকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলা হইল কেন? যেমন লোকবিশেষকে আমরা হরিদাস বা নবীনচন্দ্র ইত্যাদি নামে ডাকি, এ সকল নামে কেবল তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করে মাত্র, ইহাদের অন্য কোনও বিশেষ গুণবাচক অর্থ থাকে না; সেইরূপই কি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তাগণ এরূপ স্থলে বেদের নামান্তররূপেই কেবল এই ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, না এই নামের কোনও নিগূঢ় মর্ম্ম, কোনও বিশেষ সার্থকতাও আছে?

বেদের যে কয়টা প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল গুলিরই একটা না একটা বিশেষ অর্থ আছে। বেদ নিজেও অর্থশূন্য নাম মাত্র নহে! বিদ ধাতুর অর্থ জানা। ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে, যাহাতে সকল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তাহাকেই বেদ বলা যায়। বেদের ইহাই মৌলিক অর্থ। এই অর্থেই বেদের বেদ-নাম সার্থক হইয়াছে। বেদের আর এক নাম শ্রুত। প্রাচীন কালে শিষ্যগণ গুরুমুখে শুনিয়াই বেদশিক্ষা করিতেন, আজিকালিকার মত গ্রন্থ পড়িয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন না, আর এই জন্যই বেদকে শ্রুতি বলা হইত। এখনও শ্রুতি সেই স্মৃতিকেই জাগাইয়া রাখিয়াছে। বেদের আর এক নাম আম্নায়। আম্নায় শব্দের ধাত্বর্থ—যাহা কথিত বা উপদিষ্ট হয়। আর বেদের এই আম্নায় নামের সার্থকতাও অতি সুস্পষ্টই রহিয়াছে। বেদের আর যে কয়টা নাম আছে, সকল গুলিরই একটা না একটা বিশেষ সার্থকতা দেখিতে পাই। আর বেদকে যে ব্রহ্ম বলে, ইহারই কি কেবল কোনও সার্থকতা নাই? এরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব।

বেদের আর এক নাম শব্দ। আর এই

খানেই, আমার মনে হয়, বেদকে কেন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্মটী ধরিতে পারা যায়।

বেদকে যে অর্থে শ্রুতি বলা হইয়াছে ঠিক সেই অর্থেই যে শব্দ বলাও হইয়াছে ; এমন মনে হয় না। যাহা শোনা যায় তাহাই শব্দ, সত্য। কিন্তু এ শব্দ ধ্বন্যাত্মক। ধ্বনি-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া এই শব্দের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ হয়। প্রাকৃত জনে শব্দ বলিতে ইহাই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিত্যবস্তু নহে। অন্য-পক্ষে বেদকে সর্ব্বদা নিত্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের এই নিত্যত্ব-ধর্ম্ম নাই। এই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে সেই আকাশেই আবার বিলীন হইয়া যায়। ইহার উৎপত্তি ও বিলয় আছে। বেদ অপরিবর্ত্তনীয়, অনাদিকাল হইতে একই ভাবে, নিজ স্বরূপে স্থিতি করিতেছে। বেদ অনাদি, ইহার উৎপত্তি কখনও হয় নাই। বেদ অনন্ত, ইহার বিলয় কখনও হইবে না। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পুরুষের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। পুরুষ ইহার কর্ত্তা। বেদ অপৌরুষের। সুতরাং বেদের এই সকল লোক-প্রসিদ্ধ লক্ষণার সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গতি নাই। প্রাকৃতজনে শব্দ বলিতে যাহা বুঝে, সেই অর্থে, বেদকে শব্দ বলা যাইতে পারে না। এখানে শব্দের আর কোনও একটা অর্থ না থাকিলে বেদের শব্দ নাম নিরর্থক হইয়া পড়ে।

কিন্তু আমরা যদিও যাহা শোনা যায় তাহাকেই শব্দ বলিয়া জানি, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যতীত, আর একজাতীয় শব্দের কথাও বলিয়াছেন। সে শব্দ কানে শোনা যায় না, তাহা ধ্বন্যাত্মক নহে। সে শব্দ অতীন্দ্রিয়, কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য মাত্র। সে শব্দ "স্ফোটাত্মক।" আর এই অতীন্দ্রিয় স্ফোটাত্মক শব্দতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বেদের আর এক নাম শব্দ হইয়াছে।

এই স্ফোটাত্মক শব্দই সৃষ্টি-মূল। ইহাই জগদ্বীজ নাম ও রূপ। বেদান্তবাদী ইহাকেই মায়া বলিয়াছেন। "কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতি ?" "সেই কর্ম্ম কি, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছিল ?" পূর্ব্বপক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছিলেন তাহা নাম ও রূপ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে—অব্যক্ত কিন্তু ব্যক্ত হইবার জন্য চেষ্টিত—আমরা ইহাই বলি।" বৈষ্ণবেরা ইহাকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই স্ফোটাত্মক শব্দই গ্রীকদিগের লগস (Logos), ইহাই খৃষ্টিয়ানের বাইবেল-গ্রন্থোক্ত বাক্য বা Word.

In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God, বাইবেল এই বলিয়া আমাদের শাস্ত্রোক্ত এই স্ফোট-শব্দতত্ত্বকেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্ফোটশব্দতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বেদকে শব্দ ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এই স্ফোট-তত্ত্বের উপরেই বেদে

অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই তত্বটী না বুঝিলে, যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মনু-বর্ণিত এই লক্ষণের মর্ম্ম গ্রহণ অসম্ভব হইবে।

এই স্ফোটাত্মক শব্দ কি, গুরুকৃপা হইলে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রসের-রূপ

বাৎসল্য ও মাতৃমূর্ত্তি

ভালবাসার কি কোনও আকার আছে? সাকার-নিরাকার সম্বন্ধীয় বাদবিতণ্ডায় কখনও কখনও এই প্রশ্নটা তোলা হয়। আর সচরাচর ইহাতে সাকারবাদিগণকে একরূপ নির্ব্বাক্ ও নিরুত্তর করিয়াই তোলে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে একান্ত সাকারবাদী না হইয়াও, ভালবাসার কি কোনও আকার বা সত্য সত্যই নাই?—এ প্রশ্নটাও বোধ হয় তোলা যাইতে পারে।

তবে ভালবাসা-বস্তুটা একজাতীয় নহে। ভালবাসা কতকগুলি আন্তরিক অনুভূতির একটা সাধারণ নাম। আমরা সন্তানকেও ভালবাসি; স্ত্রী বা স্বামীকেও ভালবাসি; বন্ধুবান্ধবদিগকেও ভালবাসি। কিন্তু এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে, ভালবাসা তিন আকারে প্রকাশিত হয়। সন্তানের প্রতি ভালবাসাকে আমরা বাৎসল্য বলি, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাকে মাধুর্য্য, আর বন্ধুবান্ধবের প্রতি ভালবাসাকে সখ্য বলিয়া থাকি। এই বাৎসল্য, মাধুর্য্য এবং সখ্য এক জাতীয় বস্তু হইলেও, ঠিক এক বর্ণের নহে। বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে, মাধুর্য্যে ও সখ্যে এবং সখ্যে ও বাৎসল্যে পরস্পরের প্রভেদ বিস্তর। সুতরাং ভালবাসার রূপ বা আকার যদি কিছু থাকে, তাহা এই তিন ক্ষেত্রে তিন প্রকারেই প্রকাশিত হইবে। বাৎসল্যের রূপ যাহা, মাধুর্য্যের রূপ তাহা হ'তে পারে না। আর সখ্যের রূপ এই দুই হইতেই ভিন্ন হইবে।

আর বাৎসল্যাদির কি কোনও রূপ বাস্তবিকই নাই? ভালবাসাটা অন্তরের বস্তু সত্য। কিন্তু বাহিরে যে এই আন্তরিক ভাব সর্ব্বদাই নানাভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত, আমরা যে একে অন্যকে ভালবাসি ইহা কিছুতেই জানিতে বা জানাইতে পারিতাম না। প্রথমতঃ আমরা ইহাকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকি। সন্তানকে, পতি বা পত্নীকে, বন্ধুবান্ধবকে আমরা যে ভাবে সম্বোধন করি, তাহার ভিতর দিয়া আমাদের এই সকল বাৎসল্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষায় অন্তরের রসাদির যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে রূপ বলে না। ভাষা রসের সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; তাহার গুণও নয়, রূপও নয়। যাদু, বাছা, অন্ধের নড়ি, যাটের ধন, এ সকল বাৎসল্য-সূচক কথার সঙ্গে বাৎসল্য-বস্তুর কোন অপরিহার্য্য ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। কোনও জনক বা জননী আপনার সন্তানকে এ ভাবে সম্বোধন নাও

করিতে পারেন, অথচ তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের বাৎসল্যের অভাবও বোঝাইবে না, আর সে রসের স্ফূর্ত্তির কোনও বিশেষ ব্যাঘাতও জন্মিবে না। যেমন ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত হয়, সেইরূপ বাহিরের আচার-আচরণেও অন্তরের ভাব প্রকাশিত হয়। স্বামীপুত্রের সেবার ভিতর দিয়া সন্তানবতী সতীর মাধুর্য্য ও বাৎসল্য আপনার চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়া থাকে। এই সকল সেবা-যত্নের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের অন্তরের ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকল সেবা যত্নের সঙ্গেও বাৎসল্যের বা মাধুর্য্যের কোনও নিত্য ও অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। কোনও বিশেষ কারণে এই সেবা-যত্ন করা অসম্ভব বা অপ্রার্থনীয় হইতেও বা পারে। কিন্তু এই সেবা-যত্নের অভাব সর্ব্বত্রই যে অন্তরের রসের অভাব বা এ সেবা-যত্নের অল্পতা যে সে রসের লঘুত্ব বুঝাইবেই বুঝাইবে, এমন বলা যায় না। সুতরাং ভাষায় রসবিশেষের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা যেমন সে রসের রূপ নহে, সেইরূপ আমাদের আচার-আচরণে তাহার যে বহিঃপ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকেও সে রসের রূপ বলা যায় না।

ভাষাতে বা আচার-আচরণে রসের যে প্রকাশ হয়, তাহা সর্ব্বত্র এক নহে। আমরা যে কথায় বাৎসল্য প্রকাশ করি, ইংরেজ ঠিক সে কথা ব্যবহার করেন না। আমাদের দেশে প্রাচীনেরা পত্র ব্যবহারে অনেক সময় পুত্রকে "প্রাণতুল্যেষু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইংরেজি ভাষায় এইরূপ সম্বোধন অতিশয়োক্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। ইংরেজ-সমাজে ইহা শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া বিবেচিত হইবে কি না সন্দেহ। অন্যপক্ষে আমাদের দেশে পত্নীকে সকলের সমক্ষে প্রথম যৌবনে ডার্লিং (Darling) বা ডিয়ার (Dear)—বাছাধন বা প্রিয়তম বলিয়া ডাকা, আর বয়োবৃদ্ধিতে ক্রমে প্রেম যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া "স্নেহসারে" স্থিতি করে, তখন তাঁহাকে মা (Mother) বলিয়া সম্বোধন করা, কখনওই শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। দাম্পত্য সম্বন্ধের অন্তরালে যে মাধুর্য্য রস বিদ্যমান থাকে আমরা এই সকল কথায় সে রসকে ব্যক্ত করি না। আমরা এই ক্ষেত্রে যে সকল কথা ব্যবহার করি, ইংরেজ বা জার্ম্মাণ, কাফ্রি বা জুলু সে কথা বা তার অনুরূপ অন্য কোন কথা ব্যবহার করেন না। আর এ পার্থক্য যে সামান্য তাহাও নয়। আমাদের অন্তরের ভাব যখনই ভাষায় ব্যক্ত হয়, তখনই আমাদের নিজেদের সভ্যতার ও সাধনার, নিজেদের পারিবারিক জীবনের ও সমাজগঠনের আরো অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব বা আদর্শ তার সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই কারণে অন্তরের ভাবটা শুদ্ধ ও অমিশ্র হইলেও, বাহিরের প্রকাশটাতে আশেপাশের অনেক বস্তু মিশিয়া থাকে। আর এরূপ মিশ্রণ হয় বলিয়াই, ভাষায় বা আচার-আচরণে একই মানবীয় রসের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভাষায় বা আচার-আচরণে রস-

বিশেষের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে সে রসের রূপ বলা যাইতে পারে না।

কারণ প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর রূপের সম্বন্ধটা কিয়ৎ পরিমাণে নিত্য আর সর্ব্বত্রই অঙ্গাঙ্গী। একজাতীয় বস্তুর রূপ বা আকার মোটের উপরে এক। মানুষের রূপ বা আকার সকল মানুষের মধ্যেই মোটের উপরে এক। মানুষে মানুষে বর্ণে বা গঠনে, চেহারায় বা চলনে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, এ সকল বিভিন্নতা মানবীয় রূপের অনতিক্রমণীয় সীমা বা সমতাকে কিছুতেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। খর্ব্বাকৃতি লোমশ কে'ভ-ম্যান (Cave-man) একদিকে; কৃষ্ণকায় কুঞ্চিতকেশ, স্থুল-অধরোষ্ঠসম্পন্ন কাফ্রি আর একদিকে; সুগঠিতবপু, শ্বেতবর্ণ রোমক বা গ্রীক আর একদিকে; আমেরিক ইণ্ডিয়ান একদিকে, আর চীনাম্যান বা জাপানী আর একদিকে; এ সকলের মধ্যে বিস্তর আকৃতিগত বৈষম্য আছে। কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্ত্বেও সকলের মধ্যেই মানুষী রূপ বলিয়া যে একটা সামান্য বস্তু আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই রূপ ইহাদের সকলকেই অধিকার করিয়া আছে। এই রূপ আছে বলিয়াই ইহারা পরস্পর হইতে এতটা পৃথক হইয়াও, সকলেই মানুষ হইয়াছে। এই মানুষী রূপের সঙ্গে মানবমাত্রেরই একটা নিত্য ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই মানুষ সেখানেই এই মানুষী রূপটী ফুটিয়া আছে। ছায়া যেমন আতপের অনুগমন করে, আতপ ছাড়া যেমন কোথাও ছায়া থাকে না, থাকা সম্ভব নহে; আর ছায়া ছাড়াও কোথাও আতপ থাকে না, থাকাও সম্ভবে না; সেইরূপ মানুষের সঙ্গে এই মানুষী রূপেরও একটা নিত্য ও অপরিহার্য্য যোগ রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর রূপের সম্বন্ধ এইরূপই নিত্য, অঙ্গাঙ্গী, অপরিহার্য্য। ভাষায় বা আচার-আচরণে আমরা সচরাচর অন্তরের ভাবকে বা রসকে যেরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকি, তাহা সর্ব্বত্রই সমান নহে। এইজন্য রসের এই সকল অভিব্যক্তিকে তার রূপ বলা যায় না। রসের রূপ তার এমন একটা বিশেষ বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি হওয়া চাই, যার সঙ্গে তার একটা নিত্য, অপরিহার্য্য, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছেই আছে। যেখানেই মানব-অন্তরে কোনও রসবিশেষ জাগিয়া উঠে, সেখানেই তার এই নিজস্ব রূপটীও প্রকাশিত হইবেই হইবে। এরূপ না হইলে, তাহাকে সে রসের রূপ বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু কোনও রস বা ভাব প্রাণে জাগা মাত্রই যে তার এই রূপটী ফুটিয়া উঠিবে, এমনও কোন কথা নাই। রূপ মাত্রেই বস্তু-বিশেষের বহিঃপ্রকাশ। আর বস্তুর গাঢ়তার উপরে তার রূপের প্রকাশ হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সচরাচর জড়পদার্থের তিনটী অবস্থার উল্লেখ করেন। এক—তার বায়বীয় অবস্থা—ইংরেজিতে ইহাকে gaseous বলে। দ্বিতীয়—তার তরল বা লিকুইড (liquid) অবস্থা। তৃতীয়—তার কঠিন বা সলিড (solid) অবস্থা। প্রথমাবস্থায় পদার্থের রূপ

থাকে না; চক্ষে তাহাকে দেখা যায় না। দ্বিতীয় অবস্থায় পদার্থ চক্ষুগ্রাহ্য হইলেও তরল পদার্থের যে সাধারণ আকার তাহা ছাড়া সে নিজস্ব কোনও বিশেষ আকার ধারণ করিতে পারে না। তরলাবস্থায় পদার্থের আকার চঞ্চল থাকে, স্থৈর্য্য লাভ করে না। পদার্থ-বিশেষ সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম কঠিনাবস্থা লাভ করিলেই তার মধ্যে কোনও স্থির ও স্থায়ী রূপ ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয়।

আমাদের আন্তরিক রসেরও এইরূপ তিনটী অবস্থা আছে। জড়পদার্থের বায়বীয় বা গ্যাসাস (gaseous) অবস্থার মত, আমাদের বাৎসল্যমাধুর্য্যাদিরও একটা অতিশয় হাল্‌কা, বায়বীয় অবস্থা আছে। এ অবস্থায় রসের সাড়া মাত্র অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। এ অবস্থায় রস নিতান্ত ছায়ার মত, অশরীরী হইয়া থাকে। বিদ্যুৎচমকের ন্যায় অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়া, আবার তখনই নিভিয়া যায়। এ অবস্থায় তার রূপের প্রকাশ হয় না। জড়-পদার্থের তরলাবস্থার ন্যায় আমাদের অন্তরের এই সকল রসেরও একটা তরল অবস্থা হয়। এই অবস্থায় রসকে আস্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই অবস্থাতেই রস ব্যভিচারী ব্যবহার করিয়া থাকে। এক রস অপর বিরুদ্ধ রসের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। অপস্মার বা উন্মাদ রোগগ্রস্ত লোকের মধ্যে এইরূপ ব্যভিচারী রসের খেলা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাসিতে হাসিতে ইহারা কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। ক্ষণে ভয় ক্ষণে অভয়; ক্ষণে উচ্ছ্বসিত অনুরাগ, ক্ষণে তীব্র বিরাগ; এইরূপে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুতাড়িত জলরাশির ন্যায় ইহাদের চিত্ত যুগপৎ বিবিধ বিরোধী ভাবের তাড়নায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠে। এই তরল অবস্থাতেও রস আপনার রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। জড়পদার্থ যেমন কাঠিন্যলাভ করিলেই বিশেষ আকার বা রূপ ধারণ করিয়া থাকে, অন্তরের রসও সেইরূপ স্থির ও গভীর হইলেই আপনার নিজস্ব রূপটীকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সুতরাং এ সকল রসের রূপ দেখিতে হইলে, যে ক্ষেত্রে ইহারা অনন্যসাধারণ স্থৈর্য্য ও প্রগাঢ়তা লাভ করে, সেখানেই তাহাদের নিজ নিজ রূপের অন্বেষণ করিতে হয়; যেখানে সেখানে, যখন তখন, এ রূপের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবে না।

এই সকল রস আমাদের অন্তরেই জন্মে, অন্তরেই বাড়িয়া উঠে, অন্তরেই বাস করে, সত্য। কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ রূপ আমাদের দেহেতে ফুটিয়া উঠে। বাহিরের আলোকের সঙ্গে আমাদের চক্ষের গোলকের এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, আলোক ফুটিলেই, গোলকে তার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ আমাদের অন্তরের রসের সঙ্গে একদিকে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর ও অন্যদিকে এই স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই, আমাদের শরীরের পেশিসমূহের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্তরে কোনও রসের সঞ্চার হইবা মাত্রই,

স্নায়ুমণ্ডলে তার সাড়া পড়িয়া যায়। এই রস ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, গাঢ়তা লাভ করিলে, আমাদের শরীরের পেশিকে আসিয়া দখল করে, এবং যে পেশির সঙ্গে যে রসবিশেষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, সেই পেশিগুলির ভিতর দিয়া, তাহাদের ক্রিয়াবিশেষকে আশ্রয় করিয়া, আপনার নিজস্ব রূপটীকে ফুটাইয়া তোলে। ভিন্ন ভিন্ন রসের তাড়নায় আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে প্রথমে এবং ক্রমে আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশিসমূহের সাহায্যে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, এবং এই সকল স্নায়বীয় ও পৈশিক ক্রিয়া নিবন্ধন আমাদের চক্ষে মুখে যে সকল ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহাই এই সকল রসের রূপ। এই সকলকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্রপ্রণেতাগণ রসের মূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন। আজি কালি য়ুরোপীয়েরাও শারীর-তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের যে সকল অভিনব সত্যের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও, এ সকল রসমূর্ত্তি পুরাণোল্লিখিত বলিয়া বাস্তবিকই যে একেবারেই কেবল উদ্দামকল্পনাসম্ভূত, এমন কথা বলা কতকটা অসমসাহসিকতা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

এই সকল রস-মূর্ত্তির প্রকাশ যে অত্যন্ত বিরল তাহাও নহে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করাও যে একান্তই কঠিন, এমনও বলিতে পারি না। প্রায় সর্ব্বদাই এ সকল রসমূর্ত্তি আমাদের সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাদির ভিতর দিয়া, আমাদিগের চারিদিকে ফুটিয়া উঠে। আমাদের রসানুভূতি প্রখর নহে বলিয়া, সকল সময় আমরা এ গুলিকে দেখিয়াও দেখি না। সন্তানবতী রমণী যখন আপনার সুকুমার শিশুকে কোলে লইয়া, তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে, সেই অসহায় সন্তানের মধ্যে আপনাকে একান্ত ভাবে ডুবাইয়া দেন, তখন তাহাকে কোন্ গৃহস্থ না দেখিয়াছে? কিন্তু তাঁর এই রূপের ভিতর দিয়াই যে বাৎসল্যরসের নিত্য মূর্ত্তিটী ফুটিয়া উঠে, ইহা অল্প লোকেই জানে। এই রূপকেই জগতের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর ও ভাস্করগণ য়ুরোপের ম্যাডোনা (Madonna) বা আমাদের গণেশ-জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রাকৃত জনে হয় ত ভাবে যে সন্তান কোলে ধরিয়াই ম্যাডোনা ম্যাডোনা এবং গণেশজননী গণেশজননী হইয়াছেন। সন্তান কোলে করিয়া না বসিলে, তাঁহাদের মাতৃত্বের রূপটী বুঝি বা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিত না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সন্তানকে কোলে করিয়া যখন জননী তাঁহার সেই সন্তানের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যান, তখনই তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের সমগ্র রসটী মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে, সত্য; কিন্তু সে রসের রূপটী সন্তানের মধ্যে নহে; কিন্তু তাঁহার আপনার দেহেতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে বাৎসল্যে বিভোর হইয়া যে জননীর বাহ্যচেতনা লোপ পাইয়া যায়, তাঁর ক্রোড় হইতে সে অবস্থায় ঘুমন্ত শিশুটীকে ধীরে ধীরে সরাইয়া নিলেও, তাঁর দেহযষ্টিকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যের যে রূপটী প্রকট হইয়াছিল, তাহা অমনি অপ্রকট হইবে না। পুত্রশোকাতুরা জননী

যখন বিরহের তীব্রতায় বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া, বাৎসল্যের তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া মানসচক্ষে মৃতপুত্রকে জীবন্তভাবে আপনার ক্রোড়স্থ দর্শন করেন, তখন সন্তানের দৈহিক সান্নিধ্য ব্যতীতও, বাৎসল্যের প্রকৃত মূর্ত্তিটী তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া স্বচ্ছন্দেই ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং কোনও কোনও স্থলে ফুটিয়া যে থাকে, ইহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং য়ুরোপের ম্যাডোনা-গুলিতে বা আমাদের গনেশজননীতে যে ভাবে মাতৃমূর্ত্তিটী ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ছাড়া যে এ মূর্ত্তিটী অতি পরিস্ফুটরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, এমন নয়। ফলতঃ সন্তানকে কোলে দিয়া, ম্যাডোনাতে এবং গণেশজননীতে মাতৃমূর্ত্তির নিজস্বরূপটীকে ফুটাইবার দিকে অন্ততঃ কোনও কোনও চিত্রকর ও ভাস্কর নিজেদের দায়িত্বভার যে অনেকটা লঘু করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাও বলিতে পারি না। সন্তান যখন কোলে আছে, তখন এ চিত্র বা ভাস্কর্য্য যে মায়েরই তৈলচিত্র বা প্রস্তর-মূর্ত্তি, এ ধারণা আপনা হইতেই অনেকটা জন্মিয়া যায়। আর সেই জন্য এই সকল চিত্রপটে বা প্রস্তরফলকে বাৎসল্যের নিজস্ব মূর্ত্তিটী সত্য সত্য কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে বা উঠে নাই, এ বিষয়ে অনেকেই কোনও বিশেষ অনুসন্ধান আর করে না। মোটের উপরে ছবিখানি বা প্রতিমূর্ত্তিটী নয়নপ্রীতি-কর হইয়াছে কি না, তাহারই দ্বারা তার ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকে। সন্তান কোলে লইয়াও যে কোনও জননীর মধ্যে কখনও কখনও তাঁর সত্যিকার মাতৃমূর্ত্তিটী ফুটিয়া নাও উঠিতে পারে; সকল সময় যে ফুটিয়া উঠে না; ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। সকল জননীই তো দিনের মধ্যে কতবার সন্তানকে কোলে করিয়া বসেন ও তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদাই যে এ সকল অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে বাৎসল্যের মূর্ত্তিটী ফুটিয়া উঠে, এমন তো দেখা যায় না। আর যখন এই মূর্ত্তিটী কোনও জননীর মধ্যে সত্য সত্যই ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাকে চিনিতেও বেশি বিলম্ব হয় না। সে আপনা হইতেই আপনাকে ধরা দিয়া থাকে। আর এই যে অপরূপ মাতৃমূর্ত্তিটী, তাহারই মধ্যে বাৎসল্যরসের রূপটী ফুটিয়া উঠে।

বাৎসল্যরস পিতামাতা উভয়েরই মধ্যে সঞ্চারিত হয় সত্য; কিন্তু ইহা সন্তানের জননীকে যতটা পরিমাণে অধিকার করে, তাহার জনককে সে পরিমাণে অধিকার করে না। কারণ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা যত ঘনিষ্ঠ, তাঁর দেহমন-প্রাণ জীবনের সকল বিভাগের ভিতর দিয়া এই সম্বন্ধ আপনাকে যে ভাবে গড়িয়া তুলে, পিতার সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠ নয় ও হইতেই পারে না। আপনার সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ কেবল আন্তরিক নহে, কায়িকও। প্রথমতঃ মা দশমাস দশদিন সন্তানকে আপনার গর্ভে ধারণ করিয়া এই কায়িক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুদীর্ঘ গর্ভবাস নিবন্ধন মায়ের স্নায়ু-মণ্ডলের সঙ্গে সন্তানের স্নায়ুমণ্ডলের একটা অতি নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হয়; নাড়ীচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এ যোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া

যায় কি না, তাহাও বলা সহজ নহে। আর এই জন্য জননীর 'সন্তানবাৎসল্যের মধ্যে অন্ততঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত যে একটা শারীরিক দিকও জাগিয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। সুতরাং জননীর অন্তরের বাৎসল্যরস যখনই বিশেষ গাঢ়তা লাভ করে, তখনই যে তাহা তাঁর মনকে ছাড়াইয়া, দেহকে পর্য্যন্ত যাইয়া সহজেই অধিকার করিয়া বসে, এবং তাঁর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আপনার নিজস্ব মূর্ত্তিটীকে ফুটাইয়া তোলে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। জননী ঘুমন্ত শিশুকে কোলে লইয়া, তাঁর সুকুমার মুখখানিতে আপনার চক্ষু দুটী নিবদ্ধ করিয়া যখন আপনার মাতৃ-ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া উঠেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁর মুখে, চক্ষে, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, এমন কি প্রতি লোম-কূপের মধ্য দিয়া এই অপূর্ব্ব বাৎসল্যরস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, ও সেই রসের আবেগে যখন তাঁর পীনপয়োধরযুগল হইতে আপনা হইতে ক্ষীরধারা ছুটিয়া সন্তানের চক্ষে মুখে যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করে,—সন্তানবতী জননীকে এ অবস্থায় যে দেখিয়াছে, সে-ই বাৎসল্যরসের নিজস্ব রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। বাৎসল্যরসের পীড়নে জননীর স্নায়ুমণ্ডলে যে সকল বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাঁর চক্ষের, মুখের, উরসের স্নায়ুসকল ও পেশিসমূহ যে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, এ গুলিকে লক্ষ্য করিয়া, এই ক্রিয়ার ছবিকে অন্তরে ধারণ করিয়া, যে চিত্রকর বা ভাস্কর তাহাকে চিত্রপটে বা মর্ম্মরখণ্ডে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই সত্য মাতৃমূর্ত্তি রচনায় সিদ্ধি লাভ করেন। সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে করিতে যে জননীর চক্ষে অসীম ত্যাগের অটল সংকল্প, মুখে ভাগবতী করুণার কোমল আভা ফুটিয়া না উঠে, এই কারুণ্যে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ না হয় এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীর-ভারে স্তনযুগল যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, এমনি অবস্থা না ঘটে,—তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের রূপ প্রকাশিত হয় না, হইতেই পারে না। এই জন্য যাঁরা আজি কালিকার দিনে,একটা বিমানচারিণী ভাবুকতার মোহে পড়িয়া, বাৎসল্যের এই সত্য, শারীর ধর্ম্ম-গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল একটু চাহনি বা একটা হাবভাব কি পোজের (Pose) সাহায্যে,—ক্ষীণপয়োধর ও লঘুনিতম্ব পবাহারী কৃশাঙ্গিনীগণকে শাড়ী পরাইয়া, ছেলে কোলে দিয়া, মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদের এ চেষ্টা যে একান্ত অসত্যকে আশ্রয় করিয়া নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, ইহা আর বিচিত্র কি!

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ধর্ম্মক্ষেত্র

(১)

গোটা দেহ কার বিরাট দেউল,
সুবিশাল বেদী, ভূধর শির,
অর্ঘ্য কাহার ক্ষেত্র-কানন,
পাদ্য, শতেক নদীর নীর ?
পূজার বাদ্য কীচক রন্ধ্রে ;
সিন্ধু লহরে, বিহগ গানে,
নিতি উৎসবে আরতি কাহার,
আকাশ ভরিয়া আলোর বাণে ?
কুশের বলয়ে, ধূপের ভস্মে,
শুষ্কপ্রসাদী পূজার ফুলে,
ভরা আলপনা চন্দন দাগে,
গৃহ, প্রান্তর নদীর কূলে ?
কোথায় সদাই চরণ ফেলিতে
শিহরে অঙ্গ ভক্তি-ভরে,
পবন কোথায় গন্ধশীতল,
সলিল নিযুত কলুষ ক্ষয়ে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র,
ভারত মাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

(২)

গোধন কোথায় রেখেছে বাঁচায়ে
তাপসের তপ দেবের যাগ,
নৃপের ঋদ্ধি ;—জননীকল্পা
লভিয়াছে পূজা সেবার ভাগ ?
হিংস্র কোথায় আমিষ ত্যজেছে
লভিয়া পুণ্যকুশের গ্রাস,
বেদীর মন্ত্রে দীক্ষিত তারা
হয়েছে ঋষির দাসানুদাস,
কেশরী কেশর লুটায়ে দেছিছে
জগৎ-মাতার চরণতল ;
কালফণী সম পিতার অঙ্গ
বেড়িয়া ফেলেছে আঁখির জল ;
বিহগ কোথায় পরাণ দিয়াছে
রুধির উগারি সতীর লাগি,
খগরাজ কোথা লুটিয়া পড়িয়া
বিভুর চরণে রয়েছে জাগি ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র,
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

(৩)

দেবের ব্যজনে সাধের পুচ্ছ
দিয়াছে কোথায় চমর-বধূ,
তুচ্ছ জীবন করিছে উচ্চ
মধুমক্ষিকা বিতরি মধু ?
বহে মৃগনাভি নাভিতে হরিণ
দিতে দেবতায় গন্ধসুখ,
দিয়াছে মুক্তা কুম্ভ বিদারি
বারণ, শুক্তি বিদারি বুক ?
পাষাণ আপন বক্ষ চিরিয়া
দেছে কুঙ্কুম সিঁদুর রাগ,
তৃণ তরু দেছে আপন অস্থি,
সাধিতে কোথায় দেবের যাগ ?
কীট কোথা দিয়া আপনার হিয়া
পরায়েছে মায়ে পট্টাঞ্চল,
আপন পরাণে রঞ্জিয়া দেছে
জগৎ-মায়ের চরণতল ?

সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

(৪)

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' 'রাম রাম' বিনা
কহে না কোথায় সারিকাশুক ?
রামায়ণ-স্রোত দিয়াছে খুলিয়া
ক্রৌঞ্চ কোথায় বিদারি বুক ?
তিত্তিরি কোথা বসি আশ্রমে
উপনিষদের বারতা কয়,
কৃতক পুত্র ময়ূর করেছে
ঋষি-তনয়ের হৃদয় জয় ?
কানন পেলেছে যোগী সন্ন্যাসী
অশোক বিল্ব বটের ছায়,
আনন মলিন হোমের ধূমেতে,
করুণা অরুণ নয়নে চায় ;
ধরেছে বাকল, অক্ষ-মালিকা,
ভৃঙ্গার কোথা বিটপিকুল,
ক্ষণে ক্ষণে ঐ তনু রোমাঞ্চে
ফুটিয়া উঠেছে কেশর ফুল ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৫

দারু, তৃণ, হিয়া পাষাণে ঘরষি
কোথা দেছে দেবে গন্ধরস,
দেবতা দেউলে দহিয়া মরণে
লভিয়াছে ধূপ, অমর যশ ?
গোময় কোথায় করে দেছে
শুচি, লক্ষ্মীমায়ের আঙ্গিনাতল ?
অর্ঘ্যেরি লাগি কোথা ফুটে ফুল,
ভোগের লাগিয়া ধরে গো ফল ?
আশীষ কোথায় দূর্ব্বার দল,
মঙ্গলমাটি মৃগরোচনা ?
ধান্য কোথায় কমলাদেবীর
অঞ্চলঝরা মুক্তাকণা ?
বৈশাখদিনে অশথ কোথায়
লভে গাঙ্গেয় ঝারার জল ?
দীপ আলোকিত তুলসীকুঞ্জ
মরণেতে দেয় সুমঙ্গল ?

সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি।
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

স্বরগের ঘাটে নিতি খেয়া দিতে
জাহ্নবী মায়ে রেখেছে কে বা ?
কোথায় নর্ম্ম কর্ম্ম-ফলদা সরযু,
যমুনা, তমসা, রেবা ?
ঋষির আদেশে কোথায় শৈল
নমিয়া পড়িল তাহার পায় ?
ভূধর নৃপতি ধরিল আদরে
সন্ততিরূপে জগৎ-মায় ?
পুণ্য পুলক-শিহরণ সম
সাত্ত্বিক রসে ভক্তদেহে,
শতেক তীর্থ মঙ্গলপীঠ
জাগিয়া উঠিল কাহার গেহে ?
আমূল মর্ম্ম মন্থন করি
সিন্ধু কাহার পরাণ পণে,
কমলা, ইন্দু, সুধা, মন্দার,
বিতরিয়া দিল দেবতা জনে ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৭

নরনারী কোথা প্রভাতে দেউলে
আরতির শুভ শঙ্খতানে,
জেগে উঠে চায় ভক্তিপ্রণত
রক্ততরুণ অরুণ পানে ;
স্নানপূত শুচি, সিক্ত বসনে
ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে
অর্পণ করে তর্পণ বারি স্বর্গত যত পিতৃগণে ?
পঞ্চ যজ্ঞ করিয়া সমাধা
অতিথি ভিখারী তুষিয়া নিতি
দিবসের শেষে, আমিষবিহীন পূত
ভোজনের কোথায় রীতি ?
সন্ধ্যায় শত সারিয়া কৃত্য,
সুপ্তি কোথায় ক্লান্তিহরা ?
স্বপনেতে কোথায় হেরে গৃহী নিতি
ভৃঙ্গার জটা বাকল ধরা ?

সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৮

নিশাতম দূর আরতি আলোকে,
ভোজ্য কোথায় পূজার ভোগ,
দেউল সোপান শয্যা কোথায়,
চরণামৃত হরে গো রোগ।
বিভুনাম লেখা তিলক ভূষণ,
তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ,
গার্হপত্য মরণের চিতা,
দেবতার ঋণ শোধিতে যাগ?
পূজার কুসুমে দিন গণে নারী,
হরি বলে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
তনয়ের নাম রাখে কোথা গৃহী
বিভুর চরণ, মায়ের দাস?
জননী কোথায় অন্নপূর্ণা
দুখী তাপী জনে ধরেছে বুকে,
জনক কোথায় শ্মশানে বেড়ায়
কঙ্কাল মালা পরিয়া সুখে?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র,
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৯

শিল্প কাহার দেউল রচনা
মূর্ত্তিগঠনে প্রকাশ পায়?
সঙ্গীত কোথা ভাবগদগদ
যার পদ বুকে ধরিতে চায়?
কার সাহিত্য, সতীর, সাধুর,
দেবতা জনের করেছে সেবা?
বড় কবি কার করুণা পাথার
প্রেমের পাগল সাধক যে বা?
অনল, অনিল, গ্রহতারা, রবি
লভিয়াছে কোথা পূজার দান?
প্রজাপতি কোথা করে সোমরস
সন্ধ্যা উষার স্তোত্রগান?
কার গৃহে গৃহে শিলার খণ্ড
জাগ্রত দেব-বেদীর পরে?
সব চরাচর লভে কার পূজা
পরংব্রহ্মে বক্ষে ধরে?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র,
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১০

কর্ম্মে কোথায় শুধু অধিকার,
ফল সে ত যায় ধাতার পায়,
মরণ মিথ্যা, অমর আত্মা
নবীন বসন পরিতে চায়।
নিজ ভাবনায় রহিলে মগন,
কোথায় নিখিল ভুবন ভুলি,
অভিশাপ আসে উদ্যত জটা,
বিদ্যুৎ ছটা রোষেতে তুলি'?
নারী কোথাকার দেবীর মূর্ত্তি,
মদন শমন চরণে পড়ে,
আজীবন কোথা ব্রহ্মচারিণী,
অথবা পতির চিতায় মরে?
ইহলোক কোথা প্রবাসের মত,
ভোগ হেয় যেন মলিন ক্লেদ,
গৃহেতে অনল জ্বলিলে কোথায়
গৃহী খুঁজে তার যজুর্ব্বেদ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১১

ধর্ম্মাচরণে বিবাহ কোথায়
উজলিতে কুল কোথায় সুত?
বর্জ্জন তরে অর্জ্জন কোথা,
অভিষেক কোথা হইতে পূত?
কর্ম্মবলের লাগি যৌবন,
অতিথির লাগি কোথায় গেহ?
পুনর্জ্জন্ম জিনিতে জনম,
আত্মার লাগি কোথায় দেহ?
যোগের লাগিয়া স্বাস্থ্য কোথায়,
তপের লাগিয়া,কঠোর যোগ?
চিরনিবৃত্তি লভিবার তরে
কোথায় অচির কালের ভোগ?

জীবন ধারণ ভুবনের লাগি,
পুণ্যের লাগি মনের ভাব ?
নবীন শক্তি লভিয়া ফিরিতে
কোথায় ইচ্ছা মরণ লাভ ?
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি ?
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১২

কোথা তপঃকৃশ ঋষিতনয়ের
ক্ষীণ অঙ্গুলি হেলন ভরে,
নৃপতির শির, উদ্ধত বাজি,
উদ্যত অসি নমিয়া পড়ে ?
রাণীসহ রাজা ধেনুর সেবায়
কোথায় কাননে ভূধরে ফেরে ?
নৃপসুত ঘুরে পথে প্রান্তরে
কাঁদিয়া দুঃখী জগৎ হেরে ?
শরণাগতের লাগি নরপতি
দিতে গেল কোথা আপন প্রাণ ?
পাপের শান্তি লাগি দেবর্ষি
হেলায় করিল অস্থিদান !
যুবরাজ কোথা সখা বলি ডাকি
নিষাদে বানরে ধরিল বুকে,
মরণের আগে মুক্ত নরেশ
কমলার সুতা লভিল সুখে !
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি ?
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১৩

কোথা ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়া
বাঁধা ভগবান কুটীর দ্বারে !
যমুনায় ফেলে পরশ-পাথর
কোথায় তুচ্ছ জানিয়া তারে।
পতির নিন্দা করিয়া শ্রবণ
সতী ত্যজে কোথায় ঘৃণায় প্রাণ !
বৃদ্ধ পিতারে যৌবন দিল
অতিথিরে কোথা পুত্রদান !
সারা জীবনের সাধনার ফল
কোথা দেয় ব্যাধ গুরুর পায় ;
পঞ্চ বরষে রাজার তনয়
বনে বনে কেঁদে হরিরে চায় !
ভ্রাতার লাগিয়া নিদ্রা ক্ষুধায়
জিনিল যোদ্ধা লালসারণে,
প্রজার লাগিয়া জীবনকল্পা
মহিষীরে কোথা পাঠায় বনে ?
যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১৪

দুগ্ধধবল স্নিগ্ধদিঠিতে
কে করায় নিতি মোদের স্নান,
আকাশে বাতাসে মাতাইয়া ভাসে
কোথা নিমায়ের প্রেমের গান।
স্তন্যের সহ কে দেয় কণ্ঠে,
পাপতাপজয়ী হরির নাম !
আশীষ কাহার বরের মতন—
করে গো পূর্ণ মনস্কাম !
শত্রু জনেরে ক্ষমা কে শিখায়,
লুটিতে মিত্র জনের পায়,
কীর্ত্তননাচা পথধূলি লয়ে,
কে দেয় মাখায়ে সবার গায় !
অঞ্জলি দেয় কুসুমে ভরিয়া,
শির গুলি দেয় নোয়ায়ে আর !
বক্ষে কে দেয় বিমল শান্তি,
চক্ষে জাগায় স্বর্গদ্বার !
সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র
ভারতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম,যাহার জীবম-মরণ-শরণ চরণ চুমি।

শ্রীকালিদাস রায়।

উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতা

আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্য্যন্ত হয় না কেন?

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্ন্যাসীদের যেমন শিষ্য-সেবক থাকে, উপাধ্যায়ের সেরূপ শিষ্য-সেবক কেহ ছিল না। সে আকাঙ্ক্ষাও উপাধ্যায়ের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস অন্য ধরণের ছিল। গীতা যাহাকে সর্ব্বকর্ম্ম-ন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায়ের সন্ন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার বলিতে সংসারে তিনি কিছুই রাখেন নাই। আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অহং-জ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতর সম্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে উপাধ্যায়ের মতন আর কেহ এতটা পরিমাণে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

সন্ন্যাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা বুজুরগী লুকাইয়া থাকে। উপাধ্যায়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর প্রাণটা অতি বড় হইলেও, কোনও মতেই তাঁহাকে প্রচলিত অর্থে "বুজুরগ্" বলা যাইত না। অতিলৌকিক কোনও কিছুর দাবী তিনি কখনও করেন নাই। এমন কি আপনি সংসার করেন নাই বলিয়া, সংসারী লোকের প্রতি তাঁহাকে কখনও কটাক্ষপাত করিতেও দেখি নাই।

সন্ন্যাসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাস লইয়া লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্যাগী হন নাই। ফলতঃ তাঁর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও সজীব সমাজানুগত্যের ভাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর সন্ন্যাসের আদর্শের কোনও প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতি-সাধন কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরাও কোনও কোনও বিষয়ে একান্তভাবেই লৌকিকাচারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্তু উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইহাঁদের সমাজানুগত্যের একটা জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের সন্ন্যাসিগণ লোকসংগ্রহার্থে, কর্ম্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ যাহাতে না জন্মায়, তারই জন্য, লৌকিকাচারের অনুবর্ত্তিতা করিয়া চলেন। উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের অন্তরালে কোনও লোকসংগ্রহেচ্ছা কখনওই দেখিতে পাই নাই। তাঁর অকৈতব স্বদেশ-

ভক্তির উপরেই এই অদ্ভুত সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আর ইহাই উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল। উপাধ্যায় তাঁর নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা আজি পর্য্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের স্বদেশ-প্রেম অতি হাল্‌কা বস্তু। আমরা এ পর্য্যন্ত গোটা দেশটাকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখি। কিয়দংশ বা তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, এরূপ ভাবে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল লাগে, তাহাকেই ভালবাসি; আর যেটুকু ভাল লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, তাহা হইতে নিজেদেরে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্ম এ নহে। ভাল-ও-মন্দ-জড়িত যে প্রেমের পাত্র প্রেমিকের চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই, সে এ ভালমন্দ-মিশ্রিত বস্তুর বা ব্যক্তির ভালকেও ভাল করিয়া বোঝে না; মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে না। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুষ্মান আর কিছুই নাই। প্রেম অপরের চাইতে কম দেখে না; বেশী দেখে। আর বেশী দেখে বলিয়াই প্রেমপাত্রের মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয়া আছে, সে তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়াই তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে না।

উপাধ্যায় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তাঁর নিকটে স্বদেশ-বস্তু যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অল্পলোকের নিকটেই সেরূপ করিয়াছে। অনেক সময় এ বিষয়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে চক্ষে স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে দেখিতেন, আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম না। অথচ উপাধ্যায় যে নিরতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, বা যেটী যেমন আছে, সেটী ঠিক তেমনি থাকুক, ইহা যে তিনি চাহিতেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাজ যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হয় না, তাহা মৃত, জড়; তার ভূত-গৌরব যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ-আশা যে কিছুই নাই, আমরা যেমন ইহা বুঝি, উপাধ্যায়ও ঠিক সেইরূপই বুঝিতেন। তাঁহাকে প্রকৃত অর্থে কিছুতেই "রি-অ্যাকষণারী" (Re-actionary) বলা সঙ্গত হইত না। অথচ, অন্যপক্ষে তিনি যে প্রচলিত অর্থে সংস্কারক বা Reformer ছিলেন, তাহাও নহে।

কারণ তিনি স্বদেশকে যে ভাবে, যতটা ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, কোনও সংস্কারকের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় না। সংস্কারকের অন্তঃপ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, আর যৌবন-কালের চারিপাশের বন্ধুবান্ধব-

দিগের জীবনে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কারক সমাজের দোষভাগের প্রতি যতটা সজাগ থাকেন, তার গুণভাগের প্রতি ততটা সজাগ থাকিতেই পারেন না; থাকিলে তাঁর সংস্কার-বাসনার বেগটা কমিয়া যায়। আর যে প্রতিনিয়ত কেবল কোনও ব্যক্তির বা সমাজের হীনতারই আলোচনা করে, এবং এইরূপ আলোচনা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই ভাবিয়া থাকে তার পক্ষে সে ব্যক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত্য ভালবাসা লাভ করা কখনওই সম্ভব হইতে পারে না। ভালবাসা সুন্দরের সাক্ষাৎ-কারেই জন্মে, সুন্দরকেই চায়, সুন্দরের সন্ধানেই ফিরে। কুৎসিতের ধ্যানে বা দর্শনে বা চিন্তনে, ভালবাসা জন্মিতেই পারে না, বাড়িয়া ওঠা বা বাঁচিয়া থাকা তো বহু দূরের কথা। অথচ সমাজসংস্কারক প্রায়ই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজ-দেহের ক্ষতস্থানগুলির চারিদিকেই সর্ব্বদা ভন ভন করিয়া বেড়ান; এরূপ না করিলে তাঁর ব্যবসায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারক অনেক সময়ই আত্ম-সম্ভাবিত, ও মদান্বিত হইয়া উঠেন। আর এ অবস্থায় ইঁহাদের পক্ষে স্বদেশকে বা স্বদেশের সমাজকে সত্যভাবে বা গভীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা আর বিচিত্র কি? উপাধ্যায় প্রথম যৌবনে কিয়ৎপরিমাণে এ জাতীয় সমাজসংস্কারক যে ছিলেন না, এমন বলা কঠিন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে ছাড়াইয়া উঠেন। বাংলা দেশে তিনি যে অভিনব দেশভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁর পরিণত বয়সের দীর্ঘসাধনলব্ধ বস্তু; যৌবনের পরকীয়া প্রীতির মোহের মরীচিকা মাত্র নহে। তাঁরই জন্য এ বস্তু এতটা সাচ্চা ও সজীব হইয়াছিল।

উপাধ্যায় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়া-ছিলেন। ইহাতেই তাঁর উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের সৌন্দর্য্য, আমাদের কদর্য্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত শক্তি প্রকাশ্য দুর্ব্বলতার মায়িকতা মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যের ধ্যান করিতেন। আমরা কি করিতেছি বা করিয়াছি তার বিচার না করিয়া আমরা কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্যই আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁর প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। এ বিষয়ে তিনি ভারতের সন্ত-সমাজ-সুলভ প্রখর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের সাধুসন্তেরা মানুষ কি আছে তাহা তত দেখেন না, সে সত্য বস্তুটী যে কি, ইহা জানেন বলিয়া, তাহার বর্ত্তমান দুর্গতি বা পাপকলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হন না। এ দু'দিনের কর্ম্মভোগ দু'দিনে ফুরাইয়া যাইবে। পথের

ধূলামাটী চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস তাঁদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহাদের প্রেমের বা আস্থার বা শ্রদ্ধার কোনও অল্পতা হয় না। উপাধ্যায়ও সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি কি ভাবে পড়িয়া আছে,তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। ভারতবর্ষ সত্য বস্তুটী কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়া তার বর্ত্তমান দুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণেও তাঁর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত না। এ মোহ যে দুদিনের, এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, এ দুর্দ্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় আপনা হইতে কালক্রমে কাটিয়া যাইবেই যাইবে;—এ বিশ্বাস উপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসেরই ফল। স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির ও লোকপ্রকৃতির উপরে উপাধ্যায়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

আর এই খানেই আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ পূর্ব্বযুগের স্বাদেশিকতার আদর্শ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে যে প্যাট্রিয়টিজম্ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শক্তি-সাধ্যের উপরে এই অবিচলিত আস্থা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ বস্তু আমাদের সে'কালের সমাজ-সংস্কারক দিগের মধ্যেও ছিল না, রাষ্ট্রসংস্কারক দলেও পাওয়া যাইত না। আর এই জন্যই প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয়-কর্ম্মচেষ্টা, উভয়ই একান্ত বহির্ম্মুখীন ও বিদেশাভিমুখীন ছিল। সুতরাং সে সময়ে আমরা আমাদের সমাজ-জীবন, ধর্ম্মসাধন, কর্ম্মচেষ্টা, রাষ্ট্রীয়-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ,—স্বাদেশিকতার সকল উপকরণ-গুলিকেই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া তৌল করিতে যাইতাম।

আর পরের মাপে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এরূপ-ভাবে আপনাকে ওজন করিতে যাইবে, তার আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কদাপি সম্ভবে না। এই কারণে আমাদের প্রথমযুগের সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার সকলপ্রকারের স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টাই আমাদিগের মধ্যে একটা গুরুতর আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। এবং এই সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি হইতে একটা পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাস জন্মিয়া গিয়া, আমাদের সর্ব্ববিধ শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও আস্ফালনকেই আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির একটা প্রবল ও নূতন কারণ করিয়া তুলে

প্রচলিত সমাজসংস্কার চেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, উপাধ্যায় এই উভয়বিধ কর্ম্ম-চেষ্টারই তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সর্ব্ববিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও পরিপুষ্ট

হইবার পথে অন্তরায় স্থাপন করিতেছিল। আবেদন-নিবেদনেই দেশের নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল, জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াও এই সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টা, সে শক্তিকে সংহত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। বরং প্রজা-সাধারণের নিজেরহাতে আত্মচেষ্টাতে কোনও স্বাদেশিক কর্ম্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসকে নষ্ট করিয়াই ফেলিতেছিল। এই জন্য উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার আদর্শটীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের কোটে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের দিকে একান্ত-ভাবে মুখ ফিরাইয়া, শান্ত ও সমাহিত ভাবে আমরা জনশক্তির সংহিতে সর্ব্ববিধ স্বাদেশিক কার্য্য সাধন করিব,—উপাধ্যায় সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বাঁধানই প্রথমাবধি যে তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্রমে, ঘটনাচক্রে, এরূপ একটা বিরোধের সূত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে উপাধ্যায় নিজে ইচ্ছা করিয়া জাগাইয়া-ছিলেন, এমন কথা ও বলা যায় না। ফলতঃ দেশের তদানীন্তন অবস্থাধীনে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বাদেশিক কর্ম্ম করা নীতিসম্মত না হইলেও, চিরদিনই যে জনমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব, উপাধ্যায় এমনটা কখনও ভাবিতেন বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে দেশ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটা রাজসিক প্রেরণা প্রদান করা আবশ্যক হয়। এই জন্যই উপাধ্যায় জীবনের শেষ দশায় এই স্বাতন্ত্র্য-নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজসিকতা ভারতের সভ্যতা ও সাধনার চিরন্তন বা উর্দ্ধতন লক্ষ্য যে নয়, উপাধ্যায় ইহা যেমন জানিতেন, এমন আর কেহ জানিতেন বলিয়াই বোধ হয় না। তবে যে সাত্ত্বিকতা চিরদিনই আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়া আছে; সেই সাত্ত্বিকতাকে জাগাইতে হইলেই, সে অবস্থায়, প্রথমে দেশব্যাপী তামসিকতাকে রাজসিকতার দ্বারা অভিভূত করা আবশ্যক। উপাধ্যায় এ সত্যটাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেই এই রাজসিকতাকে জাগাইয়া তোলা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে ভবিষ্যতের সাত্ত্বিকতার পথও উন্মুক্ত হইবে, অথচ সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক অরাজকতার প্রতিষ্ঠারও কোন বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। এই জন্যই উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে এই অভিনব স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা, তাহাদিগের চক্ষুকে আপনার উপরে নিবদ্ধ করা, নিজের হাতে দেশের কাজ দশে মিলিয়া করিলে যে শিক্ষা, যে সংযম, যে শক্তি লাভ হয়, ইহাতে আপনাদের উপরে যে আস্থা জন্মে, ও এই আস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে যে উৎসাহ, অন্তরে যে আশা, পেশিতে যে বল সঞ্চারিত হয়, এই সকলের জন্যই উপাধ্যায় এই নীতি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, নতুবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিরোধ বাধানই যে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না।

কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শটীকে ধরিতে হইলে, বিশেষভাবে তাঁর সমাজ-নীতির আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এখানেই তাঁর স্বাদেশি-কতার নিজস্ব স্বরূপটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সময়ান্তরে সে কথা বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

দশম অধ্যায়

পাষণ্ডী-বিদ্বেষ ও আত্মপ্রকাশ

তুন "প্রকাশে" একদল লোক বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। গভীর রাত্রিতে কীর্ত্তনের শব্দে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। তাহারা পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র নানা কথা বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেহো বলে এ গুলার কি হইল বাই।
কেহো বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
কেহো বলে গোসাই রুষিব ঘন ডাকে।
এ গুলার সর্ব্বনাশ হইব এই পাকে॥
কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত সম সবার ব্যভার॥
কেহো বলে কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাস বামনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা চাই॥
মনে মনে ডাকিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়

কেহ কেহ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল "যবন-রাজা নদীয়ায় কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুইখানা নৌকা বোঝাই লোক পাঠাইয়াছেন।" কিন্তু নিন্দা ভয় প্রদর্শন কিছুতেই কোনও ফল হইল না। ভক্তগণ ভক্তবৎসলের নাম করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। নিমাই পূর্ব্বেরই মত নিঃশঙ্ক চিত্তে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ বলাবলি করিতে লাগিল "এরা যে রাজাকেও ভয় করে না। রাজার লোক আসিতেছে শুনিয়াও রাজপুত্রের মত নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।" অতি বুদ্ধিমান একজন কহিলেন "এই নির্ভয়তার ভাণ পলাইবার ফিকির বই আর কিছুই নহে।" শ্রীবাস-গৃহে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেন। অনেকে রঙ্গ দেখিবার জন্য আসিয়া রুদ্ধ দ্বার দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। ইহাতেও অনেকে বৈষ্ণবগণের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং বৈষ্ণবদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য তাহারা নানারূপ উপায় খুঁজিতে

লাগিল। একদিন চাপাল গোপাল নামক এক দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে শ্রীবাসের দ্বারসম্মুখস্থ স্থান উত্তমরূপে লেপিয়া তথায় হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, মদ্যভাণ্ড প্রভৃতি ভবানীপূজার দ্রব্যজাত রাখিয়া আসিল। শ্রীবাস প্রাতঃকালে সমস্ত দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া পাষণ্ডগণের কাণ্ড দেখাইলেন। ইহার তিনদিন পরে গোপালের শরীরে কুষ্ঠলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোপাল গৌরের শরণ গ্রহণ করিলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। ব্রাহ্মণ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে গঙ্গার ঘাটে গৌরকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন "তুমি আমাকে নিদারুণ মনঃকষ্ট দিয়াছ, আমি অভিসম্পাত করিতেছি—তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হইবে।" ব্রাহ্মণের শাপে গৌরের মনে অপার আনন্দের উদয় হইল, তিনি খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তটশালিনী ভাগীরথীর তীরে দলে দলে গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল। নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। গাভীদল দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিতে বলিতে তিনি দৌড়াইয়া শ্রীবাসের গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস গৃহমধ্যে নৃসিংহদেবের আরাধনায় নিরত ছিলেন। দ্বারে পদাঘাত করিয়া নিমাই কহিলেন "শ্রীবাসিয়া, যাহাকে পূজা কচ্ছিস্ দেখিয়া যা সে সশরীরে উপস্থিত।" শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, নিমাই চতুর্ভুজ হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম ধারণ করিয়া মত্ত সিংহের মত গর্জ্জন করিতেছেন। শ্রীবাস স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। নিমাই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "শ্রীবাস, এতদিনেও তুমি আমার প্রকাশ বুঝিলে না! কোথায় তোমার চীৎকারে ও নাড়ার হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিলাম; তুমি কি না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? আর নাড়া আমাকে ছাড়িয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেল। সাধুর উদ্ধার ও দুষ্টের বিনাশের জন্য আমি আসিয়াছি। আর চিন্তা নাই শ্রীবাস, এখন আমার স্তব পাঠ কর।" প্রেমপুলকিত শ্রীবাস তখন পড়িলেন

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়।
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসম্মুখায়॥
বন্যস্রজে কবলবেত্র বিষাণ বেণু।
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন "শ্রীবাস, স্ত্রীপুত্র সকলকে আনিয়া আমার রূপ দর্শন কর ও পূজা কর এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন সস্ত্রীক শ্রীবাস বিষ্ণুপূজার্থ আহৃত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ' দ্বারা নিমাইর পূজা করিলেন। নিমাই, শ্রীবাস ও তাহার পরিবারস্থ সকলের মস্তকে চরণার্পণ করিয়া কহিলেন "শ্রীবাস, তোমাকে ধরিতে যবন-রাজা নৌকা পাঠাইয়াছে, শুনিয়া কি ভয় পাইয়াছ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কে তোমাকে ধরিবে, শ্রীবাস? যদি সত্যই নৌকা আইসে সর্ব্বাগ্রে আমি গিয়া তাহাতে আরোহণ করিব এবং আমিই সর্ব্বাগ্রে গিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইব। আমাকে দেখিয়া কি রাজা সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বলিব 'হে রাজা, তোমার কাজীদিগকে বল, তোমার শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমার হস্তী, অশ্ব ও পশুপক্ষীদিগকে কাঁদাক।' কাজীর সাধ্য নাই যে পশুপক্ষী কাঁদায়। তাহারা যখন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া থাকিবে, তখন আমি রাজাকে বলিব এই কাজীদিগের কথায় তুমি সংকীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছ? আমার শক্তি দর্শন কর।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আমি যাবতীয় পশু পক্ষী কাঁদাইব, রাজাকে কাঁদাইব, তাহার পারিষদদিগকে কাঁদাইব। আমার কথায় কি তোমার প্রত্যয় হইতেছে না, শ্রীবাস? প্রমাণ চাও? তবে এখনই দেখ।" এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী নাম্নী বালিকাকে সম্বোধন করিয়া নিমাই কহিলেন "নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ ত।" চারি বৎসরবয়স্কা নারায়ণী তখন "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া নয়ন জল ভূমিতল প্লাবিত করিল। নিমাই আবার কহিলেন "কেমন, শ্রীবাস, এখন বিশ্বাস হইয়াছে, আর ত ভয় নাই।" শ্রীবাস বিগত-ভয় হইয়া নিমাইর স্তব করিতে লাগিলেন। তদবধি শ্রীবাসের গৃহ গৌরের নিত্য বিহার-স্থল হইল।

একদিন বরাহাবতারের স্তোত্র পাঠ শুনিতে শুনিতে নিমাই বরাহভাবে আবিষ্ট হইলেন, এবং বরাহের মত গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারী গুপ্তের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমাই মুরারীকে মনে মনে বড় ভাল বাসিতেন। মুরারী তাঁহাকে স্বগৃহে প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিমাই বিষ্ণুগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং এক জলপূর্ণ ভাণ্ড সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বরাহের মত দণ্ড দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাইর মানুষমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্থলে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। মুরারী ভীত হইয়া স্তব করিতে করিতে বলিলেন "হে বরাহরূপী নারায়ণ, বেদেও যখন তোমার তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত নহে, তখন ক্ষুদ্র আমি তোমাকে কি বুঝিব? তুমি আপনিই আপনাকে জান এবং তুমি যাহাকে কৃপা কর সেই কথঞ্চিৎ তোমাকে জানিতে পারে।" বরাহমূর্ত্তি তখন বেদ নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে করে এই মত বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥

ভক্তিবিহ্বল মুরারী রোদন করিতে লাগিলেন।* এইরূপে ভক্তগণ একে একে

নিমাইর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। পাষণ্ডীভয় বিদূরিত হইল। হাটে ঘাটে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়

নিত্যানন্দ ও পুণ্ডরীক মিলন, অদ্বৈত কর্ত্তৃক নিমাইর পরীক্ষা

রাঢ় প্রদেশে একচাকা গ্রামে হাঁড়াই পণ্ডিত নামক একজন পরদুঃখকাতর সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নিত্যানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিত্যানন্দের জননীর নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ শৈশব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই নিমাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হন, তখন নিত্যানন্দ এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া গ্রামবাসিগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পল্লীস্থ বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণলীলার ও রামলীলার অভিনয় করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক সন্ন্যাসী তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। হাঁড়াই পণ্ডিত পরম সমাদরে অতিথিসৎকার করেন। গমনকালে সন্ন্যাসী হাঁড়াই পণ্ডিতকে কহিলেন "আমার সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ না থাকায়, তীর্থপর্য্যটনে আমাকে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার সঙ্গে দেও, আমি তাহাকে পরম যত্নে রক্ষা করিব।" পুত্রবৎসল পিতা ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর প্রার্থনায় মর্ম্মাহত হইলেন, জননীও পুত্রবিচ্ছেদাশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অতিথির প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে অক্ষম হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণদম্পতি সন্ন্যাসীর হস্তে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিলেন।

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এবং একাকী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে পথে একদিন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মাধবেন্দ্র পুরীর দর্শন লাভ করিলেন। মাধবেন্দ্রকে দেখিয়াই নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মাধবেন্দ্রও নিত্যানন্দের দর্শনে সংজ্ঞাহীন হইলেন। এই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রের শিষ্যগণ রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত অবস্থানের পর নিত্যানন্দ তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, বিজয়ানগর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করতঃ নীলাচলে গমন করিলেন। দূর হইতে জগন্নাথের ধ্বজা দেখিতে পাইয়া নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছা অপগত হইলে জগন্নাথ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে গঙ্গাসাগর দেখিয়া মথুরায় গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবদ্বীপে গৌরের আবির্ভাব সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অচিরেই মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং নন্দন আচার্য্য নামক এক পরম ভাগবতের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নন্দনাচার্য্যের গৃহে নিত্যানন্দের আগমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে নিমাই ভক্তগণের সহিত একত্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "বন্ধুগণ দুই তিন দিনের মধ্যেই আমরা এক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিব।" নিত্যানন্দের আগমনের দিন কহিলেন "গতরাত্রিতে আমি এক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। দেখিলাম আমার দ্বারদেশে এক তালধ্বজ রথ; তৎপশ্চাতে এক বিশালকায় পুরুষ, তাঁহার স্কন্ধে এক বিপুল স্তম্ভ, বাম হস্তে বেতবাঁধা এক কাণা কুম্ভ, তাঁহার পরিধান নীলবসন, মস্তকে নীলবস্ত্রের আবরণ, বামকর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল, তাঁহার গতি চঞ্চল; দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 'এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের ?' আমি সেই ভীষণ মূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন 'আমি তোমার ভাই, কাল আমাদের পরিচয় হইবে'।" এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইর ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তিনি হলধর ভাবে আবিষ্ট হইয়া "মদ আন, মদ আন" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। তখন

'আর্য্যা তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সংকর্ষণ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই সকলকে কহিলেন "নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। হরিদাস ও শ্রীবাস তোমরা গিয়া দেখিয়া আইস। হরিদাস ও শ্রীবাস সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া কাহারও উদ্দেশ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণ সহ বহির্গত হইলেন এবং একেবারে নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া তথায় নিত্যানন্দের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ পরস্পরের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রীবাস ভাগবত হইতে আবৃত্তি করিলেন

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্‌বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীর্ত্তিঃ॥"

ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুম, কণককপিশবস্ত্র ও বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া, নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ অধরসুধা দ্বারা বেণুরন্ধ্রসমূহ পরিপূর্ণ করিতে করিতে গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বকীয় চরণচিহ্নশোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা হইল। নিমাই "পড়, পড়" বলিয়া শ্রীবাসকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছান্তে নিমাই সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ ভয়সন্ত্রস্তভাবে "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। নিত্যানন্দের ভাবোন্মাদ লক্ষ্য করিয়া গৌরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ছুটিল। কিন্তু নিত্যানন্দের ভাবাবেশ সহজে অপগত হইবার নয়।

গড়া গড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে,
কলেবর পূর্ণ হইল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস॥

ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহুতাল
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥

অবশেষে সেই উন্মাদবপু নিমাই স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলে, নিতাই নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নিতাই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে নিমাই কহিলেন "এই কম্প, এই অশ্রু ও এই গর্জ্জন কখনও ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন সম্ভাবিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হইয়া তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কোন্ দেশ হইতে তোমার আগমন হইয়াছে, ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।" নিত্যানন্দ কহিলেন "আমি তীর্থ ভ্রমণ করিতেছিলাম; কৃষ্ণের পদরেণুপূত বহুস্থান দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে দেখিতে পাই নাই। অবশেষে এক মহাত্মার নিকট যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'এত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোথায় গিয়াছেন?' তখন তিনি বলিলেন 'কৃষ্ণ গৌরদেশে গমন করিয়াছেন।' নদীয়ায় সংকীর্ত্তনের কথা শুনিয়া অনেকে আমাকে বলিল 'নদীয়ায় নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' কত পাতকী এখানে আসিয়া ত্রাণ লাভ করিতেছে। আমিও পরিত্রাণলাভের আশায় এখানে আসিয়াছি।

কিছুক্ষণ এইরূপে প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে নিমাই কহিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই, আগামী কল্য ব্যাসপূজার দিন। আপনার ব্যাসপূজা কোথায় সম্পন্ন হইবে?" নিত্যানন্দ তখন সমীপস্থ শ্রীবাসের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "এই ব্রাহ্মণের ঘরে আমার ব্যাস-পূজা হইবে।" অনন্তর সকলে শ্রীবাসের গৃহে গমন করতঃ গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাস-পূজার অধিবাসের উল্লাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণপরিবেষ্টিত নিমাই ও নিতাই নৃত্য করিতে করিতে কখনও হুঙ্কার কখনও রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরীর স্বেদ, কম্প ও পুলকের লীলাস্থানে পরিণত হইল। কখনও পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া উভয়ে রোদন করিলেন, কখনও বা পরস্পরের চরণ ধারণের চেষ্টা করিলেন, কখনও বা ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। বাহ্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, বসন খসিয়া পড়িল। অচিরেই গাত্রোত্থান করিয়া উভয়ে পুনরায় বিপুল উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন

অনন্তর নিমাই অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া খট্টার উপর উপবিষ্ট হইয়া "মদ আন, মদ আন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং নিত্যানন্দকে কহিলেন, "শীঘ্র আমাকে হল-মুষল প্রদান কর।" নিতাই নিমাইর হস্তের উপর স্বীয় হস্ত পাতিয়া দিলেন। কেহ কেহ তখন নিমাইর হস্তে হল-মুষল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতঃপর নিমাই "বারুণী, বারুণী" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। নিমাইর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সকলে পরামর্শ করিয়া একঘটি গঙ্গাজল লইয়া গেলে, নিমাই তাহা পান করতঃ "নাড়া, নাড়া" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহাকে ডাকিতেছ, প্রভু, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন নিমাই কহিলেন "আর কাহাকে ডাকিব?

যাহার আহ্বানে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই নাড়া অদ্বৈত আচার্য্য আমাকে ছাড়িয়া গিয়া এখন হরিদাসের সহিত নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাইতেছে।

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে করি কীর্ত্তন পায়ার॥
বিদ্যাধন কুলমদ তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার অপরাধ আছে॥
সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ।
নাগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥”

নিমাই ক্ষণকাল পরেই প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?” কিন্তু নিত্যানন্দের আবেশ-ভঙ্গ হইল না। তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু কোথায় চলিয়া গেল, বসন কোথায় বিক্ষিপ্ত হইল, কিছুই ঠিকানা রহিল না। নিমাই তাঁহাকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং তাঁহাকে শ্রীবাস-গৃহে রাখিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

রাত্রিকালে নিতাই স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃকালে এই সংবাদ পাইয়া নিমাই শ্রীবাস-গৃহে আসিয়া দেখিলেন, নিতাই অনবরত হাস্য করিতেছেন। অনন্তর ভক্তগণসহ নিতাইকে লইয়া নিমাই গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, এবং স্বহস্তে নিতাইর ভগ্নদণ্ড গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিলেন। গঙ্গা দেখিয়া নিতাইর আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কখনও বালকের মত নানাভাবে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা কুম্ভীর দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন সেই প্রৌঢ়-শিশুকে ব্যাস-পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিমাই তাহার সহিত শ্রীবাস-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীবাস-গৃহে সুমধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেই সংকীর্ত্তনানন্দের মধ্যে নিতাই ব্যাসপূজার সুগন্ধি মাল্য নিমাইর গলদেশে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাইর মানুষমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষলধারী ষড়-ভুজ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়-ব্যস্তভাবে “রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” বলিয়া উঠিলেন। নিতাই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অতঃপর নিমাই সেই অমানুষীরূপ সংবরণ করতঃ নিতাইর অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া তাহার চৈতন্য বিধান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণধ্বনি সমুত্থিত হইল। ভক্তগণের বিহ্বল নৃত্যে দিবা অবসান হইল। নিমাই প্রদোষে স্ব-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

নিতাই শ্রীবাস-গৃহেই রহিয়া গেলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী নিতাইকে দেখিয়া অবধিই তাঁহাকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেছিলেন। নিতাই মালিনী দেবীকে মাতৃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সহিত শিশুর মতই আচরণ আরম্ভ করিলেন। মালিনী দেবী খাওয়াইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হইত না; খাইবার সময় অন্ন ছড়াইয়া ফেলা তাঁহার নিত্য অভ্যাসের মধ্যে ছিল। পল্লীস্থ বালকবৃন্দ তাঁহার খেলার সাথী হইল। তাহাদের সহিত গঙ্গায় যাইয়া তিনি তাহাদেরই মত সন্তরণ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত হাস্যপরিহাসে তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। তাঁহার বালকবৎ উৎপাত অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত—কিন্তু

কেহই তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেন না। শ্রীবাসকেই নিতাইর অত্যাচার অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইত—কিন্তু ক্ষণ কালের জন্যও তাঁহার মনে তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই। এক দিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিমাই কহিলেন "শ্রীবাস, এই অবধূতের জাতি-কুলের ঠিকানা নাই, যদি জাতি রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সত্বর ইঁহাকে বিদায় করিয়া দেও।" শ্রীবাস বিনীত ভাবে কহিলেন "প্রভু, আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও! তবে শোন। নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনী গ্রহণও করেন, যদি তিনি আমার জাতি, প্রাণ, ধন সমস্তই নষ্ট করেন, তবুও তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শিথিল হইবে না।" নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন "শ্রীবাস, তোমার এই অচলা ভক্তির জন্য আমি এই বর দিতেছি যে, তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।"

ইহার কিছুদিন পরে শচীদেবী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন; নিমাই ও নিতাই পাঁচবৎসরের শিশু হইয়া মারামারি করিতে করিতে দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মন্দির হইতে কৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহ বাহির করিয়া আনিলেন। নিমাইর হাতে বলরাম ও নিতাইর হাতে কৃষ্ণ। তখন বিগ্রহদ্বয় নিমাই ও নিতাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এই সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ঘর-বাড়ী আমাদের, তোরা দুই ডাকাইত কেরে?" নিতাই বলিলেন "এখন আর গোয়ালার অধিকার নাই, এখন ব্রাহ্মণের অধিকার আরব্ধ হইয়াছে; দধি দুগ্ধ লুঠিয়া খাইবার কাল আর নাই। এখন যদি অবস্থা বুঝিয়া চলিতে না পার, যদি এই সমস্ত উপহারে তোমাদের পুরাতন স্বত্ব ত্যাগ না কর, তাহা হইলে মার খাইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিমাই ও নিতাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। নিতাই কহিলেন "কৃষ্ণের দোহাই আর দিতে হইবে না। এখন আর কৃষ্ণের ভয় কে করে? বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।" তখন চারিজনের মধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। সকলে পরস্পরের হাত ও মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তখন নিতাই শচীকে ডাকিয়া কহিলেন "মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দাও।" অমনি শচীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে শচী নিমাইকে ডাকিয়া তাহার নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, নিমাই হাসিয়া কহিলেন "মা আমাদের গৃহদেবতা বড়ই প্রত্যক্ষ। আমি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি, নৈবেদ্যের অর্দ্ধেক অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার সন্দেহ হইয়াছিল তোমার বৌ বুঝি নৈবেদ্য চুরি করিয়া খায়। কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার সে সন্দেহ দূর হইল। অন্তরাল হইতে স্বামীর পরিহাস শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমাই মাতার আদেশক্রমে নিতাইকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ কালে নিতাইকে সাবধান করিয়া নিমাই কহিলেন "নিতাই তোমাকে নিমন্ত্রণ ত করিলাম; কিন্তু কোনও

রূপ চঞ্চলতা করিতে পাইবে না।" নিতাই মহা গম্ভীর হইয়া বিষ্ণু স্মরণ করিলেন এবং কহিলেন "আমি কি তোমার মত পাগল?" যথাসময়ে নিতাই ও নিমাই ভোজনে উপবেশন করিলেন। শচীদেবী পরিবেশন কালে একবার রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—পাঁচ বৎসর বয়স্ক দুই শিশু ভোজন করিতেছে; তন্মধ্যে একজন শুক্লবর্ণ, দ্বিতীয়টী কৃষ্ণবর্ণ, উভয়েই চতুর্ভুজ, উভয়েই দিগম্বর, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ শিশুর অঙ্কে স্বীয় পুত্রবধূ বিরাজমানা। এই অপরূপ দৃশ্যে শচী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি

দিল্লীর বোমা-বিভ্রাট কে ঘটাইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কখনও পাওয়া যাইবে কি না ভগবান জানেন। নানা লোকে নানা কল্পনা-জল্পনা করিতেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারের অন্তরালে এদেশের বা অন্যদেশের কোনও বিপ্লবপন্থীদলের ষড়যন্ত্র আছে কি না, বলা অসম্ভব, কিন্তু যে বা যাহারাই এই আততায়ীর কর্ম্ম করিয়া থাকুক না কেন, তাহার বা তাহাদের নীতির বা কর্ম্মের সঙ্গে দেশের লোকের কোনও শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের যে তিল পরিমাণ সহানুভূতিও নাই, আর এ কথাটা অস্বীকার করা চলে না

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম এদেশে এই বিদেশী উপদ্রবের আমদানী হয়, তখনও অনেকে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতি করিয়া, সে অহিতাচারের প্রতি আপনাদের ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সে সকল প্রতিবাদের মধ্যে আজিকার এই গভীর আন্তরিকতা দৃষ্ট হয় নাই.

বলা বাহুল্য যে, চিন্তাশীল, সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞেরা কোথাও এ সকল ষড়যন্ত্রের সমর্থন করেন না। কিন্তু সকল দেশেই প্রকৃত নীতিজ্ঞের বা Statesmanএর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। প্রকৃত নীতিজ্ঞ হইতে গেলে একদিকে সর্ব্বদা আত্মস্থ হইয়া থাকিতে হয়। অন্যদিকে লোক-চরিত্রের গভীর জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। আত্মস্থ থাকিয়া, ভালমন্দ সকল অবস্থাতে জন-সমাজের নিত্য লক্ষ্যটীকে যিনি ধরিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত নীতিজ্ঞ বা Statesman. এইরূপ নীতিজ্ঞ কর্ম্মনায়কই আগন্তুক লাভালাভ বা আকস্মিক সুবিধা-অসুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া জনসমাজকে আপনার সনাতন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন।

কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনার মধ্যে এমন একটা ক্ষুদ্রতা ও সম্প্রদায়গত রেষারেষি জাগিয়া থাকে যে, এই সকল আন্দোলন-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, অনেকের পক্ষেই যথাযোগ্যভাবে আত্মস্থ হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষত

যেখানে শাসক-শাসিতের পরস্পরের স্বত্ব ও অধিকারের প্রতিদ্বন্দিতার উপরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়, আর শাসিত সম্প্রদায়ের শক্তি অসংহত ও অকর্ম্মঠ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং শাসকসম্প্রদায়ের শক্তি সুসম্বদ্ধ ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া শাসিতদিগকে সর্ব্বদা তটস্থ করিয়া রাখে, সেখানে এই শক্তি-সংঘর্ষে দুর্ব্বলতর পক্ষের অধিনায়কগণের অভিমানে পদে পদে নিদারুণ আঘাত লাগা একরূপ অনিবার্য্য হইয়াই উঠে। সে অবস্থায় ইহাঁদের পক্ষে আত্মস্থ থাকা বা দুরদর্শিনী নীতির অনুসরণ করিয়া চলা সর্ব্বদা সম্ভবও হয় না। য়ুরোপের আধুনিক গণতন্ত্রতার আদর্শ সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে, বহুবিধ প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া, একটা নিত্য বিরোধ ও বিক্ষেপের সৃষ্টি করিতেছে। এই কারণে সকল দেশেই প্রকৃত নীতিজ্ঞতা বা Statesmanship'ও স্বল্পবিস্তর কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আর প্রকৃত নীতিজ্ঞতার অভাবে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শটা স্বল্পাধিক হীন হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই যে লোকে কোনও না কোনও আকারের বৈপ্লবিক ভাবের তাড়নায় ক্রমশঃ একটা প্রলয়ঙ্করী অরাজকতার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, নীতিজ্ঞতার অপচয়ই ইহার প্রধান কারণ। কেননা, দূরদর্শী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ নীতিজ্ঞ বা Statesmanই কেবল রাষ্ট্রীয় জীবনেও যে অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের, আততায়িতার দ্বারা স্বাধীনতার, অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না ও কখনওই হইতে পারে না, ইহা জানেন ও বুঝেন। বিদ্বেষবিক্ষিপ্ত, আত্মবিস্মৃত, নাস্তদন্তীতিবাদী, আশুফললিপ্সু মামুলী রাজনীতিকের বা Politicianএর পক্ষে এ জ্ঞানলাভ সহজ নহে। এই জন্যই বাংলায় বোমার আমদানীতে দেশের প্রকৃত নীতিজ্ঞেরা ভীত এবং ক্ষুব্ধ হইলেও, দেশের সকল লোকেই যে প্রথমে ইহার গুরুতর অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, এমন বলা যায় কি না, সন্দেহ।

সে সময়ে দেশে একটা নিদারুণ অশান্তি জাগিয়া ছিল। নানা কারণে বিদেশীয় শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের শাসিতসম্প্রদায়ের একটা বিষম বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। সেই বিরোধের বিক্ষেপ-বিক্ষোভের মধ্যে যখন সহসা একটা বোমার ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন ব্যাপারটা যে কি ভয়ানক ও গুরুতর সকল লোকে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। স্বদেশ-সেবার নামে, এই জাতীয় আততায়িতা যদি দেশের উদারমতি কিন্তু অপরিপকবুদ্ধি যুবকগণের মধ্যে সাধুকর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া যায়, তাহাতে যে কেবল রাজার উদ্বেগ বাড়িবে তাহা নহে, কিন্তু প্রজারও সর্ব্বনাশ হইবে,—আমাদের অভিনব স্বদেশ-পূজা যদি এই তন্ত্র অবলম্বন করে, তাহাতে আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সনাতন সাধনা, আমাদের বিশেষ সমাজগঠন ও নিজস্ব লোক-প্রকৃতি, যাহাকে লইয়া আমাদের জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা

তাহাতে যে এ সমুদায়ই একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে,—এ সকল কথা সকল লোকে ভাবিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন কি কেহ কেহ সেই বোমা-ষড়যন্ত্রের মধ্যে কেবল গুটিকতক শুদ্ধ-চরিত্র, স্বদেশ-প্রাণ যুবকের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের সংকল্পই দেখিল। আর এই সকল যুবকেরা গুরুতর অপরাধে অভি-যুক্ত হইয়াও যখন অকুতোভয়ে আপনাদের অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল, স্বজন-বর্গের সর্ব্ববিধ অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, কোনও প্রকারে মিথ্যা-প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে আপনাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে রাজী হইল না; প্রাণদণ্ডের বিভীষিকা মাথায় লইয়া দীর্ঘকাল কারাবাসেও যখন ইহাদের স্থৈর্য্যের বা সংযমের, প্রশান্ততার বা প্রসন্নতার একটুও লাঘব হইল না; তখন কোনও কোনও অসম্যকদর্শী লোকে হয় ত এই সকল যুবকগণের ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার গুরুত্বের যথাযোগ্য পরিমাণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। আর এই সকল কারণেই পাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার বোমার উৎপাতের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে যেন আজিকার গভীর আন্তরিকতা দেখা যায় নাই।

আজ এ সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বহুদিন পরে একজন সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞ বা Statesman ভারত-শাসনভার গ্রহণ করিয়া, দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সঙ্গে নবোত্থিত প্রজাশক্তির একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সাধনের পথ ধরিয়া চলিতেছেন। সকলে না হউক, দেশের লোকনায়কগণের অনেকেই স্বল্পবিস্তর এ কথাটা বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। লাট হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি কোন্ সুদূর লক্ষ্যের সন্ধানে চলিয়াছে, অনেকেই হয় ত এখনও তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। লাট হার্ডিঞ্জের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যনীতি যে লাট রিপণের স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি অপেক্ষা কত গভীর ও কত উদার—এই নীতির যথাযোগ্য অনুসরণের উপরে ইংলণ্ডের, ভারতের ও সমগ্র ব্রিটিশসাম্রাজ্যের, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগতের, ভবিষ্যৎ শান্তি ও উন্নতি কতটা পরিমাণে যে নির্ভর করিতেছে—লাট হার্ডিঞ্জ যে এই নীতির মধ্যে ভারতের স্বারাজ্য-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-সম্পদ-রক্ষার একটা চিরন্তন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সূত্রপাত করিয়াছেন,—এ সকল কথা অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হার্ডিঞ্জ-নীতির নিগূঢ় মর্ম্ম যাঁহারা বুঝিতে বা ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই নীতিপ্রভাবে বিগত আটদশ বৎসরের দুঃস্বপ্নটা যে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিতেছেন। লাট মিণ্টোর আত্মঘাতিনী নীতি যে পরিত্যক্ত হইয়াছে,—প্রকৃতিপুঞ্জের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে উদ্যত রাজদণ্ড দেখাইয়া শান্ত সমাহিত করা অসাধ্য, ইতিহাসের এই সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়া লাট হার্ডিঞ্জ যে প্রজাতাড়ন চেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক প্রজারঞ্জন

চেষ্টা করিতেছেন,—শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোথাও একটা স্থায়ী বিরোধ জাগাইয়া রাখা নীতিসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি যে সম্রাটকে মধ্যস্থ করিয়া, বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাটা উলটাইয়া দিয়া রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন,—এ সকল কথা সাধারণ লোকেও মোটামুটি বুঝিয়াছে। আর এটী বুঝিয়াছে বলিয়াই সকল সম্প্রদায়ের লোকে লাট হার্ডিঞ্জকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁহার উপরে এই আততায়িতার আক্রমণে দেশের সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকে এক বাক্যে এমন আন্তরিকতা সহকারে এ সময়ে এতটা সমবেদনা কেবল প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে; সত্য সত্যই অন্তরে অন্তরে অনুভবও করিতেছে।

কিন্তু লাট হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সমবেদনা কিম্বা এই আততায়ী কর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। কেবল শাসনে বা প্রতিবাদে এ সকল সামাজিক ব্যাধির আরোগ্য হয় না। আততায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যদি কখনও ধরা পড়ে, এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলেই যে এ উৎপাত একেবারে থামিয়া যাইবে এমন কল্পনা করাও যায় না। এই উপদ্রব কে ঘটাইল জানি না, কখন জানিব কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যেই ঘটাক না কেন, সে যে স্বদেশের ও স্বাদেশিকতার বিষম শত্রু এ কথা ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। যাঁরা আজ লাট হার্ডিঞ্জের প্রতি স্বল্পবিস্তর শ্রদ্ধাবশতঃ এই আততায়ী কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁরাও সকলে যে এই কাজটা সত্য স্বাদেশিকতার কত বড় শত্রুতা সাধন করিয়াছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অপরে এই আততায়ী কর্ম্মের ফলে বুঝি বা দেশে পুনরায় লাট মিণ্টোর কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়, এই ভয়ে ইহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও এই দুষ্কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। আর যতদিন দেশের জনসাধারণে এটী ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়াছেন, ততদিন কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তরে কোনও না কোন আকারে বিদেশীয় বিপ্লব-পন্থীদিগের এই সকল আসুরিক কর্ম্মের প্রতি স্বল্পবিস্তর সহানুভূতি থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

এই সকল বিপ্লবপন্থীর কর্ম্মচেষ্টার সঙ্গে আমাদের সত্য স্বাদেশিকতার কোনও প্রকারের সঙ্গতি-সাধন যে একেবারে অসম্ভব, চিরদিন ইহা জানিতাম ও বুঝিতাম। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবধি যখনই এই সকল ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তখনই প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদও করিয়াছি। কিন্তু লাট মিণ্টোর শাসনকালে যথাযোগ্য ভাবে এই বিষম রোগের প্রতীকার করিবার উপযুক্ত অবসর আমরা পাই নাই। রাজপুরুষেরা তখন আমাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদই চাহিতেন, ইহার প্রতীকারের ভার আমাদের উপরে অর্পণ করিতে সাহস পান নাই। রোগের প্রতীকার করিতে হইলে প্রথমে তাহার নিদান-নির্ণয় আবশ্যক।

আর এই নিদান নির্ণয় করিতে গেলেই লাট মিণ্টোর কঠোর ও অদূরদর্শী শাসন-নীতিরও যথাযোগ্য সমালোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িত। মিণ্টোর শাসনকালে এরূপ সমালোচনা সম্ভব ছিল না, সুতরাং দেশের লোকনায়কগণের পক্ষে সত্যভাবে ও সম্যকরূপে এই রোগের প্রতীকার-চেষ্টারও অবসর ছিল না। বিধাতার কৃপায় লাট হার্ডিঞ্জের শাসনাধীনে এ অবসর আমরা পাইয়াছি। মিণ্টো-শাসনের নূতন আইন-কানুন রদ হইয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু সে সকল বিধি-ব্যবস্থার বিভীষিকা দেশে আর জাগিয়া নাই। শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু বর্ত্তমান বড়লাটের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সম্যক্‌দর্শী নীতিজ্ঞতার গুণে শাসনের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অপঘাত-বেদনা-পীড়িত হইয়াও লাট হার্ডিঞ্জ মুহূর্ত্তের জন্যও নীতি-ভ্রষ্ট হয়েন নাই। ভারতশাসনে তিনি যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এই সকল আত্মঘাতী আততায়িতার দ্বারা কেশাগ্র পরিমাণেও যে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না,—রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি এই আশ্বাস প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং এ সময়ে সর্ব্বতোভাবেই স্বদেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষি-গণের পক্ষে লাট হার্ডিঞ্জের সমীচিন শাসন-নীতির সমর্থন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বাদেশিকতার সঙ্গে লাট হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতির সম্পূর্ণ সঙ্গতি না থাকিলে কখনই এমন কথা বলিতাম না। লাট কার্জ্জন এবং তাঁহার পরে লাট মিণ্টো যে নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, তাহার সঙ্গে এই স্বাদেশিকতার সঙ্গতি থাকা দূরের কথা, বরং একটা প্রবল বিরোধই জাগিয়া ছিল। এ বিরোধ না থাকিলে, এই কয় বৎসর দেশে যে অশান্তি জাগিয়া ছিল তাহাও জাগিত না। লাট কার্জ্জন সর্ব্বতোভাবে ব্রিটিশের স্বার্থকে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ভারত-বাসীর স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের সাম্রাজ্য-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যনীতিকে তিনি কিছুতেই মিলাইতে মিশাইতে পারেন নাই। সুতরাং লাট কার্জ্জনের শাসনকালে ভারতের স্বাদেশিকতা কিয়ৎপরিমাণে গভর্ণমেণ্টের দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। লাট মিণ্টোও কার্য্যতঃ লাট কার্জ্জনের শাসননীতিরই অনুসরণ করেন, সুতরাং তাঁহার শাসনকালেও স্বাদেশিক লোকনায়কগণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাহচর্য্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। লাট মিণ্টো উদ্যত শাসনদণ্ড দেখাইয়া, আমাদের প্রাণগত স্বাদেশিকতাকে বর্জ্জন করিয়া, তাঁহার গভর্ণমেণ্টের একান্ত আনুগত্য গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর those who are not with us, are against us অর্থাৎ যাহারা আমাদের পক্ষে নয় তাহারা আমাদের বিপক্ষে, এই বলিয়া, শুদ্ধ এই সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া, অপরাধী-নিরপরাধী-নির্ব্বিশেষে দেশের সকল স্বাদেশিকতাকেই ব্রিটিশ-শাসনের স্বল্পবিস্তর শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ অদূরদর্শিতার দ্বারা যাহারা বাস্তবিক শত্রু

নহে, তাহাদিগকেও যে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে পারা যায়, লাট মিণ্টো এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরা এ মোটা কথাটাও, মনে হয়, বুঝি বা লক্ষ্য করেন নাই।

লাট হার্ডিঞ্জ ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি না কি একবার বলিয়াছিলেন যে Nagging is not administration; অর্থাৎ খোঁচান আর শাসন করা এক কথা নহে। এই জন্য তিনি কারণে অকারণে অথবা সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া দেশের কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে খোঁচাইতে চান নাই। অন্যদিকে আমাদের স্বাদেশিকতার মূল লক্ষ্যটীকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয়। বিগত বৎসর বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার প্রস্তাব করিয়া তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন' তাহাই ইহার সাক্ষী। এই মন্তব্যে তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের বা provincial autonomyর আদর্শটীকে ব্রিটিশ-শাসননীতির অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। লাট হার্ডিঞ্জের মত সুবিজ্ঞ ও সম্যক্‌দর্শী নীতিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা provincial autonomy প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা National autonomyকে যে চিরদিন ঠেকাইয়া রাখা অসাধ্য, এমন সোজা কথাটাও যে বোঝেন না ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। Provincial autonomy বা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের পশ্চাতে national autonomy বা স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্য যে আসিবেই আসিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। সুতরাং লাট হার্ডিঞ্জ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শটীকে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিয়া, কার্য্যতঃ স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শও গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই জন্যই ভারতের স্বাদেশিকতার সঙ্গে হার্ডিঞ্জ-নীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই।

কোন আদর্শের দর্শন লাভ করিলেই অমনি যে তাহা চরিত্রে বা জীবনে, অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে একেবারে গড়িয়া উঠে, তাহা নহে। কি ব্যক্তিগত জীবনের, কি সামাজিক জীবনের,—সকল উদার ও উন্নত আদর্শগুলিকেই গুরুদত্ত মন্ত্রের ন্যায়, বহুকাল ধরিয়া ধ্যান ও ধারণা করিতে হয়। দীর্ঘকালব্যাপী শাসন-সংযমের অনুসরণ করিয়া, জীবনের বা সমাজের ক্ষেত্রকে সেই আদর্শের সম্যক্ প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং মন্ত্রলাভ আর সিদ্ধিলাভ যেমন এক কথা নহে, সেইরূপ কোন আদর্শকে লাভ করা ও তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা এক কথা নহে। অতএব আমরা স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ লাভ করিয়াছি বলিয়া, এখনই যে সে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, এমন কল্পনাও করা যায় না। এ বিষয়ে এত অধীর হইলে চলিবে না। অধৈর্য্য সকল ক্ষেত্রেই সাধনার বাদী। যেমন ধর্ম্ম-জীবনে সেইরূপ রাষ্ট্রীয়জীবনেও দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনা করিতে করিতে প্রবর্ত্তাবস্থার অনেক ভুল-ভ্রান্তি অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই সংশোধিত হইয়া যায়। এইরূপেই শিষ্য আপনার পূর্ব্ব সংস্কার-বশতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গুরুদত্ত মন্ত্রের যে কদর্থ করিয়া লয়, সাধনের

অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাও সংশোধিত হইয়া, অন্তরগত মোক্ষের আদর্শ ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট ও সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠে। অতএব আমরা নবজাগরণের প্রথম উল্লাসে স্বাদেশিকতার যে ছবি আমাদের অন্তরে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে তাহার যথাযোগ্য সঙ্গতি সাধন করিতে যাইয়া যে সে ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে না বা হইবে না ইহাও অসম্ভব। আর এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে লাট হার্ডিঞ্জ আপনার মন্তব্যে যে আদর্শের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শ নহে, এমন কথাও বলিতে পারি না।

লাট হার্ডিঞ্জ ইংরেজ। ব্রিটিশের স্বার্থের প্রতি অন্ধ হইয়া চলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহার উপরে ভারতের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। ব্রিটেনের অনিষ্ট করিয়া ভারতের ইষ্ট-সাধনের জন্য চেষ্টা করিলে, লাট হার্ডিঞ্জকে বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিতে হয়। সুতরাং ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশের সকল সম্পর্ক চুকিয়া যাউক এমন নীতির অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অসঙ্গত। তাঁর শাসননীতির লক্ষ্যও ইহা নহে। অন্যদিকে তিনি জানেন যে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইলে, দেশের এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থাধীনে, কার্জ্জনের বা মিণ্টোর নীতির অনুসরণ করিলে চলিবে না। সমগ্র জগত যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সন্ধানে ছুটিয়াছে, ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জকে সে পথ হইতে সরাইয়া রাখা বা প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব নহে। সুতরাং ভারতের নবজাগ্রত স্বারাজ্য-আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া নির্ম্মূল করিতে হইবে, ব্রিটিশ শাসনের বর্ত্তমান সমস্যাও ইহা নহে। কিরূপে এই আকাঙ্ক্ষার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াও, ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কটা বজায় রাখিতে পারা যায়, ভারত-শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতিজ্ঞদিগের সম্মুখে এই সমস্যাই আজ উপস্থিত হইয়াছে। যে পথে এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভব, লাট হার্ডিঞ্জ সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই তাঁহার এই সমীচিন শাসননীতির সমর্থন ও অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

আর ভারতের সত্য স্বাদেশিকতার পক্ষেও এই একই বিধান। জগতের সভ্যতাভিমানী জাতি সকল আপনাদিগের দেশে যে সকল অধিকার ও অবসর ভোগ করিয়া থাকে, ভারতবর্ষের লোকেরা নিজেদের দেশে সেই সকল অধিকার ও অবসর লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের সার্থকতা সাধন করুক, ভারতের স্বাদেশিকতা ইহাই চায়। স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অন্য কোন অর্থ আছে বলিয়া জানি না। জগতের আর সকল জাতির সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া না থাকিলে যে আমাদের জাতীয় জীবনের এই সার্থকতা-সাধন অসম্ভব, এমনও বলা যায় না। আর ব্রিটিশের সঙ্গেও আমাদের এমন একটা সম্বন্ধ তো কল্পনা করিতে

পারা যায়, যে সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের স্বাদেশিকতার সার্থকতা সম্পাদনে কোনোই ব্যাঘাত উৎপন্ন হইবে না। ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও ব্রিটিশের সঙ্গে বিবিধ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ. কিন্তু এ সম্বন্ধ তো তাহাদের স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যকে বিন্দু পরিমাণও সঙ্কুচিত করে নাই। ক্যানেডা প্রভৃতির সঙ্গে ব্রিটিশের যে সম্বন্ধ আজ আছে; আমাদের সঙ্গে কখনই সে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে না, জানি। এ সম্বন্ধ স্বল্পবিস্তর রক্তের সম্বন্ধ। ইংরেজের উপর ভারতের সে সম্বন্ধের দাবী নাই, এবং কখনও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি যে পথ ধরিয়া চলিতেছে তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই ক্যানেডা প্রভৃতির সঙ্গেও ইংলণ্ডের একটা নূতন সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে হইবে, নতুবা কেবল বর্ত্তমান রক্তের সম্বন্ধের উপরে এত বড় সাম্রাজ্যটাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। এই নূতন সম্বন্ধ Federationএর আকার ধারণ করিবে। আর এই Federationএর আদর্শেতে ভারতের স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-সম্পদের একটা সঙ্গতিসাধন সম্ভব। লাট হার্ডিঞ্জ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহার শাসন-নীতি এই Federationএর পথ লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে। এই জন্যই তিনি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির প্রতিনিধি হইয়াও আমাদের স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শটীকে আপনার শাসননীতির মধ্যে বরণ করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন।

আর এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই, তাঁহার উপরে যাহারা আততায়ীর মত এই আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বদেশের ও স্বাদেশিকতার ঘোরতর শত্রু বলিয়া মনে করি। বিধাতার কৃপায় লাট হার্ডিঞ্জ রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া ভারতের, বিলাতের, এবং জগতের কল্যাণ কল্পে আপনার অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করুন, ভগবৎ-চরণে এই প্রার্থনা করি। তাঁহার উপরে অব্যবহিত ভবিষ্যতে ভারতের শান্তি এবং আমাদের স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের যথাযোগ্য স্ফূর্ত্তি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

(১)

জয়দেব বাঙ্গালী, কিন্তু বাঙ্গালী কবি নহেন; বিদ্যাপতি মিথিলা-নিবাসী হইয়াও কিন্তু এখন বাঙ্গালী কবির মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির যত আদর মিথিলায় তত আছে কি না জানি না, অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির যে পরিমাণে চর্চ্চা হইয়াছে ও হইতেছে, সেই পরিমাণে চর্চ্চা তাঁহার জন্মভূমিতে হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, জয়দেব যে দেশের কবি, সে দেশে কবিত্বের আদর চিরপ্রথিত, সে

দেশের জল-বায়ু যেন কবিত্বময়; অতএব যাহার যথার্থ কবিত্ব আছে বঙ্গদেশ তাহাকে সমাদর করিতে যেন বাধ্য। জয়দেব বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালী কবি নহেন, তথাপি বঙ্গ-ভারতী তাঁহার কাছে যে কত ঋণী তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। জয়দেব বাঙ্গালার শেষ সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছেন, যেন সংস্কৃত ভাষা মৃত ভাষা হইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া নিভিয়া গিয়াছে। মধুর কোমল-কান্ত পদাবলী যথার্থই যদি দেখিতে চাও, তবে গীতগোবিন্দ পাঠ কর, তাহা দেখিতে পাইবে।

কিন্তু যতই মিষ্ট হউক, গীতগোবিন্দ যদি সংস্কৃত কাব্য মাত্রই হইত, তাহা হইলে আমরা তাহার এত পক্ষপাতী হইতাম না। গীত-গোবিন্দ শেষ সংস্কৃত কাব্য, কিন্তু আদি বাঙ্গালা কাব্য। একটী বিশাল বৃক্ষের পতন হইলেও, অনেক সময় তাহার শিকড় হইতে ছোট গাছগুলি যেমন আপনি গজাইয়া উঠে, তেমনি বিশাল সংস্কৃত কাব্য-তরুর পতনে, বাঙ্গালা কাব্যবৃক্ষের চারা যেন আপনি গজাইয়া উঠিয়াছিল। গীতগোবিন্দের গীতগুলি হইতে সংস্কৃত বিভক্তিগুলি খসাইয়া লইলে, তাহারা বাঙ্গালা কবিতার মত শোনায়।

"চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলম্।"

বাঙ্গালা কবিতার উর্দ্ধতন পিতামহও নয়, ঠিক এক পুরুষ উপরেই। অনেক স্থলে গীত-গোবিন্দের পদ অবিকল বাঙ্গালা বলিয়াই লওয়া যায়—

(১) চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবর পীতবসন
বনমালী।
(২) মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল
কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।
(৩) ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল
মলয় সমীরে।

এগুলি খাঁটি বাঙ্গালা কাব্যেও বেশ চলিয়া যাইতে পারে। অনেক স্থলে ক্রিয়াপদের একটু আধটু ব্যতিক্রম করিলেই জয়দেবের গান বাঙ্গালা গানে পরিণত হয়। যথা—

ধীর সমীরে যমুনা তীরে
বসতি বনে বনমালী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটা স্তোত্র আছে, যাহার সাতটী চরণে ও ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা স্তোত্রগুলিতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

জয় রাম রাঘব, কৃষ্ণ কেশব
কংস দানব ঘাতন।

অথবা জয় জয় হর রঙ্গিয়া,
কর বিকশিত নিশিত পরশু
অভয় কর কুরঙ্গিয়া।

ইহার সহিত গীতগোবিন্দের ২নং গীতের প্রথম সাতটী চরণ মিলাইয়া দেখুন, কিছু প্রভেদ নাই। বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে যদি ইহারা স্থান পায়, তাহা হইলে যে না জানে, সে কখনই বুঝিতে পারিবে না যে, এই স্তোত্র-গুলি সংস্কৃত গীতগোবিন্দে আছে। গীত-গোবিন্দের ভাষা বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার সূচনা করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বাঙ্গালা ভাষার বীজ বপন করিয়া গীতগোবিন্দে সংস্কৃত কাব্যের শয়ন, এবং কয়েক শতাব্দী পরে গীতগোবিন্দের

ভাব, ভাষা ও ছন্দ লইয়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের জাগরণ। গীতগোবিন্দের মত মধুর না হইলেও, ভাষা ও ছন্দ বিদ্যাপতির পদাবলীতে কম সমৃদ্ধ নহে, নিতান্ত কম মধুরও নয়। কিন্তু বিদ্যাপতির ছন্দ যে গীতগোবিন্দের ছন্দের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না।

রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্।
ধীর সমীরে যমুনা তীরে
বসতি বনে বনমালী॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্
বহু মনুতে তনু তে তনু সঙ্গত পবন চলিত
মণি রেণুম্।

এই গীতের ছন্দই বিদ্যাপতির হস্তে

কবরী ভয়ে চামর গিরি কন্দরে
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে।

এবং

অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।

ইত্যাদি ছন্দে পরিণত হইয়াছে।

স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারম্।
মা মনু তে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা বিরহে তব কেশব।
সরসমসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥

জয়দেবের এই মধুর ছন্দই রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে—যথা

(১) শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
(২) এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুষ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহিতে কণক দ্বিগুণ হয় মুল॥
(৩) শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ॥
পহিঁ গহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥
(৪) আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥
(৫) এ কে ধনী কমলিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে করে করুণা কোটী॥

এইরূপ জয়দেবের আরও অনেক ছন্দ, অন্ততঃ ছন্দের ধ্বনি, বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কথিত আছে যে, জয়দেবের কবিতার অনুকরণ করিয়া কবিশেখর বিদ্যাপতি "নবজয়দেব" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নবজয়দেব ভণিতাযুক্ত পদাবলী বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। *

জয়দেবের গীতগুলি যেমন শুধু সুর ও তালের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ছন্দাত্মকও বটে, যতি ও মাত্রার উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, বিদ্যাপতির পদাবলীও ঠিক সেইরূপ। ইহারা গীত হইলেও কেবল গান নহে, কবিতাও বটে। বিরাম, যতি,

* পরিষদ্ সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী।

প্রভৃতি ইহাদের সবগুলিতেই প্রায় অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান্ আছে। তাই জয়দেবের গীতাবলী ও বিদ্যাপতির পদাবলী এতদুভয়েরই পাঠকালে যতি-পতনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িলে ইহাদের মিষ্টত্বের কোনও ক্ষতি হয় না।

বিদ্যাপতিতে ছন্দের বৈচিত্র্য বোধ হয় জয়দেব অপেক্ষাও বেশী আছে, কিন্তু কতকগুলি ছন্দ, যেমন দেশী বরাড়ী প্রভৃতি, দুই কবিরই পদে পাওয়া যায়, এবং ছন্দের গতি ও মসৃণতা জয়দেবের গীত হইতেই যে বিদ্যাপতিতে আসিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও ভুল নাই।

বিদ্যাপতি বাঙ্গালী কবি নহেন, এ কথায় আর এখন কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু বিদ্যাপতি যে দেশেরই কবি হউন, তাঁহার প্রভাব যে বঙ্গবাসীর উপর অশেষ,তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বহুশতাব্দী ধরিয়া বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর আদি কবি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশের বৈষ্ণবকবিকুল তাঁহাকে ও চণ্ডী-দাসকে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের নমস্কার পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশিত পথে চলিয়া-ছিলেন। বৈষ্ণবকবিরাই বঙ্গদেশকে কবিত্বসুধা পান করাইয়া অমর করাইয়াছেন, এবং ভগীরথের মত বঙ্গদেশে কৃষ্ণপাদোদ্ভবা পীযূষবাহিনী গীতি-ভাগীরথীকে তাঁহারাই প্রথম প্রবাহিত করিয়াছেন। অতএব এই অমৃতধারার জন্য বঙ্গদেশ চিরকাল বিদ্যা-পতির কাছে ঋণী থাকিতে বাধ্য। শুধু এই জন্যই নয়, বঙ্গদেশ বিদ্যাপতির কাছে অন্য কারণেও ঋণী। বিদ্যাপতির পদ ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যের বড় প্রিয় পদার্থ ছিল; তাঁহার পার্শ্বদগণও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে মধুর রসসাধন পিপাসা মিটাইতে পারিয়াছিলেন এবং সেই রসের পরিপোষক শিক্ষাও দিতে পারিয়াছিলেন। অতএব বিদ্যাপতির কাছে বঙ্গদেশ পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিপুষ্টির জন্যও অনেক পরিমাণে ঋণী, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

বৈষ্ণব কবির মধ্যে বিদ্যাপতির অনুকর্ত্তাই বেশী, তাহার একটা কারণও আছে, তাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য এই যে, আজ যদি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, বাঙ্গালী কবি নহেন, তাই বলিয়া যে আমরা তাঁহার ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহা নহে। সে ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না, কারণ বঙ্গদেশ বিদ্যাপতির কাছে কবিত্ব-ঋণে এত ঋণী যে সেই ঋণ পরিশোধ করাই অসাধ্য।

সে হেন বিদ্যাপতি জয়দেবের কাছে শুধু ছন্দের জন্য ঋণী নহেন, ভাবের জন্যও বিশেষ ভাবে ঋণী। জয়দেব বঙ্গদেশে মধুর রসের প্রবর্ত্তক, অতএব বৈষ্ণব কবি মাত্রই তাঁহার কাছে ঋণগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেহই বাদ যান না। জয়দেবের কবিত্ব যে কেবল কথার বাঁধুনির বা ছন্দের পারিপাট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা হয় তো অনেকে বিশ্বাস করিতেই চাহিবেন না। কিন্তু যাঁহার কাছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভাবের জন্য ঋণী, তিনি কবিত্ব-শক্তির দাবী

করিতে পারেন কি না তাহা সজ্জনেরাই বিবেচনা করিবেন। দিনকাল বদলাইয়াছে' তাই আজকাল জয়দেবের কবিত্ব প্রমাণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা এক হিসাবে সুলক্ষণ বটে, কারণ ইহা দ্বারা মানুষের মনের গতি বুঝিতে পারা যাইতেছে। লোকে এখন যে ভালবাসার রাজ্য হইতে বাস্তবটাকে একেবারে বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহাতে এক কালে যে সুফল ফলিবে, সে বিষয়ে আশা করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই যে বাস্তবকে একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারা যাইবে তাহা সম্ভব নয় এবং বাস্তব-বর্জ্জিত আদর্শ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহাও দুরাশা মাত্র। আজকালকার অনেক সমালোচক এই কথাটা বিস্মৃত হইয়া একটা ঝোঁকের মাথায় সমালোচনা করিতে বসেন এবং সমালোচ্য কবির মন্দটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন, ইহাই পরিতাপের বিষয়। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক জয়দেবে যে প্রভূত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর এক কথা, জয়দেব কিম্বা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে নির্ভর করিয়া সমালোচনা করা যে ঠিক নহে তাহা নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই বুঝিবেন। এ কথা গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি সারগ্রাহী বিদেশী লোকেরাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় জয়দেবের স্বদেশী অনেক সমালোচক তাহা বুঝিতে চাহেন না। যাহা হউক, এই দল যদি জয়দেবের গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে আমাদের বিশেষ আপত্তি থাকিত না, কিন্তু তাঁহারা যে একটা ধুয়া ধরিয়া জয়দেবের কবিত্ব-শক্তির অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হ'ন, ইহাতেই আমাদিগের আক্ষেপ।

জয়দেবের কবিতা বহির্মুখী, অন্তর্মুখী নহে, ইহাও জয়দেব সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি। তাঁহার প্রেম দেহনিবদ্ধ হৃদয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে না, এ কথাও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। আমরা আজকাল দেহ বেচারার উপর বেজায় নারাজ হইয়া পড়িয়াছি, ভালবাসার রাজ্যে বস্তুতঃ তাহার যতই দাবী থাকুক, কাব্যজগতে সে দাবীদাওয়া তাহার করা চলে না, ইহাই আজকালকার নজীর। আমরা এই মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী না হইলেও এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে, ভালবাসার যে অন্তর্মুখী বৃত্তি তাহাই কাব্যজগতে শোভা পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনও অস্বাভাবিক ভাবই কাব্যে শোভা পায় না, এই জন্য দেহবর্জ্জিত ভালবাসা যাহা জগতে অস্তিত্বহীন তাহাও কাব্যে চিরস্থায়িত্বের দাবী করিতে পারে না। ভালবাসার সুখদুঃখ কেন হয়? যাহাকে ভালবাসি তাহাকে যদি পাইলাম, তাহার সহিত কথা কহিলাম, তাহার আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিতে পারিলাম, তাহা হইলে ভালবাসার সুখ, আর তাহা না হইলেই ভালবাসার দুঃখ। ভালবাসার নৈরাশ্যের চিত্র জগতের সকল মহাকবিই আঁকিয়াছেন। সেই সকল চিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসঙ্গলিপ্সার অচরিতার্থতাই ইহার মূলে অবস্থিত এবং ইহার জন্যই নিরাশ-প্রণয়ের

যন্ত্রণা। ভালবাসার মূলে যাহাই থাকুক, অর্থাৎ রূপই থাকুক, বা গুণই থাকুক, যদি তীব্র লালসা মনে উদিত না হয়, তাহা হইলে সে ভালবাসা কখনই স্থায়ী হয় না। রোমিও রোজালিন্‌কে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার সে ভালবাসা একটা ক্ষণবিধ্বংসী ভাব মাত্র, তাহাতে লালসার তীব্রতা আদৌ ছিল না; তাই যখন সে রোজালিনের জন্য কবিতা আওড়াইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই জুলিয়েটকে দেখিয়া পাগল হইয়াছিল। তাহার এই ভালবাসায় তীব্র লালসা মিশিয়া ছিল, তাই তাহার জুলিয়েট-প্রীতিই যথার্থ ভালবাসায় দাঁড়াইয়াছিল। যদি রোমিও এবং জুলিয়েটের হৃদয়ে অসীম আকাঙ্ক্ষা ও আসঙ্গলিপ্সা না জাগিত, তাহা হইলে তাহারা কবিতা গড়িয়া বেশ পরস্পরকে ভুলিয়া থাকিতে পারিত, প্রণয়ের সর্ব্বনাশী বেগের মুখে আত্মনাশ করিয়া কাব্য-জগতে প্রণয়ীর আদর্শ হইয়া থাকিতে পারিত না। ভালবাসার রাজ্যে লালসার স্থান নিতান্ত অবহেলনীয় নহে, এ কথা মনুষ্যহৃদয়জ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তবে লালসাই ভালবাসা নহে; ইহাও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। লালসার সহিত হৃদয় সংযুক্ত না হইলে তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-বিকারে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়বিকার যে ভালবাসা নহে এবং ভালবাসা যে কেবল ইন্দ্রিয়-চপলতা নহে, তাহাও সকলেই জানেন। লালসার দ্বারা যে বাসনার উদয় হয়, তাহাই হৃদয়ে ভালবাসার পুষ্টি সাধন করিতে পারে ও করিয়া থাকে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে জগতে ভালবাসার আত্মত্যাগ বলিয়া কিছু থাকিত না। শুধু লালসা সম্ভোগ চায়, কিন্তু প্রণয়ে যে লালসা আসে, তাহা প্রণয়পাত্রকে আপনার করিতে চায়, এবং সেই প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে আপনার বলিয়া কিছু রাখিতে চাহে না, সর্ব্বস্ব প্রণয়পাত্রকে সমর্পণ করিতে চায়। প্রিয়তমের সঙ্গকামনা যে ভালবাসায় নাই, সে ভালবাসা যে কিছুই নয় এবং তাহা যে ক্ষণভঙ্গুর, তাহা জগতের সকল মহাকবিই শিক্ষা দিয়াছেন। উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে ভালবাসার কথা আছে, সেইখানেই মহাকবিরা এই কথা বলিয়াছেন। আসঙ্গলিপ্সাকে খাট করিবার ইচ্ছা যে ভাবপ্রসূতই হউক না কেন, ভালবাসার উচ্চতম প্রতিমূর্ত্তির ভিতরেও ইহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কবিকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যদি আমরা বৈজ্ঞানিকের কাছে যাই, তাহা হইলে আমরা উত্তর পাইব যে যৌন সম্মিলন প্রেমের উৎপাদক। এই আকর্ষণই ক্রমশঃ নানা প্রকারে বিশুদ্ধ হইয়া জগতে ভালবাসার পবিত্র আদর্শে উপনীত হইতে পারিয়াছে। প্রথম পরিণীতা জুলিয়েট বলিয়াছেন ঃ—

Oh I have bought the mansion of a love
But not possessed it; and though I am told,
Not yet enjoyed: so tedious is the day
As is the night before some festival
To an impatient child that hath new robes,
And may not wear them.

সেই সম্ভোগলোলুপা জুলিয়েটই অকাতরে রোমিওর জন্য মরিতে পারিয়াছিল। রোমিওও মরিবার পূর্ব্বে জুলিয়েটের মৃতকল্প দেহে শেষ চুম্বন ও শেষ আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারে নাই। এই আসঙ্গ-লিপ্সা মৃত্যুকালেও লোককে ছাড়িতে চাহে না। সম্ভোগ একীকরণের প্রধান সহায়, যদি সে সম্ভোগ মাত্র ইন্দ্রিয়-চপলতার দ্বারা সাধিত না হইয়া প্রণয়ের দ্বারা সাধিত হয়। যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ক্ষণিক উত্তেজনা প্রসূত, তাহা নীচ ও ঘৃণ্য, কিন্তু যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রণয়ীযুগল পরস্পরের আলিঙ্গনের জন্য লালায়িত হয়, তাহাকে কাব্যজগত হইতে বিসর্জ্জন দিবার জো নাই। তা যদি দেওয়া যায়, তাহা হইলে ডেস্‌ডিমোনা, শকুন্তলা এমন কি সীতা-সাবিত্রীকে পর্য্যন্ত কাব্য-জগত হইতে বিদায় লইতে হয়। তাই বলিয়াছিলাম যে, ভালবাসাকে আজকাল-কার সমালোচকেরা যতই ছাঁকিতে চেষ্টা করুন, ইহা হইতে আসঙ্গলিপ্সারূপ কীটাণুকে একে-বারে বাদ দেওয়া চলিবেই না। সাধে কি বৈজ্ঞানিক ভালবাসাকে একটা contagious disease (ছোঁয়াচে রোগ) ঠিক করিয়া প্রণয়-কীটাণুর (Love bascilli) সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তা সমালোচক মহাশয়েরা যতই হাওয়ায় হাত পা নাড়িবার পরামর্শ দিতে থাকুন, দার্শনিক "মদনমুখ চ পেটিকা" লিখিতে থাকুন, যদি ভালবাসার অস্তিত্ব জগতে ক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ মহাদেবকে অপরাধী মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, এবং সে পক্ষে স্বয়ং দেবতারাই প্রার্থী হইবেন।

স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, জয়দেবে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ও দৈহিক সম্ভোগের কথা বেশী মাত্রায় আছে। আছে বলিয়াই যে জয়দেব ভালবাসা বুঝিতেন না, তাহা নয়। ভিতরকার কথা ছাড়িয়া দিলেও, অর্থাৎ জয়দেবকে আদি বৈষ্ণব কবি ভাবিয়া বিচার না করিলেও, ইহা মানিতে হইবে যে, জয়দেব একজন প্রেমিক কবি ও উচ্চ অঙ্গের প্রেমের কবি। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ নিরবচ্ছিন্ন কামের গান নহে, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আজ এমন দিনকাল পড়িয়াছে যে, এ কথাটা বলিতেও একটু ভয় হইতেছে, কারণ জয়দেবে যে কিছু ভাল আছে, এ কথা বিশ্বাস করান নিতান্ত সহজ কাজ নহে। অনেকের ধারণা যে ইন্দ্রিয়-লোলুপতাই জয়দেবের কবিতার সর্ব্বস্ব এবং শুধু এই জন্যই আমরা জয়দেবকে তথা অন্যান্য বৈষ্ণব কবিকে আদর করি। বাঙ্গালী চরিত্রের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বাঙ্গালী এতই উচ্ছন্ন গিয়াছে যে, কবির কাব্যে কেবল এই কুৎসিৎ অংশটুকু ধরিয়াই কবিকে আমরা আদর করি, এ কথা আমি তো স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অথচ জয়দেবের আদর বঙ্গদেশে যথেষ্টই আছে তাহা দেখিতে পাই, এবং ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বিলাতেও আজকাল তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা যেন মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়াছি, কিন্তু সেখানে তো মানুষ আছে, তাহারা কি দেখিয়া জয়দেবকে আদর করিতে আরম্ভ

করিয়াছে? অতএব খুঁজিলে যে জয়দেবে কিছু ভাল জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা নিতান্ত প্রলাপবাক্য নহে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ আমার ভাল লাগে, ইহাতে যদি কোনও অপরাধ হয় তাহা হইলে আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, কারণ জয়দেবকে আদর করার অপরাধ শুধু আমার একা নয়, ভারতবর্ষে এ অপরাধ অনেকে এখনও করিয়া থাকেন। এবং এই অনেকের ভিতর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরও অভাব নাই। ভারতবর্ষ জয়দেবকে ভালবাসে অনেক কারণে; ভারত সুরপ্রিয়, জয়দেবে ভরা সুর; সংস্কৃত কোনও কাব্যেই এমন সুরের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায় না। জয়দেবের ভাষাও তেমনি মধুর, তেমনি ঝঙ্কারময়ী, তেমনি আনন্দের আধার; যিনি ভাষারসজ্ঞ তিনি জয়দেবের ভাষা দেখিয়া তেমনি আনন্দিত হইবেন যেমন একজন শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি তাজমহলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হন। এই ভাষার আভাস লইয়া বহুশতাব্দী পরে বঙ্গের ভারতচন্দ্র "ভাষার তাজমহল" খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার উপর জয়দেবের অদ্ভুত প্রভুত্ব; কি অসাধারণ নিপুণতার সহিত তিনি ভাবের সহিত কথার সঙ্গতি সাধন করিয়াছেন, তাহা এক মুখে প্রশংসার অতীত। জয়দেব বলিয়াছেন যদি কোমলকান্ত মধুর পদাবলী শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহা হইলে জয়দেব সরস্বতীকে শ্রবণ কর। আমরা বলি শুধু মধুর কোমল-কান্ত পদাবলী নহে, জয়দেব সরস্বতী গম্ভীর রসাত্মক বাক্যাবলী প্রণয়নেও যথেষ্ট কৃতী। ইহার নিদর্শনস্বরূপ "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ইত্যাদি গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও দশাবতার-স্তোত্র প্রভৃতি স্মরণ করুন। জয়দেব কবি ভাষার বিশ্বকর্ম্মা।

ছন্দের জন্যও জয়দেবের কাছে ভারতবাসীমাত্রেই ঋণী। ছন্দ এবং সুর এমন সরল ও তরল ভাবে, এমন অনায়াস-ভঙ্গির সহিত অপর কোনও কবি মিশাইতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। জয়দেবের কোমল পদাবলী সুরের সহিত, তালের সহিত গান করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি শুধু আবৃত্তি করিয়া যাও, তাহা হইলেও তাহাদের মিষ্টত্বের কোনও হানি হইবে না, তাহারা সমানভাবেই উপভোগ্য থাকিবে। গীতগোবিন্দের যেখানেই খোল, সেইখানেই এ কথার অদ্ভুত প্রমাণ মিলিবে।

বাঙ্গালীর কাছে গীতগোবিন্দের আদরের একটা প্রধান কারণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতবাসীর অধিগম্য শেষ কাব্য এবং বাঙ্গালীর প্রথম কাব্য। গীতগোবিন্দের ছন্দ লইয়া বাঙ্গালার সমস্ত কাব্য পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী জয়দেবকে আদর করিবে না এ কেমন কথা?

কিন্তু ইহাই জয়দেবের সর্ব্বস্বধন নহে, আমরা সেই কথা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিব, এবং আশা আছে একেবারে অকৃত-কার্য্য হইব না। কিন্তু সে চেষ্টার পূর্ব্বে আমা-দের নিবেদন এই যে, পাঠকগণ তাঁহাদের

পূর্ব্বগঠিত সংস্কার, জয়দেব সম্বন্ধে তাঁহাদের অকারণ-সঞ্জাত ভ্রান্ত ধারণা বর্জ্জনপূর্ব্বক আমাদিগের বক্তব্যের প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া যেন আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

চীনে প্রজাতন্ত্র

চীন জাতি যে এত দীর্ঘকাল এমন অটুটভাবে স্থায়ী রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তাহাদের জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা। চীন জাতির প্রতি পরিবার মধ্যে রাষ্ট্রনীতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই প্রত্যেক পারিবারিক শাসননীতির দ্বারাই সমস্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি গঠিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পরিবার যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে এক নিয়মে শাসিত হইয়া আসিতেছে, সেই মত বহু পরিবারের সমষ্টি একখানি গ্রামও সেই গ্রামের একজন মোড়ল দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে।

কতকগুলি গ্রাম ও সহরের দ্বারা এক জেলা গঠিত। প্রত্যেক জেলায় এক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেট একাধারে শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা, এবং ইঁহারা নানা বিষয়ে বর্ত্তমান মিউনিসিপাল প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জেলার শাসনকার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মনোনীত মোড়ল বা পঞ্চায়ত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কয়েকটী জেলার দ্বারা একটী ডিভিসন এবং অনেকগুলি ডিভিসন দ্বারা একটী প্রদেশ গঠিত। এক এক ডিভিসনের উপর এক এক কমিশনার এবং এক এক প্রদেশের উপর এক এক গভর্ণর নিযুক্ত। আবার কয়েকজন গভর্ণরের উপর একজন গভর্ণর জেনেরাল নিযুক্ত। কিন্তু প্রতি গ্রাম, প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট, প্রতি ডিভিসন, প্রতি প্রদেশ স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী দ্বারা শাসিত। এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯০০ খৃঃ বক্সার যুদ্ধের সময় হ'ও'ন-সি-যাই ও চাং-টি টুংর শাসনপ্রণালী দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিল। এবং সেই স্বায়ত্ত-শাসনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্রের অনেক গভর্ণর, ও গভর্ণর জেনেরালগণ দেখাইতেছেন।

এই সকল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সমষ্টির উপর পেকিনের রাজকীয় গভর্ণমেণ্ট। এই রাজকীয় গভর্ণমেণ্টের মূলমন্ত্রই এই যে, "প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হউক।" প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নিয়মমত রাজস্ব আদায় এবং প্রত্যেক প্রদেশে শান্তি স্থাপিত থাকিলে পেকিন গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট থাকিতেন।

তবে চীনের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রধান দোষ এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে গভর্ণর জেনেরাল পর্য্যন্ত সম্রাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। প্রজাগণের এই মনোনয়ন-কার্য্যে কোন হাত নাই। কিন্তু সম্রাট স্বেচ্ছাচারভাবে মাণ্ডারিন্‌গণকে নিযুক্ত

করিলেও তাঁহাকে সময় সময় প্রজাগণের অসন্তোষ উৎপাদনকারী মাণ্ডারিনগণকে জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুসারে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়।

চীন জাতির স্বায়ত্ত-শাসনের আর একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত তাহাদের গুপ্তসমিতি সকলের গঠনপ্রণালী। সমস্ত চীনদেশে যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ সমিতি আছে তাহাদের সভ্য-সংখ্যা ন্যূনকল্পে ৬০ লক্ষ হইবে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান যন্ত্রই এই গুপ্তসমিতি সকল।

গত তিন চারি বৎসর মধ্যে এই সকল সমিতির অন্যতম সভ্য ডাঃ সুন-ইয়েট-সেন ইহার সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং নানা দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সকল গুপ্ত-সমিতির দ্বারা এত সত্বর এই প্রকাণ্ড দুরূহ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে যে পশ্চিম জগতের একেবারে তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্তসমিতির লোকে মাঞ্চু সম্রাটের সিংহাসনের নিম্নে যেন ডিনামাইট পুতিয়া রাখিয়াছিল, কেবল একটু অগ্নিসংযোগ সাপেক্ষ ছিল।

চীন জাতির আর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা—তাহাদের সামাজিক Guild বা ব্যবসায়িক সমিতি। পরস্পরের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক সহরে এই সকল সমিতি আছে। কোন সভ্য ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, দেউলিয়া হইয়া পড়িলে বা অন্য কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হইলে অপর মেম্বরগণ তাহাকে সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়। এই গিল্ড (Guild) সমিতির জন্যই ইহাদের ব্যবসায়ে এত সমৃদ্ধি ও ইহারা এত কার্য্য-তৎপর। বর্ত্তমান ডাকবিভাগ ও ব্যাঙ্কের সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতেই চীনাদের ব্যাঙ্ক ও হুণ্ডির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

এই প্রকার বাণিজ্য, ব্যবসায় ও স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালীতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা কেন আমেরিকার প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতে পারিবে না?

২

চীন-শাসননীতির ইহাই উজ্জ্বল অংশ। রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সর্দ্দারগণের সম্মুখে অধুনা কি বিষম সমস্যা উপস্থিত, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

এখন প্রশ্ন এই যে রাজকীয় শাসন-প্রণালীর নীতি ও ভাব এককালে লোকের অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া একদমে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে কি না?

সহস্র সহস্র শতাব্দী হইতে চীন রাজতন্ত্র-প্রণালী দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। এ কথা সত্য যে, এদেশের শাসন-প্রণালী প্রজাতন্ত্রের নিয়মানুসারে কতকটা হইলেই প্রজাগণ রাজাকে পবিত্রভাবে দেখিত। এখন তাহারা সেই রাজার পরিবর্ত্তে একজন প্রেসিডেন্টকে সেই ভাবে কখনই ধারণা করিতে পারিবে না। চীন সম্রাট পবিত্র, স্বর্গজাত এবং স্বর্গীয় দেবতার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করিতেন।

তিনি জনসাধারণের পিতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু-পুরোহিত রূপে অবস্থিত ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সম্রাট একাধারে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতির কেন্দ্রস্থল ছিলেন।

পেকিনের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এক মনোহর নিকুঞ্জবন সদৃশ একটী উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্বর্গ-মন্দির (Temple of Heaven) স্থাপিত। চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী তাহার বেষ্টনী এবং উপরস্থ নীলাকাশ তাহার চন্দ্রাতপ। এই শ্বেতমর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত মুক্ত বেদীর মধ্যস্থলে একখণ্ড শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর-ফলক স্থাপিত। সেই প্রস্তর-ফলককে বিশ্ব-কেন্দ্র রূপে মনে করা হইয়া থাকে। ইহাতে কোন মূর্ত্তি স্থাপিত নাই। এই ছাদ ও বেষ্টনীশূন্য বেদিতে আসীন হইয়া সম্রাট শূন্যস্থ নয়নাগোচর দেবতাকে আরাধনা করিতেন। এবং অবনতজানু হইয়া প্রজা-বর্গের মঙ্গল কামনা এবং রাজ্যের সুখ-শান্তির কামনা করিতেন। এই ভাবে সম্রাট ও প্রজাবর্গের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ। এই ভাবে চীন-সাম্রাজ্যের অস্থি-মজ্জা গঠিত। এই ভাবের উপর কনফুসিয়ানের রাজ-নৈতিক ও দার্শনিক মত স্থাপিত।

কনফুসিয়ানের পাঁচটী উচ্চ আদর্শঃ—রাজায় ও প্রজায়, পিতা ও পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, জ্যেষ্ঠে ও কনিষ্ঠে এবং বন্ধু ও বন্ধুতে যে সম্বন্ধ ও ভাব, রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী সেই সকল সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে নৈতিক বলের দ্বারা চীন সমাজ শাসিত এবং যাহার দ্বারা রাজ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজ করে তাহা রাজ-ভক্তি, দয়া-ধর্ম্ম, অতীতের প্রতি সম্মান, বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বন্ধু-বান্ধবের উপর বিশ্বস্ততা।

এই সকল সামাজিক ও দার্শনিক নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনায় ইহার কোন কোন নীতিতে এত পার্থক্য বোধ হয় যে, তাহা উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরুর পার্থক্যের সদৃশ। এ কথা সত্য যে চীনে প্রাচীন অনেকগুলি নীতি বর্ত্তমান কালানুযায়ী অপ্রযোজ্য; এবং কন ফুসিয়ানের কোন কোন মত এখন পরিত্যজ্য।

প্রজাতন্ত্র বা ডিমক্রেটিক ভাবের মূলমন্ত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব চীনদেশে রাষ্টনীতির সম্পূর্ণ অপরিচিত। চীনদেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব এক একটী পরিবার মধ্যেই নিহিত। মৃত ও জীবিত ব্যক্তির সমষ্টি এক পরিবার মধ্যে গণ্য। পূর্ব্বপুরুষের পূজা দ্বারা এই সামাজিক নীতি গঠিত।

এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্বের ভাব এক দিনেই জন্মে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চীন-সমাজ প্রজাতন্ত্র নহে। চীনের রাষ্ট্রনীতি রাজতন্ত্র এবং ইহাই এই জাতির পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

যাহা বহুশতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে তাহাকে হঠাৎ ফেলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদেশী নীতি অবলম্বন কি সুবিধাজনক? কোন জাতির পক্ষে কি ইহা মঙ্গলজনক?

চীনের বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লব ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মত নহে, সেখানে রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়া সেই ধ্বংসাবশেষ-ভিত্তির উপর প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। চীনের

রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান কারণ মাঞ্চুরাজবংশের প্রতি বিদ্বেষ, প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া, সেই মাঞ্চুবংশের নির্ব্বাসন।

চীনেরা মাঞ্চু তাড়াইয়া আপন জাতীয় রাজবংশ কি রাজপাটে বসাইতে চাহে না? রাজার পরিবর্ত্তে প্রেসিডেণ্ট বসান চীন জাতির ধারণা ও সংস্কারের অতীত। ইউন-সি-আই যে প্রথম অবধারণ করিয়াছিলেন যে চীনের ৯/১০ অংশ লোক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, সে কথা মিথ্যা নয়। সম্রাট চলিয়া গিয়াছেন, সাম্রাজ্যের একতাবন্ধন কি দৃঢ় থাকিবে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কিস্থান, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি চীন সাম্রাজ্যের একতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে কি না? না, তাহার মাত্র আঠারটী প্রদেশ লইয়াই চীন সন্তুষ্ট থাকিবে? সেই আঠারটী প্রদেশেরও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে। ক্যাণ্টন হয় ত সুন-ইয়েট-সেনকে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিবে তাহাতে কি উত্তর চীনের লোকে রাজি হইবে?

চীনের দ্বিতীয় সমস্যা এই যে চীন প্রজাতন্ত্র-শাসনের উপযোগী হইয়াছে কি না?

মণ্টেকিউর (Monteque) ধারণা এই যে কোন বৃহদায়তনের দেশের পক্ষে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী অসম্ভব তবে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে রেল টেলিগ্রাফ ও ষ্টিমারাদি দ্বারা একদেশ হইতে অন্য প্রদেশের দূরত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু চীনের কথা স্বতন্ত্র। চীনে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে বা এক সহর হইতে অপর সহরে যাতায়াতের এক বিষম অসুবিধা রহিয়াছে। সমস্ত চীনদেশে মাত্র ২৭০০মাইল রেলপথ—ক্ষুদ্র জাপানের অর্দ্ধেক। হাংকাও হইতে ছিছোয়ানের রাজধানী চেংঠো পৌছিতে ৪০ দিন লাগে। চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইবার প্রার্থীকে সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া লোক সকলকে বুঝাইয়া দিতে এবং তদ্দ্বারা ভোট সংগ্রহ করিতে তিন বৎসরের প্রয়োজন। এই অসুবিধা ভিন্নও ভাষার অসুবিধা এক গুরুতর সমস্যা। প্রত্যেক প্রদেশে এক এক স্বতন্ত্র ভাষা। এমন কি এক প্রদেশেও নানা প্রকার উপভাষা ব্যবহৃত হয়।

ক্যাণ্টনি পেকিনের ভাষা বোঝে না। তাহারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে হয় ত মাণ্ডারিন্ ভাষায় কথা বলে, না হয় অন্য কোন বিদেশী ভাষা ব্যবহার করে। ইহা ভিন্ন এক প্রদেশের লোকের সঙ্গে অন্য প্রদেশের লোকের তাদৃশ সহানুভূতি নাই। চীন প্রদেশের লোকে ক্যাণ্টনিকে মাঞ্চু অপেক্ষাও বিদেশী মনে করে। এক প্রদেশের লোকের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে অন্য প্রদেশের লোকের ভাষা ও আচার-ব্যববারের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। এক প্রদেশের সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্য প্রদেশের সম্বন্ধে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এ অবস্থায় এই বিপ্লবকারীদিগের সম্মুখে কি সমস্যা উপস্থিত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

শ্রীরামলাল সরকার।

বেদের কথা

(২)

বিদেশীয়ের তো কথাই নাই, আমাদের মধ্যেও অনেকেই, বেদকে কেন যে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলা হইয়াছে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রাকৃতজনে স্বধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া অনেক সময়ে ইহার একটা অতি প্রাকৃত অর্থ করিয়া বসেন। কোনও অলৌকিক উপায়ে পরমেশ্বর মনুষ্য-সমাজে তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মানুশাসন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সাধারণ লোকে এমনও কল্পনা করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরাও যে সর্ব্বথাই এরূপ কল্পনার পোষকতা করেন না, এমনও বলা যায় না। মানবীয় যুক্তিতে এই অর্থে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। আর বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রাকৃতজনের এই কদর্থ গ্রহণ করিয়াই, আজিকালি অনেকে বেদের অধিকারকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর মীমাংসা-শাস্ত্রে বেদ-প্রামাণ্যের এরূপ কোন অতি প্রাকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদেরও উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টি একটা ঘটনা-বিশেষ অথবা আর এক দিক দিয়া দেখিলে ইহাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ বলিতে পারা যায়। এই সৃষ্টি হয় সার্থক, না হয় নিরর্থক। ইহা যদি নিরর্থক হয়, অর্থাৎ এই মধ্যে কোন প্রকারের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ কিম্বা উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোগ না থাকে, তাহা হইলে ইহা কোন প্রকারেই জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। সে অবস্থায় কোনও জ্ঞানের উপরে যে সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত, এরূপ অনুমান করাও অনাবশ্যক হয়। সুতরাং এরূপ সৃষ্টির সঙ্গে সর্ব্বজ্ঞান-মূল যে বেদ তাহার প্রতিষ্ঠা করারও আর কোনই প্রয়োজন থাকে না। অন্য পক্ষে সৃষ্টি যদি একটা সার্থক ব্যাপার হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি বলিতে আমরা যে ঘটনা বা ঘটনা-প্রবাহ বুঝি, তাহার যদি কোনও অর্থ থাকে, কার্য্য-কারণসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা, কিম্বা উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোগ যদি এই সৃষ্টিব্যাপারের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ হয়, তাহা হইলে এই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বজ্ঞানমূল বেদের প্রতিষ্ঠাও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই অর্থেই বেদকে জগতের যাবতীয় জ্ঞানের আধার বলা হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন এই, এই সৃষ্টি-ব্যাপার নিত্য না অনিত্য। স্রষ্টা কোন বিশেষ কালে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন, এরূপ সিদ্ধান্ত বা কল্পনা করিলে এই সৃষ্টিকে কোন মতেই নিত্য বলা যাইতে পারে না। আর সে অবস্থায় স্রষ্টাও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়েন, তাঁর নিত্যত্বও আর রক্ষা করা যায় না। "কর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ম্মীর' যে অবস্থা থাকে, কর্ম্মকালে বা কর্ম্মের পরে সে অবস্থা আর থাকে না, থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং কালবিশেষে সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ

যদি মনে করিতে হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টার যে অবস্থা ছিল, এই সৃষ্টি-কার্য্যনিবন্ধন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, এই সিদ্ধান্ত পরিহার করা অসম্ভব হয়। সুতরাং স্রষ্টার নিত্যত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টিকে বিশেষ কালে সংঘটিত ঘটনা-বিশেষরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া অনাদিকৃত কর্ম্মপ্রবাহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিতেও নিত্যত্ব ধর্ম্ম আরোপ করিতে হয়।

হিন্দু কল্প-সৃষ্ট বলিয়া এক প্রকারের সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন। কল্পারম্ভে এই সৃষ্টির সূচনা এবং কল্পান্তে ইহার বিনাশ হয়। কিন্তু বেদ যে সৃষ্টির সহচর এবং সেই জন্যই নিত্য, তাহা এই কল্প-সৃষ্টি নহে। কল্পারম্ভে বেদের নূতন সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সেই নিত্য বেদেরই পুনঃ প্রকাশ হয় মাত্র। আর কল্পান্তে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদের বিনাশ হয় না। কেবল যে প্রয়োজনে সৃষ্টির ক্রিয়াতে বেদের বহিঃ-প্রকাশ হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন আর রহিল না বলিয়া, বেদ তাহার নিত্য আশ্রয় সর্ব্বজ্ঞানাধার পরম চৈতন্যপুরুষের চিদাকাশেই বিরাজ করে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্বটী হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে বিশদ করিতে পারা যায়। কোন চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্ম্মর-ফলকে প্রতিমূর্ত্তিকে অঙ্কিত বা খোদিত করিবার পূর্ব্বে আপনার মানস-পটে ধ্যানযোগে সেই মূর্ত্তির একটা প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিয়া থাকে। সেই মানসী মূর্ত্তিটাই তাঁর রচিত চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে প্রকট হইয়া উঠে। শিল্পীর অন্তরে এই চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বা অঙ্গের যেরূপ সমাহার ও সমাবেশ হয়, ঠিক তাহারই আদেশে বাহিরের পটে বা প্রস্তরে সেই মূর্ত্তিটী ফুটিয়া উঠে। শিল্পীর মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে তাঁহার চিত্রিত বা খোদিত প্রতিমূর্ত্তির সম্বন্ধ নিত্য। একটীকে ছাড়িয়া আর একটীর সৃষ্টি অসম্ভব। অথচ শিল্পী শিল্প রচনায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই বা সমকালেই ধ্যান-যোগে আপনার মানসী মূর্ত্তিটীকে সম্পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর সেই পূর্ণ আদর্শই অল্পে অল্পে তাঁহার চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিল্পীর অন্তরে সেই মূর্ত্তিটী পূর্ণভাবেই ফুটিয়া থাকে। কিন্তু চিত্রে বা প্রস্তরে তাহা উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ না, চিত্রটী নিঃশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, ততক্ষণ সেই মানসী মূর্ত্তিটী চিত্রপটের বা প্রস্তর-ফলকের ক্রমশঃ প্রকাশিত মূর্ত্তি অপেক্ষা বড় হইয়া রহে, এবং প্রতিপদে সেই মানসী মূর্ত্তির নিকটে লইয়া গিয়াই এই বাহিরের চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের সত্যাসত্যের ও পূর্ণতা-অপূর্ণতার বিচার করিতে হয়। বাহিরের চিত্র বা ভাস্কর্য্যকে বুঝিতে গেলে, শিল্পীর অন্তরের সেই মানসী মূর্ত্তিকে ধরিয়া চলিতে হইবে। বাহিরের চিত্র বা ভাস্কর্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে কিম্বা শেষ হইবামাত্রই যদি শিল্পী তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহাতেও তাঁহার মানসী মূর্ত্তির কোন ক্ষয় বা অপচয় হইবে না। যখন ইচ্ছা তখনই তিনি পুনরায় এই মানসী মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া আবার

নূতন করিয়া চিত্রপটে বা প্রস্তর-ফলকে তাহাকে প্রকট করিতে পারেন ; বাহিরের চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের লোপে সে মানসী মূর্ত্তির লোপ হয় নাই।

স্রষ্টাকে যদি এই চিত্রকরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর তাঁর এই সৃষ্টি-ব্যাপারকে যদি এই চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে হিন্দু মীমাংসকেরা বেদ বলিতে যাহা বুঝিতেন, সে বস্তুটী যে কি, এবং সেই বেদের সঙ্গে সৃষ্টি-ব্যাপারের সম্বন্ধ কেন যে নিত্য ইহা কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে। অনাদি কাল হইতে স্রষ্টার অন্তরে এই সৃষ্টি-লীলার যে নিত্য আদর্শটী জাগিয়া রহিয়াছে, সেই নিখিল চৈতন্যের মধ্যে, দ্রব্যগুণাদির যে নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, সেই আনন্দোদ্ভাসিত চিত্তপটে যে সকল রসমূর্ত্তি নিত্য ফুটিয়া লীলাপর হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই দেশকালের ক্ষুদ্রায়তন রঙ্গমঞ্চে এই সৃষ্টি-লীলা পটে পটে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এখানকার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অর্থ, সেই জ্ঞানের মধ্যে যে সকল অর্থ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এখানকার উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোগের সার্থকতা সেই খানে, যেখানে সকল সাধনা চিরসিদ্ধি লাভ করিয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যরাজ্যকে উপেক্ষা করিলে, দৃশ্যমান বিশ্বের সার্থকতা আর থাকে না। আর সেই চিদ্‌রাজ্যের নিখিল সম্বন্ধসমূহই সত্যকার বেদ। এই বেদ যে নিত্য, এই বেদ যে কালবিশেষে পুরুষবিশেষ কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, তাহাও কি আবার বলিতে হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিলাতের পুলিশ

লণ্ডনের পাহারাওয়ালা

লণ্ডন সহরের পাহারাওয়ালা সভ্য জগতের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ফরাসীসে বা আমেরিকায়, ইতালী কি জর্ম্মাণীতে, পাশ্চাত্য জগতেও এ বস্তুটী আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের পুলিশের বড় একটা সুনাম নাই। অনেক সময় উচ্চ-নীচ অনেক পুলিশকর্ম্মচারী রীতিমত সহরের চোর, জুয়ারী এবং বারাঙ্গনাদিগের সঙ্গে নিজেদের একটা উপরি আয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এমনও শুনা যায়। ফরাসীসের পুলিশ একটা পরিমাণে উৎকোচ-গ্রাহী কি না জানি না। কিন্তু পারিসের পাহারাওয়ালা যে কার্য্যদক্ষতায় লণ্ডনের পাহারাওয়ালা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, ফরাসীস-পর্য্যটকেরাও একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রজা-পীড়নশীল রুষসাম্রাজ্যে পুলিশের প্রভাব যত বেশী, য়ুরোপের আর কোথায়ও তত নহে। রুষের পুলিশ অনেক সময় নিজেরা ষড়যন্ত্র করিয়া, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপের আয়োজন করিয়া থাকে, এ কথা কিছুকাল হইতে দুনিয়ায় রাষ্ট্র হইয়া

পড়িয়াছে। যতদিন দেশে বিপ্লবের বহ্নি প্রধূমিত হইবে, ততদিন রুষসাম্রাজ্যে পুলিশের প্রভাবও অপ্রতিহত থাকিবে। পুলিশবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এ কথা বিলক্ষণ জানেন ও বোঝেন, সুতরাং তাঁরা অনেক সময় গোপনে গোপনে নিজেদের চর পাঠাইয়া, বিপ্লবপন্থীদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকেন। আজেফ্ নামে পুলিশের একজন গুপ্তচর এইরূপে রুষিয়ার বিপ্লবপন্থীদিগের সহিত মিলিয়া অনেকগুলি নরহত্যার আয়োজন করিয়াছিল, এখন সভ্য জগতের সকলেই এ কথা জানেন। আর আজেফের ইতিহাস হইতেই রুষিয়ার পুলিশের প্রকৃতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। জর্ম্মাণীর পুলিশের কথা বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্তু রুষের পুলিশের মত এতটা দুর্দ্দান্ত ও দুরাচারী না হইলেও, ইংরেজের পুলিশের সঙ্গে, কি কার্য্যক্ষমতায় কি সচ্চরিত্রে কোন বিষয়েই জর্ম্মাণীর পুলিশের যে তুলনাই হয় না, নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা যাইতে পারে। পুলিশের কৃতিত্ব ও সাধুতা জগতের সর্ব্বত্রই দুইটী বস্তুর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। প্রথম, দেশের শাসন-যন্ত্র স্বল্প-বিস্তর পরিমাণে প্রকৃতিপুঞ্জের কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয় দেশের লোক-প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল আইন-আনুগত্য সর্ব্বদা জাগিয়া থাকা চাই। ফলতঃ এই দুইটী ভিন্ন বস্তু নহে। একই বস্তুর দুইটা দিক্‌-মাত্র। শাসনযন্ত্রের উপরে যেখানে প্রকৃতি-পুঞ্জের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে দেশের আইন-কানুন প্রজা-মতের অনুবর্ত্তিতা করিয়া চলে। আর সে অবস্থায় প্রজাসাধারণে সহজেই দেশের আইন-কানুনের অনুগত হইয়া রহে। শাসনের বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রজাসাধারণের মতামতের কোনও প্রকারের তীব্র বা স্থায়ী বিরোধ এ ক্ষেত্রে জন্মিতেই পারে না। সুতরাং প্রজামণ্ডলীর প্রাণে শাসনের বিধি-ব্যবস্থাকে পরাস্ত বা উপেক্ষা করিবার ইচ্ছাও জন্মে না। ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থা মোটের উপরে ইংরেজ প্রজা-সাধারণের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া আছে। এইজন্য বিলাতের পুলিশ ক্ষুদ্রতম প্রজারও স্বত্ব-স্বার্থের উপরে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পায় না। কোথায়ও কোনও পুলিশ কর্ম্মচারী ভুলক্রমে বা হঠকারিতাবশতঃ কাহারাও উপরে অযথা অত্যাচার করিলে, দেশময় হুলস্থুল পড়িয়া যায় এবং সেই অত্যা-চারের প্রতিবিধানের জন্য, হোম্ সেক্রেটারী হইতে আরম্ভ করিয়া, দেশের সমগ্র শাসক সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। একবার লণ্ডন সহরে একজন পাহারাওয়ালা মিস্ ক্যাস্ নামে একজন গৃহস্থ মহিলাকে বারাঙ্গনা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে, এবং তাঁহাকে রাজপথ হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। মিস্ ক্যাসের ধনবল বা পদবল কিছুই ছিল না; বেচারী খাটিয়া আপনার সামান্য জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। তথাপি এই ঘটনা লইয়া ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল। সেই আন্দোলনের কথা আমরা এ দেশেও পড়িয়াছিলাম এবং পড়িয়া বিস্মিত ও হইয়াছিলাম।

ইংরেজের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সত্যই আছে, এ কথা মনে করি না। ইংরেজ-

সমাজের এক শ্রেণীর লোকের প্রাণে অপর শ্রেণীর লোকের প্রতি যে একটা গভীর স্নেহ বা সহানুভূতি আছে, এমনও দেখি নাই। ধনিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় নির্ধনদিগকে নির্ম্মম ভাবে নিষ্পেষিত করিতে যে বিন্দু পরিমাণেও কুণ্ঠিত হন, এমন কথা বলিতে পারি না। ইংরেজ-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও ব্যক্তির মধ্যে যে কোনো প্রকারের একপ্রাণতা আছে, এমনটী কোথায়ও প্রত্যক্ষ করি নাই। বরঞ্চ প্রতিযোগিতাপ্রধান বিলাতী সমাজের প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বদা একটা স্বার্থপর স্বাতন্ত্র্যের ভাব জাগিয়া আছে, ইহাই অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইংরেজ-প্রকৃতির মধ্যেই নিজেদের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা ব্যাকুলতাও সর্ব্বদা জাগিয়া রহিয়াছে। এবং এই ব্যাকুলতা হইতেই যখনই যেখানে শাসক-সম্প্রদায় ক্ষুদ্রতম প্রজার ন্যায্য অধিকারের উপরে অযথা হস্তক্ষেপ করেন, তখন দেশের লোক আর সকল ভুলিয়া গিয়া সেই গরীবের স্বত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়ায়। এমনটী ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। আর ইংরেজ-চরিত্রের এই বিশেষত্ব নিবন্ধনই বিলাতের পুলিশ এমন অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া আছে।

বিলাতের পুলিশকর্ম্মচারিগণ জানেন যে, তাঁরা প্রজাসাধারণের ভৃত্য; তাহাদের প্রভু নহেন। প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা রাজকর্ম্মে ব্রত হইয়াছেন, সে স্বত্ব সঙ্কোচ বা হরণ করিবার জন্য নহে। আর এই জন্য একদিকে যেমন ইহারা দুষ্টজনকে দমন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, সেইরূপ অন্যদিকে সর্ব্ববিধ বিষয়ে সমাজের শিষ্টজনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর বিলাতী পুলিশের এই সাধারণ লক্ষ্যগুলি লণ্ডনের পাহারাওয়ালার মধ্যে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একদিকে যেমন বিলাতের পুলিশ প্রকৃতি-পুঞ্জের স্বত্ব-স্বার্থকে কখনই উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে না, সেইরূপ অন্যদিকে দেশের জনসাধারণেও পুলিশের বিধি-সম্মত আদেশকে কখনই খামাকা অমান্য করিয়া চলে না। পুলিশ যদি দেশের লোকের স্বত্বস্বার্থকে সম্মান না করিত, আর দেশের লোক যদি পুলিশের ন্যায্য আদেশকে মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত না হইত; তাহা হইলে বিলাতের পুলিশ-শাসন এবং পুলিশ-চরিত্রও কিছুতেই এতটা অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত না। লণ্ডনের পাহারাওয়ালাটীকে ঠিক বুঝিতে হইলে এতগুলি কথা মনে রাখা আবশ্যক।

লণ্ডনের পাহারাওয়ালার মধ্যে প্রায়শঃই কতকগুলি বিরোধী গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি সামান্য লোক হইলেও ইহাদিগের চরিত্রে কতকগুলি মহৎ গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহারা বজ্রাপেক্ষা কঠোর এবং কুসুমদল অপেক্ষাও কোমল। ইহারা যখন দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের দমনে প্রবৃত্ত হয়; তখন ইহাদিগের মধ্যে এই বজ্রের কঠোরতা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার

যখন লোকসংঘট্টের মধ্যে পথহারা অসহায় শিশুদিগের হাত ধরিয়া লণ্ডনের পাহারাওয়ালা তাহাদিগের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন তাহার মধ্যে কুসুমের কোমলতা ফুটিয়া উঠে। পুলিশ প্রহরীর ভিতরে কোন প্রকারের সৌজন্য থাকিতে পারে, ইহা এ দেশের কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু লণ্ডনের পাহারাওয়ালার সৌজন্যের সুখ্যাতি সভ্য জগতময় ছাইয়া গিয়াছে। লণ্ডন সহর না সাহারা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। জগতের আর কোথাও এরূপ জনাকীর্ণ বিজনতা আছে বলিয়া জানি না। আর এই সহরে যদি এই পাহারাওয়ালাগুলি না থাকিত, তাহা হইলে বিদেশীয়দিগের পক্ষে যথা ইচ্ছা চলা ফেরা করা একেবারেই সম্ভব হইত না। লণ্ডন সহরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও আমি তার দিক্‌নির্ণয় করিতে এখনও সমর্থ হই নাই। আমাদের কলিকাতার মত আট দশটা সহর লণ্ডনের ভিতর পুরিয়া দিলেও তাহার সকল স্থান অধিকার করা যাইবে কি না সন্দেহ। এক পল্লীর লোকের নিকটে অপর পল্লীর পথ-ঘাট অনেক সময় একান্তই অপরিচিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় কোন অপরিচিত পল্লীতে যাইতে হইলে, বিচক্ষণ পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক হইত। আর হয় না এই জন্য যে সহরের ঘাটিতে ঘাটিতে লণ্ডনের এই পাহারাওয়ালাগুলি দাঁড়াইয়া, করা মাত্রই অশেষ সৌজন্য সহকারে অনভিজ্ঞ পথিককে আপন আপন গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। কোন পথিককে নিতান্ত অসহায় দেখিলে, আর তাঁহার গন্তব্য স্থান অতি দূরে যদি না হয়, তাহা হইলে কখন কখন পাহারাওয়ালা নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে সে স্থানে রাখিয়া আসে, এমনটাও দেখিয়াছি।

লণ্ডন সহরে পথে ঘাটে যেমন লোকের জনতা, সেইরূপ গাড়ীরও ভিড়। এ জন্য পদব্রজে যারা যাতায়াত করে, তাহাদের পক্ষে বড় বড় রাজপথগুলি পারাপার হওয়া, একেবারেই নিরাপদ নহে। কিন্তু লণ্ডনের পাহারাওয়ালা এই বিপদজনক পথকেও, পথিক জনের পক্ষে সর্ব্বদা নিরাপদ করিয়া রাখে। যখনই কোন ভীরু পথিক গাড়ীর ভিড় দেখিয়া রাজপথে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, তখনই নিকটস্থ পাহারাওয়ালা পথের মাঝখানে যাইয়া আপনার হাতখানি তুলিয়া ধরে; আর অমনি দ্রুতগামী শকটশ্রেণী যে যেখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল, সেইখানেই থামিয়া যায়, এবং পথিকেরা নির্ব্বিঘ্নে রাজপথের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপে যে সকল লোক রাস্তা পাড়ি দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা এধার হইতে ওধারে চলিয়া গেলে, পাহারাওয়ালাও হাতখানি নামাইয়া সরিয়া যায়, এবং গাড়ী, ট্যাক্সী, বাস্ প্রভৃতি আবার রাজপথ জুড়িয়া যাতায়াত আরম্ভ করে। লণ্ডনের পাহারাওয়ালা যখন পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহাকে মানুষ বলিব না প্রস্তর-মূর্ত্তি বলিব বুঝিয়া উঠি নাই। মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভিতর

কি খেলিতেছে তাহা বোঝা অসম্ভব। দুনিয়ায় তাহার কোন ভাবনা, কোন ভয়, কোন আশা, কোন নিরাশা, কোন প্রেম, কোন অপ্রেম, চিত্তবিক্ষেপের কোথাও কোন কারণ আছে কি না সন্দেহ হয়। লণ্ডনের পাহারাওয়ালা যে যোগী পুরুষ এমন কথা বলিব না, কিন্তু যোগস্থ হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি করিয়া সাধন করিতে হয়, এই নিগূঢ় সঙ্কেতটী বুঝি বা সে সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া অনেক সময় এমনটাই মনে আসে। কর্ত্তব্যানুরোধে সে কঠোর হইতে পারে, কিন্তু সে কঠোরতার মধ্যে কখনই কোন প্রকারের ঔদ্ধত্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের আইন যেমন নিরপেক্ষ ও নির্ম্মম, কিন্তু নির্দ্দয়ও নহে, উদ্ধতও নহে, লণ্ডনের পুলিশও সেইরূপ আইনের পুতুল বলিলেও চলে, কলেই যেন তারা চলে, কলেই যেন তারা ফিরে, আর ঠিক কলেরই মত আপনাদের যথাযথ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যায়

অথচ এই সকল লোকেরই ঘর আছে, সংসার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে, ঋণ আছে, দায়-আদায় আছে, সকলই আছে। আর এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্যজীবনসুলভ চিত্তবিক্ষেপের সমুদায় কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানেও যে তাহারা এইরূপ কলের মত চলে ফেরে এমন নহে। সে যোগ-সিদ্ধি ইহাদের অনেক দূরে; কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কর্ম্মজীবনে ইহারা যে যোগ-শক্তি অর্জ্জন করে, তার মূল্য অল্প নহে।

বিলাত-ফেরত।

মোহ *

লেডি ভোরিস্ ভারনন্ তার সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষটিতে বসিয়াছিল—তার কুসুম-পেলব সুন্দর মুখে আজ একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে আকাশে মেঘ, কন্‌কনে শীতের হাওয়া, আর কুয়াসার ঘন অন্ধকার—কিন্তু তার কক্ষটিতে বাহিরের প্রকৃতির কোন দৌরাত্ম্য প্রবেশ করিতে পারে নাই—তাহা আরামের বহুমূল্য উপাদানে ভরা! কিন্তু এ সোনার পিঁজিরায় ভোরিসের মনে সুখ কোথায়?

ভোরিস্ অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়িবার ভাণ করিল—শেষে বিরক্ত হইয়া চাকর ডাকিবার ঘণ্টাটা ধরিয়া টান দিল। কলের পুতুলের মত আরদালি আসিয়া হাজির—ভোরিস্ জিজ্ঞাসা করিল—"সার্ ফিলিপ এখনও ফেরেন নি বোধ হয়।"

"আজ্ঞা, না,—তিনি বাহির হইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন সম্ভবত তাঁর রাত্রে আসিতে দেরী হবে—আপনি যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা না করেন।"

"আচ্ছা! আমার চা আনতে বল—আর মনে রেখো আমি আজ কারো সঙ্গে দেখা করবো না—এক মিঃ থার্লো ছাড়া।"

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

লেডি ভোরিস্ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিল।

তারপর সে বসিয়া বসিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল—তার অভিজাতবংশীয় পিতার দারিদ্র্য—শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে লক্ষপতি সার্ ফিলিপ ভারননের সহিত বিবাহ—একে একে সব কথা মনে আসিতে লাগিল। মনে পড়িল, তাহার রাল্‌ফ থার্লোর সহিত বাল্য-প্রণয়, তার প্রেমহীন বিবাহ—তারপর তার স্বামীর ব্যবহার। সে ত আপনার পূর্ব্বকথা মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া স্বামীকে ভাল বাসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু কৈ তার স্বামী ত একদিনও তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেন নাই। সার ফিলিপ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বালিকা স্ত্রীকে ছেলেমানুষী আদর করিয়া ভালবাসা দেখান তাঁহার আসিত না। তা' ছাড়া, তিনি মনে করিতেন যে ভোরিস্ অর্থলোভী দরিদ্র পিতার আগ্রহেই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছে। এমনি করিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

বহির্দ্বারের ঘণ্টাধ্বনিতে লেডি ভোরিসের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল—সে সোজা হইয়া বসিল। তার বুঝিতে বাকী রহিল না—এ অভ্যাগত কে! ভাবিতে তার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং তার অশান্ত হৃদয় সহস্র চেষ্টাতেও দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ভোরিস্ দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিল, বলিল—"আঃ মিঃ থার্লো,—বাঁচলুম। আমি ত একা একা প্রায় পাগল হইবার মত হইয়াছি!—যে বিশ্রী দিন। এদিকে এসে আগুনের কাছে দাঁড়াও। চা খাবে ত! সব প্রস্তুত।" তারপর চাকরকে চা আনিবার জন্য আদেশ করিল।

রাল্‌ফ, ভোরিসের হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—"আমি কিন্তু তোমাকে একা পাইবার জন্যই পাগল হইতেছিলাম। ভোরিস্, তুমি আজকাল আমার উপর কেন এত নির্দ্দয় হইয়াছ? কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিলে না কেন?"

ভোরিস্, রাল্‌ফের স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিল, বড় কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিল—"এ আবার কি কথা! আমি কি কাল বাড়ী ছিলুম—কাল লেডি ক্লোনেলের বাড়ী যে আমার তাস খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। সে কথা যা'ক—তুমি অমন প্যাগলামী করো না—গম্ভীর হইলে তোমাকে বড় বিশ্রী দেখায়!—চা এসেছে—এস চা খাও—মেজাজটা ঠিক হবে।" বলিয়া ভোরিস্ চা প্রস্তুত করিতে মন দিল—কিন্তু তার সংযম-সত্ত্বেও যে হাত দু'টি কাঁপিতেছিল, সেটুকু রাল্‌ফের দৃষ্টি এড়াইল না। রাল্‌ফের পিপাসিত দৃষ্টি নির্নিমেষে ভোরিসের সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেছিল—সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"ভোরিস্, সার ফিলিপ কোথায়?"

"ভগবান জানেন কোথায়! তিনি কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়ান—তা' আমি ত তাঁর অভিভাবক নই যে সব খবর রাখব!"

রাল্‌ফ ধীরে ধীরে বলিল,—"হাঁ, আমি তা' জানি।"

ভোরিস্ স্থির দৃষ্টিতে রাল্‌ফের দিকে চাহিয়া বলিল,—"অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ আবার কি? আমি কোন অর্থ ভাবিয়া তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—অন্তত আমি এমন কোনো কথা বলিতে চাহি নাই—যা তোমার ভাব্‌বার মত।"

"কিন্তু, তুমি শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবে না যে আমি আমার স্বামীর কথা ভাবিয়া থাকি।"

রাল্‌ফ একটু রুষ্টস্বরে বলিল—"তা বলিয়া তুমি বোধ হয় আশা কর না যে, আমি কোনও স্বামীর সম্বন্ধে যে কোন ভিত্তিহীন কুৎসা রটিবে তাই গিয়া তার স্ত্রীর কাছে বলিব।"

ভোরিস্ আর সামলাইতে পারিল না, বলিল,—"কিন্তু এমন করিয়া ইসারায় বলার চেয়ে স্পষ্ট কথা ভাল। রালফ, আমি মনে করিতাম তুমি আমার বন্ধু—হিতৈষী।"

"ভোরিস্, তুমি জান যে আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু চেয়ে বেশী। আমাদের প্রথম মিলনের কথা কি আমি ভুলিতে পারি।"

ভোরিস্ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"তার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের কি সম্বন্ধ? আমার স্বামীর সম্বন্ধে তুমি যা শুনেছ তাই বল।"

রাল্‌ফ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"নিশ্চয় বলতে হবে?"

"হাঁ।"

রাল্‌ফ থার্লো ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"তবে শুন, ভোরিস্,—সকলেই বলিতেছে আজকাল সার ফিলিপ, মিসেস্ হ্যারির সহিত একটু বেশী মিশিতেছে—তার বাড়ী যাতায়াত কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। তোমাদের বিবাহের পূর্ব্বে না কি সার ফিলিপের সহিত ইহার বড় ভাব ছিল। তুমি অবশ্য মিসেস্ হ্যারিকে জান না—সে ত তোমাদের সমাজের নয়। মিসেস্ হ্যারি—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী—সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে। ভোরিস্, আমার অবশ্য এ সব শোনা কথা, বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় করিও—আমি ইহার সত্যমিথ্যা কিছুই জানি না। তবে এটুকু আমার নিজে দেখা যে মিসেস্ হ্যারির চালচলন এখন বড় মানুষের মত। গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী এ সব সে কোথায় পাইল—তার স্বামী ত দরিদ্র ছিল বলিলেই হয়। লোকে বলে বাল্যসঙ্গিনী দরিদ্র প্রতিবেশীকন্যার প্রতি সার ফিলিপের দয়া।"

রাল্‌ফ চুপ করিল, ভোরিস্‌ও কোন কথা বলিল না। ঘরের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা, কেবলমাত্র ঘড়ীর টিক্‌টিক্ শব্দ শুনা যাইতেছিল—সে নীরবতা ক্রমশ উভয়ের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ ভোরিস্ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না, না, আমি এ সব বিশ্বাস করিতে চাহি না, বিশ্বাস করিব না—এ সব, সব মিথ্যা।"

"হাঁ, এ সব কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা,—লোকে কত না বলে, সবই কি বিশ্বাস করিতে হইবে!"

ভোরিস্ এ কথার উত্তর করিল না। সহস্র স্মৃতি তার হৃদয় মথিত করিতেছিল, অবিশ্বাস তার সহস্র বিষাক্ত ফণায় তার ক্ষুদ্র হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিতেছিল। কুন্দ-দন্তের নিপীড়নে ভোরিসের কুসুম-পেলব অধর রক্তিম হইয়া উঠিল—সে দুই হাত

বক্ষে চাপিয়া পাণ্ডুরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল—"তবে কি হইবে ?—আমি—আমি কি করিব ?'—তার সে স্বরে কি নিরাশা, কি কাতরতা, তার অশ্রুলেশহীন চক্ষে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা! রাল্‌ফ ভোরিসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তার কর্ণমূলে মুখ আনিয়া বলিল—"কি করবে ?—কেন, সে অবিশ্বাসীর উচিত শাস্তি দিয়া তুমি আমার কাছে এস! প্রিয়তমে, আমাদের আবাল্য প্রণয়ের মধ্যে সার ফিলিপ কে ? চল, আমার সঙ্গে, চল।"

রাল্‌ফের কথায় ভোরিস্ ভীত, চকিত হইল, বলিল,—"না, না, না, ও কথা বলো না—আমি তা পারব না।"

"না, তোমাকে আসিতেই হইবে! প্রিয়তমে, আমার কথা শুন। তোমার অবিশ্বাসী স্বামীর মত আমি লক্ষপতি নই—কিন্তু আমাদের দু'জনের চলিবার মত আমার যথেষ্ট আছে—আর আছে আমাদের দু'জনের আজীবনের ভালবাসা! প্রিয়তমে, চল আমরা কোন এক দূর দেশে গিয়া নিভৃতে সুখে শান্তিতে প্রেমে জীবন কাটাইয়া দিই। জগদীশ্বর সাক্ষী,—আমি তোমাকে চিরদিন হৃদয়ে স্থান দিব—তোমাকে সুখে রাখিব! চল, ভোরিস্—আমরা আজই—এই রাত্রেই পলাই

ভোরিস্ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল—সহস্র ভাবনায় তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। অনেক্ষণ পরে—সে ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"থাম, থাম,—আমাকে ভাবিবার সময় দাও। তুমি যা' বলছ তার মানে কি তা কি ভাবিয়াছ—তোমার জন্য আমাকে স্বামী, গৃহ, সম্মান, ধর্ম্ম সব ছাড়িতে হইবে!"

"আমার আজীবনের ভালবাসায় কি তার পূরণ হইবে না! না, ভোরিস্, ও সব ভাবিও না। চল আমরা পলাই, আজই রাত্রে ন'টার গাড়ীতে আমরা ফ্রান্সে রওনা হইতে পারি। তুমি ন'টার দশ মিনিট আগে 'ষ্টেশনে পৌঁছিও—সেখানে টিকিট লইয়া আমি প্রস্তুত থাকিব। আর দ্বিধার সময় নাই, একবার এ প্রেমহীন গৃহ ছাড়িতে পারিলে—আমরা চিরজীবন সুখে কাটাইব।"

ধীরে ধীরে ভোরিস্ বলিল—"রাল্‌ফ তুমি ত কখনও আমাকে অযত্ন করিবে না ?"

"এ কি কথা ভোরিস্! তোমাকে অযত্ন!—আর না, আর দ্বিধা নয়! আমি সমস্ত ঠিকঠাক্ করিতে চলিলাম—দেখো—এসো!—কেমন ?"

স্থির কণ্ঠে ভোরিস্ বলিল,—"হাঁ, আসিব।"

* * * * *

সে রাত্রে ন'টা বাজিবার দশমিনিট পূর্ব্বে লেডি ভোরিস্ ভারনন্ ষ্টেশনের একপ্রান্তে পদচারণা করিতেছিল—তাহার প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদয়ে অস্থিরতা, উদ্বেগ, এবং মনে যে তুমুল ঝড় বহিতেছিল—তাহা প্রকাশিত। কৈ রাল্‌ফ ত আসে নাই—তার ত অনেক পূর্ব্বেই পৌঁছিবার কথা! সেও কি তবে অবিশ্বাসী। ভাবিতে ভোরিসের মন ক্ষোভে, ঘৃণায়, রাগে ভরিয়া উঠিতেছিল। রাল্‌ফ কি জানে না যে রাল্‌ফের ভালবাসার জন্য সে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে বসিয়াছে!—স্বামী, গৃহ, ধর্ম্ম—

এক কথায় স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব সে রাল্‌ফের জন্য অতল জলে ডুবাইতে বসিয়াছে—আর সে কি না—না, না, সে নিশ্চয় আসিবে! কিন্তু আর ত পাঁচ মিনিট বই সময় নাই! তবে? আর চার মিনিট,—তিন মিনিট—কৈ সে? ওই যে তার রাল্‌ফ্। অভিমানে ভোরিস্ বলিল্—"রাল্‌ফ, তুমি জান, আমি প্রায় দশ মিনিট তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি—আর একটু হইলে আমরা ট্রেণ পাইতাম না।"

রাল্‌ফ তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিল—তার সুন্দর মুখে কি যেন একটা দুঃখের ছায়া পড়িয়াছে! তাকে বড় ম্লান দেখাইতেছে—অন্তত ভোরিস্ তাই ভাবিতেছিল। রাল্‌ফ বলিল—"প্রিয়তমে, গৃহে ফিরিয়া যাও।"

মুহূর্ত্তে ভোরিসের সমস্ত দেহে যেন আগুন ছুটিয়া গেল—সে শুনিতে ভুল করে নাই ত—রাল্‌ফ কি তাহাকে এমনতর অপমান করিতে পারে। শুষ্ককণ্ঠে ভোরিস্ শুধাইল—"রাল্‌ফ, তুমি এ কি বলিতেছ?"

রাল্‌ফ বলিতে লাগিল—"ভোরিস্, আমার সঙ্গে আসিও না! তোমার স্বামীর কাছে, তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও! তোমার স্বামী তোমাকেই মাত্র ভালবাসে—আর কাহাকেও না! আমি তোমাকে পাইবার জন্য মিথ্যা বলিয়াছিলাম—আমাকে ক্ষমা করে গৃহে ফিরিয়া যাও।"—রাল্‌ফের কণ্ঠস্বর যেন এ পৃথিবীর নয়, সে যেন কোন দুর হইতে কথা কহিতেছে

হঠাৎ ট্রেণের বাঁশীর শব্দে ভোরিসের চমক ভাঙ্গিল—সে দেখিল ফ্রান্স যাইবার ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল। ভোরিস্ পাশের একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বড় ক্ষোভে কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখে, রাল্‌ফ ত তার পাশে নাই, সে নিষ্ঠুর তাহাকে একটা সান্ত্বনার কথা না বলিয়া, বিদায় না লইয়া চলিয়া গেছে!

নিকটে একজন রেলের কর্ম্মচারী এক দৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া ছিল—ভোরিস্ সাহস করিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই খানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, কোথায় গেলেন বলিতে পার।"

সে অবাক হইয়া তার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"ভদ্রলোক?" "হাঁ, যিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন?" "কই না, আমি ত এই পনর মিনিট ধরিয়া আপনাকে লক্ষ্য করিতেছি—কই কোন ভদ্রলোককে ত আপনার সঙ্গে কথা কহিতে দেখি নাই।" ভোরিসের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না—সে ধীরে ধীরে ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

* * * * *

সে রাত্রে ভোরিস্ অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। সার ফিলিপ তখনও গৃহে ফেরেন নাই! শুইয়া শুইয়া ভোরিস্ আপনার কথা ভাবিতে লাগিল—কৈ রাল্‌ফের উপর ত' তার রাগ হইতেছে না। যে তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহাকে বড় লোভ দেখাইয়া ত্যাগ করিল—তার উপর রাগ হওয়া দূরের কথা বরং মনে হইতেছে যেন সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া রক্ষা করিতেছে।

সার ফিলিপের পদশব্দে ভোরিস্ উঠিয়া বসিল। তার স্বামী বলিলেন,—"এ কি ভোরিস্ তুমি এখনও ঘুমাও নাই!—তা' ভাল হইয়াছে।"

"কেন, কোন বিশেষ খবর আছে না কি?"—বলিতে ভোরিসের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

"হাঁ,—রাল্‌ফ থার্লো সম্বন্ধে! তোমার সঙ্গে না কি তার ছেলে বেলা হ'তে বড় ভাব—তাই খবরের কাগজে পড়ার আগে তোমাকে বলা সঙ্গত মনে করিলাম। বেচারা আজ ফ্রান্সে বেড়াইতে যাইতেছিল—ষ্টেশনে যাওয়ার পথে মোটর গাড়ী উল্টাইয়া—"

"না, না—বলো না! বাঁচিয়া আছে ত?"

"বাঁচিয়া নাই, ভোরিস্—বেচারার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইয়াছে।"

দু'জনে অনেকক্ষণ কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কহিল না। শেষে ভোরিস্ বলিল—"ক'টার সময় এই ঘটনা হয়।"

"ন'টা বাজিতে প্রায় কুড়ি মিনিটের সময়! কি ভীষণ ব্যাপার! ভাবিতেও কষ্ট হয়।"

ভোরিস্ কাঁপিতেছিল—তার মুখে রক্তের যেন লেশমাত্র নাই—সে হঠাৎ তার স্বামীর বুকে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—বলিল,—"হে আমার দেবতা, আমার স্বামী, আমার প্রিয়তম, আমাকে ধরিয়া রাখ, ধরিয়া রাখ, আমাকে পথভ্রষ্ট হইতে দিও না। আমি, তোমারই।"

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

রসের রূপ

দারু-মূর্ত্তি।

রূপ কথাটা লইয়া, দেখিলাম আমার কোনও কোনও নবশিক্ষিত বন্ধু একটু গোলে পড়িয়াছেন। রূপ আর আকার কি এক? এই প্রশ্নটাই কেহ কেহ তুলিতেছেন। এক নয় কি? আকার কাকে বলি? আকার আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে বিশেষভাবে কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ধরিতে পারি, ও ধরিয়া থাকি? মূলতঃ চক্ষুই কি আমাদের আকার-জ্ঞানের মুখ্য ইন্দ্রিয় নহে? অন্ধেরা বস্তুর উপরে হাত বুলাইয়া, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদির জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে বটে, আর কেবল দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি যদি আকারের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে ঠিক রূপের এক পর্য্যায়ভুক্ত করা নাও বা যাইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতেও, চক্ষু দিয়াই যে মুখ্যতঃ আমরা বস্তুর আকারের জ্ঞান পাইয়া থাকি, ইহা অস্বীকার করা যায় না। স্পর্শ দ্বারাও এ জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারাও হয়, এই কথাই বলিতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞান শীতোষ্ণাদিকেই স্পর্শের বিশেষ বিষয় বলিয়াছেন; রূপ বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহা বিশেষভাবে চক্ষুরই বিষয়। এইজন্য চক্ষুর অন্তর্নিহিত দৃষ্টি-শক্তিকে আমাদের মনোবিজ্ঞান রূপতন্মাত্রা

বলিয়াছেন। আর রসের রূপ কথাটা এই জন্যই আমি ব্যবহার করিয়াছি যে, রস জীবদেহে, সেই দেহের স্নায়ুমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পেশি-সমূহের ভিতর দিয়া, যে বাহ্যলক্ষণগুলি ফুটাইয়া তুলে, তাহা মুখ্যতঃ আমরা চক্ষু দ্বারাই দেখি। হাত দিয়া ধরিতে বা ছুইতে, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিতে, রসনা দ্বারা আস্বাদন করিতে পারি না। এইটকু বিচার করিয়া দেখিলে, এ ক্ষেত্রে রূপ শব্দের প্রয়োগ দুষনীয় বলিয়া হয় ত বোধ হইবে না।

আর একটা কথা। অরূপ আর নিরাকার একই কথা নয় কি? পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আমরা নিরাকার শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা একটা বিশেষ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে আমরা নিরাকার আর অতীন্দ্রিয় একই অর্থে ব্যবহার করি। ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, অর্থ এই যে তাহা কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে মনকেও ইন্দ্রিয় বলা হয়, এ কথাটাও এ স্থলে ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং নিরাকার বস্তু কেবল যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহাও নয়, সে বস্তু মন দিয়াও ধরিতে পারা যায় না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—ইত্যাদি।

আর নিরাকারের সত্য অর্থ যদি এই হয়, তবে রস-বস্তুকে নিরাকার বলা যায় কি? কারণ রস-বস্তু যে জাতীয়ই হউক না, তাহা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হউক আর নাই হউক, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সঙ্গে একরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ এ কথাটা অস্বীকার করা অসাধ্য। আমরা যাহাকে রস বলি, ইংরেজিতে তাহাকে ইমোষণস্ (Emotions) বলিয়া থাকে। এই রস আমাদের বিষয়-জ্ঞানের একটা মুখ্য অঙ্গ। ফলতঃ রস ব্যতীত জ্ঞান আপনি কিছুতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বস্তুসাক্ষাৎকার জ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত ব্যাপার বা ঘটনা বা কর্ম্ম। এই জন্য জ্ঞান মাত্রেই বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন। ইহা যেমন সার্ব্বজনীন সত্য; সেইরূপ এই জ্ঞানও যে নিয়তই জ্ঞাতার অন্তরে কোনও না কোনও রসের সঞ্চার করে, ইহাও সার্ব্বজনীন সত্য। যেখানে বোধ মাত্র জন্মে, কিন্তু রসের সঞ্চার হয় না, সেখানে এই বোধটাকে অত্যন্ত ক্ষীণ, আছে কি না এমন মনে করিতে হইবে। বোধ যেখানেই পরিস্ফুট, সেখানেই তারই সঙ্গে সঙ্গে রসের সঞ্চারও অনিবার্য্য। আর রস যেখানে ফুটে, সেখানে অবশ্যম্ভাবীরূপে কর্ম্মচেষ্টাও প্রকাশিত হইবেই হইবে। আর বোধ, রস, চেষ্টা এই ত্রিপাদে জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই তিনের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য যেখানে হয়—অর্থাৎ বোধ যেখানে তার যথাবিহিত রসের সঞ্চার করে, এই রস যেখানে তার যথাযোগ্য চেষ্টাকে জাগাইয়া তুলে,—আর ইহারা তিনে মিলিয়া যেখানে পরস্পরে পরস্পরের যাঁথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে, সেখানেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কথাটা ভাবিয়া দেখিলেও রসের সঙ্গে দেহীর পক্ষে একদিকে ইন্দ্রিয়-বোধের ও অন্যদিকে কর্ম্মচেষ্টার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, ইহা বুঝিতে বড়

গোল হইবার আশঙ্কা আর থাকে না। আর তখন রসের রূপ যে নিতান্ত নিরাকার হইতেই পারে না, এ সিদ্ধান্তটাকেও ঠেলিয়া ফেলা সম্ভব হয় কি না সন্দেহ।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের মুখবন্ধে ভালবাসার আকার বা রূপ সম্বন্ধে যে কথাটা তুলিয়াছিলাম, তাহাকে আর একটু বিশদ করিবার জন্য, এখানে এতগুলি কথা বলা হইল। এমন সোজা কথাটা যে কেহ গোলমেলে ভাবে বুঝিবেন, বা বুঝিতে পারেন, ইহা তখন ভাবি নাই, নতুবা সেইখানেই ভালবাসা প্রভৃতি রসের সম্বন্ধে রূপ-কথাটা ব্যবহার করা যে অসঙ্গত নয়, ইহার আলোচনা করিতাম।

আমি যদিও রসের রূপ কথাটা ব্যবহার করিয়াছি, আমাদের দেশের রসশাস্ত্রে এতদপেক্ষা একটা বেশি গুরুতর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁরা খোলাখুলি ভাবে রসের মূর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তির কথার উল্লেখ আছে। রস-শাস্ত্রে রস-মূর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-শাস্ত্র যে ভক্তিশাস্ত্র, তাহাতে ভক্তির উপজীব্য ভগবানকে "নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ মূর্ত্তি সাকার, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। নিরাকার অর্থাৎ সর্ব্ববিশেষণশূন্যও নহে। কিন্তু ইহা চিন্মূর্ত্তি। মহাপ্রভু কাশিধামে প্রকাশানন্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারে বলিয়াছেন—

> ব্রহ্ম শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান
> চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ সমান।
> তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার
> চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

ভগবানের "নিখিলরসামৃতমূর্ত্তিটী" চিদ্‌মূর্ত্তি, জড়মূর্ত্তি নহে। সুতরাং রসের রূপের কথা তুলিলেই যে সে রূপকে সর্ব্বথা জড়ধর্ম্মাপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, এমন কথা ভাবিয়া লইবার কোনও হেতু নাই।

অন্য পক্ষে, এই রূপ যে, অন্ততঃ আমাদের চক্ষে ও জ্ঞানে, সর্ব্বপ্রকার জড়সম্পর্কশূন্য, এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান বিষয়তন্ত্র; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও রস যতক্ষণ না আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, বিশেষতঃ আমাদের চক্ষুগোচর হয়, ততক্ষণ তাহার যে রূপ আছে, ইহা আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি না। সুতরাং রসের রূপ বলিতে আমরা রসবিশেষের আবির্ভাবে জীবদেহে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কেবল সেই বস্তুকেই জানি ও সেই বস্তুকেই বুঝিয়া থাকি। বাৎসল্যভাব যখন জননীকে অভিভূত করিয়া, তাঁহার স্নায়ু-মণ্ডলকে অধিকার করে ও সেই স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে তাঁহারা শরীরের শোণিত-প্রবাহ ও পেশিসমূহকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার দেহযষ্টিতে একটা বিশেষ ছবি ফুটাইয়া তুলে, সেই ছবিটীকেই বাৎসল্যের সত্যকার রূপ বলি। এ রূপ নিত্য অর্থাৎ যেখানে বাৎসল্য একটা বিশেষ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, সেখানেই এই ছবিটী ফুটিয়া উঠে। এই রূপ সার্ব্বজনীন অর্থাৎ সভ্য-অসভ্য, শ্বেতকৃষ্ণ, বিজ্ঞ-অজ্ঞ সকল জননীতেই ফুটিয়া উঠে। এই রূপ সার্ব্বভৌমিক—সকল দেশেই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

আর রসের এ সকল প্রকাশ জীব-দেহেতেই হয় বলিয়া, তাহার রূপ বা মূর্ত্তি আছে বলা কিছুতেই অসঙ্গত হয় না।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি বাৎসল্য-রসের রূপ বা মাতৃমূর্ত্তির কথাই বিশেষভাবে ও বিস্তৃত-রূপে বলিয়াছি। আর সর্ব্বপ্রথমেই বাৎসল্যের ও মাতৃমূর্ত্তির আলোচনা করিয়াছি এই জন্য যে এই মূর্ত্তিটী অনেকেই, ভাগ্যগুণে, স্বচক্ষে নিজের ঘরে বা প্রতি-বেশীদের ঘরে কখনও না কখনও দেখিয়া থাকিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু যেমন বাৎসল্যের, সেইরূপ অন্যান্য রসেরও এক একটী নিজ নিজ মূর্ত্তি আছে। যেভাবে বাৎসল্যের মূর্ত্তি জননীর দেহ-যষ্টিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠে, সেই ভাবে যখন যে রস কোনও ব্যক্তির অন্তরে জাগিয়া তাঁহার মনপ্রাণকে অধিকার ও অভিভূত করে, সেই রসের আপনার বিশেষ মূর্ত্তিটী সেই ব্যক্তির দেহে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। কোনও রসের মূর্ত্তিই নিতান্ত বিদেহী নহে।

এইরূপে যেমন বাৎসল্যের সেইরূপ মাধুর্য্যেরও একটা নিজস্ব মূর্ত্তি আছে। দাস্য এবং সখ্যেরও আছে। এ সকলের মধ্যে দাস্যরসের মূর্ত্তিটীই সর্ব্বাপেক্ষা সরল। কারণ দাস্যরসও তত জটিল নহে। প্রভুতে একান্ত আত্মসমর্পণ ও প্রভুর সেবাতে চরম কৃতার্থতা লাভ করাই দাস্যরসের ধর্ম্ম। প্রভুর প্রতি সম্ভ্রম, তাঁহার সেবাতে নিষ্ঠা, ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্য সাধনেই দাস্যরস তৃপ্তিলাভ করে। সুতরাং এখানে সম্ভ্রম ও আনুগত্যের ভাবটাই প্রধান। এই সম্ভ্রম ও আনুগত্যেরও একটা রূপ আছে। এই রূপও আমাদের মুখের ভাবে, চক্ষের চাহনিতে, চলাফেরার, বসা দাঁড়ানর ধরণেতে ধরা পড়িয়া যায়। যাঁহাকে অতিশয় সম্ভ্রম করি, তাঁহার দিকে চাহিতে গেলে, চক্ষু আপনা হইতেই আনত হইয়া আইসে। শরীরের সমস্ত পেশিগুলি শিথিল হয় না, কিন্তু কেমন যেন একটা নম্রভাব ধারণ করে। আর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা ফুটিয়া বাহির হয়। এই রূপের মধ্যে ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু বশ্যতা আছে; লোভের চিহ্ন নাই, অথচ সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে; হীনতা-বোধ নাই, কিন্তু অপূর্ব্ব দীনতা আছে; স্পর্দ্ধা নাই, কিন্তু বিলক্ষণ আব্দার আছে। সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য যতটা জটিল, দাস্যরস ততটা জটিল নয় বলিয়া ইহা যে একান্ত একটা সরল বস্তু, ইহার মধ্যেও যে অদ্ভুত, অপূর্ব্ব বিচিত্রতা নাই, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। দাস্যরসেও অশেষ প্রকারের তরঙ্গরঙ্গলীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই রস যখন জীবের অন্তরে জাগিয়া তাহার অন্তর্বাহ্য সমুদায় বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধিকার করে,—প্রভুই যখন দাসের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উপজীব্য হইয়া বসেন,—তখন এই রস দাসের স্নায়ুমণ্ডলীকে অধিকার ও তাঁহার পেশিসমূহে শক্তি সঞ্চার করিয়া, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া, আপনার নিজস্ব রূপটীকে ফুটাইয়া তুলে। দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর আমরা দাস্যমূর্ত্তিটী দেখিতে পাই না। কারণ

আমাদের সমাজেই দাস্যরস একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চে সুনিপুণ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মধ্যে, কখনও কখনও এ রূপটী দেখিতেও পাওয়া গিয়া থাকে।

সখ্যমূর্ত্তি

সখ্যরসটী দাস্যরস অপেক্ষা অধিক জটিল। "পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে।" বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রসিক সুজন-দিগের বিচারে দাস্যরস সখ্যরসের নিচে। সুতরাং দাস্যের গুণ সখ্যেতে থাকিবেই, কিন্তু সখ্যে যে একটা খোলাখুলি গলাগলি ভাব, যে একটা সাম্য-সম্বন্ধ থাকে, দাস্যে তাহা সম্ভবে না। দাস্যরস যখন বিশেষ গভীরতা লাভ করে, তখন দাসের দেহের স্নায়ুমণ্ডলকে যাইয়া অধিকার করে, এবং তাহারই জন্য তাঁহার মুখে চক্ষে ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, চালচলনে সকল বিষয়েই একটা বিশেষ ছবি ফুটিয়া উঠে। সখ্যেতেও তাহা হয়। আর সখ্যের রূপ বা ছবিটী ঠিক দাস্যের মতন হয় না। সখাও সখার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তদ্‌গতপ্রাণ হইতে পারেন। সখাও সখার সেবা করিতে পারেন, সখ্যেতেও সম্ভ্রম এবং আনুগত্য সকলই আছে, কিন্তু ক্ষেত্রগুণে এ সকল বস্তু এখানে যে আকারে ফুটে তাহা দাস্যেতে এগুলি যেভাবে ফুটে, তাহা অপেক্ষা কতকটা ভিন্ন। প্রভু সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কোনও আকারে উদাসীনতা প্রকাশ পাইলে দাস্যরস নষ্ট হইয়া যায়। প্রভুর উপস্থিতির বা প্রভুর সেবা বিষয়ে দাসের কোনও ভাবের, কি বাহিরের কি ভিতরের, বিন্দু পরিমাণ অনবধানতা বা ঔদাসিন্য থাকিতে বা জন্মিতে পারে না। জন্মিলে তাহাতে রসভঙ্গ হইয়া, অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অনবধানতা সখ্যরসের কোনও সাংঘাতিক ব্যাঘাত উৎপন্ন নাও করিতে পারে। সখার উপস্থিতিতে সখা উঠিয়া দাঁড়ান বা বসিয়া থাকুন, তাঁহাকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া আনুন বা না আনুন, তাঁর পায়ের নীচে বসুন কিম্বা ঘাড়ের উপরে চড়ুন, এ সকলে তাঁর প্রাণগত সখ্যরসের কোনও ইতরবিশেষ হয় না, হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং দাস প্রভুর নিকট দাঁড়াইলে তাঁর অন্তরগত রসের পীড়নে, চক্ষে মুখে, দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে, এ সকলে যে মূর্ত্তিটী প্রকাশিত হইবে, সখা যখন সখার কাছে যাইয়া দাঁড়ান, তখন কোনও মতেই সে মূর্ত্তিটী ফুটিবে না। সখ্যরস দাস্যরস অপেক্ষা সমধিক জটিল বলিয়া, এ রসে যতটা বৈচিত্র্য ফুটিবার অবসর আছে, দাস্যরসে ততটা নাই। সখ্যের রসবৈচিত্র্য ও রসলীলা দেখিতে হইলে, কিশোর-কিশোরীদিগের মধ্যেই তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। আর বড় বেশি অন্বেষণ করারও প্রয়োজন হয় না; ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে এ রসের শত শত প্রাণবিমোহন ছবি দিনের ভিতরে কতবারই না চক্ষে পড়ে। ইংরেজিতে যে বস্তুকে School boy বা School girl love বলে, তাহাতে এই অপূর্ব্ব সখ্যরসেরই বিচিত্র মূর্ত্তি সকল ফুটিয়া উঠে। সে বয়সে এই রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই অনন্য-প্রতিদ্বন্দিতা নিবন্ধন, কিশোর বয়সের এই

প্রেমেতেই এই সখ্যের নিত্যকার ও সত্যকার রূপটী অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা অতি অদ্ভুত কথা এই যে, বয়ঃসন্ধিকালে—শৈশব আর যৌবন যেখানে গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া যাইতে আরম্ভ করে —তখনকার সখ্যেতে এমন সকল বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, যাহা বস্তুতঃ সচরাচর কেবল মাধুর্য্যেতেই দেখা গিয়া থাকে। এই বয়ঃসন্ধিকালের বালকে বালকে ও বালিকায় বালিকায় যে অপূর্ব্ব স্নেহের, প্রেমের, সাম্যের, স্পর্দ্ধার, ঔদ্ধত্যের, আব্দারের, মানের, কখনও অনুরাগের কখনও বিরাগের, ক্ষণে কলহ ক্ষণে মিলন, ক্ষণে ক্রোধ ক্ষণে ক্ষমা,—এ সকল ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সখ্যের বিচিত্র স্বরূপ। আর এই সকল বিচিত্র ভাবের তাড়নায় ক্ষণে ক্ষণে এই সকল প্রণয়িগণের মধ্যে যে রস উচ্ছলিত হইয়া তাহাদের চক্ষে মুখে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, সর্ব্ব শরীরে ছাইয়া পড়ে, ও তাহার দরুণে ইঁহাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া যে জীবন্ত ছবি সকল ফুটিয়া উঠে, তাহাই সখ্যের রূপ। কৃষ্ণ-লীলার অভিনয়ে, গোষ্ঠের পালায় এ রসের স্ফূর্ত্তি ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, সুকুমার বালকগণকে লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা করা প্রয়োজন হয়। কারণ তাহাদের সুকোমল ও কামসম্পর্কশূন্য দেহেতেই কেবল সত্য সখ্যের বিশুদ্ধ রূপটী ফুটিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। যাহারা অনাচারে ও অত্যাচারে ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়া বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দেহে এ রসের মূর্ত্তিটীকে ধারণ করিবার শক্তি থাকে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মানবের জন্মকথা

যে সকল যন্ত্র শব্দ উচ্চারণে এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে, প্রথম হইতে ঐ সকল যন্ত্র পুষ্ট ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল কেন, অন্য যন্ত্র কেন পুষ্ট হইল না, তাহা বুঝা কঠিন নহে। পিপীলিকাগণ শুঁড় দ্বারা পরস্পরের সহিত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভাব বিনিময় করিতে পারে; হিউবার পিপীলিকার ভাষা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় লিখিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও প্রথম হইতে চেষ্টা করিলে অঙ্গুলিকেই বাক্‌যন্ত্রে পরিণত করিতে পারিতাম; কারণ যাঁহার অঙ্গুলিচালনা অভ্যাস আছে, তিনি, প্রকাশ্য সভায় কোন বক্তা দ্রুতবেগে বক্তৃতা করিলেও বধির ব্যক্তির নিকট অঙ্গুলি চালনা দ্বারাই তাহা জ্ঞাপন করিতে পারেন। কিন্তু হস্তকে এই কার্য্যে ব্যবহার করিলে অন্য কার্য্য সম্বন্ধে যে ক্ষতি হইত তাহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইত। আমাদিগের বাক্‌যন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণেরও তদ্রূপই, এবং উভয়েই উহা ভাব-বিনিময়ের নিমিত্ত ব্যবহার করি ও করে; সুতরাং ভাব বিনিময়ের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐ বাক্‌যন্ত্রও অধিকতর পুষ্টতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই কার্য্য নিকটবর্ত্তী

উপযুক্ত যন্ত্রাদির অর্থাৎ জিহ্বা এবং ওষ্ঠাধরের সহায়তায় সিদ্ধ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই উচ্চশ্রেণীর বানরগণের বুদ্ধিবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে উন্নতি লাভ না করা হেতুতেই উহারা বাক্য উচ্চারণ নিমিত্ত বাক্‌যন্ত্র ব্যবহার করে না। উহারা বাক্য উচ্চারণ করে না, কিন্তু দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হইত এরূপ বাক্‌যন্ত্র উহাদিগের আছে; অনেক পক্ষীরও গান করিবার উপযুক্ত যন্ত্র আছে, কিন্তু কখনও গান করে না। ঐ বানরগণের ও পক্ষিগণের অবস্থা তুল্য। বুলবুলের ও কাকের বাক্‌যন্ত্র সমভাবে গঠিত; কিন্তু বুলবুল বিচিত্র গান করিবার নিমিত্ত উহা ব্যবহার করে, অথচ কাক কেবল কা কা করিয়া থাকে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, মানুষের যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, বানরের তাহা হইল না কেন, তবে কেবল সাধারণ ভাবে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ ভাবে উত্তর পাইবার আশা করাও সঙ্গত নহে, কারণ প্রত্যেক জন্তু কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তৎ সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ।

বিভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি এবং বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি একই প্রকার; উভয়ই ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হওয়ার প্রমাণও একই প্রকার। ইহা আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু জীবের অপেক্ষা ভাষার গঠন আমরা বেশি দূর পর্য্যন্ত মূল অনুসন্ধান করিতে পারি, কারণ অনেক শব্দ নানাবিধ ধ্বনির অনুকরণে কিরূপে জাত হইল তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ হই। পৃথক্ পৃথক্ ভাষা ঐ ভাষা হইতে উৎপন্ন হওয়া হেতু অনেক স্থলে বিস্ময়কর একতা দেখা যায়, এবং উহাদিগের গঠন এক প্রকারে হওয়ায় গঠন-সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। কতিপয় অক্ষর অথবা ধ্বনি পরিবর্ত্তিত হইলে অন্যান্য অক্ষর এবং ধ্বনি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা [জীবতত্ত্বের] সহ-পরিবর্ত্তনের ন্যায়। ভাষা ও জীব—উভয় ক্ষেত্রেই অধিকাঙ্গত্ব দৃষ্ট হয় এবং দীর্ঘকাল নিয়ত ব্যবহারে পরিণাম ফল ইত্যাদিও তুল্য। উভয় ক্ষেত্রেই লুপ্তাবশিষ্ট অঙ্গ বিদ্যমান থাকে, ইহা আরও উল্লেখযোগ্য। "Am" শব্দের m অক্ষরের অর্থ "I" সুতরাং "I am" পদে অনাবশ্যক লুপ্তাবশেষ বিদ্যমান আছে। শব্দের বর্ণবিন্যাসে অনেক সময় প্রাচীন কালীয় উচ্চারণের লুপ্তাবশিষ্ট অক্ষর রহিয়া যায়। জীবের ন্যায় ভাষা সকলেরও শ্রেণী বিভাগ করা যায়; এবং উৎপত্তি অনুসারে অথবা অন্য লক্ষণ অনুসারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রধান ভাষা অথবা ভাষার কোন বিশেষ গঠন* প্রধান হইলে বহুবিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য ভাষাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, সার চার্ল্স লায়েল বলেন জাতির ন্যায় ভাষাও একবার বিনষ্ট হইলে পুনরায় জাত হয় না। এক ভাষার দুই জন্মস্থান থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা মিশ্রিত হইয়া ভাষার সঙ্কর উৎপন্ন করে। প্রত্যেক ভাষার পরিবর্ত্তনশীলতা আছে; নূতন শব্দ সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু স্মৃতিশক্তির সীমা আছে, সুতরাং এক একটী শব্দও সমগ্র ভাষাটীর ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া

* Dialects.

থাকে। ম্যাক্স্‌মূলার ভালই বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দসমূহের মধ্যে এবং ব্যাকরণসম্মত রূপ সকলের মধ্যে প্রতিনিয়ত জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে; যাহারা হ্রস্ব, সরল, উত্তম তাহারাই জয়ী হইতেছে। তাহাদিগের অন্তর্নিহিত উপযোগিতাবশতঃই জয়ী হইতেছে।" এই সকল গুরুতর কারণে কতিপয় শব্দ অপরাপর শব্দের স্থান অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটী কারণ আছে, নূতনত্ব এবং রুচি; কারণ মানবমন সকল বিষয়েই অল্প পরিবর্ত্তন খুব ভাল বাসে। জীবন-সংগ্রামে কতিপয় শব্দ টিকিয়া যায় অথবা রক্ষিত হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

অনেক অসভ্য জাতির ভাষা-গঠন অতি সুশৃঙ্খল এবং জটিল, ইহা হইতে অনেকে বিবেচনা করেন যে ঐ সকল ভাষা ঈশ্বরদত্ত অথবা উহাদিগের নির্ম্মাতাগণ সভ্য ও খুব কৌশলী ছিলেন। এফ, ডন্, শ্লেগেল লিখিয়াছেন, "অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বুদ্ধিহীন জাতিগণের ভাষা মধ্যেও আমরা অনেক সময় উত্তম ব্যাকরণসম্মত গঠন-কৌশল দেখিতে পাই; বাস্ক, ল্যাপোনিয়ান এবং আরও কতিপয় অ্যামেরিকান ভাষা সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে সত্য। কিন্তু ভাষাকে শিল্প বলা নিশ্চয়ই ভ্রম, কারণ শিল্প শব্দে মনুষ্য কর্তৃক যত্নপূর্ব্বক বিধিমত গঠিত বুঝায়। ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ এক্ষণে স্বীকার করেন যে বিভক্তি ও প্রত্যয়গুলি পূর্ব্বে পৃথক পৃথক শব্দ ছিল, তৎপর অন্য শব্দে যুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল শব্দ পূর্ব্বে বস্তু ও ব্যক্তির সম্বন্ধবাচক থাকায় আদিকাল হইতেই প্রায় সমস্ত জাতি উহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে ভাষার পূর্ণতা সম্বন্ধে কত সহজে ভ্রমে পতিত হইতে পারি; একটী জীবের কখন কখন দেড়লক্ষ খোসা থাকে, উহারা অতি উৎকৃষ্ট ভাবে ব্যাসার্দ্ধ রেখার ন্যায় সজ্জিত; কিন্তু কোন জীবতত্ত্ববিৎ এই শ্রেণীর জীবকে সমদ্বি-পার্শ্বিক জীব অপেক্ষা অধিক উন্নত বোধ করেন না, যদিও ইহাদিগের তত অধিক অংশ নাই, এবং যাহা আছে তাহাও অসম, কেবল দেহের দুই পার্শ্বস্থ অংশগুলি তুল্য। দৈহিক যন্ত্র সকল পৃথক পৃথক হওয়া এবং নির্দ্দিষ্ট অংশে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়াকেই জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ উন্নতির (পূর্ণতার) লক্ষণ বিবেচনা করেন; ইহাই সঙ্গত। ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই। যে সকল ভাষা শৃঙ্খলাহীন, সংক্ষিপ্ত, মিশ্র অথবা সঙ্কর; যাহারা সুস্পষ্ট শব্দ, অথবা প্রয়োজনীয় গঠন-পদ্ধতি বিজেতৃ কিম্বা বিজিত জাতির অথবা নবাগতগণের ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল ভাষাকে [ঐ হেতুতে] শৃঙ্খলাযুক্ত জটিল ভাষা হইতে অধিক উন্নত বিবেচনা করা সঙ্গত নহে।

এই সকল অসম্পূর্ণ এবং অল্পসংখ্যক বৃত্তান্ত হইতেই আমি বিবেচনা করিতে পারি যে, অনেক অসভ্য জাতির ভাষা-গঠন সুশৃঙ্খল এবং জটিল হওয়াতেই ঈশ্বর কর্তৃক পৃথক সৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয় না এবং স্পষ্ট উচ্চারিত বর্ণাত্মক ভাষা কেবল মানুষেরই আছে, এ হেতুতেও নিম্নতর জীব হইতে মানবের উৎপত্তি হওয়া বিশ্বাস করিবার অলঙ্ঘনীয় বাধা হয় না। (ক্রমশ)

শ্রীশশধর রায়।

উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতি

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় স্বদেশ-বস্তুকে কতটা যে ভাল বাসিতেন, তাঁর ঐকান্তিক সমাজানুগত্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু সাধনা পরিহার করিয়া, সাধনান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন করেন নাই। বরং এই বিদেশীয় ধর্ম্মসাধনকেই, আপনার জীবনে, সম্পূর্ণরূপে, নিজের দেশের সমাজ-বিধানের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সমাজানুগত্যের অন্তরালে কেবল একটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণশীলতাই দেখিতেন। প্রথম বয়সে উপাধ্যায় না কি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁর পরিণত বয়সের এই সমাজানুগত্যকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তাঁর পূর্ব্বকার ধর্ম্মবন্ধুগণ, পুরাতন কুসংস্কারের দিকে পুনরাবর্ত্তন বা রি-অ্যাকৃষণ (re-action) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু উপাধ্যায়কে এ জাতীয় রক্ষণশীল বা এই শ্রেণীর পুনরাবর্ত্তনকারী বা রি-অ্যাকষণারী (re-actionary) বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ।

উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন না ও বোঝেন না। "সন্ধ্যা"-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর "সন্ধ্যাতে" প্রায়ই সমাজের, বিশেষ নব্যশিক্ষা-ভিমানী সম্প্রদায়ের, কোনও কোনও শ্রেষ্ঠজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর, তীব্র, কখনও কখনও বা গভীর বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত লোকে কোনও প্রকারেই সম্পাদককে এক জন শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু উপাধ্যায়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁরা তাঁহার কথাবার্ত্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার অভাব দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পল্লীবাসীর কাহাকেও না কাহাকেও তার আবর্জ্জনরাশি পরিষ্কৃত করা অত্যাবশ্যক হয়। এ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু না কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দশের হিতের জন্য এ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি যে স্বভাবতঃই আবর্জ্জনা ভাল বাসে, এমন কথা যেমন বলা সঙ্গত হয় না, সেইরূপ সময়বিশেষে সমাজের নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে, সমাজের শ্রেষ্ঠজনকেও সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রীতিকর কর্ম্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে স্বল্পবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে নির্ব্বিকার-চিত্ত দেশ-সেবককে হীনচরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। "সন্ধ্যা"পত্রিকায়

সমাজের কোনও কোনও শ্রেষ্ঠজনকে যখন তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত বলিয়া, সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাশীলতা ছিল না, একেবারে সরাসারিভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ উপাধ্যায় "সন্ধ্যা" পরিচালনা করিতে যাইয়া, আপনার অন্তরকে কতটা পরিমাণে যে নিপীড়িত করিতেন, বহুদিন কাছে থাকিয়া, এক সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সকল আক্রমণ যে সর্ব্বদা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাও নহে। তবে অপর লেখকদিগের প্রবন্ধাদির উপরে তিনি প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর সমাজের "মেকি" নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবার প্রভাব নষ্ট না হইলে, সত্য ও সজীব স্বাদেশিকতা কখনওই ফুটিয়া উঠিবে না, ইহাও তিনি মনে করিতেন। এই জন্য আর কোনও কিছু বিচার না করিয়া উপাধ্যায় এ সকল লেখা পত্রস্থ করিয়া দিতেন। নতুবা, সত্য সত্যই যে লোকনিন্দায় তাঁর আনন্দ হইত, তাহা নয়। আর এ সকলে তাঁর প্রাণগত শ্রদ্ধাশীলতার অভাবও সূচিত হইত না।

প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা হইতে, সর্ব্বত্রই এক প্রকারের রক্ষণশীলতাও জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় রক্ষণশীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশই ছিল। তারই জন্য উপাধ্যায়ের হাত প্রাচীনের ও প্রতিষ্ঠিতের উপরে আঘাত করিতে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইত। এই জন্যই উপাধ্যায় প্রথম বয়সে আপনার কৌলিক ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট ধর্ম্মসংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া, কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রের নিজের চরিত্রে একটা রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাশীলতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল। এ বস্তু ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখায় ততটা পাওয়া যায় নাই। উপাধ্যায়ের প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেতেও বেশি দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। এই শ্রদ্ধাশীলতার প্রেরণাতেই, আমার মনে হয়, উপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া প্রথমে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ও শেষে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এই খানেই, তাঁর প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা ও রক্ষণশীলতার প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ-নীতির মূল ভিত্তিটী গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সর্ব্বত্রই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাজানুগত্যের একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া রহে। যেখানেই এই অনধীনতার ভাবটা প্রবল হইয়া উঠে, সেই খানেই সমাজানুগত্যটা ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া, পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাব খুবই প্রবল। এই জন্য ইহাদের মধ্যে সমাজানুগত্যও ক্রমশই কমিয়া গিয়াছে, এখন নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘে, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্য-মর্য্যাদা সমভাবে রক্ষিত

হইয়া, ধর্ম্মসাধনে ও সমাজ-জীবনে, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার ভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য এখানে সমাজানুগত্য যে ধর্ম্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই কারণেই, রোমক-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের ভাবটাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

অতএব এই সমাজানুগত্যটা ভাল হউক মন্দ হউক; যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক আর যাহা কিছুই হউক না কেন, ইহার অন্তরালে যে একটা বিরাট ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একটা খেয়ালের চাপে উপাধ্যায় প্রাচীন সমাজশাসন পরিত্যাগ করেন নাই; খেয়ালের চাপে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তনকারী বা রি-অ্যাকষণারীও বলা যায় না।

ফলতঃ আমাদের সমাজের যাহা যেরূপ আছে, তাহা সেইরূপই থাকিবে বা থাকা বাঞ্ছনীয়, উপাধ্যায়কে কোনও দিন এমন কথা বলিতে শুনি নাই। "বন্দে মাতরম্" পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নূতন কাগজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবে, ইহাই আমাদের উভয়ের বিচার্য্য বিষয় ছিল। বন্দে মাতরম্ সর্ব্ব বিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, আমি এই কথা বলি। উপাধ্যায় এ বিষয়ে একটু আপত্তি করেন। তাঁর মূল কথাটা আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তিনি বলেন—"সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি নই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাধীনে সমাজ-সংস্কার বলিতেই বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনার প্রভাবে, কতকগুলি বৈদেশিক আদর্শের স্বল্পবিস্তর অনুবর্ত্তনই বুঝাইয়া থাকে। এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারে আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমরা ফিরিঙ্গীর একটা নকলের নকলের মতন হইয়া উঠিতেছি। এটী আমি চাই না। ইহাতে সমাজের স্বাদেশিকতা নষ্ট হইয়া, সমাজের ও লোক-চরিত্রের সাংঘাতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। এই বিদেশীয় শক্তির প্রভাবকে প্রথমে আটকাইতে হইবে। স্বদেশের সমাজকে ও স্বদেশের জনগণকে সর্ব্বাদৌ আত্মস্থ করিতে হইবে। তারা আগে জাগুক। নিজেরা নিজেদের চিনিয়া লউক। তারপর, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া পিটিয়া শুধরাইয়া লইবে।"

এই কথাগুলিতেই উপাধ্যায়ের সমাজনীতির যেমন, তেমনি তাঁর স্বাদেশিকতারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ উপাধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটী স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। Social organism বা সমাজ-জীব আধুনিক বিদেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত পরিভাষাটী তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর কথা-

বার্ত্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজ-তত্ত্বটীকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা খুবই বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সকল সমাজেরই ভাল ও মন্দের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ কথাও তিনি বলিতেন। এইজন্যই বিলাতী সমাজের মন্দটীকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভালটীকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ নিতান্ত অসাধ্য, সেইরূপ আমাদের নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁত ভাবে রক্ষা করিয়া, কেবল তার মন্দটুকুকে একান্ত ভাবে পরিহার করাও একান্ত অসম্ভব। জীবদেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল তাহার অন্তরস্থ রোগের বীজাণু সকল প্রবল হইয়া অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আরম্ভ করে, প্রাণীর সুস্থ সবল অবস্থায় তারা নির্জীব ও অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপই সত্য। সমাজ মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে তখন সমাজের রীতি-নীতি এবং শাসন-সংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও তাহার মন্দটুকু হতবল ও হীনতেজ হইয়া অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু সমাজের প্রাণশক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেই এ সকল অন্তর্নিহিত উৎপাত ও অমঙ্গলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সুতরাং সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, সেখানে বল সঞ্চার করা, এ সকলই সমাজসংস্কার সাধনের প্রথম ও মুখ্য কর্ম্ম। এটী করিতে পারিলে, সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধি সকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। উপাধ্যায় এই কারণেই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব-প্রযত্নে, স্বদেশী সমাজের প্রাণমধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উত্তেজক ঔষধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রব সকলকে প্রশমিত করিবার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এ কথাটী না বুঝিলে, উপাধ্যায় কেন যে শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারের কথা তেমন বেশী বলিতেন না, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বা সম্ভব হইবে না।

উপাধ্যায়ের ভূয়োদর্শন এই ভাবটীকে বিশেষভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, করাচীতে যখন রোমক খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছিলেন, তখন, উপাধ্যায় যতটুকু পরিমাণে সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ততটুকুও ছিলেন কি না, সন্দেহ। আমরা সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া কোন্ পথে চলিতেছি, এই পথ ধরিয়া চলিলে পরিণামে কোন্ স্থানে যাইয়া পৌঁছাইতে হইবে,—বিলাতে যাইয়া ইংরেজ-সমাজের গতিবিধি ও রীতিনীতি, মত ও আদর্শ এবং ভাবস্বভাব সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উপাধ্যায় তাহা বেশ করিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। আর ঐ পথ যে আমাদের পক্ষে

ভয়াবহ পরধর্ম্মের পথ,—উপাধ্যায় ইহাও বিশ্বাস করিতেন। এই কারণেই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কতকটা পরিমাণে স্বদেশের সামাজিক জীবনের ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। কামোপভোগপ্রবণ যৌবন-কালে যাঁরা বিলাত যান, তাঁদের কথা যাহাই হউক না কেন, বেশী বয়সে, বিশেষতঃ প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, যাঁহারা বিলাতী সমাজের ভাব-স্বভাব ও মতিগতি পরীক্ষা করিবার প্রত্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকেই, বোধ হয়, স্বদেশের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের সমধিক পক্ষপাতী হইয়া বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। অন্ততঃ উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এরূপই ঘটিয়াছিল। এই জন্যই উপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এতটা শঙ্কিত হইতেন।

এরূপ শঙ্কা যে একান্তই অস্বাভাবিক বা নিতান্তই অযৌক্তিক, এমনই কি বলিতে পারা যায়? ইংরেজি শিখিয়া, য়ুরোপীয় ঝাঁঝের ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ও গণতন্ত্রতার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া, আমরা এক সময়ে সমাজ-সংস্কারব্যাপারটা যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে তাহা তত সহজ নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই অল্পে অল্পে জন্মিতেছে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় সমাজ-চিত্রের ধ্যানে এই জ্ঞান বাড়িয়া উঠে বৈ হ্রাস হয় না। এক এক করিয়া, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারের মুখ্য প্রয়াসগুলিকে ধীরভাবে তাকাইয়া দেখিলেই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। উপাধ্যায় এটী খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, এতটা সরাসরিভাবে সমাজসংস্কারের চেষ্টায় আপনিও প্রবৃত্ত হন নাই, অপরকেও এ কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতেন না।

প্রচলিত সংস্কার-প্রয়াসিগণ আমাদের জাতিভেদ-প্রথাটা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। এ ব্যগ্রতা স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে এই জাতিভেদ-প্রথা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সমাজের স্থবিরতা যে অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করাও যায় না। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও মহাজনেরা সময়ে সময়ে, এই বংশগত জাতিভেদপ্রথার সংস্কার সাধন যে করেন নাই, তাহাও নহে। জাতিভেদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও বহু কালাবধি হিন্দুসমাজে যে বীজ-মিশ্রণ ঘটিয়া আসিয়াছে, ইহাও বোধ হয় প্রমাণ করা কঠিন নহে। এইরূপ বীজ-মিশ্রণে কেবল বিবিধ বর্ণসঙ্করেরই উৎপত্তি হয় নাই, যাঁরা সমাজে সঙ্করবর্ণ বলিয়া পরিচিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে এরূপ বীজমিশ্রণ ঘটিয়াছে, ইহারও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় মার্গের সাধক ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই এই জাতিভেদ-প্রথাকে স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমানেও যে এ প্রথার সংস্কার প্রয়োজন নয়, অথবা সংস্কার হইবে না, এমন কথা কে বলিবে? উপাধ্যায় কখনও এমন কথা বলেন নাই, তিনি জীবনের কোনও বিভাগে এরূপ

স্থবিরতা ও বদ্ধভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি যে ভাবে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকেরা জাতিভেদ-প্রথাকে ভাঙ্গিতেছেন বা ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, উপাধ্যায় তাহার সমর্থন করেন নাই। আর করেন নাই এই জন্য যে আমরা এই পথে আমাদের প্রাচীন জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বিদেশের আমদানী আর এক প্রকারের ঘৃণ্যতর ও সহস্রগুণে অধিক অমঙ্গলকর জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছি। বিদেশীয় সমাজে ইহাকে জাতিভেদ বলে না বটে। তাঁহারা ইহাকে শ্রেণীভেদ বলেন। কিন্তু যে নামেই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, বস্তু দুটী এক না হইলেও যে নিতান্তই স-জাতীয় ইহা কি অস্বীকার করা যায়? আর এখানে প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্থবিরতা-পোষক যে বংশগত জাতিভেদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহার বদলে আমরা, সংস্কারের নামে, সমাজের বিপ্লবসাধক, পদগত বা ধনগত যে বিলাতী শ্রেণীভেদকে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমাদের সমাজে বরণ করিয়া লইতেছি, তাহার দোষ তদপেক্ষা বেশি কি না? এই বিষয়ে উপাধ্যায় এই প্রশ্নটাই তুলিতেন। আর এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেবল একটা— বিলাতী শ্রেণীভেদের দোষ আমাদের জাতিভেদের দোষ অপেক্ষা আকারে ভিন্ন হইলেও, ওজনে কম নহে। আমাদের জাতিভেদ মানুষের মনুষ্যত্ব-বস্তুকে হয় ত কোনও কোনও স্থলে চাপিয়া রাখে, বিলাতী শ্রেণীভেদ তাহাকে পিষিয়া মারে। সুতরাং যেরূপ করিয়াই হউক, এই পুরাগত জাতিভেদকে ভাঙ্গিয়া দিলেই যে আমাদের সমাজ উন্নতির পথে ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে, উপাধ্যায় এমনটা বিশ্বাস করিতেন না।

জাতিভেদের সংস্কার সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও সেই কথা। যেটাকে ভাঙ্গিয়া যেটাকে গড়িতে যাইতেছি, তাহা কি বেশি ভাল? যেমন প্রচলিত জাতিভেদ, সেইরূপ বর্ত্তমানে যে আকারে বাল্যবিবাহ-প্রথা দেশে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের ঠিক সহায় যে নয়,—এ কথা উপাধ্যায় জানিতেন এবং মানিতেন। এ কুপ্রথা এক সময়ে আমাদের সমাজেও ছিল না। কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ বিশেষ অবস্থাধীনে ইহা প্রচলিত হয়, স্থির করা বহু-বিস্তৃত-ও-সূক্ষ্ম গবেষণা-সাপেক্ষ। কিন্তু যখন এবং যে কারণেই ইহা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হউক, না কেন, হিন্দুসমাজে যখন প্রাণশক্তি প্রবল ছিল, তখন সমাজ আপনা হইতেই ইহার আনুসঙ্গিক অমঙ্গল ফলগুলি, একান্ত ভাবে না হউক, অন্ততঃ বহুল পরিমাণে নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। সমাজের সে প্রাণশক্তির হীনতা নিবন্ধন ক্রমে এ সকলও ব্যর্থ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ বাল্যবিবাহ-প্রথা যতটা অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, কিছুকাল পূর্ব্বেও তত অনিষ্টকর ছিল না। এ সকলই সত্য।

সকলে না হউক, অতি নিষ্ঠাবান অথচ চিন্তাশীল হিন্দু যাঁহারা, তাঁহারাও এ সকল স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রথাকে জোর করিয়া বন্ধ করিলে, আর তাহার বদলে বিলাতী ছাঁচের যৌবন-বিবাহ ও যুনর্নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে আমাদের সমাজের বেশি অমঙ্গল আশঙ্কা হইবে কি না, এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহারা সহসা এ সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না।

এইরূপে আমাদের সমাজবিধানে যে সকল মন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া উপড়াইয়া দিলে, তার ভাল যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে কি না, এই ভয়েই উপাধ্যায় মহাশয় সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এতটা শঙ্কিত হইয়া চলিতেন। নতুবা আমাদের সমাজে বর্ত্তমান অনিষ্টকর প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে অন্ধ ছিলেন, কিম্বা এ সকলের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ইচ্ছা করিতেন না,—এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না।

অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্য ও সমাজনীতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। উপাধ্যায় স্বদেশী সমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে দেখিতেন। ভক্ত লোকেও প্রয়োজন হইলে আপনার দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া থাকেন, কিন্তু ভাঙ্গিবার জন্য তাহা ভাঙ্গেন না, অন্য দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্যও তাহাকে নষ্ট করেন না। আপনারা দেবতার সেবার সৌকর্য্যার্থেই ভাঙ্গিয়া থাকেন এবং ভাঙ্গিবার সময়, শান্ত সমাহিত, শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া, ভক্তির সঙ্গেই ভাঙ্গেন। এরূপভাবে যদি কেহ হিন্দুসমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, উপাধ্যায় তাহার সে চেষ্টাকে মাথায় করিয়া লইতেন, ইহা জানি। আর প্রচলিত সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে এই সংযম, এই শ্রদ্ধা ও এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তিনি ইহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশ-বস্তুকে কেবল ভালবাসিতেন যে তাহা নয়, আন্তরিক ভক্তিও করিতেন। তাঁর সমাজানুগত্যের মধ্যে ও সমাজনীতির মূলে এই অপূর্ব্ব স্বদেশভক্তিটা সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিয়া, তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

পাণ্ডবগণের জন্ম।

সেই সেই দেবতাগণের দৈবসঙ্গমে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রী ঐ ব্যাপার দেখিয়া কুন্তী যাহাতে তাঁহাকে ঐ মন্ত্র দেন তজ্জন্য পাণ্ডুকে অনুরোধ করিলেন। কুন্তী সপত্নীকে দেবতাবিশেষের ধ্যান করিতে বলিলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধ্যান করিলেন। কুন্তী মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের আহ্বান করায় তাঁহারা মাদ্রীকে যমজ পুত্র দেন। পাণ্ডব-

গণের এই জন্ম অমানুষিক ব্যাপার বটে, কিন্তু তাঁহাদের বহু পরেও যাঁহারা স্বীয় গুণে মনুষ্যজাতির উপাস্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ অমানুষ-জন্মের উল্লেখ হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত, আধুনিক সুসভ্য জগতের উপাস্য 'পরমহংস সিদ্ধ যিশুর জন্মবৃত্তান্তও এইরূপ অলৌকিক। তাঁহার মাতাও জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে বিনা পুরুষসংযোগে কুমারী দশায় পরম ভাগবত যিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন। হে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুঙ্গবগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন যে যদি প্রভু যিশুর দৈবজন্ম বিশ্বাস করিতে পারেন, যুধিষ্ঠিরাদির এই দৈবজন্ম কেন অবিশ্বাস করিবেন

যাঁহারা যিশুর অলৌকিক জন্ম বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও ঐ জন্মবশতঃ যিশুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন না। ঐরূপ দৈবজন্ম অতিরঞ্জিত বলিতে হয় বলুন, কিন্তু তা বলিয়া যে যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব ছিল না ইহা বলা যায় না। যে সমস্ত কুতার্কিক যিশুর অস্তিত্বেও সন্দিহান, তাঁহাদের নিকট যদি আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে যুধিষ্ঠিরাদি যথার্থই ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিশ্বাস করা উচিত।

কৃপ, কৃপী, দ্রোণ, ধার্ত্তরাষ্ট্র, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মও অলৌকিক। অনেকে বলিতে পারেন যে যদি কেবল পাণ্ডবদের জন্ম অলৌকিক হইত, তাহা হইলে তাহা না হয় অতিরঞ্জিত বলিয়া ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ইতিবৃত্ত বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু মহাভারতের অধিকাংশ চরিত্রেরই যখন জন্ম অলৌকিক তখন ভারতীয় ইতিবৃত্তকে কবির কল্পনা ভিন্ন আর কি বলিব? তাঁহারা বলিতে পারেন যে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র হওয়া এবং গান্ধারীর একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করা ও সেই মাংসপিণ্ডকে ব্যাসের বিভাগ করা এবং তাহা বিহঙ্গডিম্বের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠা ঠাকুরমার গল্প। সেইরূপ শরবনে পতিত বীর্য্য হইতে কৃপ ও কৃপীর জন্ম, দ্রোণে পতিত ভরদ্বাজের বীর্য্য হইতে দ্রোণের জন্ম এবং যজ্ঞবেদি হইতে যাজ ও উপযাজের আহুতিবলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনীর জন্মও উপকথা মাত্র। সত্য বটে, জগতে সাধারণতঃ যে নিয়মে মনুষ্য আসে, সেই নিয়ম অনুসারে বলিতে গেলে ঐরূপ জন্ম সম্ভব নহে; কিন্তু পরমাত্মার শক্তি বিশ্বতোমুখী। ভক্ত কবি যে গাইয়াছেন "অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব; প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব" তাহা মিথ্যা নহে। প্রকৃতির শক্তির সীমা নাই। দেখুন কিছুদিন পূর্ব্বে মনুষ্য উড়িতে পারে বলিলে কতই উপহাস করিতেন; রাবণের পুষ্পকরথ শুনিয়া কতই হাসিতেন, রাবণ অগ্নিকে ও বায়ুকে বাঁধিয়াছিলেন ইহা পাঠ করিয়া উপকথা মনে করিতেন। কিন্তু এক্ষণে উড়িবার যন্ত্র আবিভূর্ত দেখিয়া, বৈদ্যুতিক আলোক ও বৈদ্যুতিক তালবৃন্ত দেখিয়া বাল্মীকির কথা সম্ভবপর মনে করিতেছেন। বিজ্ঞানের বলে যত অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে ততই অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। আধুনিক

বৈজ্ঞানিক প্রথা ও প্রাচীন ঋষিদের প্রথার পার্থক্য এই যে, বৈজ্ঞানিক প্রথা এক জড়শক্তির দ্বারা অপর জড়শক্তির জয়। ঋষিগণের প্রথা ছিল যে প্রকৃতির কারণীভূত চিচ্ছক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে জয়। তাহাও যে কতক সম্ভব ইহা হরিদাস সাধু, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, বামা ক্ষেপা বাবা প্রভৃতি আধুনিক সাধুগণ দেখাইয়াছেন। সুতরাং কি ব্যাসের, কি ভরদ্বাজের, কি যাজ উপযাজের তপোবলে যে ঐরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা অসম্ভব নহে। আর তপোবল বিশ্বাস না করিলেও মহাভারতের মূল অংশ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মহাভারতের মূল ইতিবৃত্ত

কুরুপাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মহাভারতের বঙ্গীয় সংস্করণের ৬১ অধ্যায়ে দেওয়া আছে। ১ম অধ্যায়েও ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ মুখে মুল ঘটনা সন্নিবেশিত। মূল ইতিবৃত্ত এই যে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্য পান নাই। পাণ্ডু রাজা হইয়া দিগ্বিজয় করতঃ সম্রাট হন। পরে 'নির্ব্বেদপ্রযুক্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি কুন্তী ও মাদ্রী এই দুই' পত্নী সমভিব্যাহারে বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন ও হিমালয়ের উত্তরে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে মুনিগণের সহিত বাস করেন। তথায় তপস্যার ফলে দেববরে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীগর্ভে নকুল ও সহদেব পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্র হয়। তাঁহাদের বাল্যাবস্থায় পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে মাদ্রী সহমৃতা হন। কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে ঋষিগণ হস্তিনাপুরে দিয়া যান। ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে পাণ্ডুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি বহু পুত্র হয়। কুরু-বালকদের শিক্ষার ভার কৃপের উপর পড়ে। অল্পদিন কৃপাচার্য্যের নিকট শিক্ষা পাইবার পরই কৃপের ভগ্নীপতি দ্রোণ উহাদের আচার্য্যরূপে ব্রতী হন। দ্রোণের নিকট উহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষাগুণে অর্জ্জুন আচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য হন। কুরুবালকদের সাহায্যে দ্রোণ দ্রুপদকে জয় করিয়া, দ্রুপদ যে তাঁহাকে পূর্ব্বে অপমান করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ লন; কিন্তু ঔদার্য্যবশতঃ তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই দেন। দ্রুপদ বৈরনির্য্যাতন আশায় দ্রোণঘাতী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞফলে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিলে, তাঁহাকে হন্তা জানিয়াও, গুরু দ্রোণ তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। কন্যা কৃষ্ণবর্ণা থাকায় কৃষ্ণা ও যজ্ঞফলে হওয়ায় যাজ্ঞসেনী নাম পান। এদিকে পাণ্ডবগণের শৌর্য্যবীর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হইল। তাঁহাদের বধ-সাধন জন্য দুর্য্যোধন বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অসদুদ্দেশ্য সফল হইল না। ধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তখন কূটবুদ্ধি দুর্য্যোধন নিরীহ পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বারণাবতে পাঠাইলেন। বিদুরের সাহায্যে পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বাহিরে প্রচার

হইল যে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব দগ্ধ হইয়াছে। পথে ঘোর নিশীথে বনে হিড়িম্বকে ভীম নিপাতিত করিয়া হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। হিড়িম্বার সহিত বিবাহ কবির কল্পনা বলিতে হয় বলুন, তাঁহার গর্ভে ঘটোৎকচের উৎপত্তি অমানুষিক নহে। পরে পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ-বেশে একচক্রানগরে আসিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে অতিথি হইয়া বক রাক্ষসকে বধ করতঃ ঐ প্রদেশ নিরুপদ্রব করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-বেশে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চভ্রাতার বিবাহে দ্রুপদ প্রথম অসম্মত হইলেও পরে ব্যাসদেবের কথায় তাহা স্বীকার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের প্রকাশ হইল। বিদুরের মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে প্রত্যানয়ন করতঃ তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থ ও দুর্য্যোধনকে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দিতে প্রস্তাব করিলে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থের অরণ্য কাটিয়া রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ পত্তন করিলেন। ক্রমে পাণ্ডবগণের শৌর্য্যবীর্য্যে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রধান হইয়া উঠিল। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নিখিল আর্য্য-অনার্য্য রাজবর্গকে পরাজিত করিয়া অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে সম্রাটপদভাক্ করাইল। রাজসূয় যজ্ঞের অধিষ্ঠান হইল। পাণ্ডব-গণের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে পাপী দুর্য্যোধনের ঈর্ষা আবার জ্বলিল। তখন শকুনি কর্ণ প্রভৃতি কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় কুচক্রী দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করতঃ তাঁহার রাজ্যধনজন প্রভৃতি কাড়িয়া লইলেন। যুধিষ্ঠির আত্মহারা হইয়া শেষে আপনাকে ও চারি ভ্রাতাকে এমন কি পত্নী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ করিয়া খেলিলেন ও হারিলেন। দ্রৌপদীর উপর দুঃশাসন অনার্য্য ব্যবহার করিলেন। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালার উক্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি নিজ কুপুত্রকে তিরস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাদি ফিরাইয়া দিলেন। গৃহ-বিবাদ যেন মিটিয়া গেল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে আবার সব ঘুরিয়া গেল! আবার দ্যূতক্রীড়া হইল। পণ রহিল—যে পক্ষ পরাজিত হইবেন সেই পক্ষ রাজ্যচ্যুত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন এবং অজ্ঞাতবাসকালে জ্ঞাত হইলে পুনরায় ঐরূপ দ্বাদশবর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ব্যবস্থা হইল। যুধিষ্ঠির হারিলেন। ভারতের দুর্দ্দিন আসিল। এই গৃহবিবাদে যে অনল জ্বলিল, তাহাতে নিখিল ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। বিদুর ইহা বুঝিয়াছিলেন তাই তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু দৈবের বিচিত্রগতি; ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির স্বীয় সত্য পালন করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষের পর স্বরাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন। পাপী দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি দিতে চাহিলেন না। উভয় পক্ষ যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিলেন। ভারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয়জাতির এমন কি আর্য্যসমাজের আশ্রিত অথচ সেই সমাজ বহির্ভূত দরদ পহ্লব চীন হূন প্রভৃতি জাতিও যুদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলেন। কুরুরাজ্যের জন্য যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল তাহার ফলে ভারত হীনবীর্য্য হইয়া

পড়িল। এই ভীষণ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি কৌরব-সেনাপতি পদে বৃত হইলেন ও একে একে প্রাণ দিলেন। উভয় পক্ষের লোক-সংক্ষয়ে তদানীন্তন সুসভ্য জগৎ নিস্তেজ হইল। দুর্য্যোধনও প্রাণ হারাইলেন।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু ঘটিলে জয়োল্লাসে বীরগণ অসাবধান হইয়া শিবিরে শয়ন করিলেন, সেই সুযোগে অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণ নিশীথে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বীরগণকে হত্যা করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রও হত হইল। সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি ও কৃষ্ণ অপর স্থানে শয়ন করায় রক্ষা পাইলেন। পর দিন অশ্বত্থামা ভীমার্জ্জুন হস্তে পরাজিত হইলেন, কিন্তু গুরুপুত্র বলিয়াই প্রাণে রক্ষা পাইলেন। যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি করাইলেন, অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর এবং কুরুনারীগণের দশা দেখিয়া আত্মীয়-বধ হেতু তিনি কাতর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের ও ব্যাসের বাক্যে তাঁহার ঐ মোহময় নির্ব্বেদ অপগত হইলে, তিনি শুভদিনে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিদুর সঞ্জয় প্রভৃতি মন্ত্রিত্ব পাইলেন। ভীমাদির উপর কার্য্যের ভার পড়িল। প্রাণপণে তাঁহারা প্রজা-নুরঞ্জনে ব্যাপৃত হইলেন। ধর্ম্মরাজের শাসনগুণে ধরায় আবার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল। এইরূপে অনেক বৎসর কাটিবার পর যদুবংশ সুরাদেবীর প্রভাবে আত্মকলহে ধ্বংস হইল। শ্রীকৃষ্ণও ভূভার হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সংবাদে ব্যথিত হইয়া অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন।

মহাভারতের এই মূল বৃত্তান্তে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। ইহার প্রতি বিশ্বাস ভারতে চিরদিন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ডবগণের চরিত্র মহনীয় এবং তাঁহাদের অবদান, অদ্ভুত। শৌর্য্য; বীর্য্য ও ধর্ম্মে পঞ্চ-পাণ্ডব ভারতবাসীর উপাস্য। তাঁহাদের জন্ম বিবরণে ও কর্ম্মে যে অলৌকিকতা, তাহার কারণ বুঝিতে হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে মহাভারত-কাহিনী তাঁহাদেরই বংশধর অবিচলিত প্রতাপ নরপতি জন্মেজয়ের নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সে কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্তিপ্রাণ ভারতে মহাপুরুষদিগর চরিত্র কীর্ত্তন।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

করঙ্ক *

ছোট গল্পের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে, তাহা একদিকে যেমন সরস ও কুতুহলো-দ্দীপক হইবে, সেইরূপ অন্যদিকে অত্যন্ত হালকাও হইবে। পড়িতে কোনও প্রকারের ক্লান্তির উদ্রেক হইবে না। বুঝিতে ভাবনা ব্যয় করিতে হইবে না।

* শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ছোট গল্পের বহি। মূল্য ৷৷০ কলিকাতায় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সম্ভোগে কোনও প্রকারের অবসাদ পশ্চাতে রাখিয়া যাইবে না। বাসন্তী বনস্থলীর বরণ-কিরণ-সৌরভ-সম্ভার লোকে যেমন সহজে সম্ভোগ করে, দেখে আর মুগ্ধ হয়, আর সন্ধ্যাসমাগমে নগরের ধূলিকোলাহল-পূর্ণ জনতার মধ্যে ফিরিয়া আসিলে, কেবল সেই সম্ভোগের স্নিগ্ধ স্মৃতিটুকু মাত্র প্রাণে জাগিয়া থাকে, সাহিত্যে ছোট গল্পও সেইরূপ হইলেই সর্ব্বোচ্চ উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। পড়া সাঙ্গ হইলে একখানি পরিষ্কার ছবি, একটী সংযত রস, একটা ভাবের হাওয়া, নীরবে, ধীরে, মাদকতা ও চাঞ্চল্য-শূন্য হইয়া মনের মধ্যে জাগিয়া থাকিবে।

বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্যে ছোট বড় অনেকেই ছোট গল্প লিখিতেছেন, এই সকল গল্প-লহরীর একটা সবিস্তার সমালোচনা করিতে পারিলে, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের এই বিভাগেও বাঙ্গালী কতকটা কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমার মনে হয় যে, আজি কালি বিলাতে সচরাচর উচ্চাঙ্গের পত্রিকাদিতেও যে সকল ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়া থাকে, তার তুলনায় আমাদের ছোট গল্পগুলি সর্ব্বতো-ভাবেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গৃহীত হইবে।

কিছুদিন হইতে ইংরেজি সাহিত্যে এক জাতীয় বর্ব্বর রস অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। অসভ্য লোকেরা রসের নিতান্ত বাহ্যপ্রকাশকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সম্ভোগ করিয়া থাকে। দৃশ্যে বর্ণের আতিশয্য, কর্ম্মে আস্ফালনের প্রাবল্য, এগুলিতেই বর্ব্বরসাধনা-সুলভ রসের বিশেষ প্রকাশ হইয়া থাকে। আর আজি কালি বিলাতের কি রঙ্গমঞ্চে কি সাহিত্যক্ষেত্রে এই colour and actionটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যে সংযম উচ্চাঙ্গের রস-সম্ভোগের প্রধান অঙ্গ, যে সমাহিত ভাবের ভিতর দিয়াই গভীরতম রসের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেখানে আজি কালি চারিদিকেই তাহার একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই জন্য গল্পের রাজ্যে অসংযত কল্পনার আশ্রয়ে Penny Dreadfulএরই প্রসার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। মাসিকে, সাপ্তাহিকে, এমন কি দৈনিক সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত, এ জাতীয় গল্পের ছড়াছড়িতে ইংরেজের রুচিবিকার জন্মিতেছে। ফলতঃ হার্পার প্রভৃতি মার্কিণী মাসিকপত্রে যে সকল ছোট বড় উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে, সাহিত্যকলার দিক দিয়া বিচার করিলে, বিলাতের মাসিকপত্রে তেমনটী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও যে এ বিষয়ে এতটা হীনতা দেখা যাইতেছে, ইহার অনেক কারণ আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ বোধ হয় এই যে যাবতীয় সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে ছোট গল্প লেখা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ।

আর এটী এমন কঠিন কাজ এই জন্য যে এখানে বহুবিধ অবান্তর বিষয়ের সাহায্যে লেখক কিছুতেই আপনার অন্তরের কবিকল্পনার নিজস্ব দীনতাকে ঢাকিয়া রাখিবার অবসর পান না। ইহার তুলনায় একটা বড় গল্প লেখা অনেকটা সহজ।

কারণ সে ক্ষেত্রে বর্ণনা-বাহুল্যে নানাবিধ আনুসঙ্গিক চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া, গল্পের প্রাণভূত যে লোক-চরিত্র, তাহা কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না উঠিয়াছে, সে মূল প্রশ্নটা কিয়ৎ পরিমাণে চাপিয়া রাখিতেও বা পারা যায়। বিশেষতঃ লেখকের যেখানে অনন্যসাধারণ শব্দসম্পদ থাকে, যেখানে তিনি কবিতার ভাষার সাহায্যে আপনার বর্ণনাদিতে বিবিধ ব্যভিচারী রস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেখানে গল্প হিসাবে কোনও গ্রন্থ অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও, শুদ্ধ আপনার রচনা-নিপুণতাগুণে, তাহা লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া সাধারণ সাহিত্যে একটা অল্পবিস্তর স্থায়ী স্থানলাভ করিতেও পারে। কিন্তু ছোট গল্পে ইহার কোনওই সম্ভাবনা নাই। চিত্রকলায় যাহাকে pastel drawing or chalk drawing বলে, সাহিত্যকলায় ছোটগল্প অনেকটা তারই সমশ্রেণীর। পেষ্টেলাঙ্কনে লোকবিশেষের প্রতিকৃতিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটাকতক স্থূল রেখার সাহায্যে, পরিষ্কার রূপে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ছোটগল্পেও ঠিক সেইরূপ। এখানে গুটিকতক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, অতি অল্প পরিসরের মধ্যে, দুচারিটী লোকের ভিতরকার প্রাণটাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সার্থকতা লাভ হয় না। এই জাতীয় ছোটগল্প রচনায় বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে, আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে পরিমাণে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন, আর কেহ তাহা করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

সুধীবাবুর গল্পের একটা প্রধান গুণ এই যে, এগুলি প্রায়ই অতিশয় ছোট। "করঙ্কের" প্রথম গল্পটী স্বল্পায়তন পৃষ্ঠার চৌদ্দটী পৃষ্ঠা মাত্র পূর্ণ করিয়াছে। পড়িতে বোধ হয় ১০।১২ মিনিট সময় লাগে। অথচ এই সামান্য চিত্রপটে, দুই তিনটী ঘটনার সাহায্যে, তিনি (১) দরিদ্র ভদ্র বিধবা সুবোধের মা (২) জমিদার-পত্নী 'হাবলা'র মা, (৩) সুবোধ (৪) হাবলা—এই চারিটী চরিত্রকে কেমন উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এঁরা সকলেই যেন আমাদের পরিচিত, কতবার যেন ইঁহাদের দেখিয়াছি, কতদিন যেন ইঁহাদের চরিত্রের আলোচনা করিয়াছি। ভদ্রগৃহস্থের বিধবাটী কিরূপে সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনার একমাত্র পুত্রটীকে প্রতিপালন করিতেছেন, জমিদার-গৃহিণীর ইদানীন্তনলব্ধ ধনের মত্ততায় কত প্রাচীন আভিজাত্য-মর্য্যাদা পদদলিত হইতেছে, আর এঁদের পুত্র দুটী এইরূপ বৈষয়িক অবস্থার বৈষম্য সত্ত্বেও, কেমন সরলভাবে, কতটা ঔদার্য্য সহকারে, পরস্পরকে কত না ভালবাসে,—এ সকল যেন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইয়া আছে—সুধীবাবুর 'মিতে' পড়িতে পড়িতে তাহাই মনে হয়। এখানে কিছুই অলৌকিক, কিছুই বিস্ময়কর, কোনও কিছুই প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতার বাহিরের কথা নাই। অথচ আদ্যোপান্ত কেমন চিত্তাকর্ষক!

যেমন তাঁর "মিতে" সেইরূপ "কাসিমের মুরগী"ও অতি ছোট, অতি সরস, অতি সরল, অথচ অতিশয় কলাকুশলতাপূর্ণ একটী

চিত্র। এখানেও একটী বালক ও তার মাতা, কটীএ বৃদ্ধ, ও গোটা দুই তিন মুরগী, এই মাত্রই গল্পটীর সরঞ্জাম। আর ইহার সাজ-সজ্জারও কোনও আতিশয্য বা বাহুল্য নাই। কিন্তু ছবিটী যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একান্তই নিখুঁত। দুখানি কাটি নাড়িয়া বাজিকর যেমন কত কি না দেখায়, সুধীবাবুও সেইরূপ দুচারিটী সামান্য বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনাকে নাড়িয়া চাড়িয়া এই অদ্ভুত সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ ইহাতে ঐন্দ্রজালিক কিছুই নাই। তাঁর প্রত্যেক ঘটনাটী, প্রত্যেক মানুষগুলো, নিরেট সত্য। সর্ব্বদাই এ সকল ঘটনা ঘটিতেছে। সর্ব্বত্রই এ লোকগুলো চলা ফেরা করিতেছে। আর এই স্বাভাবিকতার দরুণই সুধীবাবুর এই গল্পগুলি এমন অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

তার পর "ঠাকুর দেখা"। এই গল্পটীতে সুধীবাবু আপনার কবিপ্রতিভার আর একটা দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "মিতে" ও "কাসিমের মুরগী" এই দু'টী গল্পের রসেতে জটিলতা বড় নাই। দুইটীর মধ্যেই সখ্যরস ফুটিয়াছে। কারণ বালক কাসিমের মুরগী ক'টী তার খেলারই সঙ্গী ছিল। কিন্তু "ঠাকুর দেখা" শীর্ষক গল্পে, সুধীবাবু গভীরতর ও জটিলতর স্ত্রী-চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ গল্পের অবলম্বন ও আশ্রয় সখ্য নহে কিন্তু মাধুর্য্য। "ভগবতী" ধনগর্ব্বিতা, মুখরা, অপ্রিয়ভাষিণী, সকলই সত্য। এইজন্য সরলচিত্ত, উদারহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ "মহেন্দ্র" বড় দুঃখে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু "ভগবতীর" শত দোষ সত্ত্বেও, সে নারী, পতিপ্রেম-পিয়াসিনী। কি করিয়া সে প্রেম পাইতে হয়, বেচারী তাই জানিত না। অবোধ বালকে যেমন সুমিষ্ট কমলালেবু সযত্নে মৃদুহস্তে ছাড়াইয়া খাইতে জানে না বলিয়া সবটাই মুখে পুরিয়া দাঁত দিয়া চিবাইয়া, খোসার তিক্তরসে বিরক্ত হইয়া তাহা "থু থু" করিয়া ছুড়িয়া ফেলে, অথচ সে নেবুর প্রতি যে তার লোভ ছিল না বা নাই, এমন নহে; হতভাগিনী "ভগবতী"ও তাহাই করিয়াছিল। তার অপ্রিয়ভাষণ, কলহ-মুখরতা, সকলই পতিপক্ষে ফলতঃ ও মূলতঃ মাধুর্য্যেরই বিকার ছিল। মহেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না। তাই মানিনীর মানও ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে দুর্জ্জয় মান, কেমন করিয়া, একদিন বালির বাঁধের মতন ভাঙ্গিয়া গেল, সুধীবাবু সুনিপুণ তুলিকায় সে করুণছবিটী অঙ্কিত করিয়া,—ভগবতীর পূর্ব্বজীবনের কর্কশতা ও যে প্রকৃতপক্ষে কেবল তাঁর প্রাণগত প্রেমেরই বিকৃতি মাত্র ছিল, ইহা চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়াছেন। "মিতে" বা "কাসিমের মুরগী" পড়িয়া গভীরতর ও জটিলতর রসাঙ্কনেও যে গ্রন্থকারের এমন অসাধারণ নিপুণতা আছে, ইহা বোঝা যায় না। "ঠাকুর দেখা"তেই ইহার প্রমাণপরিচয় পাওয়া যায়।

"করঙ্কের" প্রায় প্রত্যেক চিত্রই এইরূপ বিবিধ রস ফুটাইয়া পাঠকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। বাংলার সকল ছোট গল্পের বই যে আমি পড়িয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু যতটা পড়িয়াছি, তাহাতে সুধীবাবু বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্পের লেখকশ্রেণীর মধ্যে অতিশয় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

নিত্যানন্দ সর্ব্বদাই বাল্যভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। স্নেহশীলা মালিনী দেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। নিতাই ক্রমে তাঁহার স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মালিনী দেবী অসহায় শিশুর মত সদা সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। নিতাই বালকের মত সকলের সহিত কলহ করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্য এক দিন নিমাই তাঁহাকে কহিলেন "নিতাই, এ বয়সে সকলের সহিত কলহ করা কি ভাল ?" শুনিয়া নিত্যানন্দ "বিষ্ণু, বিষ্ণু" করিয়া উঠিলেন এবং নিমাইকে বলিলেন "আমি কি পাগল ? আমি কি চঞ্চলতা করিয়াছি বল দেখি ?" নিমাই কহিলেন—"কেন অনাবৃষ্টি ত তোমার নিত্যকার্য্যের মধ্যে।" নিতাই উত্তর করিলেন "আমার দোষ ধরিয়া আমাকে ভাত দিবে না, তাহার ছলা খুঁজিতেছ বুঝি" এই বলিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং উলঙ্গ হইয়া মস্তকে বস্ত্র বন্ধন করতঃ জোড়ে জোড়ে লম্ফ দিতে লাগিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে ধরিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন।

একদিন শ্রীবাসের গৃহ হইতে একটী পিত্তলের বাটী কাকে লইয়া যায়। বাটীটী গৃহদেবতার ঘৃতপাত্র ছিল। ঠাকুরের পাত্র কাকে নিয়াছে, এই কথা শ্রীবাস জানিতে পারিলে ক্রুদ্ধ হইবেন মনে করিয়া মালিনীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় নিতাই আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া কাককে বাটী প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন কাক বাটী আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌর নিজগৃহে আলাপে রত আছেন এমন সময় দিগম্বর বেশে নিত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "উলঙ্গ হইয়াছ কেন ?" নিত্যানন্দ কেবল "হয় হয়' বলিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন "কাপড় পর।" নিতাই বলিলেন "আমি আজি চলিয়া যাইব।" গৌর বলিলেন "এ কি করিতেছ ?" নিতাই উত্তর করিলেন "আর খাইতে পারি না।"

গৌর—জিজ্ঞাসা ক'রি এক, জবাব দেও আর, এর মানে কি ?

নিতাই— শবার খাবো।

গৌর তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "নিতাই সাবধান, শেষ আমাকে ডুবিতে পারিবে না।"

তখন নিতাই বলিলেন "এখানে ত থাক নাই।"

গৌর পুনরায় মিনতি করিয়া বলিলেন "নিতাই দয়া করিয়া কাপড় পর।"

নিতাই—আমি ভোজন করিব।

অপারগ হইয়া গৌর নিতাইকে ধরিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন।

শচীদেবী সকলই দেখিয়াছিলেন, তিনি তখন নিতাইকে লইয়া ভোজন করাইতে বসিলেন। নিতাই কিছু খাইলেন—কিছু ছড়াইয়া ফেলিলেন। শচী তাহাতে তিরস্কার করায় নিতাই বলিলেন "ফেলিব না, এক ঠাঁই দিলেন কেন?"

শচী—আর ত ঘরে কিছুই নাই—আর এখন কি খাবে?

তখন নিতাই বলিলেন "তুমি ঘরে গিয়া দেখ—নিশ্চয়ই সন্দেশ আছে।" শচীদেবী গৃহ মধ্যে গিয়া দেখিলেন "চারিটী সন্দেশ রহিয়াছে।" বিস্মিত হইয়া সেই সন্দেশ আনিয়া শচীদেবী নিতাইকে প্রদান করিলেন, নিতাই আনন্দে তাহা ভক্ষণ করিলেন।

নিতাইকে গৌর এমনি শ্রদ্ধা করিতেন যে এক দিন নিতাইএর নিকট হইতে তাঁহার একখানা কৌপিন লইয়া শত খণ্ড করতঃ ভক্তগণ মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং ভক্তির সহিত তাহার পূজা করিতে এবং নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিতে সকলকে উপদেশ দিলেন।

শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। প্রত্যহ যাবতীয় ভক্ত সমাগত হইতেন এবং গৌর ও নিত্যানন্দকে বেষ্টন করিয়া উন্মত্তভাবে কীর্ত্তন করিতেন। একদিন সংকীর্ত্তন কালে, নিমাই হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাঞি পণ্ডিতকে ডাকিয়া কহিলেন "রামাঞি, তুমি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতকে বল 'যাহার জন্য বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে, যাহার জন্য কত না ক্রন্দন করিয়াছিলে, যাহার জন্য কত দিন উপবাস করিয়াছিলে, তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। তোমারই জন্য তিনি ভক্তিযোগ বিতরণ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন'—তুমি শীঘ্র আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাও।' নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তাও তাঁহাকে জানাইবে এবং আমার পূজোপকরকণ সহ তাঁহাকে সস্ত্রীক আসিতে অনুরোধ করিবে।" রামাঞি কাল বিলম্ব না করিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করতঃ সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে রামাঞির বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন

"কোথায় গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে॥"

কিন্তু পরক্ষণেই আবার রামাঞিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বল বল রামাঞি, কেন তুমি আচম্বিতে আমার গৃহে আগমন করিলে?" তখন রোদন করিতে করিতে রামাঞি বলিলেন "আমি আর কি বলিব? তুমি ত সকলই জান?

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥"

তখন আচার্য্য উর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; উদ্বেলিত আনন্দবেগ ধারণে

অসমর্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "প্রভুকে আমিই আনিয়াছি" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং "আমারই জন্য আমার প্রাণনাথ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছেন" বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আচার্য্য বলিলেন—"রামাঞি, যদি তিনি আমারই প্রভু হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তিনি আমাকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। তাহা যদি দেখিতে পাই, আমার মস্তকে যদি চরণ তুলিয়া দেন, তবে জানিব তিনিই আমার প্রাণনাথ।" এই বলিয়া পূজার সমস্ত উপকরণ লইয়া সপত্নীক রামাঞির সহিত নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে কি ভাবিয়া রামাঞিকে বলিলেন "আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে গিয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি গিয়া প্রভুকে বলিবে অদ্বৈত আসিল না।" এই বলিয়া অদ্বৈত নন্দন আচার্য্যের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীবাসগৃহে গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সহ বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ হুঙ্কার করিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন এবং "নাড়া আসিতেছে, নাড়া আসিতেছে, নাড়া আমার ঠাকুরভাব দেখিতে চাহিতেছে" বলিতে লাগিলেন। তখন নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন—গদাধর তাম্বুল কর্পূর প্রদান করিলেন, ভক্তগণ যুক্ত করে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামাঞি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নাড়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া আমার পরীক্ষার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি এখন ফিরিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আইস। রামাঞি তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতকে আনিতে ছুটিলেন। অদ্বৈত সমস্ত শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে শ্রীবাসগৃহে আগমন করিলেন, এবং দূর হইতে স্তবপাঠ করিতে করিতে সপত্নীক গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল—দেখিলেন জ্যোতির্ম্ময় দেহ বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, অনন্ত তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া আছেন। তখন স্তম্ভিত আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন "কি দেখিতেছ আচার্য্য! তোমারই কাতর রোদনে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।" তখন অদ্বৈত নানাভাবে গৌরের স্তব করিয়া সস্ত্রীক তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। ভক্তবৎসল গৌরও অদ্বৈতের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া তাহাকে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তখন সেই ভক্তগণ মধ্যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল। সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যান্তে আপনার মালা অদ্বৈতের গলায় অর্পণ করিয়া গৌর কহিলেন 'আচার্য্য, তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর।" তখন নিষ্কামযোগী ভক্তরাজ অদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন "আর কি বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছি সকলই পাইয়াছি।

তোমার সাক্ষাতে করি আপনে নাচিনুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইনুঁ ॥
কি চাহিমু প্রভু কি বা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিনুঁ প্রভু তোর অবতার ॥
কি চাহিমু কি বা নাহি জানহ আপনে।
কি বা নাহি দেখ তুমি কি বা দরশনে ॥

ক্ষণকাল পরে পুনরায়—

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যেচে মনে বাধে ॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা ॥"

একদিন সংকীর্ত্তনান্তে উপবিষ্ট হইয়া গৌর "পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি" বলিয়া অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক শ্রীকৃষ্ণের নাম। ভক্তগণ প্রথমে ভাবিলেন বুঝি বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই গৌর রোদন করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যানিধি উপাধি শুনিয়া তাঁহারা সংশয়াপন্ন হইয়া, গৌর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার জন্য তিনি রোদন করিতেছিলেন। তখন গৌর বলিলেন "পুণ্ডরীক চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাহ্যিক বিষয়ীর আচার পালন করেন—কিন্তু অন্তরে তাহার মত ভক্ত দুর্লভ। তাহার অদর্শনে আমি বড় কষ্ট ভোগ করিতেছি।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বহুসংখ্যক দাস দাসী সমভি-ব্যাহারে নবদ্বীপে সমাগত হইলেন। মুকুন্দ দত্তের নিবাস চট্টগ্রামে। তিনি বিদ্যানিধিকে জানিতেন। একদিন প্রিয়-বন্ধু গদাধরের সহিত মুকুন্দ বিদ্যানিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। গদাধর দেখিলেন বিদ্যানিধি রাজপুত্রের ন্যায় মহামূল্য চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র আস্তরণ শোভিত খট্টার উপর উপবিষ্ট আছেন। দুইজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত পাখাদ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। বিদ্যানিধির ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া গদাধরের মনে অবজ্ঞার উদয় হইল। তখন মুকুন্দ স্বীয় স্বাভাবিক সুকণ্ঠে ভাগবত হইতে আবৃত্তি করিলেন।

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥"

অসাধ্বী রাক্ষসী পুতনা যাহার বধেচ্ছায় কালকূটসম্পৃক্ত স্তন তাহাকে পান করাইয়াও তাহার নিকটে তাহার ধাত্রীর উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছিল তদপেক্ষা দয়ালু আর কে আছে—যাহার শরণ লইব?

এই শ্লোক পঠিত হইবামাত্র বিদ্যানিধির নয়নে বন্যা ছুটিল। তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া "বোল বোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল এবং তিনি উন্মত্তের মত "কৃষ্ণরে বাপরে" বলিয়া করুণ কণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন—এবং ঈদৃশ ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যানিধি

পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; দীক্ষার দিন স্থির করিয়া গদাধর মুকুন্দের সহিত প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন রাত্রিকালে বিদ্যানিধি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে অলক্ষিত বেশে শ্রীবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু গৌরের দর্শন লাভ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণেক বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া "কৃষ্ণরে বাপরে" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার কাতর ক্রন্দনে সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর অগ্রসর হইয়া বিদ্যানিধিকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং "বাপ পুণ্ডরীক আজি তোমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম" বলিয়া হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। গৌরের নয়ন জলে বিদ্যানিধির দেহ সিক্ত হইল। গৌর বলিলেন "প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে ইঁহার জন্ম। আজি হইতে ইহার নাম হইল পুণ্ডরীক প্রেমনিধি।"

যথাকালে গদাধর প্রেমনিধির নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

২

জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির বিষয় বহু বিস্তৃত, কিন্তু জয়দেবে লালসার যেরূপ উদ্দাম গতি, যেরূপ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, বিদ্যাপতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। জয়দেবে পূর্ব্বরাগ ও প্রথম মিলনের চিত্র নাই, আভাসে তাহাদের উপযোগী ভাবাবলীর নির্দ্দেশ করা আছে মাত্র। জয়দেবে প্রবাসচিত্রও নাই, অতএব শতবর্ষব্যাপী প্রিয়বিরহ হেতু শ্রীরাধার দারুণ ব্যথার চিত্রও নাই। তাঁহার কাব্যের বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত; বসন্ত-সমাগমে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিকের উদ্‌ভ্রান্তি বশতঃ তৎপ্রণয়বিধুরা শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া অন্য যুবতীবৃন্দের সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সেই চিত্র শ্রীরাধা আপন চক্ষে দেখিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত খেদে কাতর হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও ক্ষণিক মোহের অবসানে শ্রীরাধার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পরে সখীর সাহায্যে উভয়ের মিলন, মানভঞ্জন ও বিহার। সংক্ষেপতঃ এই কয়টী কথা লইয়া গীতগোবিন্দ বিরচিত। এই কাব্যের ভিতর মাত্র তিনটী চরিত্র,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও সখী। তাহার মধ্যেও আবার সখী নিজের কথা কহে না, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার কথাই কহে, অতএব বিস্তৃত ভাবে দুইটী হৃদয়ের কথাই গীতগোবিন্দে লিপিবদ্ধ। ইহাতে শাসনাদি নাই, সখীতে সখীতে সম্ভাষণ বা জল্পনা নাই, সুবাগ্মিতার সহায়তা গ্রহণ নাই, ছল-কপটতা নাই, লুকোচুরি নাই, হেঁয়ালী-প্রবন্ধ নাই, আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ নাই; আছে কেবল দুইটী হৃদয়ের প্রবল, সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য্য

স্রোত। গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে ভালবাসার মুখে সকলই ভাসিয়া যাইতেছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই ভাব শেষ কালে আসিয়াছে, কিন্তু সে বড় শেষে। প্রথমে তাঁহার কাব্যে অনেক হাবভাব, অনেক ছলচাতুরি, আত্মগোপন, সংসার ও প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতগাবিন্দ সে সকলের ধার ধারে না।

গীতগোবিন্দের শ্রীরাধার চরিত্র লইয়া বিচার আরম্ভ করা যাউক। প্রথমেই কবি দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক বিরহেই কত কাতর; সেই স্বল্পক্ষণস্থায়ী বিরহের ব্যথাও তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বসন্তকুসুমসুকুমার দেহকে প্রপীড়িত করিয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, প্রবল চিন্তায় তাঁহার মর্ম্ম ব্যাকুল হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে। জয়দেব কবি বসন্তের কোকিলের পঞ্চম তানের মত সুমধুর সুরে বসন্তের গান ধরিয়াছেন, সে গান শ্রীরাধার বিরহব্যথারূপ অনলে ঘৃতসংস্পর্শের কাজ করিয়াছে, আমাদের কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে একটা মধুর আবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। ললিতলবঙ্গলতার কোমল আশ্লেষে আজ মলয়সমীরণ উৎফুল্ল হইয়া বেড়াইতেছে, সেই কোমলস্পর্শে নিজেও কোমল হইয়াছে। আজ নির্লজ্জা পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া, গাছগুলাও ফুলের হাসি হাসিয়া লইতেছে, এমন সরস সময়ে—এমন দুরন্ত সময়ে কি না

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে।
স্ফুরদতিমুক্তলতা-পরিরম্ভণ-
পুলকিতমুকুলিত-চূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত-
যমুনা-জল পূতে ॥

একে প্রকৃতির দৌরাত্ম্য, তাহার উপর প্রিয়বিরহ। তোমার হৃদয়ে দুঃখ আছে বলিয়া বাতাস ফুলের রেণু ছড়ানও বন্ধ করে না, এবং কেতকীর গন্ধ মাখিয়া তোমায় গায়ে আগুন ছড়ানও বন্ধ করে না; “ইহ হি দহতি চেতঃ” বলিয়া মধুকরনিকর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, কোকিলও কুহু কুহু রবে দিক্ সকল মুখরিত করিতে ছাড়ে না। কবি বসন্তের শোভা তিল তিল করিয়া সখীর মুখ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে “চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী” যুবতীবৃন্দের সহিত কিরূপ ভাবে ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহারাই বা কত হাবভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সখী তাহাও রাধার কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছে, শ্রীরাধা সখীর সহিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সকল লীলা দেখিয়াছেন। গীতগোবিন্দকে যে ভাবেই দেখা যাউক, এই বর্ণনাগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। জয়দেবের সহজ কবিত্ব এই সকল বর্ণনায় উছলিয়া উঠিয়াছে। এক একটী শ্লোকে এক একটী নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের বর্ণনায় কবির উদ্দেশ্য সেই সময়োপযুক্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর যথাযথ সংস্থাপন একটা environment এর সৃষ্টি।

সেই জন্যই জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রিয়াকর্ষণের সকল উপচার,—মন ভুলাইবার সকল প্রকার উপায়—স্তরে স্তরে সাজাইয়াছেন, এবং সেই সকল অবস্থা ও দৃশ্য সখী সহচারিণী শ্রীরাধাকে দেখাইয়াছেন। এই মধুর উল্লাসময় বসন্ত কালে কোথায় প্রিয়বঁধু তাঁহার সহিত প্রেমরসে নিমগ্ন থাকিবেন, তা না করিয়া কি না তিনি শত সুন্দরী পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া—

মুগ্ধ বধূনিকরে
* * * বিলসতি কেলিপরে।

শুধু তাহাই নহে, রাধাকে সখী দেখাইতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি স স্মিত চারু-পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্॥

বৈষ্ণব যাঁহারা তাঁহারা জানেন যে এইরূপ ঘটনা সংস্থাপনের কি উদ্দেশ্য, কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি। যাঁহারা শুধু কাব্য হিসাবেই গীতগোবিন্দকে দর্শন করিবেন তাঁহারাও বুঝিবেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার ভালবাসা ফুটাইবার জন্যই কবি দুই জনকেই এই পরীক্ষানলে ফেলিয়াছেন।

প্রথমে দেখা যাউক, এই বিসদৃশ দৃশ্য দেখিয়া শ্রীরাধার মনে কি ভাবের উদয় হইল। কবি বলিয়াছেন যে এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীরাধার মনে ঈর্ষার উদয় হইল—হওয়াই সম্ভব; কারণ যাহারা তাঁহার প্রাণাধিককে তাঁহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, তাহাদের প্রতি ঈর্ষা না হওয়া বড়ই অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ যাহার মনে ভালবাসা আছে, তাহার পক্ষে এমন হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব রাধা আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, অন্যত্র চলিয়া গেলেন, ইহাও স্বাভাবিক। তাঁহার আর একটী ভাব উপস্থিত হইল তাহাও স্বাভাবিক। "শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই সকলের অপেক্ষা ভালবাসেন" তাঁহার এই গর্ব্ব টুটিয়া গেল, এবং সেই বোধের সহিত হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া গেল; তাই তিনি আজ অতি দীনা, বুঝি মাথা তুলিয়া কথা কহিবারও তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই গর্ব্বহানির বিশেষ উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কবি "সাধারণ প্রণয়ে হরৌ" এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়া হরির অপক্ষপাতিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব মাত্রেই বুঝেন যে ভগবান্ সকলকেই ভালবাসেন, শুধু একজনকেই ভালবাসেন না, এবং ভগবৎ সম্বন্ধেও গর্ব্ব অনেক সময় স্বাভাবিক হইলেও ভাল নহে, তাই শ্রীরাধিকা, যিনি ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহাকেও এই গর্ব্ব পরিত্যাগের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। ভগবানের ভাবে বিভোর হওয়া চাই,—দীনহীন হইয়া, দেমাকের উপর নহে। এই স্থলেই আবার ভক্তের পরীক্ষা এবং প্রণয়েরও পরীক্ষা, তাই সখীর প্রয়োজন। বৈষ্ণব নিদানে সখীর স্থান বড় উচ্চ, ফলে সখী ব্যতিরেকে রাধাকৃষ্ণলীলারস পুষ্ট হয় না। নিঃস্বার্থ ভক্তি এই সখীদের, ইহারা নিজেদের জন্য কিছু চাহে না, নিজেদের বিষয় ভাবে না, ভক্তকে ভগদুন্মুখী করিয়া, ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিয়াই

পরিতৃপ্ত হয়, নিজের সুখ চাহে না, রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধিয়াই কৃতার্থ হয়। ইহাই জয়-দেবের সখীচরিত্রের মূল সূত্র এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেবই প্রথম সখী-চরিত্রের স্রষ্টা; এ চরিত্র তিনি কোনও পুরাণে পান নাই। সখীর চরিত্র অবলম্বনে রাধার চরিত্র তিনিই প্রথম ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা এখন রাধাচরিত্রের অনুসরণ করিব।

আমরা দেখিয়াছি যে প্রণয়গর্ব্বিতা রাধিকা আজ "দীনা" তাই তিনি মধুকর-কম্পিত কোনও একটী কুঞ্জবনে বসিয়া—বসিয়া বলিলে ঠিক হয় না—যেন মাটির সহিত মিশিয়া "লীনা" হইয়া সখীকে মনের কথা নিবেদন করিতেছেন। কি সে মনের কথা? অনুযোগ নাই, অভিযোগ নাই, কেবল সেই রূপের স্মৃতি সেই মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখের মধ্যে তাঁহার প্রাণনাথকে কি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল তাহারই বর্ণনা, আর এততেও, এত দেখিয়াও তাঁহার মন সেই বিশ্বাসঘাতী প্রণয়ীকে স্মরণ করিতেছে কেন, ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ। এই কি হৃদয়হীনার পরিচয়? আমাদের আদর্শ ও মনের ভাব এখন এত বদলাইয়াছে যে "ভ্রমর" বোধ হয় এখন ঘরে ঘরে, অথচ ভ্রমর কেবল লোকমুখে শুনিয়া, চোখে কিছু না দেখিয়াই স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু রাধা নিজের চ'খে প্রণয়ীর বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়াও তাঁহারই চিন্তায় ব্যাকুল। সখী বলিতেছে, "তবে তাহাকে ভাব কেন?" তাহার উত্তরে শ্রীরাধার মুখে কি উদার, কি গভীর প্রণয়পূর্ণ বাক্যই না কবি জয়দেব বসাইয়াছেন—

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলতৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা,
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি
কিম্

বৈষ্ণব কৃত অনুবাদ,—

শুন সখি মোর মন বিপর্য্যয় হৈল।
কৃষ্ণ গুণগ্রাম মন জপিতে লাগিল॥
সখী কহে শুন রাধা আমার বচন।
তোমা ছাড়ি অন্য সহ করয়ে রমণ॥
তবে কেন তুয়া মন তাহারে স্মঙরে।
বুঝিতে না পারি কথা কহ দেখি মোরে।
রাধা কহে শুন সখি আমার আকুতি
কৃষ্ণ বিনা মোর মন না চলয়ে কতি।
ভ্রমেতে না করে ক্রোধ কৃষ্ণ গুণ বিনে
কৃষ্ণ পরিতোষ সদা করিছে ধেয়ানে॥
দোষ দূরে ত্যাগ কৈল চাহি দেখিবারে।
আপন মরম সখি কহিল তোমারে॥
যুবতীর মধ্যে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
আমা বিনা নানা সুখ বাড়িল অপার॥
পুনরপি মনোরম্য করিছে কামনা।
কি করিব কহ সখি বাক্যের যোজনা॥

প্রতিকূল সমালোচককে প্রশ্ন করি—এই কি হৃদয় না থাকার প্রমাণ? এই কি ইন্দ্রিয় লোলুপার কথা? এই একাগ্রতা, এই ক্ষমা, এই তিতিক্ষা এই একনিষ্ঠতা কি কেবল ইন্দ্রিয়সুখাস্বাদনের ফল, না ইহাকে ভাল বাসা—ভালবাসা তো একটা ক্ষীণ, হাল্‌কা কথা—প্রগাঢ় প্রেম বলা যাইতে পারে? ইন্দ্রিয়সুখছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি

ক্লেদময়ী, অবসাদময়ী, ক্ষণিক প্রীতি ভিন্ন তাহার সাধ্য নাই যে হৃদয়ে কোনও স্থায়ী ভাবের সৃষ্টি করে। যে শুধু ইন্দ্রিয় সুখ খোঁজে, তাহার কাছে কি প্রিয়বিরহে জগৎ সুখশূন্য হয়, চাঁদের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়, ফুলের হাসি শুখাইয়া যায়? তার কাছে কি এমন সরসবসন্তসুশোভিতা সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির কিছুই ভাল লাগে না? যার ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল, অত্যন্ত পরিপক্ক না হইয়াছে সে কি এমনি করিয়া আত্মাভিমান বর্জ্জন করিতে পারে? সে কি এমনি করিয়া অদোষদর্শী, নিত্যবদ্ধহৃদয় হইতে পারে? তাহা যদি হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে কবি জয়দেবের শ্রীরাধিকা ইন্দ্রিয়চপলা নায়িকা মাত্র নহেন, তাঁহার দেহের সহিত তাঁহার মন, প্রাণ ও প্রণয় মহাযজ্ঞের আহুতি হইয়া তাঁহার হৃদয়-দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আর এইরূপ হইয়াছে বলিয়াই শ্রীরাধার অন্য কোনও চিন্তা নাই, অন্য কোনও বিষয়ের স্মৃতি নাই, তাঁহার প্রবল প্রণয়ের স্রোত সহস্র বাধাকে অতিক্রম করিয়া প্রিয়তমরূপ মহাসাগরের দিকেই ধাবিত হইয়াছে। এমন অবস্থাতেও যাহার মনে প্রথম সমাগম-লজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিয়তমের সকল রহস্য, সকল বিলাস, সকল আদর হৃদয়ে অনন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, সে যদি প্রণয়িনী না হয়—তবে প্রণয়িনী কাহাকে বলা যাইতে পারে তাহা তো বুঝিতে পারি না। এত দূর যদি তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাও মানিতে হইবে যে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দে ভাল জিনিষ আছে।

কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা এই জয়দেবের শ্রীরাধার! তাঁহার মনের কি অপূর্ব্ব একাগ্রতা; তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ অন্যাসক্ত, তিনি নিজে বুঝিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহার ভালবাসা বিফল, আশাহীন, তথাপি তাঁহার মুখে এক কথা—

"গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীবৃতং পশ্যামি
হৃষ্যামি চ ॥"

বিদ্যাপতির শ্রীরাধাও প্রেমিকা, কিন্তু বলিতে কি তিনিও বোধ হয় জয়দেবের রাধার মত এত অনন্যচিন্তাপরায়ণা নহেন, বুঝি তাঁহাতেও এত আত্মাভিমানবর্জ্জন দেখিতে পাই নাই। যখন বিদ্যাপতির রাধিকা দেখিলেন যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নয়—তখন তিনি বড় রাগ করিলেন এবং কৃষ্ণের সহিত মিলন সাধনে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের উপর বড় অনুযোগ ও কৃষ্ণের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না।

বোললি বোলে উত্তিম পত্র রাখ।
নীচ সবজ জন কী নহি ভাখ ॥
হমে জে উত্তিম কুল গুণমতি নারি।
এত বা নিত্য মনে হলব বিচারি ॥

"উত্তম লোক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, নীচসম্বন্ধ (নীচ কুলোদ্ভব) ব্যক্তি কি না বলে? আমি উত্তম কুলের গুণবতী নারী, ইহা নিজের মনে বিচার করিও।"—পরিষদ সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও তাঁহার টীকা।

ইহাও কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, কারণ বিদ্যাপতির রাধিকার তখনও শ্রীকৃষ্ণ ও নিজের মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধান

ছিল—সংসার। কিন্তু জয়দেবের রাধিকা নিজের ও শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে কোনও ব্যবধান রাখেন নাই, তাঁহার পক্ষে "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই।" তাই তিনি সখীকে কাতর ভাবে নিবেদন করিতেছেন—সখি! আমি যে তাহার দোষ দেখিতে পাই না, তাহার উপর রাগ করিতে জানি না, সব অবস্থাতেই তাহার উপর সন্তুষ্ট আছি, এই দেখ সহস্র যুবতীর অটল ব্যবধান ভেদ করিয়াও আমার নয়ন তাহাকে দেখিতেছে, আমাকে দেখিয়া সেই সময় তাহার যে বিস্ময়বিস্ফারিত বদনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি ও হৃদয় আনন্দময় হইয়া উঠিতেছে; তার বিরহ যে আমার অসহনীয়। তাই বলি

সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথ ভাবিতয়া
সবিকারম্।

তারপর জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের জাগরণের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা শ্রীরাধার বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিয়া পরে সে কথা বলিব। যাহার হৃদয়ে অত আকাঙ্ক্ষা, অত লালসা তাহার বিরহ-যাতনা কত নিদারুণ তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যখনই শ্রীরাধার মনে উদয় হইয়াছে যে বুঝি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলেন, তখনই তাঁহার সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে—মনের বাঁধন ছিঁড়িয়াছে—দেহের আদর ঘুচিয়াছে—ফলে তাঁহার জীবনের সাধই যেন মিটিয়া গিয়াছে। এই নৈরাশ্যময় হৃদয় বহিয়া তাঁহার যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা কবি জয়দেব নিপুণ তুলিকার সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন,—নিজের কথায় নয়, সখীর কথায়। সখী ভিন্ন রাধার মনের কথা দেহের ব্যথা কেহও বুঝিতে পারে না, তাই সখী সেই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে—কি সুন্দর বর্ণনা, কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি! বিরহিণী রাধিকার বর্ণনায়—কবির কল্পনা উল্লসিত হইয়া শত সুন্দর ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই সুন্দর ভাবাবলী লইয়াই পরে বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের পাগলিনী শ্রীরাধার চিত্র আঁকিয়াছেন। জয়দেব বিরহবর্ণনে নিজের কৃতিত্ব প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছেন, এবং বিপুল উৎসাহের সহিত এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল নিপুণ ভাবচিত্রের কথা ধরিলেও এই বর্ণনা গুলি উপাদেয়—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি
খেদমধীরম্।
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি
মলয়সমীরম্।
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া
ত্বয়ি লীনা॥
অবিরল-নিপতিত-মদন-শরাদিব
ভবদবনায় বিশালম্।
স্ব-হৃদয়-মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল
নলিনীদল-জালম্॥
কুসুম-বিশিখ-শর-তল্পমনল্প-বিলাসকলা-
কমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ-সুখায় করোতি
কুসুম-শয়নীয়ম্॥

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধর-মানন-
কমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্তদলন-গলিতামৃত-
ধারম্॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গ-মদেন ভবন্তমসমশর-
ভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং
নবচূতম্॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে
পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে
তনুদাহম্॥
ধ্যান-লয়েন পুরঃ পারকল্প্য ভবন্তমতীব
দুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদতি চঞ্চতি
মুঞ্চতি তাপম্॥

ইহার ভাষা এত সরল যে ইহার অনুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই পদাবলীর এক একটী শ্লোকে এক একটী নূতন ও কমনীয় ভাব ও চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীরাধাকে মহাভাবময়ী বলিয়া উল্লেখ করা হয়—তাঁহার সম্বন্ধে কোনও ভাব অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যে চলে না তাহা ভক্তির অবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রমাণ করিয়াছেন। তাই আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁহার সম্বন্ধে বহুবিধ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন—

স্তনবিনিহিতমপিহারমুদারম্
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥

হে কেশব তোমার বিরহে রাধার আর কোনও অলঙ্কার ভাল লাগিতেছে না, বুকের হারও সে ভার মনে করিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কৃশতনুর বুঝি সে হারটী বহন করিবারও ক্ষমতা নাই। এই ভাব ভাবিত হইয়াই বিদ্যাপতির রাধিকা বলিয়াছেন

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হাররে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যামুন সলিলে সব ডাররে॥

বলা বাহুল্য এই অল্প পরিসরের মধ্যে জয়দেব যে ভাবাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাই রূপান্তরিত ও বিস্তৃত হইয়া বিদ্যাপতির বিরহ-বর্ণনার অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে।

সরসমসৃণমপি মলয়জ-পঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥
* * *
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বাল-শশিনমিব সায়মলোলম্॥
হরি-রিতি হরি-রিতি জপতি সকামম্।
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্॥

বিরহবিহিত মরণা শ্রীরাধার সেই নিষ্ঠুর প্রিয়তমের নাম জপ কত উচ্চ ভাবের ব্যঞ্জক তাহা প্রতিকূল সমালোচক একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এততেও কি তাঁহারা গীতগোবিন্দে মানের প্রভাব দেখিতে পান না? শ্রীরাধার কৃষ্ণচিন্তার এত একাগ্রতা যে, সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি সম্পূর্ণ মাত্রায় শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যান—নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবে ভাবিতে থাকেন—

মুহুরবলোকিত-মণ্ডন লীলা

মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।

ইহাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে অন্য আকারে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ বর্ণনে প্রকটিত হইয়াছে

অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুধামুখি ভেল মাধাই।

কি অপূর্ব্ব সেই দিব্যোন্মাদ! এমন অবস্থায় উন্নীত হইবার জন্য মনের কত একনিষ্ঠতা, চিন্তার কত প্রগাঢ়তা, কত অন্তর্লীনতার প্রয়োজন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে কি?

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥

এই শ্লোকের ভাব আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছে, শ্রীরাধার জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতেছে। ভক্তি-সাহিত্যে বোধ হয় শ্রীজয়দেব প্রথমে বিরহের চিন্তাকে এমনি করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই ভাবে ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তগণ ভাবুক হইয়াছিলেন—বঙ্গের প্রথম ও প্রধান বৈষ্ণব কবি এই ভাব লইয়া তাঁহার শ্রীরাধার চিত্র আঁকিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি যে শ্রীজয়দেবের কাছে বৈষ্ণব কবি মাত্রেই মহাঋণে আবদ্ধ।

বিদ্যাপতির তো কথাই নাই। বিদ্যাপতি শ্রীজয়দেব কবির ভাবে পূর্ণমাত্রায় অনুপ্রাণিত। তাঁহার পূর্ব্বরাগই বল, মিলনই বল, মানই বল, বিরহই বল, সম্ভোগই বল—সর্ব্বত্রই মহাকবি জয়দেবের প্রভাব স্পষ্ট। কোথাও তিনি ভাবের, কোথাও বা বর্ণনার, কোথাও বা ভাষার, কোথাও বা ছন্দের ঋণ গ্রহণ করিয়া নিজ হৃদয়গ্রাহী পদাবলী রচনা করিয়া নব জয়দেব উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

তবে জয়দেবের শ্রীরাধার ও বিদ্যাপতির শ্রীরাধার চরিত্রগত কিছু পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য যদিও চরিত্রের প্রকৃতিগত নহে, তথাপি অনুভবনীয় বটে। আমরা দেখিতে পাই যে দুইজনেই প্রেমিকা—দুইজনেই লালসাময়ী, দুইজনেই কৃষ্ণগতপ্রাণা; কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকা সরলা বালিকা, ক্রীড়াময়ী, চঞ্চলা, তরলা লজ্জালুলিতা। জয়দেবের রাধিকার চঞ্চলত বা তরলতা নাই, তিনি গভীর লালসাময়ী, অপার প্রেমময়ী, অনন্যচিন্তারহিতা; তাঁহাকে আমরা যখন প্রথম দেখিতে পাই তখনই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, তাঁহার কৃষ্ণসঙ্গ ভিন্ন সুখ নাই, কৃষ্ণসঙ্গ ভিন্ন জীবনের কোনও সার্থকতা নাই, তাঁহার লুকোচুরি নাই, ভাবগোপনের চেষ্টা নাই, তাঁহার জগৎ নাই, বিশ্ব নাই, আছে এক শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গাকাঙ্ক্ষা, শ্রীকৃষ্ণরসাস্বাদন-পিপাসা; ফলে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিজগতে তাঁহার আর কিছুই নাই। তাঁহার বিরহ, তাঁহার মান, তাঁহার সম্ভোগ, তাঁহার প্রগল্‌ভতা, তাঁহার আদর-আবদার সকলই সেই পীতাম্বরকে অবলম্বন করিয়া। তাঁহার প্রেমের এই প্রগাঢ়তাই শ্রীজয়দেব কবির বৈষ্ণবকুলকে প্রধান দান ও সেই জন্যই বৈষ্ণব কবিকুল তাঁহাকে মাথায় ধরিয়া রাখিয়াছেন ও রাখিবেন তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলনের কবি—রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের কবি—তিনি মনের কবি—তিনি দেহের কবি, কারণ বৈষ্ণব জানে যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবাই

পরম পুরুষার্থ, তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কৃষ্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
লইয়া নিজের অপরূপ ভক্তির পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারি, কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী তাঁহারা এই সম্ভোগাদি ব্যাপারে নাসা কুঞ্চিত করিবেন না তাহা নিশ্চয়।

আসলে কিন্তু শ্রীজয়দেব নীচ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চিত্রকর নহেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি, আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে জয়দেবের শ্রীরাধার হৃদয় আছে, প্রণয়ের গভীরতা আছে, আকাঙ্ক্ষার আধ্যাত্মিকতা আছে, লালসার তীব্রতা আছে। বিদ্যাপতির রাধারও হৃদয় প্রেমাপ্লুত, তবে তাঁহার রাধিকা যেন একটী পার্ব্বত্যতটিনী, আরম্ভে ক্ষীণা, কখনও স্ফীতা কখনও প্রস্তরোপহত হইয়া চঞ্চলা ও মুখরা, বীচিবিক্ষুব্ধা, কখনও আবার হ্রস্বকায়, কিন্তু তাহারও গতি সেই সমুদ্রের পানে, এবং সমুদ্রের ভিতর সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে সেও জয়দেবের শ্রীরাধার মত একটানা বিশালকায় নদীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

জন্মজন্মান্তরে

জন্ম হ'তে জন্মান্তরে মোরা দুজনায়
সমকর্ম্মফলভোগী, সহযাত্রী দোঁহে
চলেছি অনন্ত পথে সুখে দুঃখে মোহে
পুণ্য পাপে অবিচ্ছিন্ন। অনন্ত যাত্রায়
ঘূর্ণ্যমান কোটি জন্মমৃত্যু আবর্ত্তনে
দুটি পান্থ পাশাপাশি। কত শত লোকে
সহস্রযোনিতে মোরা জনমে মরণে
ভ্রমণ করেছি দোঁহে। অরুণ আলোকে
এক বৃন্তে দুটি কলি বিচিত্র কুসুমে
হরষে উঠেছি ফুটি। জানি না কেমনে
কোন শুভলগ্নে মোরা কোন পুণ্যভূমে
উপনীত হ'ব ধীরে; মন্থর চরণে
বহিতে হ'বে না আর জীবনের ভার
প্রেমের নির্ব্বাণ মোক্ষে হব একাকার।

বীণাবাদিনী

এ বক্ষ বীণার মাঝে শ্লথতন্ত্রীগুলি
রূপ রস শব্দ গন্ধ পরশ আঘাতে
কম্পিত ঝঙ্কৃত সদা। নিশিতে প্রভাতে
চারিদিক হ'তে যেন সহস্র অঙ্গুলি
নিয়ত জাগায়ে তোলে মিশ্র কোলাহল,
অর্থহীন ধ্বনি শুধু ছন্দ সুর নাই।
বিরামবিশ্রামহারা আঘাত চঞ্চল
বীণাটিরে আপনার ক্রোড়ে দিলে ঠাঁই
টানি' নিলে বক্ষোপরি, হে বীণাবাদিনি,
নিপুণ করুণ করে বাঁধি নিলে সুর।
হে আমার মূর্ত্তিমতী নিখিল-রাগিণী,
জনতার শব্দজাল করি দিলে দূর
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে তব; মোহন ঝঙ্কারে
বাজালে তোমার গান মোর তারে তারে।

সুরেশ্বর শর্ম্মা।

লোকশিক্ষা

সর্ব্ব সাধারণের জন্য শিক্ষার যে প্রস্তাব হইয়াছে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাহার বিরোধী। সকলে যাহা চায়, কেন বিপিনবাবু তাহার বিরোধী হইলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট বাণী আমরা পৌষ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিরোধী নহেন। তবে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তিনি সেই প্রণালীর বিরোধী। তাঁহার কথাটা এই,—আমাদের সমাজ শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের এই বিশেষভাবটা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমরাও আমাদের বিশেষত্ব-ভ্রষ্ট হইয়া কাফ্রি বা জাপানীদের মত কিম্ভূতকিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইব। ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য নহে, বিপিনবাবু তাহা জানেন বলিয়াই খোলাসা রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, হিন্দুশাসনও ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন এই যে, সমাজে শাসন আর সন্ন্যাসে ব্যক্তিত্ব। যতদিন মানুষ সমাজে থাকিবে ততদিন তাহার জন্য কেবলই শাসন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সে ব্যক্তিত্ব ভোগ করিবে। হিন্দুর এই সমাধান যে হিন্দু পরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহার বিষময় ফলে যে সমাজজীবন মৃতপ্রায় হইয়াছে, মানুষ সামাজিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে পঞ্চাশোর্দ্ধে তাহা লইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলে মানব-সমাজের সমূহ ক্ষতি অর্থাৎ সামাজিক জীব মানুষের জীবনের সর্ব্ব প্রধান সমস্যার মীমাংসা যে অতি সামাজিক হইতে পারে না, বিপিনবাবু এই কথাটা তলাইয়া দেখেন নাই বলিয়াই ইহা লইয়া এত হাঙ্গামা করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যতই বিবাদ থাকুক্ না কেন, উভয়কে একত্র থাকিতেই হইবে। মানবসমাজ জীবদেহেরই ন্যায় Organism, শাসন ও ব্যক্তিত্ব অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। উভয়কে পৃথক করা যায় না। শাসনবিহীন ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বই নয়; আবার যেখানে ব্যক্তিত্ব নাই সেখানে শাসন অর্থহীন। উভয়কে মিলিত করা শক্ত বলিয়া এক অবস্থায় শাসন ও এক অবস্থায় ব্যক্তিত্বের ব্যবস্থা শুনিলেই ইলিয়ট্ সাহেবের একবেলা ডাল আর একবেলা ভাতের কথা মনে পড়ে। চিরজীবন ব্যক্তিত্বলোপী শাসনের মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তিত্ব কখনও লাভ হইতে পারে না। পাখীকে সর্ব্বদা খাঁচার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া একদিন হঠাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সে উড়িতে পারে না, আবার খাঁচার মধ্যে আসে। তাই "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" ব্যবস্থা থাকিলেই শতবর্ষেও কেহ ঘরের বাহির হয় না। আর সন্ন্যাসী নামধারী দলের মধ্যে জটাধারী বিভূতি-মণ্ডিত দশ বছরের বালকের অসদ্ভাব নাই! জীবন্ত দেহকে ধড় ও মস্তক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে কি হয়? এইরূপে বিভক্ত হইয়া আমাদের সমাজ ও সন্ন্যাস দুইই অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

বিপিন বাবুর মূল আপত্তি এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থা যখন আমাদের হাতে থাকিবে না, তখন সে শিক্ষাদ্বারা আমরা জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করিতে চাই না। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি কখনও একটী জাতীয় শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়া আমাদের জাতীয় বিশেষত্বের রক্ষণ আশা করিতে পারি? এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, যে এই বিশেষত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি বিপিনবাবুর সঙ্গে এক মত নহি। কেননা, এখন আমাদের পক্ষে একান্ত ব্যক্তিত্ববিহীন সামাজিক চরিত্র রক্ষা করার চেষ্টায় আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইব। আমরা এখন আর ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছি না। বাহিরের চাপ আমাদিগকে গড়িতেছে। এই চাপের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় আমাদের নিরপেক্ষ হইয়াই গড়িয়া উঠিতেছে, সে গুলির উপর যেমন এক দিকে হাত নাই, অন্যদিকে সেগুলির হস্ত এড়াইবারও শক্তি নাই। তখন রাগ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলে মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা হয় না কি? আর, যে বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য এই প্রয়াস, তাহা আমাদিগকে কল্যাণের পথে লইয়া যায় নাই। তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। এখন সে শিক্ষা আমরা চাহিয়া লইলে ইহার উপর আমাদের কিছু হাত থাকিলেও থাকিতে পারে এবং টানাটানি করিয়া এই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত বিশেষত্বের একটু স্থানও করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরে সে সুযোগও থাকিবে না। জগতে সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। জগতের সঙ্গে যে আমাদের যোগ তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং জগতের সঙ্গে যোগ কাটিবার আমাদের শক্তি নাই। জগতে যাহা হইতেছে তাহা আমাদেরও হইবে। সেদিন তো এ স্রোত থামাইতে পারিব না। সুতরাং স্রোতে ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঘর সামলাইয়া লইলে ভাল হয় না কি? আমরা নিজেরা রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে যে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব তাহার সম্ভাবনা নাই, এবং ব্যক্তিত্ববিহীন শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনও নাই। যাহা Practical politics-এর বাহিরে তাহা লইয়া আন্দোলন নিষ্ফল এবং বিড়ালের সঙ্গে বাদ করিয়া নিরামিষ ভক্ষণের ন্যায় হাস্যকর।

বিপিনবাবু যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একেবারে নিরঙ্কুশ, ব্যক্তিত্বপ্রধান ও শাসন-বিহীন মনে করিতেছেন, সেটা ঠিক নহে। তিনি কি দেখিতেছেন না যে এই প্রতিযোগিতার মধ্য হইতেই কেমন সুন্দর সহযোগিতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে? আর আমাদের ব্যক্তিত্ববিহীন সহযোগিতা বিরাট্ অসহযোগিতায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগণই শাসনাধীন হইতে পারে। শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা আগে চাই। তাহা না

হইলে যে শাসনের প্রতিষ্ঠা, তাহা জড় পরমাণুর উপরে প্রতিষ্ঠিত শাসন। তাই আমাদের দেশের যত Co-operation no-operationএর জন্ম দিয়া সমগ্র জাতীয় জীবন তমোপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন বাবু কি দেখিতে পাইতেছেন না, কেন হিন্দুর এত সাধের একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে? উহা ব্যক্তির সমষ্টি না হইয়া ইট্ পাট্‌খেলের সমষ্টি ছিল বলিয়া এত সহজে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তোলা। ব্যক্তিগণ যখন শাসন স্বীকার করিয়া একত্রিত হয়, তখনই বাস্তবিক ব্যক্তিত্ব ও শাসনের সমস্যা মিটিয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে যে মিল, তাহা গোঁজা মিল। আমরা গোঁজা মিল দিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় শূন্য দেখিতেছি। আমরা যদি সত্যই মনে করি যে, ব্যক্তিত্ব একটা অতি খাঁটি ও উচ্চ বস্তু, তবে তাহার প্রতি সন্ন্যাসের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের সমাজ ও পরিবারে তাহার জন্য একটু স্থান করিয়া দেওয়া চাই, তাহা হইলে এই খাঁটি বস্তুর সংস্পর্শে আমাদেরও সমাজ এবং পরিবার খাঁটি হইয়া উঠিবে। তমোগুণ পরিহার করিয়া রজোগুণের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা এই ব্যক্তিত্ববিহীন শাসন চিরদিনই তমোগুণের আকর হইয়া আমাদের উপর রাজত্ব করিবে। আমাদের সমাজপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন এই দিক্ দিয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের উপরের দিক্ যে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহা হইতে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত রাখিলে অন্য নানা রকমের জটিলতা আসিয়া সমাজ-দেহকে আক্রমণ করিবে। সমাজ দেহকে এরূপভাবে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেওয়া ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। এইটাই পরিণামে একটা গুরুতর সমস্যায় পরিণত হইবে। তাহার সমাধানের জন্য তখন হয় তো আজ যে শিক্ষা পায়ে ঠেলিতেছি, সর্ব্বসাধারণের জন্য তাহাই বরণ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিত্বের সাধনা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেছি, সমাজে তাহার উপেক্ষা করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ চেষ্টা কখনও ফলবতী হইতে পারে না। যাঁহারা মানব-মন ও মানব-সমাজকে এখন Organism বলিয়া ধরিতে না পারিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছেন এরূপ বিফল প্রয়াস তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। যাঁহারা মনে করেন, শাসন যেখানে উদ্যত বজ্রের ন্যায় ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত করিতেছে সেই কঠোর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে আসিয়া আমরা মেষ-শাবকের ন্যায় শুইয়া থাকিব এবং আমাদের সমাজপ্রকৃতি অক্ষুণ্ণই থাকিবে, তাঁহারা যে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্তমত পোষণ করেন সে কথা আমরা বলিতে বাধ্য।

এক্ষেত্রে বিপিন বাবু একটা idealএর পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, কাজেই তিনি যখন যে দিকটা দেখেন, অপর পক্ষের সে সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তখন

সেদিকটা তিনি আদৌ দৃষ্টিপথে রাখেন না। ইহাতে একটা দিক বেশ স্পষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তবে বিপদ্ এই যে, তিনি যদি ঘটনাক্রমে দুই দিকেরই কথা বলিতে বাধ্য হন, তবে এই দুই দিকই সমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে। আমার মনে হয় পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' এইরূপ বিপদ্ ঘটিয়া গিয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তিনি যে ব্যক্তিত্বের প্রসার অত্যন্ত হানিজনক মনে করিয়াছেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের প্রশংসা করিতে যাইয়া সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকেই জাতীয় তামসিকতা দুরীকরণের একমাত্র অস্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ যে ক্ষেত্রেই কার্য্য করুক না কেন, মনটি তাহার সামাজিক আবেষ্টন বিপিনবাবু যদি রাষ্ট্রকে হিন্দুর সন্ন্যাসের ন্যায় মানুষের সামাজিক জীবনের বাহিরে স্থাপন করিয়া থাকেন, তবে তিনি একটা মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন। অখণ্ড মানবজীবনকে এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে মানব-প্রকৃতিকে একেবারেই বুঝা হইবে না। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিত্বাভিমানকে জাগাইয়া তোলাই জাতীয় জীবনের পক্ষে অবশ্য করণীয় কাজ হয়, তবে সমাজক্ষেত্রেও গত্যন্তর নাই। বাহিরে সিংহ, ঘরে মেষ—এ অভিনয় বেশী দিন চলে না। ফলে, অল্পদিনের অভিনয়ের পর আবার মুষিকই হইতে হয়। ব্যক্তিত্ব জাগাইবার চেষ্টায় যদি ব্রহ্মবান্ধবের প্রশংসা নিহিত থাকে, তবে সে প্রশংসা সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কারক সকলেরই প্রাপ্য। বিপিনবাবু যে এ সকলের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাহার লেখার পশ্চাতে Philosophyর অসদ্ভাব এবং অতিরিক্ত ওকালতি-প্রিয়তা।

বিপিনবাবুর আর একটি কথার উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলেন সংস্কারকেরা সমগ্র প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারে না। তাহা হইলে না কি তাহাদের ব্যবসাই মাটি। এই উপলক্ষে তিনি স্বীয় জীবনের যৌবনকালের অভিজ্ঞতার হাঁড়িটা হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বিপিনবাবু তো সন্তানের পিতা—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি তিনি যখন পুত্রের দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধনের জন্য, মৌখিক নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কি কখনও মনেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে তিনি পুত্রকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন না? না চেষ্টার তীব্রতাটা ভালবাসার তীব্রতারই পরিচায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে। যেখানে সে চেষ্টা দেখি না সেখানে ভালবাসাটা ভালবাসার বিকার বলিয়াই মনে করি। যে পিতা পুত্রের দোষ দেখিয়াও দেখেন না, ভাবেন আমার পুত্রের অনেক গুণ আছে দোষটা মায়া, উহা চলিয়া যাইবে তাহার জন্য সমাজের হস্তে বেত্র রহিয়াছে। চীনদেশে না কি পুলিশেরও ঐ রকম একটা কি ব্যবস্থা আছে। ইহা ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু উহা তামসিক ভালবাসা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কামরূপের সামাজিক প্রথা*

কামরূপের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে গুটিকয়েক বিষয় সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সামাজিক যথার্থ তথ্য অবগত হওয়া সহজ নহে; বিশেষতঃ এমন একটী বিষয় কেবল একটী মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকটিত করাও সম্ভবপর নহে।

কামরূপের হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কেওট, কোচ, কামার, কুমার, নমশূদ্র, নদীয়াল, বৃত্তিয়াল, প্রভৃতি নানা বর্ণের লোক লইয়া গঠিত। জলাচরণীয় ও জল-অনাচরণীয় এই দুই প্রধান শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। সকলেরই জাতিগত ব্যবসায় আছে এবং সকল শ্রেণীর লোকেরাই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ রীতি-নীতির অনুসরণ করিয়া সমাজ রক্ষা করিতেছেন। মহাপুরুষীয় ও দামোদরীয় বৈষ্ণবধর্ম্মই এখানকার অধিকাংশ লোকের সামাজিক ধর্ম্ম। শাক্তসম্প্রদায়স্থ লোকের সংখ্যা স্বল্পতর।

মনিষী ৺পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংকলিত প্রাচীন স্মৃতিমতে সমুদায় ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল পর্ব্বতীয়া গোস্বামী প্রভুগণের শাক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে কতিপয় লোকে কোন কোন স্থলে রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণি মহাশয়ের নব্যস্মৃতি মত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানকার ব্রাহ্মণসম্প্রদায় শাস্ত্রোক্ত দশকর্ম্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এদেশে মিতাক্ষরীণ ব্যবস্থারই প্রাধান্য ছিল। বর্ত্তমানে ব্রিটিশ শাসনাধীনে শাসন-সৌকর্য্যার্থে বিচারালয়ে দায়ভাগের ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করিলেও সামাজিক বিষয়ের মীমাংসাদি মিতাক্ষরা মতেই হইয়া থাকে

অন্যান্য জাতি—যথা কাছাড়ি, গাবো, প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি—কোন এক নির্দ্দিষ্ট কাল অখাদ্য ভোজনাদি হইতে বিরত থাকিলে এবং নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসরণ করিলে গুরু তাহাদিগকে শরণ বা দীক্ষা দিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। ইহারা শরণীয়া নামে অভিহিত।

এখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহেতেই শাস্ত্রানুযায়ী নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ, হোমাদি ক্রিয়া, কন্যাসম্প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদের প্রথম গর্ভধারণের অষ্টম মাসেতে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার-কার্য্য হইয়া থাকে। বাদ্য-ভাণ্ডাদি এবং আয়তির গীত বা এয়োদের সংগীত আবশ্যকীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়ারূপে পরিগণিত হয়। স্ত্রী-আচারাদিও যথাবিহিত-রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে

নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে কোন কোন স্থলে কেবল স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হইয়াই যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না এমতও নহে। কিন্তু এইরূপ বিবাহকে সমাজ শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন না।

কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই পাত্রস্থ করা সকলেই স্পৃহনীয় মনে করেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং উচ্চশ্রেণীর কলিতা প্রভৃতির। ইহা

---

* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত

তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতির কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে পতিতা বলিয়া গণ্য হয়, অন্য শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তাহা হয় না।

ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিলোম ক্রমে কন্যাসম্প্রদানের প্রথা প্রচলিত আছে।

কন্যার কেশার্চ্চন-বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীগৃহে প্রেরিতা হয় না। বিবাহে শুভদৃষ্টিকালীন দম্পতীর পরস্পর দর্শনের পর কেশার্চ্চন (দ্বিতীয় বিবাহ) না হওয়া পর্য্যন্ত পরস্পরের দর্শন বা আলাপাদি নিষিদ্ধ।

এ অঞ্চলে কিছু পূর্ব্বে কন্যাপণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, অনেকে কন্যাপণের দায়ে একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতেন, কেহ বা অর্থের অনাটনে চিরজীবন অবিবাহিত রহিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে ইহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই প্রথা নিবারণকল্পে সভার অনুষ্ঠান করেন। ১৫ বৎসর হইল সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব স্বদেশবৎসল পরমোৎসাহী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বরুয়া, এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মাদলৈ এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ বুজর বরুয়া স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতির উদ্যোগে উক্ত কুপ্রথা ক্রমশঃ দুরীভূত হইতেছে।

স্থানে স্থানে সভাসমিতি হইয়া বিবাহের ব্যয়ের হার নির্দ্ধারিত হইতেছে। কেহ গোপনে পণ গ্রহণ করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও তাহাদের ছাত্রবর্গ এ সম্বন্ধে অগ্রণী হইয়া কার্য্য করিতেছেন। শিক্ষিত লোকেরা ইহাতে যোগ দিয়াছেন, কাজেই এই কুপ্রথা যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বে যে স্থলে ১০০০৲ ব্যয় হইত এখন সে স্থলে ১৫০৲ । ২০০৲ মধ্যে কার্য্য সঙ্কুলান হইতেছে।

বরপণ এদেশে একেবারেই নাই। আসামের কুত্রাপি ইহা দৃষ্ট হয় না।

বিধবাবিবাহ এদেশে প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু সমাজের চক্ষে ইহা তেমন শ্রদ্ধার জিনিষ নহে। ব্রাহ্মণের ভিতর বিধবা-বিবাহ নাই। যদি কেহ এরূপ কার্য্য করেন তবে তিনি পতিত হন। কায়স্থেরা পতিত হন না বটে, কিন্তু তাঁহারা কায়স্থ-সমাজে স্থান পান না। কলিতা জাতি বিধবা বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত না হইলেও সমাজে হীনাচার রূপে পরিগণিত হন। তদিতর জাতির মধ্যে যদিও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তেমন শ্রদ্ধার সহিত যে উক্ত বিবাহে লিপ্ত হন তেমন মনে হয় না। কায়স্থজাতীয় বিধবার বিবাহ কায়স্থেতর জাতির সহিত হইয়া থাকে। স্বজাতির মধ্যে হয় না। পুনর্ব্বিবাহিত বিধবার পক্ষে সধবাদের মত কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এবং তাঁহাদের পক্ষে সধবার চিহ্ন সিন্দূর ব্যবহার ও সিঁথি কাটা অবিহিত।

কেশার্চ্চন-বিবাহের পর যিনি বিধবা হন—তাঁহার বিবাহ যেমন হেয় বলিয়া সমাজ মনে করেন, কেশার্চ্চনবিবাহের পূর্ব্বে যিনি বিধবা হন তাঁহার বিবাহকে তেমন হেয় মনে করেন না। বিশেষ এই

শ্রেণীর বিধবা বিবাহিতা সধবার ন্যায় সিন্দূর ব্যবহার করিতে ও সিঁথি কাটিতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা নাই।

এই শ্রেণীর বিধবার কেশার্চ্চনক্রিয়া বা বিবাহ দ্বিতীয় পতির সহিত সম্পন্ন করিতেই হয়। এই কার্য্যটী যথাবিহিত শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিধবাবিবাহ বঙ্গদেশে প্রচলনের জন্য অক্লান্ত শ্রম করিয়াছিলেন তাহা আসামে স্মরণাতীত কাল হইতেই ব্রাহ্মণেতর জাতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু অন্যপ্রকার বিধবাদের বিবাহে শাস্ত্রীয় কোনরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয় না, কেবল স্ত্রী-আচারেই উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

এখানকার ভদ্রমহিলারা সাধারণতঃ অবগুণ্ঠিতা হইয়া আত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সতত অতি সন্তর্পণে লজ্জাশীলতা এবং সুরুচি-রক্ষণে যত্নবতী থাকেন। স্থানান্তরে কার্য্যোপোলক্ষে যাইতে হইলে যানাদিতে গমন করেন।

দরিদ্র-অবস্থা বা নিম্নস্তরের লোকেরাও সুরুচিসঙ্গতভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আত্মীয়দের সঙ্গে গমন করিয়া থাকেন।

উপর আসামে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দাস বা দাসী বড় ঝাপি বা বৃহৎ ছত্র ধারণ করিয়াও গমন করেন। সেই বৃহৎ ছত্রটী যে কোন অবস্থায় আবশ্যক হইলেই ভদ্র মহিলাকে পথিকের বা অন্য লোকের দৃষ্টি বহির্ভূত করিবার জন্য আবরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের বেশভূষা যে অতি সুরুচি-সঙ্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইহারা মেখলা এবং তদুপরি এক খণ্ড বস্ত্র যাহাকে রিহা বা আস্তরণ বলা যায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিরিক্ত এক খানি উপরেণী বা খনিয়া ব্যবহার করেন।

হস্ত, কণ্ঠ ও কর্ণে অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন, সাড়ি ব্যবহার এ অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে। বিবাহকালে, সাড়ি পরিধান করাইয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করা হইয়া থাকে। মৃতা স্ত্রীলোককে চিতারোহণের পূর্ব্বে সাড়ি পরাইয়া দিতে হইবে। মেখলাপরিহিতা অবস্থায় দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

পতিশোকাতুরা বিধবা অশৌচকাল সাড়ি পরিধান করিবেন ইহাই এ অঞ্চলের বিধি। বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়াতে প্রায় সাড়ি পরিধান করিয়া থাকেন

আসামে সর্ব্বত্র এ নিয়মটী প্রচলিত নাই, তাই অনেকে মনে করেন যে সাড়ি পরাটা এদেশ বাঙ্গালীদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা করিয়াছে। কামরূপের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখা যায় যে ২০০ বৎসরাধিক কাল একখানি পট্টবস্ত্রের সাড়ি অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। শাশুড়ী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রস্থা হইয়াছিলেন পুত্রবধূ আবার সেখানি পরিয়া বিবাহিতা হইলেন, এইরূপে বংশানুক্রমে এই বস্ত্র ২০০ বৎসরাধিক কাল ব্যবহৃত হইতেছে।

বিধবাদের সধবাদের মত অলঙ্কার পরিধান করায় দোষ না হইলেও উহারা কণ্ঠে ও কর্ণের উপর কোনরূপ অলঙ্কার পরিধান করেন না ও সীমন্তে সিন্দুর ব্যবহার করেন না এবং বিধবারা কেশচ্ছেদন বা মস্তকও মুণ্ডন করেন না। তবে গয়া প্রভৃতি তীর্থাদি গমন করিয়া তীর্থের নিয়মানুযায়ী মস্তক মুণ্ডন করেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

এখন এদেশের উৎসবাদির বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

এখানকার দোমাহি বা বিহুই জাতীয় উৎসব। কাতি বিহু অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তি, মাঘ্য বিহু অর্থাৎ পৌষের সংক্রান্তি এবং বহাগ বিহু অর্থাৎ চৈত্রের সংক্রান্তি এই তিন কাতির বিহু কঙ্গালী, মাঘের বিহু ভোগালী এবং বহাগ বিহু রঙ্গালী বলিয়া কথিত হয়। কাতি বিহুতে কোনরূপ ভোজনাদির আড়ম্বর নাই বলিয়া কঙ্গালী, মাঘ বিহুতে লড্ডুক, পিষ্টক প্রভৃতি চব্য চুষ্য নানাবিধ ভোজনের ব্যবস্থা আছে কাজেই ভোগালী। এবং বহাগ বিহুতে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের, রঙ্গ-তামাসার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া উহার নাম রঙ্গালী।

কার্ত্তিক বিহুতে এদেশবাসীরা ধান্যক্ষেত্র এবং গৃহাদিতে দেবোদ্দেশে প্রদীপ ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকেন। গৃহে গৃহে নামকীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং সমস্ত কার্ত্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দিয়া থাকেন। এই মাস পবিত্র মনে করিয়া নানাবিধ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অনেকে সমস্ত মাস নিরামিষ ভোজন করেন।

মাঘ বিহু দিবস অর্থাৎ পৌষের সংক্রান্তি দিনের পূর্ব্বরাত্রে বালক ও যুবকগণ মাঠে গৃহ নির্ম্মাণ করে ও সকলে একত্রিত হইয়া দলভাত বা লভাত খায় অর্থাৎ আমোদ-আহ্লাদ ও ভোজনাদি করে। পরে প্রাতে ঐ ঘরে অগ্নিদান করিয়া প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক অগ্নি সেবন করে। পরে সকল গৃহস্থই নিজ নিজ গৃহে নামকীর্ত্তনাদি করিয়া গুরুগৃহে উপহারাদি লইয়া গমন করেন। মধ্যাহ্নে গ্রামস্থ নামঘরে সকলে সমবেত হইয়া সাড়ম্বর নামকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। রাত্রিতে দেবোদ্দেশে ভোগ দান করিয়া থাকেন; গুরুজনাদিকে প্রণাম এই দিবসের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য। পরে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী গৃহে গমন করিয়া লাড়ু, পিঠে, কোমল চাউল ইত্যাদি ভক্ষণ করেন। এবং সম্ভবমত অন্যকে ভোজন করান। ডিমখেলা, মলক্রীড়া, দৌড়াদৌড়ি, লাফান প্রভৃতির যথেষ্ট আয়োজন হয় এবং আবালবৃদ্ধ সকলেই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। এই কারণেই এই বিহুকে ভোগালী বলা হয়। সকলে নিজ নিজ কার্য্য হইতে সেই দিন ও পরের দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ বিরত থাকিয়া বিশ্রাম ও আমোদ সম্ভোগ করেন। এই দিবসও নামসংকীর্ত্তন, গুরুজনকে প্রণাম, লাড়ু পিষ্টক ভক্ষণাদি অপেক্ষাকৃত অল্প সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। যদিও এইদিনকে তাহারা বড় দোমাহি বা বড় বিহু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই মাসকেও পবিত্র মনে করিয়া সকলে নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। বিশেষ দেবালয়

ও চতুষ্পাঠীগুলিতে সমস্ত মাসব্যাপী গীতা পাঠ হয়, গৃহস্থেরাও সকলে অন্ততঃ নিজ নিজ গৃহে একদিন গীতা পাঠ করাইয়া থাকেন।

বহাগ বিহু—লড্ডুক পিষ্টকাদির ব্যবস্থা মাঘবিহুর মতই। দুঃখী ধনী সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে নববস্ত্র পরিধান করেন ও আত্মীয় স্বজনকে দান করিয়া থাকেন। আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে বাজার হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া দান করেন, কিন্তু তাহা নহে। স্ত্রীলোকেরা নিজ হস্তে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। এখানকার ব্রাহ্মণ হইতে অধস্তন সকল জাতির লোকেদের স্ত্রীলেকেরা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। বস্ত্রবয়ন স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণ। বস্ত্রবয়নের কৃতিত্বের উপর কন্যার সৎপাত্র লাভের বিশেষরূপে নির্ভর করে। এখানে বস্ত্রবয়ন দ্বারা জাতি চ্যুতির ভয় নাই। সেদিন মাত্র বঙ্গদেশ এই বিষয়টী বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এইদেশে আবহমানকাল এই সুন্দর প্রথাটী প্রচলিত রহিয়াছে। সে কথা যাক, যাহা বলিতে ছিলাম কামরূপে প্রায় প্রসিদ্ধ গ্রাম সকলে এই বিহুতে বাঁহবিয়া ক্রিয়া উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে, সেই মেলাতে দেশীয় তামাসা ও মল্লক্রিয়াদিও হইয়া থাকে। বাঁহবিয়ার বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখিত হইতেছে। গ্রামের লোক বাঁশ যোড়া দিয়া যত উচ্চ করিতে পারেন করিয়া তাঁহারা সমস্ত গ্রামের লোককে আহ্বান করেন, যেন ঐটী স্বয়ম্বরা কন্যা টীকেও কে নিতে পারেন অর্থাৎ যে গ্রামের বাঁশ তাহা হইতে অধিকতর উচ্চ হইবে সেই বাঁশ স্বয়ম্বরা লাভে সক্ষম হইবে এবং ঐ গ্রামের লোকেরা জয়ী হইবে। বাঁশের উচ্চতা অকটারলোনী মনুমেণ্টের প্রায় তুল্যই হইয়া থাকে।

এই উৎসব 'উথেলী' নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় সমস্ত মাস বিশেষ সাতবিহু অর্থাৎ বৈশাখের ৬ দিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিতে থাকে। প্রায় সকল কন্যারা এই বিহুতে পিত্রালয়ে আগমন করিয়া থাকেন।

বিহুর দিন গৃহপালিত পশু সকলকে তৈলমর্দ্দন করাইয়া স্নান করান হয়। লাউ বেগুনের মালা গাঁথিয়া গলায় পরান হয়। কোমল বৃক্ষ পত্র লইয়া মৃদু মৃদু আঘাত করা হয়। এবং নিম্নলিখিতরূপ বচন বলা হয়

দীঘা লাউর দীঘল পাত
গরু বাচর জাত জাত।
লাউ খাবি না বাকাল খাবি
প্রতি বচরেবারি যাবি।

পুরাতন পাখা পরিবর্ত্তন করিয়া নববস্ত্রের ন্যায় নূতন পাখার ব্যবহার হয়। প্রথমে দেবতা, গো, অগ্নি পরে গুরুজনকে ব্যজন করিয়া নূতন বর্ষের জন্য গৃহস্থ ব্যজনা ব্যবহার করেন। কুটুম্বাদি গৃহে ঐদিন উপহার দ্রব্য বা নববস্ত্রদান লইয়া সকলে পরস্পর যাতায়াত করেন।

উপর আসামে ভাখনি উৎসব নাই। কেবল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পুরুষ স্ত্রী এই উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়া সমস্ত বৈশাখ মাস নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। কামরূপে কিন্তু ঐরূপ নৃত্যগীতাদির প্রচার নাই। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবস

হইতে অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রবর্গ প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থঘরে ভিক্ষা করেন। সকলেই শ্রদ্ধার সহিত কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিয়া থাকেন। ঐরূপে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের প্রাপ্য। এই ব্যাপারের দ্বারা প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের চিত্র নয়নপথে পতিত হয়।

প্রবন্ধের উপসংহারে এই বক্তব্য, এদেশবাসীরা বিশুদ্ধ আর্য্য রীতিনীতির ঐকান্তিক অনুসরণ করেন। আর্য্যসভ্যতার মনোমুগ্ধকর উজ্জ্বল জ্যোতিতে এদেশ উদ্ভাসিত। হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবস্থা অবলম্বনে জাতিগত যে সকল গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে, সমুদায় এই দেশে বিদ্যমান।

পরিশেষে এই প্রবন্ধের উপকরণ-সংগ্রহে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দেব।

নারদ

মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি আমাদের জাতীয় মহাকাব্য ও অন্যান্য প্রাচীন কথা বা কাহিনীতে মহর্ষি নারদ একটী বিশেষ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছেন মহর্ষি নারদ কল্পিত হউন আর সত্যই হউন, দেবতা সমাজে তিনি যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবতাগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং স্বর্গলোক হইতে মর্ত্তালোকে সংবাদ প্রেরণের আবশ্যক হইলেই মহর্ষি নারদের ডাক পড়িত। প্রত্যেক কাহিনীতেই নারদ সংশ্লিষ্ট আছেন। মহাকাব্য লেখকগণ নারদের এই আবতারণা দ্বারা মানুষকে একটি পরম শিক্ষা দান করিয়াছেন। নবীন অরুণালোকের মধ্যে মধুর বীণাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ প্লাবিত করিতে করিতে, মহর্ষি নারদের আগমন অধিকাংশ প্রাচীন কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। নারদের মূর্ত্তিকে কোনোও প্রাচীন লেখক বা কবি রাত্রির অন্ধকারে উপস্থিত করেন নাই,—দিবালোকের সুস্পষ্ট আলোকের সহিত তাঁহার স্মৃতি জড়িত। মহাকবিদের বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে জটাজুটমণ্ডিত স্নিগ্ধ প্রশান্ত ঋষির বীণাধ্বনির মাধুর্য্য প্রতিদিনের অরুণালোকের মতই মধুর তাহার পর আরও একটি আশ্চর্য্য এই যে নারদের গতি সর্ব্বত্র অবারিত, তাঁহাকে কেহ কখনো বাধা দিতে পারে নাই। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হইতে মর্ত্তের নৃপতিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই ভবনদ্বার তাঁহার কাছে উন্মুক্ত। এমন সর্ব্বলোকবিহারী বিশ্বজন-বন্ধু ঋষি আর দ্বিতীয়টি নাই। অথচ এই ঋষিটি কখনো কি দেব, কি মানব, কাহারো অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বর্গের দেবেন্দ্র হউন অথবা মর্ত্ত্যের রাজেন্দ্রই হউন কাহার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় দেখিলে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতেন না। স্বর্গ বলিতে আমরা একটি পাপশূন্য, শুভ্রলোকের কল্পনা করি,

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এমন অনেক বর্ণনা দেখা যায় যে, স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্তও অপরাধে মর্ত্তালোকে নামিয়াছেন। নারদ যেন স্বর্গমর্ত্ত্যের পাপতিমিরবিনাশকারী একটি উজ্জ্বল নির্ম্মল খর পুণ্য-শিখা।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম নবীন অরুণালোকের মধ্যে তাঁহার অভ্যুদয় অতি মনোরম। জমাট্ অন্ধকার যেমন প্রভাতের কিরণাঘাতে বিনষ্ট হইয়া যায়, নারদের চরিত্রেও তেমিন একটি পুণ্যপ্রভা দেখিতে পাই, যাহার সম্মুখে বহুদিন-সঞ্চিত পাপ এবং অন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাঁহার রোষ কষায়িত তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্গাধিপতির সিংহাসনও কম্পিত হয় অথচ সকল দেবতা এবং সকল মানবের সহিত তাঁহার একটি পরমসৌন্দর্য্যবন্ধন আছে।

অভিমানী দক্ষ শিব-রহিত যজ্ঞ করিবার বাসনা করিয়া মহাদেব ব্যতীত অন্যান্য সকলকেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত করেন। শিবদ্বেষী দক্ষের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার জন্য যথাকালে তাঁহার সমীপে নারদ উপস্থিত হইলেন। তিনি দক্ষের পক্ষ হইয়া মহাদেব ব্যতীত ত্রিভুবনের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। শিবকে যিনি অপমানিত করেন অর্থাৎ মঙ্গল ব্যতীত যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেন বা কোনো কার্য্য করেন, তাঁহাকে কি শাস্তি ভোগ করিতে হয় এই দক্ষকে দণ্ড দিয়া, নারদ তাহা বিশ্বজনের সমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।

প্রাচীন কাহিনীর অধিকাংশ কলহ এবং গণ্ডগোলে নারদের নাম পাই; কেন না তিনি কলহ করিয়া অশিবকে, মনোমালিন্য ও পাপকে দূর করিয়া দেন। পাপের মলিনতার বিনাশ অতি সহজ হয় না; বহু সংগ্রামে এবং বহু জয়-পরাজয়ের পর পাপের বিনাশ হইয়া থাকে অন্ধকারকে ভেদ করিয়া যেমন আলোকের প্রকাশ, পাপকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াই তেমনি পুণ্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রকাশ। ইহার মধ্যে কত ঘাত কত প্রতিঘাত, কত কষ্ট ও কত দুঃখ তাহার ইয়ত্তা নাই। পাপের বিনাশ-সাধনকারী বিধাতার উদ্যত হস্ত যখন প্রসারিত হয়, তখন তাহা আমাদের নিকট চক্রচ্ছিন্ন-গৌরী-দেহধারী রুদ্রদেবের তাণ্ডব নৃত্যের ন্যায়ই বোধ হয়

আমাদের মনের সমস্ত পাপ, দৈন্য ঈশ্বর জানিতেছেন; অবশেষে কোনো একসময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নারদ ঋষিটি যখন আমাদের সমস্ত খবর বিধাতার কাছে হাজির করিবেন তখন দেখিব সব উল্টা; কাল যেমন সুখ-লালসে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আজ দেখি আমার অবস্থা অন্যরূপ। আমি দারিদ্র অথচ দুঃখের এই প্রকাশ আমার নিকট সহস্রগুণ তিক্ত ঠেকিলেও সত্যই তাহা আমার নিকট মঙ্গল, শিব। মঙ্গল দুঃখের ছদ্মবেশ ধরিয়া উপস্থিত হয় মাত্র। দুঃখের দিন সেই জন্যই ঈশ্বরের দান,—শিক্ষা বলিয়া অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করিতে পারে। মহাকাব্যের মধ্যে যেমন একটি নারদ ঋষি পাপমলিনতা দূর করিবার জন্য একদিন বিমল প্রভাতে পুণ্য জ্যোতিরূপে উপস্থিত হন। মানবের জীবন-কাব্যের মধ্যেও তেমনি এক শুভ মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী মানুষের সমস্ত পাপ,

মলিনতা দূর করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকে। পাপীর পাপ সেই নারদের মঙ্গল বাণীরূপে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়—তাহার পর বিধাতার রুদ্রমূর্ত্তি জাগ্রত হয়। তখন পাপীর সমস্তই লণ্ডভণ্ড, সমস্তই উল্টাপাল্টা হইয়া যায়।

যে জীবন অনবরত অর্থ সঞ্চয়ে একত্রত হইয়াছিল—বিধাতা তাহার উপর এমন আঘাত করেন, যাহাতে সে অর্থ ছাড়িয়া দেয়—কিন্তু সে বড় যন্ত্রণা, বড় দুঃখ পাইয়া প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের গ্রন্থের নানাস্থানে, নানা কাহিনীতে নারদের অবতারণা করিয়া মানুষকে এই শিক্ষা দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, "অন্যায়, পাপ, কলঙ্ক কখনো অপ্রকাশিত থাকে না, যে মূঢ় যত গোপনে যত পাপই করুক্ না তাহা বিশ্বজনের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। সেই জন্যই অপাপবিদ্ধ পুণ্যাত্মা ঋষিগণ কাহিনীর মধ্যে ভক্তি-নম্র চিত্তে নারদের অবতারণা করিয়াছেন। এবং সেই কাহিনী নারদের জয় দিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম বিধাতা জানিতে পারিতেছেন এবং তাহার যথোপযুক্ত বিধানও করিতেছেন। নারদ সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ নির্ম্মল। আমাদের প্রত্যেক জীবন এমন হউক যেন বিধাতার কাছে নারদ আমাদের নামে আর কিছু নালিস করিতে না পারেন এবং নারদের সহিত আমাদের যেন সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়। নিত্য প্রভাতকালে পূর্ব্বাকাশ-ভালে বীণাহস্তে শুভ্রবেশধারী ঋষিটি প্রত্যহই উঠিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অনুপম কিরণ-বীণার মধুর ঝঙ্কারে জগতের প্রত্যেক কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতেছে

হে নারদ! তোমার বীণার পবিত্র ঝঙ্কারে আমাদের অন্তর হইতে সমস্ত পাপ মুছিয়া ফেল। প্রত্যেক প্রভাতে তোমার উদয় আমার চক্ষের সম্মুখে যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে এবং সমস্ত দিবস যেন তোমার সঙ্গীত চিত্তকে নম্র করিতে থাকে। প্রাচীনকালে ঋষিগণ তোমার যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কল্পনা নহে—অত্যুক্তি নহে। আজি তুমি তোমার শুভ্র বেশ ধারণ করিয়া বীণার তারে ঝঙ্কার দাও। তুমি আমাদের পবিত্র, শান্ত, সংযত নির্ম্মল কর।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মূল ইতিবৃত্ত সত্য

মূল ইতিবৃত্ত যে সত্য তাহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য নহে। ঐ ইতিবৃত্তের প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথম আভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয় বাহ্য। বাহ্য প্রমাণ আবার প্রবাদ, ভগ্নাবশেষ ও লেখ্য ভেদে তিন প্রকার।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থে মহাভারতের

ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে মহাভারতের কি মত। মহাভারতের মতে কুরুপাণ্ডবের ইতিবৃত্ত সত্য পুরাবৃত্ত আদিপর্ব্বের প্রারম্ভেই নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,

ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
* * * *
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
* * * *
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্॥

পুণ্য ভারত-ইতিহাস যাহা বৈশম্পায়ন জয়মেজয় রাজাকে বলেন সেই পাপনাশিনী সংহিতা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।

ইহার উত্তরে সৌতি বলিলেন—

আচক্ষুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

কোন কোন কবি এই ইতিহাস পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর কেহ ইহা এখনও ব্যাখ্যা করেন। ভবিষ্যতেও অন্যে ইহা পৃথিবীতে প্রচার করিবেন।

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকেও মহাভারতকে ইতিহাসরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাগমেষ্বয়ম্।

এই ইতিহাস গভীরার্থক ও সমস্ত আগমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আদিপর্ব্বের ৬০ অধ্যায়ের শেষে ব্যাসদেব বৈশম্পায়নকে আদেশ করিতেছেন—

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যথা ভেদোঽভবৎ পুরা।
তদস্মৈ সর্ব্বমাচক্ষ যন্মত্তঃ শ্রুতবানপি॥

আমার নিকট তুমি কুরুগণের ও পাণ্ডবগণের ভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ তাহা ইঁহার নিকট সমস্ত বল।

তাহার পর লেখা হইয়াছে—

গুরোর্ব্বচনমাজ্ঞায় স তু বিপ্রর্ষভস্তদা।
আচচক্ষে ততঃ সর্ব্বমিতিহাসং পুরাতনম্॥

গুরুর আদেশ পাইয়া সেই বিপ্রর্ষি তখন সেই প্রাচীন ইতিহাস আমূল বলিলেন।

৬১ অধ্যায়ে প্রাগুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—

এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
ভেদো রাজ্যবিনাশায় জয়শ্চ জয়তাং বর॥

হে জেতৃগণের প্রধান, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবগণের পুরাবৃত্ত এইরূপ। রাজ্যের জন্য তাঁহাদের কলহ হয় এবং এইরূপে তাঁহারা জয়লাভ করেন।

মহাভারতের মতে যে মহাভারত ইতিহাস, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে বিবেচ্য যে ব্যাসদেব স্বীয় মাতার কন্যাদশায় বিবাহও গোপন করেন নাই, যিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন যে—ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, অতএব হে জীব! কোন অবস্থায় ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না—যিনি সত্যের মাহাত্ম্য জলদগম্ভীরনাদে গাহিয়াছেন, সেই মহর্ষি কি কল্পিত চরিত্র লিখিয়া সেই উপন্যাসকে ইতিহাস বলিবেন? বেদব্যাস মিথ্যাবাদী ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহাদের বিশ্বাসকে ধন্য। তিনি কেবল স্বীয় কৃতিকে ইতিহাস বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, ঐ ইতিবৃত্তে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও দেখাইয়াছেন। তিনিই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মদাতা, তিনিই পাণ্ডবগণের বিবাহ দ্রৌপদীর সহিত দেন, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, তিনিই

সঞ্জয়কে প্রজ্ঞাচক্ষু দেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এই সমস্ত কথা কাল্পনিক হয় তবে তাঁহার ন্যায় মিথ্যাবাদী আর জগতে কেহ থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে অসংখ্য উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোন উপন্যাসকার ঐ উপন্যাসের ঘটনাবলিতে আপনাকে আজ পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে উপস্থাপিত করেন নাই।

হোমার, ভার্জিল প্রভৃতি কোন দেশের কোন কবি কাল্পনিক বৃত্ত দিতে গিয়া কখনও ঐ বৃত্তের সহিত আপনাদিগকে মিশান নাই। ব্যাসদেব যে মিথ্যাগল্পে মিথ্যা আপনাকে জড়াইবেন এ বিশ্বাস কি তবে যুক্তিযুক্ত? বিশেষ যদি ব্যাসদেব এতই মিথ্যাবাদী হইতেন তাহা হইলে তিনি তত্ত্বদর্শী, জ্ঞানী, সত্যবাদী ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন না, তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকার-গণও কখনই কুরুপাণ্ডবগণকে সত্যচরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

প্রথম বাহ্য প্রমাণ—প্রবাদ

যদি আবহমান কাল কোন প্রবাদ কোন দেশে প্রবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলে তাহার মূলে সত্য আছে বিশ্বাস করা উচিত। যুধিষ্ঠিরাদি যে আমাদের ন্যায় রক্ত-মাংসের শরীরে পৃথিবীতে লীলা করিয়াছেন তাহা আবহমান কাল ভারতের লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। যদি আবার পুরাণ, ব্যাকরণ, বৈদ্যশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ঐতি-হাসিক গ্রন্থ, কাব্য, অলঙ্কার, এমন কি নিখিল সংস্কৃত সাহিত্য সেই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়, যদি দেখেন যে যুধিষ্ঠিরাদির বংশ বলিয়া মধ্যকালের নৃপতিগণ নিজ নিজ পরিচয় দিয়াছেন, যদি যুধিষ্ঠিরের শক কোন কোন দেশে প্রচলিত থাকা দেখা যায়, যদি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে তাঁহাদের ভূরি ভূরি উল্লেখ থাকে, এবং সর্ব্বশেষে যদি সেই যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র জনমেজয়ের দানপত্র দেখিতে পাই তাহা হইলে মনে অনুমাত্রও সংশয় থাকা যুক্তিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয় বাহ্য প্রমাণ—ভগ্নাবশেষ

এখনও যুধিষ্ঠিরের দুর্গ, যজ্ঞস্তম্ভ, নীলছত্রী প্রভৃতি ভগ্নাবশেষ তাঁহাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বংশপরম্পরাক্রমে সেইগুলি যুধিষ্ঠিরাদির বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই দুর্গাদি যে মুসলমান সম্রাটগণের রচিত নহে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথ্বী-রাজের পূর্ব্বেও তাহাদের অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের রচনা-প্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে উহা প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পও নহে। সুতরাং বুদ্ধদেবের অপেক্ষা তাহারা প্রাচীন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দিল্লীর নিকট কোন কোন স্থান খনন করতঃ কতকগুলি অদ্ভুত প্রাচীন কারুকার্য্যখচিত চৌবাচ্চা বাহির করেন। ঐগুলি দেখিলেই বোধ হয় যে উহারা মহম্মদীয় বা বৌদ্ধ শিল্প নহে, প্রত্যুত প্রাচীন হিন্দু শিল্প। এই সমস্ত দেখিয়া এখন আমাদের রাজপুরুষেরাও যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলাদির সত্তা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতেছেন।

তৃতীয় বাহ্য প্রমাণ—লেখ্য

যুধিষ্ঠিরাদি যে কল্পিত জীব নহে,

তাহার যথেষ্ট সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী লিখিত প্রমাণ আছে। সেই সব লেখ্যের দোষ এই যে তাহারা স্বদেশী, বিদেশী নহে। যুধিষ্ঠিরাদি অন্যূন চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতরঙ্গে অভিনয় করেন। তখন ইউরোপ ও আমেরিকা বনময়। ইউরোপবাসিগণ তখন অসভ্য, নগ্ন, বন্যমাংসভোজী, বর্ণমালার নামগন্ধও জানেন না। তাহার অন্ততঃ একহাজার বর্ষ পরে ফিনিসিয়গণের নিকট ইউরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীস বর্ণমালা পাইয়া জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ করেন। গ্রীসের পরে রোমের অভ্যুদয়। ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, জার্ম্মানি প্রভৃতি রোম ভাঙ্গিয়া ১০০০।১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসও ১৫০০ বৎসর মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আদিম বৃটনের ইতিবৃত্ত ২০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না, সুতরাং পাণ্ডবগণের সময়ে ইউরোপীয় কোন দেশের সহিত ভারতের কোনরূপ সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভব ছিল না ও হয় নাই। ঐ সব দেশের সাহিত্য হইতে কুরুগণের ইতিবৃত্তের পরিপোষক প্রমাণ আশা করা বাতুলতা মাত্র। এজন্য বিদেশী প্রমাণ ভিন্ন যদি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিশ্বাস করিতে না চান তাহা হইলে আমাদের প্রয়াস অরণ্যে রোদন মাত্র। এ স্থলে মনে রাখা উচিত যে কোন জাতিই স্বীয় প্রাচীন ইতিহাসের পরিপোষক প্রমাণ অপর জাতির ইতিহাস হইতে দিতে পারেন না। গ্রীকদের প্রাচীন ইতিহাস গ্রীক পুস্তকাদি হইতে বিশ্বাস করিতে হয়। রোমের ইতিহাস রোমীয় পুস্তকেই পাওয়া যায়। সেইরূপ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ভারতের প্রাচীন গ্রন্থেই প্রাপ্য

কুরুপাণ্ডবের ইতিহাসের জ্বলন্ত লেখ্য প্রমাণ—

১। পুরাণ

সকল পুরাণেই কুরুপাণ্ডবগণের ইতিহাসের কোন না কোন অংশ আছে। কোন পুরাণের বক্তা ভীষ্মদেব, কোন পুরাণে আবার বাসুদেবার্জ্জুনের নরনারায়ণত্ব প্রতিপন্ন।

বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, ভাগবত ও মৎস্য এই পঞ্চপুরাণেই চন্দ্রবংশের পরিচয় আছে, এবং পাণ্ডবগণের মূল ইতিবৃত্ত মহাভারতে যেরূপ দেওয়া আছে সেইরূপই দেওয়া হইয়াছে। পুরাণে দেবাসুর-সংগ্রাম, স্বর্গনরকাদি-বর্ণনা প্রভৃতি নানা অলৌকিক ঘটনা আছে সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বর্ণিত। ঐ বংশাবলী অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইংরাজি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণও এক্ষণে চন্দ্রবংশের শেষাংশ বিশ্বাস করিতেছেন। তাঁহাদেরও মতে ভারতের ইতিহাস এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের তিনশত শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুরাণের উল্লিখিত জরাসন্ধবংশ বিশ্বস্ত না হইলেও তৎপরবর্ত্তী পঞ্চ প্রদ্যোত, দশ সুঙ্গ, নব নন্দ, প্রভৃতি যে সত্য জীব ইহা তাম্রশাসন ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হওয়া বিশ্বাস করিতেছেন। পুরাণের পরবর্ত্তী বংশাবলী এইরূপে প্রামাণিক হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী বংশাবলী যে বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রমাণিক হইতেছে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে জরাসন্ধবংশ বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যদি পুরাণের বংশবলী ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ আধুনিক পণ্ডিত

মণ্ডলীকে প্রবঞ্চনা করিবার বাসনায় নিজ মনোমত দিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ইহাতে সেই বংশাবলীর শেষ দুই-তৃতীয়াংশ সত্য হইত না। ঐ বংশাবলীর কতদূর এক্ষণে সত্য সপ্রমাণিত হইয়াছে তাহা পরে এই প্রবন্ধে প্রকাশ পাইবে। যখন আবার বিবেচনা করা যায় যে কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও পুরাণে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিত তখন সেই বর্ণনা অবিশ্বাস করা দুঃসাহস মনে হয়। অতএব পুরাণের প্রমাণে যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। যাবতীয় পুরাণ আলোচনা আবশ্যক নাই। কেবল বিষ্ণু পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ হইতেই দেখাইতে পারা যায় যে পরীক্ষিতের সময় হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাদির ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বেহার-চিত্র

দেওয়ানজি

(বেহারের লালা কর্ম্মচারী)

জীবনের প্রত্যূষেই মুন্সী ছেদিপ্রসাদের চরিত্রে বিষয়বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল। অন্যান্য অল্পবুদ্ধি বালকেরা যখন "লেঙ্গ্ড়ু গুরুজির" বৃক্ষতলস্থ পাঠশালে বসিয়া সমস্বরে "ও নামাসি ধং গুরুজি পতং" আবৃত্তি করিত, বালক ছেদি তখন পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া নদীতীরস্থ আম্র-কুঞ্জে বড়লোকের নষ্টস্বভাব ছেলেদের সঙ্গে 'জুয়া' খেলিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিত এবং বাবু গণেশলালের নির্জ্জন উদ্যান হইতে প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য তরকারি সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় পরিধেয় বস্ত্র সাহায্যে নদী হইতে মৎস্য সংগ্রহ ব্যাপারেও ছেদির অনুরাগের অভাব ছিল না।

সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া কৈশোরেই ছেদি তাম্রকুট হইতে গঞ্জিকার সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। মাঠের খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে গোপনে আহরিত 'তাড়ি'র রসাস্বাদও তাহার অবিদিত ছিল না।

সুকুমার কৈশোরেই পৌত্রের এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বৃদ্ধ দামড়িলাল সর্ব্বদাই পুলকিত চিত্তে ভবিষ্যৎ বাণী করিতেন যে এ ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে 'দেওয়ানজি' না হইয়া ছাড়িবে না।

বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রখরবুদ্ধি ছেদি আরও দুই একটা দুর্লভ বিদ্যা সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—হিসাবে গোঁজামিল দেওয়ার বিদ্যা এবং একজনের লেখা দেখিয়া অবিকল সেইরূপ লিখিবার কৌশল।

ছেদির পিতার একটী ক্ষুদ্র মস্‌লার দোকান ছিল। এই দোকানই, ছেদিকে

এই দুই বিদ্যালাভে সাহায্য করিয়াছিল। ছেদির পিতা ভুখনলাল মধ্যে মধ্যে দোকানের জন্য জিনিস কিনিতে যাইতেন; সেই সময়ে দোকানের ভার ছেদির উপর পড়িত। ছেদি এই সুযোগে দোকান হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকদের নামে খরচ লিখিয়া রাখিত এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের স্বাক্ষর নকল করিবার চেষ্টা করিত।

পাঠশালা ছাড়িয়া ছেদি কিছুদিন তাহার মাতুলের নিকটে বিষয়কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে আসিল। ছেদির মাতুল মুন্সী রামশরণ লাল জমিদারের 'পাটোয়ারি' ছিলেন। দলিল দস্তাবেজ লিখিতে সে অঞ্চলে না কি তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। ছেদি মাতুলের নিকট থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই দুর্লভ 'দলিল মুসাবিদা' বিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিল। বলা বাহুল্য এই উমেদারি অবস্থাতেও ছেদির অর্জ্জনস্পৃহা একান্ত সুষুপ্ত থাকে নাই।

পক্ষান্তরে ছেদি একাঙ্গ উন্নতির পক্ষপাতী ছিল না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাদকসেবন এবং ইন্দ্রিয়পরতার ব্যাপারেও সে সমভাবে উন্নতিসাধন করিতেছিল।

বিংশতি বর্ষ বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছেদি কর্ম্মসংগ্রহের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বহুদিন নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে মাতুলের সাহায্যে সে এক জমিদারের বহুদূরবর্ত্তী 'মাহালে' পাঁচ টাকা বেতনের এক পাটোয়ারির পদ লাভ করিল। এই পাঁচ টাকা সম্বন্ধেও সর্ত্ত রহিল যে প্রজাদের দুরস্ত করিয়া দিতে না পারিলে ছেদি পূর্ণ বেতন লাভের অধিকারী হইবে না। সে অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের জরিপ আরম্ভ হইবার কথা হইতেছিল। জরিপে একবার খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে সে হার আর সত্বরে বর্দ্ধিত করা দুঃসাধ্য। সুতরাং পূর্ব্বে হইতে খাজনা বাড়াইয়া লইতে না পারিলে জমিদারের সমূহ ক্ষতি। তাই মালিক রামপ্রতাপ সিং বহুদিন হইতে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দুইবার পাটোয়ারি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেহই জমিদারের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় নাই। ছেদি আসিয়া 'কড়ার' করিল যে তিন বৎসরে মধ্যে যদি সে খাজনা বাড়াইয়া দিতে না পারে তাহা হইলে সে বিনা আপত্তিতে 'বরখাস্ত' হইবে এবং যতদিন না সে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে ততদিন সে পাঁচ টাকার স্থলে তিন টাকা মাত্র বেতন গ্রহণ করিবে।

সন্তুষ্ট হইয়া জমিদার ছেদিকেই উপযুক্ত কর্ম্মচারীরূপে মনোনীত করিলেন।

২

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই সুচতুর ছেদি প্রজাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে যত্নবান হইল। প্রথম সাক্ষাতেই সে প্রজাদের নিকট জমিদারের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিল এবং জমিদার যে এরূপ অত্যাচারী এ কথা পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে সে যে কদাচ এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না এ কথা তাহাদের বিশদরূপে

বুঝাইয়া দিল। ছেদির অকপট আত্মীয়তায় সরলচিত্ত প্রজাবৃন্দ বিমুগ্ধ হইল।

বৎসরান্তে খাজনা আদায় করিয়া ছেদি কাহাকেও রসিদ দিল না। সকলকে বুঝাইয়া দিল যে ছাপা রসিদ আনিতে লোক গিয়াছে, আসিলেই সকলকে রসিদ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

পর বৎসরও ছেদি খাজনা লইয়া রসিদ দিল না। প্রজাদের বলিল যে রসিদ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু রসিদে জমিদারের স্বাক্ষর ছিল না। সেইজন্য সে সমস্ত রসিদ জমিদারের নিকট ফেরত দিয়াছে। জুয়াচোর জমিদার তাহাদের সরল পাইয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু মুন্সী ছেদিপ্রসাদকে যিনি ঠকাইবেন তাঁহাকে 'গঙ্গাজি'তে মুখ ধুইয়া আসিতে হইবে।

পাটোয়ারির চতুরতা এবং প্রজাপ্রীতি দেখিয়া প্রজাবৃন্দ অধিকতর বিমুগ্ধ হইল।

তৃতীয় বৎসরে ছেদি প্রজাদের ডাকাইয়া গোপনে বলিল যে পাষণ্ড জমিদার তাহাদের খাজনা সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ করিবার চেষ্টায় আছে, এই সময় হইতে তাহাদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, নহিলে ইহার পর বড় বিপদে পড়িতে হইবে। প্রজারা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল এ জন্য কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ছেদি বলিল তাহাদের যাহার নিকটে যত পুরাতন রসিদ আছে, সমস্ত যদি তাহারা তাহার কাছে আনিয়া দেয় তাহা হইলে সে অবশ্যই একটা সদুপায় বাহির করিতে পারে। প্রজারা তাহাই করিল। ছেদিপ্রসাদ রসিদগুলি লইয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিল। প্রজাদের বলিল, এ সম্বন্ধে একবার সদরে গিয়া উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক। এই সুযোগে ছেদি প্রজাদের তৃতীয় বৎসরের খাজনারও রসিদ দিল না। চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে ছেদি জমিদারের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে প্রজাবৃন্দকে জানাইল যে পাষণ্ড জমিদার শতকরা ৫০১ টাকা হিসাবে অধিক খাজনা দাবি করিয়াছে। প্রথমাবধিই পাষণ্ডের এই প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল, কিন্তু ছেদি তাহাকে বহু কষ্টে এতদিন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল! সক্রোধে ছেদি প্রজাদের আদেশ করিল তাহারা যেন কোন মতেই এই অত্যাচারী জমিদারের অন্যায় আদেশ পালনে সম্মত না হয়।

কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রবঞ্চিত প্রজাবর্গ সভয়ে জানিল যে তাহাদের নামে তিন বৎসরের বাকি খাজনার নালিশ হইয়াছে এবং ছেদিপ্রসাদের সিন্দুক হইতে প্রজাদের সমস্ত পুরাতন রসিদ জমিদারের গুপ্তচর কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। প্রজারা আসিয়া ছেদির কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শুনিয়া ছেদিপ্রসাদ ক্রোধে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না "উঃ এতদূর অত্যাচার, এরূপ ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা!" বলিতে বলিতে ছেদি নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বিনা রসিদে খাজনা দেওয়ার কথা আদালতে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না—পুরাতন রসিদের অভাবে খাজনার হার সম্বন্ধে প্রমাণও

বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রজাদের নূতন করিয়া জমিদারের নামে বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ত লিখিয়া দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া লইতে হইল।

যেদিন সমস্ত কবুলিয়ত রেজিষ্টারি হইয়া গেল সেইদিনই ব্যথিত হৃদয়ে ছেদি-প্রসাদ উদ্যত রোষে সর্ব্বসমক্ষে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে যদি আর এক মাসের অধিক এ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সকলে যেন তাহার জন্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ করে!

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেদি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। একমাসের মধ্যেই সে নিজের কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ তহশীলদারের পদে উন্নীত হইয়া মহেশপুর ত্যাগ করিয়া গেল!

৩

তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া দৌলতপুরে আসিয়া ছেদি দেখিল যে নূতন করিয়া জমির বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে উত্তমরূপ অর্থ-সংগ্রহের সুযোগ নাই। সুতরাং ছেদি প্রজাদের নিকট 'নোটিস্' পাঠাইল যে তাহাদের অধিকৃত সমস্ত জমির পুনরায় জরিপ করাইতে হইবে; কেননা তাহারা কবুলিয়ত-লিখিত জমি অপেক্ষা অনেক অধিক জমি বিনা খাজনায় অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিতেছে।

দৌলতপুরের প্রজারা অধিকাংশই 'বাভন'। ছেদির অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহারা মন্ত্রণা করিয়া লোকমুখে ছেদিকে জানাইল যে এখানে কোন প্রকার 'লালাগিরি' খাটিবে না, তাহাদের জমিতে যে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকে মস্তকটী স্থানান্তরে রাখিয়া আসিতে হইবে।

ছেদি বুঝিল মহেশপুরের কৌশল এখানে খাটিবে না। এখানকার জন্য রীতিমত প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সে জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রজাদের অন্যায় অত্যাচারের কথা সবিস্তরে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল। রাজস্ব-বৃদ্ধির আশায় লুব্ধ জমিদার হুকুম দিলেন যে এজন্য যত টাকার প্রয়োজন হইবে সমস্ত 'সরকার' হইতে প্রদত্ত হইবে। কোন প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হওয়া চাই। জমিদারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া ছেদি প্রথমেই দারোগা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। দারোগা-জয়ের অব্যর্থ মন্ত্র সুচতুর ছেদিপ্রসাদের অবিদিত ছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই দারোগা সাহেব ছেদির একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

দারোগাকে হস্তগত করিয়া ছেদি এক দল লাঠিয়াল সংগ্রহ করিল এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত হইয়া ছেদি সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

বিদ্রোহীদলের অগ্রণী ছিল দুর্দ্ধর্ষ 'বাভন' বাবু রামলোচন সিং। ছেদি সর্ব্বপ্রথমে রামলোচনের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে পরদিন প্রত্যূষ হইতে তাহার জমির 'পয়মাইস সুরু' হইবে।

শুনিয়া রামলোচন সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিল, যাহার মাথার উপর মাথা আছে সেই যেন রামলোচন সিংহের জমি দখল করিতে আসে। গোপনে সংবাদ লইয়া ছেদি জানিল যে রামলোচন রাত্রির মধ্যে

বিস্তর লোকজন সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ছেদির সাহসে কুলাইল না। ছেদি গোপনে লাঠিয়ালদের হুকুম দিল যে, রাত্রির অন্ধকারে এক শত মহিষ লইয়া তাহারা যেন রামলোচনের ক্ষেত্রস্থিত পরিপুষ্ট ধান্যশ্রেণী সমস্ত 'চরাইয়া' দেয়। কিন্তু এ সংবাদ কেমন করিয়া রামলোচনের কাণে পৌঁছিল।

ফলে নিশাচর লাঠিয়াল সম্প্রদায় লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত দেহে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাহাদের ক্ষুধাতুর মহিষযূথ নিকটবর্ত্তী 'পাউণ্ডে' প্রেরিত হইল।

নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ছেদি রামলোচনের সর্ব্বনাশের জন্য মনে মনে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল।

তিন মাস ধরিয়া নানা কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ লইয়া ছেদি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল, দারোগা সাহেবের সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে গোপনে গভীর মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। তিন মাস পরে একদিন প্রত্যূষে সহসা দারোগাসাহেব সদলে দৌলতপুর আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রামলোচন ও তাহার ছয়জন প্রধান সাহায্যকারী গ্রেপ্তার হইল। অভিযোগ গুরুতর—ডাকাতি, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, গৃহদাহ। অভিযোগের মর্ম্ম শুনিয়া রামলোচন ও তাহার সহচরগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

সুচরিত্র ছেদিপ্রসাদ মহেশপুর পরিত্যাগ কালে এক নিম্নশ্রেণীর যুবতীকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। গ্রামের এক নির্জ্জন প্রান্তে তাহার জন্য এক ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অভিযোগকর্ত্রী সেই যুবতী এবং তাহার এক দাসী।

যুবতী অবলীলাক্রমে আদালতে সকলকে সনাক্ত করিল এবং দাসী তাহার প্রত্যেক কথার সমর্থন করিল। প্রমাণ-প্রয়োগের কিছুমাত্র অভাব রহিল না। সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ হইল রামলোচনের স্বহস্ত-লিখিত এক পত্র।

রামলোচন তাহার সঙ্গী গঙ্গাধর সিংকে এই পত্র লিখিয়াছিল। পত্রে অভিযোগের প্রায় সকল কথাই ইঙ্গিতে লিখিত ছিল এবং সঙ্গীদের নামেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। পত্র অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় যুবতীর ভস্মীভূত গৃহে পাওয়া গিয়াছিল। রামলোচনের লিখিত নানা দলিলের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গেল যে পত্রের লেখা অবিকল দলিলের লেখার অনুরূপ। সাদৃশ্য দেখিয়া স্বয়ং রামলোচনই বিস্মিত হইয়া গেল। এরূপ প্রভূত প্রমাণের পর নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

দায়রার বিচারে রামলোচন এবং তাহার সঙ্গীদের প্রত্যেকের ৫ হইতে ৭ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইহার পর কাহার সাধ্য প্রবল-প্রতাপ ছেদিপ্রসাদকে বাধা দেয়? ছেদি যাহা বলিল প্রজারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। জমিদারের খাজনা অর্দ্ধেকের অধিক বাড়িয়া গেল এবং প্রভুভক্ত ছেদি শুদ্ধ সেলামিতেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিল। নিতান্ত প্রীত হইয়া

জমিদার ছেদিকে সদরের নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলেন।

৪

সদরে আসিয়া ছেদি দেখিল যে দেওয়ানজিকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে পূর্ণ প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। দেওয়ানজি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত, সুতরাং সহসা তাঁহার অনিষ্ট করা দুরূহ। সুতরাং অতি সন্তর্পণে ছেদিকে এ পথে অগ্রসর হইতে হইল। ছেদির কীর্ত্তিকাহিনী ইতিপূর্ব্বেই দেওয়ানজির কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দেওয়ানজি পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছেদি এ কথা বুঝিতে পারিয়া প্রথম হইতেই দেওয়ানজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতে লাগিল।

ছেদির কপটতা বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজি ক্রমে ক্রমে ছেদি সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেদি প্রভুর চরিত্রটাও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। অল্পদিনেই সে বুঝিল যে প্রভুর চরিত্রে দুর্ব্বলতার অভাব নাই। মনুষ্যচরিত্রে যে পথ ধরিয়া সয়তান প্রবেশ করিতে থাকে বাবু রামপ্রতাপের চরিত্রে তাহার অধিকাংশই উন্মুক্ত। দুরাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, মাদক দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ—সকলগুলিই রামপ্রতাপের চরিত্রে অল্পাধিক প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, অথচ বুদ্ধির তাদৃশ তীক্ষ্ণতা ছিল না

সুযোগ বুঝিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি নায়েব প্রথমেই প্রভুবশীকরণে প্রবৃত্ত হইল।

ছেদি উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত করিবার কৌশল অবগত ছিল। সে গোপনে সুরা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে উপহার দিতে লাগিল। তাহার প্রযত্নে রামপ্রতাপের বিলাসভবন দেখিতে দেখিতে নব নব নর্ত্তকী ও বিলাসিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে রামপ্রতাপ নরকের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেন।

তখন 'কোকেন' মাদক দ্রব্যের মধ্যে অধিকার বিস্তার করিতেছিল। ছেদি প্রভুকে ইহাতেও দীক্ষিত করিল।

ক্রমে ক্রমে রামপ্রতাপের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। ছেদি তাঁহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে লাগিল।

বৃদ্ধ দেওয়ানজি প্রভুকে অনেক বুঝাইলেন, ছেদি সম্বন্ধে তাঁহাকে সতর্ক হইতে বলিলেন, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন রামপ্রতাপ সে কথা কাণে তুলিলেন না। অবসর বুঝিয়া ছেদি দেওয়ানজির সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

'হোলি'র উৎসব মহাসমারোহে আরব্ধ হইয়াছে। রামপ্রতাপের বিলাসকুঞ্জে বিলাসের স্রোত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—সুরা, ভাঙ্, গঞ্জিকা, কোকেন, চণ্ডুর অবাধ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। নানাদেশ হইতে সমাগত সুন্দরীকুল লালসার অগ্নিকুণ্ডে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইতেছে। রামপ্রতাপ ধীরে ধীরে পশুত্বের নিম্নতম সোপানে অবতীর্ণ হইতেছেন। এমন সময় সজল-চক্ষু ছেদি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ছেদিকে দেখিয়া শিথিলবেশ রামপ্রতাপ বাহু প্রসারণ করিয়া সুরাজড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন 'আও মেরা ভাই জান!' ছেদি তাঁহার উদ্যত বাহুপাশ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলিল যে, সে তাঁহার চরণে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে! উত্তেজিত রামপ্রতাপ বলিলেন "কেঁও?" সুযোগ পাইয়া নানা অলঙ্কার সংযোগ করিয়া ছেদি প্রভুকে বুঝাইয়া দিল যে দেওয়ানজি তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আর তাহার 'সরকারে'র বাটীতে কাজ করা অসম্ভব। এরূপ ভাবে অপমানিত হইয়া কার্য্য করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করাও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে ছেদি উদ্বেলিত অভিমানে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

বিকৃতচিত্ত রামপ্রতাপ হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "বোলাও শালে দেওয়ানকো।"

ক্ষণকাল পরেই দেওয়ানজি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানজিকে দেখিয়া রামপ্রতাপ চীৎকার করিয়া ছেদিকে বলিলেন "লাগাও শালা দেওয়ানকো বিশ জুতি হামারা সাম্‌নে"—প্রভুর অবস্থা দেখিয়া দেওয়ানজি স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ছেদি প্রভুর কাণে কাণে বলিয়া দিল—"দেখিতেছেন উহার বেয়াদবি, আপনাকেও গ্রাহ্য করিতেছে না!" ক্রোধে রামপ্রতাপ বিকট চীৎকার করিয়া দেওয়ানজিকে অযথা গালি দিয়া পেয়াদাকে হুকুম দিলেন "উস্‌কো কাণ পাকড়কে নিকাল দেও।"

দেওয়ানজি দেখিলেন এ সংসারে আর ভদ্রস্থতা নাই। সুতরাং অপমানিত বৃদ্ধ ছেদির প্রতি একবার তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিদীর্য্যমান হৃদয়ে প্রভুগৃহের নিকট নীরবে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া গেলেন। সেই নর্ত্তকীকণ্ঠমুখরিত, সুরাসিক্ত, অহিফেন ও গঞ্জিকাধূমান্ধকার নরকে ছেদিপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ দেওয়ানজির পদে উন্নীত হইলেন।

৫

বহুকষ্টে চিরপ্রার্থিত উন্নতি লাভ করিয়া এইবার ছেদিপ্রসাদ প্রাণ ভরিয়া ভোগসুখে মনোনিবেশ করিলেন। রামপ্রতাপকে বুঝাইয়া দিলেন যে একটু 'ধুমধাম' না করিলে গভর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানলাভ করা অসম্ভব।

রামপ্রতাপ ও দেওয়ানজি উভয়ের জন্য নূতন করিয়া বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। সুদৃশ্য বৃক্ষলতায়, চিত্রে মর্ম্মরে, মূল্যবান গৃহসজ্জায় অট্টালিকাদ্বয় সুশোভিত হইল—হস্তী, অশ্ব, মোটর ও ফিটনের অভাব রহিল না। নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, প্রীতিভোজ গৃহের নিত্য সহচর হইল। চারিদিক হইতে কলাকুশলা সুন্দরীকুল সমাহৃত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গসমাজের ষোড়শোপচারে পূজা চলিতে লাগিল। তাঁহাদের মৃগয়া-ব্যাপারে, প্রীতিভোজে, নৃত্যোৎসবে রজতকণিকা বৃষ্টি-ধারার ন্যায় অজস্রধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। দেওয়ানজির ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহার রাজোচিত বেশভূষা তাঁহার যান-বাহন, তাঁহার অকাতর আতিথেয়তা,

তাঁহার মুক্তহস্তে অর্থবৃষ্টি—যে দেখিল সেই বিস্মিত হইল। রামপ্রতাপ কর্ম্মচারীর কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

কিন্তু এরূপ অপব্যয়ে রাজার ঐশ্বর্য্যও লুপ্ত হইয়া যায়, রামপ্রতাপের মত ক্ষুদ্র জমিদারের ত কথাই নাই। সুতরাং ঋণের সূত্রপাত হইল। রামপ্রতাপ চক্ষু বুজিয়া সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দিতে লাগিলেন এবং দেওয়ানজি যথেচ্ছ হারের সুদে যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঋণভার দিনে দিনে বন্যার মত স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? টাকা বড় না 'ইজ্জত' বড়? সুতরাং এ অবস্থাতেও ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া রামপ্রতাপের দুই কন্যার বিবাহ হইল। অবশ্য ব্যয়ভার সমস্তই ছেদিপ্রসাদের উপর। নিশ্চিন্তচিত্ত রামপ্রতাপ কেবল বিলাসের অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া সুরারঞ্জিত নেত্রে যুবতীর বিম্বাধরে স্বর্গের সুষমা দর্শন করিতে লাগিলেন।

৬

কিন্তু ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা জমিদারীর মূল্য ছাড়াইয়া উঠিল। ছেদিপ্রসাদ ঋণ-গ্রহণের সময়ে সুদের দিকে আদৌ দৃক্পাত করেন নাই। যে যাহা চাহিয়াছিল তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং ঋণের পরিমাণ অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছিল। এত দিনে মহাজনেরা অধীর হইয়া নালিশ করিতে উদ্যত হইল।

ব্যাপার দেখিয়া রামপ্রতাপের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ব্যাকুল হইয়া রাম-প্রতাপকে ধরিয়া বসিল যে এখনো সাবধান না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে।

বিহ্বলচিত্ত রামপ্রতাপ বলিলেন, "এ বিষয়ে যা বলিতে হয় আমার দেওয়ানজিকে বল। আমার টাকা পয়সার হিসাব করিবার অবসর নাই।"

বন্ধুবান্ধবদিগের এই অন্যায় উপদ্রবের কথা অবগত হইয়া দেওয়ানজি দীল্লি হইতে দুইজন নূতন নর্ত্তকী আনাইয়া দিলেন। রামপ্রতাপের অবসর আরও কমিয়া গেল!

হতাশ হইয়া হিতৈষীবৃন্দ কালেক্টর সাহেবকে ধরিয়া বসিল যে তিনি সাহায্য না করিলে বহু কালের একটা পুরাতন বংশ বিলুপ্ত হয়।

কালেক্টর সাহেব সহৃদয় ব্যক্তি। সকল ব্যাপার শুনিয়া তিনি রামপ্রতাপের সম্পত্তি 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে'র তত্ত্বাবধানে দিবার জন্য চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

শুনিয়া দেওয়ানজি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের চেষ্টাই সফল হইল। দেওয়ানজি মালিককে দিয়া আপত্তি করাইয়া, ডাক্তার সাহেবের প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করিয়া 'রেভিনিউ বোর্ডে' 'কারোয়াই' করিয়াও কোন মতে 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে'র ভীষণ কবল হইতে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তিন মাসের মধ্যেই কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে আদেশ আসিল যে এক মাসের মধ্যে 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্' কর্ত্তৃক নিযুক্ত ম্যানেজারকে সমস্ত হিসাব ও সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বিপন্ন দেওয়ানজি বহু কালের পর ধূলি-

ধূসরিত পুরাতন খাতাপত্র টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বহুকাল হিসাব লেখাই হয় নাই। প্রজাদের নিকট কতই বা বাকি আছে, আর কতই বা আদায় হইয়াছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেওয়ানজি উত্তরীয় বস্ত্রে ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

* * * *

হিসাব দিবার আর দুই দিনমাত্র বাকি। সমস্ত কাগজপত্র আফিস-ঘরে সুসজ্জিত। দেওয়ানজির মুখমণ্ডল চিন্তালেশহীন।

সন্ধ্যাকালে আফিস হইতে বাড়ী যাইবার সময় দেওয়ানজি আফিসের চৌকিদারকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে, সে যেন খুব সাবধানে পাহারা দেয়। আফিসে বিস্তর মূল্যবান কাগজপত্র রহিল। চৌকিদার মস্তক অবনত করিয়া সেলাম করিল।

চৌকিদার চারি দিক দেখিয়া রাত্রি দশটার সময়, অভ্যাসমত আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

গভীর রাত্রে বিকট শব্দে চৌকিদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে জাগিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল হুতাশনের লোলরসনা দিগন্ত প্রদীপ্ত করিয়া আফিস-গৃহের বংশনির্ম্মিত চালে ভীষণ প্রতাপে নৃত্য করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া সে দেওয়ানজিকে এই ভীষণ সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

নিদ্রাজড়িতচক্ষু দেওয়ানজি সংবাদ পাইয়া শিথিলবস্ত্রে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া চৌকিদারকে তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন। তাহার পর যখন দেখিলেন অগ্নিশিখা গৃহের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তখন শিথিল-বস্ত্রে উন্মত্তের মত দহ্যমান গৃহের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুলিশ আসিয়া দেখিল দেওয়ানজি অর্দ্ধবিবস্ত্রবেশে আফিস-গৃহের চারিপার্শ্বে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "হায় হায় আমার সর্ব্বনাশ হইল। ওই ঘরে আমার চিরজীবনের সম্বল ১০ হাজার টাকার খুচরা নোট ছিল। আগুন নিভাও, আগুন নিভাও। এক এক কলসী জল, এক এক মোহর। বাঁচাও ভাই, বাঁচাও।"

দারোগাকে সম্মুখে দেখিয়া দেওয়ানজি উন্মত্তের মত ভীষণ অগ্নিতরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দারোগা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। চীৎকার করিয়া দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন "হায় হায় হামারা সব গিয়া, আর হাম্‌কো ভি জানে দিজিয়ে।"

অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হইল, তখন সমস্ত ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। হিসাবের একখানি ছিন্ন কাগজ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নাই।

তৃতীয় দিনে শোকার্ত্ত দেওয়ানজি ললাটে করাঘাত করিতে করিতে ম্যানেজার সাহেবকে শূন্য থলি এবং কয়েক লক্ষ টাকার ঋণভার সমর্পন করিয়া আনতমুখে আপনার জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

রামাবতী

(১)

বাঙ্গালার পালবংশীয় রাজাদিগের শেষ রাজধানীর নাম 'রামাবতী'। ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালাদেশের অধিবাসিগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় [সেখ শুভোদয়া নামক] একখানি হস্তলিখিত পুথি বহুদিবস হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার প্রতি যখন পণ্ডিতসমাজের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখন তাহার এক স্থলে 'রামাবতী'র নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। রামাবতী যে একদিন বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল, সে কথা তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে 'রামাবতী'র অনেক পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুকানন হামিল্টন্ বরেন্দ্রভূমির নানাস্থানের পরিদর্শনকার্য্য শেষ করিয়া এক 'রিপোর্ট' লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা বিলাতে এবং এদেশেও মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে একটি জনশ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে,—"প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে, বরেন্দ্রভূমিতে এক কৈবর্ত্ত রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল;—তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়;—ভীম নামক এক রাজার নামও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।" একশত বৎসরের মধ্যে সে জনশ্রুতি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখনও ভীমরাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এখনকার জনশ্রুতি তাঁহাকে আর সহস্রবৎসর-পূর্ব্বকালবর্ত্তী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করে না—তাঁহাকে [মধ্যম পাণ্ডব] ভীম বলিয়াই প্রচারিত করে! বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে [রাজসাহীর অন্তর্গত গোদাগাড়ী অঞ্চলে] এবং উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে [বগুড়ার অন্তর্গত 'মহাস্থানে'র নিকটে] স্থানে স্থানে যে সকল পুরাতন মৃৎপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এখন [রাজসাহী অঞ্চলে] 'ভীমের ডাইঙ্গ', এবং [বগুড়া অঞ্চলে] 'ভীমের জঙ্গল' বলিয়া পরিচিত। তাহার সহিত যে 'রামাবতী'র কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা কল্পনা করিবারও উপায় ছিল না। এই সকল উচ্চভূমির রহস্যভেদের জন্য কোন কোন রাজপুরুষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাকে জলপ্লাবন-নিবারণের 'বাঁধ' মনে করিয়াও, সম্পূর্ণরূপে সংশয়শূন্য হইতে পারেন নাই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামের নিকটবর্ত্তী কমৌলিগ্রামে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও সুপণ্ডিত ডাক্তার ভিনিস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে * জানিতে পারা গিয়াছিল,—বিগ্রহপালদেবের রামপাল নামক এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা তাম্রশাসনে এইরূপে উল্লিখিত আছে,—

* Epigraphia Indica, Vol. II.

"তস্যোর্জ্জস্বলপৌরুষস্য নৃপতেঃ
শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-শীতকিরণঃ
সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাৎ
যথাবৎ যশঃ
ক্ষোণী-নায়ক-ভীমরাবণ-বধাৎ
যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ

ইহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—রামপাল অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মতই (যথাবৎ) যশঃ বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। কারণ, উভয়েই 'যুদ্ধার্ণব' উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; উভয়েই 'জনকভূ' লাভ করিয়াছিলেন; উভয়েই 'ভীমরাবণ' বধ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকের [রামপাল-পক্ষের] ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—রামপাল [জনকভূ] মিথিলা জয় করিয়া, ভীম নামক মিথিলারাজকে নিহত করিয়াছিলেন;—কিন্তু ভীম নামক কোনও রাজা কখন মিথিলার রাজা থাকা জানিতে পারা যায় নাই বলিয়া, অধ্যাপক ভিনিস্ আত্ম-সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিয়া, নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তৎকালে এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে অন্তরায়ের অভাব ছিল না। 'জনকভূ'-শব্দের এক পক্ষের অর্থ (সীতাদেবী) সুগম হইলেও, অন্য পক্ষের অর্থ সুগম ছিল না। কারণ, পাল-রাজগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, সে কথা তখন অনেকেই জানিতেন না; যাঁহারা বা জানিতেন, তাঁহারাও মানিতেন না। সুতরাং জনকভূ-শব্দের 'জন্মভূমি'-অর্থ গ্রহণ না করিয়া, অধ্যাপক ভিনিস্ মিথিলা-অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তারানাথ বরেন্দ্রভূমিকে পাল-নরপালগণের জন্মভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—হামিল্টনও সহস্রবৎসর-পূর্ব্ব-কালবর্ত্তী ভীম রাজার নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, এই শ্লোকেই বুঝিতে পারা যাইত,—ভীমরাজাকে নিহত করিয়া, বরেন্দ্রভূমির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, রামপালদেবও শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় [যথাবৎ] যশঃ বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেও, সকল কথা বুঝিতে পারা যাইত না। বিগ্রহপালদেবের রাজ্যে ভীম কেমন করিয়া অধিকার লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার রহস্যভেদ করা সম্ভব হইত না।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ছয় সাত বৎসর পরে, দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত রামপালদেবের পুত্রের [মদন-পালদেবের] তাম্রশাসনখানি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের হস্তগত হয়, এবং তাঁহারই অধ্যবসায়ে তাহার পাঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহারও একটি শ্লোকাংশে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"এতস্যাপি সহোদরো নরপতি-
র্দিব্যপ্রজানির্ভর
ক্ষোভাহুতবিধুত-বাসবধৃতিঃ
শ্রীরামপালোঽভবৎ॥"

এই তাম্রশাসনেই জানিতে পারা যায়, —বিগ্রহপালদেবের পুত্র মহীপাল রাজা হইবার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ শূরপাল রাজা হন; এবং তাঁহার পর, তাঁহার সহোদর [এতস্যাপি সহোদরো] রামপালও রাজা হইয়াছিলেন। [তৎকালে] শ্লোকটির পাঠোদ্ধারে কিছু গোলযোগ থাকিলেও, মোটের উপর জানিতে পারা গিয়াছিল, —রামপাল রাজার সঙ্গে স্বর্গাধিপতি 'বাসবে'র কোন না কোন বিষয়ে তুলনা করা হইয়াছে। রাজকবি কোন্ বিষয়ে কিরূপ তুলনার অবতারণা করিয়া, ইঙ্গিতে কোন্ ঐতিহাসিক তথ্যের আভাস দিয়া গিয়াছেন, লিপি-পাঠ মুদ্রিত করিবার সময়ে, তাহার রহস্য ভেদের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসের 'এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রসিডিং' প্রকাশিত হইলে জানিতে পারা গিয়াছিল,—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ মহোদয় নেপাল হইতে সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত 'রামচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ আনয়ন করিয়াছেন; তাহাতে [বিগ্রহপালদেবের স্বর্গারোহণের পর] কৈবর্ত্ত-বিপ্লবে বরেন্দ্রী ভীম রাজার হস্তগত হইবার, ও [রামপাল-দেব কর্ত্তৃক ভীম নিহত হইবার পর] বরেন্দ্রী রামপালদেবের হস্তগত হইবার বিবরণ উল্লিখিত আছে। আরও জানিতে পারা গিয়াছিল যে,—এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অবসানে, রামপালদেব কর্ত্তৃক 'রামাবতী' নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই বিবরণের সাহায্যে মদনপালদেবের এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনোক্ত রামপাল-দেবের কীর্ত্তিবিজ্ঞাপক কবি-প্রশস্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিবার সুবিধা ঘটিলেও, তাহা প্রচারিত না হইয়া, যাহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'রামচরিতম্' কাব্যখানি সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এখন সকলেই জানিতে পারিয়া-ছেন,—'কৈবর্ত্ত-বিপ্লব'—'ভীমরাজার উত্থান ও পতন',—তাহার অবসানে 'রামাবতী' নগর নির্ম্মাণ,—বাঙ্গালীর ইতিহাসের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থেও তাহা সাদরে উল্লিখিত হইয়াছে।

তথাপি এখনও অনেক কথা তর্কসঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে,—'রামচরিতম্' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহার সকল কথা সর্ব্বাংশে বোধগম্য হইতে পারে নাই। 'রামচরিতম্' শ্লিষ্টকাব্য বলিয়া, এক অর্থে শ্রীরামচন্দ্রের 'সীতা-উদ্ধার' এবং অন্য অর্থে রামপালদেবের 'বরেন্দ্রী-উদ্ধার' বিবৃত করিতে গিয়া, [শ্লেষের অনুরোধে] সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার কাব্যখানি দুর্ব্বোধ করিয়া দিয়াছেন। কিয়দংশের টীকা প্রাপ্ত হইলেও, [অনুবাদের অভাবে] সটীক শ্লোকগুলিও সকলের বোধগম্য হইতে পারে নাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় [ইংরাজি ভাষায় লিখিত] ভূমিকায় কাব্যোক্ত বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদানের জন্য যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে সকল কথা যথাযোগ্যভাবে আলোচিত

হইতে পারে নাই। এমন কি, 'রামাবতী' কোথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে ; এবং পূর্ব্ববঙ্গের রামপাল নামক স্থান 'রামাবতী' বলিয়া [পার্শ্ব টীকায়] ইঙ্গিত মাত্রেই সূচিত হইয়াছে।

এখন আর 'রামাবতী'র কথা কল্পনার সাহায্যে আলোচিত হইতে পারে না। এখন এই গ্রন্থোক্ত শ্লোকাবলীর সাহায্যেই অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে ;— 'রামচরিতম্' কাব্যের সকল কথা যথাযোগ্য ভাবে বুঝিবার জন্য, [প্রয়োজন হইলে,] নানাস্থান পরিদর্শনের ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। গৃহে বসিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ' সাজিবার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের আশায় যেখানে যাওয়া উচিত মনে হইবে, সেখানেই গমন করিবার জন্য স্বদেশবাসীকে উৎসাহ দান করিতে হইবে ; কখন কখন বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলে, পরাজয়কেও ভবিষ্যতের বিজয়লাভের সোপান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানপ্রণালী এইরূপেই ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী সুপণ্ডিত যে উপাদেয় গ্রন্থের আবিষ্কার সাধন করিয়াও, চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের পূর্ব্বে তাহা সুধী-সমাজে প্রকাশিত করিতে অগ্রসর" হন নাই, সে কাব্য যে বিলক্ষণ দুরূহ, তাহাতে সংশয় নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাসের মধ্যেই যে [এক সময়ের] সমগ্র প্রাচ্যভারতের ইতিহাসের মূলসূত্রের সন্ধান-লাভের আশা আছে, এই দুরূহ কাব্যের আলোচনায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তখন এই কাব্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সমাদর লাভ করিবে। যিনি এরূপ গ্রন্থের আবিষ্কার-সাধন করিয়াছেন, তাঁহার জীবন সন্ধ্যা এই সৎকার্য্যের আত্ম-প্রসাদেই চরিতার্থতা লাভ করিবে; এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থাবিষ্কারের কথা একদিন না একদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য বলিয়াই স্বীকৃত হইবে।

পাল-রাজবংশের শাসনসময়ে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য বহুসংখ্যক 'সামন্তচক্রে' বিভক্ত ছিল। ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে 'মহাসামন্তাধিপতি'র উল্লেখ থাকায়, তাহার আভাস মাত্রই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল ;—'রামচরিতম্' কাব্যে বিস্তৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অমর-কোষে [২।৮।২] দেখিতে পাওয়া যায়,—

"রাজা তু প্রণতাশেষ-সামন্তঃ স্যাদধীশ্বরঃ।"

যিনি 'অধীশ্বর' [চক্রবর্ত্তী বা সার্ব্বভৌম] তাঁহার 'স্ব-দেশের' অব্যবহিত ভূমির রাজগণ 'সামন্ত' পদবাচ্য ; তাঁহারা সার্ব্বভৌমের আশ্রয়ে আপন আপন রাজমণ্ডলে শাসন-ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। ভানুজী দীক্ষিতের টীকায় ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"সমন্তায়াঃ স্বদেশাব্যবহিত-ভূমে রিমে রাজানঃ।"

সমস্ত 'রাজমণ্ডলে' বা 'সামন্ত-চক্রে' ভ্রমণশীল

'চক্রবর্ত্তী'র সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি থাকিলেও, যাহা তাঁহার 'স্বদেশ' তাহাতেই তাঁহার সাক্ষাৎশাসন প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। সামন্তগণের রাজধানী 'সামন্তচক্রে', —চক্রবর্ত্তীর রাজধানী তাঁহার 'স্বদেশে'— প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কথা। বরেন্দ্রী ব্যতীত অন্য কোনও স্থান পালবংশীয় নরপালগণের 'স্বদেশ' বলিয়া পরিচিত থাকিবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে, 'রামচরিতম্' কাব্যে বরেন্দ্রী তাঁহাদিগের 'জনকভূমি' বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার 'অব্যবহিত ভূমি' রাঢ়া, বঙ্গ [পূর্ব্ববঙ্গ] ইত্যাদি স্থান 'সামন্তচক্রে'র অন্তর্গত ছিল।

কৈবর্ত্ত-বিপ্লবে পালবংশীয় নরপালগণের জনকভূমি [বরেন্দ্রী] কিয়ৎকালের জন্য হস্তচ্যুত হইবার পর, সামন্তগণের সহায়তায় রামপালদেব বহু ক্লেশে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া, 'রামাবতী' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,— ইহাই 'রামচরিতম্' কাব্যের আখ্যানবস্তু। বাসব [ইন্দ্র] যেমন স্বর্গবিচ্যুত হইয়াও, ধৈর্য্যাবলম্বনে দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে পুনরায় স্বর্গরাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন, রামপালদেবও সেইরূপ ধৈর্য্যের [ধৃতির] পরিচয় প্রদান করায়, বাসবের সহিত তাঁহার তুলনা দিবার অবসর লাভ করিয়া, রাজকবি [মদনপালদেবের তাম্রশাসনে] রামপালদেবকে 'বাসব-ধৃতিঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যিনি এইরূপে বহুকালে, বহুক্লেশে জনকভূমির উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই "স্বদেশ" পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গের [পূর্ব্ববঙ্গের] সামন্তচক্রের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইবেন কেন, তাহাতে সহজেই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। 'রামচরিতম্' কাব্যেও এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতেই সংশয় অধিক বদ্ধমূল হইয়া পড়ে; এবং মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকার পার্শ্বটীকায় রামপালকে 'রামাবতী' বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন কেন, তাহা বোধগম্য হয় না। মনে হয়,—ইহা হয় ত মুদ্রাঙ্কনের ক্রটি মাত্র। যে ভাবে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ক্রটি ঘটিবার সম্ভাবনার অভাব ছিল না। এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও, এই গ্রন্থের মুদ্রাকার্য্যে এত অধিক ক্রটি ঘটিয়া গিয়াছে যে, শিক্ষার্থিগণের পুনঃ পুনঃ পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকার [৮ পৃষ্ঠায়] একস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে,—গুরবমিশ্রের শিলালিপি 'রঙ্গপুর' জেলায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহা চিরকাল দিনাজপুর জেলার মধ্যেই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। ভূমিকার আর এক স্থানে [৯পৃষ্ঠায়] মুদ্রিত হইয়াছে,—দ্বিতীয় বিগ্রহপালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজার নাম মহীপাল, "তিনি গোপালের একতম পুত্র।" বলা বাহুল্য, মহীপাল দ্বিতীয় বিগ্রহপালেরই পুত্র ছিলেন। ভূমিকার আরও এক স্থানে [১৩পৃষ্ঠায়] মুদ্রিত হইয়াছে,—নরপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যসম্বৎসরে গয়াধামে যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহার ফলকলিপি 'বৈদ্য-বজ্রপাণি' কর্ত্তৃক রচিত, এবং তাহা শীঘ্রই

[বাবু আর, ডি, বানার্জ্জি কর্ত্তৃক] প্রকাশিত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় 'বৈদ্য বজ্রপাণি'র নাম কিরূপে পাইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার আভাস থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই লিপির এক প্রতিকৃতি বহু পূর্ব্বে কনিংহাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং 'রামচরিতম্' মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে এই লিপির পাঠ ও মর্ম্ম এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল;—ফলকলিপি 'বাজিবৈদ্য সহদেব' কর্ত্তৃক রচিত;—তাহা সুধীসমাজে সুপরিচিত। 'বৈদ্য-বজ্রপাণি' নূতন আবিষ্কার, হয়ত মুদ্রাকরপ্রমাদ, অথবা পূর্ব্বপঠিত পাঠের পুনশ্চ পাঠোদ্ধার চেষ্টার অভিনব নিদর্শন! এইরূপ ত্রুটিতে কেবল যে ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'ভূমিকা' মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নয়;—মূলগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণেও স্থানে স্থানে [ইহার প্রভাবে] তাৎপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছে;—দুই এক স্থলে প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিপরীত অর্থও সূচিত হইয়াছে!

'রামাবতী' কোথায় ছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, 'রামচরিতম্' অবলম্বন করিয়াই তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে। এই সকল মুদ্রণ-ত্রুটির জন্য তাহার উপর সকল স্থলে নিঃসংশয়ে নির্ভর করিবার উপায় না থাকায়, প্রথমে মুদ্রিত পুস্তক-খানির সংশোধন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহার চেষ্টা না করিয়া পাল-নরপালগণের শেষ শাসনসময়ের ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং অধ্যবসায় প্রশংসনীয় হইলেও, তাহার সকল ফল প্রশংসনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

চরিতচিত্র।

শ্রীযুক্ত স্যার তারকনাথ পালিত।

বাংলা দেশের বাহিরে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের নাম এতাবৎকাল যে খুব সুপরিচিত ছিল তাহা নহে। আপনার দীর্ঘ জীবনের সমুদায় সঞ্চিত সম্পত্তি জড়বিজ্ঞান-শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করিয়া, পালিত মহাশয় আজ একটা ভারতব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেশবিদেশের সংবাদপত্র সকল তাঁর গুণগানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুরুষেরা তাঁর এই অনন্যসাধারণ বদান্যতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে "নাইট" শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আজি পর্য্যন্ত বাংলা দেশে এক হাইকোর্টের জজেরা ব্যতীত অপর কেহ এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। বোম্বাইএ পারশী ধনকুবেরদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বদান্যতার

জন্য এইরূপ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলায় পালিত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

বহুদিন হইতেই বাংলার লোকে পালিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া আসিয়াছে। অল্প বয়সে বিলাত যাইয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। সেকালে বিলাত যাওয়া এতটা সহজ ছিল না। আর বাঙালী ব্যারিষ্টারের সংখ্যাও দেশে অতি অল্প ছিল। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় পালিত মহাশয়ের পূর্ব্বেই ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ পালিত মহাশয়ের সমকালীন লোক। কিন্তু মনোমোহন ঘোষ বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপন আপন ব্যবসায়ে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পালিত মহাশয় তাহা করেন নাই। অথচ পালিত মহাশয়ের শক্তিসাধ্য যে ইহাঁদের অপেক্ষা বড় বেশি হীন ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পালিত মহাশয় ইহাঁদের অপেক্ষা কতকটা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ জগতে সর্ব্বত্রই একটা অদ্ভুত ক্ষতিপূরণের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। বিধাতা যাহাকে একদিকে কিছু বেশি দান করেন, অন্যদিকে সেই আতিশয্যের "পাষাণ ভাঙ্গিবার" জন্যই বা বুঝি, তাহাকে কিছু খাট করিয়াও রাখেন। একটু তলাইয়া দেখিলে অনেক বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার থাকে, ধীরতা তার তেমন থাকে না। সহজে যে জটিল বিষয় ধরিতে বা বুঝিতে পারে, গভীর বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনোনিবেশ করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস তার প্রায়ই দেখা যায় না। মেধা ও শ্রমশীলতা কচিৎ এক সঙ্গে বসবাস করে। পালিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণ মেধাই বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর ব্যবসায়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বলাভের অন্তরায় হইয়াছিল। আর এই জন্যই তিনি অধিকাংশ সময় ফৌজদারী মামলাতেই নিযুক্ত হইতেন। ফৌজদারী মামলায় এক সময়ে বাঙালী ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মতন এমন সুদক্ষ লোক আর কেহ ছিলেন না, বলিলেও হয়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপত্তি কতকটা বেশি ছিল সত্য, কিন্তু ঘোষ মহাশয় কেবল আপনার ব্যবহার-কুশলতাগুণে এই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন কি না, কি বলা যায় না। ঘোষ মহাশয়ের যে কর্ম্মকুশলতা, যে লোকরঞ্জন-শক্তি, যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ছিল, সে সকলগুণ সে মাত্রায় পালিত মহাশয়ের থাকিলে, তিনি কোনও অংশে যে ঘোষ মহাশয় অপেক্ষা অল্প খ্যাত্যাপন্ন হইতেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে এ সকল 'যদি'র স্থান নাই। তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের উপযোগী শক্তিসাধ্য দান করিয়া থাকে। একদিকে কাহাকে একটু কিছু বেশি দিলে আর একদিকে একটু কাটিয়া ছাটিয়া সমান করিয়া দেয়। ঘোষ মহাশয়ের যাহা ছিল পালিত মহাশয়ের তাহা ছিল না, আর পালিত মহাশয়ের যাহা আছে, ঘোষ মহাশয় তাহা পান নাই, এইরূপে গড়ে মানুষ একটা বিচিত্র ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের অনেক

শক্তিসাধ্য আছে—যে সকল শক্তিসাধ্য থাকিলে লোকে ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ করে, পালিত মহাশয়ের তাহা বিলক্ষণ ছিল। আর যে সুযোগ পাইলে এ সকল শক্তিসাধ্য সফলতা লাভ করিয়া থাকে, পালিত মহাশয়ের ভাগ্যে সে সুযোগও যে জুটে নাই, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাতে এ সকল শক্তি এবং সুযোগ সত্ত্বেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। লোকে সচরাচর ব্যবহার-ব্যবসায়কে স্বাধীন ব্যবসায় বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু এখানেও যে স্বাধীনতার খুব আদর থাকে বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব এমন বলা যায় না। উকিল বারিষ্টারকেও আদালতের মুখ চাহিয়া এবং হাকিমের মর্জ্জি বুঝিয়া চলিতে হয়। না পারিলে ব্যবসায় চলা ভার হইয়া উঠে। আর অনন্যসাধারণ আইনজ্ঞতা বা কর্ম্মকুশলতাগুণে ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও সকল সময়ে সমব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করা সম্ভব হয় না। পালিত মহাশয় চিরদিনই অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লোকের মুখ চাহিয়া চলিবার কৌশলটী তিনি কখনও শিক্ষা করেন নাই। যে নম্রতা থাকিলে এ শিক্ষা সহজ হয়, পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে তাহা ছিল না এবং নাই। খাতির কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। চক্ষুলজ্জা-বস্তুটীও তাঁর আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এ সকল যে উকীল-বারিষ্টারের নাই, তাঁর পক্ষে আপনার ব্যবসায়ে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা আদৌ সম্ভবে না। পালিত মহাশয়ের প্রকৃতি একটু রুক্ষ। মনে হয় যেন সহজেই তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং—মহাভারতের এই সমীচীন নীতি অনুসরণ করিয়া চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মোলায়েম করিয়া কথা বলার অভ্যাসটা তিনি কখনও লাভ করেন নাই। আর এই জন্যই এত শক্তিসাধ্যও থাকিতেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে যথাযোগ্য উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

আর ঠিক এই কারণেই দেশের তথাকথিত জনহিতকর কর্ম্মেও পালিত মহাশয় এ পর্য্যন্ত নেতৃ-পদ প্রাপ্ত হন নাই। এ আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁর কখনও ছিল, এরূপও মনে হয় না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ ভাগে, আর মনোমোহন ঘোষ মহাশয় আযৌবনই দেশহিতকর অনুষ্ঠানে লিপ্ত ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যাবধিই লোকমতগঠন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, যখন তিনি অজাতশ্মশ্রু যুবক মাত্র, তখনই "ইণ্ডিয়ান মিরার" (Indian Mirror) পত্রের সম্পাদকীয় ভার বহন করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান মিরার" তখন সাপ্তাহিক ছিল; তার বহুকাল পরে দৈনিক আকারে পরিণত হয়। কিন্তু সে কালে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনাও সামান্য ব্যাপার ছিল না। বিশেষতঃ "ইণ্ডিয়ান মিরার" তখন নবোদিত ব্রাহ্ম-

সমাজের মুখপত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চে যে সুর জাগাইতেছিলেন, ইণ্ডিয়ান মিরারের স্তম্ভে সেই সুরই ভাঁজিতে হইত। ইহাতেই একদিকে মনোমোহনের শক্তিসাধ্যের ও অন্যদিকে লোক-হিতব্রতে তাঁর কি যে গভীর অনুরাগ ছিল তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। মনোমোহন এইরূপে প্রথম যৌবনাবধিই লোকনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চাভিলাষ আমরণ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তরে জাগরুক ছিল। কিন্তু পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ বস্তুটী কখনও দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ, যে সকল সরঞ্জাম থাকিলে লোকে জননায়কের পদ লাভ করিতে পারে, পালিত মহাশয়ের সে সকল সরঞ্জামও কখনও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যেমন ব্যবহার-ব্যবসায়ে হাকিমের মুখ চাহিয়া কথা বলিতে হয়, সেইরূপ জননেতৃত্বলাভ করিতে হইলে অনেক সময় জনগণের মন যোগাইয়া চলা আবশ্যক হয়। যাঁহারা অনন্যসাধারণ বাগ্মীতাশক্তি বা সাহিত্যপ্রতিভার গুণে প্রথমে অগঠিত লোকমতকে প্রবুদ্ধ ও গঠিত করিয়া সেই সংহত জনশক্তির অগ্রণীরূপে লোকনায়কের পদলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে লোকমতানুবর্ত্তিতা না করিয়াও সেইপদ রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের এ শক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে লোকমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী হইয়া না চলিত পারিলে, আধুনিক দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রণীদলভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা লোকনেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, একদিকে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যদিকে কিয়ৎপরিমাণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর প্রায় সকলকেই স্বল্পবিস্তর লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হইয়াছে। আর সুরেন্দ্রনাথও এক সময়ে যতটা স্বাধীন ছিলেন, পরে সে স্বাধীনতা ততটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যেসকল গুণ থাকিলে লোকে এরূপ ভাবে, পদ ও প্রতিপত্তির লোভেও আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে সে গুণ নাই। যে স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি আপনার ব্যবসায়ের চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই, সেই স্বাধীনচিত্ততার জন্যই তিনি আমাদের আধুনিক সমাজসংস্কারের বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর দলে নেতৃত্বলাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ কোনও আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে কখনও জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। অথচ পালিত মহাশয় নিজের পরিবারে আর দশজন বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুর মতন আধুনিক সমাজ সংস্কারের আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল লইয়া একটা হুজুগ করেন নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনাতেও তিনি এইরূপেই যোগ দিয়া আসিয়াছেন। প্রয়োজন মত কংগ্রেসের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য অর্থদান করিয়াছেন। তাঁর সমশ্রেণীর আর দশজনে যেমন এ সকল ব্যপারে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, পালিত মহাশয়ও সেরূপ করিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল দানের

জন্য কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিবার কোন লিপ্সা তাঁর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ফলতঃ এরূপ নেতৃত্বলাভের যোগ্যতাও তাঁর নাই; কিন্তু পালিত মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসার কথা এই যে, তিনি আপনার ঠিক ওজনটী জানেন। তিনি কি করিতে পারেন ও কি করিতে পারেন না, ইহা যেমন পরিষ্কাররূপে জানেন, তাঁর সমশ্রেণীর লোকেরা অনেকেই তাহা জানেন না। এই জন্যই যাঁর যে কার্য্যের কোনও শক্তি ও সরঞ্জাম নাই, সেও আপনার পদের বা ধনের জোরে সে কার্য্যে কেবল হাত দেয় যে তাহা নহে, একেবারে নেতৃত্ব পদে যাইয়া চড়িয়া বসিতে চাহে। বাংলা ভাষায় ইহাকেই বোধ হয় হাম্‌বা বলে। এই বস্তু হইতেই ইংরাজের হাম্বাগিজমের (Humbugismএর) উৎপত্তি হয়। যার প্রকৃতির ভিতরে এই বাংলা হাম্‌বাটী নাই, তার পক্ষে ইংরেজি হাম্বাগিজম করিবারও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। যার যে শক্তি নাই, সে সেই কাজ করিতে গেলেই হাম্বাগ (Humbug) হইয়া উঠে। যার প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি নাই সে যদি ধার্ম্মিকের আসনে যাইয়া বসিবার জন্য লালায়িত হয়; যাঁর বাক্‌শক্তি নাই সে যদি করতালি লাভের লোভে বক্তৃতামঞ্চে যাইয়া দাঁড়াইতে চাহে; যার বিনয় স্বভাবসিদ্ধ নয় সে যদি বিনয়ীর যশলিপ্সায় এই মহৎ গুণের অভিনয় করিতে ব্যস্ত হয়; যার বুদ্ধি ও বিদ্যা নাই, আছে কেবল ধনের উত্তাপ, সে যদি লোকমত পরিচালনার জন্য জননেতৃত্ব দাবী করিতে আরম্ভ করে;— তাহা হইলে তার পক্ষে এই হাম্‌বার জন্য হামবাগ না সাজা অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ রূপ কোন হাম্‌বা নাই বলিয়া, তিনি এই হুজুগের যুগেও এ পর্য্যন্ত হাম্বাগ হইয়া উঠেন নাই।

তাঁর রুক্ষ স্বভাবের জন্য পালিত মহাশয় নিজের ব্যবসায়ে যেমন অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ আমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনেও কোনও প্রকারের নেতৃত্বমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। আর এই জন্য তাঁর মেধার বা চরিত্রের প্রভাবও আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোরাজ্যেও কোনও প্রকারের আধিপত্য লাভ কর নাই। ফলতঃ ইংরাজিতে যাহাকে public man বলে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত সে জাতীয় জীব নহেন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে লোকনেতৃত্ব লাভ করিবার কোনও উপকরণও নাই। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে, আশৈশবই তিনি অশেষ প্রভুত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছেন অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বহুকালাবধিই জানা গিয়াছে। আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগের উপরে তাঁর একটা মোহিনী শক্তিরও পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁরা পালিত মহাশয়ের সকল প্রকারের ত্রুটী দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিয়া চিরদিন তাঁর মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন। একবার যে তাঁর বন্ধুতালাভ করিয়াছে চিরদিন পালিত মহাশয়, প্রাণপণে তাঁহার প্রতি সুহৃদ্‌জনোচিত সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। অন্যপক্ষে তাঁর শত্রুতা যে একবার করিয়াছে, বা তাঁর বন্ধুবান্ধবদিগের কোনো ও প্রকারের অনিষ্টের চেষ্টাতে যে একবার লিপ্ত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত জীবনে কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা অল্প, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁর শত্রু বা অসম্পর্কিত লোকের প্রতি পালিত মহাশয় কখনও উদার ও কোমল ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁর প্রাণটা যে খুব কঠোর এমনও মনে করা সঙ্গত হইবে না। কারণ এই কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁর কোমলচিত্ততারও অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন পালিত মহাশয়কে নিরতিশয় কঠোর-প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়, অন্যদিকে সময়ে সময়ে তাঁর সেইরূপ অসাধারণ কোমলতারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের সম্বন্ধেই যে তিনি নিরতিশয় কোমলচিত্ততার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা নহে; কখনও কখনও নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোকদিগের প্রতি গভীর ও উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে তাঁর বক্ষে দরবিগলিত ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সেদিন একটী যুবকের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া পালিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ আমাদের মধ্যে আর কাহারও চক্ষেই সে জন্য কিছু পরিমাণও অশ্রুপাত হয় নাই। পালিত মহাশয়ের আপাতঃ কঠোরতা ও রুক্ষ স্বভাবের সঙ্গে এই ভাবোচ্ছ্বাসের যতটা অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, ফলতঃ ততটা অসঙ্গতি এ দু'এর মধ্যে একেবারেই নাই। দুই-ই ভাবুকতার লক্ষণ। যাঁরা অতি সহজে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তাঁরা যে বস্তুতঃই অতিশয় নির্ম্মম প্রকৃতির লোক, তাহা নহে। প্রকৃত নির্ম্মম লোকেরা লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, কিন্তু হঠাৎ কাহারো উপরে চটিয়া যায় না। যাঁদের প্রাণ নিরতিশয় কোমল তাঁরাই একদিকে সহজে ক্রোধের বশবর্ত্তী হন, আর অন্যদিকে স্নেহমমতার আবেগেও আত্মহারা হইয়া যান। এ বস্তুটী অনেক লোকহিতব্রত মহাপুরুষের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে ইহা দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর যেমন সহজে চটিয়া যাইতেন, সেইরূপ অতি সহজেই আবার গলিয়াও যাইতেন। ফলতঃ কোনও কোনও বিষয়ে পালিত মহাশয় বিদ্যাসাগর চরিত্রকে স্মরণ করাইয়া থাকেন। অবশ্য দুজনার এক নিক্তিতে তৌল করা চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেবত্ব পালিত মহাশয়ের মধ্যে সব দেখা যায় নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানুষী ভাবগুলি অনেক সময় পালিত মহাশয়ের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ছিলেন; পালিত মহাশয়ের স্বাধীনচিত্ততাও লোকপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও মুখ চাহিয়া কখনও কথা কহিতে পারিতেন না; পালিত মহাশয়ও তাহা পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমলচিত্ততাও কিয়ৎ পরিমাণে পালিত মহাশয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ব্রাহ্মণ্যপ্রকৃতিসুলভ যে নিতান্ত নির্লোভ ভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এতটা বড় করিয়াছিল, ক্ষাত্রপ্রকৃতি ইংরেজের রজত-প্রধান সভ্যতার আদর্শে অভিভূত, ব্যবহার-জীবী পালিত মহাশয়ের মধ্যে সে নির্লোভ ও সে ত্যাগের প্রমাণ কেহ কখনও অন্বেষণ করিতে যায়ও নাই, কেহ কখনও পায়ও নাই, আর শেষ জীবনে পালিত মহাশয় যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী ত্যাগের সমজাতীয় বস্তু নহে। এ ত্যাগেও বিলাতী গন্ধ আছে, বিদ্যাসাগরের ত্যাগে সাত্ত্বিকতা-প্রধান ব্রাহ্মণ্য-আভাও দেখা যাইত। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও, বাংলার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে উভয়েই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আর পালিত মহাশয় জীবনের সন্ধ্যাকালে এইরূপ ভাবে আপনার যথাসর্ব্বস্ব স্বদেশী যুবকগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য দান করিয়া, প্রথমজীবনে সঞ্চিত সমুদায় কুযশকে একান্ত ভাবে ক্ষালন করিয়া, বাংলার আধুনিক সমাজের ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একাসনে নহে, কিন্তু একই মন্দিরে, অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

৺জগদীশনাথ রায়

ন্যূনাধিক ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে, আষাঢ় মাসে—রথযাত্রার দিন, নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুবিখ্যাত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে, ৺জগদীশনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া এককালে সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম ছিল, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং প্রতিভাশালী চিকিৎসক বৈদ্য এখানে বাস করিতেন। ভক্ততিলক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপার পাত্র শিবানন্দ সেন, তাঁহার অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুত্র কবিকর্ণপূর, নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, কবি এবং "প্রভাকর" সংবাদপত্রের জন্মদাতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি হরিমোহন সেন, ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ ডি উপাধিধারী মেজর গোপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অনেক মহাত্মা এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়া পূর্ব্বে নরহট্ট বলিয়া প্রচারিত ছিল, এই নরহট্টে সেন শিবানন্দের ভবনে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অনেকবার আগমন করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত কবিবর রামপ্রসাদ সেন ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাঁচড়াপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন, ।৺জগদীশনাথ রায়ের পিতামহ—৺গোকুলচন্দ্র রায় এবং রামপ্রসাদ সাক্ষাৎ মাসিত পিস্তিত ভাই ছিলেন, সেই জন্য রামপ্রসাদ গোকুলচন্দ্রের ভবনে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন, তৎপরে হালিসহরে বিবাহ করিয়া সেই খানেই বাস করেন। জগদীশনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঙ্গালায় প্রথমে বীরভূমে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের এই উপনিবাসের নাম মৌড়েশ্বর গ্রাম এবং উহা মৌরাখ্য নদীতীরে স্থিত; এই মৌড়েশ্বর গ্রাম মহারাজ বল্লাল সেন ইঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে জায়গির স্বরূপ প্রদান করেন, তাম্রফলকে এই জায়গিরদানের কথা অঙ্কিত আছে। বৈদ্যসমাজে এই পরিবার বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং ইঁহাদের পরিচয় দিতে হইলে মৌড়েশ্বরগ্রামী পদ্মের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। জগদীশনাথ রায়ের বংশ, বল্লাল সেনের দৌহিত্রবংশীয়; পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে, মৌড়েশ্বরী গ্রামী, মৌদ্গল্য গোত্রীয়, এই পদ্মের সন্তান রায়বংশীয়েরা কতক কতক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সবাই গ্রামে এবং তৎপরে সরস্বতী-কূলে শঙ্খনগরগ্রামে আসিয়া বাস করেন; শঙ্খনগরে ইঁহাদের গড়খাই কাটা বসতবাটী, দেবালয় প্রভৃতি ছিল। বিখ্যাত বর্গির হাঙ্গামার সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা দুইবার পুরী লুণ্ঠন করে, সেই জন্য গোকুল সেন রাজ-পুরোহিতগণকে বাটী ও দেবালয় দান করিয়া গঙ্গা পার হইয়া নরহট্ট গ্রামে পলাইয়া আসেন এবং সেই খানে শিবানন্দ সেনের পরিবার মধ্যে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺গুরুপ্রসাদ রায় জগদীশনাথ রায়ের পিতা। গুরুপ্রসাদ

রায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শি, আরবি এবং ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আরব্য ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং "শব্দরত্নাকর" বলিয়া এক সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন; উইলসন সাহেব, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা এবং রাজা রাধাকান্ত দেব এই অভিধানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গুরুপ্রসাদ রায় সঙ্গীত বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন, ইঁহার পিতা গোকুলচন্দ্র রায় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের অধীনে মুর্শিদাবাদ সহরে কাজ করিতেন। সাহেব যখন মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া আসেন, গোকুলচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে পলাইয়া আসেন এবং পলায়ন করার দরুণ তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। ইনি বড় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং এই ধর্ম্মজীবন তাঁহার পুত্র এবং প্রপৌত্রে বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। আধুনিক কাঁচড়াপাড়ায় ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডেশ্বর এবং ভারত-সম্রাটের পিতৃব্য ডিউক অব্ এডিনবরা এবং লাট সাহেব লর্ড মেয়ো শিকার করিতে যান।

জগদীশনাথ রায়ের এক পূর্ব্বপুরুষ মুক্তারাম রায় বঙ্গেশ্বর আলিবর্দ্দি খাঁর দেওয়ান ছিলেন. নবাব ইঁহার কার্য্য-কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাকে "রায় রৈঁএ" উপাধি প্রদান করেন, সেই পর্য্যন্ত এই পরিবার "রায়" বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বে ইঁহাদের মুসলমান দত্ত 'সরকার' উপাধি ছিল। জগদীশনাথ রায়ের পিতামহ গোকুল চন্দ্র রায়, যে সময় নরহট্টে (আধুনিক কাঁচড়াপাড়া) বাস করেন, সেই সময় কলিকাতাতেও তাঁহার আবাস-বাটী ছিল। এই গোকুলচন্দ্র রায়ের স্ত্রী পতির মৃত্যুতে শব লইয়া সহমরণে যান, ইনি যেমন ধার্ম্মিকা তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। ইঁহার স্বহস্ত-রোপিত একটি আম্রবৃক্ষ অদ্যাপিও কাঁচড়া-পাড়ার রায় ভবনে বিরাজ করিতেছে।

জগদীশনাথ রায়ের পিতার সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণতা এবং ইংরাজি লেখাতেও বেশ সুযশ ছিল। তখনকার যত গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তাঁহাদের অভিনন্দন-লিপি ইঁহারই হস্ত লিখিত। ইনি সুবিখ্যাত ধনকুবের নিমাইচরণ মল্লিকের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিয়া দিতেন। গুরু-প্রসাদ রায় নিজ বাটীতে বহু ভদ্রসন্তান-দিগকে অন্নদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাদান করিতেন। ইঁহাদের পুরাতন বাটীটি কলু-টোলা ষ্ট্রীট পড়িয়া যাওয়ার শেষে ইঁহারা হোগলকুঁড়িয়ায় আসিয়া বাস করেন। সুপরি-চিত ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের বাটীটি পূর্ব্বে ইঁহাদের ছিল এবং এখান হইতেই জগদীশনাথ রায় লেখা পড়া করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে কাঁচড়াপাড়ায় জগদীশনাথ রায়ের হাতে খড়ি হয়, অতি অল্পদিন গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িয়া জগদীশ কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে জুনিয়ার সিনিয়ার উভয় স্কলারসিপ পান ইনি সাত বৎসর উপর্য্যুপরি মাসিক ৪০্ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তখন বৃত্তি রিটেন করা বলিয়া একটা ব্যবস্থা ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে জগদীশনাথ রায় সাত বৎসর ধরিয়া স্কলারসিপ্ রিটেন করেন। রিটেন করার অর্থটা কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া

আবশ্যক। ধরুন পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পাইলাম, সে বৃত্তিটি এক বৎসরকাল রহিল। বৎসরের পর নূতন ছাত্রদিগের সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম এবং উচিত স্থান গ্রহণ করিয়া বৃত্তিটি রক্ষা করিলাম, এই প্রকার সাত বৎসর ধরিয়া নূতন নূতন ছাত্রদের সঙ্গে সাতবার পরীক্ষা দিয়া জগদীশনাথ তাঁহার ৪০ টাকার বৃত্তিটি রক্ষা করেন; ইহাতেই তাঁহার মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি কলেজে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বরাবর শীর্ষস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, কখন দ্বিতীয় হন নাই। তখন লাইব্রেরী-মেডেল বলিয়া একটি স্বর্ণ-পদক প্রত্যেক বৎসর প্রদত্ত হইত, হিন্দু কলেজ লাইব্রেরীতে যত পুস্তক আছে, এমন কি স্কাইলাস, সফোক্লেস্, এবং তরজমা করা পুকস্তগুলিও পাঠ করিতে হইত, কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল না,—যে কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, সেই পুস্তকরাশি পাঠ সমাপনান্তে সিনিয়ার স্কলারেরা পরীক্ষা দিতেন, যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিতে পারিতেন, তিনিই সুবর্ণপদকখানি পাইতেন। জগদীশনাথ রায় যখন উপর্য্যুপরি দুইবার মেডেল পাইলেন, তখন কাউন্সেল অব্ এডুকেশন হইতে হুকুম হইল যে ইনি পুনরায় পরীক্ষা দিলে সর্ব্বোচ্চ হইলেও পদক পাইবেন না, যিনি দ্বিতীয় হইবেন তিনিই পদকখানি পাইবেন; ইঁহার মতন কৃতী উচ্চদরের ছাত্র তখনকার কালে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

জগদীশনাথের লেখা পড়া শেষ হইলে হিন্দুকলেজে ছয় মাসের জন্য একটি অধ্যাপকের আবশ্যক হয়, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইঁহাকেই মনোনীত করেন, এবং ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে গণ্য মান্য হন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, সুপরিচিত উকীলদ্বয় মুরলীধর সেন এবং রমানাথ লাহা প্রভৃতি, (সমধ্যায়ীদিগের ভিতর যে কয়েকজনের নাম মনে আছে)—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারিচরণ সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

জগদীশনাথ রায় সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন, ইনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। ইংরাজি বাংলা সমস্ত ক্রীড়া, ঘোটকারোহণ, অস্ত্র-বিদ্যা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই ইনি দক্ষ ছিলেন। কথিত আছে, সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দুকলেজে একটি পিয়ানো কেনা হয়, অধ্যাপক ছাত্রদের স্বর কিরূপ জানিবার জন্য বাজনার সহিত সুর মিলাইতে বলেন, কেহই কিছু পারিলেন না। কিন্তু জগদীশনাথ রায়ের কণ্ঠের স্বর বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া গেল এবং সর্ব্ব শেষ 'কি' পর্য্যন্ত তাঁহার স্বর উঠিল। অধ্যাপক মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন "ইনি একজন উৎকৃষ্ট গায়ক হইবেন।" কলেজ ছাড়িবার সময় সমস্ত অধ্যাপকেরা ইঁহাকে উচ্চ সার্টিফিকেট

দেন, তন্মধ্যে কাউন্সেল অব্ এডুকেশনের দুইজন নেতার সার্টিফিকেট হইতে কয়ছত্র তুলিয়া দিলাম-

"His educational attainments are of such a high and superior order, that we feel no hesitation in stating that since the foundation of the Hindu College up till now, we have never seen a student who could be compared with him" এই সার্টিফিকেটটি লিখিয়াছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার মটেরেট এবং সার সিসিল্ বিডন। এই বিডন সাহেব পরে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর হন। সুপ্রসিদ্ধ বিটন (Hon'ble Drinkwater Bethune) সাহেব ইঁহার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতেন এবং লর্ড এলেনব্রো, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ক্লিণ্ট প্রভৃতি অনেক মহাত্মা ইঁহাকে রাশি রাশি পুস্তক প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় সকলেই ইঁহার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, বলিতেন "সেক্ষপিয়র পাঠে তোমার ন্যায় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞান দেশীয়দিগের মধ্যে বিরল।" কলেজের আর একজন অধ্যাপক লিওনার্ড ক্লিণ্ট সাহেবের সঙ্গে রিচার্ডসনের মনের বড় মিল ছিল না, বাঙ্গালী ছাত্রেরা রিচার্ডসনের বিদ্যার প্রশংসা করিলে ক্লিণ্ট সাহেব বলিতেন "what a ship is in Calcutta is but a boat in London." জগদীশনাথ রায়ের নিকট অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সেক্ষপিয়র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন, তন্মধ্যে "রিস্ এবং রায়তের" সম্পাদক শম্ভু মুখোপাধ্যায় এবং মিষ্টার এস, পি, সিংহের আত্মীয় সুযোগ্য ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট প্রতাপনারায়ণ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষার সদুত্তর ছাপা হইত, জগদীশনাথ রায়ের অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং প্রশ্নোত্তর এই ভাবে ছাপা আছে।

পাঠ করিবার সময় ইনি এত নিবিষ্টচিত্ত হইতেন যে অপর কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না, ইঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের হঠাৎ বুকে বেদনা ধরিয়া মৃত্যু হয়; যখন ব্যথা ধরিয়াছে, তখন ইঁহার অগ্রজ রমানাথ রায় মহাশয়, বাটীর চারিদিকে "জগদীশ, জগদীশ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর না পাইয়া জগদীশনাথের শয়নকক্ষ ঘরের দ্বারে বলপূর্ব্বক আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন ভিতর হইতে ইনি বলিয়া উঠিলেন "দাদা, কি হইয়াছে, কেন আমায় ডাকিতেছেন?" পিতার পীড়ার কথা শুনিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গিয়া, হাত দেখিয়া বলিলেন "বাবার নাড়ি নাই, যদি তীরস্থ করিবার মানস থাকে, তবে এই দণ্ডে করুন।" বৃদ্ধকে তীরস্থ করা হইল এবং তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। ইঁহাদের বংশে পরে সকলেই এই প্রকার দেহত্যাগ করিয়াছেন, ভুগিয়া অপরকে কষ্ট দিয়া কেহ মহাপথের পথিক হন নাই।

কলেজ ছাড়িবার কিছুদিন পরে হাওড়ায় নিমক্‌আফিসের সেরাস্তাদারী খালি হয়, এই

কর্ম্মটির বেতন ছিল মাসিক ১০০৲ টাকা। ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে একশত টাকা বেতনের চাকুরি একটা কম জিনিষ ছিল না। পাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগদীশনাথ রায়ও কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া বিডন সাহেবের সুপারিস-পত্র লইয়া নিমক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পিকক্ সাহেবের সঙ্গেসাক্ষাৎ করিলেন। পিকক্ সাহেব তাঁহার অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন "আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে বিডন সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। কথা কি, আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি যে হিন্দু কলেজের সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে এই কর্ম্মটি দিব এবং তজ্জন্য কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনকে পত্র লিখিয়াছি, পত্রের উত্তর আসিলেই যে ছাত্রের নাম আসিবে তাহাকে পদস্থ করিব।" এই কথা শুনিয়া জগদীশনাথ ধীরে ধীরে সাহেবের ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, খানিক দূর আসিয়াছেন আবার একজন চাপরাসী আসিয়া বলিল "মহাশয় আপনাকে সাহেব ডাকিতেছেন।" ফিরিয়া গেলে তিনি বলিলেন "আমি বড় দুঃখিত হইতেছি যে কর্ম্মটি তোমায় দিতে পারিলাম না। এই দেখ রিচার্ডসন সাহেব জগদীশনাথ রায়কে দিতে বলিতেছেন।" জগদীশনাথ রায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বিডন সাহেব যাঁহাকে দিতে বলিতেছেন, তাঁহার নামটি কি?" তখন উহাতে জগদীশনাথ রায় লেখা আছে দেখিয়া সাহেব বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং কর্ম্মটি উঁহাকেই দিলেন।

প্রথম যেদিন জগদীশনাথ রায় কর্ম্মে বসিবেন, সেইদিন আফিসে লোকারণ্য, সকলেই দেখিতে আসিয়াছেন কলেজের ছোকরাটি কিরূপ, যে এত বড় কর্ম্ম করিবে এবং যে কর্ম্মে হাবড়ার বাঙ্গালবাবু রামরতন বসু প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখনকার সময়ে মাসিক একশত টাকার 'পদ' বড় উচ্চ পদ বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। পাথুরিয়াঘাটার অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি বাঙ্গালার হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, তিনি জগদীশনাথ রায়ের সেরেস্তাদারীর সময়, হাবড়া ফৌজদারী আদালতের নাজির ছিলেন, বেতন মাসিক দশটাকা মাত্র ছিল। কিছুদিন এখানে সেরেস্তাদারী করিয়া, জগদীশনাথ রেভেনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার হন, সেখান হইতে খুলনা জেলায় এক সাহেব নিমক-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কার্য্য শিক্ষা দিতে যান। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে, যে সাহেবকে তিনি শিক্ষা দিতে যান, তিনি একজন যুবাপুরুষ, কোন এক লর্ডের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয়াত্মজ, সাহেবের মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতন ছিল, কিন্তু ঐ টাকাটা তাহার স্যাম্পেন সরাপেই ব্যয় হইত, অন্য খরচের জন্য তাঁর পিতা মাসে মাসে প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন। সে বৎসর খুলনা জেলার নিমক মহলের কার্য্য এত ভাল হইয়াছিল যে, রেভিনিউ বোর্ড ঐ জেলাকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছিলেন এবং মন্তব্যের মধ্যে, 'বিলাতের বড় ঘরের ছেলেরা অল্পদিনের মধ্যে কার্য্যকুশলতা প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার কি সুচারু দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে সক্ষম, ইত্যাদি ভাবে সাহেবের গুণানুবাদ ও ধন্যবাদ করিয়া, গবর্ণমেণ্টকে লিখেন

এবং গবর্ণমেণ্টও বোর্ডের সঙ্গে একমত হইয়া যুবা সাহেবটিকে স্পেসিয়াল ধন্যবাদ প্রদান করেন। সাহেব ধন্যবাদ-পত্র পাইয়া হাসিয়া আকুল, তিনি জগদীশনাথ রায়ের নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন "দেখ, দেখ, কি মজার কথা, আমি আজও কাকে ছাড়, কাকে পরওনা বলে তাহা জানি না, আমি মাত্র দস্তখত করিয়াছি, আর তুমি সমস্ত কার্য্য করিয়াছ। তোমায় ধন্যবাদ না দিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছে। কি মজার কথা, আমি লিখিব, এই ধন্যবাদ পাইবার আমি উপযুক্ত নহি, যদি কাহার ধন্যবাদে দাবী থাকে সে তোমার এবং তোমাকে আমি গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রদান করাইব।" যে কথা সেই কাজ। গবর্ণমেণ্ট তখন জগদীশনাথ রায়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। উচ্চ, উদার এই ইংরাজ আপনি সুখ্যাতি না লইয়া, যথার্থ পাত্রকে ধন্যবাদ দেওয়াইয়া সত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

খুলনার কার্য্য শেষ হইলে অতি অল্প দিনের জন্য জগদীশনাথ রায় বোর্ডে পুনরায় ফিরিয়া আসেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের একটি আজ্ঞা (রেজোলিউসান্) লিপিবদ্ধ ছিল যে, নিমক-মহলে উচ্চপদে কোন দেশীয় লোক বসিতে পাইবেন না, জগদীশনাথ রায়ের কার্য্যদক্ষতায় এবং সততায় গবর্ণমেণ্ট এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, উল্লিখিত নিয়মটি রদ্ করিয়া, তাঁহাকে নিমক-বিভাগের উচ্চপদ (আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) প্রদান করিয়া জলেশ্বরে বদলি করেন। জলেশ্বর হইতে ইহার পুনরায় পদোন্নতি হওয়াতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া মেদিনীপুরে বদলি হয়েন, মেদিনীপুর হইতে তমলুকে আসেন এবং এখানে প্রায় আঠার বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তখনকার সময়ে একটি নূতন প্রথা প্রচলিত ছিল, পোষ্টাল বিভাগের তখন উন্নতি হয় নাই, সুতরাং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেন, তাঁর কেরাণি থাকিত, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টার রাজকর্ম্মচারী। জগদীশনাথ রায় এই জন্য জলেশ্বর, তমলুক ইত্যাদি স্থানে একস্-অফিসিও পোষ্টমাষ্টার ছিলেন; নিমকবিভাগের হাকিমদের মেজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল, নিমকসংক্রান্ত মকদ্দমার ইহাঁরাই বিচার করিতেন এবং জরিমানা, মেয়াদাদি দিতেন। এইজন্য নিমক কাছারীতে জেল ছিল, তাহাতে কয়েদীরা থাকিত এবং বরকন্দাজেরা নিয়মিতরূপে পাহারা দিত। জগদীশনাথ রায় ইঁরা নভেম্বর ১৮৪৮ সালে প্রথম কার্য্যে ব্রতী হয়েন, ১৮৫৩ ইংরাজী সালে জলেশ্বরে যান, বৎসরেক পরেই মেদিনীপুরে আসেন এবং মেদিনীপুর হইতে তমলুকে আসিয়া ১৮৬৩ ইংরাজী অব্দ পর্য্যন্ত সেখানে থাকেন। ইং ১৮৬৪ সনে ইনি কলিকাতার হাটখোলার 'নিমক সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট' হইয়া বদলি হয়েন; হাটখোলার আফিস খুব জাঁকাল ছিল, ৩০০ এর উপর টিপনবীস ছিল, প্রায় ৪০০ কয়াল ছিল। ইহা ব্যতীত সেরেস্তাদার, পেশকার, মহাফেজ, অনেক ইংরাজ-সেরেস্তার কেরাণি, দারোগা,

বরকন্দাজ প্রভৃতি ছিল, প্রায় বৎসরাধিক এই কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগদীশনাথ রায়, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন যে হাটখোলার সল্ট-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং তাঁহার আফিস রাখা নিতান্ত অনাবশ্যক, ক্ষতি ব্যতীত উপকার খুব কম নিমক-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য সুচারুরূপে কস্টম কালেক্টারের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে. রিপোর্ট যথাস্থানে পৌঁছিলে সাহেব মহলে একটা গোল পড়িয়া গেল, অনেক সাহেবের ইচ্ছা এ পদ থাকে। বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট একটি কমিসান নিযুক্ত করিলেন, তাহার সভ্য হইলেন- বোর্ডের সিনিয়ার মেম্বার সক সাহেব, পুলিসের ডেপুটী কমিসনার মেজার রেভলি, নিমক-বিভাগের কর্ম্মচারী ওয়েন সাহেব এবং জগদীশনাথ রায়, অনারেবল এড্‌লি ইডেন সভাপতি মনোনীত হইলেন। জগদীশনাথ আপনার মত সমর্থন করিতে লাগিলেন এবং ওয়েন সাহেব পদ রাখিবার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জগদীশনাথের কথা গ্রাহ্য হইল এবং হাটখোলার আফিস উঠিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে নিমকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে বেঙ্গল-পুলিসে ভর্ত্তি করা হইত, সুতরাং জগদীশনাথও বেঙ্গল পুলিশে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে স্পেসিয়াল আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করিয়া আলিপুরে কর্ম্ম দেওয়া হইল। যখন হাটখোলার আফিস উঠিয়া যাইবে স্থির হইল এবং জগদীশনাথ কি কর্ম্ম করিবেন তাহার আলোচনা হইতেছে, তখন প্রকাশ হইল, ইহাঁকে মালদহ জিলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করা হইয়াছে। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, ঈশ্বর ঘোষাল, ঈশ্বর মিত্র প্রভৃতি অনেক বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বলিলেন "তুমি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হইও না, নিমকবিভাগে দেশীয়গণের প্রবেশের উপায় ছিল না, তুমি প্রবেশ করিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়াছ, তোমার পর সূর্য্যকান্ত বলিয়া একজন ভদ্রলোক নিমক মহলে উচ্চকর্ম্ম পান, এখন তুমি পুলিসে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া যদি এ বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশ-পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, তাহা হইলে একটা মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তুমি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হও।" জগদীশনাথ রায় বন্ধুবর্গের পরামর্শ মত ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটি গ্রহণ করিলেন না, পুলিশেই প্রবেশ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমগ্র দেশীয়দের মধ্যে প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া দেশীয়গণের একটা উপকার করিয়া দিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ পদটি বড় মান্যের ছিল, মিলিটারী অফিসারেরাই এই কর্ম পাইতেন, অন্য সাহেব যাঁরা হইতেন তাঁরা সকলেই বড় ঘরের ছেলে। কর্ম্মটি পাইতে জগদীশনাথ রায়কে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। যখন তিনি দেখিলেন ডিপার্টমেণ্টের সাহেবেরা একজোট হইয়াছেন এবং উঁহাকে এ পদ হইতে বঞ্চিত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি সার উইলিয়াম গ্রে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের কাছে এক আবেদন করিলেন। আবেদনের মন্তব্য ছিল—কেন তিনি এই পদ পাইবেন না, বিদ্যা বুদ্ধি কার্য্যদক্ষতায় তিনি উচ্চ ছিলেন, তবে কি জন্য তাঁকে এ পদ দেওয়া হইতেছে

না এবং কেন তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এচ্, এল্ ড্যাম্পিয়ার তখন প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি ইঁহার পক্ষ হইয়া জোর করিয়া লিখিলেন, ছোটলাটও ইঁহার পক্ষ হইয়া লিখিলেন, লাটসাহেব লর্ড লরেন্স বলিলেন ইঁহার মতন বিদ্বান সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে এ পদ দেওয়া উচিত। কাগজপত্র বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট গেল তিনি জগদীশনাথ রায়কে এ কর্ম্ম দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, জগদীশনাথ এপ্রিল ১৮৬৮ সালে এ কর্ম্ম পাইলেন, সেই বৎসরের বাঙ্গলার শাসন-বিভাগের রিপোর্টে ছোটলাট গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন যে "এই প্রথম আমরা একজন দেশীয়কে এই কর্ম্ম পদ প্রদান করিলাম।" গেজেট হইবার পূর্ব্বে এই পদ প্রাপ্তির কথা হিন্দু পেট্রিয়াট সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, নিজের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, সাহেবেরা তখনও এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। বরং এলিফ বলিয়া একজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছিলেন "প্যাট্রিয়াটের কথা আমরা বিশ্বাস করি না, জগদীশনাথ রায় কখনই এ পদ পাইবেন না। যখন আমরা তাঁহাকে বলিলাম মাসিক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোমার বেতন হইবে তুমি বরাবরেই এই আলিপুরে থাকিবে, তখন তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। জগদীশনাথ রায় বলিয়াছিলেন, আমি ৫০০টাকায় চিরদিন ভারতবর্ষের এক প্রান্তে, পড়িয়া থাকিব। তবুও আমার এই পদ পাওয়া চাই! এখনি তিনি নিজের ভুল বুঝিবেন। Distinguished officers object on political grounds to a native being placed in charge of a District." ফলে জগদীশনাথ রায় যখন এ কর্ম্ম পাইলেন, তখন দেশীয়েরা বড়ই উল্লাসিত হইলেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজি সকল সংবাদপত্রে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। এই নূতন পদ পাইয়া প্রথমেই তাঁহাকে নোয়াখালিতে যাইতে হয়, নোয়াখালি তখন ডাকাতের আবাস-ভূমি ছিল। (ক্রমশ)

শ্রী :—

বেদের কথা

বেদকে আমাদের শাস্ত্রে কেবল সকল জ্ঞানের মূল বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয় নাই; যাবতীয় সৃষ্টিও এই বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এমন কথাও বলা হইয়াছে। উভয় কথারই সার্থকতা স্ফুটবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর যাহা সকল জ্ঞানের মূল, তাহা ত সকল সৃষ্টির মূলে থাকিবেই থাকিবে। কারণ এই সৃষ্টিব্যাপার লইয়াই ত আমাদের সকল জ্ঞান। এই জড় ও এই জীব, এই দেশ এবং এই কাল—এ সকলই ত আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এ সকলকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়াই ত আমরা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানলাভ করিতেছি। জ্ঞানের এ সকল বিষয় যদি

না থাকিত, তাহা হইলে কি বিষয়জ্ঞান, কি আত্মজ্ঞান, কোনও জ্ঞানই সম্ভব হইত না। অতএব এই বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার এবং জ্ঞান-বস্তুর সম্বন্ধ এমনই ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী যে যাহা জ্ঞানের মূল, তাহা অনিবার্য্যরূপেই সৃষ্টিরও মূল হইবেই হইবে।

প্রচলিত কথায় বলে, যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। আপাততঃ শুনিতে কথাটা কেমন কেমন ঠেকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত কি না রহিয়াছে, যাহার কোনও কিছু আমার ভাণ্ডে, অর্থাৎ আমার মনের ভিতরে নাই। এ দিক্ দিয়া কথাটা দৃষ্টতঃই মিথ্যা। কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, এই কথাটা একান্ত সত্য বলিয়াই প্রতীত হইবে। কারণ, বিশ্বে এমন অনেক বস্তু আছে ও থাকিতে পারে, যাহা আমার ভিতরে নাই—কিন্তু আমার ভিতরে যাহা নাই, তার কোনও জ্ঞানলাভ আমার পক্ষে তো আদৌ সম্ভবে না। এ কথাটাই কি অস্বীকার করিতে পারি? যিনি মা হন নাই, তাঁর অন্তরে মাতৃস্নেহ বস্তুটী নাই। তাঁর ভাণ্ডে সন্তানের প্রতি মার যে অকৈতব, মর্ম্মগত বাৎসল্য এ বস্তু নাই। সুতরাং অন্য রমনীর মধ্যে ইহা থাকিলেও, বন্ধ্যার পক্ষে এ বস্তুর জ্ঞানলাভ আদৌ সম্ভবে না। সুতরাং তাঁর ভাণ্ডে এ বস্তু নাই বলিয়া, ব্রহ্মাণ্ডে এ বস্তুর থাকা না থাকা তাঁর পক্ষে উভয়ই সমান। এইরূপ অন্ধের ভিতরে বর্ণবোধশক্তি নাই বলিয়া, এই বিশ্বের বরণাকরণমেলা থাকা না থাকা তাঁর পক্ষে সমান। যে ব্যক্তির কাণে, অর্থাৎ মনে, কোনও প্রকারের সুরবোধ নাই, তার পক্ষে সঙ্গীতও নাই। যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে এই প্রচলিত কথাটার এই অর্থ। ইহা আমাদের জ্ঞানের একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আমাদের জ্ঞান কেবল ভিতরে নয়, কেবল বাহিরেও নয়। জ্ঞানের ছাঁচ-গুলো আমাদের মনে থাকে, এগুলি ভিতরের বস্তু। জ্ঞেয় বিষয়গুলি এই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলি বাহিরের বস্তু। এই ছাঁচ-গুলোই আমাদের ভাণ্ড। এই জ্ঞেয় বিষয়-রাজ্যই ব্রহ্মাণ্ড। বাহিরের বিষয়গুলির গুণাগুণ আমাদের ভিতরের ছাঁচে পড়িয়া, তবে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। নতুবা তারা নিজেরা সোজাসুজি আসিয়া আমাদের জ্ঞানে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান-শক্তির ও জ্ঞান ক্রিয়ার সঙ্গে বাহিরের বিষয়রাজ্যের ও বিশ্বরাজ্যের এই নিতান্ত ঘনিষ্ঠ, নিতান্ত অঙ্গাঙ্গী, একান্ত অচ্ছেদ্য ও নিত্যযোগ রহিয়াছে বলিয়াই, আমাদের চৈতন্যের মূলে যে বস্তু জাগিয়া আছে, সেই বস্তুই আবার বাহিরের এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে বলিয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। আর এই জন্যই জ্ঞানের মূলে যাহা তাহাই আবার সৃষ্টিরও মূলে রহিয়াছে, নতুবা জ্ঞান সম্ভব হইত না। অতএব বেদ যদি সকল জ্ঞানের মূল ও সকল জ্ঞানের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা হয়, তবে তাহাকে সেই কারণেই যাবতীয় সৃষ্টির মূল ও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেরও আশ্রয় হইতেই হয়। যাহা বিশ্বের মূলে নয়, যাহা সৃষ্টির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা নহে, তাহা

কোনও মতেই আমাদের জ্ঞানের মূল ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

ভিতরের ও বাহিরের, ভাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের, বিষয়ী ও বিষয়ের, এই দুই'এর মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার উপরেই জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়বাদী কথনও কথনও মনে করেন বটে যে, তাঁর বিজ্ঞানটা কেবল ব্রহ্মাণ্ড লইয়া, ভাণ্ডের সঙ্গে তার বড় একটা সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ইহা তাঁর কল্পনামাত্র। কারণ যে সকল কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধের উপরে যাবতীয় জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, সে সকল সম্বন্ধ জড়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে নাই, আমাদের মনেতেই আছে। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটা দুইটী বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত। একটা ঘটনা পূর্ব্বে ঘটিলে, আর তার অব্যবহিত পরে আর একটী ঘটনা এই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার ক্রিয়াফলরূপে যদি প্রকাশিত হয়, তবেই ইহার একটীকে কারণ ও অপরটীকে আমরা কার্য্য বলি। সুতরাং এই যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ইহার মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য যোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ কালকে আশ্রয় করিয়া এই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। কাল বলিতে আমরা ঘটনাপারম্পর্য্য বুঝিয়া থাকি। এই ঘটনা-প্রবাহ যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণ কালের জ্ঞান আমাদের হয় না। গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রাবস্থায়, এই জন্য, আমাদের কালের জ্ঞান একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। অন্য পক্ষে যখন অনেক ঘটনা একটার পর আর একটা দ্রুতবেগে ঘটিতে থাকে, আর এ সকল ঘটনাপরম্পরা আমাদের মনের উপরে গভীর দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়, তখন অতি সামান্য কালকেও আমাদের অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। অন্যদিকে, গভীর ধ্যানে, যখন মন একাগ্র-ভাবে কোনও একটা বিষয়েতে নিবদ্ধ থাকে, তখন অতি দীর্ঘকালও অতি সামান্য কাল বলিয়া বোধ হয়। অতএব ঘটনা-প্রবাহ আমাদের মনের উপরে যে সকল দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়, তাহারই উপরে কালের প্রতিষ্ঠা হয়। কাল আমাদের মনের ধর্ম্ম; জড়ের ধর্ম্ম নহে। যে কালের উপরে জড়ের কার্য্যকারণসম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারও অস্তিত্ব জড়ে নহে, মনে; ব্রহ্মাণ্ডে নহে, ভাণ্ডে। জড় কারণও বুঝে না, কার্য্যও জানে না। আমরাই তার কাছে দাঁড়াইয়া তার ক্রিয়ার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিয়া, আমা-দের মনের ভিতরকার ছাঁচে ঐ বাহিরের ক্রিয়াগুলাকে ফেলিয়া ও ঢালাই করিয়া, তবে জড়বিজ্ঞানের বিবিধ বিধানসকলের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি।

ফলতঃ জড় ও মন ইহারা যদি একান্ত ভাবে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত, তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা একে-বারেই অসম্ভব হইত। জড়বিজ্ঞান জড়বস্তু নহে, মানসিক সিদ্ধান্ত মাত্র। জড়ের ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব ও পর, কারণ ও কার্য্য, সম ও বিষম ইত্যাদি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, মন নিজ-ধর্ম্মানুযায়ী জড়বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছে। আর ঠিক আমাদের মনের ধর্ম্মানুযায়ী যদি জড়ের বিকাশ ও বিবর্ত্তন না হইত, তাহা হইলে, আমরা কোনও মতেই

কখনও জড়ের কোনও জ্ঞানলাভও করিতে পারিতাম না এবং জড়বিজ্ঞান বলিয়া কোনও প্রকারের প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতাম না। বাহিরে, জড়জগতে একটা বিধান আছে—ইংরাজিতে ইহাকে Natural order বলে। আর ঠিক এই জড়জগতের বিধানের বা Natural orderএর অনুরূপ আর একটা বিধান আমাদের অন্তরেও আছে, ইহাকে ইংরাজীতে Mental order বলে। এই বাহিরের জড়জগতের বিধানের সঙ্গে, ভিতরের মনোজগতের বিধানের একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই, আমরা জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে সম্বন্ধ, মনোগত ভাবের সঙ্গে বাহিরের সেই ভাবপ্রকাশক বস্তুর যে সম্বন্ধ, চিত্রকরের বা ভাস্করের অন্তরে যে ছবি জাগিয়া উঠে, তাঁহারা চিত্রপটে বা মর্ম্মরফলকে যে চিত্র বা মূর্ত্তি অঙ্কিত বা খোদাই করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে ঐ অন্তরগত ছবির যে সম্বন্ধ; আমাদের মনোরাজ্যের সঙ্গে বাহিরের জড়রাজ্যের কতকটা সেই সম্বন্ধ। কতকটা বলিতেছি এই জন্য যে চিত্রকর বা ভাস্কর নিজের অন্তরের আয়ত্ত ছবিটী বাহিরে নিজেরাই ফুটাইয়া তুলেন; এই সকল চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের স্রষ্টা তাঁহারা নিজেরাই। আমরা এই জড়জগতের স্রষ্টা বা কর্ত্তা নই। কেবল জ্ঞাতা মাত্র। আর আমরা এই জগৎকে জানিতে, বুঝিতে, তাহার বিবিধ সম্বন্ধাবলী ও কার্য্যাকার্য্যকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহা হইতে সার্ব্বজনীন সত্যের ও সম্বন্ধের, নিয়মের ও গতির জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি এইজন্য যে, যে ছাঁচে এই জড়জগৎ বা Natural order গঠিত হইয়াছে, সেই ছাঁচ আমাদের মনের মধ্যেও আছে। অর্থাৎ স্রষ্টার হাতের কাজগুলা বাহিরের জড়ে, আর তাঁর মনের ভাব ও আদর্শগুলা আমাদের ভিতরে তিনি প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের জ্ঞানের যেমন দুইটা দিক,—একটা বাহিরে আর একটা ভিতরে পরম জ্ঞানেরও সেইরূপ—এক দিক তার বিষয়ের দিক, প্রকাশের দিক, বিবর্ত্তনের দিক, সৃষ্টির দিক, তটস্থ দিক; অন্যদিক তার ভিতরের দিক, আদর্শের দিক, নিত্য ও তুরীয় দিক। আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র ও পরিমিত, দেশকালের অধীন বিষয়জ্ঞান যেমন আমাদের অন্তরের মানসিক ছাঁচের বা mental orderএর উপরে নির্ভর করিতেছে, বিশাল বিশ্বের এই অসম অনন্ত জ্ঞানপ্রবাহও সেইরূপ বিশ্বপতির অন্তরের নিত্য জ্ঞানের যে ছাঁচ তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই নিত্য জ্ঞানের নিত্য ছাঁচের অনুরূপেই বিশ্ববিবর্ত্তনের ক্রমশঃ প্রকাশ্য জ্ঞানজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। আর সেই ছাঁচই আমাদের অন্তরে পরিণামী নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে বলিয়া, আমরা এই বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যকে উত্তরোত্তর অধিকার করিতে পারিতেছি। আর এই যে ছাঁচটী, (১) যাহা নিত্য ভাবে তুরীয় চৈতন্যে অনাদিকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, (২) যাহা পরিণামী নিত্যরূপে জীবচৈতন্যে নিহিত রহিয়াছে, আর (৩) যাহা জড় ও

জীবের স্থিতি ও গতির আশ্রয় হইয়া বিশ্ববিবর্ত্তনে নিয়ত প্রকট হইতেছে,—তাহারই নাম বেদ। ইহুদীরা ইহাকেই Sophia বলিতেন। গ্রীকেরা ইহাকেই Logos বলিতেন। খৃষ্টীয়ানেরা ইহাকেই Christ বলেন। বৈষ্ণবেরা ইহাকেই প্রকৃতি বলেন। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই জগদ্বীজ মায়া বলিয়া থাকেন। এই বেদই আমাদের সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের একমাত্র ও নিত্য আশ্রয়। জড়ের ধর্ম্ম ও জীবের ধর্ম্ম, ব্যষ্টির ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও সমষ্টির সামাজিক ধর্ম্ম, সাধনধর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্ম, বিবর্ত্তনের স্থিতির দিক ও গতির দিক, এ সকলই এই বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এই বেদকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মনু ধর্ম্মকে বেদমূলক বলিয়াছেন। এই বেদই শব্দ—যে শব্দকে আশ্রয় করিয়া বিশাল সৃষ্টির প্রকাশ হইতেছে, ইহা সেই স্ফোট শব্দ। এই স্ফোটশব্দতত্ত্বের উপরেই যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিলাতের টিকটিকী

(১)

টিকটিকী কথাটার ব্যুৎপত্তি কি, জানি না। কেন যে পুলিশের গোয়েন্দাকে বাংলা ভাষাতে টিকটিকী বলে, ঠিক বুঝি না। কিন্তু ইংরেজের চলতি কথায় ইহাদিগকে টিক্ বা টেক্ (tec) বলা হয়, ইহা জানি। এই টিক্ বা টেক্ ইংরেজি ডিটেকটিভেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। এই টিক্ হইতেই কি আমাদের টিকটিকীর উৎপত্তি হইয়াছে?

দেশী টিকটিকীর কথা আমরা আজি কালি অনেকেই জানি। ইহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, চালচরিত্র কিছুই আমাদের আজ অবিদিত নহে। ইহারা যে কি করিতে পারে, আর কি না করিতে পারে, দেবতারাও তাহা জানেন না, মর্ত্ত্যদের ত কথাই নাই। এরা যে ভাবে গোয়েন্দার কর্ম্ম করে, তাহাও আমরা অল্পবিস্তর বিলক্ষণই জানি। কিন্তু বিলাতের পুলিশের সঙ্গে যেমন আমাদের পুলিশের তুলনা হয় না, বিলাতের টিকটিকীর সঙ্গেও সেইরূপ আমাদের দেশের টিকটিকীরও কোনও বিষয়েই তুলনা হয় না। বিলাতের সাধারণ পুলিশ প্রহরীর মতন, টিকটিকীগুলাও আমাদের ভদ্রসন্তান পুলিশ কর্ম্মচারী অপেক্ষা অনেকগুণে ভদ্রলোক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এজন্য আমাদের পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে দায়ী করা যায় না। এরা যে শাসননীতির অধীন থাকিয়া কাজ করে, এক দিকে সেই নীতি, ও অন্যদিকে যে সমাজের ভিতরে কাজ করে সেই সমাজের সাধারণ লোক-প্রকৃতি,—এই দুই ইহাদের কর্ম্মাকর্ম্মের ও ভাল-মন্দের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ দেশে আসিয়া কাজ করিতে হইলে, বিলাতের

পুলিশের কর্ম্মচারিগণও ঠিক এদেরই মতন হইয়া যাইবে। ইহা জল ও মাটিরই মাহাত্ম্য।

দেশে থাকিতেই আমার ভাগ্যে স্বদেশী টিক্‌টিকার পরিচয়লাভ ঘটিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই পুলিশের প্রভুগণ আমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুভদৃষ্টি এ গরিবের উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একবার একজন লোক ছাড়া আর কেহ কখনও আমার সঙ্গে কোন প্রকারের অসদ্ব্যবহার করে নাই। প্রথম যে ব্যক্তি আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে নিযুক্ত হয়, সে অতিশয় ভাল মানুষ ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত সে যে আমার পেছনে লাগিয়াছে, ইহা আমি অনুভবই করিতে পারি নাই। একজন মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী আমাকে তার কথা না বলিলে হয় ত আরো বহুকাল তাহার পরিচয় আমি পাইতাম না। তখন আমি রসারোডের উপরে হাজরা পুকুরের পূবে, একটী বাড়ীতে বাস করিতাম। আর এই ব্যক্তি দিবারাত্র হাজরা পুকুরের বাগানের ভিতরে বসিয়া আমার বাড়ী পাহারা দিত। আমি যখন বাহিরে যাইতাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, প্রথম দিনে যখন আমি ইহা লক্ষ্য করিলাম, সে দিনই সে ধরা দিয়া ফেলিল। আমি ট্রামে উঠিয়াছি, দেখি সেও দৌড়িয়া আসিয়া ট্রাম ধরিল। আমি অমনি ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম, সেও অমনি নামিয়া গেল। আমি তখন তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি আমার উপরে মোতায়েন হইয়াছ?" বেচারীর মুখখানি শুকাইয়া গেল—নম্রভাবে বলিল—"বাবু সাহেব, কি করব, পেটের দায়ে এও করিতে হইতেছে। তবে আমা হইতে আপনার কোনও অনিষ্ট হইবে না। আপনার সকল সভাতেই আমি উপস্থিত থাকি। আপনি যা বলেন, তাহা শুনিয়া থাকি। আপনি তো আমাদেরই ভালোর জন্য এত কষ্ট ভুগিতেছেন, ইহা জানি ও বুঝি কংসের রাজ্যে যেমন অক্রুর ছিল, আমাকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আমা হইতে আপনার কোনও অমঙ্গল হইবে না।" কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তা তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিবে, তাতে আর দোষ কি? তবে আমার পিছনে কে চলে ফেরে, ইহা আমি জানিতে চাই মাত্র। এখন আর আমার কোনও আপত্তি নাই।"

বিলাতেও ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। আমার পশ্চাতে যে টিক্‌টিকী লাগিয়াছে বহুদিন পর্য্যন্ত আমি ইহা জানিতে পারি নাই সেখানেও যে আমাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইবে, ইহা কল্পনাও করি নাই। সুতরাং প্রথম পাঁচ ছয় সপ্তাহ কে সঙ্গে যায় না যায় কেহ সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে কি না, এ বিষয়ে দৃক্‌পাত করি নাই।

একদিন লণ্ডন সহরের উত্তরাংশে এক স্থানে ডাক্তার রথারফোর্ডের একটা বক্তৃতা হয়। রথারফোর্ড তখন পার্লেমেন্টের সভ্য ছিলেন। সুরতে (Surat) যখন কংগ্রেসের বৈঠক হয়, সে সময়ে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসেও উপস্থিত ছিলেন।

আমি তখন বক্সারে বন্দী। আমার সঙ্গে তাই দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু বিলাত গেলে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ আলাপ আত্মীয়তা হইয়া যায়। একদিন তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন, এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অনেক বিলাত প্রবাসী ভারতবাসী এইজন্য এই সভাতে যাইয়া উপস্থিত হন। আমার সঙ্গে আমার একটী পার্শি বন্ধু এবং তাঁর সহধর্ম্মিণীও এই বক্তৃতা শুনতে যান। এই দিনই, এই বক্তৃতা হতে ফিরিবার কালে, আমার পিছনে যে টিক্‌টিকী লাগিয়াছে, সে কথা আমি প্রথম জানিতে পাই।

আমরা "বাসে" (Bus) চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। বাসের ভিতরে আমার পার্শি বন্ধুটী, তাঁর গৃহিণী, এবং আমি, আমরা এই তিন জন এদেশীয় লোক ছিলাম। অপরাপর ভারতবাসীরা অনেকে বাসের উপরের তলায় খোলা হাওয়াতে যাইয়া বসিয়াছিলেন। "বাসের" কন্‌ডাকটার আমাদের টিকিট দিয়া উপরের যাত্রীদের ভাড়া আদায় করিতে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিল—"স্যার্ আপনার কোনও বন্ধুলোক কি উপরে আছেন?" আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমার পার্শি বন্ধুটী বলিলেন—"আমাদের অনেক বন্ধুই তো উপরে আছেন।" কন্‌ডাকটার বলিল—"না, আমি আপনাদের স্বদেশবাসীদের কথা বলছি না। কোনও ইংরেজ কি আপনাদের সঙ্গে আছে?" আমরা বলিলাম "না", তখন সে বলিল "তাহা হইলে একজন লোক আপনাদের পেছু লইয়াছে।" "তুমি কি করিয়া জানিলে?" "সে ব্যক্তি প্রথমে আপনারা কোথাকার টিকিট কিনিয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি বলিলাম 'আপনারা মার্ব্বেল আর্চ্চের টিকিট নিয়াছেন—বোধ হয় ওঁরা টিকিটও আপনারাই কিনিয়া থাকিবেন! তখন সে ব্যক্তি বলিল—'না তাঁরা আমার টিকিট নেন নাই—তুমি আমাকেও মার্ব্বেল আর্চ্চের একখানা টিকিট দাও।' এতেই আমার সন্দেহ হয় এ ব্যক্তি আপনাদের ফলো (follow) কচ্ছে।" আমরা তখন ব্যাপারখানা কি বুঝিলাম। আমার বন্ধুটী 'বাসে'র কনডাকটারের হাতে একটা ছয়-আনি (রূপার ছয় পেনী) দিয়া বলিলেন—"আমরা যখন নেবে যাব, তখন তুমি ইশারা করিয়া সেই লোকটীকে আমায় দেখাইয়া দিও।" সে যথাসময়ে তাহাই করিল। তখন বাস্ হইতে নামিয়া আমার বন্ধুটী এই ব্যক্তির পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন। সে একটা গাড়ীর ছায়ায় লুকাইয়া আমরা কোন্ পথে যাই, দেখিবার চেষ্টা করিল, আমার বন্ধুটীও সেইখানে যাইয়া তার কাছে দাঁড়াইয়া তার চেহারাটী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সে সরিয়া গেল, তিনিও সরিয়া গেলেন। এইরূপে দুজনে খানিকটা বেশ লীলাখেলা হইল। ইতিমধ্যে আমার বন্ধুর গৃহিণীও তাহাকে বেশ করিয়া চিনিয়া লইলেন। খানিকক্ষণ পরে আমার বন্ধুটী আমাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিয়া এই গরিব টিক্‌টিকী বেচারীর পেছুনে নিজে টিক্‌টিকীর কর্ম্ম করিতে লাগলেন। সে দেখিল আর আমাদের পেছু লওয়া সম্ভবপর

নহে; তখন আর এক পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। আমার বন্ধুটীও তখন দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটলেন। বিলাতী টিক্‌টিকীর সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়।

ইহার কিছুদিন পরে আমার এই বন্ধুর গৃহিণী, তাঁহার এক স্বজাতীয় বন্ধু, আমার পুত্র, আমার সেক্রেটারী—একটী আইরিশ মহিলা, এবং আমি, আমরা এই পাঁচজনে মিলিয়া লণ্ডনের একটু বাহিরে ইলফোর্ডনামক উপনগরে একটা সভায় যাই। পথে লণ্ডন ব্যাঙ্কের নিকটে আমার পার্শি বন্ধুটীও আমাদের সঙ্গে আসিয়া জোটেন। আমরা লিভারপুলষ্ট্রীট রেল ষ্টেশনে গাড়ী চাপিয়া তবে ইলফোর্ডে যাইব, এরূপ বন্দোবস্ত ছিল। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়া ষ্টেশনে যাইতেছি, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পথে গ্যাস জ্বলিতেছে, সময় প্রায় ৭॥০ টা। আমার বন্ধুর গৃহিণী একবার কি কারণে পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একটী লোক আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে। তিনি বলিলেন—মিঃ—আপনার শরীররক্ষক ঐ আসছে। আমরা সকলেই তখন তাহাকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। আমাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া গরিব বেচারী একেবারে লণ্ডন ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া পড়িল। রাত্রি সাড়ে সাতটায় ব্যাঙ্কে ঢুকিতে যাওয়াই তার মূর্খতা হইয়াছিল। সুতরাং তাহাকে না দেখিয়াই আমাদের সন্দেহ দূর হইয়া গেল—সে যে আমারই পিছনে চলিয়াছে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ক্রমে আমরা ষ্টেশনে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার বন্ধুটী টিকিট লইতে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন লোকটা দূরে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁর কেমন দুষ্টামি করিতে ইচ্ছা গেল; তাই টিকিট বিক্রেতাকে বলিলেন—"দ্যাখ, ঐ ব্যক্তি আমার স্ত্রীর পেছনে লাগিয়াছে—আমরা কোথায় যাচ্ছি তাহাকে বলিও না।" তখন সে ব্যক্তি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল "সে কি কথা মশায়? এক্ষণি একে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছি।" যেই বলা অমনি পুলিশ ডাকা। পুলিশের পাহারাওয়ালা এই কথা শুনিবা মাত্রই সে ব্যক্তিকে যাইয়া পাকড়াও করিল। তখন দুজনে টিকিট ঘরে ঢুকিয়া গেল এবং পাহারাওয়ালা তার কাগজ পত্র দেখিয়া, অন্য দরজা দিয়া সরিয়া পড়িল। আমরা তখন প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইয়া ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার টিক্‌টিকী তখন আমার কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে টুপী খুলিয়া বলিল—"মিঃ—আমার কোনও অপরাধ নাই—মিসেস অনর্থক ভড়্‌কিয়া গিয়া এই গোলটা বাধাইলেন।" মিসেস—ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি বুঝি তাই ভাবছো? আমি তোমায় চিনেছিলাম। তোমাকে অপ্রস্তুত করার জন্যই এ ফাঁদ পাতা হয়েছিল।" তখন লোকটী আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"মিঃ—এ কাজটা যে আমার মনোমত তা ভাববেন না। সময় সময় নিজের উপরে ঘৃণা হয়। কিন্তু কি করি স্ত্রীপুত্র আছে, তাদের রুটির ব্যবস্থা করিবার জন্য এমন কাজও করিতে হচ্ছে।" খানিক পরে, আমরা

তখন ইলফোর্ডে নামিয়াছি, আমার কাছে আসিয়া বেচারি আবার বলিল—"মিঃ—আজকের এ ব্যাপারটা যদি খবরের কাগজে বাহির হয় বা কর্ত্তাদের কানে উঠে, গরিবের অন্ন মারা যাবে। কারণ আমাদের আপনাদের কাছে আত্মা বা কোনও প্রকারে আপনাকে উত্যক্ত করা। এমন কি আমরা যে আপনার পিছনে পিছনে ঘুরি, ইহা ঘুণাক্ষরেও আপনাকে জানিতে দেওয়া আমাদের পক্ষে অতিশয় দণ্ডনীয় ব্যাপার। আপনি আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এটী রাষ্ট্র হলে এক্ষণি আমার কাজটী যাবে।" বেচারার মুখ দেখিয়া আমার বড় কৃপা হইল। আমি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম—"আমা হইতে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।" তদবধি এ ব্যক্তি আমার বন্ধু হইয়া গেল; কখনও কোনও অসৌজন্য প্রকাশ করে নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিশ্বের প্রেম

ভালবাসে পাখী, প্রভাত-আলোকে
নিতি সে শুনায় গান;
ভালবাসে তরু, ছায়া দানে মোর
জুড়ায় তাপিত প্রাণ!
ভালবাসে ঊষা, প্রতি নিশি-শেষে
মোর গৃহে দেয় দেখা;—
নিমীল নয়ন; চুমিয়া সোহাগে
মুছে স্বপনের লেখা!
ভালবাসে মেঘ নীল অঞ্চলে
দেয় খররবি ঢাকি';
করে সে বীজন মলয়-পবন
কুসুম-সুরভি মাখি'।
অস্ত-অচলে কনক তপন—
করুণ বিদায়-ছবি—
মোর পানে চাহি' ডুবিতে না চায়,
ভালবাসে মোরে রবি।

ভালবাসে নিশি, দিবা-অবসানে
মোর কাছে আসে ধীরে;
ছড়ায়ে জড়ায়ে কুন্তল রাশি
আমারে রাখে গো ঘিরে।
প্রিয়ার মতন বাঁধে মোরে তার
নিবিড় প্রেমের পাশে;
নিভৃত তেমনি মিশে যাই যেন
দোঁহে দোঁহাকার শ্বাসে!
বিশ্বের প্রেম শতধারে আসি
পশিছে আমার প্রাণে;
আলোকে, আঁধারে, বরণে, গন্ধে
কত রসে, কত গানে।
মনের পাত্র ভরি লইয়াছে
আস্বাদ সে সবার;
ধন্য আমি সে, কৃতার্থ আমি,
নমি সবে বার বার।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন

(চট্টগ্রামে, সাহিত্য সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশনে)

সভাপতির অভিভাষণ

এস মা সঙ্গীত-সাহিত্য মাতা, ভাবভাষা-জননী ভারতি! ভারতের এই প্রান্তপ্রদেশে আবার ভারতি! তোমার আরতি করিব। এই সম্বৎসর আমার নিভৃত নিলয়ের নিস্তব্ধ কক্ষে আমি নিত্যই তোমাকে ডাকিয়াছি;—কিন্তু আজি আর এক ভাবে তোমায় ডাকিব। এখানে মা! আমার কণ্ঠস্বর যতই ভগ্ন হউক, এই সহস্র সাহিত্য-সেবকের প্রাণের ঝঙ্কারে আমার কর্কশ কণ্ঠের কঠোরতা বিলুপ্ত হইবে; আমার ক্ষুদ্র তাল সেই ঝঙ্কার অতি বিপুল করিয়া তুলিতেছে। তোমার সহস্র সেবকগণের শক্তির সহিত মিলিত হইয়া আমার ক্ষীণা শক্তি মহতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দাও মা! তোমার অভয় চরণের শীতল ছায়া,—আমরা সেই ছায়াতলে সমবেত হইয়া, প্রাণের সমস্বরে ঋষভ পঞ্চমে তোমার আরতি গান করি। এস ভাই! সকলে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ভুলিয়া, আমরা ভারতে ভারতী দেবীর বন্দনা করি। বল ভাই! সকলে মিলিয়া বল,—মা! আমরা যেন তোমার মন্দিরে আসিয়া দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যাই। যেন বৌদ্ধ ব্রাহ্ম, হিন্দু-মুসলমান সকলে প্রাণের সহিত বলিতে পারি,—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে;
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

চট্টগ্রামের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার মত অকৃতী অধমকে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া, এই সমগ্র বিদ্বৎসঙ্ঘ সেই নির্ব্বাচন অনুমোদন করিয়া এবং অধমকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ কথা আপনারা একটি বিনয়ের মামুলি কথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু এই কার্য্যে যে আপনারা আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে কথা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। রাজা মহারাজাকে, প্রফুল্ল-জগদীশের মত জগদ্বিখ্যাত সুধী মনীষীকে সভাপতি সকলেই করে ও করিতে পারে। কিন্তু আমার মত অকৃতী সাহিত্য সেবীকে কদমতলার কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া যে এই মঞ্চের সর্ব্বোচ্চ স্থানে

অধিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, এই কার্য্যের মহত্ত্ব তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং—যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন ঘোষিত হইবে।

আমার একটি শিষ্যের মত, সাহিত্য-সেবা-রত ভদ্রলোক আমাকে সেদিন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "অভিভাষণ" কাহাকে বলে ? আমি বলিলাম, "তা'ও ভাল জানি না ; গত বৎসরের পূর্ব্বে অতবড় কঠিন কথা আমি কখনও ব্যবহার করি নাই।" আবার প্রশ্ন হইল,—"যেখানে অভিভাষণ হয়, সেখানকার কথা কি বলিতে হয় ?" আমি বলিলাম,—"মহারাজ তাই করিয়াছিলেন, আমাদিগকে মহাকবি কালিদাসের কুটুম্ব করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমি ত সে সব কিছু পারিব না ; চট্টগ্রামের কথা আমি ত কিছু জানি না। বৈবাহিকের "বিশ্বকোষ" উদ্ঘাটন করিয়া কতকটা বিদ্যা জাহির করা যায়, কিন্তু তাহাও পারিব না।" "তবে আপনি বলিবেন কি ?" আমি উত্তর করিলাম,—"আমি বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে, আর আমার চিরদিনের কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।" এবার শিষ্য গুরু সাজিলেন, বলিলেন,—"ও শেষ কথাটা বলিয়া আর কোন ফল নাই।" আমিও গম্ভীরভাবে আমার গুরুত্ব রক্ষা করিয়া গীতা আওড়াইয়া বলিলাম,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমার গুরু গাম্ভীর্য্যে শিষ্য তূষ্ণীম্ভূত হইলেন।

বাস্তবিক আমি চট্টগ্রামের প্রায় কিছুই জানি না। জানিতাম সেই একজনকে—চট্টগ্রামের একমেবাদ্বিতীয়ং সেই নবীনচন্দ্র সেনকে। জানিতাম কেন বলি, তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্বই ছিল। কিন্তু সে নবীন ত আর নাই। শোককাহিনী আর বাড়াইব না। আমার বড় পান্‌সে চোখ, অশ্রুবর্ষিণী লেখনী এখনই সভা নষ্ট করিবে। বরং এমন করিয়া বলি, যিনি হাসিতে হয় হাসুন, আর যিনি কাঁদিতে হয়, কাঁদিতে থাকুন।—আজি আমার এই কৃষ্ণ-মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে সেই নবনীত-নিন্দিত কান্তি, হাস্যোজ্জলমুখ, স্ফূর্ত্তমুখশ্রী, সুবিন্যস্ত-কেশকলাপ, জলভরা প্রাণভরা বিশাল-চক্ষু যদি বসাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনারা সেই অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইতেন। কিন্তু সে নিত্যনবনীতশ্রী আর ত দেখিতে পাইব না।

আর এখানকার শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেবের কৃপায় আমরা জানিয়াছি যে, অনেক-গুলি মুসলমান কবি বাঙ্গালায় রাধাকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি অতি গুহ্য বিষয়ে, অতি সুন্দর পদাবলি লিখিয়া ভক্তিসাধনা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। করিম সাহেবই সর্ব্ব প্রথমে কবি আলিওয়ালের পরিচয় আমাদের নিকট দেন এমন নহে, তিনি আরও বিস্তর ছোটবড় হিন্দু মুসলমান কবির পরিচয় আমাদিগের কাছে দিয়াছেন ; তাহার মধ্যে মুসলমান শৈয়দ মর্ত্তুজা আলি, এতিম নাছির, সৈয়দ সোলতান, নুরমহম্মদ, সৈয়দ আমাইদ্দিন, উজীর আলি পণ্ডিত এবং হিন্দু কবি নটবল্লভ, দ্বিজ রঘুনাথ, ভবানন্দ, বাসুদেব প্রভৃতির পদাবলিও তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। করিম সাহেব এই জন্য সমগ্র সাহিত্য-সেবীর কাছে ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য। চট্টগ্রামের সাহিত্য-সেবার আর যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছি, তাহা পরিশিষ্টে বলিব।

এইখানে দাঁড়াইয়া যদি বলি, সৌন্দর্য্যময়ের

জগৎ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, বোধ হয় তাহা হইলে কেহই আমার প্রতিবাদ করিবেন না। এই মধুমাসে মধুর সম্মিলন, মধুর মলয়ানিল সাগর-বক্ষ বাহিয়া প্রাণ শীতল করিতেছে, নানাবিধ বিহঙ্গের কলকাকলি রবে স্বভাবের কুঞ্জভবন সকল মুখরিত হইতেছে। ফুল ফুটিয়াছে,সৌরভ ছুটিয়াছে ; আম্রশাখা মুঞ্জরিত, মধুমক্ষিকা সকল 'ম' 'ম' শব্দে অনবরত মধ্যম পঞ্চম সুরে ঝঙ্কার দিতেছে। শাখিবর লতার বহুধারা বাহুলতা বেষ্টনে স্তব্ধপ্রায় হইয়া,

"প্রিয়তমা নিদ্রা যায়, পাছে বিঘ্ন হয় তায়,
নাহি নড়ে, কথা নাহি কয়।"

চারিদিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি দেখিবার জিনিষ, উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু সকলে দেখিতে পায় না, উপভোগ করিতে পারে না। উপভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্ব কমিয়া যায়, মনুষ্য বর্ব্বর থাকিয়া যায় বা ক্রমে হইয়া পড়ে। সকলরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের নিদর্শন।

এই সৌন্দর্য্য আকাশে পাতালে, ভূতলে পর্ব্বত-শিখরে—সকল দিকে, সকল সময়ে অজস্র ছড়ান আছে। রথাশ্বগজপদাতি-সেবিত নৃপতি যেমন হীরামরকতমাণিক্য-মণ্ডিত প্রাসাদে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, দীনদরিদ্র পর্ণকুটীরবাসী কৃষকও সেইরূপ তাহার শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে নয়ন ভরিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তবে উপভোগের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা হয় ত সম্রাটেরও কখন কখন থাকে না, তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়াও মর্ম্মদাহনে দগ্ধ হন, আবার দীনহীন দরিদ্র তাহার পর্ণ-শয্যায় শায়িত হইয়া সৌন্দর্য্যময়ের আনন্দ-রূপে বিভোর হইয়া থাকে।

ভগবান্ বৈচিত্র্য-প্রিয় ; জগৎ বৈচিত্র্যময়। ভগবান্ শৃঙ্খলাপ্রিয়, জগৎ শৃঙ্খলাময়। বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে যে শৃঙ্খলা,—বহুর মধ্যে এক ভাব, তাহাই জগতের মূল ; বৈচিত্র্যের মধ্যে যে শৃঙ্খলা তাহাই সৌন্দর্য্যের মূল। এই সৌন্দর্য্য যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি পরিতৃপ্ত হন, প্রফুল্ল হন ; তাঁহার মনে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব আপনা আপনি উদিত হয়। অল্পবিস্তর সকলেরই হয়,—হয় ত ভারতবাসীর এবং য়ূদীয়াবাসীর অধিক পরিমাণে হয়। সেই জন্যই অন্য জাতি বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হইলেও, ভারতবাসী ও য়ূদী আজিও জীবন্ত রহিয়াছে, শত নির্য্যাতনেও তাহারা জীবন্ত।

সুকুমার সাহিত্য-সেবায় এই সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা জন্মায়, বৃদ্ধি পায় এবং হয়।

রস-রচনার নাম সাহিত্য। সৌন্দর্য্যের নাড়া চাড়া করিলে রস বাহির হয়। "ধার্ম্মিক লোক সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব" বলিলে স্বরূপ উক্তি হয়, সত্য কথা বলা হয়, কিন্তু "ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার" বলিলে সেই একই কথা সুন্দর করিয়া বলা হয়, তাহাতে রস জন্মায়। প্রথমটি কেবলমাত্র ভাষা, দ্বিতীয়টি সাহিত্যের টুকরা নমুনা।

বহুকালের শিক্ষার এবং অভ্যাসের গুণে, জলবায়ুর প্রকৃতিবশে আমরা একরূপ কোমল-স্বভাব হইয়াছি ; আমাদের মাতৃভাষা এত সহজে সুন্দর হয় যে, আমরা মনে করিলেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পারি। "ভালবাসি", একটি অতি সাধারণ কথা। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' কি না—ভাল বলিয়া জানি ও বিশ্বাস করি। কথাটি বৈদিক

নয়, সংস্কৃত নয়, বিদেশী নয়—খাঁটি বাঙ্গলা কথা। কিন্তু ঐ কথাটির ভিতর কেমন সুন্দর ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে! "ভালবাসি তাই আসি" চিরিয়া দেখাইতে গেলে মানে হয়, তোমাকে ভাল বলিয়া বিশ্বাস করি, তাই তোমার কাছে আসি। কিন্তু চিরিলে ত সাহিত্য থাকে না। "ভালবাসি তাই আসি" এই ক্ষুদ্র আয়তনেই রসবিন্দু অতি সুন্দর পরিপুষ্ট হয়। আর একটি যৌগিক শব্দ 'দেখনহাসি'—পরস্পর দেখা হইলেই মুখে হাসি আপনা আপনি আসে; হৃদয়ে রস উথলিয়া উঠে, মুখে তাহার মৃদু তরঙ্গ খেলিতে থাকে। এমন বহুতর কথা দেখান যাইতে পারে। এইরূপে ছোট ছোট কথার বিচার করিয়া, জয়দেব-চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত কবিকুলের রচনার ভঙ্গী দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সাহিত্য আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতি শৈশবের সেই ঘুমপাড়ানি গান—"বাটাভরে পান দিব, গালভরে খেও"। আর অন্তিমে সেই হরি-সঙ্কীর্ত্তন—সমস্তই সাহিত্য-মাখা। এই জাতির পক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনই সুন্দর ব্যবস্থা। যদি কোন পথে আমাদের প্রকৃত সম্মিলন হয়, উন্নতি হয়, বিকাশ হয়, তবে এই সুকুমার সাহিত্যের পথেই হইবে।

সাহিত্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে বলুন? আমাদের প্রকৃত পুরাতন সনাতন সমাজ, অসাড়, অনড়, নির্ব্বাত, নিষ্কম্প বিরাট দেহে বিশাল বক্ষে ভর করিয়া জমি লইয়া পড়িয়া আছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে,—নাচিতেছেন নীতি-সংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক!!! সংস্কার লইয়া সম্মিলন হয় না। ভাঙ্গার পর গড়া হইলে সংস্কার হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আমরা ভাঙ্গিতে মজবুত, গঠনে অপটু। সুতরাং সংস্কারক-সম্মিলন আমাদের মধ্যে হইতেই পারে না। রাজনীতির আলোচনা দিল্লী প্রভৃতি পীঠস্থান ছাড়া, নির্ব্বাচিত পুরোহিতগণ মধ্য ব্যতীত সাধারণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। তাহার পর বিজ্ঞান। আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানরত্ন আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনের সময় এখনও হয় নাই। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের একচালার পরচালা হইয়া বিজ্ঞান গত বৎসর হইতে কথঞ্চিৎরূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। সুতরাং এক সাহিত্য-সম্মিলনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আর আমাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তিও সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট। বহুকাল হইতে আমরা কীর্ত্তন-কবি, যাত্রা-কথকতা, পাঁচালি লইয়া সৌন্দর্য্যের নাড়াচাড়া করিয়া বাঙ্গালিজীবন সার্থক করিয়া আসিতেছি।

সৌন্দর্য্য হইতে রস; রস-রচনায় সাহিত্য ভাবুকে দ্বিবিধ উপায়ে রস উপভোগ করেন, আর উপভোগ করান—এক সৃষ্টি করিয়া, আর এক দৃষ্টি করিয়া বা দেখাইয়া দিয়া। সৃষ্টির ক্ষমতা অল্প লোকেরই থাকে, দৃষ্টি সাধনা করিলে অনেকেরই হইতে পারে। এই সৃষ্টি-দৃষ্টির সমন্বয়ে সকলরূপ সাহিত্য জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালি সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, আখ্যান হইতে অসংখ্য নরনারীর অবতারণা করিয়াছেন। রচনার ভঙ্গিতে, বিচিত্র রঙ্গেতে সেই সকল আমাদের একেবারে নিজস্ব হইয়াছে। মেনকা যে কবি-কল্পনা-সম্ভূতা, তাহা

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—নিজগৃহে, প্রতিবেশি-গৃহে যেমন আর দশজন 'মা' দেখিতে পাই, মেনকা তাহাদেরই মত একজন—মেয়ে মেয়ে করিয়া পাগল। কার্ত্তিকের মুখে নবনীত দিতে গিয়া ভুলিয়া উহা উমাকেই খাওয়াইয়া ফেলেন; তিন দিন পরে ভাঙ্গড় জামাতা মেয়েকে লইয়া যাইবেন, প্রথম দিনেই তাহা মনে পড়িয়াছে, বলিতেছেন,—

"আমার কিসের ঘরকন্না।
বৎসর অন্তর আসেন গৌরী তিন দিন বৈ রন্না॥"

ভাগবতের যশোদা গোপী হইয়াও রাজমহিষী। আর আমরা যশোদাকে এমনই নিজস্ব করিয়াছি যে, তাঁহাকে ঘাঘরা-পরা দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করি। সেইরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী সমস্তই আমরা আমাদের মত করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাকে আমরা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকে নিজস্ব করিতেই প্রাণ চায়। রামপ্রসাদ জগজ্জননী জগদম্বাকে আমাদের এমনই নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন যে, উহার ভিতর যেন একটা রূপক বা আরোপ আছে, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গল" সুন্দর গ্রন্থ; "র ক্ষুদ্র অথচ অতি সুন্দর। তবে ভারতচন্দ্র অতি কুক্ষণে অন্নদামঙ্গলের মধ্যে "বিদ্যাসুন্দর" গছাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি রাজাদেশে ঐরূপ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতৃরাজ্যগ্রাসকারী বর্দ্ধমান-রাজের উপর তাঁহারও আক্রোশ ছিল। থাকিতে পারে; বিচিত্র কি? যাহাই হউক চোর-কবির বিদ্যা চুরি করিয়া তিনি বিদ্যাসুন্দর লেখাতে বর্দ্ধমানরাজ অপদস্থ হউন আর নাই হউন, ক্ষমতা থাকিতেও তিনি স্বয়ং অপদস্থ হইয়াছেন। "বিদ্যার মত বিদুষী কন্যা আমাদের হউক"—কোন বাঙ্গালিই প্রাণ ধরিয়া এমন কামনা করেন না। আর আমাদের সাহিত্য-সম্রাট, মাথার মণি, চূড়ার ময়ূর-পাখা বঙ্কিমচন্দ্র তেমনই কুক্ষণে ইংরাজি হইতে নায়ক-নায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের নবীনচন্দ্র, তোমাদের নবীনচন্দ্র তাহা সুন্দররূপে ধরাইয়া দিয়াছেন। সে কথাও এখানে বলা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অমর। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে। কিন্তু আদর্শচরিত্র নাই। রামায়ণ-মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদশ কন্যা, এমন কি আদর্শ ভৃত্য পর্য্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার সাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন,—গড়িতে পারেন নাই। * * * * বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি য়ুরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।"

এরূপ ভাবে না বলিলেও, বাঙ্গালির যশোদা, মেনকা, জগদম্বার উল্লেখ করিয়া আমি বঙ্কিমবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিতে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানেন, সে অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। এখনও অনেক কৃতি-লেখককে সেইরূপ অনুরোধ করিয়া থাকি,

তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না। আমাদের দুর্দ্দশাই এই, আমরা দূরে পশ্চিমদিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখন আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। ঐ সমালোচক নবীন-চন্দ্র ও কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে তুলনা করিয়াই দেখুন না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা কালে কেমন আমাদের আদর্শের কথা তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যের সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা—এ সকল কি? তাঁহারই কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট কি? সেই যে কুরু-ক্ষেত্র সমরের অবসর সময়ে রাত্রিকালে হিন্দু-রমণী দীপ লইয়া হতাহতের অনুসন্ধান করিতে-ছেন—সেটি কি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের এক-রূপ সংস্করণ নয়?

অতিথি ভারতে চিরদিনই পূজ্য। সেই অতিথি অঙ্গনে উপস্থিত; কুলবধূ তাঁহাকে অর্ঘ্য দিবার জন্য করঙ্ক পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী পথশ্রান্ত হইয়া আসিলেন। সেই মহাব্রত আতিথ্য পড়িয়া রহিল, অতিথি স্বাগত-সেবা না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কুলবধূ করঙ্ক অধৌত রাখিয়া দিয়া পতিসেবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।—এই না হৈল আমাদের সধবা কুলবধূর আদর্শ। যদি স্বামিসেবা বিস্মৃত হইয়া কুলবধূ পরপুরুষের হতাহতের সেবায় ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে সেই আদর্শ থাকে কি? কখনই থাকে না। প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ-ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে শান্তি, যে প্রীতি, দয়া-মায়া, আতিথ্য, দেবভক্তি, গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবে,—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব।

এখন ভাষার কথা। বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না; বঙ্গীয় শব্দ বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণপদার্থ আছে, সেইটি বাঙ্গালির মত হইলে তবে বাঙ্গালির উপযোগী ভাষা হয়।

ভাষা বুঝিতে হইলে প্রাণ-পদার্থ বুঝিতে হয়। ভাষা প্রাণের জিনিষ। প্রাণের ব্যাকুলতায় শিশুদিগের ভাষা ফুটিতে থাকে। কথিত হইয়াছে যে, নঞ্‌বাচক শব্দ সভ্য অসভ্য অনেক ভাষাতেই তুল্য রূপ; 'ন' দিয়া আরম্ভ। ন, না, নেহি, no, not, nil ইত্যাদি। কেন এমন হইল? সকল দেশেই দেখা যায়, ছেলেরা দুধ খাইতে বড় নারাজ,—তা মাতৃস্তন হইতেই কি আর পত্রপুট বা কোনরূপ মূল্যবান্ পাত্র হইতেই বা কি। মা ছেলেকে কোলে ফেলিয়া বলপূর্ব্বক দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ছেলে দাঁত টিপিয়া, মাথা নাড়িয়া প্রাণের ব্যাকুলতায় কোনরূপ নিষেধবাচক বা অসম্মতি-সূচক শব্দ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে,—দাঁত টিপিয়া থাকিলে আর কি শব্দ বাহির হইতে পারে—ছেলেটি বলিতেছে, "ন ন নে নৈ নি নি" ইত্যাদি। এই সার্ব্বদেশিক ব্যাপার হইতে 'ন' হইয়াছে নিষেধবাচক বা অসম্মতিসূচক। এই ভাষাপুরাণের মধ্যে কতটুকু ইতিহাস

আছে, তাহা বলিতে পারি আর নাই পারি,— প্রাণের ব্যাকুলতায় যে ভাষার উৎপত্তি সে কথা নিশ্চয়। পশুপক্ষীর কি প্রাণের ব্যাকুলতা নাই? আছে বৈ কি। তবে তাহাদের মধ্যে আমাদের মত ভাষা নাই কেন? ইহার উত্তরে আবার একটি বিচিত্র রহস্যময় কথা বলিতে হইতেছে।

মানুষের প্রাণ তিনটি। দার্শনিক মতে পঞ্চ প্রাণের কথা আছে, সে বায়ুগত প্রাণ; তাহার কথা এখন ধরিব না। প্রাণ তিনটি; সেই জন্য শাস্ত্রে প্রাণ নিত্য বহুবচনান্ত পদ,— ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। তিনটি প্রাণ কোথা হইতে আসিল? একটি পিতৃস্থানে ঔরসে পাইয়াছি, একটি মাতৃস্থানে জঠরে পাইয়াছি, আর একটি আমার নিজস্ব—কর্ম্মসূত্রে পাইয়াছি। সংস্কৃত বচন তুলিয়া প্রবন্ধ দুর্ব্বোধ্য করিব না; কিন্তু অনেকে আমার কথা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। মনের ভিতর শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে বিবাদ অতি প্রাচীন শাস্ত্রে আছে; উপনিষদে আছে। সুমতি-কুমতির কলহ অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকারও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেয় প্রেয় ব সুমতি-কুমতি-কলহে একটি তৃতীয় প্রাণ মধ্যস্থরূপে প্রকাশিত হন,— এ কথা স্পষ্ট করিয়া কেহ না লিখিলেও, আমি বলি আপনাদের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফল কথা প্রাণ তিনটি, ব্যষ্টিভাবে দেখা যাউক আর নাই যাউক, সমষ্টিভাবে অনেক সময়েই অনুভূত হইয়া থাকে। পিতামাতার চেহারা, ধরণধারণ, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-মেজাজ— এই সকল যে সন্তানে পায়, তাহা অনেকেই জানেন ও মানেন। আমরা পৃথক্ পৃথক্ প্রাণও পিতা মাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকি। আমরা কে? আমি কে? সেই কর্ম্মফলভোগী পুরুষ। তবেই তিনটা জড়াইয়া একটা হইল। এই প্রাণ বা মহাপ্রাণ আছে বলিয়াই আমরা প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিতে পারি— তাহারই নাম ভাষা। যে ভাষায় প্রাণ নাই, সে ভাষাই নহে।

এক সময়ে ভারতবর্ষে ঋষিমুনিদের, ব্রাহ্মণদের প্রাণ ছিল। সেই প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহারা দেবভাষায় মন্ত্রশক্তিবলে প্রাণের দেবতার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এক সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ ছিল। সূর্য্যচন্দ্রবংশীয়েরা সেই প্রাণের বলে পুরাণ ইতিহাসে অধিনায়কত্ব করিয়াছেন। এক সময়ে বৈশ্যের বা পণিকের বা বণিকের প্রাণ ছিল। তাঁহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণে একদিকে ফিনিসিয়া ও বিনিস্, অন্যদিকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি, বর্ণীয়, চীন, জাপান—এমন কি কাহারও কাহারও মতে, সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। সে দিন আর নাই। সেই প্রাণীদিগের প্রাণবন্তঃ আর নাই। যদি থাকেন ত লোক-চক্ষুর প্রায় অগোচরে, সমাজের নিভৃত নিলয়ে লুকাইয়া আছেন। ভারতের প্রাণ বাঙ্গালার ক্ষীণ প্রাণ এখন কেবল শস্যোৎ-পাদক কৃষকের হস্তে। এইজন্য ইংরেজেরা বলেন, ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ঠিক কথা। বিদ্যা সাহেবদের কাছে; ক্ষত্রিয়ত্ব গোরার কাছে; কলকারখানা, রেল-গাড়ী, ষ্টিমার—সকলই সাহেবদের কাছে। ভারতবাসীর কোন দিকে যদি কিছু উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা থাকে ত সে কেবল চাষে।

চাষেই আমাদের প্রাণ বাঁচে, চাষেই আমাদের প্রাণ আছে।

সে প্রাণে আড়ম্বর নাই, জয়ডঙ্কা নাই, সভা নাই, বক্তৃতা নাই, সম্মিলন নাই, আস্ফালন নাই—এ সকল কিছুই নাই, তবু প্রাণ আছে, উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে; তোমার আমার কাহারও তাহা নাই। ম্লেচ্ছর্ষি জন্ ব্রাইটের মহদ্বাক্য স্মরণ করুন,—"A nation lives in the cottage" কুটীরবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি।

ঐ কথা ইংলণ্ডের মনীষী-মুখে। যে ইংলণ্ড প্রতাপে অদ্বিতীয়, শৌর্য্যেবীর্য্যে অসামান্য, সেনা-সজ্যে রণতরীসাকল্যে জগতে দুর্দ্ধর্ষ—সেই ইংলণ্ডের জন ব্রাইট বলিতেছেন,—কুটীরবাসী লইয়াই দেশ। আর, আমাদের উপরিস্তরে কিছু নাই বলিলেও চলে, অথচ আমরা নিম্ন-স্তরের গৌরব বুঝি না; যেখানে সমাজের প্রাণ সেখানকার গৌরব বুঝি না। নিম্নস্তরকে অবহেলা করিলে দেশের প্রাণে অবহেলা করা হয়। নিম্নস্তরের ভাষায় অবহেলা, অবজ্ঞা, উপহাস ঘৃণা করিলে আমরা নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইব।

অবহেলা করিতে সংস্কৃত পারেন, ল্যাটিন পারেন, হীব্রু পারেন, গ্রীক পারেন, আরবি—হয় ত পুরাতন পারসীও পারেন; কিন্তু ইংরাজি পারেন না, ফরাসি পারেন না, জর্ম্মাণ পারেন না—মৃত ভাষায় পারেন, জীবন্ত ভাষায় পারেন না। আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিতে বা রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের নিম্নস্তরের ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। ভাষাতে যাদু-ঘরের মত রাশি রাশি কঙ্কাল, পেটে-মসলা-পূরা পশুপক্ষী রাখিলে চলিবে না; চিড়িয়াখানার মত জীবন্ত পশুপক্ষী বন্দী করিয়া রাখিলেও চলিবে না, সেখানেও প্রাণ কম। ভাষাকে একটি বড় দেশী মেলার মত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে জনতা চাই, ক্রেতাবিক্রেতার চলাচল চাই, জনতার মধ্যে উচ্চ রোল চাই, হর্ষের উল্লাস চাই, বিষাদের বার্ত্তা চাই, সুখ-দুঃখজড়িত উচ্চ নীচ মানবসঙ্ঘের সংঘর্ষণ চাই—অর্থাৎ চলন্ত প্রাণ চাই।

কুলীন-মৌলিক, অপ্রাকৃত-প্রাকৃত, সম্ভ্রান্ত-ইতর,—সমাজের নানা স্তরে এইরূপ বিভেদ করিয়া আমরা বি[illegible]র গণ্ডগোল করিয়া থাকি। মাতৃ-ভাষার মহিমময়ী শাখাশ্রেণীতে আবার সেইরূপ কুলীন-মৌলিক বিভেদ বলবৎ করিয়া আর গণ্ডগোল না করিলেই ভাল হয়।

পূর্ব্বে দেশ-প্রচলিত ভাষার তিনটি অঙ্গ ছিল; (১ তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃতসম, (২) তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃতোদ্ভব, এবং (৩) দেশজ। এখন আমাদের অদৃষ্টবশে হইয়াছে চারিটি;—আর একটি বিদেশজ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কুলীন-মৌলিক কোন বিভেদ থাকিতেই পারে না। ঐ বিদেশী ডাক্তার আসিয়া, জুতাশুদ্ধ তোমার ছেলের বিছানার পাশে বসিয়া, ঘড়ি খুলিয়া নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিতেছেন, উঁহাকে কতদিন আর বিদেশী বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিবে বল? উনি তোমার সন্তানের প্রাণ-দাতা, তোমার মহোপকারী বন্ধু। তাঁহাকে তোমার সংসারের একজন না ভাবিয়া কিরূপে থাকিবে? তবে তাঁহাকে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না—প্রাণ গেলেও দিবে না,—সে স্বতন্ত্র কথা।

এরূপ বলাতে কেহ মনে করিবেন না

যে, আমি অশ্লীল বা অশ্রাব্য ভাষাকে সাধু পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। অশ্লীল, অশ্রাব্য সংস্কৃতেও আছে। তা যেথানেই থাকুক, সে সকল ত্যাজ্য। আমি বলিতেছি, "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—আমাদের ত্যাজ্য নহে,—আবার "পক্ষিসর্ব্ব রবকারী, রাত্রি প্রভাতা"—আমাদের গ্রহণীয় নহে। বরং যদি উভয়ের মধ্যে বাছনি করিতে হয়, তাহা হইলে শেষেরটি ফেলিয়া প্রথমটিই আমাদিগকে লইতে হইবে।—ইহাতে প্রাণের কথা বুঝান হইল না, মোটামুটি আমি কি চাই, না চাই তাহাই বুঝান হইল।

গতবৎসর সম্মিলনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন"—এইরূপ বলিলে যদি লক্ষ লোক বুঝিতে পারে, কিন্তু "রাম অযোধ্যায় রাজা হইয়া বাপে যেমন সন্তানদের পালন করেন, সেইরূপ করিয়া প্রজা পালন করিতে লাগিলেন"—এইরূপ বলিলে যদি কোটি লোকে বুঝিতে পারে, তবে এই দুই-এর কোন্‌টি ভাল? সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলাম, যদি লোকশিক্ষা কথাটা একটা ভণ্ডামি না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে শেষোক্ত ভাষা গ্রহণ করিতেই হইবে। অর্থাৎ আমি বলিয়াছিলাম যে, ভাষা যত অধিক লোকের বোধগম্য হয়, তত ভাল। এবার বলিতেছি যে, প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি; নিম্নস্তরের লোকের এখনও যৎকিঞ্চিৎ প্রাণ আছে,—তাহাদের ভাষা অসাধু বা অকুলীন বলিয়া অবহেলা না করিয়া সংস্কৃতসম বা সংস্কৃতোদ্ভব ভাষার সহিত ভূয়োপরিমাণে দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাষার প্রাণ থাকিবে বা হইবে।

আমার সম্মুখে একখানি উত্তম পুস্তক রহিয়াছে। অনেক পরিশ্রম ও একনিষ্ঠার ফল এই "ঢাকার ইতিহাস" হইতে ভূমিকার প্রথম ছত্র লইলেই আমার কথা একটু পরিষ্কার হইবে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"জাতীয় জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় দেশেরই ইতিহাস।" প্রথমতঃ জাতীয় কথাটা নেহাত বিজাতীয়! তাহার পর "জাতীয় জীবন" আরও অবোধ্য। সেইজন্য আমি বলি, 'দেশে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে প্রথমে দেশের পরিচয় জানা প্রয়োজন।' তাহা ত বটেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের পরিচয় পাইয়া, তাহার পর দেশের সাধারণ লোকের ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার পর সেই ভাষা আপনাদের ভাষার সহিত মিলাইতে পারিলে, তবে দেশে প্রাণ বাড়িবে, সজীবতা বাড়িবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মনীষিগণ যে প্রকারে বিদেশী ব্রাণ্ডির আমদানি করিয়া দেশের প্রাণবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে বিদেশী তীব্র উগ্র ভাব সকল বাঙ্গলা ভাষায় আমদানি করিলে সুফল হইবে না, বরং বিপরীত ফল হইবে।

অল্পবয়সী যুবতী জননী যেমন রুগ্ন সন্তানকে অতি সন্তর্পণে কোলে শোয়াইয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলান, অতি ধীরে ধীরে বাতাস করিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন, একটু একটু করিয়া বলকারক পথ্য দিয়া তাহার শরীরে বলাধানের চেষ্টা করেন, তেমনি করিয়া আমাদিগকে এই মাতৃসেবা

করিতে হইবে। হঠকারী সেবককে রোগ-শয্যা হইতে সুদূরে রাখিতে হইবে। যাঁহারা খট্‌খট্‌ 'বুট' বিহার করিয়া রোগের বিষয়ে সদয় জিজ্ঞাসা (kind enquiry) করিতে আসেন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে হইবে। বলহীনে বল সংযোগ বড় বিষম বিড়ম্বনা। প্রথমতঃ চিকিৎসককে রোগীর ধাতু বুঝিতে হইবে। দেখুন, ধাতু না বুঝিয়া পথ্যপ্রয়োগে কিরূপ অনর্থ হইতেছে। যেখানে সেখানে একটি কথা দেখিতে পাই 'সুবর্ণ সুযোগ'—'এ সুবর্ণ সুযোগ আমরা ছাড়িব কেন?' মনে করুন কোন একটি দেশে, কোন একটি প্রবল রাজসিক জাতির মধ্যে সুবর্ণ সঞ্চয়ই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কাজেই তাহাদের ভাষাতেও সুবর্ণ সর্ব্বদা উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইবে। Golden time, Golden opportunity, Golden deeds ইত্যাদি। এখন তাই দেখা দেখি তুমি যদি তোমার মাতৃভাষার বলাধান করিতে গিয়া বলিতে থাক যে, সুবর্ণ সময়, সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ কার্য্য, তাহা হইলে বাস্তবিক কি ভাষার বলাধান হইল? না ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজের মূলসূত্রে মহাবিপ্লব বাধিল? আমরা শাস্ত্রের উপদেশে সাধুলোকের দৃষ্টান্তে, সমাজের ছন্দে বন্দে শিখিয়াছি যে, সুবর্ণ আমাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য, মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য, শুভ আমাদের লক্ষ্য, সেইজন্য আমরা বলি, "এই শুভ সুযোগে আমাদের এই কার্য্য করিতে হইবে।" সেই সমাজ যখন বলে, হীরক জুবিলি, রজত জুবিলি, আমরা সেই সময় বলিব, শুভ জুবিলি, জুবিলি মঙ্গল ইত্যাদি।

বিপিনচন্দ্র ধরাইয়া দিয়াছেন, পিতা পুত্রকে লেখেন, "প্রাণতুল্যেষু"। সেইরূপ পিতাকে আমরা লিখি, "পরম পূজনীয়"। ইহার পরিবর্ত্তে "প্রিয় পিতা" বলিলে কি ভাষায় কিছু লাভ হইতে পারে? না "প্রিয় প্রিয়" বলিয়া পিতার সঙ্গে তুল্য-মূল্য হইবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়? সেটা কি ভাল?

প্রাচীন সমাজে, সেই সমাজের ভাব-ভঙ্গির সহিত, চাল-চলনের সহিত ভাষা এরূপ ভাবে জড়াইয়া থাকে যে, বিদেশী ভাষা তাহার সহিত বলপূর্ব্বক যোগ করিতে গেলে সমাজের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। যাঁহারা সমাজ ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা ভাষার উপর বল প্রয়োগ করুন, তাঁহাদিগের কার্য্যে আমাদের কোন কিছু বলিবার অধিকার নাই বলিলেও চলে, কিন্তু যাঁহারা এই পুরাতন সমাজের অগ্রে স্থিতি, পরে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা ভাষায় উপর দৌরাত্ম্য করিলে আমাদের কপালে করাঘাত করিতে ইচ্ছা করে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ভাষা একটি জীবন্ত প্রবাহ। তাহার গতি আছে, বেগ আছে। তাহাতে আবর্ত্ত আছে, প্রপাত আছে; আর প্রবাহের ধারে ধারে চড়া আছে, শস্য-শ্যামলা ভূমি আছে, কর্কশ কঠিন পর্ব্বতমালা আছে। ইহার জলরাশি কমে বাড়ে বটে, কিন্তু নিয়তই প্রবহমান; চলিতেছে—কখন কুলুকুলু রবে, কখন বা গভীর গর্জ্জনে। এই প্রবাহে অন্য ক্ষুদ্র প্রবাহ সকল পতিত হয় বটে, ক্বচিৎ বিবর্ণ করে বটে, কিন্তু প্রায়ই কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মিলিয়া যায়। এই প্রবাহের গতি না বুঝিয়া

প্রবাহের সংস্কার করিতে যাওয়া একরূপ বাতুলতা মাত্র।

সামাজিক কোন ব্যাপারই গড়াপেটা জিনিষ নহে। সকল ব্যাপারই ক্রমে ক্রমে গজাইয়া উঠে। অসার সংস্কারকেরা মনে করেন, কোন ধর্ম্ম, রীতিনীতি বা ভাষা যখন কোন শক্তিশালী পুরুষের সৃষ্ট বা নির্ম্মিত, তখন আর একজন বা দশজন তাঁহার মত শক্তিশালী লোকে কেন তাহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন অথবা উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন না? এই ভুল ধারণা হইতেই মহা অনর্থপাত হইতেছে। একদিকে কিছু শক্তি থাকিলেই, অনেক লোকে মনে করেন, আমি অনেক বিষয়ে শক্তিশালী। এক কোপে বৃহৎ ছাগচ্ছেদের সামর্থ্য আছে বলিয়াই আমি সন্তরণে গঙ্গাপার হইতে পারি! ভাষার উপর এই যে নিষ্ঠুর অত্যাচার, ইহাও এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। ভাষাও একটি জীবন্ত জিনিষ; কুম্ভকারের প্রতিমার মত বা গৌরীপুরের কলের মত গড়াপেটা পদার্থ নহে। ইহার প্রবাহ বুঝিতে হইবে, গতি বুঝিতে হইবে। স্রোতে স্রোত মিলাইয়া খাল কাটিয়া জল আনিতে পার ভালই, কিন্তু প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে যাইবেই; কোন খানেই দক্ষিণ-বাহিনীকে উত্তর-বাহিনী করিতে পার না। পৃথক্ বঙ্গলিপি যদি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও ছিল এমন বোধ হয়, তাহা হইলে পৃথক্ ভাষা তখন ছিল না, মনে করিতে হইবে কি? না, এমন মনে করিতে হইবে যে, সে সময়ে অবশ্য একটি পৃথক্ বঙ্গভাষা ছিল। তা যদি থাকে, আমরা ত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গভাষার নমুনা পাইয়াছি। প্রবাহ বুঝিবার মত আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় একটি পরিষ্কার সুন্দর সহজ ঠাট অনেক দিন হইয়াছে। তবে পদ্য বলিয়া যদি বুঝিতে না পার, আমরা একটু গদ্যের নমুনা দিব,

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র

"প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায় পরম কল্যাণাস্পদেষু।

"আমার বয়ঃক্রম যে হইয়াছে, তাহাতে এখন সদর মফস্বল মল্‌কি কোন বিষয়ে মামলত যে আমি করি তাহার সময় নহে। পারলৌকিক যে যে ব্যাপার তাহাই আমার কর্ত্তব্য এ কারণ আপনি স্বচ্ছন্দরূপে * * * * * তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম শ্রীশ্রী৮ দেবসেবা প্রভৃতি ও জমীদারী লওয়া জমাখরচ আখরাজাত ও নফা লোকসান সমস্ত তোমারই, তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত এলাকা নাহি, প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দেবের পোষ্য অধিক এ কারণ আমার মোশাহেরা সরকারে যে পাওনা আছে তাহার মধ্যে সালিয়ানা পনের হাজার তাঁহার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ মহেশ দেবের দশ হাজার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ ঈশানচন্দ্র দেবের দশ হাজার ও ভৈরবচন্দ্র দেবের পোষ্যপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ মাধবচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার ও হরচন্দ্র দেবের পোষ্যপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত যজ্ঞচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার একুনে এই চল্লিশ হাজার টাকা এহাদিগের খরচের নিমিত্ত মোকরার

করিয়া দিলাম। এই নিয়ম যে করিলাম ইহার উল্লঙ্ঘন তাঁহারা এবং তুমি কেহ কখন করিবে না। যদি কেহ কখন এ নিয়মের অন্যমত আচরণে উদ্যত হও, তবে লোকত ধর্ম্মত এবং হাকিমানে সে নামঞ্জুর। ইতি সন ১১৮৭ শন এগার শত সাতাশী শন তারিখ ৯ই জৈষ্ঠস্য।”

লক্ষ্য করিবেন যে, এই দানপত্রের ভাষা, দুই একটি পার্সী কথা ছাড়া, সমস্তই খাঁটি বাঙ্গলা; অর্থাৎ এখন যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমরা বাঙ্গলার বিশেষত্ব বুঝিতে পারি সে সমস্তই উহাতে আছে। এ কথা ভাল করিয়া দেখাইতে গেলে অনর্থক গুরুমহাশয়গিরি করা হইবে; তাহা করিব না। এটি হইল একশত বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্র, বৃত্তিভোগী রামপ্রসাদ, তাঁহার দানপত্র যে বিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা লেখান হইয়াছিল, সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু আমি ভালমন্দের বিচার করিতেছি না, কেবল ভাষার ভঙ্গি যে পূর্ব্ব হইতে একই ভাবে রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। ইহার কিছু পরের আর একটি লেখা দেখাইব।

পরেরটি রেবরেণ্ড কেরি সাহেবের লেখা। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন; পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, এখন হইতে ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ছাপান “ইতিহাসমালা”। তখন ইতিহাস বলিলে গল্প কাহিনীও বুঝাইত। একটি কাহিনী এইরূপ;—

“এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চব্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্ব্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্য কয়টি পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্য পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল সুরস হইয়াছে। পরে পুনর্ব্বার মনে ভাবিল মৎস্য কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটি মৎস্য খাইল। পুনর্ব্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয়, ভাবিয়া সেটিও খাইল। এইরূপে খাইতে খাইতে একটি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্যটি আর অন্ন তাহাকে দিল। কৃষক কহিল যে এ কি? চব্বিশটি মৎস্য আনিয়াছি আর কি হইল? তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিল,—

মাছু আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিল দুই গণ্ডা
বাকী রইল ষোল।
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল॥
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট॥
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয়॥
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুঁই॥
তবে থাকিল এক।
অই পাত পানে চাহিয়া দেখ॥
এখন হইস যদি মানুষের পো।
তবে কাঁটাখানা খাইয়া মাছখান থো॥
আমি যেই মেয়ে।
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে॥

এইরূপে মৎস্যের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।’

হিসাবের পদ্ধতি কেরি সাহেবের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, ঐটকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষক-গৃহিণীর রহস্যময়ী কাহিনী লেখা হইয়াছে। এ লেখার সহিতও এখনকার লেখার কোন বিশেষ পার্থক্য নাই

কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই কি আর কেরি সাহেবের সময়েই কি, বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতজ্ঞে দেখিয়া শুনিয়া দিতেন। দানপত্রের প্রথমেই আছে 'বয়ঃক্রম', এই বিসর্গেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য; কেরির রচনায় বার বার আছে 'কৃষক-গৃহিণী'। তিনি ঝোল রাঁধিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কথাতেই 'সুরস' হইয়াছিল। এ সকল অবান্তর কথা। আসল কথা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, আমাদের ভাষার ঠাট, কায়দা, ভঙ্গি, রীতি বহুদিন হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। পদ্য বহুদিন হইতে, গদ্য অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের সময় হইতে। এই ঠাট একটা বাঁধি ঠাট। আমাদের সমাজে যদি কিছু বাঁধন থাকে, তাহা হইলে ভাষায়ও আছে। যাঁহারা বলিবেন, বাঁধন কোনদিকে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন কথা নাই। যাঁহারা মনে করেন, সমাজের ঠাট বজায় রাখিয়া সমাজের উন্নতি আবশ্যক, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, ভাষাতেও সেইরূপ ঠাট বজায় রাখিয়া উন্নতি আবশ্যক। তবে আমাদের ভাষার ঠাট কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে একটু দৃষ্টি আবশ্যক, আর যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম আবশ্যক। মাতৃভাষায় ভক্তি থাকিলে এবং ভাষা বেওয়ারিশ ময়দা নয়, ছেলেখেলার সামগ্রী নয়,—এ জ্ঞান থাকিলেই, সে দৃষ্টি সহজেই আসে এবং সে পরিশ্রম করিতে সকলের ইচ্ছা হয়।

এ যে ভাষার প্রবাহ ইহাতে মধ্যে মধ্যে বন্যা আসে, ঢল নামে। এই বন্যা হইলে বা ঢল নামিলে ভাষার পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু ভাষার ভাবভঙ্গির বৈলক্ষণ্য হয় না। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় একটি বন্যা হয়; তাহার পর কেরি প্রভৃতি মিশনরি সাহেবদের সময় আর একটি। তাহার পর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বাঙ্গলা গদ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখাইতে থাকেন। বাঙ্গলার গদ্য একটা শিক্ষার উপায় এবং উপভোগের সামগ্রী হয়। সাহিত্যের প্রসার তখন আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই—গদ্যকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল; ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম সমানে বিঘোষিত হইয়াছিল।

এই সমস্ত লিখিত ভাষার কথা। এই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই কথিত ভাষা ছিল, থাকিবেই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ও মিশনরিরা দেশীয় লোকের কথোপকথন প্রভৃতি যখন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন, তখন সেই ভাষা ব্যবহার করিলেও, কোন গ্রন্থকার সেই ভাষা আপনার ভাষা বলিয়া ব্যবহার করিতে সাহস করিতেন না, অথবা ঘৃণাবোধ করিতেন। এই সময়ে দুইজন কায়স্থপুরুষসিংহ দুর্জ্জয় সাহসে বঙ্গভাষার রঙ্গমঞ্চেও দেখা দিয়া ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর ও বঙ্গভাষায় মহাভারতের অনুবাদের উদ্যোগকর্ত্তা এবং "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা"-লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,—

"যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথমে ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার বরণীয় উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এবং 'আলালের ঘরের ছুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। * * * আলালের ঘরের দুলাল দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

"উহাতেই প্রথম এই বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, বাঙ্গলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথমে দেখাইয়াছিলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে; তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল।' প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি। অতএব বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ।"

বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গলায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতেই হইবে। বঙ্কিমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া "রত্নোদ্ধার" করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, —আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের সহজ মাতৃভাষায় বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।

তাহার পরের যুগের প্রবর্ত্তক, প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক—সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কালীপ্রসন্নের, প্যারীচাঁদের গ্রাম্যতা-দোষ-পরিহার পূর্ব্বক ভাষাকে একটু বিশুদ্ধ করিয়া তাহার প্রবাহ বৃদ্ধি করিলেন। সেই পথে যে বাঙ্গলা ভাষা এখনও চলিতেছে এবং সেই পন্থা যে বাঙ্গলার সমগ্র সাহিত্য-সেবীর অনুমোদিত, তাহার জলন্ত প্রমাণ—এই সভায় সমবেত সাহিত্য-সেবিগণ কর্তৃক আমার মত অকৃতি লেখককে সভাপতিত্বে নিয়োগ।

প্যারীচাঁদের গ্রন্থ-সমালোচনা অবসরে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি

ব্যতীত আমি আর একটি কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি;—সে কথাটি এই যে, ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষায় অধিকতর সংস্রব রাখিতে হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, যদি ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে পারি বা আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে পারি। প্রাণের একটা দৃষ্টান্ত দিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থানে আমরা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছি। তিনি সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষায় অদ্বিতীয় শায়েন শাহা সম্রাট্—তখনও যেমন এখনও তেমনই। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেশাচারের উপর খড়্গহস্ত হইয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাষার ভঙ্গি শুনুন,—"ধন্য রে দেশাচার! তুই শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্ ইত্যাদি।" দেখুন, এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও ইতর লোকের মত 'তুই মুই' করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিম্নস্তরের প্রাণের ভাষা না লইলে প্রাণের আবেগ প্রকাশ করা যায় না।

প্রাণ নিম্নস্তরে; নিম্নস্তরের ভাষা আমাদিগকে লইতেই হইবে। লিখিত ভাষা যত কথিত ভাষার সহিত কাছাকাছি থাকিবে, তত লিখিত ভাষায় জীবন পাওয়া যাইবে। লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যত দূরে ফেলিয়া রাখিবে, তত্ই আপনি জীবন হারাইবে, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীকের মত হইবে, নানা গুণ থাকিলেও জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। এখনও যে সংস্কৃত ভাষায় একটু একটু প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে, সে কেবল দেবারাধনা কোথাও কোথাও একটু আধটু জীবিত আছে বলিয়া।

ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।

এই সময় বঙ্কিমবাবুর কথা আর একবার বলিব। এবার বন্ধুভাবে, শিষ্য ভাবে নহে, বিরোধ ভাবে বলিব। আমরা জানি বিরোধে সাজুয্য লাভ করা যায়। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ, কবির আর একটি বিশেষ গুণ—রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি এ কালে পরিহার্য্য; ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে—* * এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি। আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।" আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না; তাঁহাকে প্রণাম করি।

'রস' শব্দ, বঙ্কিমবাবুর ব্যঙ্গভাবে প্রণম্য অভাগা আলঙ্কারিকদিগের সৃষ্ট শব্দ নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্র সৃষ্ট হইবার বহু বহু পূর্ব্বে ঋষিরা এই রসে টল্‌টলায়মান ছিলেন;

"বেদ ল'য়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।"

ভারতচন্দ্রের এই শ্লিষ্ট শ্লোকার্দ্ধে তাহারই

পরিচয় আছে। "রসো বৈ সঃ" ইহা ঋষিদেরই উক্তি। আলঙ্কারিকগণ রসের লক্ষণা করিতে পারেন নাই,—বলিয়াছেন, রস ব্রহ্মানন্দের মত অপূর্ব্ব পদার্থ। সেই রসানুবোধ-ক্ষমতা আমাদের কমিয়াছে বটে, আর ইংরাজিতে প্রতিশব্দ নাই বলিয়াই কি রস-শব্দ পরিহার করিতে হইবে? বাঙ্গলার রসশেখর লেখকের পক্ষে রস পরিহাসের কল্পনা একটা অদ্ভুত রসের কথা বটে।

আকাশের কি বুঝি, আকাশের কি লক্ষণা করিতে পারি; কিছুই পারি না। কিন্তু আকাশ সকলেই বুঝে। রস সেই আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছে। ঐ যে নবোঢ়া কিশোরী প্রথম সমাগম অবসরে প্রফুল্ল যুবক স্বামীর শয্যাপার্শ্বে খট্টাঙ্গ-দণ্ড ধরিয়া ক্ষৌম বসনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া, ব্রীড়াবিকুঞ্চিত অঙ্গে বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর ঐ যে তরুণ যুবক পূর্ব্ব হইতে পুষ্পবাসিত শয্যায় শয়ান আছে, মৃদু মৃদু দক্ষিণ, পদ কম্পন করিতেছে, আর মুচকি মুচকি হাসিয়া তরুণীর লজ্জাতরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছে ভাল, ইহারাই কি রস বুঝিয়াছে, আর আমরা এই প্রৌঢ় বয়সে কি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না? ঐ যে প্রবাসগামী পতি পার্শ্বে প্রণয়িনী কি বলিতে গিয়া বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারিল না, মরমে মরমের কথা তাহার বলা হইল না, সেই প্রণয়ী প্রণয়িনীই কি রস বুঝিয়াছিল, আর আমরা কেহ কিছুই বুঝি না? ঐ যে অর্দ্ধ যুবতী, অর্দ্ধ কিশোরী, অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি সুঠাম সুগোল মাতৃস্তন বিকশিত করিয়া দুরেক্ষিত কথঞ্চিৎ চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট শিশু সন্তানকে সাগ্রহ আহ্বান করিতেছে, আর সন্তান উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে, টলিতে টলিতে দৌড়াইতেছে,—ঐ বঙ্গজননী আর ঐ বঙ্গ শিশুই কি রস বুঝিয়াছে, আমরা কেহ বুঝি না? আর ঐ যে,

"বঁধূর বাঁশী বাজে বুঝি ঐ বিপিনে, নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে,"

ঐ বংশীধর বন্ধু আর অবশ-অঙ্গিনী গোপীগণই কি রস বুঝিয়াছিলেন, আমরা কেহ বুঝি না? তা কেন? "ঘন বিজন কানন বা তরুশূন্য মরুদেশ, প্রখর রশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, তরুণযৌবন বা পরিপক্ক প্রবীণকাল, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় পুরাৎপর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার করিয়া ভক্তিমানের চিত্ত রসসঞ্চারে ভক্তিভরে পরিপ্লুত হয়।"

রসময়ের রস সর্ব্বত্র ছড়ান আছে; ছড়ানই বা কেন বলি, ওতপ্রোত আছে; তবে এই রস উপভোগ করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নহে। সকল বিষয়ই অনুশীলনসাপেক্ষ। রসেরও অনুশীলন করিতে হইবে। যে ভাষায় জননীর আদর, পত্নীর সোহাগ, ছেলেদের আব্দার, বন্ধুর প্রিয় সম্ভাষণ পাইয়াছি, সেই মাতৃভাষায় সাহিত্য সেবা করাই রসানুশীলনের সরস উপায়। রসরচনার অনুশীলনে হৃদয় কোমল হইবে, প্রাণ শীতল হইবে, মন সরল হইবে; দয়া মায়া, শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কপটতা, নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা কমিয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়িয়া যাইবে। আমরা কোমলপ্রাণ জীব, নাই বা পারিলাম

মারামারি করিতে, নাই বা পারিলাম উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতে, পরের জন্য প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে ত পারি, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইবে, জগৎ শতমুখে বলিবে বাঙ্গালি পরের ব্যথা বুঝিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সেবা-ধর্ম্মে পরম গরিষ্ঠ।

সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-সাহিত্য-সেবার সুযোগ বঙ্গ সমাজে দান করিয়া আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গত বৎসর আমি সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অধিকতর কর্ম্মঠ করিবার অভিপ্রায়ে আমার অভিভাষণে অনেক কথা বলিয়াছিলাম।

যে যাহারে ভালবাসে,
সে তাহারে সদা দোষে।—

এই রীতি সকল দেশেই আছে। এ বৎসর সে সকল আব্দার কিছু করিব না।

এ বৎসর সাহিত্য-পরিষদের অতি দুর্ব্বৎসর। যে রাম-স্বভাব রামেন্দ্রসুন্দর শত কর্ম্ম থাকিতেও এই সম্মিলনের স্থাপন গঠন কার্য্যে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির প্রধান সহায় ছিলেন, আপনার শত শত গুরুতর কার্য্য থাকিলেও যিনি কোন দিন পরিষৎ-সেবায় বিরাম দেন নাই, সেই রামেন্দ্রসুন্দর এখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মন প্রাণ বহিলেও শরীর ত আর বহে না পরিষদের সম্পাদকতার অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার দেহ একবারে রুগ্ন ভগ্ন হইয়াছে। সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ, অথচ সাহিত্য সেবায় অক্লান্ত কর্ম্মবীর এখন শুষ্করস স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সেইরূপ সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার প্রধান সহায় শ্রীমান্ ব্যোমকেশ মুস্তফীও অনিয়ত পরিশ্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, রোগ-গ্রস্ত হইয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, এ বৎসর সাহিত্য-পরিষদের অতি দুর্ব্বৎসর। এ বৎসর আমরা আকাঙ্ক্ষা-আব্দারের কথা তুলিব না। ভগবানের নিকট, সাহিত্য-মাতা সরস্বতীর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রামেন্দ্রসুন্দর, ব্যোমকেশ পুনরায় সবল ও সুস্থ হউন, এবং আবার পূর্ব্বমত যত্ন, পরিশ্রম সেবায় সাহিত্য-পরিষৎকে গরিয়সী করুন।

এইবার সমস্ত বঙ্গের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কথা এই বিপুল সাহিত্য-সঙ্ঘ-সমক্ষে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিব।

আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, পল্লীগ্রাম লইয়াই পৃথিবী। সহর, নগর,—ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান, সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যস্থান। প্রধানত পল্লী লইয়াই প্রদেশ। কিন্তু পল্লীগ্রামের উপর কাহারও দৃষ্টি নাই। যিনি একটু 'মাথাতোলা' হইলেন, তিনিই সহরে গিয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। বলেন, দেশের উন্নতি করিতে হইবে। দেশ কি কেবল কলিকাতা আর ঢাকা?

পল্লীর উন্নতি দূরে থাকুক, এমন কি পল্লীর স্থিতির জন্য কাহারও কোন উদ্যোগ নাই। পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইতেছে, কত বিশিষ্ট গণ্ডগ্রাম হইতে গোরু বাছুর বাঘে লইয়া যাইতেছে, জ্বরে ওলাউঠায় দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে; জলকষ্টে, জল আনিবার কষ্টে, আর দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে জল আনিবার সময় সুযোগ সুবিধা হওয়ায়, বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়, কুলবধূ কুলের বাহির হইয়া যাইতেছে। এতকল কথা আমরা প্রায়ই ভাবি না। কিন্তু

এখন দিনকতক আমাদের ঘরের কথা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, নহিলে আর যে চলে না।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা সাধারণ ভারতবাসী, বিশেষত বঙ্গবাসী নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটীতে বাস করিতে পাই না; স্নান, পান ও রন্ধনের জন্য পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে কাজেই প্রচুর সূর্য্যালোক পাই না; মাটী-পচায়, গাছ-পচায়, জল-পচায়, পাট-পচায় বায়ু অনেক স্থানে বিষম দূষিত হইয়াছে,—বিশুদ্ধ বায়ু আমরা সেবন করিতে পাই না; রোগক্লিষ্ট শোকগ্রস্ত, অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ কোটি কোটি নরনারীর আর্ত্ত রবে আকাশ পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে, শূন্যপ্রাণে শূন্যপানে চাহিয়াও আমরা সান্ত্বনা পাই না। দুর্দ্দশায় আমাদের স্বস্তি, শান্তি অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। কি করিব আমরা নির্ব্বাচিত সদস্যপূর্ণ মন্ত্রণা-সভা লইয়া? কি করিব কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল লইয়া? কি করিব উচ্চ নীচ, সুলভ দুর্লভ শিক্ষা লইয়া? কি করিব বিচারক ও শাসকের পার্থক্য লইয়া? কি করিব সভাগৃহমধ্যে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অবাধ প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লইয়া? তবে, শত ধন্যবাদ দিই মহারাজ রণজিৎ সিংহকে আর রায় সীতানাথ রায়কে; তবু দুই জন লোক, বড় লোক হইয়াও আমাদের স্বাস্থ্যবিভ্রাটের কথা বড়লাটের সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, মন্দের ভাল বলিতে হইবে। আমরা নিতান্ত বিপন্ন, দীনহীন হইয়া পড়িতেছি,—আমরা যে বাস্তব মাটী পাই না, তৃষ্ণার জল পাই না, শীতে রৌদ্র পাই না, গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ বায়ু পাই না। আমরা বিষম দেশব্যাপী জ্বরে হয় জড়সড় হইয়া কাল কাটাই, নয় উজাড় হইয়া যাই। আমরা যে প্রচুর আহারের অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি; দেহের বল কমিতেছে, হৃদয়ের সাহস কমিতেছে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি নাই বলিলেই চলে।

রাস্তা, বাঁধ, জঙ্গল, সড়ক—সমগ্র ভারতে নিত্যই বাড়িতেছে,—গোলোক-ধাঁধার মত রাস্তার জটিলতায় পথ হারাইয়া ফেলিতে হয়; রাস্তার জাল দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে,—তাহাতে স্থলপথ সুসার হইয়াছে বটে, কিন্তু জলনিকাশের পথ প্রচুর না থাকায় বৃষ্টির জল, বন্যার জল নিকাশ পায় না, মাটীতে ক্রমাগত জল ব'সতে থাকে। কাজেই ভূমি হইয়াছে ম্যালেরিয়ার বিহারক্ষেত্র। বালকেরা শিশু-শরীরপালন পাঠ করিয়া শুষ্ক ভূমিতে বাস করিতে শিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু ভূমিতে জল বসিলে ভূমি শুষ্ক থাকে কিরূপে; কাজেই বাস্তভূমি সকল বিক্রীত হইয়াছে।

আবার নদীগর্ভ সকল ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছে। এক যশোহরের রায় যদুনাথ মজুমদার ব্যতীত কেহই সে দিকে মনোযোগী নহেন। বাঙ্গলার অনেক স্থলের নদী সকল কাটাইয়া না দিলে রীতিমত জল নিকাশ হইবে না; দিলে জল নিকাশের ব্যবস্থা হইবে, স্নানের ও পানের জল সঙ্কুলান হইবে এবং বাণিজ্য ও যাতায়াত সুগম হইবে। ভাগীরথী কাটাইবার কথা বাঙ্গলার লাট সভায় উপস্থাপিত করিয়া মহারাজ রণজিৎ আমাদের পুনর্ব্বার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ধনী ও মধ্যবিত্তের ধর্ম্মপ্রাণতা

ছিল। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নব পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত। এখন সে ধর্ম্মপ্রাণতা নাই। কিন্তু প্রাণ রক্ষা ত চাই। ভাল জলের সংস্থান না করিলে নদীবিহীন পল্লীগ্রাম টিকিতেই পারে না।

তাহার পর দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। কতক আমাদের উদাসীনতায়, কতক আমাদের আলস্যে, আর কতক আমাদের রসনার উপাসনায়। বাগাত জমিতে গাছপালা চিরকালই আছে ও থাকিবে, নতুবা বাগাত হইবে কি প্রকারে? কিন্তু বাস্তু-উদ্বাস্তু —আমরা রসনা-পরায়ণ হইয়া আমের কলমে, লিচুর কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার আছে সে বাগাত জমিতে বাগান কর, কিন্তু বাস্তু-উদ্বাস্তু জঙ্গল করিও না; মাঠান জমিও বাগাতে পরিবর্ত্তন করিও না। জঙ্গলে ভূমি শুষ্ক হইতে পারে না। তাহাতে বাস্তুর বিলক্ষণ ক্ষতি হয় এবং ক্ষেত্রে বাগান করিলে শস্যসম্ভার কমিয়া যায়। "উত্তর কলা, দক্ষিণখোলা"—গৃহস্থ লোকের বাসের দক্ষিণে খানিকটা খোলা জমি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দক্ষিণে খোলা জমি থাকিলে বাঙ্গলায় রৌদ্র, বাতাস দুইই পাওয়া যায়। আগাছা একটু বড় হইলেই পূর্ব্বে লোকে জ্বালানির জন্য কাটিয়া ফেলিত; এখন অনেক স্থলে পাথুরে কয়লা জ্বালানি হওয়ায় আগাছার তত টান নাই। বড় বড় আগাছায় গ্রাম নগরের উপকণ্ঠ একেবারে ভরিয়া উঠিতেছে। আলস্যে এবং উদাসীনতায় আমরা সেগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করি না। কিন্তু না করিলে আর ত চলে না। আপনার অবস্থা, আপনার গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার অবস্থা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন ভিটায় আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারি, তাহার চেষ্টা সকলকে করিতে হইবে,—জঙ্গল কাটাইতে হইবে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, নদী সকল যাহাতে বহতা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

শরীর বহিলে তবে কর্ম্মসাধন হয়, লোকযাত্রা সাধন হয়। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কিছুই হয় না, কোন কিছু ভাল লাগে না। শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপনা বল, ধন বল, যশ বল, শরীর বহিলেই সব। যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া বসবাস করিতে পারি, তাহার জন্য অগ্রে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে আভ্যন্তর নীতি বলিতে হয়, বল; প্রজানীতি বলিতে হয়, বল; স্বাস্থ্যনীতি বলিতে হয়, বল; এই জন্য রাজপুরুষগণের কাছে যে ক্রন্দন, আবেদন, নিবেদন—তাহাকে রাজনীতি বলিতে হয়, বল,—যে নামে বলিতে হয়, বল—কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছু দিন করা চাই। সর্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই পরম মঙ্গলকর কার্য্যে লাগিয়া যাও; আর উদাসীনতায়, আলস্যে, নির্বুদ্ধিতায় আসল খোয়াইয়া নকলের জন্য লালায়িত হইও না।

কতবার বলিয়াছি, আবার বলি, সমস্ত বাজে কথা আর কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া এখন দিন কতক বাঙ্গালিকে বাঙ্গালির স্বাস্থ্যের কথা ভাবিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাকে ততটুকু চেষ্টা

করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ,—তিনি সন্ন্যাসী হউন,গৃহী হউন, হিন্দু হউন,মুসলমান হউন,—বাঙ্গালি জনসাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালির পরম বন্ধু। আর যিনি এখন অন্য বিষয়ে বাঙ্গালিকে মন লাগাইতে উপদেশ দিবেন, তিনি বাঙ্গালির পরম শত্রু। আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও।

বিগত বর্ষে এমনই দিনে, এমনই শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্যজন্মদিনে, এমনই ভারতব্যাপী বসন্তোৎসব—ফল্গুৎসবের দিনে, আমি পঞ্চম সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে বিশেষভাবে আমার হুগলি জেলার এবং সামান্যভাবে সমগ্র বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার কথা অতি কাতর কণ্ঠে, অতি আর্ত্তস্বরে সমগ্র সাহিত্যসেবিগণ-সমক্ষে অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিবেদন করিয়াছিলাম ; বলিয়াছিলাম, সাহিত্য-সেবিগণ ! আমি দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে, সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যোন্নতির অভিলাষী তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটু চেষ্টা করুন। বলিয়াছিলাম, অন্য কাহারও কাছে আমি কখন এমন করিয়া আবেদন নিবেদন করি নাই। আপনাদিগকেই আমি বন্ধু বলিয়া, আত্মীয় বলিয়া, মুরুব্বী বলিয়া জানি ও মানি। আমি আপনাদের দরবারে যেরূপেই হই হাজির হইয়াছি—আপনারাই আমার জজ, আপনারাই আমার জুরি, আপনারা আমার অশ্রুপাতে দৃষ্টিপাত করুন, আমার ক্রন্দনে কর্ণপাত করুন, স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে মন দিন। আমার সেই অভিভাষণের ভূয়ো প্রচার হইয়াছিল, অনেক প্রশংসা হইয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ নিন্দাও হইয়াছিল, কিন্তু এমন কথা একজনও বলেন নাই বা লেখেন নাই যে, সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে দেশের স্বাস্থ্যের জন্য এতটা কাঁদাকাটি করা ভাল হয় নাই। ইহাতেই আমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। একে ত আমি অতি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছি বলিয়া আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাহাতে আপনাদের প্রশ্রয় পাইয়া আমার আব্দার, আমার স্পর্দ্ধা, অত্যন্ত বাড়িয়াছে ; আর বাড়িয়াছে আপনাদের কৃত কার্য্যে, আপনাদের অর্থাৎ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যে। আপনারা আমার মত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কৃতি লোককে সভাপতিত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই আমার পূর্ব্ব অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন যে, দেশের দুর্দ্দশার দিকে সকলের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য আমার একটা অসাধারণ ঝোঁক, অসাধারণ টান, অসাধারণ আবেগ আছে ; এটা জানিয়া শুনিয়াও যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন সেই ঝোঁক, সেই টান, সেই আবেগ যে নিতান্ত উপহাসের ব্যাপার বা অবহেলার সামগ্রী, তাহা কখন আপনারা মনে করেন নাই। তাহা যখন করেন নাই, তখন আমি সঙ্কুচিত হইব কেন? অসঙ্কোচ ত বটেই; অধিকন্তু এমন আশা করাও অসঙ্গত হইবে না যে, আপনারা আমার ক্রন্দনে এইবার প্রকৃতই কর্ণপাত করিবেন।

আবার নিরাশার কথা বলি! এই সম্বৎ-

সব ধরিয়া বাঙ্গলার অনেকগুলি মাসিকপত্র পর্য্যালোচনা করিলাম,—কৈ ঐ কথার গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখি নাই। সাপ্তাহিক পত্রেই বা কৈ? 'সুলভে' কিছু কিছু থাকিত, তা সুলভ ত আর নাই। "অমৃতবাজার", "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি দুই একখানি পল্লীসম্পর্কিত পত্রে কিছু কিছু থাকে,—তাহাতেও বড় আশা হয় না। "অমৃতবাজার" বলেন, কলিকাতার লোকে জ্বরকষ্ট বা জলকষ্ট কিছুই বুঝে না, সেইজন্য কিছুই লেখে না। বাঙ্গলা কবন্ধ হইলেও কলিকাতা আমাদের মাথা,—মাথায় না লাগিলে কাহারও মাথাব্যথা হইবে কেন? ভাল, কলিকাতায় বড় লোকদের সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, সহুরে কংগ্রেস যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন, শাসকসম্প্রদায়ও যদি পূর্ব্বের মত গয়ংগচ্ছ করেন, তবে আমরা এই সামান্য মধ্যশ্রেণীর সম্প্রদায়, এই সমগ্র সাহিত্য-সেবীর দল, এই মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রগুলির সম্পাদকগণ, এই কবি-লেখকের দল, এই ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়—আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারি না কি? নাই বা হইলাম রামমূর্ত্তির মত জোয়ান, সুরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা, ডাক্তার ঘোষের মত আইনজ্ঞ ও ইংরাজি-সাহিত্যরত, ঠাকুর কুমারের মত ধনশালী,—নাই বা হইলাম আমরা এ সব কিছু; আমরা এই সামান্য বলবিত্ত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া প্রতি জনে জনে ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া কিছুই কি করিতে পারিব না? যদি শ্রীভগবানের সহায়ে আমার এই প্রাণের কথা আপনাদের দশজনেরও প্রাণে লাগাইতে পারি, তাহা হইলেই আশা করিব বাঙ্গলায় যুগান্তর উপস্থিত হইবে, স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প—সকল বিষয়েরই উন্নতি হইবে।

জঙ্গলে, বাঁধে, রেলের পথে যখন দেশের জল বন্ধ হয় নাই, যখন দেশের ছোট বড় সকল লোকে পল্লীগ্রাম প্রিয়তর বলিয়া জানিত, নদীগুলি যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই,—তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা মনে করিতে গেলেও চক্ষে জল আসে। তখন দেশে অন্ন ছিল,—দুই বেলা দুই মুঠা মোটাভাত সকলেই খাইতে পাইত; দেশে বিস্তর তন্তুবায় ও জোলা ছিল,—মোটা কাপড় সকলেই পরিতে পাইত। আর ছিল—যাত্রা-গান, কবি, পাঁচালি, কথকতা; কৃত্তিবাসী কাশীদাসী পাঠ হইত; চণ্ডীর গান, পীরের গান গীত হইত, আর হইত পূজা, অর্চ্চনা, আরাধনা, আজান; মেলা-মহোৎসব নিত্যই হইত; বারয়ারিতে হিন্দু মুসলমানের সমান উৎসাহ; সর্ব্বত্রই হাসিখুসি, গল্পগুজব, গান-বাজনা। পূর্ব্বাঞ্চলে নদীর উপর সারিগান ও ভাটিয়াল গান পদ্মার মত ভীষণ নদীর প্রবাহ ছাইয়া রাখিত। এখন দেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে ঐ সকল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; সে উদ্যোগ নাই, সে উৎসাহ নাই; সে প্রাণ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই; সে প্রফুল্লতা নাই, সে রস নাই—সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল জ্ঞানের মায়া, বিজ্ঞানের ছায়া, সভার আড়ম্বর, আর বক্তৃতার বিড়ম্বনা; আছেন—উকীল মোক্তার, কৌন্সিলি ও ডাক্তার। আর আছে বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপত্র এবং ইংরাজের নকলে দেশের ইতিহাস। অতি বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল খোয়াইয়া,

এই সকল ছায়া লইয়া কি বাঁচিয়া থাকা যায় ? আপনারাই বলুন, এই জরাজীর্ণ দেহে এই বিষম চিন্তার দুর্ব্বহ ভার আর কতকাল বহন করিব ?

আপনারা অপূর্ব্ব বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য-সেবার উপকরণস্বরূপ হৃদয়ে প্রফুল্লতা আবার আনিতেই হইবে. বাঙ্গলার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেই হইবে ; আপনারা এই বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন, আমি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া ভগবতী ভারতীর এই পীঠ মধ্যে, তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিয়া আপনাদের জয়গান করি। প্রসীদ ভারতি ! ভারত-সন্তানে।

পরিশিষ্ট

আপনারা জানেন, আমি মাসিক পত্রে ও সংবাদ-পত্রে নিয়মিত সাহিত্য-সেবা করিতাম। সাংসারিক বিঘটন ঘটায়, সংসারের সেবায় অধিক সময় দেওয়া প্রয়োজন হওয়ায় সাহিত্যের নিয়মিত সেবা আমার দ্বারা আর হয় না। তবে অভ্যাস দোষে চোরের যেমন তুম্বীনাড়া রোগ ছিল, আমারও সেইরূপ সাহিত্য-তুম্বী নাড়া চাড়া করা রোগের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সেবা দুই প্রকারে হয়, এক পঠনে আর এক লিখনে। পঠন জীবনের চির সহচর, সে ত আছেই, লিখনও এক এক সময় বিশেষ বন্ধুত্ব করিয়া থাকেন। এইরূপে 'পূর্ণিমা'য় নিয়মিত লেখক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে "পূর্ণিমা' মাসিকপত্র লীলা সম্বরণ করিয়াছে ; আমিও মনে করিয়াছিলাম, আমি খালাস পাইলাম। কিন্তু পূর্ণিমায় এক বৎসর সমালোচনা করিয়াছিলাম বলিয়া গ্রন্থকারগণ আমাকে পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুস্তক উপহার দেন, আবার নিগ্রহ করিয়া সমালোচনার দাবী করেন। নিগ্রহ কেন বলিতেছি, বলি। লেখাপড়া কিছু না শিখিয়া অনেকের লিখিবার বাসনা হয়। অনেক লেখা বুঝিতে পারা যায় না,—সমালোচনা একটা নিগ্রহ হইয়া উঠে। তাহার পর অভ্যাস দোষে গ্রন্থের দোষগুলা চোখের সম্মুখে পড়ে, সেই দোষ দেখা একটা রোগে পরিণত হয় ; যৌবনে এ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ; ছাড়িতে চাই, কিন্তু উপরোধ অনুরোধ এড়াইতে পারি না।

তাহার পর অধিকতর বিড়ম্বনা গত বৎসর হইতে। আমার ঘরের কাছে সাহিত্য-সম্মিলন করিতে সারদাবাবু সঙ্কল্প করিলেন ; আমি রোগশয্যায় শায়িত, শয্যাপার্শ্বে সারদাবাবু আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলেন,—আমি তাঁহাকে 'না' বলিতে পারিলাম না, স্বীকার করিলাম। সেই সম্মিলনের দিন হইতে রাশি রাশি পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা আসিতে লাগিল। আমি সামান্য লোক,—আমার সাহিত্যের সেরেস্তা নাই, ভাণ্ডার নাই ; যে গ্রন্থগুলি আছে, তাহারই সুশৃঙ্খলায় স্থান সংকুলান করিতে পারি না। সুতরাং অজস্র পুস্তকাগমে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। কতক হারাইয়াছে ; কতক বিশৃঙ্খলায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে, যেগুলি সম্মুখে পাইয়াছি, আপনারা অনুমতি করিলে, আপনাদের সম্মুখে সেগুলির একটু আধটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতে পারি।

এটা যদি দস্তর হয়, দস্তর দুরন্ত হইল ; আর যদি দস্তর না হয়, গোস্তাকি মাফ্ করিবেন।

প্রথমেই স্ত্রীলোকের লেখা পুস্তকের কথা বলিতে হইতেছে। তিনজন সম্ভ্রান্ত মহিলার লিখিত চারিখানি পুস্তক পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণকন্যা, একটি বৈদ্যকন্যা, আর একটি কায়স্থকন্যা। ব্রাহ্মণকন্যা অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র" নামে একখানি গল্পের বই। বৈদ্যকন্যার "সৃষ্টি রহস্য' নামে একখানি অতি গম্ভীর দর্শনের পুস্তক, আর কায়স্থকন্যার একমাত্র পুত্রের অকাল বিয়োগে "মর্ম্মভেদী" ক্রন্দন ; এই সকল গ্রন্থের কোন সমালোচনা সম্ভব নহে।

দুইখানি এতদঞ্চলের মুসলমান লিখিত গ্রন্থ। একখানি "কারবালা" বা মহরমের যুদ্ধের বিবরণ। নোয়াখালি মাইজদী হইতে শ্রীআবদুলবারি প্রণীত ; আর একখানি ভোলার মোজাম্মেল হক্ প্রণীত "জাতীয় মঙ্গল," দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ সালে মুদ্রিত ; দুইখানিই কবিতাময় ; কবিতাগুলি সরল ও ভাবপ্রবণ।

চট্টগ্রাম পটিয়ার শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত ১৩১৮ সালে প্রকাশিত "সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান" নামক বৃহৎ অবয়বে ৪০০ পৃষ্ঠায় পদ্যময় পুস্তক। পদ্যের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, পরিচয় স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হিন্দুর আদিম কীর্ত্তি গায় রামায়ণ,
মধ্যকীর্ত্তি করে মহাভারত বর্ণন,
শেষ কীর্ত্তি রাজস্থান এ লঘু ভারত।
যেমতি বিচিত্র তাহা পবিত্র মহৎ।"

সম্প্রতি চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকারের চারিখানি পুস্তক পাইয়াছি। এই গুলি এই সম্মিলনের প্রথম ফল। আর নবীনচন্দ্রের "আমার জীবন" চতুর্থ ভাগ পাওয়া গিয়াছে। "বঙ্গদর্শনে" কয় খণ্ডেরই আলোচনা করিয়াছি, এই চতুর্থ খণ্ডেরও করিব।

ইতিহাস চারিখানি ও জীবনী একখানি পাইয়াছি। ইতিহাস, প্রকৃত ইতিহাস বাঙ্গলায় দুর্ল্লভ পদার্থ। প্রথমেই "গৌর রাজমালার" নাম করিতে হয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ; স্বয়ং ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার সম্পাদক। তাঁহার সম্পাদকতায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বড়ই আনন্দের বিষয়। কিন্তু "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই রাজমালার বিস্তর ভ্রম বা অনবধানতা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে যেন বোধ হয় যতটা শ্রম বা যত্ন করিলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আরও নির্দ্দোষ হইতে পারিত ততটা যত্ন করা হয় নাই। বিনোদবিহারী রায় স্বয়ং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকের ৫৬ খণ্ড ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। "ঢাকার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। এই গ্রন্থে অগাধ পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণে ইঁহাকে উৎসাহ দিলে, আমরা আনন্দিত হইব। 'বারভূঞা' বা ষোড়শ শতাব্দে বাঙ্গলার ইতিহাস— শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। অতি উত্তম গ্রন্থ। শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়াকাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস

পালিতের 'গম্ভীরা' সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছে। ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'রাজ-তপস্বিনী' নামে মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর লেখা।

এই বৎসর বিজয়গুপ্তের "ম নসামঙ্গল" গ্রন্থের সচিত্র তৃতীয় প্রচার (বা সংস্করণ) পাইয়াছি। বিজয়গুপ্তের ভণিতা ছাড়া আর পাঁচ জন কবির ভণিতা মঙ্গল মধ্যে আছে সুতরাং এখানি খাঁটি বিজয় গুপ্তের গ্রন্থ না বলিলেও চলে। কানা হরিদত্ত যে বিজয় গুপ্তের অঞ্চলে প্রথম মনসামঙ্গল রচনা করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে। কাব্যে দেখা যায়, রজক-কুমারী নেতা বিষহরির সখী মন্ত্রণাদাত্রী এবং গুরুর মত; তিনি এই পদ কিরূপে পাইলেন, গ্রন্থ-সম্পাদক তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে অন্য গ্রন্থের আভাস ইহাতে আছে। সে কোন্ গ্রন্থ? সম্পাদক এই সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

আর একখানি প্রাচীন পুস্তক আমরা পাইয়াছি, দ্বিজ কমললোচন প্রণীত "চণ্ডিকা-বিজয়"; শ্রীপঞ্চানন সরকার সম্পাদিত ও রঙ্গপুর-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। সন ১২ ৮ সালের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে এই গ্রন্থ মুদ্রিত সম্পাদন-কার্য্য সুন্দর হইয়াছে।

এইবার কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের কথা বলিব। প্রথমেই প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কথা বলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী এই বৎসর প্রচার-কার্য্যে অধিকতর উৎসাহশীল হইয়াছেন; প্রভুপাদই সম্পাদক। তাঁহার সম্পাদনে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "প্রার্থনা", পৌষ মাসে ঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", আর মাঘ মাসে শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বিরচিত "শ্রীমনঃ-শিক্ষা" প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন নির্ব্বাচন তেমনই সম্পাদন হইয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি একেবারে হীরার টুকরা।

তাহার পর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থাবলির কথা বলিতে হয় সকল গ্রন্থ আমি পাই নাই; দুই খানি পাইয়াছি, "শ্রীরায় রামানন্দ" ও "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ"। গ্রন্থ দুইখানি অতুল্য; গূঢ় ভজনগানের অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল পুস্তক-দ্বয়ে নিহিত আছে। আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থূল কথার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি মাত্র, একটু একটু বুঝি 'নামে রুচি, জীবে দয়া,' আমরা এই সকল সূক্ষ্ম কথার সমালোচনা করিতে পারি না।

আরও একখানি "বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী-প্রণীত উপহার পাইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝি না, মোটা বুদ্ধিতে মোটা কথা বলিতেই ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিণী সভার সহিত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের কোন সংস্রব নাই, অথচ মুসলমান মৌলবী এই সভায় বক্তৃতা করেন,—এটা কিরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। ইহা কি সঙ্কীর্ণ ঔদার্য্য, না স্বেচ্ছাচার?

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, কর্ত্তৃক "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" (সচিত্র) সংস্কৃত

মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর। ইহাতে ১১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা আছে, সেও এক অপূর্ব্ব পদার্থ। সম্পাদক-অনুবাদকের শ্রম সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সমালোচকের জয়দেবকে আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিপ্রণীত "রাস লীলা" অতি সুন্দর অথচ নিপুণ ব্যাখ্যান গ্রন্থ। আমাদের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত "শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থ এইখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান্ প্রকৃতই ভক্ত,—শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীচৈতন্য দেবের কাঁথাখানি, পুঁথিখানি ও কমণ্ডলুটি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমানের জয় হউক।

দুই তিনজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থাবলি এই বর্ষে আমাকে উপহার দিয়াছেন; তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি গৌরবান্বিত। গতবৎসর সম্মিলনের সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ আমাকে এক রাশি পুস্তক উপহার দেন। ১৬ খানি নাটক, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে তাহার মধ্যে "প্রতাপাদিত্য" নাই। এক দিন আমি আলিপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস মেলায় তাঁহার প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিয়াছিলাম, মোহিত হইয়াছিলাম। নাটকগুলির নাম আর উল্লেখ করিলাম না। ক্ষীরোদবাবুর "নারায়ণী" উপন্যাস সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। "বিরাম-কুঞ্জে" কয়েকটি ছোট গল্প আছে, সেগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। "দুর্গা" চণ্ডীর গল্পকথা। বড় সুন্দর। আমার নয় বৎসরের দৌহিত্রীকে পড়াইয়াছি,—সমস্ত বুঝে নাই, কিন্তু সে একেবারে মোহিত হইয়াছে।

কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন অনেক দিন হইতে সুকবি বলিয়া বাঙ্গলায় সুপরিচিত। তাঁহার কবিতার রস উপভোগ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই বৎসর তিনি আমাদের ভাগ্যগুণে তাঁহার সমস্ত কবিতা বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কতকগুলির নাম "গোলাপগুচ্ছ." "অশোকগুচ্ছ" ইত্যাদি; কতকগুলি মঙ্গল গ্রন্থ "অপূর্ব্ব শিশু মঙ্গল," "হরি মঙ্গল" ইত্যাদি। আরও তিনখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ আছে, "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা," "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা" ও "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য;" মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা," "ব্রজাঙ্গনা" আর রবি কবির "নৈবেদ্য" উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ; তবে দেবেন্দ্রনাথের এগুলিও অপূর্ব্ব বটে। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন মজুমদার "দেবেন্দ্র-মঙ্গল" লিখিয়াছেন; বলিতেছেন—

"সার্থক সাধনা তব, হে কবিপ্রবীণ,
তপ-পূজা পুরোহিত তুমি মহাব্রতী!
চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ,
তাই দেব করিলাম তোমার আরতি।"

বাস্তবিক কবি দেবেন্দ্রনাথ আরতি করারই উপযুক্ত।

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের অনেকের সাহিত্য গুরু স্বর্গগত অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। ইনি আটখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি সকলগুলি এখনও পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। "বেণু ও বীণার" 'আরম্ভে' কবি কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন,

"বাতাসে যে ব্যথা যেতে ছিল ভেসে ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে।
লুকান যা ছিল অগাধ অচল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে!"

Lyric কাব্যের অতি সুন্দর পরিচয় নয়?

"হোমশিখার" প্রথমেই "সবিতা" কবিতার একটি নান্দী পংক্তি আছে,

"ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়,
রমণীয় দীপ্তি দেবতায়,
আমাদের বুদ্ধি বিধাতায়।"

হোম-শিখার সুন্দর নান্দী। তাহার পর "তীর্থ-সলিল" ও "তীর্থ-রেণু," কবি-প্রদত্ত পরিচয়—

"বিশ্ববাসীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভরেছি আমার সোণার কলস নানা তীর্থের জলে।"

"ফুলের ফসলের" আগম-বাণী আরও মনোহর, পয়গম্বর মহম্মদের কথা।

"জোটে যদি একটি পয়সা,
থাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে, তবে অর্দ্ধেকে,
ফুল কিনিও হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল-তণ্ডুল,
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল,
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা।"

"চীনের ধূপ" গদ্য গ্রন্থ। চীনের উপনিষৎ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। "কুহু ও কেকাতে" আমরা কুহুই পাইলাম, কেকা পাইলাম না! "দৃষ্টিহারা," "নিধিধ্যান" প্রভৃতি চারিখানি নাটক আছে। "দৃষ্টিহারা" পড়িয়া দিশেহারা হইয়াছি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিদেশের বিশেষ কথা বুঝিতে পারি না।

"ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"— শ্রীতারাকিশোর শর্ম্ম-চৌধুরী প্রণীত। গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান নাই বলিয়া এবং ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি ভদ্রসন্তান নিতান্ত অনাচারী হওয়াতে ব্রহ্মবাদ সাধারণ লোকের কাছে অনাদরণীয় হইয়াছে; প্রকৃত ব্রহ্মবাদ যে কি, তাহা শুনিতেও লোকের স্পৃহা নাই। এমন দিনে এই গ্রন্থের নামকরণ যে সময়োপযোগী হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। নতুবা এই গ্রন্থের মত গ্রন্থ বহুদিন দেখি নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গলা ভাষা শাস্ত্র-সমন্বিতা হইয়াছেন, আর চৌধুরী মহাশয় সকলের পূজনীয় হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে গত বৎসর সাহিত্য-সেবীদিগের নিকটে আমি পরিচিত করিয়া দিই। এখন তিনি সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। এ বৎসর তাঁহার "শিক্ষা-সমালোচনা", "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" ও "সাধনা" প্রকাশিত হইয়াছে। সকল গুলিতেই গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধমূলক শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত "অনুসন্ধান" নামক পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রকৃতির পরিচয়" ও "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। এইরূপ গ্রন্থ বাঙ্গলায় যত প্রকাশিত হইবে, ততই ভাল।

"ভারতের শিক্ষিত মহিলা"—শ্রীহরিদেব শাস্ত্রি প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন কালের

এবং এখনকার দিনের বিখ্যাত ভারত-মহিলার চরিত্রের পরিচয় আছে। শিক্ষিত বঙ্গমহিলার এখানি সুপাঠ্য পুস্তক, পড়িলে জ্ঞানের সঙ্গে আমোদ পাইবেন।

"সনাতন ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান-সমিতি" শ্রীহরিচরণ রায় এম, এ প্রণীত। থিয়সফির গ্রন্থ। থিয়সফিষ্টগণ একটি পৃথক্ সম্প্রদায় গঠন করিতে গিয়া এবং মহাযাদুকরী 'বলবৎ-সখী'কে সম্প্রদায়-কর্ত্রী করিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের মত বেশ ভাল। তবে উহার মধ্যে যে creed বা বিশেষ বিশ্বাসের পদার্থগুলি আছে, তাহা ত্যাগ করিলেই ভাল হয়।

"সামাজিক সমস্যা", প্রথম খণ্ড; শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সমস্যার শেষ কথা হইতেছে,—"অনেক প্রাচীন নিয়ম-পদ্ধতিগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে, তাই অবলম্বিত পন্থাগুলি ঠিক কার্যাক্ষম হইতেছে না। বরং স্থলবিশেষে উপহাসের কারণ হইতেছে। দশ দিক দেখিয়া শুনিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অনেকগুলি সুলিখিত প্রয়োজনীয় পুস্তক সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই ম্যালেরিয়া-প্রবণদেশে, চিকিৎসা পদ্ধতির বিপর্য্যয় সময়ে, এগুলি বিশেষ উপকারী এবং উপযোগী। (১) 'পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা' ষষ্ঠ সংস্করণ। (২) 'সুসন্তান লাভের উপায়' সন্তান যদি লাভ হইল তাহার পর (৩) 'শিশুপালন ও চিকিৎসা'। শিশুদের ব্যাপার হইল তাহার পর(৪) 'স্ত্রীশিক্ষা', শেষ (৫) 'মাতার প্রতি উপদেশ,' গ্রন্থকার বলিতেছেন "আর্য্য মহর্ষিরা বিজ্ঞানের যে উচ্চ শিখিবে আরোহণ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই এইটি দেখাইবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ও শ্লোকের নিম্নে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"রাঙ্গা দেবীদাস", শ্রীসত্যরঞ্জন রায় এম, এ প্রণীত একখানি উপন্যাস। গ্রন্থকারের ভাষার উপর অধিকার জন্মিয়াছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য উৎসুক রহিলাম। "মৃত্যু মিলন" শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস। হেমেন্দ্র বাবু সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, তথাপি বলিতে পারি না যে, তাঁহার "মৃত্যু-মিলন" সফল হইয়াছে। পত্নীর সামান্য ভ্রান্তিতে হিন্দুপতির চিরজীবন বিচ্ছিন্ন সংস্থান —যেন কেমন কেমন লাগে, একটু বিলাতী বিলাতী বোধ হয়।

আমার সাহিত্য পরিচয় নিতান্ত নীরস হইতেছে। এইবার একবার শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'পঙ্ককমালা' হইতে 'কৌতুক'-পঙ্ককের চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিই।

"প্রণাম করো খোপা নেড়ে,
(আমি যাবো বোকা মেরে)
দেহের বর্ণ স্বর্ণ ভূষায় উজল করে খাঁটি।
বুঝব আমি,—নারীর ফুল্ল
দীপ্তি বাড়ায় সাড়ীর মূল্য
প্রীতির তত্ত্বে গীতার অর্থ একেবারে মাটী।"

এই সময়ে শ্রীযুক্ত রসময় লাহার "পুষ্পাঞ্জলি" "আরাম" ও "ছাই-ভস্মের" উল্লেখ করি। ছাইভস্মের পরিহাস

কবিতাদি বেশ সুন্দর। বাঙ্গলায় পরিহাস-রস শুকাইয়া যাইতেছে, রসময় রস রক্ষা করিলে আমরা চরিতার্থ হইব, তাঁহার নাম সার্থক হইবে।

"কালিদাসের গীত।"—শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী প্রণীত। ব্যাখ্যাভাবে বর্ণনা উত্তম।

"সদালাপ।" শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বহু মহাপুরুষের চরিত্র-চিত্র ও উক্তি-কণা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বালক বালিকার চরিত্র-গঠনে সহায় হইবে।

কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা"—পত্নীবিয়োগে শান্তি অন্বেষণ অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। পড়িতে পড়িতে মন পরিষ্কার হয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মায়। শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে,—ইহা কবির কম গৌরবের কথা নহে। আরও অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা পুস্তক পাইয়াছি। সে গুলির আর খুঁটাইয়া পরিচয় দিবার "অবসর নাই। তবে" শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝরা ফুল' ভাল লাগিয়াছে, আর বালক পাঠ্য "ভগীরথ" অতি সুন্দর চিত্র এবং কৃত্তিবাসের বিবরণ-সম্বলিত অতি উত্তম পুস্তক, আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত বালিকা-পাঠ্য "ঠানদিদির থলে" বা বাঙ্গলার ব্রত-কথা অতি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক,—ইহার চিত্রগুলিও বেশ,—এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয় গত বর্ষে আমাদের সম্মিলনে উপস্থিত হন এবং অধমের গৃহে পদার্পণ করেন। তিনি "প্রবন্ধাষ্টক" ও "হেড়ম্ব-রাজ্যের দণ্ডবিধি" নামে দুইখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ খানিতে শিখিবার বিষয় আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "শীশ্ মহল," ঐতিহাসিক উপন্যাস অনেক দিন আমার কাছে রহিয়াছে। হইয়াছে কি জানেন? কোন হিন্দু বাঙ্গালির লেখা মুসলমানি চরিত্র দেখিলে, আমার একরূপ আতঙ্ক হয়। আয়েষা জগৎ সিংহকে ভাল বাসিল—বিধর্ম্মী বলিয়া মনে একটু 'কিন্তু' হইল না? এই সকল পড়িয়া আমার আতঙ্ক হয়। শীশ্ মহলের সমালোচনা করিতে তাই পারি নাই।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসের "আলেখ্য" "সোণাবিবি" ও "বৌ"। "বৌ" অতি উত্তম গ্রন্থ; নবীনা কুলবধূ মাত্রেরই পড়া উচিত। শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ প্রণীত "কাদম্বিনী" (১৩১৮) ও "শরতের পূর্ণচন্দ্র" (১৩১৯), পরে পরে ভাল হইতেছে; অদ্ভুত ঘটনা-সমাবেশ কমাইলে ক্রমে আরও ভাল হইবে।

বহুতর গ্রন্থের নানাবিধ রস চাকিয়া আমাদের মুখ মারিয়া গিয়াছে। আসুন, সর্ব্বশেষে ফকিরের সুরসাল "নবান্নের" নব রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

নিমাই-চরিত্র

—*—

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্ম হরিদাস

অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে আর একজন মহাপুরুষ আসিয়া গোরের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার নাম হরিদাস। হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, তিনি বূঢ়ন গ্রামে এক যবনের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান, তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ব্রহ্ম, তাঁহার জন্মের ছয় মাস পরে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন এবং এক সন্তানবৎসল মুসলমান তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করেন। হরিদাস যবনসন্তানই হউন অথবা ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভবই হউন, তিনি যে শৈশবে যবন-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াও হরিদাস পরম হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতিপালক (অথবা পিতা) প্রথমতঃ ইস্লামধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। গৃহতাড়িত হরিদাস বেনাপোল নামক স্থানের গভীর অরণ্যের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন গৃহে তিনি অধিকাংশ সময়ই ভজনে অতিবাহিত করিতেন। রাত্রি দিনে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। নিকটস্থ গ্রাম-বাসিগণ তাঁহার নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অযাচিত সম্মান হরিদাসের তপো-বিঘ্নের কারণ হইল। তত্রত্য জমিদার রামচন্দ্র খাঁ পরম অত্যাচারী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। ভক্ত হরিদাসের প্রতি সাধারণের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে অপ-মানিত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন দুর্বৃত্ত এক পরম রূপবতী বারাঙ্গনাকে সাধুর তপোভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল। কুলটা নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া হরিদাসের কুটীরে গমন করতঃ প্রেমপূর্ণস্বরে

তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিল। হরিদাস শান্তস্বরে কহিলেন "এখনও আমার তিন লক্ষ নাম জপ সম্পূর্ণ হয় নাই; নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব। ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।" রমণী বসিয়া রহিল, কিন্তু হরিদাসের নামসংখ্যা পূর্ণ হইতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল

রমণী প্রস্থান করিল। কিন্তু পুনরায় পর রজনীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিদাস কহিলেন "গত রজনীতে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। তজ্জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, আজি আমার কীর্ত্তন শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আজি তোমার অভিলাষ নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।" তখন সেই পতিতা রমণী গত রজনীর মত দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে দুই একবার তাহার মুখেও হরিনাম স্ফুরিত হইয়া উঠিল। হরিদাসের নাম কীর্ত্তনে নিশা অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী বিফল-মনোরথ হইয়া সেদিনও প্রস্থান করিল। তৃতীয় রাত্রিতেও যথাসময়ে রমণী আসিয়া হরিদাসের কুটীরদ্বারে সমাগত হইল এবং দ্বারে বসিয়া ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত হরিনাম শুনিতে লাগিল। নাম শুনিতে শুনিতে পতিতার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার কণ্ঠে হরিনাম বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সে সাধুর চরণতলে পতিত হইয়া রামচন্দ্র খাঁর দুর্বৃত্ততার কাহিনী বিবৃত করিল, এবং স্বকীয় পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। হরিদাস কহিলেন "আমি সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ যে পাপ করিয়াছে তজ্জন্য তাহার উপর আমার ক্রোধ হয় না। আমি তোমারই জন্য এ তিন দিন এখানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করতঃ আমারই এই কুটীরে বসিয়া একমনে হরিনাম জপ এবং তুলসীর সেবা কর, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে দয়া করিবেন।" রমণী তাহাই করিল। সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে একবস্ত্রা হইয়া সেই কুটীরে বাস করতঃ সে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিল। তাহার ইন্দ্রিয় দমিত হইল, প্রেম প্রকাশিত হইল। দেশবিদেশে পরম বৈষ্ণবী বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রচারিত হইল।

সেই অরণ্য হইতে হরিদাস চাঁদপুরে চলিয়া গেলেন এবং তথায় বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলরাম সপ্তগ্রামের ধর্ম্মশীল জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন-দাসের পুরোহিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন হরিদাসের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সেই গ্রামে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ এই স্থানে, হরিদাসের দর্শন লাভ করিয়া পরম ভক্তিমান্ হইয়া উঠেন। একদিন বলরামের সহিত জমিদারের সভায় গমন করিয়া হরিদাস নামমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে কহিলেন "নামের ফল—কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমোৎপত্তি, পাপক্ষয় ও মোক্ষ নহে। মুক্তি নামাভাসেই হইয়া থাকে।" সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী

নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরিদাসের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আপনারা এই ভাবুকের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিবেন না। কোটীজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তিলাভ হয়, এই ব্যক্তি বলিতেছে, নামাভাসে সেই মুক্তি হয়, এও কি কখনই সম্ভব?" হরিদাস কহিলেন "শাস্ত্রেই ত আছে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়। ভক্তি-সুখের নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বলিয়াই ভক্তগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না।' গোপাল তখন বলিয়া উঠিল, নামাভাসে যদি মুক্তি হয়, তবে আমার নাক কাটিব।" হরিদাসও দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন "যদি না হয় তবে আমার নাক কাটিব।" সভাসদ্ সকলে গোপাল চক্রবর্ত্তীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গোপাল জমিদারের আরিন্দাগিরি করিত। সে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম-চ্যুত হইল। কিন্তু হরিদাস কহিলেন "আমার এ ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্রও ক্রোধ নাই; তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নামের মহিমা বুঝিতে পারে না।" ইহার কিছুকাল পরে গোপাল কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল।

কিছুকাল চাঁদপুরে অবস্থান করিয়া হরিদাস কুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাকার মুসলমান কাজী তাঁহাকে নানাপ্রকারে উৎ-পীড়িত করিতে লাগিল এবং অবশেষে বাদশাহের নিকট তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, তিনি মুসলমানধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাদশাহ লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে হরিদাস বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস বন্দিশালায় প্রেরিত হইলেন। তথায় অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সাধু দেখিয়া প্রণাম করিলে, হরিদাস কহিলেন "যেরূপ আছ তেমনি থাক।" বন্দিগণ আশীর্ব্বাদচ্ছলে এই অভিসম্পাত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তখন হরিদাস কহিলেন "আমি আশীর্ব্বাদই করিয়াছি। এই বন্দিশালায়—হিংসা নাই, প্রজার পীড়ন নাই, এখানে আছে কেবল বিপন্নের শরণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-ভিক্ষা। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছি এই বন্দি-অবস্থায় তোমরা যেরূপ একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—বন্ধনমুক্ত হইয়াও তোমরা তদ্রূপই একাগ্র ভাবে হরি-গুণ ভজনা কর।"

পর দিন হরিদাস বাদশাহ-দরবারে নীত হইল—বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অতি মিষ্ট বচনে তাঁহাকে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিদাস বাদশাহের বচন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "অহো বিষ্ণুমায়া।" অনন্তর হিন্দু ও মুসলমানের যে একই ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বরের প্রেরণাতে যে তিনি হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, বাদ-শাহকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহ হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রথমে কতকটা শান্ত হইলেন বটে – কিন্তু ধর্ম্মান্ধ কাজীর প্ররোচনায় অবশেষে হরিদাসকে কহিলেন, ইস্লামানুমোদিত আচরণ অবলম্বন না করিলে তিনি তাহার শাস্তি বিধান করিবেন; হরিদাস নির্ভীক

ভাবে উত্তর করিলেন "ঈশ্বর যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ,

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন "এই দুর্ব্বৃত্তকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া বধ কর; যদি নিদারুণ বেত্রাঘাতেও প্রাণান্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব এ যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য।" রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। পাইকগণ হরিদাসকে ধরিয়া বাজারে বাজারে প্রকাশ্য ভাবে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। জনসাধারণ সাধুর অপমানে ক্ষুণ্ণ হইয়া বাদশাহ ও উজীরকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। কিন্তু হরিদাস নির্ব্বিকার; তিনি তখন স্বীয় আরাধ্য দেবতার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানহীন, ঘাতকগণের আঘাত তাঁহার শরীরে লাগিল না। যে সকল হতভাগ্য তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল, কেবল তাহাদের জন্যই তাঁহার প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ, এই দুর্ভাগ্য রাজভৃত্যদিগকে দয়া কর, আমার উপর যে দ্রোহাচরণ করিতেছে, তজ্জন্য যেন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে না হয়।" পাইকগণ যখন দেখিল, তাহাদের প্রহারে হরিদাসের কিছুই হইল না, তখন হরিদাসকে কহিল "হরিদাস, তোমার প্রাণ নাশ করিতে আমাদিগের উপর আদেশ হইয়াছে, কিন্তু এত প্রহারেও যখন তোমার প্রাণ বহির্গত হইল না তখন কাজীর হাতে আর আমাদের নিস্তার নাই।" দয়ালু হরিদাস কহিলেন "আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের অনিষ্ট হয়, তবে আমার জীবিত থাকিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া যোগী হরিদাস ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। পাইকগণ তাঁহার নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া বাদশাহসমীপে উপস্থাপিত করিল। বাদশাহ সেই দেহ কবরস্থ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুষ্ট কাজীগণ প্রতিবাদী হইয়া বলিয়া উঠিল "পাপিষ্ঠ মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ অবলম্বন করিয়াছিল; উহার দেহ কবরস্থ করা সঙ্গত নহে। নদীতে লইয়া উহাকে ফেলিয়া দেও।" হরিদাস গঙ্গাবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভাগীরথীর তরঙ্গচঞ্চল বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে হরিদাসের জ্ঞান ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সন্তরণপূর্ব্বক তীরে উঠিয়া বাদশাহ-দরবারে গমন করিলেন। বাদশাহ স্তম্ভিত হইলেন। সভাসদ্গণ নির্ব্বাক হইয়া চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অসাধারণত্ব প্রমাণিত হইল। বাদশাহ সভাসদ্গণ সহ দণ্ডায়মান হইয়া হরিদাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন।

বাদশাহ-দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। ফুলিয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রেমবিহ্বল হরিদাস প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে কহিলেন, 'ভক্তগণ আমার জন্য দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই, জীবনে ঈশ্বরনিন্দা অনেক শুনিয়াছি, তাই ঈশ্বর রাজদরবারে আমার শাস্তি সংঘটন করিয়া দিয়াছেন। পাপের তুলনায় শাস্তি আমার সামান্যই হইয়াছে।"

গঙ্গাতীরে এক গোফা নির্ম্মাণ করিয়া হরিদাস তথায় সাধন-ভজনে নিমগ্ন রহিলেন।

সেই গোফার নিম্নদেশে এক বিষধর সর্প বাস করিত। অনেকে সেই গোফায় হরিদাসের দর্শন লাভার্থ গমন করিয়া সেই বিষধরের গাত্রনিঃসৃত তীব্র জ্বালা অনুভব করিত। কিন্তু কারণ অনুমান করিতে পারিত না। অবশেষে কয়েক জন বৈদ্য গোফা পর্য্যবেক্ষণ করতঃ প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া হরিদাসকে সেই গোফা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস অনুরোধ শুনিয়া কহিলেন "অনেক দিন যাবত আমি এই গুহায় বাস করিতেছি, কিন্তু কোনও দিন কোন জ্বালা অনুভব করি নাই। তবে তোমরা যখন এখানে আসিতে পারিতেছ না, তখন এ গুহা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। দেখি যদি মহানাগ এই গুহায় নিশ্চিতই থাকেন, তাহা হইলে আগামী কল্যই তিনি ইহা ত্যাগ করিয়া যাইবেন। যদি না যান তখন অন্যত্র যাইব।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে সকলে দেখিতে পাইল, এক ভীষণ সর্প গর্ত্ত হইতে উঠিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল।

"ডঙ্ক" নামক এক শ্রেণীর নর্ত্তক সর্ব্বাঙ্গে অহিভূষণ ধারণ করিয়া নৃত্যগীত করিত, এবং জনসাধারণ তাহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। ফুলিয়া গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে একদিন ডঙ্কের নৃত্য ও কালীয়দহে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীত হইতেছিল। হরিদাস নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। নৃত্যপর ডঙ্ক ভাবাবিষ্ট হরিদাসকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সভার একধারে দাঁড়াইয়াছিল। সেই সভায় এক নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ ছিল। সে হরিদাসের প্রতি সকলের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল "হরিনাম করিয়া নৃত্য করিলেই ত সকলে ভক্তি করে। আমিও যদি হরিদাসের মত বিহ্বল ভাব দেখাইতে পারি, আমাকেও সকলে ভক্তি করিবে।" এই ভাবিয়া সে ভাবাবেশের ভাণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। কিন্তু এবার ডঙ্ক স্বীয় নৃত্যের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করিয়া রুষ্ট হইয়া উঠিল এবং সেই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জ্জরিত ব্রাহ্মণ "বাপ বাপ" বলিয়া পলায়ন করিল। তখন সকলে ব্রাহ্মণকে প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ডঙ্ক কহিলেন "ও লোকটী ভাবাবেশের ভাণ করিয়াছিল, তাই তাহাকে প্রহার করিলাম। উহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে হরিদাসের সমান হইতে চায়। কৃষ্ণ যাঁহার হৃদয়ে নিরবধি ভক্তিডোরে আবদ্ধ, তিলাদ্ধের জন্য যাঁহার সঙ্গ আশ্রয় করিয়া লোক কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়, মূর্খ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রাপ্য সম্মানে লোভ করে!

জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এ সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

হরিদাস উচ্চকীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তন-দ্বেষিগণ তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিত। এক দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ এক দিন তাঁহাকে কহিল "হরিদাস, মনে মনে কি হরিনাম জপ করা

যায় না? তবে চেঁচাইয়া সকলকে উত্যক্ত কর কেন?" হরিদাস বিনীত ভাবে কহিলেন "আপনাদের কাছেই ত আমি হরিনামের মাহাত্ম্য শিখিয়াছি। আপনাদের নিকটই শুনিয়াছি—শাস্ত্রে বলে উচ্চরবে হরিনাম করিলে শত গুণ পুণ্য হয়, উচ্চ করিয়া হরিনাম করিলে পশুপক্ষীকীটও হরিনাম শুনিতে পাইয়া কৃতার্থ হয়। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "কলিকালে হরিদাস হইয়াছেন দর্শন-কর্ত্তা।"

ফুলিয়া হইতে হরিদাস শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে হরিদাস উপস্থিত হইবামাত্র আচার্য্য তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করতঃ সাধনভজনার্থ গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য এক গোফা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই নির্জন গোফায় এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে হরিদাস নামকীর্ত্তনে নিরত আছেন, এমন সময় এক পরম রূপবতী রমণী তথায় উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করিল। হরিদাস অবিচলিত ভাবে কহিলেন "আমার সংখ্যামত নামকীর্ত্তন সমাপ্ত না হইলে, আমি কোনও কার্য্য করি না। তুমি দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া নাম গান শ্রবণ কর। কীর্ত্তনান্তে তুমি যাহা বল তাহা করিব।" বেণাপোলের কুটীরে পূর্ব্বোক্ত রমণীর ন্যায় নবাগত রমণীও ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি আগমন করিল; প্রতি রাত্রিই হরিদাসের কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইল। তৃতীয় রাত্রিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রমণী কহিল "বৃথা আশ্বাসে তুমি তিন দিন আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, রাত্রিদিনেও তোমার নাম শেষ হয় না।" হরিদাস বিনীত ভাবে কহিলেন "তোমার কষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু আমিই বা নিয়মভঙ্গ করি কি রূপে?" রমণী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "ঠাকুর! আমি মায়া, তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। ব্রহ্মাদি সকলকেই আমি মোহিত করিয়াছি, তুমিই কেবল আমাকে অতিক্রম করিলে। মহাভাগবত তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণ উপদেশ কর।" হরিদাস তাহাকে যথোচিত উপদেশ দান করিলেন।

হরিদাস যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন গৌরচন্দ্র অল্পে অল্পে নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌরকর্ত্তৃক আহূত হইয়া আচার্য্য নবদ্বীপে গমন করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাসও অচিরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাত প্রহরিয়া ভাব

একদিন সমাগত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া গৌরচন্দ্র কহিলেন "আমরা দিবাভাগেই হরিনাম করিতেছি, কিন্তু রাত্রিগুলি বৃথা অতিবাহিত হইতেছে; আজি হইতে রাত্রিতেও কীর্ত্তন করা যাউক।" ভক্তগণও তাহাই চাহিতেছিলেন, তাঁহারা সানন্দে গৌরের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। প্রতি নিশায় শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কোনও কোনও রাত্রিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের

অদ্বৈত, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, মুরারী, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান্, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় প্রভৃতি কত ভক্তই কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। ভক্তকণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনি নৈশ আকাশে সমুত্থিত হইত; পাষণ্ডগণ তাহা শুনিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল "বৈষ্ণবগণ মধুমতী সিদ্ধিলাভ করিয়া মন্ত্রবলে পঞ্চকন্যা আনয়ন করতঃ নিশাকালে তাহাদের সহিত আমোদপ্রমোদ করে।" বিদ্বেষ্টাগণের নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনে রত রহিলেন।

কীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই গৌর ভাবাবেশে মত্ত হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চরণ শিথিল হইয়া পড়িত, এবং সময় সময় এমন ভাবে ভূপতিত হইতেন যে, তাহা দেখিয়া শচীদেবী আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। পুত্রবৎসলা জননী কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেন—

কৃপা কর কৃষ্ণ মোরে এই দেহ বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানে সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥

যত দিন যাইতে লাগিল, কীর্ত্তনের প্রগাঢ়তাও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল. ক্রমে বিবিধ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি অনেকে অনেক সম্প্রদায় গঠন করিলেন। কীর্ত্তন কালে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হইত, তাহা বর্ণনাতীত। দলে দলে লোক তাহা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিত, কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে পারিত না। পাষণ্ডীগণও কীর্ত্তন শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রবেশ করিতে না পাইয়া বিষম রুষ্ট হইয়া উঠিত। এখন তাহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল "দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না, বেটারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে। এত ভাল ছেলে নিমাই পণ্ডিত, এই সমস্ত বদমায়েসের দলে মিশিয়া মাটী হইয়া গেল। কোথা হইতে এক জাতি-নাশা অবধূত আসিল, শ্রীবাস দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে স্বগৃহে স্থান দান করিল। বেটাদের স্পর্দ্ধা বড় বাড়িয়াছে, আমরা দেয়ানে নালিশ করিয়া ইহাদের জারিজুরি সব ভাঙ্গিয়া দিব।" কিন্তু নিন্দা ও ভয় প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না। কীর্ত্তন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

গভীর নিশায় এক দিন কীর্ত্তন হইতেছে, ভক্তগণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খোল করতাল ও কীর্ত্তনের রব নবদ্বীপের নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মুক্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় ভক্তমণ্ডলী ভেদ করিয়া গৌরচন্দ্র বিষ্ণুখট্টার দিকে ধাবিত হইলেন। খোল করতাল নীরব হইল, ভক্তগণ বিস্ময়স্তিমিত লোচনে চাহিয়া দেখিলেন, গৌর বিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করিয়া শালগ্রামশিলা অঙ্গে ধারণ করতঃ উপবিষ্ট হইলেন। মড় মড় শব্দে খট্টা কম্পিত হইয়া উঠিল। ত্রস্তব্যস্ত ভাবে নিত্যানন্দ যাইয়া খট্টা স্পর্শ করিলে শব্দ নিবৃত্ত হইল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গৌর বলিতে লাগিলেন—

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ
আমি সেই ভগবান দেবকীনন্দন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী মাঝে আমি নাথ।
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস ॥
তোমা সভা লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ সেই আহার আমার ॥"

তখন প্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইল। গৌর সমস্তই ভোজন করিয়া বলিলেন "আর কি আছে, আনো।" ভক্তগণ ছুটিলেন এবং অচিরেই প্রচুর দ্রব্য সকল আনিয়া প্রভুসমীপে স্থাপন করিলেন; কিন্তু নিমিষেই তাহা উদরস্থ করিয়া গৌর আবার বলিলেন "আরো আন।" আর আনিবে কি? ভক্তগণ ভীত হইয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন "হে বিশ্বম্ভর, তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় উদরে ধারণ করিয়া আছ, আমাদের ক্ষুদ্র উপহার দ্বারা কিরূপে তোমার তৃপ্তি সাধন করিব?" গৌর কহিলেন "ভক্তের উপহার ক্ষুদ্র নহে; তোমাদের যাহা আছে লইয়া আইস, তাহাই আমার পরম প্রিয়।" ভক্তগণ কর্পূর ও তাম্বুল আনিয়া দিলেন এবং ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

ইহার কতিপয় দিবস পরে প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। একে একে যাবতীয় ভক্ত আসিয়া সমাগত হইলেন। গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন-কালে গৌর প্রায়ই দাস্যভাবে আবিষ্ট হইতেন, কখনও কখনও ঈশ্বর ভাবে বিভোর হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেও, অচিরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া যেন অজ্ঞানাবস্থায় না জানিয়া তথায় উপবেশন করিয়াছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আজি নাচিতে নাচিতে তিনি বিষ্ণু-খট্টায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং সাত প্রহর যাবত তথায় বসিয়া রহিলেন। ভক্তগণ যুক্ত করে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। গৌর আদেশ করিলেন আমার অভিষেক-সঙ্গীত গান কর। ভক্তগণ 'সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ' মন্ত্রে গঙ্গাজল দ্বারা তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া গৌরের দেহ চন্দনচর্চ্চিত করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকোপরি এক সুন্দর ছত্র ধারণ করিলেন, অন্য এক ভক্ত চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় দ্বারা যথাবিধি পূজা শেষ করিয়া ভক্তগণ স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। ভক্তদত্ত নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া, গৌর শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, মনে পড়ে একদিন দেবানন্দের টোলে প্রেমরসময় ভাগবত শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া তুমি ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়াছিলে। দেবানন্দের মূর্খ ছাত্র-গণ ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া তোমাকে টানিতে টানিতে বাহির দুয়ারে লইয়া গিয়াছিল, দেবানন্দ দেখিয়াও শিষ্যগণকে নিবারণ করেন নাই। তুমি মনে বড় দুঃখ পাইয়া আবার নির্জ্জনে ভাগবত শুনিতে চাহিয়াছিলে। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার হৃদয়ে আবি-র্ভূত হইয়াছিলাম এবং প্রেমযোগ দিয়া

তোমাকে আবার কাঁদাইয়াছিলাম। সে কথা কি মনে আছে শ্রীবাস?" পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীবাস কাঁদিয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

কোনও ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গৌর বলিলেন "অমুক রাত্রিতে বিপ্ররূপে আসিয়া আমি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম; সে কথা মনে হয় কি?" প্রভুর দয়ার প্রমাণ পাইয়া ভক্ত আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন "গঙ্গাদাস, রাজার ভয়ে সপরিবারে যে দিন তুমি পলায়ন করিয়াছিলে, সে দিনের কথা মনে আছে কি? খেয়াঘাটে নৌকা না দেখিতে পাইয়া তুমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলে। তখন আমিই খেয়ারীরূপে নৌকা লইয়া আসিয়া তোমাকে পার করিয়াছিলাম। গঙ্গাদাস উদ্বেলিত ভাবাবেগে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর গৌর কহিলেন "শীঘ্র একজন গিয়া শ্রীধরকে আমার নিকট লইয়া আইস। খোলা বেচিয়া শ্রীধর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। খোলা বেচা হইতে যে আয় হইত তাহার অর্দ্ধেক নিত্য গঙ্গাপূজায় ব্যয়িত হইত, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দ্বারা শ্রীধর কোনও রূপে দুটী অন্নের সংস্থান করিতেন। সকলে তাঁহাকে খোলাবেচা শ্রীধর বলিয়া ডাকিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শ্রীধর কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। আজি নিজগৃহে শ্রীধর হরিনামে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। ত্বরিতপদে কয়েকজন ভৃত্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভুর আদেশ তাঁহাকে শোনাইল। শ্রীধর আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পদযুগল অচল হইয়া পড়িল। ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গৌরের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। শ্রীধরকে দেখিতে পাইয়া গৌর পরম স্নেহে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "শ্রীধর আমাকে ভাবিয়া তুমি বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ; এজন্মেও প্রচুর খোলা, মুলা থোড় তুমি আমাকে দিয়াছ। আজি আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। তখন

মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমালশ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে বংশী মোহন দক্ষিণে বলরাম।
মহা জ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥

দেখিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌর কহিলেন "শ্রীধর তোমার ডাকে আমি চিরদিন মুগ্ধ; তুমি আমার স্তব কর, শুনি।" বিদ্যালেশ হীন শ্রীধর তখন স্মৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্তোত্র রচনা করিয়া প্রভুর বন্দনা পাঠ করিলেন। অনন্তর গৌর কহিলেন "শ্রীধর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" শ্রীধর কহিলেন "প্রভু আর আমাকে ভাঁড়াইও না, আর ভাঁড়াইতে পারিবে না।" গৌর কহিলেন "না শ্রীধর, তোমাকে বর মাগিতেই হইবে।" তখন শ্রীধর বলিলেন 'যদি একান্তই বর দিবে তবে প্রভু বর দেও

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সাথে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তার চরণযুগল"।

বলিতে বলিতে শ্রীধরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—উর্দ্ধবাহু হইয়া তিনি কেবল

রোদন করিতে লাগিলেন। গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন "শ্রীধর তোমাকে আমি এক বিপুল সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিতে চাই।" শ্রীধর কহিলেন "আমি কিছুই চাই না প্রভু, আমি কিছুই চাই না, আমি চাই কেবল তোমার নাম করিতে। তাহারই অধিকার কেবল তুমি আমাকে দেও।" গৌর কহিলেন "প্রাণাধিক্ শ্রীধর, আমার প্রিয় ভৃত্য শ্রীধর, অষ্টসিদ্ধি, বিপুল সাম্রাজ্য, কত কি আমি দিতে চাহিলাম। তুমি কিছুই চাও না, তুমি কেবল চাও আমাকে। নিষ্কাম ভক্ত, আমি আজি তোমাকে বেদ-শাস্ত্রে ভক্তি-যোগ প্রদান করিলাম।"

কলামূলা বেচা যাহার উপজীবিকা, ধনহীন, বিদ্যালেশহীন সেই শ্রীধর যাহা পাইল, কোটীশ্বর কোটী জন্মেও তাহা প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীধরকে বর দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্বোধন করতঃ গৌর কহিলেন; "আচার্য্য বর প্রার্থনা কর।" আচার্য্য বলিলেন "যাহা চাহিয়াছিলাম সকলই পাইয়াছি, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।" তখন গৌর মুরারিকে কহিলেন, "মুরারি, তোমার অভিলষিত রূপ দর্শন কর।" মুরারি দেখিলেন, দূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র বীরাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার এক-দিকে লক্ষ্মণ, অন্যদিকে সীতা দণ্ডায়মান; বানরগণ যুক্তকরে স্তব পাঠ করিতেছে। দেখিয়া মুরারি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন তাঁহাকে

ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর, 'আরেরে বানরা।
পাসরিলি—তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা॥
তুই তার পুরী পুড়ি করিলি বংশক্ষয়॥
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥
উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান॥"

মুরারি চৈতন্যলাভ করিলে বিশ্বম্ভর কহিলেন, "তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।" মুরারি বলিলেন, "বর দাও প্রভু যেন তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার জীবন অতিবাহিত হয়। জন্মে জন্মে যেন আমি তোমার দাস হইতে পারি। তোমার দাসদিগের মধ্যে প্রতি জন্মে আমি যেন জন্মগ্রহণ করি।" "তথাস্তু" বলিয়া গৌর বর দান করিলেন।

অনন্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "হরিদাস আমার প্রাণ হইতেও তুমি আমার প্রিয়তর। তোমার যে জাতি আমারও তাই। পাপিষ্ঠ যবনগণ তোমায় বড় দুঃখ দিয়াছিল। নগরে নগরে তোমায় মারিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। অত্যাচারকারিগণের শাস্তি বিধান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করিব, দেখিলাম যাহারা তোমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে, মনে মনে তুমি তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করিতেছ। দুর্ব্বৃত্তগণ তোমাকে যে প্রহার করিয়াছিল, তাহা আমারই পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল; এই দেখ এখনও তাহার দাগ রহিয়াছে। তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হইয়াছি। তোমাকে আমি অক্ষয় ভক্তি-ভাণ্ডার দান করিলাম।" প্রভুর সুধামাখা বচনাবলী শুনিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "আচার্য্য, একদিন নিশাভাগে তোমাকে ভোজন করাইয়াছিলাম মনে পড়ে? তুমি গীতার শ্লোকবিশেষে ভক্তিযোগ না

পাইয়া উপবাস করিয়া ঘুমাইয়াছিলে, স্বপ্নে আমি তোমাকে ঐ শ্লোকের ভক্তিসূচক অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কতদিন কত শ্লোকের অর্থ আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি তাহা কি তোমার মনে আছে?" অনন্তর সেই সমস্ত শ্লোক একে একে আবৃত্তি করিয়া অদ্বৈতকে স্তম্ভিত করতঃ গৌর কহিলেন, "আচার্য্য সকল পাঠই তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল এক পাঠ বলি নেই; এখন তাহা শোন। গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এই:

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন গৌর যাবতীয় ভক্তগণকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, "প্রভু আমি কেবল এই চাহি যে তুমি মূর্খ নীচ ও দরিদ্রগণকে কৃপা কর।" কেহ কহিলেন, "আমার পিতা তোমার নিকট আসিতে দিতে চাহেন না; তাঁহার সুমতি বিধান কর।" যিনি যাহা চাহিলেন ভক্তবৎসল গৌর তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

কতজনকে ডাকিয়া গৌর কত মিষ্ট কথা কহিলেন, কতজনকে বর দিলেন, কিন্তু মুকুন্দ দত্তের নাম একবারও উচ্চারণ করিলেন না। মুকুন্দ প্রকোষ্ঠান্তরে মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন। গৌরের আদেশ ব্যতীত আসিতে পারেন না, অথচ আসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া শ্রীবাস গৌরকে কহিলেন, "প্রভু, তোমার প্রিয় ভক্ত মুকুন্দ তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে ডাকিতেছ না? মুকুন্দ যে তোমার পরম ভক্ত; সে যদি অপরাধ করিয়া থাকে, নিজ হস্তে তাহার দণ্ডবিধান কর, কিন্তু তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না।" শ্রীবাসের কথায় কোপ প্রকাশ করিয়া গৌর কহিলেন, "ও হতভাগ্যের জন্য কেহ আমাকে অনুরোধ করিতে পারিবে না, ও কখনো দাঁতে তৃণ লয়, কখনো জাঠি মারে। এরূপ করিয়া কেহ কি কখন আমাকে পাইয়াছে?" শ্রীবাস বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুন্দের অপরাধ কি প্রকাশ করিয়া বল।" গৌর কহিলেন, "ও যখন যেখানে যায় সেইমত কথা বলে। যখন অদ্বৈতের সঙ্গে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন দাঁতে তৃণ লইয়া ভক্তিভরে নাচিতে থাকে। আবার অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া ভক্তিকে তুচ্ছ করে। ভক্তি হইতে বড় কিছু আছে এ কথা যে বলে সে আমাকে নিদারুণ পীড়া দেয়। ভক্তি স্থানে কৃতাপরাধ মুকুন্দ আমাকে দেখিতে পাইবে না।" মুকুন্দ অন্তরাল হইতে সমস্তই শুনিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "গুরু উপরোধে পূর্ব্বে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানি নাই, সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছেন; তাই আমার এই শাস্তি হইল। কিন্তু তাঁহার দর্শনই যদি না পাইলাম, তাহা হইলে এই অপরাধী শরীর রাখিয়া কি লাভ? আমি এ শরীর ত্যাগ করিব।" মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "ঠাকুর, একবার প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এ জন্মে ত তাঁহার দর্শন লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না, কখনও

ঘটিবে কি ?" বলিতে বলিতে মুকুন্দের নয়ন দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার প্রার্থনা শ্রীবাস গৌরের নিকট নিবেদন করিল, তিনি কহিলেন, "কোটীজন্ম পরে মুকুন্দ নিশ্চয় আমার দর্শন লাভ করিতে পারিবে।" "কোটীজন্ম পরে হউক একদিন ত পাইব" ভাবিয়া মুকুন্দ আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং "পাইব পাইব" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাহার নৃত্য দেখিয়া গৌর হাসিয়া উঠিলেন এবং স্নেহভরে নিকটে আসিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অপরাধমুক্ত হইয়াছ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" অপ্রার্থিত অনুগ্রহ পাইয়া মুকুন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন

প্রভু বলে "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার
সঙ্গদোষ তোমার সকল হইল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়॥
কোটীজন্মে পাইবা যখন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥
'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকালে হৃদয়ে বাঁধিলা॥'

মুকুন্দ আপনাকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন গৌর স্বীয় গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া ভক্তগণ মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং চর্ব্বিত তাম্বুল সকলকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। ভোজনের অবশিষ্ট যাহা ছিল শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে গৌর তাহা দান করিলেন। তদবধি বৈষ্ণব-সমাজে 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র' বলিয়া নারায়ণী বিখ্যাত হইয়াছেন। এই নারায়ণীর গর্ভে চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা পরমভক্ত বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

রামাবতী।

রামপাল নামক পাল-নরপালের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের রামপাল নামক সুপরিচিত স্থানের নাম-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিয়া, রামপাল নামক স্থানকে 'রামাবতী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে, প্রমাণ নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

যাহার নাম 'রামাবতী' ছিল, তাহা কোন্ প্রক্রিয়ায় 'রামপাল' হইয়া গিয়াছে, তাহার আবিষ্কার-সাধন সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। এই স্থানের নামকরণের একটি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে তাহার কথা অনালোচিত থাকিতে দেখিয়া, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি একটি প্রবাদবাক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

"বল্লাল কাটায় দীঘি, নাম রামপাল।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—বল্লাল যে দীঘি কাটাইয়াছিলেন, তাহা (তাঁহার ভাণ্ডারী রামপালের নামে) রামপাল দীঘি বলিয়া কথিত হইয়াছিল;—তাহা হইতেই স্থানের নামও রামপাল হইয়াছে।

এই জনশ্রুতির মূল্য যাহাই হউক, ইহাকে একেবারে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই, ইহাতে সংশয় দূর হয় না; আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। শ্রীবিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থান এক সময়ে শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা যে কখনও বরেন্দ্রীর একাংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; বরং বরেন্দ্রীর সুপরিচিত ভৌগোলিক সীমায় বিপরীত প্রমাণই বর্ত্তমান আছে। কারণ, তাহার পূর্ব্বসীমা করতোয়া।

'রামাবতী' নির্ম্মাণের সমকালবর্ত্তী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী-মণ্ডলেই 'রামাবতী' নির্ম্মিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রামপালদেবের পুত্র মদনপাল দেবের শাসন-সময়ে সন্ধ্যাকর কাব্যরচনা করিয়াছিলেন; গ্রন্থ মধ্যে তাহার পরিচয় উল্লিখিত আছে। মদনপাল দেবের (মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত) তাম্র শাসনে তাঁহার অষ্টম রাজ্য-সংবৎসরে "রামাবতী-নগর-পরিসার" তদীয় "জয়স্কন্ধাকর সমাবাসিত" থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দীর সমসাময়িক উক্তি কবিকল্পনা মাত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই সকল কারণে, শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বরেন্দ্রী-মণ্ডলেই "রামাবতী" নির্ম্মিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এই কথাটি এমনভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সংশয় আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, —"বরেন্দ্রী-দেশে গঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গমস্থলে, (?) রামপাল "রামাবতী" নামক একটি নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।" *

ইহার একাংশের সহিত অপরাংশের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গঙ্গা-করতোয়ার "সঙ্গম-স্থান" কোথায়? করতোয়ার সহিত কখন কোনও স্থানে গঙ্গার মিলন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে, সে ভৌগোলিক বিবরণ কোথায় পাইব? শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সন্ধান প্রদান করেন নাই। গঙ্গার সহিত করতোয়ার মিলন-স্থান চাই; তাহা বরেন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত থাকা চাই;—তাহাই পূর্ব্ববঙ্গের রামপাল হওয়া চাই। এতগুলি বিষয় সংস্থাপিত না হইলে, পার্শ্ব-টীকার ইঙ্গিত মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ইহার কোন কথারই প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

আরও একটি সংশয়ের কথা আছে। 'রামাবতী' যে আদৌ "গঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গম-স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল," এ কথা কোথায় পাওয়া গিয়াছে? 'রামচরিতম্' কাব্যের কোন্ পরিচ্ছেদের কোন্ শ্লোকে ইহার উল্লেখ বা আভাস পাওয়া যাইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার একটু ইঙ্গিত করিলেও, বুঝিবার চেষ্টা করা যাইত। তিনি তদ্বিষয়ে নীরব।

'রামচরিতম্' কাব্যের কোন স্থানে এরূপ উল্লেখ বা আভাস আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া

* Ramapala founded a city named Ramavati at the confluence of the Ganges and the Karatoya in the Barendra country.—Indroduction, p. 14.

যায় না। তৃতীয় পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে একবার মাত্র "গঙ্গা-করতোয়া" একত্র উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহাকে 'গঙ্গা-করতোয়ার" সঙ্গম সূচক বলিয়া কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহাকে একবার রাম পক্ষে আর একবার রামপাল পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। একদিক্ টানিতে গেলে, আর একদিক্ ছিঁড়িয়া যায়।

একে সন্ধ্যাকরের কাব্য (প্রত্যক্ষর শ্লেষ-নিবদ্ধ বলিয়া) বিলক্ষণ দুরূহ; তাহাতে তৃতীয় পরিচ্ছেদের টীকা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যে একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা, 'শ্রীশীলচন্দ্র' নামক লেখক কর্ত্তৃক লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শীলচন্দ্র নাম দেখিয়া মনে হয় লিপিকারক বৌদ্ধ,—তাহার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল না,—তজ্জন্য অনেক শব্দ ও শ্লোক পরিত্যক্ত এবং বিকৃত হইয়াছে।" শীলচন্দ্র যে বৌদ্ধ ছিল, কেবল তাহার নাম হইতে তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে না। কিন্তু "শ্রীঘনায় নমঃ সদা" বলিয়া (বুদ্ধদেবের নমস্কারের পদ) নকল আরম্ভ করিয়া, শীলচন্দ্র তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক, সত্য সত্যই সকল কার্য্যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। এরূপ ত্রুটি (অল্পাধিক মাত্রায়) হস্তলিখিত সকল পুঁথিতেই সংঘটিত হইতে পারে; কোনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নকল করিলেও, এরূপ ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। প্রথমে অধ্যয়ন না করিয়া, "যথাদৃষ্টং" প্রণালীতে গ্রন্থ নকল করা হইত; পরে, অধ্যয়ন কালে, লিপিপ্রমাদ সংশোধিত হইত। শীলচন্দ্রের নকল অধীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহাতেই লিপিপ্রমাদ সংশোধিত হয় নাই। যে লিপিকর এরূপ দুরূহ শ্লিষ্ট কাব্য নকল করিয়াছিল, তাহার সংস্কৃত ভাষায় কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি ছিল না বলিয়া, অনুমান করিতে সাহস হয় না। এইরূপ অনুমান কিন্তু 'রামচরিতম্' কাব্যের পক্ষে এবং তাহার নকলকারক শীলচন্দ্রের পক্ষে কোন কোন স্থলে বড় বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। শীলচন্দ্রকে মূর্খ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নকল খানির সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ,—ইহার জন্যই গ্রন্থমুদ্রাঙ্কণে বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় অনেক স্থলেই সুবিবেচনার সহিত পরিত্যক্ত অক্ষর সংযুক্ত করিয়া, এবং বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত করিয়া, পাঠকের উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু পাঠ-সংযোগের চেষ্টা সকল স্থলে সর্ব্বতোভাবে সফল হইতে পারে না বলিয়া, দুই এক স্থলে শীলচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। যে শ্লোকে "গঙ্গা-করতোয়া" একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও নকলকারকের ভ্রমপ্রমাদ ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা যেরূপে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই, ভূমিকা লিখিয়াছেন। সুতরাং এখানেও সংশয়ের অভাব নাই।

সকল সংশয়ের উপর প্রধান সংশয় ঐতিহাসিক সংশয়। সম্প্রতি যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বাবিষ্কৃত প্রমাণাবলীর আলোচনা করিলে

বুঝিতে পারা যায়,—বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই, রামপাল দেবের পক্ষে সহসা পূর্ব্ববঙ্গে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। (ঢাকা জেলার বেলাবো গ্রামে আবিষ্কৃত) ভোজবর্ণ দেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, (কৈবর্ত্তরাজ) দিব্যের সমকালবর্ত্তী জাত বর্ম্মদেব কামরূপ অধিকার করিয়া (পূর্ব্বাঞ্চলে) 'সার্ব্বভৌমশ্রী" বিস্তৃত করিয়াছিলেন ;— শ্রীবিক্রমপুর এই রাজবংশের রাজধানী ছিল।

এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক হইলেও, ইহার ঐতিহাসিক বিবরণগুলির উদ্ধার-সাধনের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন না করিয়া, অনেকেই আত্ম প্রাধান্য খ্যাপনের অশোভন চেষ্টায়, বঙ্গসাহিত্যে বিবিধ বিতণ্ডার সূত্রপাত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনে (কৈবর্ত্ত-বিপ্লবের সমকালবর্ত্তী) পূর্ব্বাঞ্চলের যেরূপ স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 'রাম চরিতম্' কাব্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে ;—তাম্রশাসনের সাহায্যে "রামচরিতম্" কাব্যের) টীকাহীন অংশের) একটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণেরও সদুপায় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

'রামচরিতম্' কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, এক অর্থে 'রাবণবধ,' অন্য অর্থে 'কৈবর্ত্তরাজবধ' বিস্তৃত করিয়া, সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম "রামপ্রত্যাগমনম্।" উভয় পক্ষে প্রযোজ্য বিবরণগুলি তাহাতে যথাক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। রামপাল পক্ষে 'রামাবতী' নির্ম্মাণের পর এবং নগরপ্রবেশের পূর্ব্বে, কবি কতকগুলি ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াই রামপাল নিরস্ত হইতে পারেন নাই ; কৈবর্ত্ত-বিপ্লবে পালসাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল (বরেন্দ্রীমণ্ডল) হস্তচ্যুত হইবার পর, (পাল-সাম্রাজ্যের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশের সামন্তচক্র অনুকূল থাকিলেও), অন্যান্য স্থানে অনেকেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য রামপালকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল ;—তাঁহাকে 'কামরূপ' জয় করিতে হইয়াছিল। নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়,— রামপাল বঙ্গপতির কবল হইতেই কামরূপের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। "রামচরিতম্" কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪৪ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি (দানাদি উপঢৌকন প্রদানে) রামপাল দেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন ; এবং এইরূপেই পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি (আনুগত্য স্বীকারে) স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই,—

"স্বপরিত্রাণ-নিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বরবারণ-দানেন চ নিজস্যন্দন-দানেন
বর্ম্মণারধে॥"

শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় রচিত ভূমিকায় [১৫ পৃষ্ঠায়] ইহার উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"একজন পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি তাঁহাকে (রামপালকে) বৃহৎ হস্তী, রথসমূহ (?) এবং বর্ম্ম প্রদান করিয়া, রামপালের রক্ষণাধীনে থাকিবার জন্য, তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন।"*

---

* An eastern potentate propitiated him with large, elephants, chariots and armour for extending his protection to him.—Introduction, p. 15.

এই শ্লোকোক্ত 'পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি কে, এ পর্য্যন্ত, তাহার মীমাংসা করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু শ্লোকটি যে ভাবে রচিত, তাহাতে উভয় পক্ষে প্রয়োজ্য বলিয়া, (পূর্ব্বাঞ্চলের নরপতির নাম উল্লিখিত না হইয়া) '"বর্ম্মণা"—শব্দ গৃহীত হইয়াছে কি না, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার আলোচনা না করিয়া, বীর-কঞ্চুক (বর্ম্ম) বলিয়াই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী স্থানান্তরে বীরগণের "নামাঙ্কন" না করিয়া, নামাংশ বা উপাধিমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে টীকা থাকায়, নামগুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানে টীকা না থাকায়, সে সুবিধা ঘটে নাই। তথাপি রচনা-ভঙ্গীতে বোধ হয়,—কবি যেন "প্রাগ্দিশীয়েন পত্যা" এই দুইটি শব্দকে "বর্ম্মণা"-শব্দের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্লেষানুরোধে "বর্ম্মণা"-শব্দটি দুই পক্ষে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। রামপক্ষে বর্ম্ম-অর্থ বীর-কঞ্চুক তাহা সুগম। রামপাল-পক্ষেও সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইলে, এই শব্দটিকে শ্লিষ্ট না বলিয়া, "উভয়পক্ষে তুল্যার্থ-বোধক" বলিতে হয়।

জিগীষানুরোধে সেরূপ তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সত্যাবিষ্কারানুরোধে, সে তর্ক পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভোজবর্ম্মদেবের (বেলাবো গ্রামে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনের সাহায্যে সমকালবর্ত্তী পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতির বর্ম্মন্-উপাধির পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পর, 'রামচরিতম্'-কাব্যোক্ত "বর্ম্মণা" শব্দের সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কবি "বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন" বলিয়া একটি মাত্র চ কারের প্রয়োগে, হয় ত প্রদত্ত দ্রব্যের মধ্যে বীরকঞ্চুকের (বর্ম্মের) উল্লেখ করেন নাই। সার্ব্বভৌমত্বের নিদর্শন (বরবারণ ও নিজস্যন্দন) অর্পণ করিয়াই, পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি "স্ব-পরিত্রাণ' লাভের জন্য, রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি এইরূপে "পরিত্রাণ" লাভ করিয়া, (সার্ব্বভৌমত্ব পরিহারপূর্ব্বক), স্বামি-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া, নিজ-রাজমণ্ডলে রামপাল দেবের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামপালের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ (পূর্ব্ববৎ) "স্বদেশের অব্যবহিত ভূমি" হইয়াছিল;—পূর্ব্বাঞ্চল তাঁহার "স্বদেশ" পদবাচ্য হইতে পারে নাই;—সুতরাং সেই সামন্তচক্রের মধ্যে রামপালের রাজধানী নির্ম্মাণের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা ছিল না। পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি এইরূপ ব্যবহার না করিলে, "পরিত্রাণ" লাভ করিতে পারিতেন না, রাজ্যচ্যুত হইতেন। কিন্তু "স্বপরিত্রাণনিমিত্তং" যে ভাবে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে সেরূপ তাৎপর্য্য বিকশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 'ভূমিকায় ভাবানুবাদমাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এমনও বোধ হইতে পারে যে,—পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি যেন কোনও শত্রু-ভয়ে ভীত হইয়া, রামপালদেবের আশ্রয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্লোকে সেরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাঁহারা সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, অথবা যৎসামান্য অভিজ্ঞতা থাকিলেও, স্বয়ং স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত ভাষায় 'রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ, তাহারাও স্বভাবতই স্বদেশের

ইতিহাস জানিবার জন্য কৌতূহলী। সুতরাং 'রামচরিতম্‌' কাব্যের একটি বিশুদ্ধ অনুবাদ মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহার অভাবে অনেকের পক্ষেই ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকাটি একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর সকল স্থলে নিঃসংশয়ে নির্ভর করিবার উপায় থাকিলে, তাহার সাহায্যেই তথ্যানুসন্ধান পরিচালিত হইতে পারিত। কিন্তু ভূমিকার সহিত গ্রন্থোক্ত বিষয়ের নানা-স্থলে এইরূপ নানা অসামঞ্জস্য দেখিয়া, 'রাম-চরিতম্‌' কাব্যের যথাযোগ্য আলোচনার প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত করিলাম। নিরপেক্ষ ভাবে, সত্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, এই কাব্যের আলোচনা প্রচলিত হইলে, অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে। সেই আশায় প্রথমেই "রামাবতীর" কথার অবতারণা করা হইয়াছে। রামাবতীর অবস্থান-ভূমি নির্ণয় করিবার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে "রামচরিতম্‌" কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য কত অধিক, তাহা দিন দিন অধিক প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিলাতের টিক্‌টিকী।

মানুষের প্রকৃতি মোটের উপরে সর্ব্বত্রই সমান। আরাম, আয়েস, সকলেই চাহে। সহজে, বিনা পরিশ্রমে যে কার্য্যটা হয়, তার জন্য আবার কষ্ট স্বীকার করিতে কোথাও লোক বড় রাজী হয় না। আর এইরূপে আপনার কষ্টের লাঘব করিতে যদি একটু আধটু মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাতেও কোথাও বেশী লোকে পশ্চাৎপদ হয় না। আমাদের দেশের পুলিশের লোকের মিথ্যা-প্রবণতার কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। আর কখনও কখনও এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এমনও মনে করিয়া থাকি যে বুঝি বা আমাদের পুলিশের লোকেই দুনিয়ার সকল লোকের অধম ফল কথা কিন্তু তাহা নয়। সুযোগ পাইলেই লোকে সর্ব্বত্রই এরূপ মিথ্যাচরণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, এখানে পুলিশের লোক যতটা পরিমাণে এ সকল প্রলোভনে পড়ে, বিলাতের পুলিশ কর্ম্মচারীরা ততটা পরিমাণে প্রলুব্ধ হয় না। লোকে মিথ্যা বলে আত্মরক্ষার জন্য; যেখানে মিথ্যা না বলিলে আপনার সুখ-সুবিধা রক্ষা করা কঠিন সেখানে লোক সহজেই মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। যেখানে মিথ্যা বলা নিষ্প্রয়োজন কিম্বা নিরাপদ্‌ নহে, সেখানে লোক সত্য বলিতেই চেষ্টা করে। বিলাতে পুলিশকর্ম্মচারীদের উপরে এমন কড়া শাসন আছে, সাধারণ প্রজাবর্গ আপনাদের স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্য সতত এমন সজাগ থাকে, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা এবং ধর্ম্মাধিকরণ সকল জনমণ্ডলীকে সর্ব্ব প্রকারের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে

রক্ষা করিবার জন্য এতটাই সমুৎসুক যে, সেখানে পুলিসের লোকের পক্ষে মিথ্যা আচরণ করিবার প্রলোভন নাই বলিলেও চলে। কোনও সূত্রে, কোথাও কোনও নিরপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে দেশের লোক একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে; সকলেই আপনাপন স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্যই পরস্পরকে রাজপুরুষদিগের অযথা শাসন হইতে বাঁচাইবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া থাকে যে, সেখানে পুলিশের কর্ম্মচারীদিগকে সতত অতি সন্তর্পণে যথাসম্ভব সত্যের ও ধর্ম্মের পথ ধরিয়া চলিতেই হয়, না চলিলে তাহাদের চাকরী লইয়া টানাটানি পড়ে।

রাজ্যে শান্তি রক্ষার জন্য বিলাতের গবর্ণমেণ্টকেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। বিশেষ, লণ্ডন সহরে না কি দুনিয়ার যত বিপ্লবপন্থী লোক আসিয়া প্রায় আশ্রয় লইয়া থাকে; যারা স্বদেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইয়া শাসন সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে, তারা অনেক সময়ই ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। রুশের, জার্ম্মাণীর অষ্ট্রিয়ার বিপ্লবপন্থীগণের অনেকে লণ্ডনে বাস করেন। লণ্ডনের পলিশকে এ সকল লোকের উপরে সর্ব্বদা চক্ষু রাখিতে হয়। এ ছাড়া ইংরাজের নিজের রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারী লোকের অভাব নাই। এ পর্য্যন্ত আইরিশেরা তো সর্ব্বদাই ইংরেজগবর্ণমেণ্টের স্বল্প বিস্তর বিরোধী হইয়া আছে। ইহাদেরও অনেকে আয়র্লণ্ডে না থাকিয়া লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি স্থানে বাস করে। এ সকলের উপরেও চক্ষু না রাখিলে চলে না। তার পর, ক্রমে ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীও বিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইতেছেন। এই শ্রেণীর সকল লোকের উপরেই বিলাতের পুলিসের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং বিলাতের টিকটিকীরা সে কেবল আমাদের উপরেই মোতায়েন হইত, তাহা নহে। বহু কালাবধিই ইহাদিগকে রাজনৈতিক লোকের উপরে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইতেছে। আর এই দীর্ঘ অভ্যাস নিবন্ধন এ কার্য্যে ইহারা অদ্ভুত পটুতা লাভও করিয়াছে। কাহাকেও বিরক্ত করে না; কাহারও উপরে অত্যাচার উৎপীড়ন করে না; কাহাকেও অসম্মান দেখায় না; কেবল দূর হইতে কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, কোনও বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে কি না, কোনও অরাজক দল পাকাইয়া তুলিতেছে কি না, ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। নানা দেশে, নানা মতের, নানা প্রকৃতির লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ইহাদের এমন একটা কর্ম্মকুশলতা জন্মিয়াছে, যাহা বোধ হয় আর কোনও দেশের গোয়েন্দাবিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকাংশ স্থলেই বিলাতের পুলিশকে না কি বিদেশীয় বিপ্লবপন্থীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়, এজন্য বিলাতী বিলাতের টিকটিকীদের মধ্যে এমন একটা নিষ্কাম ভাব জন্মিয়া গিয়াছে,যাহা অপর দেশের টিকটিকীদের আছে কি না বিশেষ সন্দেহের কথা। সর্ব্বোপরি ইংরেজ জাতটাই মোটের উপরে স্বাধীনতা বস্তুকে বড় ভাল-বাসে। যেখানে আপনাদের জাতীয় স্বত্বস্বার্থের

সঙ্গে কোন বিরোধ নাই; সেখানে এ জাতটা সর্ব্বদাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির বিরোধ বাধিলে, প্রজামতেরই আনুকূল্য করিয়া থাকে। কাজে না পারিলেও কথায় বার্ত্তায়, মনোভাবে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যাহারা দণ্ডায়মান হয়, তাহাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি অনুভব করিয়া থাকে। এমন কি, ভারতে যাঁহারা প্রজাস্বত্ব সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন আর এই চেষ্টা করিতে যাইয়া ভারতের ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে স্বল্পবিস্তর নির্য্যাতিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও মোটের উপরে বিলাতের লোকের একটা সামান্য সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদিগকে বিলাতের লোকে অনেকটা সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিলাতের পুলিশের লোকেও যে তাহা করে, ইহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা পশ্চাতে যে সকল টিকটিকী মোতায়েন হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আমার সঙ্গে নিরতিশয় সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতেন। চেনাশোনা হইলে সর্ব্বদা দেখিবামাত্রই টুপি খুলিয়া সেলাম করিতেন। আর চেনাশোনা হইতে বড় বেশি বিলম্বও হইত না। দুজন লোক প্রাতে নয়টা হইতে রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত আমার বাড়ীর আশে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, বরফ পড়ুক, রৌদ্র দহুক, সর্ব্বদাই তারা দাঁড়াইয়া আছে; কখনও তামাক খাইতেছে, কখনও পথের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কখনও বা পকেট হইতে সংবাদপত্র খুলিয়া পড়িতেছে, কখনও বা বইই হয়ত পড়িতেছে কিন্তু নজরটা সর্ব্বদাই আমার দরজার দিকে রহিয়াছে—এ ভাবে যারা গোয়েন্দাগিরি করে, তাদের চিনিয়া লইতে তো আর বড় দেরি হয় না। প্রথম কয় সপ্তাহ এ দিকে নাকি তেমন লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তখন এদের চিনিতে পারি নাই, কিন্তু যে দিন হইতে বুঝিলাম যে আমার পিছনে লোক আছে, সে দিন হইতে ইহারা সর্ব্বদাই ধরা দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে কি করিয়া এক ব্যক্তিকে ধরিয়াছিলাম, পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গীকেও ধরিয়া ফেলি।

এই দিনও আমার পাশি বন্ধুটীর গৃহিণী এবং আমার পুত্র ও আর একটী পার্শি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন। এ দিনও আমরা সকলে মিলিয়া একটা সভাতে যাইতেছিলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, একবার পথে চলিতে চলিতে পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া কেহ সঙ্গ লইয়াছে কি না দেখিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আমরা "টিউব" ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। লণ্ডন সহরে মাটীর নীচে দিয়া সুড়ঙ্গের ভিতরে, যে সকল রেলগাড়ী তাড়িত যোগে যাত্রী-সম্ভার লইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাতায়াত করে, তাহাকেই টিউব বলে। রেলের যেমন ষ্টেশন আছে, এই টিউবেরও সেইরূপ ষ্টেশন আছে। ষ্টেশনগুলো রাস্তার উপরে। এখানে টিকিট কিনিয়া তাড়িত-চালিত লিফ্‌টে (lift) করিয়া নীচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিতে হয়। টিউবেরও প্ল্যাটফর্ম আছে। এ প্ল্যাটফর্মগুলা সাত আট তালা প্রমাণ জমির নীচে। আমরা ক্রমে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন একটা লোককে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল যে বুঝি বা সেই এবার আমার উপরে মোতায়েন

হইয়াছে। মিনিটে মিনিটে টিউবের গাড়ী সকল আসা যাওয়া করে। একখানি ট্রেন আসিতেছে দেখিয়া আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম যে তাঁরা এই ট্রেণে উঠিবার ভাণ মাত্র যেন করেন, কিন্তু একেবারে যেন উহাতে চড়িয়া বসেন না। ট্রেণ আসা মাত্র সে ব্যক্তি তাহাতেও উঠিয়া পড়িল। আমরা উঠিব উঠিব করিয়া আর উঠিলাম না। ট্রেণখানা ছাড়িয়া দিল। তখন সে ব্যক্তি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্লাটফর্মে একখানা বেঞ্চে যাইয়া বসিয়া পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তখন প্লাটফরমে আমরা ক'জন ছাড়া আর একজন যাত্রীও ছিল না। আমি আস্তে আস্তে এ ব্যক্তির কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম--"তুমি কি আমার পিছু লাগিয়াছ?" "Are you following me?" সে গলা ভারি করিয়া বলিল—"না।" আমি বলিলাম—"তাই যদি, তবে তুমি গাড়ীতে চড়িয়া, আমি উঠিলাম না দেখিয়া নাবিয়া পড়িলে কেন?"—সে ব্যক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন আমি বলিলাম—"দ্যাখ, আমার পিছনে লোক থাকুক তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু কে আছে, এইটী মাত্র আমি জানিতে চাই।" একটু পরে বলিলাম—"তুমি আমাকে চেন?' "হাঁ আপনাকে চিনি বই কি আপনি মিঃ—।" "এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, আমার কর্ত্তব্য আমি করিব। দুজনে একটা বোঝাপোড়া হইল, ভালই।" এ সময়ে আবার আর একখানি ট্রেণ আসিয়া পড়িল. আমরা সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

'প্রথম প্রথম একটু বিরক্তি বোধ হইল; কিন্তু ক্রমে আমোদ লাগিল। আমার বাড়ীতে আমার পুত্র ছাড়া আর তিনচারিটী বাঙ্গালী ও মাহারাট্টি যুবক এক সময় আমার সঙ্গে ছিল। এই ইংরেজ টিকটিকীদের লইয়া তাহারা মাঝে মাঝে বড় তামাসা করিত। একদিন দুজন লোক আমার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাড়ী পাহারা দিতে ছিল। ছেলেরা দুখানা বড় বই লইয়া, একটা কাল টেবিলক্লথ দিয়া ঢাকিয়া জানালা খুলিয়া গিয়া তাহাদের দিকে বই দুখানিকে নির্দ্দেশ করিয়া যেই দাঁড়াইল, আর অমনি গরিব বেচারীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে সরিয়া গেল। তারা ভাবিল এই বইগুলো বুঝি ফটোগ্রাফের ক্যামেরা, আর ছেলেরা বুঝি তাদের ছবি তুলিয়া, কাগজ পত্রে একটা হাঙ্গামা করিবার আয়োজন করিতেছে। এদের কেহ কেহ আমার ছেলেদের পিছনে পিছনেও যাইত। স্যার কার্জ্জন ওয়াইলীর হত্যার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেলেদের তাহাদের উপরে দৃষ্টি খুবই বেশী ছিল, আমার উপর ততটা ছিল না। আর ছেলেরাও দুষ্টুমি করিয়া বেচারীদের হায়রাণ করিয়া মারিত। তিনজনে তিন পথে খামকা খামকা ঘুরিতে যাইত। এ গলি ও গলি করিয়া গরিবদের ঘুরাইয়া আনিত ইহারা সারাদিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন সন্ধ্যার প্রক্কালে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িত, তখন ছেলেরা তিন চার মাইল বেড়াইবার জন্য বাহির হইত। সেই অবসন্ন দেহে এতটা ঘুরিতে তারা পারিবে কেন? তাই ছেলেদের গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিত। "মিঃ-

বাসে (Bus'এ) চড়িয়া চলুন না—খামাকা হাঁটিয়া যাবেন কেন?"—"আমাদের আজ পয়সা নাই—বাসে (Bus'এ) যাব না।" "আচ্ছা আপনারা বাসেই চলুন, আমি আর হাঁটিতে পারি না,—পয়সা আমি দিচ্ছি।" এই বলিয়া গরিব বেচারীর স্কন্ধে চড়িয়া ছেলেরা ৭।৮ মাইল বাসে বেড়াইয়া আসিত।

ফলতঃ আমাদের জন্য লণ্ডনের পুলিশের কত পয়সা যে খরচ হইয়াছে, বলিতে পারি না। দু'তিন জন, কখনও চারিজন কর্ম্মচারী দিনরাত আমার বাড়ী পাহারা দিত। মাঝে কদিন আমার বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার পরপারে একটা বাড়ী পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়াছিল। সেখানে বসিয়া এঁরা আমার বাড়ীতে কে আসে কে থাকে, এ সকল লক্ষ্য করিত। আমাদের কেহ যখন বাহিরে যাইতাম, তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন যাইত। কেবল তাহাই নহে। মাঝে মাঝে আমরা দুষ্টুমী করিয়াও ইহাদের পয়সা খরচ করাইতাম। এক দিন আমি সন্ধ্যার পরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। আমার সেক্রেটারীও তখন বাড়ী যাইতেছিলেন। খানিক পরে তিনি বলিলেন "মিঃ— আপনার শরীররক্ষক (Body Guard) বুঝি ঐ আসছে?" আমি পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম বাস্তবিকই একটা লোক আমার অনুসরণ করিতেছে। তখন সামনে দিয়া এক খানা মটরকার যাইতেছিল। আমার সেক্রেটারীকে ট্রেনে চড়িয়া বাড়ী যাইতে বলিয়া আমি নিজে ঐ চলন্ত বাসে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এবার আমার রক্ষককে ফাঁকি দিয়াছি। কিন্তু বাসখানা মাইল খানেক দৌড়িয়া যখন একটা টিউব ষ্টেশনের সামনে যাইয়া দাঁড়াইল, দেখি সে ব্যক্তি তাহাতে উঠিয়া এবং টুপি খুলিয়া আমায় সেলাম করিয়া উপরে যাইয়া বসিল। আমি তো দেখিয়া অবাক্। খানিক পরে আমি বাস্ হইতে নামিয়া পড়িলাম। সেও নামিয়া পড়িল। আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আমার সঙ্গ নিলে কেমন করিয়া বল তো? আর এত দূরে আসিয়া বাসই বা ধরিলে কেমন করিয়া?" সে হাসিয়া বলিল,—"ট্যাকসিতে করিয়া" আমি বলিলাম—"এত খরচ কল্লে!" "না কল্লে চলে কৈ? আমি যদি সঙ্গে না থাকি, আর অন্য কেহ আপনাকে কোথাও দেখিয়া রিপোর্ট করে, তবে আমার চাকরিটী যাবে যে। সুতরাং যেরূপ করিয়াই হউক, আমার আপনার সঙ্গে থাকিতেই হয়।"

কিন্তু সকলেই যে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিত তাহাও নহে। কখনও কখনও কেহ কেহ সঙ্গে না থাকিয়াও আমার কাছে আসিয়া, আপনার দৈনন্দিন রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া যাইত। কর্ম্মভার যেখানে এতটা শ্রমসাধ্য সেখানে মাঝে মাঝে কর্ম্মচারীর পক্ষে একটু আধটু প্রবলতার আশ্রয় লওয়াও স্বাভাবিক। একদিন আমাকে একটা বক্তৃতা উপলক্ষে লণ্ডনের বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। সে দিন রবিবার। আমার বিকালে উল্‌ইচ্ নামক উপনগরীতে যাইয়া বক্তৃতা করিবার কথা। আমি একটু শীঘ্র শীঘ্র মধ্যাহ্নাহার শেষ করিয়া উল্‌ইচ্ যাত্রা করিলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখি আমার শরীররক্ষক সেখানে দাঁড়াইয়া। আমায় দেখিয়া

সে টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল এবং ভদ্র লোকটীর মতন মন্থরগতিতে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করিল। টিউবের ষ্টেশনে যাইয়া যখন লিফটে (Lift) চড়িলাম, তখন সেও সেই লিফটেই উঠিল আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"আজ যে অনেক দূর যেতে হবে।" "কত দূর, মিঃ—?" "উল্‌ইচ্‌।" "বাবা, আমার যে এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই।" "আমি খাইয়াই আসিয়াছি।" "উল্‌ইচে কি আজ কোনও সভা আছে না কি?" "আছে বৈ কি।" "কোথায়, মিঃ –?" "কারমেল্‌ চ্যাপেলে।" ইতিমধ্যে লিফট্‌ নামিয়া আসিয়া যথাস্থানে থামিয়া গেল। দুজনেই তখন ট্রেণের দিকে যাইতে লাগিলাম। আমার রক্ষক তখন বলিল "মিঃ –, আপনার অনুমতি যদি পাই তবে আজকের দিনটা আমি আমার ছেলে পিলেদের সঙ্গে যাইয়া কাটাই—আমি আর আপনার সঙ্গে যাব না।" "আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।" "আপনি কখন ফিরিয়া আসিবেন?" "জানি না তো! উল্‌ইচ্‌ হতে আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিব—কিন্তু আজ রবিবার, তোমাদের সভ্যতায় রবিবারে সন্ধ্যার পর মদের দোকানে মদ মিলে কিন্তু ভদ্র লোকের বাড়ীতে তো খাওয়া মিলে না, কাজেই আমায় বাহিরে খাইয়া আসিতে হইবে। নয়টা সাড়ে নয়টার আগে যে ফিরিতে পারিব, এমন মনে হয় না।" "আজ কি বিষয় বক্তৃতা করিবেন?" আমি বিষয়টী বলিয়া দিলাম। সেও সেটী আপনার পকেট বইএ নোট করিয়া লইল এবং আর একবায় আমার অনুমতি লইয়া, সেলাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। সেদিন আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আমি কাপড় চোপড় ছাড়িবার আয়োজন করিতেছি—তখন প্রায় সাড়ে দশটা—এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া বলিল—"একটী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" "এই রাত্রে ভদ্রলোক কে? ইনি কি আমার স্বদেশী?" "না একজন ইংরেজ ভদ্রলোক।" "আচ্ছা, নিয়ে এস।" তখন দেখি ঐ আর কেউ নয়—আমার শরীররক্ষক। এত রাত্রে আমায় বিরক্ত করিতে আসিয়াছে বলিয়া অতিশয় দীনতা সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমি বক্তৃতাতে কি কি বলিয়াছি, সেখানে কত লোক ছিল, ভারতবাসী লোক কেহ ছিল কি না,—এসকল কথা নোট করিয়া লইয়া গেল। আমি বুঝিলাম—আজকের রিপোর্ট খানি আমাকেই লিখিয়া দিতে হইল। এও মন্দ নহে। বিলাতের টিক্‌টিকীই এরূপ করে। এদেশের টিক্‌টিকী হইলে আপনার মনগড়া একটা ভয়ঙ্কর বক্তৃতা সাজাইয়া রিপোর্ট করিত না কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

৩

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণগত-প্রাণা শ্রীরাধাকে দেখিয়াছি, এইবার এতদুভয়ের শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে যদি আমরা এই টুকু বুঝিয়া থাকি যে, শ্রীরাধার ভালবাসা তোমার আমার সম্পূর্ণ বোধায়ত্ত না হইলেও ইহা এক অপার্থিব বস্তু, তাহা হইলেই ইহার যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। যিনি বৈষ্ণব তিনি জানেন যে শ্রীরাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা নাই ; শ্রীরাধা সংযুক্ত হইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর তাহা না হইলেই তিনি কৃষ্ণ মাত্র ; এই হ্লাদিনী শক্তির সংযোগ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়ী প্রকৃতির বিকাশ, নচেৎ সকলই আনন্দহীন। হ্লাদিনী শক্তি না থাকিলে বাঁশী বাজিত না, জীবের ভক্তিও চরিতার্থ হইত না। এই আনন্দময়ী বৃত্তির পরিপোষক যত বস্তু আছে তাহাদের মধ্যে রসাস্বাদ-লোলুপা সখীই প্রধান। ইহারা না থাকিলে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস পরিপুষ্ট হয় না। তাই বৈষ্ণব কবি সর্ব্বত্রই সখী-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—ভগবানে সর্ব্বস্বার্পণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদাস্বাদন ইহাই হ্লাদিনীর আকাঙ্ক্ষা, তাই আমরা আদি বৈষ্ণব কবিদ্বয়ে দৈহিক আকাঙ্ক্ষার এত প্রাবল্য দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বেও সখীর কার্য্য অনেক দেখিয়াছি, অতঃপরও দেখিতে পাইব। শ্রীরাধার চরিত্র-বিশ্লেষণ যেমন সখীর সাহায্য ব্যতীত হয় না, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রও সেইরূপ সখীর সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যক্ত হয় না। ইহাদিগকে যাঁহারা দূতী বলিতে চাহেন, তাঁহারা তাই বলুন, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে এই সখীর চরিত্রে যে কোমলতা, প্রাণে যে নিঃস্বার্থতা, হৃদয়ে যে কবিত্ব আমাদিগের আলোচ্য মহাকবিদ্বয় কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছে, তাহা সামান্যা দূতীর ত কথাই নাই, অনেক নায়িকারও নাই। এ কথা আপনা হইতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়।

এখন আমরা জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দেখিয়া প্রেমতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস করিব। শ্রীকৃষ্ণ যে বৈষ্ণবের কাছে ভগবান্ স্বয়ং সে কথা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে সরস বসন্তে শ্রীকৃষ্ণ শত যুবতী পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ক্ষণিক ভ্রান্তিময় মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ভুলিয়া শত সুন্দরীর মন রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবি শ্রীকৃষ্ণের চারিধারে একটা যেন অভেদ্য ইন্দ্রিয়াকর্ষণের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একে বসন্ত ঋতু,—তাহাতে স্বভাবতঃ যুবকের হৃদয় মদমত্ত হইয়া উঠে, প্রাণের উপর দিয়া একটা চঞ্চলতার স্রোত বহিয়া যায়, তাহার উপর আজ সেই বৃন্দারবিপিন যেন সুন্দরী যুবতীবৃন্দের মুখ-শতদলে বিশোভিত হইয়া প্রলোভনের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আবার এই সুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার জন্য যেন একটা রেষারেষি

চলিতেছে,—যত প্রকার মন ভুলাইবার হাব-ভাব ও কৌশল দ্বারা রমণী যুবজনের হৃদয়াকর্ষণ অথবা ইন্দ্রিয়াকর্ষণ করিতে পারে, সবগুলিই এই যুবতীবৃন্দ আজ শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে—

পীনপয়োধর ভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চমরাগম্॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচন খেলন-জনিত-মনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন-বদন-সরোজম্॥
কাপি কপোলতলে মিলিতালপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে।
কেলিকলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা-জল-কূলে।
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥

কবি পুঞ্জে পুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে উপভোগের উপাদান স্তূপীভূত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, কবি দেখাইতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ এই আকর্ষণে যেন সত্যই আকৃষ্ট—

করতলতাল-তরল বলয়া বলি কলিত কলস্বন-বংশে।
রাস রসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসে॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিত-চারু-তরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্

গীতগোবিন্দে এমন আভাস আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধার উপর আড়ি করিয়া এই আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে গোবিন্দলাল যাহা করিয়াছিল, এ যেন অনেকটা সেই রকম ঘটনা। যে ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় এমন করে সে সেই বহ্নিতে দগ্ধ হয়, তাহার আর নিস্তার থাকে না। গোবিন্দলাল এই অনলে পুড়িয়া মরিয়াছিল, প্যারিস এই অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিল। যাহার কেবল ইন্দ্রিয়-আকাঙ্ক্ষা সে এত ইন্দ্রিয়োপভোগের উপচারের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে ও আত্মোৎসর্গ করিতে বাধ্য। বুঝি, মুহূর্ত্তের জন্য এই সম্ভাবনা অনন্ত-বিশ্বাসময়ী শ্রীরাধার মনেও উদিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিফল, তাঁহার মুরারি এই অচ্ছেদ্য বন্ধন, এই অতি তীব্র প্রলোভন এই সুন্দরীবৃন্দের আকর্ষণ ও আলিঙ্গন পাশ ছেদ করিয়া বাহির হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার এ সন্দেহ শুধু যে ক্ষণস্থায়ী তাহা নহে, ইহার সঙ্গে বিশ্বাসের নেশাটা অতিমাত্রায় জড়িত ছিল

মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিত-সুধাস্মিত-মুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ॥

অত তো আনন্দের তরঙ্গ, অত আমোদের ছড়াছড়ি, অত সুন্দরীর হুড়াহুড়ি, প্রলোভনের বাড়াবাড়ি, তবু আমাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে যাহার মুখকমল হর্ষাপ্লুত হইয়া স্মিত-সুধা বর্ষণ করে, তাহাকে কে আমার কাছ হইতে দূরে রাখিতে পারিবে? শ্রীরাধার হৃদয়ে অমন লাঞ্ছনার পরও এই সুন্দর গর্ব্বময় ভাব তখনও বিরাজিত ছিল। কেন? তিনি জানিতেন যে তাঁহার প্রাণাধিক তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। আর এই জন্যই তাঁহার কাছে তাঁহার বঁধুর কিছুই দূষ্য বা নিন্দিত ছিল না; বরং সেই রমণীসমাজে তাঁহার রূপ কেমন উছলিয়া উঠিতেছিল

তাঁহার চক্ষে সেইটাই উজ্জ্বলরূপে ভাসিতেছিল। তাঁহার হৃদয়েশ্বর যে "বহু বল্লভ" ইহাতে তাঁহার নিজের গর্ব্ব একটু খর্ব্ব হইলেও, তাঁহার প্রণয়-গর্ব্ব আরও যেন বাড়াইয়া দিয়াছিল। শ্রীরাধার হৃদয়-দর্পণে শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা এইরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়াই অত অপমানেও তিনি ভ্রমরের মত অথবা অন্য কোনও বিলাতী নায়িকার মত শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যান নাই বরং ইহার পরেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য আরও ব্যগ্র হইয়াছিলেন। প্রেমের লক্ষণ এমনি করিয়াই অভিব্যক্ত হয়। আর প্রেমের সহিত অন্য কোনও ভাবের মেশামিশি না থাকাতেই এই দুইটী হৃদয়ের যথার্থ কোনও বিচ্ছেদ হয় না। মাঝে মাঝে মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িলেও নিশীথিনী জানে যে সে মেঘ কাটিয়া যাইবে, তা অল্প দিনেই হৌক, অথবা দীর্ঘ বিরহের পর হৌক, চাঁদ আবার হাসিবে, 'অমৃত ধারা' আবার ঝরিবে। তাই সে সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। চাঁদকে গাল দিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যায় না। এই যে অনাত্ম-সম্বন্ধিনী ও প্রিয়ানুগামিনী হৃদয়-বৃত্তি ইহাই ভারতবর্ষের রমণীর প্রেম, এবং ইহা দ্বারাই সকল অবস্থাতে বিষের পরিবর্ত্তে অমৃতের উদ্ভব হয়।

এমন ধারা ভালবাসার একটা অমোঘ আকর্ষণ আছে, যাহা বোধ হয় ইচ্ছা করিলেই কাটাইয়া উঠা যায় না। বিশেষতঃ যাহার হৃদয়ে এই আকর্ষণী শক্তির কাছে পরাজয় মানিবার ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া আছে, তাহার তো কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে রামকে নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় কেহ গরুড়কে স্মরণ করিবার কথা বলে, আর গরুড়কে স্মরণ করিতেই সে উপস্থিত হয়, ও তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্র পাশমুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠেন। এ ক্ষেত্রেও শ্রীরাধার উপর চকিত দৃষ্টিপাত শ্রীরাধার ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিল। শ্রীরাধার প্রিয় বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি মিথ্যা কহে নাই; তিনি যে যুবতীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়চকিত প্রফুল্লাননে সুস্মিত রেখা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃষ্ণের হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; এবং তাহাই নাগপাশ-বদ্ধ রামচন্দ্রের সম্বন্ধে গরুড়ের মত কার্য্য করিয়াছিল। রূপকথায় সোণার কাঠি আর রূপার কাঠির গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; সোণার কাঠিতে জ্ঞান ফিরাইয়া দেয়, আর রূপার কাঠিতে অজ্ঞান করে, মুগ্ধ করে। ব্রজযুবতীগণের আকর্ষণরূপ রূপার কাঠি স্পর্শে যে মুগ্ধ হরি বৃন্দাবন বিপিনে রাধাকে ভুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, রাধা দর্শন রূপ সোণার কাঠি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া দিল। কোথায় রহিল যুবতীবৃন্দ, কোথায় রহিল আমোদ-আহ্লাদ, প্রাণ তখনি প্রিয়তমার দিকে ছুটিয়া চলিল, নেশা কাটিয়া গেল, ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া গেল।

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বন্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

এই পরিণতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই জয়দেব কবি শ্রীকৃষ্ণের চতুঃপার্শ্বে ইন্দ্রিয়ের ভোগোপযোগী উপচার রাশি সজ্জিত করিয়াছেন ও করিয়া দেখাইয়াছেন যে যেখানে যথার্থ ভালবাসা আছে, যেখানে প্রণয়িনীকে

"সংসার-বাসনা-বন্ধ-শৃঙ্খলা" বলিয়া জ্ঞান আছে, সেখানে হৃদয়ের যে আকর্ষণ তাহা শত প্রকার বিপ্রকর্ষণ দ্বারা পরাভূত হয় না। মেঘনির্মুক্ত শশধরের ন্যায় ইহার পুনঃ প্রকাশ যেন উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর বলিয়া মনে হয়। জয়দেব এই দৃশ্য দ্বারা যে প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন বিদ্যাপতি মাথুর ও প্রবাস দ্বারা তাহাই করিয়াছেন। মাঝে মাঝে শ্রীরাধার মানের হেতুভূত শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি তাঁহার পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আকর্ষণীশক্তি অর্পিত হয় নাই। বৈষ্ণব কবিতায় "প্রবাস" বিদ্যাপতির মৌলিকত্ব, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিয়াছেন। তিনি সেইখানে দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাধার টান শ্রীকৃষ্ণকে অন্য শত আকর্ষণের প্রতি সহজে তাচ্ছিল্য আনিতে পারে। এমনি আকর্ষণ আছে বলিয়াই এক-জনের অভাবে সমস্ত শূন্যময় হইয়া যায়, এক নিমেষে অন্য সকল প্রলোভন হৃদয় হইতে দূরে অতি দূরে সরিয়া যায়।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ নিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতি ভয়েন ॥
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব।
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম জীবীতেন
গৃহেন ॥

কিন্তু তিনিও জানিতেন যে শ্রীরাধা যতই রাগ করুন, যতই অভিমান করুন, তাঁহার হৃদয় তাঁহাতেই সংলগ্ন আছে। তাই আজ তাঁহার এত চিন্তা, এত ব্যথা, তাই তাঁহার প্রধান চিন্তা কেন তাহাকে অপরাধ-ভীত হইয়া যাইতে নিবারণ করি নাই; সে কি করিবে সে কি বলিবে, সে এই দীর্ঘ বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিবে। যেমন ক্ষণ-কালের জন্য হৃদয় রাধা-চিন্তা বিরহিত হইয়া-ছিল, তেমনি এখন সেই চিন্তার প্রখরতায় হৃদয় অবশ ও অনন্যকর্ম্মা। মন আর কিছু করিতে চাহে না, শুধু তাহারই কথা ভাবিতে চাহে, কৃতাপরাধের শাস্তিস্বরূপ ক্ষণিক ভ্রান্তির প্রতিশোধস্বরূপ মন সে চিন্তা ছাড়িতেও পারে না। অথচ ভয়ে ভয়ে তাহার কাছে গিয়া অপরাধ ক্ষমা করাইতেও সাহস করে না। এই সন্ত্রস্ততা, এই আকুল চিন্তা এই সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা বল দেখি পবিত্র-প্রণয়বাদী, যথার্থ প্রেম হইতে আসে, না ইন্দ্রিয়লোলুপতা হইতে আসে? যাহার ভালবাসা হৃদয়ের সমস্ত অধিকার না করিয়াছে তার কি এমন অবস্থা হয়? অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে আমরা এখনও শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মনুষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই বিচার করিতেছি। মানুষ কতদূর ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিলে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, ভালবাসা থাকিলে নিজেকে কতদূর খর্ব্ব করিতে পারে, তাহা আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-চরিত্র হইতেই প্রথম শিখিতে পাইয়াছি। আমরা এই ক্ষণিক বিরহে শ্রীরাধার অবস্থার পরিচয় পাইয়াছি, এখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার সন্ধান করিব। ইহাও আমাদিগকে সখীর কাছ হইতে শুনিতে হইবে, কারণ সখীর মত মর্ম্মগ্রাহিণী না হইলে সে অবস্থা কি তন্ন তন্ন করিয়া আর কেহ বুঝিতে না বলিতে পারে? যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সখী শ্রীরাধার দশা বর্ণনা করিয়াছে,

তেমনি শ্রীরাধার কাছেও সখী শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছে—

সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥
দহতি শিশির ময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদন বিশিখে বিলপতি বিকলতরোতি।
ধ্বনতি মধুপ-সমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুদমুপযাতি ॥
বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিত ধাম।
লুঠতি ধরণি-শয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥

সখী ব্যথার ব্যথী, তাই সে রাধাকে উপদেশ দিয়াছে—

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশম্

ঐ শোন এই ধীর সমীরে, যমুনাতীরে, তোমার সর্ব্বস্ব, তোমার প্রাণকান্ত, তোমার অভীষ্ট ধন বনমালী,—

নাম-সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনু-সঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুম্ ॥

সে যে তোমার বাঁশী বাজাইয়া "রাধা নামের সাধা বাঁশী" তে রাধা রাধা বলিয়া ডাকিতেছে, তুমি যাও "ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বনম্" – সে যে তোমার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র চালিত ধূলিকণাকেও অমূল্য রত্ন ভাবিয়া গায়ে মাখিতেছে, তুমি আর বিলম্ব করিও না। সে যে—

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদু-পযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥

তোমার কুঞ্জবনে সে যে আজি উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া তোমার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে, পাখী নড়িলে, গাছের পাতা খসিলে তুমি আসিয়াছ ভাবিয়া সে যে ব্যস্ত হইয়া তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শয়ন বিরচন করিতেছে, এমন যে তোমার প্রাণনাথ তাহার কাছে যাইতে বিলম্ব করিতেছ কেন ?

এই সখী-প্ররোচনার ভিতর কত মধুর ভাবই না উথলিয়া উঠিয়াছে;—এই ভাবগুলি লইয়া বঙ্গভাষার কত কবিই নিজের কবিতা পুষ্ট করিয়াছেন, ও বঙ্গসাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্ঞানদাসাদির "রসোদ্গার" শীর্ষক কবিতাগুলি যে জয়দেবের পদ হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা আজকাল অঙ্গসঙ্গের নামে শিহরিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্তু অঙ্গসঙ্গ-কামনা কতদূর আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হইতে পারে—তাহা কবি জয়দেব প্রথম দেখাইয়াছেন, যাহার কাছে প্রিয়তমার অঙ্গসংস্পৃষ্ট ধূলিকণাও বহুমানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, যে পল্লমাত্র শব্দেই প্রিয় সমাগম হইল ভাবিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হয় তাহার হৃদয়ে ভাবের কত গভীরতা তাহার উৎকণ্ঠায় কত মধুরতা, কত প্রাবল্য, কত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নয় কি ?

তাহার পর এই সখীসম্বাদে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে সখীর বিশ্বাস যে শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারই তাঁহার চরম সাধনা; আত্যন্তিক সুকৃতি বিপাক। তাই এই ব্যাপারের যাহা কিছু বিঘ্ন সখী তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দিতে বলিতেছে—মঞ্জীরে কাজ কি, সে যে শুধু বিহারের রিপুস্বরূপ;

নীল নিচোলে তোমার গৌরাঙ্গের আভা ঢাকিয়া ফেল; তোমার দেহ বল তোমার বসন ভূষণই বল সবই তো তাহারই সুখের জন্য, তবে আর বিলম্ব কেন? সে যে অভিমানী, নিশিথিনীও যে শেষ হইতে চলিল, তাহার কামনাপূর্ণ করিতে আর বিলম্ব কেন?

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি
বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পূরয়
মধুরিপুকামম্॥

তাহার অবস্থা কি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না?

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানা শাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে
মদন-কদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে॥

সাধে কি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

ধনি ধরণীর মণি জনম ধনি তোর—
সবজন কানু কানু করি ঝুরায়
সে তুয়ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসাল অম্বুদ
চকোর চাহি রাহু চান্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন কারী
মঝু মনে লাগল ধান্দা॥

দুজনের যখন এমন উৎকণ্ঠা তখন মিলন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সেই মিলনের পথেও অনেক বিঘ্ন আছে, কতক সময়-সাপেক্ষতা আছে। সেই যে একটু খানি বিলম্ব, তাহাও বুঝি এই প্রণয়িযুগলের সহে না—সেই যে শ্রীকৃষ্ণ আসিবার একটু বিলম্ব তাহাতেই শ্রীরাধা ভাবিয়াই আকুল,—

মম মরণমেব বরমতি বিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥

কেন যে শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না ইহার কত হেতুই কল্পনা করিতেছেন, কত রকম গড়িতেছেন' ভাঙ্গিতেছেন, কখনও মনে করিতেছেন যে তাঁহা অপেক্ষা গুণবতী কেহ বুঝি তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে, কখনও মনে মনে সেই দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন, কখনও ভাবিতেছেন যে তাঁহারই মত বুঝি শ্রীকৃষ্ণের তদ্বিরহবেদনাজনিত দুর্ব্বলতা আসিয়াছে তাই তিনি এক পাও চলিতে পারিতেছেন না। জয়দেবের শ্রীরাধা পাগলিনী; আমরা আর এক মহাকবি সৃষ্ট পাগলিনী রাধার পরিচয় পাই, সেই পাগলিনী আর জয়দেব-সৃষ্ট পাগলিনী একই উপাদানে গঠিত। বিদ্যাপতির রাধিকা রসিকা চঞ্চলা ও কবিত্বময়ী, কিন্তু তিনিও কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে এক কালে এমনই দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন। যে 'কালো' ভালবাসে তাহাকে বুঝি এমনি হইতেই হয়।

এই পাগ্‌লামির চিহ্ন দেখ "মানে"। অদ্ভুত রমণীহৃদয়-রহস্য, "দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?" যাহার জন্য এত ভাবনা, এত কাঁদাকাটি এত জীবনে ধিক্কার, যাহাকে পাইবার জন্য এত সাধ্যসাধনা, এত অনুনয় বিনয়, সে যেই আসিয়া উপস্থিত অমনি মানিনী মুখ বাঁকাইয়া বসিলেন! সাধে কি সখী তাহাকে "বিপরীতকারিণী" খেতাব দিয়াছে! কিন্তু যার বড় ভালবাসা তারই বোধ হয় মানও বড় বেশী; একটু রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য নয়, একটু শাস্তি দিবার প্ররোচনায় নয়, সে মান যেন প্রাণের ভিতর হইতে আপনা আপনি উছলিয়া আসে, এ দারুণ অভিমান কেন আসে,

কোথা হইতে আসে তাহা বোঝা ভার, কিন্তু তাহা যে আসে তাহাতে তো সন্দেহ নাই। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য যে রাধিকা বলিয়াছিলেন—

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।
কিন্তে কৃষান্ত ভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ॥
তিনিই বিনীত শ্রীকৃষ্ণকে—
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ
কেতব বাদম্।

বলিয়া স্বচ্ছন্দে বিদায় করিয়া দিলেন। অসূয়া বড় বিষম ভাব—"ন মানিনী শং মহতেশ্চ সঙ্গমম্" এ সূত্রে একটা সাধারণ সত্য প্রকাশ করিয়াছে। মান জিনিষটাই একটা পাগ্‌লামি বটে, কিন্তু যে যত অধিক পাগল মানের সময় তাহার মুখ খুলে বেশী। জয়দেবের রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বেশ দু কথা গুছাইয়া শুনাইয়াছেন, আবার বঙ্গের পাগল কবির পাগলিনীও ঠিক এমনি ধারা শ্লেষের বাণ ছাড়িয়াছেন। কেবল বিদ্যাপতির সরলা রাধিকা গালি দিয়া মনের জ্বালা জুড়াইয়াছেন। যতদিন এই পোড়া "আমি"টা একেবারে পুড়িয়া ছার হইয়া না যায় ততদিন কি আর অভিমান ছাড়া যায়? তা মানও করিব, আর তারপর সে চলিয়া গেলে আবার কাঁদিতেও বসিব। তাহা না হইলে পাগ্‌লামীর চূড়ান্ত হয় কৈ? মানের রস বড় পরিপক্ক, তাই বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলিয়াছেন যে এ রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রীতি বোধ হয়।

প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।
জনমে কখন স্বল্প কখনও অধিক॥
সেই দুইমত হেতু নিহেতু উপজে।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভূঞ্জে॥ *

কেন? মানের ভিতর দিয়া প্রণয় ফুটিয়া বাহির হয় বলিয়া এবং এই মানের অবলম্বনে নিজের অভিমান বর্জ্জন করা যায় বলিয়া ইহা প্রণয়ীর পক্ষে বড় উপাদেয় রস, আর "নায়ক শিরোমণি" ইহাকে অবলম্বন করিয়াই "নায়িকা শিরোমণির" মান বাড়াইতে চাহেন বলিয়া তিনি মান এত ভালবাসেন।

থাকুক সে কথা, এখন আমরা যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। রাধিকা তো কৃষ্ণের সকল অনুরোধ, দীনতা, বিনয় উপেক্ষা করিয়া মানে বসিলেন, বেশ দু'কথা শুনাইয়াও দিলেন। যদি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ভালবাসা না থাকিত তাহা হইলে শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিবার এমন সুন্দর সুযোগ আর হইত না। যদি তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-পরায়ণই হইতেন তাহা হইলে তাঁহার শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া অন্য যুবতীশত, যাহারা তাঁহাকে একান্ত প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদের কাছে ফিরিয়া যাইয়া নিজের সুখ খুঁজিয়া লইবার কোনও বাধা ছিল না, বরঞ্চ এ তো তাঁহার মনোমত সুযোগে পরিণত হইত। আমি আসিলাম তুমি আমায় ফিরাইয়া দিলে, আমি আর কি করিতে পারি? এতো তাঁহার সুন্দর কৈফিয়ৎ। কিন্তু কৈ তিনি তো সে অছিলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাধাকে ত্যাগ করিলেন না, বরং তাঁহার মানাপগমের ক্রোধ-শান্তির অপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে সখী

রাধিকাকে কত বুঝাইল, কত অনুযোগ করিল, "তোর যে সবই উলটা" বলিয়া কত তিরস্কার করিল, করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। কিন্তু সখীরও তো একটু রঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা হয়, সে তাই আর কোনও কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিল। এদিকে শ্রীরাধার মান প্রাণের আকুলতার মুখে ভাসিয়া গিয়াছে, অথচ যাহাকে এইমাত্র তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাকে কি করিয়া ফিরাইবেন এই চিন্তাতে হৃদয় এখন মগ্ন হইয়াছে। সখী বুঝিতেছে অথচ কোনও কথা কহিতেছে না, বোধ হয় মনে মনে সে একটু হাসিয়া লইতেছে এবং মনে মনে বলিতেছে—

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?

শ্রীরাধার বড় বিপদ্, এ বিপদে সখী ভিন্ন গতি নাই, অথচ সখীকে কিছু খুলিয়াও বলিতে পারিতেছেন না, মনের বাসনা দীর্ঘ নিশ্বাসে ও সখীর প্রতি বার বার সলজ্জ চাহনিতে প্রকাশ পাইতেছে। একটী হৃদয় যেন বিনা কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, ছবিটী বড় মনোরম মনে হয়, যেন এমনি অবস্থায় শ্রীরাধিকাকে আর একটুক্ষণ দেখিতে পাইলে আমাদের নয়ন সার্থক হইত। ঠিক এমনি ছবিটী আমরা বিদ্যাপতিতে দেখিতে পাই না, সেখানে সখীও রাধিকাকে দুকথা শুনাইয়াছে, রাধাও সখীকে অনুরোধ করিয়াছেন। এমনি ধারা নির্ব্বাক্ নিবেদন, এমনি কথা না কহিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ছবি বিদ্যাপতির 'মানে' নাই, আছে ভাবী বিরহে, তাও বড় সুন্দর, কিন্তু এই ছবিটীতে যে মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অধিক জটিল। জয়দেব চিত্রাঙ্কণে যে বেশ সিদ্ধহস্ত তাহা এই চিত্র হইতে বুঝা যাইতেছে।

সখী রাধিকার কাছে কোনও কথা বলুক আর না বলুক, সে যে শ্রীরাধার এই অবস্থার কথা শ্রীকৃষ্ণকে কোনও উপায়ে জানাইয়াছিল সে বিষয়ে ভুল নাই, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাছে আসিয়া তাঁহার মানের অবশিষ্টাংশ ভাঙ্গিবার জন্য অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী
হরতিদরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুর দধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥

অপরাধভীত শ্রীকৃষ্ণের মুখ দুদণ্ড পূর্ব্বে একেবারেই খোলে নাই, কিন্তু এখন শ্রীরাধার কোপাপনয়নসংবাদে তাঁহার কবিত্বের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে, এখন কতক সাহসও বাড়িয়াছে এবং মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার অবসরও মিলিয়াছে; মুখও খুলিয়াছে; অপরাধী রাণীর দরবারে হাজির হইয়া "আর্জি" করিয়াছেন, আমি দোষী তাহাতে "সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী" তাহা হইলে আমায় সাজা দাও আমাকে লইয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাই কর "যেন বা ভবতি সুখ জাতম্।" তুমি যে আমার সব—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব জলধি-রত্নম্।

আমার ভুল কি তুমি ক্ষমা করিবে না? তুমি ত জান তুমি যাহাতে সুখে থাক আমি সেই কামনা লইয়াই জীবিত আছি।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয়মতি-যত্নম্ ॥

তোমাকে লইয়াই আমার কাম, আমার ভোগ আমার বাসনা, আমার লালসা এ সকলেরই চরম আশ্রয় তোমার ঐ দেহখানি। তোমার মনটী আমার সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। হে মানিনি, তোমার বৃথা সন্দেহ দূর কর, তুমি থাকিতে কি এ হৃদয়ে আর কাহারও স্থান হইতে পারে? তাই বলি "মুঞ্চময়ী মানমনিদানম্" এস আমার হৃদয়ে, তোমার নয়ন রাগে আমার কাল দেহ রঞ্জিত হোক, তোমার হৃদয়ের হার চঞ্চল দোলনে হৃদয়ে শোভা সম্পাদন করুক, তোমার মেখলা কোমল নিক্কণে লালসার মদনের আজ্ঞার প্রচার করুক, প্রিয়ে আমি অপরাধী আমি একান্ত বাসনা সত্ত্বেও তোমার আর কোনও অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস করি না শুধু আমার হৃদয়ের ভূষণ তোমার পা দুখানি ছুঁইতে সাহস করি, এস সেই দুইটীকে অলক্তক রাগে রঞ্জিত করি। আমি বাসনা বিষজর্জ্জরিত; তোমার স্পর্শই তাহার একমাত্র ঔষধ। অতএব আমার শিরোরত্ন স্বরূপ সেই পা দুখানি—

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে জয়দেব এই চরণটী শেষ করিতে গিয়া চকিত ও ত্রস্ত ভাবে উহা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার সেই দ্বিধান্দোলিত ও চকিত হৃদয়ের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। কি করিয়া তিনি তাঁহার চিরারাধ্য দেবতা জগৎ-পতি কৃষ্ণকে এত দীনতা স্বীকার করাইবেন ইহা ভাবিয়া যে তিনি আকুল হইয়াছিলেন, অকুল পাথারে পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ভক্তমালে ঐ চরণ পূরণের যে বিবরণ আছে তাহা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, এ কথা সত্য যে সেই মানীর মানী অথচ ভক্তের কাছে তৃণাদপি সুনীচ, ভক্তের মান বাঁচাইবার জন্য যিনি চিরদিন প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, তিনিই ভক্ত কবির হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণীর মান বাড়াইবার জন্য কবির লেখনী হইতে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অসমসাহসিক এই অশেষ আশাপ্রদ বাক্য বাহির করিয়া-ছিলেন।

আমরা যে ভাবেই কৃষ্ণচরিত্র বিচার করিনা কেন জয়দেবের কাছে যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" সে বিষয়ের প্রমাণ গীতগোবিন্দের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান্ রহিয়াছে, অতএব বৈষ্ণবসাহিত্যে ভগবানের দীনতা যে কতদূর প্রসৃত হইতে পারে তাহার এই প্রথম ও প্রধান নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে যে জয়দেবকে অসমসাহসিকতার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও মতভেদ হইতে পারে না। ভক্তমালের বিবরণ একেবারে অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না, কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করিতেও বলি না, কারণ তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। যেরূপেই এই বাক্য লিখিত হউক, আমরা ইহা হইতে ভক্তিরসের এক অভাবনীয় নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি, এবং মহাকবি ও মহাপ্রেমিক জয়দেব সেইভাব বঙ্গদেশে প্রথম প্রবাহিত করিয়াছেন, তাই ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে জয়দেবের এত সম্মান, জয়দেবের আসন এত উচ্চে। ক্রমে এই ভাব সহজ হইয়া আসিয়াছিল, এমন কি বিদ্যাপতিতেই যেন অতটা সম্ভ্রম-বোধ আর দেখিতে পাওয়া যায়

না, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা তো সম্ভ্রমের ভাবটা একেবারেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই অপূর্ব্ব উপায়ে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছেন। মনের মান "মানে," তাই বৈষ্ণব কবির কাছে মানের এত আদর। বস্তুতঃ ইহা মানিতেই হইবে যে কোনও "বহুবল্লভ" নায়কের পক্ষে একই নায়িকার কাছে এত হীনতা স্বীকার করিবার একমাত্র প্রয়োজন প্রাণের অনিবার্য্য ও প্রবল আকর্ষণ; এমন আকর্ষণ যে তাহার কাছে নিজের মান-মর্য্যাদা, গুণ-গরিমা সকলই ভাসিয়া যায়। আপাততঃ আমাদের এই টুকুতেই প্রয়োজন।

তাহার পর এত আকাঙ্ক্ষার এত সাধা-সাধির, এত যত্নে "মানভঞ্জনের" যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; এবং যে ভালবাসা কেবল ভাবমাত্রে পরিণত হয় নাই তাহার যাহা সুখময় ফল কবি জয়দেব তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার কবিরা এ সব বর্ণনায় দোষ দেখিতেন না, এখনকার কবিরা দেখেন, তাই তাঁহাদের অনেক সময় আভাসে সূত্রাকারে এই সত্য প্রকাশ করিতে হয়। যাঁহাদের ভাল লাগে না তাঁহারা স্বচ্ছন্দে এইগুলি বাদ দিয়া যাইতে পারেন, গ্রন্থ উপভোগের কোনও বাধা হইবে না। তবে না বুঝিয়া, মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইয়া, কেবল অশ্লীলতার ধুয়ার খাতিরে, মহাকবি জয়দেব বা বিদ্যাপতিকে গালাগলি না করিলেই সাহিত্যের পক্ষে ও নিজেদের পক্ষেও ভাল হয়। যে সকল কথা আমরা অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করি সেই গুলিই বৈষ্ণব অনুবাদক ভক্তির পরিপোষক বলিয়া আদরের সহিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা হইতেই তাহাদের গূঢ়রহস্য অনেক পরিমাণে জানা যায়। গীতগোবিন্দের শেষে সম্ভোগান্তে খিন্নবেশা, শ্রস্তকুন্তলা শ্রীরাধা দেহসজ্জার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছেন। সমগ্র গীতগোবিন্দে যে একটা কৃষ্ণলালসার ভরা সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, ইহা সেই সুরের সুমধুর সমাপ্তি। "তোমার দেহ তুমি সাজাইয়া লও, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি" শেষ যে ছিল লজ্জাটুকু তাহাও তোমার সুখের জন্য ধুইয়া ফেলিয়াছি, তোমার জন্যই এই দেহ, তোমার জন্যই এই ইন্দ্রিয়গুলা, তুমি ইহাদের সাজাইবে তবে তাহারা সাজিবে, তুমি ইহাদের যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে, কিন্তু হে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আমি কেমন করিয়া অনলঙ্কৃত দেহে, ভূষণবিহীন ইন্দ্রিয় লইয়া তোমার সেবায় নিয়োজিত হইব? তাই আমার দেহে বল দাও, অঙ্গে অঙ্গে ভূষণ দাও আমার আকুল কবরী সংযত করিয়া দাও, তোমার নৈবেদ্য তুমিই গুছাইয়া লও, যদি এ দেহে তোমার আবার প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাকে নিজে সাজাইয়া লও, তোমার মনোমত করিয়া লও, তোমার প্রেমের ভূমিকে শক্তিশালিনী করিয়া লও; শ্রীরাধার ইহাই সুখ, ইহাই আবদার, ইহাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যাঁহারা ভক্তির রহস্য অবগত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ভক্তের ইহাই কামনা, ইহাতেই তাহার সুখ। তাই কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রথমেই জোর করিয়া বলিয়াছেন—

"যদি হরি স্মরণে কুতুকং মনঃ—
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।"

এবং এই জন্যই বৈষ্ণব অনুবাদক লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ ভজন তত্ত্ব সকলি লিখিলা—
বৈষ্ণবের ধ্যানবর্ত্ম তত্ত্ব বিচারিলা।
*　　*　　*
নিত্যলীলা-সহ গ্রন্থ বিচারি কহিলা।
রসসার গ্রন্থ যাতে সব কৃষ্ণলীলা॥
*　　*　　*
শ্রীকৃষ্ণে একান্ত আত্মা তনু মন যার—
সেই জয়দেব পাদপদ্মে নমস্কার॥

জয়দেবের কাব্যের যেখানে সমাপ্তি, বিদ্যাপতির কাব্যের সেই খানেই আরম্ভ। বিদ্যাপতির কাব্যের প্রাণ বিরহে, সেই বিরহ তিনি সম্পূর্ণ সম্ভোগের পরে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জয়দেব গুরু, বিদ্যাপতি শিষ্য শুধু বিদ্যাপতি কেন সকল বৈষ্ণব কবিই জয়দেবের শিষ্য, কারণ জয়দেব মধুর রসের আদি কবি। এক হিসাবে কিন্তু বিদ্যাপতি গুরুর অপেক্ষা অধিক কৃতী; তাঁহার শ্রীরাধিকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ সম্পাদনে আমরা তাহার পরিচয় পাই। একটী সরলা বালিকা ভালবাসার পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হয়, বিদ্যাপতি তাহাই সূক্ষ্ম ভাবে দেখাইয়াছেন, পক্ষান্তরে একজন ভক্ত ভগবৎ-প্রেমের পথে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রগামী হয়, বিদ্যাপতি তাহাও দেখাইয়াছেন। এইরূপ একটী সরলা বালিকা পরকীয়া হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, এবং তাহার প্রেম ও 'কুলের' মাঝে পড়িয়া যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও বিপরীতগামী ভাবাবলী তাহাতে প্রকাশ পায়, শেষে প্রেমের জয় হইলে কেমন করিয়া সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রিয়ানুশীলনে নিমগ্ন হয়, বিদ্যাপতি তাহা নিপুণ তুলিকার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতিতে এইজন্য কলা-কৌশল বেশ বিকশিত। পক্ষান্তরে, ভক্তির ক্রম পরিপুষ্টি, ভক্তের হৃদয়ে সংসার ও ভগবানের এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে অবলম্বন করিতে হইবে এই ভাবনার তুমুল আন্দোলন ও এই পরস্পরবিরোধী ভাব-দ্বয়ের পরস্পরের অভিনব চেষ্টায় যে সকল অবস্থা বিশেষের সংস্থান ও পরিশেষে ভগবদা-কর্ষণের জয় হয়, কবি ও রসিক ভক্ত বিদ্যাপতি উৎসাহের সহিত তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য বৈষ্ণব-কবি হিসাবে বিদ্যাপতির স্থান কোনও বৈষ্ণব কবির নীচে নহে; এবং কাব্য-কলা ও মনুষ্যহৃদয়জ্ঞতা যদি স্থান নির্ণয়ের পরিমাপক হয় তাহা হইলে তিনি অন্যান্য সকল বৈষ্ণব কবির গুরুস্থানীয় তাহা সূক্ষ্মদর্শী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে না। আমরা বিদ্যাপতির কথা অনেক বার বলিয়াছি হয় তো ভবিষ্যতে আবার কিছু কিছু বলিতেও হইতে পারে, অতএব এক্ষেত্রে আর বেশী বলিবার ইচ্ছা করি না।

বোধ হয়—আমরা এতক্ষণে দেখাইতে পারিয়াছি যে কবি জয়দেব ভাব, ভাষা ও ছন্দে বঙ্গসাহিত্যকে অশেষ প্রকারে ঋণ-জালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস, যাঁহারা বঙ্গকাব্যসাহিত্যকে অশেষ শোভাশালী রত্নরাজি উপহার দিয়া বহু সমৃদ্ধ করিয়াছেন—উভয়েই মধুর রসের আদি-কবি জয়দেব গোস্বামীর কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রশংসার কথা আমি—বঙ্গভারতীর একজন নগণ্য সেবক-খুঁজিয়া পাই না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

বেদের কথা।

আজি কালিকার য়ুরোপীয় সাধনা বিশাল বিশ্বব্যাপারে একটা ক্রম বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে এক শক্তি, এক পদার্থ, এক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সে শক্তি, সে পদার্থ, সে তত্ত্ব যে কি তাহা কেহ জানে না। নানা লোকে তার নানা নাম দিয়া থাকে। কেহ বলে তাহা জড়, কেহ বলে অজড়। কিন্তু সে বস্তু যাহাই হউক না কেন, এই বিশাল ও বিচিত্র জগৎ যে সেই একই বস্তুরই ক্রমবিকাশে রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর বেশি কোনও সন্দেহ নাই। আমরা চিরদিনই এ বস্তুকে অজড়, তত্ত্ববস্তু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। "স দেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" হে সৌম্য সেই এক ও অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই আদিতে ছিলেন—"নান্যদস্তীতি কিঞ্চন"—এ ছাড়া অন্য আর কোনও কিছু ছিল না। সেই বস্তুই এই অশেষ বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব। আধুনিক বিজ্ঞানও এই তত্ত্বকেই ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

আর আমরা চিরদিনই সৃষ্টির মূলীভূত এই তত্ত্ববস্তুকে চৈতন্য বস্তু বলিয়া জানিয়াছি। এই বস্তুই ব্রহ্ম-বস্তু। এ বস্তু 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' এই ব্রহ্মবস্তুই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ। কারণ আবার আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকারের। এককে উপাদান কারণ ও অপরকে নিমিত্ত কারণ বলে। মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান কারণ। কারণ মৃত্তিকার দ্বারা ঘটাদি নির্ম্মিত হয়। আর কুম্ভকার এ সকল ঘটাদির নিমিত্ত কারণ। নিমিত্ত কারণ এখানে কুম্ভকারের কেবল কুলাল বা হাত নহে, তাহার মনও। কুম্ভকার আপনার মনের মধ্যে পূর্ব্বে ঘটাদির আকৃতি প্রভৃতি ধারণা করিয়া লয়। পরে সেই ধারণার অনুরূপ করিয়া, কুলাল-সহায়ে আপনার হাত দিয়া, মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্রহ্মবস্তু জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই। তাঁর অতিরিক্ত বিশ্বে কোনও কিছুই নাই। সুতরাং এই বিশ্বরচনার আত্মাতিরিক্ত কোনও কিছুর সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন নাই। আর এরূপ কোনও উপাদান যদি থাকিত, তবে তাঁহাকে সেই উপাদান লইয়া বিশ্বরচনা করিতে গিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সে বস্তুর অধীনও হইতে হইত। মৃত্তিকা যেমন কুম্ভকারের শক্তির বশীভূত হইয়া, ঘটাদিতে পরিণত হয়, কুম্ভকারকেও এই সকল ঘটাদি নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া মৃত্তিকার প্রকৃতিগত যে সকল ধর্ম্ম আছে, তার বশ্যতা মানিয়া চলিতে হয়, নতুবা তার পক্ষে এই মাটী দিয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু যদি আপনিই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ দুইই না হন, তাহা হইলে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা আর রক্ষা পাইতে পারে না। জগতের উপাদান যাই হউক না কেন, জগৎকর্ত্তাকে সে উপাদানের বশ্যতা মানিয়া তবে এই জগৎ রচনা করিতে হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে জগৎ-কর্ত্তার সঙ্গে জগতের উপাদানবস্তুর একটা সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইয়া উঠে। কিন্তু দু'ই বস্তুতে কোনও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা

করিতে গেলে, এ সম্বন্ধের সূত্ররূপের তৃতীয় বস্তুরও প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা আর যোগস্থাপন একই কথা। আর দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে যোগস্থাপন করিতে হইলে, একটা সাধারণ যোগসূত্র অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। ব্রহ্ম যদি জগতের নির্ম্মাতা বা রচয়িতা মাত্র হয়েন, আর অন্য কেহ বা কোনও কিছু যদি জগতের উপাদান হয়, তবে এই নির্ম্মাতার সঙ্গে এই উপাদানের একটা সম্বন্ধ ও যোগ স্থাপন করা তো চাই, না হইলে জগৎ নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্ভব হয় কৈ? এই জন্যই বলিতেছিলাম যে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ দুই যদি এক ব্রহ্ম-বস্তু না হয়েন, তবে তৃতীয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না করিলে জগৎ-রচনা সম্ভব হয় না। আর সে বস্তু একদিকে বিশ্বের উপাদান বস্তুকে অন্য দিকে বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া থাকিবেন—ইহারা উভয়ে সেই পরম ও চরম বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর তখন সেই পরম ও চরম তাক্ত বস্তুকেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। তখন তাহাই পরিশেষে বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের শাস্ত্রে এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই ব্রহ্মবস্তুকে বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয় কারণরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর নিমিত্ত কারণ বলিলেই, তাহার মধ্যে বীজরূপে এই নিয়ত বিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ড অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে ইহাও মানিতে হয়। কারণ প্রকট হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ছিল, অন্যথা এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না; অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবে না। যাহা মূলে নাই, ফলেতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই ক্রমে ব্যক্ত হইতে থাকে—ক্রমবিকাশের বা ইভলিউষণের ইহাই মূল কথা। এ বস্তু ব্যক্ত হইতে গিয়া বিবিধ কারণ সমবায়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে বটে—এ সকল রূপান্তর বা variation বাহিরের কারণে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, কিন্তু রূপান্তর বলিতেই একটা ভিতরকার স্বরূপ যে আছে, ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় না কি? এই রূপান্তর ঘটনের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তো বিদ্যমান থাকে। আর কার্য্য ও কারণ ইহা যে দুইটা ভিন্ন বস্তু নয়, একই বস্তুর পরিণতি মাত্র, ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না। কারণের বিকৃতি, বিবর্ত্তন, বা পরিণতি হইতেই কি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না? যেখানে কারণ ও কার্য্য উভয়ের মধ্যে একটা নিত্য বস্তু কিছু না থাকে, সেখানে এ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় না কি? আমার জ্বর হইয়াছিল, আমি সেই জ্বরের বিরাম অবস্থায় কুইনাইন খাইয়াছিলাম, তাহার ফলে জ্বর আরোগ্য হইল। এখানে আমি বা আমার শরীর বলিয়া একটা বস্তু সমভাবে কার্য্যের ও কারণের সঙ্গে জড়িত হইয়া উভয়কে ব্যাপিয়াছিল বলিয়াই কুইনাইন্ সেবনকে কারণ ও জ্বরের উপশমকে কার্য্য বলিতে পারিলাম। আমার বন্ধু কেশবের জ্বর হইয়াছিল, আমি তাঁর সে জ্বরের বিরাম অবস্থায় দশগ্রেণ কুইনাইন্ খাইয়াছিলাম, পরের দিন আর তাঁর জ্বর আসিল না এমন যদি ঘটে, তাহা হইলে আমার কুইনাইন্ সেবনের সঙ্গে তাঁর জ্বরবিচ্ছেদের কোনও

কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করা যাইবে কি ? আর কার্য্য ও কারণের মধ্যে সেইরূপ কোন একটা কিছু সমভাবে এখানে বিদ্যমান নাই বলিয়াই, এক্ষেত্রে এ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। অতএব ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে-এমন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্মেতে ছিল, সৃষ্টির পরেও ব্রহ্মেতে একদিকে ও ব্রহ্মাণ্ডেতে অন্যদিকে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বস্তুই দেশকালের চিত্রপটে ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকট হইতেছে। এই বস্তুর প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও যোগ-স্থাপন সম্ভবে না।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বসমস্যার ভেদ করিতে যাইয়া, বিভিন্ন দেশের ঋষি ও মনীষিগণ এই অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। এই বস্তুকেই আমাদের বৈদান্তিকেরা মায়া, বৈষ্ণবেরা প্রকৃতি শাক্তেরা শক্তি ইহুদীরা সোফিয়া, গ্রীকেরা, লেগস, খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্ট নাম দিয়াছেন। এই বস্তুই জগদ্বীজ। এই বস্তু পরিপূর্ণ আকারে ব্রহ্মচৈতন্যে—তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও নহে, অভিন্ন হইয়াও নহে—অনাদিকাল হইতে বাস করিতেছে। চিত্রকরের অন্তরে প্রথমে যেরূপ একটা ছবি জাগিয়া উঠে ও তাঁর ধ্যানে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আর তিনি এই মানসচিত্রকেই পরে ধীরে ধীরে চিত্রফলকে ফুটাইয়া তুলিয়ালোকচক্ষুর গোচর করিয়া থাকেন, সেই রূপ এই বিশ্বের একটা পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি বিশ্বপতিও বিশ্বকর্ত্তার চিদাকাশে অনাদিকাল হইতে ফুটিয়া রহিয়াছে, এই প্রতিকৃতিরই অনুকৃতি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে। সেই তুরীয় চৈতন্যে মিতাধৃত আদর্শই এই বিশ্বের বিবর্ত্তনে তিলে তিলে প্রকট হইয়া উঠিতেছে; সেইখানেই এই সকল অনিত্য বস্তুর নিত্য সার্থকতা। সেইখানেই এই সদসদাত্মক জগতের নিত্য সত্যের প্রতিষ্ঠা। সেই অভিধানেই বিশ্বের সকল শব্দের সত্য অর্থ লিখিত রহিয়াছে। সত্যের কষ্টিপাথর ঐখানে; ধর্ম্মের উৎপত্তি ঐখানে; সৌন্দর্য্যের ওজন ঐখানে। অমৃতত্ত্বের পরীক্ষা ঐ খানে। আর ব্রহ্মচৈতন্যধৃত এই যে বিশ্বছবি তাহাই সত্যবেদ। তাহাই স্ফোটাত্মক শব্দ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এই স্ফোটাত্মক বেদ ধারণ করিয়া আছেন বলিয়াই ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি হইয়াছেন। এখানেই, এই তত্ত্বের মধ্যেই তাঁর শাস্ত্রনিযোত্বের অর্থ ও প্রামাণ্য অন্বেষণ করিতে হইবে। নতুবা তিনি যে মানবের মত আপনার মুখ দিয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দযোজনা করিয়া ধ্বন্যাত্মকশব্দ সম্বলিত ঋগ্বেদাদির সাক্ষাৎ প্রচার করিয়া শাস্ত্রযোনি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা কবিকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বকথা নহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রিণ্টার,—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।